শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ

শ্রী গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

॥ নবভারত পাবলিশার্স ॥
॥ কলিকাতা ৯ ॥

প্রথম সংস্করণ
১৫ আগষ্ট ১৯৫৬

প্রকাশক
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সাহা
নবভারত পাবলিশার্স
৭২ হ্যারিসন রোড
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীসুধীর মৈত্র

মুদ্রক
শ্রীসুবোধ পালিত
বাস্তব প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৮৫-ই রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

মূল্য সাড়ে বারো টাকা
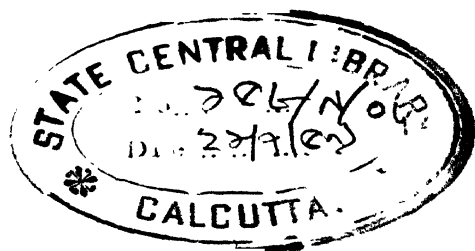
উৎসর্গ

"ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যাঁরা
জীবনের জয়গান।"

… … তাঁদের স্মরণে

ভূমিকা

বাংলা ১৩৪৭ সনে, বৈশাখমাসে আমি শ্রীঅরবিন্দ "উদ্বোধন" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ করি এবং একাদিক্রমে সাত বৎসর উহা ঐ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া শেষ করি। ইংরেজ তখনও ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যায় নাই।

সেই সময় স্বামী সুন্দরানন্দ "উদ্বোধন" পত্রিকার সম্পাদক। ঘরে-বাইরে নানারূপ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি আমার এই শ্রীঅরবিন্দ দৃঢ়তার সহিত ছাপাইয়াছেন।

আমার বন্ধু বম্বে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ্ ক্ষিতীশচন্দ্র সেন, আই-সি-এস "ইন্দুপ্রকাশ" হইতে New Lamps For Old এবং Bankim Chandra Chatterjee প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। বঙ্কিম-প্রবন্ধগুলি তাঁহারই আবিষ্কার।

আমার পরলোকগত বন্ধু সুসাহিত্যিক নবদ্বীপবাসী জনরঞ্জন রায় আমাকে লইয়া চন্দননগর "প্রবর্ত্তক সংঘ"-এর শ্রীমতিলাল রায়ের নিকট বহুবার যাতায়াত করিয়া পুরানো "বন্দেমাতরম্" পত্রিকা হইতে প্রয়োজনীয় বহু তথ্য সংগ্রহ করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। আমরা শ্রীমতিলাল রায়ের আশ্রমে কখনও কখনও রাত্রিবাস পর্যন্ত করিয়াছি এবং অতিশয় সহৃদয়তার সহিত আমরা অভ্যর্থিত হইয়াছি।

আমার অধ্যাপক শ্রীযুত মনমোহন ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লতিকা ঘোষ, বি-এ (কলিকাতা) বি-লিট্ (অক্সন্) আমাকে "কর্ম্মযোগিন্" ও "ধর্ম্ম" পত্রিকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং শ্রীঅরবিন্দের কাব্য (poetry) সম্পর্কে আলোচনা দ্বারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

শোভারাণী দত্ত আমাকে বিপিনচন্দ্র পালের কন্যা ও শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষের নিকট হইতে নানারূপ তথ্য ও পুস্তক সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিয়াছিলেন।

আমি আমার নিজগ্রাম ময়মনসিংহ জেলায় ছুয়াজানি থাকাকালে আমার সেজ ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী সত্যবতী রায়চৌধুরাণী, বি-এ ইহার কতকগুলি প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি লিখিয়া দিয়াছে।

পরিশেষে আমার সোদরোপম শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ ('মন্টি ঘোষ') কলিকাতা, নবদ্বীপ, ছুয়াজানি—যখন যেখানে এই সাত বৎসর ছিলাম, আমার সঙ্গে থাকিয়া আগাগোড়া ইহার পাণ্ডুলিপি লিখিয়া দিয়াছেন। শুধু লিখিয়া দেন নাই, বহুস্থানে আমাকে পরামর্শ দিয়া আমার অভিমত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এবং এই সাত বৎসরের প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠার স্তূপাকার লেখাগুলি সুসংবদ্ধ করিয়া ছাপাইবার উপযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত আমি এই গ্রন্থ ছাপাইতে পারিতাম না।

আমার পরম স্নেহভাজন, আমার পুত্র অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর রায়-চৌধুরীর অন্তরঙ্গ বন্ধু, "পরিক্রমা" মাসিক-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমান সুধাংশু দে অক্লান্ত পরিশ্রমে সমস্ত প্রুফ দেখিয়া দিয়াছে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের গ্রন্থাগারিক, "পরিক্রমা"-র সহযোগী সম্পাদক আমার স্নেহভাজন শ্রীমান রণজিৎ চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থের শব্দ-সূচী (Index) অতিশয় পরিশ্রমের সহিত নিপুণভাবে তৈরি করিয়া দিয়াছে।

পরিশেষে আমার স্নেহাস্পদ ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য ইহা প্রকাশের ভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।—ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট এজন্য আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

যখন শ্রীঅরবিন্দ "উদ্বোধন" পত্রিকায় ছাপা হইতেছিল, তখন পণ্ডি-চারী আশ্রম হইতে এইরূপ একপ্রকার সমালোচনা শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, আমি পারিপার্শ্বিক ঘটনার দৃশ্যপট ("landscape") অঙ্কিত করিয়াছি, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মূর্ত্তি ("portrait") আঁকিতে

পারি নাই। আমার পুস্তকের নাম শুধু "শ্রীঅরবিন্দ" নয়, তৎসঙ্গে "বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ"ও বটে। 'ল্যাণ্ডস্কেপ' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা আমাকে অনিবার্য্যরূপেই অঙ্কিত করিতে হইয়াছে। ইহাতে 'পোর্ট্রেট্' আঁকা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। বরং ভাল হইয়াছে বলিয়াই মনে করি।

আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে—"উদ্বোধন" পত্রিকায় আমার শ্রীঅরবিন্দ যখন ছাপা হইতেছিল, তখন প্রতি মাসেই শ্রীঅরবিন্দকে পণ্ডিচারীতে উহা পাঠ করিয়া শুনান হইত। তিনি শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে : "আমার রাজনৈতিক জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশগুলিকে ('dark period') কেহ লেখে, ইহা আমি ইচ্ছা করি না। যদি কেহ সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস উদ্ধার করে, সে আমার মুখের হাসি কাড়িয়া লইবে—('he will snatch away smile from my face')।

শ্রীঅরবিন্দ ১৯১০।ফেব্রুয়ারীর শেষে ভগিনী নিবেদিতার পরামর্শে কলিকাতা বাগবাজার গঙ্গার-ঘাট হইতে নৌকাযোগে চন্দননগর শ্রীমতিলাল রায়ের বাড়ীতে গিয়া সেখানে সমস্ত মার্চ্চ মাস (March, 1910) লুকাইয়া থাকেন। তিনি যে-ঘরে লুকাইয়া ছিলেন, সেই ঘরটি আমি দেখিয়াছি।

পরে তিনি সেই আত্মগোপনের অবস্থাতেই জাহাজে চড়িয়া ৪ঠা এপ্রিল (4th April, 1910) পণ্ডিচারী গিয়া উপনীত হন এবং সেইখানেই তাঁহার তিরোভাব ঘটে (৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০) ও তাঁহার দেহ সেইখানেই সমাহিত করা হয় (৯ই ডিসেম্বর, ১৯৫০)। তিনি ৭৮ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচারীর জীবন-লীলা রহস্যে আবৃত। উহা আমি জানিনা। যাহা আমি জানি না, তাহা লিখিবার মত দুঃসাহস ও স্পর্দ্ধা আমার নাই।

৭।১ বিপ্রদাস ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

এক ঃ অরবিন্দের জন্মের পূর্বে

[পৃঃ ১—১৮]

দুই ঃ শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হইতে সাত বৎসর

[পৃঃ ১৯—২২]

তিন ঃ শ্রীঅরবিন্দের বিলাতে চৌদ্দ বৎসর

[পৃঃ ২৩—৬২]

চার ঃ বরোদায় চৌদ্দ বৎসর

[পৃঃ ৬৩—৪৩২]

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আলিপুর বোমার মামলা হইতে মুক্তিলাভ
করিবার অব্যবহিত পরে গৃহীত ফটো।
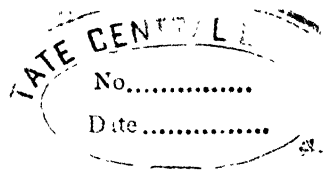
এক

শ্রীঅরবিন্দের জন্মের পূর্ব্বে

শ্রীঅরবিন্দের পিতামাতার বিবাহ :

রাজনারায়ণ বসু ছিলেন অরবিন্দের মাতামহ। রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যাই অরবিন্দের মাতা। অরবিন্দের পিতা ও মাতার বিবাহ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ-বাবুর কথাই উদ্ধৃত করিতেছি :

"আমার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম অনুষ্ঠান আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্মমতে দেওয়া। এই বিবাহ মহা জাঁকজমকের সহিত দেওয়া হইয়াছিল। তখন ব্রাহ্মসমাজে দলাদলি আরম্ভ হয় নাই। ঐ বিবাহ উপলক্ষে দেবেন্দ্রবাবু ও কেশববাবু উভয়েই মেদিনীপুর গিয়াছিলেন।

"কলিকাতার অনেক ব্রাহ্ম এই উপলক্ষে মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। বিবাহ-সভা কলিকাতার ব্রাহ্ম ও মেদিনীপুরের ব্রাহ্ম এবং মেদিনীপুরস্থ প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লইয়া হয়। সভাটি মহতী হইয়াছিল। তখন হারমোনিয়ম বাদ্যযন্ত্র ব্রাহ্মসমাজে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত বাদ্যযন্ত্র কলিকাতা হইতে আনাইয়া সঙ্গীতসময়ে বিবাহ-সভায় বাজান হইয়াছিল। এই বিবাহে কেশববাবু প্রধান আচার্য্য এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও মেদিনীপুরের পরমোৎসাহী ব্রাহ্ম মেদিনীপুর জিলাস্কুলের হেডপণ্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের কর্ম্ম এবং অযোধ্যানাথ পাকড়াশী পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। বিবাহকার্য্য এত জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হয় যে, দেবেন্দ্রবাবু পরে বলিয়াছিলেন যে—রাজা-রাজড়ার বিবাহে এমন হয় না। ......আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বামী শ্রীমান্ কৃষ্ণধন ঘোষকে আমার 'ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা' উৎসর্গ করি।"—(আত্ম-চরিত—পৃঃ ৮০)।

"১৮৬৪ সালে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়।"—(ঐ—পৃঃ ১১০)।

রাজনারায়ণবাবু লিখিয়াছেন, "আমার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম অনুষ্ঠান, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মমতে দেওয়া।" ইহা কিন্তু জাতিভেদ-ভঙ্গকারী অসবর্ণ বিবাহ নয়। একই কায়স্থ সমাজের 'ঘোষ' এবং 'বসু'তে বিবাহ। জাতিভেদ রক্ষা করিয়া ১২ বৎসরের কন্যাকে বিবাহ দিয়া রাজনারায়ণবাবু বলিতেছেন যে, এই বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্মমতে দেওয়া হইল। তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই বিবাহে প্রধান আচার্য্যের কার্য্য করেন। অরবিন্দের পিতামাতার বিবাহে প্রধান পুরোহিত বৈদ্য—এইটুকু যা-একটু তখনকার দিনের সমাজ-সংস্কার। এবং পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করাতেই রাজনারায়ণবাবু মনে করেন যে, এই ১২ বৎসরের কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্মমতেই দেওয়া হয়।

ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ (১৮৪৬—১৮৯৩):

ডাক্তার কে. ডি. ঘোষের পিতার নাম ছিল কালীপ্রসাদ ঘোষ। ডাঃ ঘোষ যখন ১২ বৎসরের বালক, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ডাঃ ঘোষের পিতা গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরি করিতেন এবং ৩০০৲ মাসিক বেতন পাইতেন। ডাক্তার ঘোষের মাতার নাম ছিল শ্রীযুক্তা কৈলাসকামিনী ঘোষ। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি কাশীধামে গিয়া বাস করেন। অরবিন্দের পিতা ডাঃ কে. ডি. ঘোষ তাঁহার মাতা কৈলাসকামিনীকে মাস পঞ্চাশ টাকা করিয়া পাঠাইতেন এবং প্রতি মাসে নিজে হাতে একখানা করিয়া চিঠি দিতেন। অরবিন্দের পিতামহীকে অরবিন্দের পিতা অতিশয় ভক্তি করিতেন। অরবিন্দের পিতা অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি মায়ের ইচ্ছানুসারে ১০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরগাত্রে একটি সোনার পাত আঁটিয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ প্রতি বৎসর দুইবার কাশী গমন করিয়া তাঁহার মাতাকে দেখিয়া আসিতেন। অরবিন্দের পিতামহী কৈলাসকামিনী অরবিন্দের বিবাহকাল (১৯০১ খৃঃ) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এবং ইহা 'ঘোষে'-'বোসে' বিবাহ, অর্থাৎ সবর্ণ বিবাহ। অসবর্ণ অথবা রেজিষ্ট্রীকৃত বিবাহ নয়। ইহা জানিতে পারিয়া অরবিন্দের পিতামহী অত্যন্ত খুসী হইয়াছিলেন—কেননা, তিনি গোঁড়া রক্ষণশীল নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন।

ডাঃ কে. ডি. ঘোষ ও তাঁহার পৈত্রিক নিবাস:

কলিকাতার চারি ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে, হুগলি জেলায় গঙ্গাতীরস্থ কোন্নগর

গ্রামে ডাঃ কে. ডি. ঘোষের পিতা বাস করিতেন। বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন—"আমাদের পৈতৃক বাস কোন্নগরে। সে ভিটা শুনেছি এখনও আছে, তবে আমি কখনও চোখে দেখি নি। আমার ঠাকুরদা'র মৃত্যুর পরে বাবা ও কাকা নিজের নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে চলে গেলে ঠাকুরমা কাশীবাস করেন;—সেই থেকে কোন্নগরের বাস আমাদের উঠলো।"—(আত্ম-কথা—পৃঃ ৬, ৭)।

কোন্নগরের স্বনামধন্য পুরুষ, ডিরোজিও-শিষ্য, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, কোন্নগর গ্রামের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির উদ্যোগী পুরুষ—শিবচন্দ্র দেব তাঁহার জীবিতকালে ইহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতিবিধান করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৮৯০-এর ১২ই নভেম্বর দেহত্যাগ করেন।

"শিবচন্দ্র দেব পেন্‌শন্‌ লইয়া কোন্নগরে বাস করিয়াই তিনি স্বীয় বাসগ্রামের উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিলেন।……তৎপূর্ব্বে ১৮৫২ সালে গ্রামবাসিগণকে সমবেত করিয়া 'কোন্নগর হিতৈষিণী সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। ১৮৫৪ সালে তাঁহারই প্রযত্নে ও তাঁহার বন্ধুগণের সাহায্যে একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়।….. ১৮৫৮ সালে তাঁহার উদ্যোগে একটি বাঙ্গলা স্কুল স্থাপিত হয় এবং একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ভবনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কোন্নগরে ষ্টেশন খোলা হয়। ১৮৫৮ সালে একটি ডাকঘর ও চেরিটেব্‌ল্‌ ডিস্পেন্‌সারী স্থাপন করেন। তিনি ডিরোজিও-শিষ্য দলভুক্ত ছিলেন।……পরে ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হইলে বহু বৎসর তিনি ইহার সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। …সত্য সত্যই ডিরোজিও-বৃক্ষের এই ফলটি অতি মধুর হইয়াছিল।"—(রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—পৃঃ ১৩৫-১৩৬)।

অরবিন্দের জন্মের পূর্ব্বে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের ইতিহাস :

অরবিন্দের জন্মবৎসরে, কলিকাতা সহরে ও বাংলাদেশে এক তুমুল ঝড় বহিয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্ম সংস্কারকদিগের দ্বারা উত্থিত এই প্রবল ঝটিকাবর্ত্তের মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দ ভূমিষ্ঠ হন। জন্মস্বত্বে শ্রীঅরবিন্দ ব্রাহ্ম পরিবার ও ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত ব্যক্তি। ব্রাহ্মগণ হিন্দু কি-না? সে প্রশ্নের জবাব-দেওয়া হইয়াছে! রাজনারায়ণবাবু বলিয়াছেন—হ্যাঁ, হিন্দু। আবার কেশব সেন বলিয়াছেন—না, হিন্দু নই।

অরবিন্দের জন্মবৎসরের যে-ঝড়ের কথা বলা হইল—তা সে-ঝড় কিছু

একদিনেই উঠিয়া, তার পরের দিন থামিয়া যায় নাই। ১৮২৯-এর ৪ঠা ডিসেম্বর রাজা রামমোহন যখন ইংরেজের দরবারে, স্বদেশীয় ধর্ম্মনিষ্ঠ বহু গণ্য-মান্য-ভব্য লোকদিগের কথিত এবং লিখিত প্রবল আপত্তির বিরুদ্ধে আইন করিয়া সতীদাহ নিবারণ করাইলেন, সেইদিন হইতে যে-ঝড় বহিতে সুরু করিল—বহুদূরে প্রসারিত হইয়া, শ্রীঅরবিন্দ পর্য্যন্ত আসিয়াও সে-ঝড় থামে নাই। ইতিহাসের ঝড় থামে না। রামমোহন হইতে অরবিন্দ—স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায় বাঙ্গালী জাতির নব জাগরণের একটা ধারাবাহিক বিকাশ। এ যুগে এই বিকাশই বাঙ্গালী জাতির জীবন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথায়—'বাঙ্গলার প্রাণ'; প্রাণের বিচিত্র বিকাশ। জাতির প্রাণের বিকাশে বহু ভঙ্গিমা, বহু বৈচিত্র্য আছেও—থাকিবেও। কিন্তু এই বিকাশে রামমোহন হইতে অরবিন্দে বৈচিত্র্য আছে বলিয়া তা' বিচ্ছিন্নও নয়, পৃথক বস্তুও নয়। তাহা এক অবিচ্ছিন্ন জীবনের বহু-বিচিত্র বিকাশ।

সতীদাহ সম্পর্কে তৎকালীন 'সতী'দের বিষয়ে রাজা রামমোহন এমন-কিছু বলিয়াছিলেন যা—স্বামী বিবেকানন্দ ও পরে শ্রীঅরবিন্দ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। এই আভ্যন্তরিক প্রমাণের বলে রামমোহন হইতে অরবিন্দে এক অবিচ্ছিন্ন বিকাশের ধারা বিদ্যমান—এ কথা বলা সহজ। কিন্তু যা সহজ নয় অথচ খুব সত্য, সে কথাটি হইতেছে যে : এ যুগে বাঙ্গালী জাতির এই বিকাশের ধারাটিই সবচেয়ে বড় সত্য—তার স্মরণীয়-বরণীয় সকল মহাপুরুষদের চেয়ে বড় সত্য। রামমোহন অপেক্ষা বড়—অরবিন্দ অপেক্ষা বড়।

শ্রীঅরবিন্দের জীবন আলোচনায় রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীয় জীবনের এই বিকাশের ধারাকে জীবন্তরূপে, অখণ্ডরূপে প্রত্যক্ষ না-করিলে এবং এই ধারামুখে ইতিহাসের প্রয়োজনমত শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবকে এবং সেই সঙ্গে তাঁহার সহকর্ম্মী সব দিকপালের আবির্ভাবকে না-বুঝিতে পারিলে, অরবিন্দকে খর্ব্ব করা হইবে এবং ভুল বুঝা হইবে।

অরবিন্দের আলোচনায় রামমোহন প্রসঙ্গ অবতারণার হেতু কি?

শ্রীঅরবিন্দের উপর তাঁহার মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর প্রচুর প্রভাব বিদ্যমান বলিয়া অরবিন্দের একখানি প্রসিদ্ধ জীবন-চরিতের (* ক) সম্পূর্ণ প্রথমার্দ্ধেরও বেশী রাজনারায়ণ বসুর কথাতেই ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজনারায়ণের

(* ক) The Life of Aravinda Ghosh—*by* Ram Chandra Palit.

সহিত অরবিন্দ সম্পর্কে অবান্তর কথা বাদ দিলেও এই উভয়ের, শুধু রক্তের নয়, ভাব-সম্মিলন এবং যোগাযোগ—নিবিড়ই বলুন আর প্রগাঢ়ই বলুন, সর্ব্বজনবিদিত ও সর্ব্বজনস্বীকৃত। প্রশ্ন—তাতে রামমোহন আসেন কিসে এবং কেন? উত্তরে বলা যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত রাজনারায়ণের যে-সম্পর্ক, রাজা রামমোহনের সহিত রাজনারায়ণের পিতা নন্দকিশোর বসুর সম্পর্ক তার চেয়ে কম নয় (* খ)। রামমোহনের প্রভাব প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথে যে-সূত্রে বিগুমান, ঠিক সেই সূত্রেই নন্দকিশোরপুত্র রাজনারায়ণেও বিগুমান। শ্রীঅরবিন্দ দুই রকমে এই রামমোহনী প্রভাবের উত্তরাধিকারী। ১ম, রামমোহন তাঁহার মাতামহ বংশের গুরু। ২য়, রামমোহনী ধারার সহিত তাঁহার জীবনের মূলসূত্র জড়িত। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, রামমোহনী প্রভাব সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যতটা সচেতন (* গ) শ্রীঅরবিন্দে তার কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। কোন প্রকাশ বা উল্লেখ কোথায়ও তেমন দেখি না।

(* খ) "পিতাঠাকুর স্কুল ছাড়িয়া দিন কতক রামমোহন রায়ের সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। তিনি রামমোহন রায়ের একজন প্রাথমিক শিষ্য ছিলেন। ······আমার মাতামহ অন্য কন্যাকে দেখাইয়া আমার মাতাঠাকুরাণীর সহিত আমার পিতার বিবাহ দেন। তাহাতে বাবা চটিয়া পুনরায় একটি বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে রামমোহন রায় তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন যে, 'গাছের ফলের দ্বারা গাছের উৎকৃষ্টতা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদি তোমার এই স্ত্রীতে উত্তম পুত্র জন্মে, তবে তোমার এই স্ত্রীকে সুন্দরী বলিয়া জানিবে'।" —[রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত—পৃঃ ৭ ।

"তিনি (নন্দকিশোর বসু) রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য ছিলেন। এবং কিছুদিন রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করিয়াছিলেন। ১৮৪৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এইরূপ কথিত আছে যে, মৃত্যুশয্যাতে শয়ান হইয়া তিনি রামমোহনরায়-কৃত শঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ আনাইয়া পাঠ করাইয়াছিলেন। এবং ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে ওঁকার জপিতে জপিতে যেমন রাজার মৃত্যু হইয়াছিল, তেমনি ওঁকার জপিতে জপিতে ইঁহারও মৃত্যু হয়।"— [রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—পৃঃ ৩১৫]

(* গ) "It was here, too, that we heard a long talk on Rammohan Roy, in which he pointed out *three things* as the dominant notes of this teacher's message : his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism and the love that embraced the Mussulman equally with the Hindu. In all these things, he (Swamiji) claimed himself to have taken up the

রাজনারায়ণবাবু (জন্ম: ১৮২৬—মৃত্যু: ১৮৯৯) ১৫ হইতে ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত (১৮৪১—১৮৪৪ খৃঃ) ডিরোজীও-পরিচালিত হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজ সেকালের চতুষ্পাঠী টোল নয়। অরবিন্দ ১৩ হইতে ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত (১৮৮৫—১৮৯০খৃঃ) লণ্ডনের St. Paul's Schoolএ এবং Cambridgeএ অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই উভয় বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকের তালিকা মিলাইয়া দেখিলেই তৎকালীন হিন্দু কলেজী শিক্ষার একটা স্বরূপ বুঝা যাইবে। চাইকি, সময়ের দূরত্ব সত্বেও লণ্ডন ও কলিকাতার মধ্যে একটা সাদৃশ্যও মিলিতে পারে। অন্ততঃ ডিরোজীওর মত শিক্ষক লণ্ডনেও বিরল। হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মদ্যপান করিতেন। যুবক রাজনারায়ণও বিলক্ষণ মদ্যপান করিতেন (* ঘ)।

---

task that the breadth and foresight of Rammohan had mapped out."—[*Notes of Some Wanderings, by Sister Nivedita—P. 12*]

আমেরিকায় 'থাওজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে' জনৈকা শিষ্যার নিকট তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। স্বামিজী বলিতেছেন—

"সেই শ্রেষ্ঠ হিন্দু-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্ম্মের অদ্ভুত দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন ভারতের সাহায্যকল্পে অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনিই সতীদাহ-প্রথা বন্ধ করেন। ......তিনি ব্রাহ্ম-সমাজ নামে বিখ্যাত ধর্ম্মসমাজ স্থাপন করেন। আর, একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিন লক্ষ টাকা চাঁদা দেন।......তিনি নিজের জন্য কোনরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা করিতেন না।"

"রামমোহন সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বিশেষরূপে সচেতন। উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট যোগসূত্র বিদ্যমান।"—[স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী—পৃঃ ২৩৮-৩৯]

(* ঘ) "আমি......প্রভৃতির সহিত কলেজের গোলদীঘিতে মদ খাইতাম, এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শিক-কাবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে গোলদীঘির রেল টপকাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) উক্ত কাবাব কিনিয়া আনিয়া আমরা আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শ-শূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শক কার্য্য মনে করিতাম।...মদ্যপান বিষয়ে রামমোহন রায়ের শিষ্য ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রভেদ ছিল। রামমোহন রায়ের শিষ্যেরা অত্যন্ত পরিমিতপায়ী ছিলেন। কিন্তু কলেজের অধিকাংশ ছাত্র এরূপ ছিলেন না...।"—[রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত—পৃঃ ৪২]

রাজনারায়ণবাবু পর পর নিম্নলিখিত কার্য্যগুলিতে হস্তক্ষেপ করেন। যথা—১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন (* ঙ)। অরবিন্দের পিতা ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ এই বৎসর (১৮৪৬ খৃঃ) জন্ম গ্রহণ করেন।—(১৮৪৬-১৮৪৮খৃঃ) উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ করেন (* চ)।—(১৮৪৮-১৮৫০খৃঃ) বেদ আপ্তবাক্য এবং আভ্রান্ত কি-না এই আন্দোলনে, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত যোগদান করিয়াছেন (* ছ)।—(১৮৫১-১৮৬৬ খৃঃ) ১৬ বৎসর একাদিক্রমে

"একদিন সন্ধ্যার পর আমাকে পিতাঠাকুর তাঁহার লিখিবার ঘরে ডাকিলেন। ডাকিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম না যে, ব্যাপারটা কি? তাহার পর দেখিলাম, তিনি একটি দেরাজ খুলিয়া একটি কর্কস্ক্রু ও একটি সেরীর বোতল ও একটি ওয়াইন-গ্লাস বাহির করিলেন। তৎপরে প্রকাণ্ড টিনের বাক্সটি খুলিলেন। টিনের বাক্স খোলা হইলে আমি দেখিলাম যে, তাহাতে সদর-দেওয়ানীর কাগজ নাই—পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা রহিয়াছে। পিতাঠাকুর আমাকে বলিলেন, 'তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে এই সকল উত্তম দ্রব্য আহার করিবে, কিন্তু মদ (সেরী) দুই গ্লাসের অধিক পাইবে না; যখনই শুনিব অন্যত্র মদ খাও, সেই দিন অবধি এই খাওয়া বন্ধ করিয়া দিব।' কিন্তু আমি সেইরূপ পরিমিত পানে সন্তুষ্ট হইতাম না। অন্যত্র পান করিতাম।"—[রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত—পৃঃ ৪৩-৪৪]

(* ঙ) "যেদিন প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া (ইং ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে) ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সেদিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়। জাতি-বিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়। খানা খাওয়া ও মদ্য পান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্য্যন্ত টানিয়াছিল।—[ঐ—পৃঃ ৪৬]

(* চ) "১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস, এমনি সময়ে আমি তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদকের কর্ম্মে ৬০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই।"—[ঐ—পৃঃ ৫০]

"ঈশ্বরগুপ্ত আমার সম্বন্ধে একবার শ্লেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন 'বেকন পড়িয়া 'করে বেদের সিদ্ধান্ত'।"—[ঐ—পৃঃ ৫৪]

"১৮৪৬ সালে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন; এবং উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন বিষয়ে, অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৪৮ সাল পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন।"—[রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—পৃঃ ৩১৭]

(* ছ) "ইংরাজী ১৮৪৮-৫০ এই তিন বৎসর, বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট কি-না ইহা সর্ব্বদা আমাদিগের মধ্যে বিচারিত হইত।"—[রাজনারায়ণ বসুর

মেদিনীপুর ছিলেন। এই সময়কার এক অতি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় দিয়া গিয়াছেন (* জ)। 'হরিশের আবির্ভাব', অরবিন্দের জন্মের ২০ বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস।

মেদিনীপুর থাকাকালীন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ অরবিন্দের পিতামাতার বিবাহের মাত্র তিন বৎসর পূর্ব্বে, রাজনারায়ণবাবু 'জাতীয়গৌরব সম্পাদনী সভা' স্থাপন করেন। 'A Society for the Promotion of National Feeling among the Natives of Bengal' নামে এক প্রস্তাবনা-পত্র প্রকাশ করেন (* ঝ)। ইহার ঠিক তিন বৎসর পরে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরেই

আত্ম চরিত—পৃঃ ৬৫]

"দেবেন্দ্রবাবু, অক্ষয়বাবু দুইজনে তর্ক হইয়া স্থির হইল যে—বেদকে আর ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু উহাতে ভ্রম ও অযুক্তি-যুক্ত বাক্য দৃষ্ট হইতেছে। বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত—এই মত অক্ষয়বাবু দ্বারা ১৭৭২ শকের ১১ই মাঘ দিবসের সাম্বৎসরিক উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়।"—[ঐ—পৃঃ ৬৭-৬৮]

"রাজনারায়ণবাবু যখন বেদে অভ্রান্ততাবাদ রক্ষা করা কঠিন বলিয়া অনুভব করিলেন, তখন অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিচার উপস্থিত করিলেন। তাহার ফলস্বরূপ বেদের অভ্রান্তবাদ ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত মত হইতে পরিত্যক্ত হইল; এবং মানবের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি আত্ম-প্রত্যয়ের উপরে নিহিত হইল।"—[রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী—পৃঃ ৩১৮]

(* জ) "বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্য্যন্ত, এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবা বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোম-প্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তি সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল, প্রত্যেকটিরই ইতিবৃত্ত গভীর অভিনিবেশ সহকারে আলোচনার যোগ্য।"—[ঐ —পৃঃ ২২৪-২৫]

(* ঝ) "জাতীয়গৌরব সম্পাদনী সভার কার্য্যবিবরণ হইতে 'Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal' রচিত হয়। হাইকোর্টের জজ দ্বারকানাথ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, যদি উক্ত সভা সংস্থাপিত হয় তাহা হইলে তিনি তাহার সভাপতি হইবেন। ঐ পুস্তিকা হইতে বান্ধববর নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলার ভাব পান। তিনি ঐ মেলা ও তৎপরে জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন।·········

অরবিন্দের পিতামাতার বিবাহ হয়। পৃথিবীতে শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের হেতু বা কারণ মেদিনীপুরেই উদ্ভব হইয়াছে।

অরবিন্দের পিতামাতার বিবাহ-বৎসরে—"১৮৬৪ সালে ব্রাহ্মিকাসমাজ নামে নারীগণের জন্য একটি স্বতন্ত্র উপাসনা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং কেশবচন্দ্র তাহার আচার্য্যের কার্য্য করিতে থাকেন।" কিন্তু এই বৎসর হইতেই ব্রাহ্ম-সমাজে Rightists এবং Leftists দুইটি দলের সূত্রপাত দেখা দেয়। দেবেন্দ্র-নাথ রাইটিষ্টদের নেতা, আর কেশবচন্দ্র নব্য দল লেফটিষ্টদের নেতা। Moderate এবং Extremists'ও বলা চলে (* ক)। এই বৎসরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়।

যে একটী ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিত তাহার এক পয়সা করিয়া জরিমানা হইত।"—[রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত—পৃঃ ৮৩]

"তৎপরে উল্লেখযোগ্য বিষয় জাতীয়গৌরব সম্পাদনী সভা। দেশীয় শিক্ষিত দলের মধ্যে জাতীয় ভাব উদ্দীপ্ত করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এতৎসংস্রবে তিনি ইংরাজীতে 'A Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal' নামে এক প্রস্তাবনা-পত্র বাহির করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ প্রস্তাবনা-পত্র পাঠ করিয়াই হিন্দুমেলার প্রবর্ত্তক নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের মনে তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সভা ও জাতীয় মেলার ভাব উদিত হয়।"—[রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—পৃঃ ৩২০]

(* ক) "প্রাচীন দলের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও যুবকদলের নেতা কেশবচন্দ্র সেন। ইঁহাদের মধ্যে পরামর্শ ও কার্য্যের একতা বহুদিন রহিল না। নবীন ব্রাহ্মগণ অধিক দিন মুখে জাতিভেদের নিন্দা করিয়া এবং কার্য্যতঃ উপবীত ত্যাগ করিয়া এবং সকল জাতি মিলিয়া একত্র পান-ভোজন করিয়াও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। ১৮৬৪ সাল হইতেই তাঁহারা বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই ধুয়া ধরিলেন যে, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ বেদীতে বসিলে তাঁহারা উপাসনাতে যোগ দিতে পারেন না। দেবেন্দ্রনাথ এতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি প্রথম প্রথম উপবীতত্যাগী উপাচার্য্য নিযুক্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু নবীন ব্রাহ্মগণ যখন বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন এ পথে ইহারা কতদূর যাইতে পারে ভাবিয়া চমকিয়া গেলেন। তাঁহার রক্ষণশীল প্রকৃতি আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। এই স্থলে প্রাচীন ও নবীন ব্রাহ্মদলে বিচ্ছেদ ঘটিল।"—[রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—পৃ: ২৫০]

—১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দের পিতা-মাতার বিবাহের দুই বৎসর পরে, কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন (* খ)। বিবাহের তিন বৎসর পরে—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে চৈত্রসংক্রান্তিতে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক হইয়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'হিন্দুমেলা'র প্রথম অধিবেশন অতিশয় উৎসাহের সহিত অনুষ্ঠান করেন (* গ)। রাজনারায়ণ-বাবু 'Natives of Bengal'দের জন্য জাতীয়গৌরব সম্পাদনী সভা করিয়াছিলেন। নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলাতে 'গাও ভারতের জয়' আর 'কত কাল পরে, বল ভারত রে দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবে'—উচ্চ ঐকতানে গীত হইল। জাতীয়ভাব বাংলা হইতে ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। ১৮৬১ এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এ বাঙ্গালীই এই কার্য্য করিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের জন্মের কত পূর্ব্বে বাঙ্গালী জাতীয় ভাবের জন্ম দিয়াছে! অরবিন্দ জন্মিবার ১১ বৎসর পূর্ব্বে 'জাতীয়গৌরব' এবং ৫ বৎসর পূর্ব্বে 'হিন্দুমেলা'র জন্ম হইয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথায়—আগে সুর আগমনী গান করিয়াছে, পরে রূপ মূর্ত্তি ধরিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সুর আর রূপের মধ্য দিয়াই বাংলার প্রাণের বিকাশের ধারা প্রবাহিত হইতেছে।

এইরূপে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দের পিতামাতার বিবাহের ৪ বৎসর পরে, এবং

(* খ) "অগ্রসর ব্রাহ্মদল ১৮৬৬ সালের নবেম্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথের সমাজ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। তদবধি দেবেন্দ্রনাথের সমাজের নাম "আদি ব্রাহ্মসমাজ' হইল।"—[রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—পৃঃ ২৫০]

(* গ) "১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের চৈত্রসংক্রান্তিতে হিন্দুমেলার অধিবেশন হইল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্র মহাশয় সহকারী সম্পাদক হইলেন।......বর্ষে বর্ষে চৈত্র-সংক্রান্তিতে একটী মেলা খোলা স্থির হইল। ......মেলার প্রথম সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মেলার উদ্দেশ্য এইভাবে বর্ণনা করেন—'ভারতবর্ষের এই একটী প্রধান অভাব যে, আমাদের সকল কার্য্যেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি—ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়! কেন, আমরা কি মনুষ্য নহি? ......অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভরতা ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।' সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জাতীয় স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিকে জাতীয় চিত্তে উদ্দীপ্ত করাই হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ছিল। সুখের বিষয় এই মেলার আয়োজনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সাধিত হইয়াছে।"—[ঐ পৃঃ ২৫৮],

তাঁহার জন্মের ৪ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছা গেল। পৌঁছিয়াই দেখা গেল আর এক আশ্চর্য্য কাণ্ড! কেশবচন্দ্র অবতার হইয়াছেন। তাঁহার শিষ্যেরা স্পষ্ট ঘোষণা করিয়া বসিয়াছে যে, তিনি সাক্ষাৎ অবতার (* ঘ)। তিনিও রাজী হইয়াছেন; বলিতেছেন—"আমি ভক্তির স্রোত বন্ধ করিতে চাই না"। এখন উপায়?

এদিকে রাজনারায়ণবাবু কোন মানুষের নাহক্ অবতার হওয়ার পক্ষে ঘোর বিরোধী (* ঙ)। তিনি ডিরোজীও-পরিচালিত হিন্দু কলেজের ছাত্র। ইহা তাঁহার ধাতে সহ্য হইবে না। না হইবারই কথা। বিশেষতঃ ব্রাহ্ম-সমাজে নরপূজা, মূর্ত্তিপূজার মতই—একদম নিষেধ। কি করা যায়? তিনি Brahmic Advice, Caution & Help নামে এক পুঁথি লিখিয়া যুক্তিপূর্ণ অথচ তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। কেশবেরা Indian Mirrorএ এই প্রতিবাদের আবার পাল্টা প্রতিবাদ করিয়া তবে ছাড়িলেন। তাঁহারা বলিলেন—'ও, কিছু নয়। রাজনারায়ণবাবুর যুক্তি সব বাজে।' এরকম বলিবার লোকের অভাব বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে শ্রীঅরবিন্দ পর্য্যন্ত কোনদিন হয় নাই। আমাদের দেশের মাটী এত উর্ব্বর যে, অবতারের বীজ একবার পড়িলে অঙ্কুরোদ্গম না-হইয়া যায় না। Brahmic Advice, Caution & Help পরবর্ত্তীকালে শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিত্বের উপর কতটা

(* ঘ) "এই সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মধ্যস্থবাদ ও অবতারবাদ বিলক্ষণ প্রবল হইয়াছিল। কেশববাবু যখন সিমলায় যান তখন মুঙ্গের হইয়া যান, তথায় তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার অবতারত্ব ঘোষণা করেন। প্রথমে সেই স্থানে তিনি অবতার হয়েন। তাঁহার শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন যে, 'ভক্তির স্রোত আমি বন্ধ করিতে চাহিনা'।.........এলাহাবাদে একদিন দেবেন্দ্রবাবুর সহিত কেশববাবুর অবতারত্ব বিষয়ে আমার কথোপকথন হইতেছিল। তিনি বলিলেন, 'অবতার পদের প্রতি কেশববাবুর কেন লোভ হইল বুঝিতে পারি না, আমাদের দেশে মাছও অবতার, কচ্ছপও অবতার।"—[রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত—পৃঃ ১৩৬]

(* ঙ) এইরূপ ব্রাহ্মসমাজে নরপূজার আবির্ভাব দেখিয়া আমি তাহার বিপক্ষে Brahmic Advice, Caution & Help নামক একটী পুস্তিকা রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম।.........যখন ব্রাহ্মসমাজে নরপূজা প্রবেশ করিতেছে, তখন আমি তাহার বিপক্ষে না-লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না।"—[ঐ—পৃঃ —১৩৪-৩৫]

প্রযোজ্য অথবা অপ্রযোজ্য কি-না এবং সেই সঙ্গে অবতার-বাদ সম্বন্ধে অরবিন্দের সুচিন্তিত ও সুলিখিত অভিমতসকল যথাস্থানে তুলনা করিয়া দেখিবার সুযোগ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।

—(১৮৬৯—১৮৭৯) রাজনারায়ণবাবু পেনসন লইয়া কলিকাতায় বাস করিতে থাকেন। রাজনারায়ণবাবুর কলিকাতা বাসকালেই অরবিন্দের জন্ম হয়।

ডাঃ কে ডি. ঘোষের চিকিৎসা শিক্ষার জন্য (প্রথমবার) বিলাত গমন:

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, কেশবচন্দ্র মুঙ্গেরে অবতার হওয়ার পরের বৎসর অরবিন্দের পিতা চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হইবার জন্য বিলাত গমন করেন এবং দুই বৎসর তথায় থাকিয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে দেশে ফিরিয়া আসেন।

রাজনারায়ণবাবু লিখিতেছেন—"আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুত ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ যখন (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে) চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত যান, তখন কৃষ্ণধনকে সম্বোধন করিয়া ইংরাজিতে চারিটী চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখি।"—(আত্ম-চরিত—পৃঃ ১৬০)। যথা:

"Go Son beloved ! as pilgrim bold···

* * *

Thou art not one who fears to cross the sea,

* * *

Thy freedom I esteem, though thy excess
I check oft···

* * *

But not like apes who change their manners dress
And language···
They England for their home do shameless call,
And reckon mother-land and tongue as gall.

* * *

Go, losing not yourself, learn from the West···"

রাজনারায়ণবাবুর অভিপ্রায় বুঝা গেল। কিন্তু তাঁহার এই সদুপদেশ সম্পূর্ণ উল্টা ফল প্রসব করিয়াছিল। রাজনারায়ণবাবু লিখিতেছেন:

"১৮৭১ সালের শেষে আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন। আমি আমার ইংরাজীতে লিখিত চতুর্দ্দশপদী কবিতাতে এমন আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, তিনি বোধ হয় বিলাতে অবস্থিতি নিবন্ধন দেশীয় ভাব হারাইবেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'বিলাত হইতে তিনি সম্পূর্ণ ইংরাজ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন'। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন, বিলাত হইতে আসিবার পর তাহার বিপর্য্যয় দেখিলাম। দেখিলাম সংশয়বাদিতা তাঁহার মনে কিয়ৎপরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। 'ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা' তাঁহাকে আমি উৎসর্গ করি, সে উৎসর্গ-পত্রে এমত আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে—তিনি ডাক্তার স্বরূপে যেরূপ লোকের শারীরিক রোগ দূর করিবেন, সেইরূপ ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা লোকের আধ্যাত্মিক রোগ নিবারণ করিবেন। আমার আশা বিফল হওয়াতে আমি মর্ম্মাহত আছি। ....তাঁহার অনেক অসাধারণ গুণ আছে, তিনি যারপর নাই ভদ্র, অমায়িক ও পরোপকারী। বিলাতে অবস্থিতি জন্য এই সকল গুণ তিনি হারান নাই। তাঁহার মন অতিশয় মধুর। সেই মাধুর্য্য তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিফলিত হইয়াছে। আমি যখন কানপুরে ছিলাম তথাকার ইংরেজী পল্টনের পাদরী Rev. Mill সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, 'I have never seen such a sweet face as his'।"—(আত্ম-চরিত—পৃঃ ১৯১-৯২)।

এই 'ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা' এক প্রয়োজনীয় ও স্মরণীয় গ্রন্থ। ইহাতে ধর্ম্মের উৎপত্তি ও হেতু বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' একখানি চটিগ্রন্থ। ইহাতেও ধর্ম্মের উৎপত্তি ও হেতু বর্ণিত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ আত্মপ্রত্যয়কে ধর্ম্মের উৎপত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি উপানষদের মূল সূত্রকে অনুসরণ করিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' ও 'ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা'র পরে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র Scotch দার্শনিকদিগকে অনুসরণ করিয়া সহজ জ্ঞান ('Common Sense') অথবা স্বাভাবিক জ্ঞান (Intuition)-কেই ধর্ম্মের উৎপত্তি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ধর্ম্মবিজ্ঞানের (Science of Religion) প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন। কিন্তু ধর্ম্মবিজ্ঞানের ছাত্র বা অধ্যাপকেরা বোধ হয় রাজনারায়ণবাবুর 'ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা'র নাম পর্য্যন্তও শোনেন নাই। অধ্যাপক ম্যাক্স্‌ম্যুলার বলিয়াছেন: প্রকৃতির উপাসনা হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি। আবার হার্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন: মৃত পিতৃপুরুষ-

দিগের প্রেতাত্মার পূজা হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দেখাইয়াছেন যে : ঋগ্বেদে এই দুইটি বিভিন্ন উৎপত্তির কারণই সুস্পষ্ট বিদ্যমান।

রাজনারায়ণবাবুর 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' :

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র বিলাত গমন করেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' বাহির হয়। কিন্তু ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের সব কথা এখনও বলা হয় নাই। এই বৎসর রাজনারায়ণবাবু 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' সম্পর্কে এক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বক্তৃতা দেন (* ক)। যদি নভেম্বর কিংবা ডিসেম্বরে এই বক্তৃতা দেওয়া হইয়া থাকে, তবে

(* ক) "ঐ বক্তৃতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে করা হয়।......যেদিন বক্তৃতা করা হয় সেদিন লোকেলোকারণ্য। ......মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।......

"বিখ্যাত বাঙ্গালী খৃষ্টান রেভারেণ্ড লালবিহারী দে বলেন যে, শ্রীহট্ট ও মেদিনীপুর হইতে আনীত চুণ দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের কলি ফেরান হইতেছে।........ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিকূল ভাব না-দেখাইয়া বলেন, 'হিন্দুধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্মের—পূর্ব্বসূচনা'।

"কেশববাবু উক্ত বক্তৃতার বিপক্ষে কলিকাতায় দুইটি—এলাহাবাদে একটী বক্তৃতা করেন। এবং তাঁহার বিখ্যাত চেলা এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও একটী বক্তৃতা করেন।

"উক্ত বক্তৃতার বিপক্ষে কেশববাবুর দলের ব্রাহ্মেরা বক্তৃতার পর বক্তৃতা ঝাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের মুখপত্র Mirror এমন দিন ছিল না যে, আমাকে গালাগালি না-দিতেন। ... ...

"দিনকতক এমন হইল যে, প্রায় প্রত্যহই Mirror খুলিলে আমার গালাগালি দেখিতে পাওয়া যাইত।"—[রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত—পৃঃ ৮৭, ৯০, ১৯৮]

"রাজনারায়ণবাবুর—'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা-বিষয়ক বক্তৃতা' লোকের দৃষ্টিকে যেরূপ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং যে তরঙ্গ তুলিয়াছিল এরূপ অল্প বক্তৃতার ভাগ্যে দেখা গিয়াছে। ......১৮৭১ সালে ১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট-ভবনে উহা প্রদত্ত হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্রের জাতীয় সভা ঐ বক্তৃতা দেওয়াইবার জন্য প্রধান উদ্যোগী ছিল। ... ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহ আইনের আন্দোলন উপস্থিত হওয়াতে এবং কেশববাবুর দলস্থ ব্রাহ্মগণ তদুপলক্ষে তাঁহারা নিজে হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী নহেন বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে, আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহাদের বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজনারায়ণবাবুর বক্তৃতা সেই বিবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র। .... রাজনারায়ণবাবু বঙ্গবাসীর চিত্তে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিলেন। কেশববাবুর পক্ষ হইয়া আমরা কয়েকজন

অরবিন্দ তখন একমাস অথবা দুইমাস মাতৃগর্ভে আগমন করিয়াছেন। আর যদি ডাঃ কে. ডি. ঘোষ বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই এই বক্তৃতা দেওয়া হইয়া থাকে, তবে শ্রীঅরবিন্দ তখনও মাতৃগর্ভে আগমন করেন নাই—দু'এক মাস বিলম্ব আছে মাত্র।

'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' এক যুগান্তকারী বক্তৃতা। এই বক্তৃতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়াই কেশবচন্দ্র যদিও দেবেন্দ্রনাথের বিপক্ষে তিনিই নব্যদলের অবিসম্বাদিত নেতা, তথাপি তাঁহার নেতৃত্বের আসন টলটলায়মান হইয়া উঠিল।

শ্রীঅরবিন্দের জন্মবৎসর :

এই বৎসরে কেশবচন্দ্র তিন-আইনের অসবর্ণ-বিবাহ আইনের বলে পাশ করাইলেন। রাজনারায়ণ যেমন কেশবের অবতার হওয়ার বিরুদ্ধে, তেমনি এই জাতিভেদ-ভঙ্গকারী 'রেজেষ্ট্রী'-মার্কা বিবাহের বিরুদ্ধেও তুমুল এবং তীব্র প্রতিবাদের ঝড় বহাইয়া দিলেন (* খ)। অন্ততঃ বেশ প্রমাণ পাওয়া গেল যে, বাঙ্গালী জাতি উদাসীন নয়।

তদুত্তরে বক্তৃতা করিলাম, কিন্তু সে কথা যেন কাহারও কর্ণে পৌঁছিল না। বরং কেশববাবুর দলস্থ ব্রাহ্মগণ অ-হিন্দু বলিয়া—হিন্দুসমাজের অবজ্ঞার তলে পড়িলেন।"—[রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—পৃঃ ৮২২]

(* খ) "আমার কলিকাতায় অবস্থিতির সময়ে ১৮৭২ সালে প্রচলিত ধর্ম্ম-সকলের বহির্ভূত ব্যক্তিদিগের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মদিগের হিতার্থে Civil Marriage Bill বিধিবদ্ধ হয়। ব্রাহ্ম বিবাহ—বৈধ বিবাহ, তাহার জন্য বিশেষ আইন করিবার আবশ্যক ছিল না। যখন চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগের কণ্ঠিবদল বিবাহ এবং অত্যন্ত আধুনিক শিখ সম্প্রদায় কোকাদিগের বিবাহ আদালতে বৈধ বলিয়া গণ্য হয়, তখন বিশেষ আইন না-হইলেও ব্রাহ্ম বিবাহ আদালতে বৈধ বলিয়া গ্রাহ্য হইত—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেশববাবু আর কিছুদিন অপেক্ষা করিলে ব্রাহ্ম-বিবাহ একটি সাম্প্রদায়িক প্রথা দাঁড়াইত; তাহা হইলে তাহা আদালতে বৈধ বলিয়া গ্রাহ্য হইত। কিন্তু কেশববাবুর সকল কার্য্যই তিন তাড়াতাড়ি। ......অসবর্ণ বিবাহ যদি হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত নহে, তবে নিজ কেশববাবুর উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? ... কেশববাবু হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে কোন রকম সম্বন্ধ রাখিতে চাহেন না। সিমলায় আসিবার কিছু পূর্ব্বে কেশব-বাবুকে আমি বলিলাম, 'তোমরা যদি বল যে হিন্দু নই, তাহা হইলে আমার পক্ষে

স্ত্রী-শিক্ষার সূত্রপাতও এই বৎসর হইতে হয়। Miss Akroyd এই কার্য্যে প্রথম সহায়তা করেন (* গ)।

আইন করিবার সুবিধা হয়। যেহেতু প্রচলিত ধর্ম্মত্যাগকারী সকল লোকের জন্য ধর্ম্মসম্পর্কশূন্য একটি সাধারণ সিভিল বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ করিতে আমরা মানস করিতেছি।' কেশববাবু উত্তর করিলেন, 'আমি হিন্দু নই বলিতে প্রস্তুত আছি।' ইহাতে আমি আশ্চর্য্য হইলাম। আশ্চর্য্য হইবার কথাই বটে। যেদিন কেশববাবু বলিলেন 'আমি হিন্দু নই' সেদিন কি শোচনীয় দিবস!"—[রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত—পৃঃ ১৮২, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৬]

"আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত উন্নতিশীল দলের ঘোর বাক্‌যুদ্ধ উপস্থিত হইল। আদি ব্রাহ্মসমাজ নবদ্বীপ, কাশী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহপূর্ব্বক দেখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের অবলম্বিত পদ্ধতি হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে বৈধ। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ও কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃত-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মত সংগ্রহ করিয়া দেখাইলেন যে, উভয় সমাজের পদ্ধতিই শাস্ত্রানুসারে অবৈধ।"—[রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—পৃঃ ৩০৬]

(* গ) "Miss Akroydএর সঙ্গে আমাদিগের সামাজিক অনেক বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। আমি বলিলাম—'যদি আমরা ইংলণ্ড জয় করিয়া তথাকার লোক দ্বারা আমাদিগের রীতিনীতি অনুকরণকার্য্যে আমরা উৎসাহ প্রদান করিতাম তাহা হইলে আপনারা কি পছন্দ করিতেন?' তিনি বলিলেন—'না'। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কোন সাহেব যদি ধুতি পরিয়া লণ্ডনের রাস্তায় বেড়ান তাহা হইলে আপনারা তাঁহাকে কি করেন?' Miss Akroyd তাহাতে উত্তর করিলেন—'We instantly clap him to Bedlam', অর্থাৎ 'আমরা তাহাকে পাগলাগারদে দিই'। তাহাতে আমি বলিলাম—'আপনারা যেমন ঐ কার্য্য ঘৃণা করেন, আমরাও সেইরূপ বিলাতফেরৎ বাঙ্গালী দ্বারা ইংরাজ পরিচ্ছদ ব্যবহারে সেইরূপ ঘৃণা করি।' …… তিনি এইরূপ আমার সকল কথা মানিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে রাগিতেছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। তাহার পর আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমি বলিলাম—'You consider English manners to be perfect?' এই কথা বলাতেই তিনি টেবিল চাপড়াইতে লাগিলেন, গৃহের মেজেতে পদাঘাত করিতে লাগিলেন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাহার চক্ষু হইতে বিনির্গত হইতে লাগিল। আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল আমাকে বা প্রহার করেন। আমি কম্পিতকলেবর হইয়া বলিলাম—'I beg to be excused madam, I didn't mean anything wrong.'

"……Miss Akroyd কোপনস্বভাবা স্ত্রীলোক। কেশববাবু একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাহাতে তর্ক উপস্থিত হইয়া দুই জনে

ভারত-আশ্রম প্রতিষ্ঠাও এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান (* খ)।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১লা বৈশাখ বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিলেন (* গ)।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইটালীর Joseph Mazziniর মৃত্যু হয়। শ্রীঅরবিন্দের জন্মের সহিত Mazziniর মৃত্যুর যোগসূত্র অনেক জীবনচরিতকার ইঙ্গিত করিয়াছেন। অর্থাৎ, Mazzini মরিয়া অরবিন্দ হইয়া জন্মাইলেন। অরবিন্দই Mazzini!

শ্রীঅরবিন্দ ভূমিষ্ঠ হইলেন :

১৮৭১ সালের শেষভাগে শ্রীঅরবিন্দ মাতৃগর্ভে আগমন করেন। এবং ১৮৭২-এর ১৫ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় অরবিন্দের পিতৃবন্ধু ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের থিয়েটার রোডের বাড়ীতে ভূমিষ্ঠ হন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতেই রাজনারায়ণ বসু পেন্সন্ পাইয়া কলিকাতায় বাস করিতেছেন। সুতরাং শিশু অরবিন্দ ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাঁহার উপস্থিত থাকা সম্ভব।

ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ ও ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষেই শুধু বন্ধুত্ব ছিল না। পরন্তু কে. ডি. ঘোষের স্ত্রীর নাম 'স্বর্ণলতা' এবং মনোমোহন ঘোষের স্ত্রীর নামও 'স্বর্ণলতা' থাকায় উভয় সখীতে 'গোলাপ' পাতান ছিল। অরবিন্দ ভূমিষ্ঠ হইবার কালে তাঁহার মাতার বয়স ২০ বৎসর হইবে। এবং আগে পর পর দুইটি সন্তান (বিনয়ভূষণ ও মনোমোহন) হওয়ার পর হইতেই তাঁহার

রাগারাগি হয়। কেশববাবু বাড়ী ফিরিয়া আসিবার সময় সিঁড়িতে নামিতেছিলেন এমন সময়ে Miss Ackroyd সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিয়া পুনরায় তাহার সহিত আর একবার ঝগড়া করিয়া গেলেন।"—[রাজনারায়ণ বসুর আত্ম- রিত —পৃঃ ১৯৪-৯৫-৯৬]

"কুমারী এক্রয়েড হইতেই বঙ্গনারীর উচ্চশিক্ষার প্রথম আয়োজন।" —[রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—পৃঃ ৩০৪]

(* খ) "১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ভারত আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়। কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড বাসকালে ইংরাজ জাতির গার্হস্থ্য নীতি দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন ইংরাজের hcmeএর ন্যায় জিনিসটি আর পৃথিবীতে নাই। ...... তাঁহার আহ্বানে আমরা অনেকে সপরিবারে ভারত আশ্রমে গিয়া বাস করিয়াছিলাম। সেখানে একত্র উপাসনা, একত্র আহার, সময়ে পাঠ, সময়ে কার্য্য প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছিল।"—[ঐ—পৃঃ ৩০২]

(* গ "১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের প্রতিভা আর এক আকারে দেখা দিল। ... তিনি রুশোর সাম্যভাবের পক্ষ, উদারনৈতিকের অগ্রগণ্য এবং বেস্থাম ও মিলের হিতবাদের পক্ষপাতী।"—[ঐ—পৃঃ ২৮৪]

'হিষ্টিরিয়া' রোগ দেখা দেয়। উন্মাদ রোগগ্রস্ত বংশের কন্যা হিসাবে তাঁহার কিঞ্চিৎ মস্তিষ্কের পীড়াও দেখা দেয়। এই অবস্থার মধ্যেই অরবিন্দের জন্ম হয়।

আমরা দেখিয়াছি, অরবিন্দের পিতা বিলাত হইতে শুধু ইংরাজ হইয়াই ফিরেন নাই, পরন্তু তাঁহার মনের মধ্যে সংশয়বাদ ও নাস্তিকতা প্রবেশ করিয়াছে। তিনি আর এখন নিষ্ঠাবান, উৎসাহী 'ব্রাহ্মযুবক' নহেন। অরবিন্দের জন্মকালে তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর হইবে। এখন প্রশ্ন—এই জন্মদাতা ও গর্ভধারিণী শ্রীঅরবিন্দের মত একটা প্রতিভাকে পৃথিবীতে আনিলেন কিরূপে? আরো প্রশ্ন জাগে—প্রতিভার জন্ম কিসে এবং কোথায়? যাঁদের জীবন চারিপাশের আবেষ্টনকে আলোড়িত করে, ইতিহাসকে ভাঙ্গে-গড়ে, রাষ্ট্রের বন্ধন ছিন্ন করে, নূতন সৃষ্টির ইঙ্গিত দেয়, তাঁদের জন্ম—তাঁদের আবির্ভাবের জন্য কৃতিত্ব কি শুধু পিতামাতারই? এ এক গুরুতর প্রশ্ন। বংশানুক্রম—heredity—কতটা তাঁহাদিগকে বাধা দেয় এবং কতটাই বা তাঁহাদিগকে জীবনের পথে সাহায্য করে, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা তাহা লইয়া বিস্তর গবেষণা করিতেছেন (* ক)। তথাপি সব কথার জবাব পাওয়া যায় নাই।

শ্রীঅরবিন্দ কতটা এই বংশানুক্রমের দ্বারা শৃঙ্খলিত বা নিয়মিত হইয়াছেন, আর কতটাই বা আত্মানুশীলন দ্বারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বিচিত্র বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহার অতি অদ্ভুত জীবন আলোচনায় হয় ত সে-কথা কিছু পরিমাণে পরিষ্কার হইয়া উঠিবে।

(* ক) "The force of heredity as one of the most important factors in the constitution of human character can never be ignored.···A father's proclivities are often seen in a son and a grand-father's in a grandson and as a practical illustration of this, we refer to the case of Aravinda Ghose."

"It was his mother who played a great part in moulding the temperament and character of Aravinda". [*Life of Aravinda Ghose—by R. Palit*—p. 51 & 90]

দুই

শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হইতে সাত বৎসর

প্রথম বৎসর (**১৮৭২।১৫ই আগষ্ট—১৮৭৩।১৪ই আগষ্ট**) :

জন্মের পর প্রথম বৎসর ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের যে আলোড়ন, তাহা আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

দ্বিতীয় বৎসর (**১৮৭৩।১৫ই আগষ্ট—১৮৭৪।১৪ই আগষ্ট**) :

শিশু অরবিন্দের পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৎসর আরম্ভ হইল। এই বৎসরে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের জাতিভেদ-ভঙ্গকারী সমাজ-সংস্কারে উত্যক্ত ও বিরক্ত হইয়াই নিজে তাঁহার দুই পুত্র, সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দেবেন্দ্রনাথ মূর্ত্তিপূজা চান না, কিন্তু জাতিভেদ চান। এই উপনয়ন অনুষ্ঠানের সময় রাজনারায়ণ বসুর মত 'শূদ্র'-এর (?) সেখানে প্রবেশ নিষেধ (* ক)। অথচ গোঁড়া হিন্দু ভূদেব মুখোপাধ্যায় একবার নিজের গলার পৈতা খুলিয়া রাজনারায়ণ বসুর গলায় স্বহস্তে জড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "রাজনারায়ণ, তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। আমরা তোমার তুলনায় কিছুই নই।"

দেবেন্দ্রনাথ কেশব ও কৈশবদের নিকট আঘাত পাইয়া ভুদেব মুখার্জ্জির চেয়েও গুরুতর রক্ষণশীল হিন্দু হইয়া উঠিলেন।

মাইকেল ২৯শে জুন দেহত্যাগ করিলেন। সত্যই একটা ইন্দ্রপাত হইয়া গেল।

বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশ করিলেন।

(* ক) "দেবেন্দ্রবাবু সোমেন্দ্রনাথ (ঠাকুর) ও রবীন্দ্রনাথ (ঠাকুর) নামক তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ দুই পুত্রের উপনয়ন দেন। ...... আমি জানিতাম না যে, শূদ্রে তথায় বসিতে পারিবে না। জানিলে, আমি তথায় বসিতাম না।"—[রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত—পৃঃ ১৯৯]

তৃতীয় বৎসর (১৮৭৪।১৫ই আগষ্ট—১৮৭৫।১৪ই আগষ্ট):

অরবিন্দের জীবনের তৃতীয় বৎসর আরম্ভ। বঙ্কিম 'চন্দ্রশেখর' প্রকাশ করিলেন। এই সময়ে রাজনারায়ণবাবু বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা দেন। তাহাতে মাইকেল ও বঙ্কিমের সমালোচনা থাকে (* খ)।

চতুর্থ বৎসর (১৮৭৫।১৫ই আগষ্ট—১৮৭৬।১৪ই আগষ্ট):

অরবিন্দের জীবনের চতুর্থ বৎসর। এই বৎসরে দুইটি প্রধান ঘটনা দেখা যাইতেছে। প্রথম, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র গিয়া উপনীত হইলেন। ইহা এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা। ব্রাহ্মসংস্কার-যুগের অন্তে প্রতিক্রিয়ামূলক (reactionary) এক সমন্বয় যুগের আরম্ভ হইতে দেখা গেল। ইহা যেন ইয়োরোপে খৃষ্টান ধর্ম্মে প্রটেষ্টাণ্ট (Protestant)-দিগের বিরুদ্ধে রোমান্ ক্যাথলিক্ (Roman Catholic)-দিগের পুনরুত্থান। কেশবচন্দ্রই স্বামী বিবেকানন্দের আগে পরমহংসদেবের উপর শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করিলেন। প্রকাশ থাকে যে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতেই কেশবচন্দ্র গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়, এই বৎসরে আবার নবীনচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশ করিলেন। 'বধ' নয়—'সংহার' নয়—একেবারে সদ্য এ-কালের জিনিষ, 'যুদ্ধ'। বাংলার মুসলমান ও হিন্দুর সহিত খৃষ্টান ইংরেজের যুদ্ধ।

মেঘনাদকে 'বধ' করিয়া, বৃত্রকে 'সংহার' করিয়া, বাঙ্গালী পলাশীর 'যুদ্ধে' হারিয়া গেল।

পঞ্চম বৎসর (১৮৭৬।১৫ই আগষ্ট—১৮৭৭।১৪ই আগষ্ট):

অরবিন্দের পঞ্চম বৎসর আরম্ভ। এই বৎসরের শেষে কিংবা ইহার পর-বৎসরের (১৮৭৮ খৃঃ) প্রথমে বালক অরবিন্দ তাহার অপর দুই ভ্রাতার সহিত দার্জ্জিলিঙ Loretto Convent Schoolএ দুই বৎসরের জন্য পড়িতে যান।

এই বৎসরে Indian Association—'ভারত সভা'—স্থাপিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মীতায় রাজনৈতিক বক্তৃতা আরম্ভ

(* খ) "উক্ত বক্তৃতাতে মাইকেল মধুসূদনের দোষ দেখানতে তাঁহার গোঁড়ারা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন ও তাঁহার গুণ দেখানতে তাঁহার শত্রুরা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও ঐরূপ করাতে তাঁহার শত্রু-মিত্র উভয়েই আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন।"—[রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত—পৃঃ ৯৪]

করিলেন। যুবকগণ আকৃষ্ট হইতে লাগিল। আনন্দমোহন বসু ভারত সভার প্রথম 'সেক্রেটারী' নির্ব্বাচিত হইলেন।

ষষ্ঠ বৎসর (১৮৭৭।১৫ই আগষ্ট—১৮৭৮।১৪ই আগষ্ট):

ষষ্ঠ বৎসর আরম্ভ। এই বৎসরে অরবিন্দের পিতা 'নেটিভ' সংস্রব হইতে দূরে রাখিবার জন্যই দার্জ্জিলিঙ 'লোরেটো কন্‌ভেণ্ট স্কুল'-এ বিদ্যারম্ভের জন্য অরবিন্দকে তাঁহার অপর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পাঠাইয়া দিলেন। পুত্রদের সম্বন্ধে পিতার অভিপ্রায় বুঝা গেল।

ছয় বৎসরের বালক অরবিন্দ এক ইংরেজী আবেষ্টনের মধ্যে, ইংরেজ বালকবৃন্দের সঙ্গে, দার্জ্জিলিঙের সেই পাহাড় বরফ ঝরণা ও শীত-প্রধান দেশে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন:

"Dr. K. D. Ghose had a whole-hearted belief in Western education, and at the age of five (?) Manmohan with his brothers, Benoy and Aravindo, were sent to the Loretto Convent School at Darjeeling. We can imagine these boys with deep, wistful eyes, earnest and thoughtful, for genius had marked two of them for her own, wandering amidst a brand of English boys. In the shadow of the Himalayas, in sight of the wonderful snow-capped peaks, even in their native land they were brought up in alien surroundings."—[*India Writers of English Verse, Lotika Ghose, B. A.* (*Cal*) *B. Litt.* (*Oxon*)—*p 101*].

শেষের কথাটি —'alien surroundings'—প্রনিধানযোগ্য। ডাঃ কে. ডি. ঘোষ পুত্রদের দেশে রাখিয়াও যতদূর সম্ভব বিলাতী আবহাওয়ার মধ্যে রাখিয়া মানুষ করিতেছেন। অরবিন্দেরা তিন ভাই কনভেণ্টের ছাত্রাবাসে থাকিত। বড়দিনের ছুটিতে বিনয়ভূষণ ও মনোমোহন কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু শোনা যায়, অরবিন্দ আসিলেন না—হেডমাষ্টারের সহিত পড়াশুনায় ও হিমালয়ের দৃশ্য দেখিয়া বড়দিনের ছুটি কাটাইলেন। হেডমাষ্টার এবং সমপাঠী ইংরেজ বালকেরা অরবিন্দের বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইত। বালক অরবিন্দ সব পরীক্ষাতেই প্রথম হইতেন। হিমালয়ের দৃশ্য দেখিয়া অরবিন্দ ছোট একটি কবিতার মত লিখিয়া ফেলিলেন। পরদিন হেডমাষ্টার ঐ

রচনাটি দেখিয়া অরবিন্দকে বলিলেন—"তুমি একদিন একজন বড় কবি হবে" ("You will be a great poet one day, my child")।

সপ্তম বৎসর আরম্ভ (**১৮৭৮।১৫ই আগষ্ট—১৮৭৯। এপ্রিল**) :

বালক অরবিন্দ দার্জিলিং কনভেণ্ট স্কুলে দ্বিতীয় বৎসর অধ্যয়ন করিতেছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ : এই বৎসর কুচবিহারের রাজার সহিত কেশব-চন্দ্রের ১৪ বৎসরের কম বয়স্কা কন্যার বিবাহ দেওয়াতে অতি উগ্র ব্রাহ্ম যুবকদল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করিলেন।

কংগ্রেসের ৭ বৎসর পূর্ব্বে, সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক (Constitutional) ও গণতান্ত্রিক (Democratic) ভিত্তিতে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ ৭০০০৲ টাকা অর্থ সাহায্য করিলেন। তিনি ভুলিতে পারেন নাই—কেশব ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মমভাবে তাঁহার নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। ১৮৬৬ এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জাতিভেদ-ভঙ্গকারী সেই প্রখর প্রচণ্ড Gladstone Bright ও Gambatta-র সমকক্ষ বাগ্মী কেশব, যাঁহার বাগ্মীতার ভঙ্গী Cicero-র মত ছিল—তিনি ব্রাহ্মসমাজের নব্য দলের নেতা ছিলেন। মাত্র ৬ বৎসর পরে, তিনি স্বখাত সলিলে পতিত হইয়া তখনকার প্রগতিশীল ব্রাহ্ম যুবকদের দ্বারা কী নিষ্ঠুরভাবেই না পরিত্যক্ত হইলেন! উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীলতা সর্বপ্রথম ব্রাহ্ম যুবকগণই দেখাইয়া গিয়াছেন।

বাংলায় নেতৃত্বের ইতিহাস যেন এক ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল, খরস্রোতা নদী। নেতৃত্ব—তরঙ্গের মত উঠে, আবার পড়ে; কিন্তু স্রোত চলে, বিরাম নাই। এই চলন্ত, জীবন্ত স্রোতই বাংলার প্রাণ। এই স্রোত-মুখে এবং এই স্রোতাবর্ত্তের মধ্যেই অরবিন্দের বিচিত্র জীবনের উদ্ভব ও আরম্ভ।

এই বৎসর বঙ্কিম 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশ করিলেন। অরবিন্দ তাঁহার পিতা-মাতা, দুই ভ্রাতা ও ভগ্নী-সহ বিদ্যাশিক্ষার্থ জন্মভূমি বাংলাদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন।

রাজনারায়ণ বাবুও ঠিক এই বৎসরই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বৈদ্যনাথ-ধামে জীবনের শেষ ২০ বৎসর কাটাইবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

তিন

শ্রীঅরবিন্দের বিলাতে চৌদ্দ বৎসর

"I was brought up in England amidst foreign ideas.…I was in England for 14 years. I know the English people and their politics.

বয়স সাত বৎসর (১৮৭৯। মে—১৮৭৯।১৪ই আগষ্ট):

অরবিন্দকে লইয়া অরবিন্দের পিতার বিলাত গমন: ডাঃ কে. ডি. ঘোষ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, সম্ভবতঃ মে মাসের প্রথমদিকে তাঁহার গর্ভবতী স্ত্রী ও তিন পুত্র—বিনয়ভূষণ, মনোমোহন ও অরবিন্দ—এবং এক কন্যা সরোজিনীকে লইয়া জাহাজে চড়িয়া বিলাত রওনা হইলেন। অরবিন্দের সপ্তম বৎসর পূর্ণ হইতে তখনও ৪ মাস বাকী। "কয়েকটি সন্তানের পর পর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দের মা, স্বর্ণলতাতে হিষ্টিরিয়া ও কিছু-কিছু উন্মাদ রোগের চিহ্ন দেখা যায়।…প্রতিভাবান রাজনারায়ণের বংশে কিছু উন্মাদ রোগের বীজ ছিল।"—(বারীন্দ্রকুমার, 'সন্ধ্যা'—৯।১২।১৯৩৯)।

ডাঃ কে. ডি. ঘোষ দুইটি কারণে সপরিবারে বিলাত গমন করিয়াছিলেন। ১ম—তাঁহার স্ত্রীর চিকিৎসা। ২য়—পুত্রদের বিদ্যাশিক্ষা। অবশ্য বিদ্যাশিক্ষা দেশে না-হইতে পারিত, এমন নয়। কিন্তু ডাঃ. কে. ডি. ঘোষ সাহেবীয়ানার পক্ষপাতী ছিলেন। এবং পুত্রদিগকেও পুরাদস্তুর সাহেব করিবার জন্যই 'নেটিভ' সংশ্রব বর্জন করিয়া এই অল্প বয়সেই বিলাতে আনিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই ইংরেজ পরিবার এবং ইংরেজ সমাজের মধ্যে থাকিয়া বর্দ্ধিত হইলে বুদ্ধি, বিদ্যা ও চরিত্র উন্নত হয়—১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ও এই ধারণা পোষণ করিতেন (* ক)।

(* ক) "From personal experience, I am impressed with the conviction that the greater cur intercourse with European gentlemen, the greater will be cur improvement in literary, social and political affairs."—[*Speech by Raja Rammohan Roy, in a great public meeting held at the Town Hall of Calcutta on December 15, 1829*]

ডাঃ কে. ডি. ঘোষ যখন রংপুরে সিভিল সার্জেন ছিলেন, সেই সময় তিনি বিলাত গমন করেন। রংপুরের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট গ্লেজিয়ার (Glazier) সাহেব, ডাঃ কে. ডি. ঘোষের বন্ধু ছিলেন। বারীন্দ্রকুমার বলিতেছেন :

"রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট গ্লেজিয়ার (Glazier) সাহেব ছিলেন বাবার বন্ধু, তাঁরই আত্মীয় non-conformist পাদ্রী ড্রুইড্ সাহেবের পরিবারে ম্যানচেষ্টারে তিন ভাই থাকিতেন।"—(আত্ম-কথা—পৃঃ ১৫)।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী ঘোষ আমাদিগকে বলিয়াছেন : "বাবা যখন চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিবার জন্য প্রথমবার বিলাত যান (১৮৬৯ খৃঃ) তখনই ড্রুয়েট্ পরিবারের সহিত বাবার আলাপ-পরিচয় হয়।"

বিলাতে পৌঁছিয়া ডাঃ কে. ডি. ঘোষ ম্যাঞ্চেষ্টারে ড্রুয়েট্ পরিবারে তিন পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা ও থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। এবং ৪ মাসকাল স্ত্রীপুত্র কন্যার সহিত অবস্থান করিয়া সুচারুরূপে তাঁহাদের সকল রকম বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ১৮৭৯-এর আগষ্ট মাসে পুনরায় রংপুরেই একা ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার গর্ভবতী স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য বিলাতেই রাখিয়া আসিলেন।

অরবিন্দের বিলাত গমনের তারিখ এবং সেই সময় তাঁহার বয়স সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম তারিখ কল্পনা করিয়াছেন (* খ)। ইহা অসতর্কতার ফল। দায়িত্বজ্ঞানহীনতাও বলা চলে। অবশ্য সকলেই ভুল তারিখ লিখিয়াছেন, এমন নয়।

ডাঃ কে. ডি. ঘোষ একটা অসমসাহসিক কাজ করিয়া ১৮৭৯-এর আগষ্ট মাসে রংপুর ফিরিলেন।

ডাঃ কে. ডি. ঘোষের রংপুরের জীবনযাত্রা : ডাঃ কে. ডি. ঘোষ রংপুরে সিভিল সার্জেন ছিলেন, এবং পুরাদস্তুর সাহেবী কায়দায় বাস করিতেন। সেখানে অরবিন্দের মাতাকে 'গাউন্' (gown) পরিতে হইত, ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে হইত। সৌন্দর্য্যের জন্য লোকে তাঁহাকে 'Rose of Rungpur' বলিত।

(* খ) শ্রীঅরবিন্দের অগ্রজ অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা লিখিয়াছেন : "১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মনোমোহনের জন্ম হয়। ৫ বৎসর বয়সে ('at the age of five') তিনি দার্জ্জিলিং শিক্ষার্থ প্রেরিত হন, এবং ইহার দুই বৎসর পর ('two years afterwards') অর্থাৎ ১৮৭৪ বিলাত গিয়াছিলেন।"—[*Indian Writers of English Verse, Lotika Ghose*—p. 101]

এই দ্বিতীয়বার বিলাত গমনকালে ডাঃ কে. ডি. ঘোষের বয়স ৩৪ বৎসর, এবং তাঁহার স্ত্রীর বয়স ২৭ বৎসর মাত্র। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, বিবাহের সময়, ডাঃ কে. ডি. ঘোষের বয়স ছিল ১৯, এবং তাঁহার স্ত্রীর বয়স ছিল মাত্র ১২। বিবাহের ১৫ বৎসর পর, তাঁহারা পুত্রকন্যাসহ একত্র বিলাত গমন করেন।

দেখিতে পাই, ডাক্তার ঘোষের চিন্তা স্বাধীন—পরমুখাপেক্ষী নহে। চরিত্রে বজ্রকঠোর দৃঢ়তা বিদ্যমান। অথচ এত দৃঢ়তা সত্ত্বেও, এবং এত সাহেবীয়ানা সত্ত্বেও, তিনি কড়া মেজাজি লোক ছিলেন না। বরং একেবারে উল্টা। তিনি অতিশয় কোমল প্রকৃতি ও গরীবদুঃখীর প্রতি দয়ালু স্বভাবের ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে একটা অদ্ভুত সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। ডাঃ কে. ডি. ঘোষের রংপুরে জীবনযাত্রা সম্পর্কে আরও কিছু কথা আছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন লিখিয়াছেন যে :

"পূর্ণবাবু (বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর) কিছুদিন রঙ্গপুরে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সে সময়ে ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ (কৃষ্ণধন ঘোষ) রঙ্গপুরের

"পাঁচ ছয় বৎসর বয়স হইতে যৌবনারম্ভের পর পর্য্যন্ত বিলাতেই ছিলেন।" —['অরবিন্দ-প্রসঙ্গ', দীনেন্দ্রকুমার রায় পৃঃ ৩]

"At the tender age of nine Sri Aurobindo along with his two elder brothers and his only sister was taken to England".— [*Barindra Kumer Ghose 'Dawn'—November 8. 1933*]

"Sri Aurovindo went to England when he was only 9 (nine) years of age and stayed there for 14 years to complete his education".—[*Life-Work of Sri Aurobindo, by Jyotish Chandra Ghose—p. 4*]

"When seven years old he was sent to England", [*Life of Aurovindo Ghose, by R. Palit—p. 91*]

"শ্রীঅরবিন্দের বয়স যখন সাত বৎসর মাত্র, যখন তাঁহার পিতা সপরিবারে বিলাত যান—এবং সমুদ্রবক্ষে, ইংলণ্ডে জাহাজ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, বারীন্দ্র-কুমারের জন্ম হয়।" —['শ্রীঅরবিন্দ', প্রমোদ সেন,—পৃঃ, ৫]

সর্ব্বেসর্ব্বা।- তিনি ছিলেন, ইংরেজ-বাঙ্গালীর 'সুরেজ যোজক'। তাঁহার বাড়ীটি ছিল, ইংরেজ-বাঙ্গালীর সম্মিলনক্ষেত্র। প্রত্যহ তাঁহার বাড়ীতে বাঙ্গালীদের একটি বিশেষ আড্ডা বসিত।"—('নারায়ণ'—শ্রাবণ, ১৩২২)।

বিলাত হইতে ফিরিয়াও ডাঃ কে. ডি. ঘোষ বহুদিন রংপুরেই ছিলেন। এবং এই সময়ের পরেও ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ ১৪ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র ১৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ রংপুরের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। ডাক্তার কে. ডি. ঘোষের জনপ্রিয়তার বহু প্রমাণের মধ্যে পণ্ডিত যাদবেশ্বরের চাক্ষুষ প্রমাণ উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা পূর্ণবাবু স্বয়ং লিখিতেছেন—"আমরা উভয়ে (পূর্ণবাবু ও পণ্ডিত যাদবেশ্বর) প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের বাটীতে মিলিত হইতাম। আমি তখন রংপুরের একজন ডিপুটি ছিলাম। ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত এবং তেজস্বী পুরুষ আমি কদাচিৎ দেখিয়াছি। বঙ্কিমবাবুর সহিত তখন তাঁহার আলাপ-পরিচয় ছিল না, তথাচ তাঁহার গ্রন্থাদি পড়িয়া ডাক্তার ঘোষ গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনিই মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমবাবুর কথা উত্থাপন করিতেন।"—('নারায়ণ'—ভাদ্র, ১৩২২)।

সুতরাং অব্যর্থ প্রমাণ পাওয়া গেল যে, ডাঃ কে. ডি. ঘোষ বঙ্কিম-প্রতিভার উন্মেষ হইতেই বঙ্কিমের গোঁড়া ভক্ত হইয়াছিলেন।

আমরা রংপুরে যেমন ডাঃ কে. ডি. ঘোষকে বঙ্কিম-সাহিত্যে অনুরক্ত দেখিতে পাই, তেমনি ইহার পরে খুলনাতে তাঁহাকে কলিকাতার 'ষ্টার' (Star) থিয়েটারের 'পেট্রন' (patron)-হিসাবেও দেখিতে পাই। পারদর্শী অস্ত্র-চিকিৎসক হিসাবেই শুধু তাঁহার খ্যাতি ছিল না। পরন্তু উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির মধ্য দিয়া তাঁহার রসপিপাসু মন আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতেছে।

বারীন্দ্রকুমার লিখিতেছেন: "ছেলেপুলে নিয়ে সস্ত্রীক বাবা বিলাত যান এবং একা ফিরে আসেন ১৮৭৯-এর আগষ্ট মাসে। শ্রীযুক্তা সরোজিনী ঘোষ (২০।৫।৪০ তারিখে) আমাদিগকে বলিয়াছেন যে—'আমার বাবা ৫।৬ মাস মাত্র বিলাত ছিলেন'।"—(আত্ম-কথা—পৃঃ ১৫)।

একটা কথা বার বার মনে আসে। ডাঃ কে. ডি. ঘোষ যখন স্ত্রীপুত্রদিগের নিকট ম্যাঞ্চেষ্টারে বিদায় লইয়া দেশে ফিরিতেছেন, তখন কি তিনি ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, পুত্রদের সহিত ইহজীবনে তাঁহার আর দেখা হইবে না!

আট বৎসরের বালক অরবিন্দও কি পিতার সহিত এই শেষ-সাক্ষাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন? ডাঃ কে. ডি. ঘোষ পুত্রদের, বিশেষতঃ অরবিন্দের ভবিষ্যৎ-জীবন সম্পর্কে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে—মৃত্যুর ২ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—কত উচ্চ আশাই না পোষণ করিতেন। অথচ অরবিন্দ যখন দেশে ফিরিলেন তখন তিনি আর পিতাকে দেখিতে পাইলেন না।

বয়স আট বৎসর (১৮৭৯।১৫ই আগষ্ট—১৮৮০।১৪ই আগষ্ট):

অরবিন্দের মাতা স্বর্ণলতা ঘোষ: আরবিন্দের পিতা দেশে ফিরিবার ৪ মাস পর, অরবিন্দের মাতা ১৮৮০-এর ৫ই জানুয়ারী বারীন্দ্রকুমারকে প্রসব করিলেন। বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন:

"আমাকে গর্ভে নিয়ে বিলাতে পৌঁছিয়া সেখানে (Crystal Palace) মর্ম্মর প্রাসাদের সামনে লণ্ডন-উপকণ্ঠে নরউডে (Norwood) আমার জন্ম। প্রায় সমুদ্রগর্ভে জন্ম বলে নাম হোলো বারীন্দ্রকুমার।…মায়ের ডাক্তারের নাম ছিল ম্যাথিউ। আর ক্রাইষ্টের জন্মের পরেই ৫ই জানুয়ারী আমার জন্ম বলে পাগলী মা আমার এক উদ্ভট বাইবেলী নাম রাখলেন—ইম্যানিউয়েল ম্যাথিউ ঘোষ। ক্রয়ডনের (Croydon) বার্থ-রেজেষ্ট্রী অফিসে লিখলে এখনও ঐনামে জন্মের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।"—(আত্ম-কথা—পৃঃ ১৪, ১৫)।

"…সেজদার নাম যে হয়েছিল অরবিন্দ এক্রয়েড ঘোষ সেই এক্রয়েড (Ackroyd) পরিবার এই ড্রুইডের আত্মীয় ও তাঁরাও বাবার পরম বন্ধু ছিলেন।"—(আত্ম-কথা—পৃঃ ১৫)।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী ঘোষ (২০।৫।৪০ তারিখে) আমাদিগকে বলিয়াছেন—"বাবা ও মার সঙ্গে Miss Ackroyd-এর খুব ভাব ছিল।"

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে Miss Ackroyd-এর সহিত রাজনারায়ণ বসু ও কেশচন্দ্রের হাস্যোদ্দীপক সংঘর্ষের কথা আমরা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াছি।

বারীন্দ্রকুমারের জন্ম সম্পর্কে আর একটি ভুল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। "…সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডে জাহাজ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বারীন্দ্রকুমারের জন্ম হয়"।—('শ্রীঅরবিন্দ', প্রমোদ সেন—পৃঃ ৫)। বারীন্দ্রকুমারের নিজের লেখাই এই ভুল সংবাদের প্রতিবাদ করিতেছে।

অরবিন্দের মাতা কবে দেশে ফিরিলেন? বারীন্দ্রকুমার লিখিতেছেন—"...মা আমাকে ও দিদিকে নিয়ে একা দেশে আসেন আমার জন্মের তিনমাস পর, ১৮৮০ সালের মার্চ মাসে। —(আত্ম-কথা—পৃঃ ১৫)। অরবিন্দের মাতা কম সাহসী মহিলা নহেন! মাত্র ৩ মাসের শিশুপুত্র এবং আর একটি শিশুকন্যাকে লইয়া তিনি একাই জাহাজে চড়িয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তখন অরবিন্দের মাতার বয়স ২৮ বৎসর মাত্র। তিনি এক বৎসর বিলাতে ছিলেন।

অরবিন্দের মাতা যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন অরবিন্দের ৮ম বৎসর শেষ হইতে মাত্র সাড়ে চারিমাস বাকি। অরবিন্দের মাতা চলিয়া আসিবার পরে অরবিন্দেরা তিন-ভ্রাতা, পিতামাতা ছাড়া হইয়া, ম্যাঞ্চেটারে ড্রুয়েট্-পরিবারে বাস করিতে লাগিলেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল। ডিস্রেলী (Disraeli) তখন লর্ড বীকন্স্ফীল্ড (Lord Beaconsfield)—ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী। কিন্তু তাঁর মন্ত্রীত্ব অবসানের আর মাত্র ১ বৎসর বাকি। বিসমার্ক (Bismarck) তখন ইয়োরোপের আকাশে কিরণ ও উত্তাপ দুই-ই ছড়াইতেছেন। ১৮৭৯-এর ডিসেম্বরশেষে বালক অরবিন্দ বিলাতে প্রথম 'খৃষ্টমাস' (Christmas) সম্ভবতঃ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের 'New Year' (নববর্ষ)-পর্ব্বের সমারোহও প্রথম দেখিয়াছিলেন।

বয়স নয় বৎসর (১৮৮০।১৫ই আগষ্ট—১৮৮১।১৪ই আগষ্ট):

বালক অরবিন্দ তাঁহার অপর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়ভূষণ ও মনোমোহনের সহিত ম্যাঞ্চেষ্টার 'গ্রামার স্কুল' (Grammar School)-এ গিয়া ভর্ত্তি হইলেন কি-না, সঠিক জানা যাইতেছে না। শোনা যায়, প্রথমে তিনি Grammar Schoolএ গিয়া ভর্ত্তি হন নাই, বাড়ীতেই Mr. Druette তাঁহাকে Latin পড়াইতেন আর Mrs. Druette তাঁহাকে ইংরেজি পড়াইতেন। এই ৯ বৎসরের বালকের মেধা ও প্রতিভা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছিলেন। কোন ইংরাজ বালকের মধ্যেও তাঁহারা এইরূপ প্রতিভা দেখেন নাই।

এই বৎসর ডিস্‌রেলি (Disraeli)র মন্ত্রীত্বের অবসান হইয়া গ্লাডষ্টোন

(Gladstone)-এর দ্বিতীয়বার মন্ত্রীত্বের প্রতিষ্ঠা হইল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই ইতিহাস-বিখ্যাত আইরিশ দেশপ্রেমিক পার্ণেল (Parnell) পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিয়া আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতার জন্য দল গঠন করিয়াছেন এবং সেই দল পার্লামেণ্টের সব কাজেই বাধা দিয়া আসিতেছে। বেকার আইরিশ কৃষকেরা দলে দলে industrial town (শ্রমকেন্দ্রিক সহর) Manchester (ম্যাঞ্চেষ্টার)এ আসিয়া উপনীত হইতেছে।

বয়স দশ বৎসর (১৮৮১।১৫ই আগষ্ট—১৮৮২।১৪ই আগষ্ট):

এই বৎসর এপ্রিল মাসে Disraelir মৃত্যু হয়। Queen Victoria তাঁহার coffinএ সম্মানার্থ ফুল পাঠাইলেন এবং 'dear, great friend' বলিয়া সম্বোধন করিলেন (* ক)। এই বৎসর ১৭ই অক্টোবর Parnellকে ধরিয়া জেলে দেওয়া হয়। কেননা, তিনি আইরিশ Land Actএর বিরুদ্ধে কৃষকদিগকে খেপাইয়া দিয়া Governmentএর Land Actএর কাজে বাধা দিয়া ঐ Act একরূপ বাতিল করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু Parnell কারাগারে আবদ্ধ হইয়া Governmentএর বিরুদ্ধে আরও বেশী বিপজ্জনক হইয়া উঠিলেন। কাজেই Government Parnellকে কারাগার হইতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

আবার এদিকে বাংলাদেশে ঐ বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরবর্ত্তীকালে এই আনন্দমঠের প্রভাব শ্রীঅরবিন্দের উপর প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হইবে। এবং আবার এই বৎসরই স্বামী বিবেকানন্দ গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিলেন। এই সাক্ষাতের জন্য সম্ভবতঃ সমগ্র পৃথিবী উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া ছিল। অরবিন্দ তখন Druette পরিবারে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতেছেন।

বয়স এগার বৎসর (১৮৮২।১৫ই আগষ্ট—১৮৮৩।১৪ই আগষ্ট):

এ অতি ভয়ানক বৎসর। কেননা, পার্ণেল (Parnell) জেল হইতে মুক্তি পাইয়া আবার Irish National League (আইরিশ জাতীয় লীগ)

(* ক) এই Disraeli ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে: ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের Colonyগুলি একদিন কালে সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। Disraelir অনেক আগে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন আয়র্লণ্ড ও ভরতবর্ষকে তুলনা করিতে গিয়া স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে: আয়র্লণ্ড ও ভারতবর্ষ কালে একদিন ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার এক সভায় বিষম বক্তৃতা করিলেন। সেইসঙ্গে আয়র্লণ্ডের (Irish) Secretary of State, Lord Frederish Cavendish ও তাঁহার সহযোগী, Mr. Burke, ডাব্লিন (Dablin) সহরে Phoenix Parkএ গুপ্ত আততায়ীর হস্তে অকস্মাৎ নিহত হইলেন। পার্ণেল মিঃ গ্লাডষ্টোনকে প্রকাশ্য সভায় আসিয়া আয়র্লণ্ডের প্রতি গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় (policy) কি, খোলসা ব্যক্ত করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। গ্লাডষ্টোন কিন্তু নানা অজুহাতে ইহাতে সম্মত হইলেন না। এদিকে বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবীচৌধুরাণী' প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন।

বয়স বার বৎসর (১৮৮৩।১৫ই আগষ্ট—১৮৮৪।১৪ই আগষ্ট):

এই বৎসরে ইজিপ্ট (Egypt)এ মুসলমান ধর্মের রক্ষক বলিয়া the 'Mahdi' (*or* the Prophet) বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বৎসর বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' পরিসমাপ্ত করিয়া প্রকাশ করিলেন। অরবিন্দ ইহার ২৬ বৎসর পর (Saturday, August 14, 19C9) *Karma Yogin* ('কর্ম্মযোগিন্') পত্রিকায় এই 'আনন্দমঠ'-এর অতি সুন্দর ইংরেজি অনুবাদ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ('It was a summer day of the Bengali year 1176') ইহা বাংলাদেশের ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

বয়স তের বৎসর (১৮৮৪।১৫ই আগষ্ট—১৮৮৫।১৪ই আগষ্ট):

ড্রুয়েট্ (Druette) পরিবারের ম্যাঞ্চেষ্টার ত্যাগ: এই বৎসরেই ড্রুয়েট্ পরিবার ম্যাঞ্চেষ্টার ত্যাগ করিয়া অষ্ট্রেলিয়া গমন করেন। এবং "অষ্ট্রেলিয়া যাবার পথে ভারতে এসে বাবার কাছে নিজের প্রাপ্য টাকা নিয়ে গেল।"—(বারীন্দ্রকুমার, 'আমার আত্মকথা'—পৃঃ ১৯)। এবং সেই সঙ্গে অরবিন্দ ও অপর দুই ভ্রাতাকে ড্রুয়েট্ পরিবারের আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে হইল। ইংলণ্ডে এই বৎসর Third Reform Bill পাশ হয়। সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া নিজে বিরুদ্ধবাদীদের সম্মত করাইয়া এই 'বিল' (Bill) পাশ করান। সাম্রাজ্ঞীর এই মহানুভবতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। জনসাধারণকে এই বিলে ভোট (vote) দিবার অধিকার প্রদান করা হয়।

অরবিন্দ এইবার ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে লণ্ডনে আসিতেছেন।

বয়স চৌদ্দ বৎসর (১৮৮৫।১৫ই আগষ্ট—১৮৮৬।১৪ই আগষ্ট):

ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে লণ্ডন: এই বৎসর অরবিন্দ লণ্ডনের সেণ্টপলস স্কুলে (St. Paul's School, London) আসিয়া ভর্ত্তি হইলেন। এবং মনোযোগের সহিত পড়াশুনা আরম্ভ করিলেন।

'বীজ অঙ্কুরিত': অরবিন্দের জীবন-চরিত আলোচনায় এই বৎসরটি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ১৯০৬-এর ৩০শে আগষ্ট, তিনি তাঁহার স্ত্রীকে লিখিতেছেন—"প্রিয়তমা মৃণালিনী ……… চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল।" কিসের বীজ? এবং কিসেরই বা অঙ্কুর? নব-প্রসূত কংগ্রেসের জন্ম কি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল?

কংগ্রেস: এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইল। সভাপতি ডব্লিউ. সি. বোনার্জি (W. C. Bonnerjee.)। সভাপতি মহাশয় বলিলেন:

(ক) ইংরেজের শাসনে আমরা অনেক সুবিধা পাইয়াছি ("She had given them order, she had given them railways and, above all, she had given them the inestimable blessing of Western education.")। এই জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

(খ) এই কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে একতা স্থাপন করিবে এবং জাতীয় ভাব (Sentiments of National Unity), জাতীয় ঐক্যবোধ বৃদ্ধি করিবে।

(গ) এই কংগ্রেস রাজদ্রোহী নহে—শিক্ষিত ভারতবাসী অতিশয় রাজভক্ত (…'not…'a nest of conspirators and disloyalists'…but there were no more thoroughly loyal and consistent well-wishers of the British Government")।

(ঘ) আমরা ইয়োরোপের দেশগুলির মত আমাদের শাসনকার্যে আমাদের প্রাপ্য ন্যায্য অংশ গ্রহণ করিতে চাই ("…according to the ideas of government prevalent in Europe…we desire…our proper and legitimate share in it.")।

বালক অরবিন্দ কি W. C. Banerjee র এই বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, এবং নব-প্রসূত কংগ্রেস কি তাঁহার মনে স্বদেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত

করিয়াছিল? ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ এই বৎসরেই কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বিলাত গমন করিয়াছিলেন এবং অরবিন্দ ও তাঁহার দুই ভ্রাতার পড়াশুনার খবর লইয়াছিলেন।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি একজন বাঙ্গালী। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে শ্লাঘার বিষয়, সন্দেহ কি।

বয়স পনের বৎসর (১৮৮৬।১৫ই আগষ্ট—১৮৮৭।১৪ই আগষ্ট):

মি: গ্লাডষ্টোন ও আইরিশ হোম রুল বিল: ১৮৮৬-এর ১৫ই আগষ্ট, ১৫শ বর্ষ আরম্ভ। Gladstoneএর পরিবর্ত্তে Lord Salisbury প্রধান মন্ত্রী হইলেন। কিন্তু মাত্র কিছু দিনের জন্য। কেননা, সাধারণ নির্ব্বাচনে এই বৎসরই পুনরায় Gladstone তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হইলেন। Parnell আয়র্লণ্ডের পক্ষ হইতে খুব বড় রকমের একটা Tenants' Relief Bill আনিলেন, কিন্তু ইহা অগ্রাহ্য হইল। Parnell অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। কিন্তু Gladstone স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, আয়র্লণ্ডকে Home Rule দেওয়া ব্যতিরেকে আয়র্লণ্ডের সমস্যার কোন মীমাংসা সম্ভব নয়। অতএব তিনি Home Rule Bill আনিলেন। বিরুদ্ধবাদীরা স্পষ্ট বলিলেন যে, এই Home Rule Billএর শেষ-পরিণতি আয়র্লণ্ড ইংলণ্ড হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন হইবে। অতএব তাঁহারা ৩০ ভোটের সংখ্যাধিক্যে Gladstoneএর Home Rule Bill বাতিল করিয়া দিলেন। Gladstone পদত্যাগ করিলেন, Lord Salisbury দ্বিতীয়বার আসিলেন।

'বীজ অঙ্কুরিত' হওয়ার পরের বৎসরের ঘটনাগুলি অরবিন্দ সমস্তই বুঝিতে পারিতেছেন—এইরূপ মনে করাই স্বাভাবিক। Irish Home Rule Bill নিশ্চয়ই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

কংগ্রেস: এদিকে আবার কলিকাতাতে এই বৎসর কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হইল। দাদাভাই নৌরজী সভাপতি হইলেন। তিনি বলিলেন: 'আমাদের মেরুদণ্ড পর্যন্ত রাজভক্ত'। কিন্তু আবার ইহাও বলিলেন: 'প্রজার জন্যই রাজার সৃষ্টি। রাজার জন্য প্রজার সৃষ্টি নহে।' ('We are loyal to the backbone'—*cheers*—কিন্তু 'kings are made for the people, not people for their kings'.)

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের তিরোভাব: এই বৎসরই আবার

(১৮৮৬-এর ১৬ই আগষ্ট, রবিবার) ব্রাহ্মমুহূর্তে বাঙ্গালাদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দেহত্যাগ করিলেন।

বয়স ষোল বৎসর (১৮৮৭।১৫ই আগষ্ট—১৮৮৮।১৪ই আগষ্ট):

চৌদ্দবৎসর বয়সে অরবিন্দের মনে যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা এখন তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া নিশ্চয়ই বর্দ্ধিত হইতেছে।

কংগ্রেস: এই বৎসর (১৮৮৭ খৃঃ) কংগ্রেস ডিসেম্বরমাসে মাদ্রাজে হয়। সভাপতি—মিঃ বদরুদ্দিন তায়েবজি। এই কংগ্রেসে লালমোহন ঘোষ ও মনোমোহন ঘোষ উপস্থিত হইতে না-পারিয়া টেলিগ্রামে সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। এই মনোমোহন ঘোষ অরবিন্দের পিতার একজন পরম সুহৃদ ছিলেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন:

(ক) গত দুই বৎসর (১৮৮৫-৮৭ খৃঃ) অর্থাৎ কংগ্রেসের ভূমিষ্ঠ হইবার প্রথম দুই বৎসর, মুসলমানেরা ইহাতে যোগ দেন নাই। কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় না যে, ভারতের সমগ্র মুসলমান-সমাজ কংগ্রেস-বিরোধী।

(খ) শিক্ষিত ভারতবাসী সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবী রাখে। কেননা, ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের যে উপকার হইয়াছে (ভাল রাস্তা, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ-পোষ্টঅফিস, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি, হাসপাতাল, ভাল আইনকানুন, পক্ষপাতিত্বহীন বিচারালয়) ইহা শিক্ষিত ভারতবাসী বুঝিতে পারিবে, অশিক্ষিত ভারতবাসী পারিবে না।

(গ) শিক্ষিত ভারতবাসীরা সেই জন্য অতিশয় রাজভক্ত। ('I maintain that the educated natives of India are loyal to the backbone.')। এই রাজভক্তি (loyalty)র কথা W. C. Banerjee ও দাদাভাই নৌরোজী, উভয়েই কংগ্রেস-মঞ্চ হইতে তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।

'PARNELLISM & CRIME': এই সময় Times পত্রিকায় 'Parnellism & Crime' শীর্ষক অনেকগুলি প্রবন্ধ ছাপা হইতে থাকে। অরবিন্দ

'বীজ অঙ্কুরিত হইবার তৃতীয় বৎসরে' নিশ্চয়ই সেই সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এবং পার্ণেলের বিরুদ্ধে ইংরেজের কূটনীতি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছিলেন।

সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ও 'জুবিলি' উৎসব : এই বৎসরই সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ৫০ বৎসর রাজত্বের সম্মানার্থে 'জুবিলি' (Jubilee) উৎসব হয়। ভারতবর্ষের অনেক করদ রাজা এই উপলক্ষে বিলাত যান। লণ্ডন সহর ইন্দ্রপুরীরমত সজ্জিত হয়। ইংলণ্ডের সমস্ত স্কুলের বালকদিগকে উত্তমরূপে ভোজ দেওয়া হয়। অরবিন্দ এই ভোজ খাইয়াছিলেন কি-না, জানিনা। খাওয়া অসম্ভব নয়।

সেণ্ট পল্‌স্ স্কুল (St. Paul's School)**:** এই St. Paul's School এ ইহাই অরবিন্দের শেষ বৎসর। শোনা যায়, অরবিন্দ পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিলেন। Latin ও Greek এ তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলনা। তিনি এতবড় মেধাবী ছাত্র যে, যেমন ছাত্রমহলে তেমনি শিক্ষকদের মধ্যে—সকলের নিকটেই তিনি উচ্চ প্রশংসা পাইয়াছিলেন। তিনি গ্রীক্, ল্যাটিন, ইংলিশ, ফ্রেন্স, ইটালিয়ান, জার্মান ও স্পেনিশ—সকলগুলি ভাষাই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এই সময় কবিতা লেখার প্রতিও তাঁহার মনোযোগ দেখা যায়।

এই বৎসর পুরস্কার-বিতরণী সভায় তিনি দুইটি পুরস্কার পাইলেন। একটি পাইলেন, পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইবার জন্য। আর একটি পাইলেন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth)-এর 'কোকিল' ('To The Cuckoo') কবিতা আবৃত্তি করিবার জন্য। আবৃত্তিতেও তিনি প্রথম হইয়াছিলেন এবং সোনার মেডেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

কিন্তু পুরস্কার বিতরণের দিন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'কোকিল' কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া সেই রাত্রেই নিজে 'To The Cuckoo' বলিয়া আর একটি কবিতা লিখিলেন।

TO THE CUCKOO

Sounds of the awakening world, the year's increase,
Passage of wind and all his dewy powers

With breath and laughter new-bathed flowers
And that deep light of heaven above the trees
Awake 'mid leaves the muse in golden peace
Sweet noise of birds, but most in heavenly showers
The Cuckoo's voice pervades the lucid hours,
Is priest and summoner of these melodies.
The spent and weary streams refresh their youth
At that creative rain and barren groves
Regain their face of flowers ; in thee the ruth
Of nature wakening her dead children moves.
But chiefly to renew thou hast the art
Fresh childhood in the obscured human heart.

এই কবিতাটি পরের দিন স্কুলে গিয়া শিক্ষক ও ছাত্রদের দেখাইলেন। সকলেই বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। স্কুলের ম্যাগাজিনে আগ্রহের সঙ্গে শিক্ষকেরা এই কবিতাটি ছাপাইয়া দিলেন। কবি বলিয়া অরবিন্দের খ্যাতি রটিয়া গেল। St. Paul's Schoolএ থাকিবার সময় তিনি আরও অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন। কত অল্প বয়সে বালক অরবিন্দের মধ্যে আমরা এই কবি-প্রতিভার প্রকাশ দেখিতে পাই! বালক অরবিন্দের প্রতিভা বাল্য-কাল হইতেই অতুলনীয়।

বয়স সতের বৎসর (১৮৮৮।১৫ই আগষ্ট—১৮৮৯।১৪ই আগষ্ট) :

এই বৎসর শেষেরদিকে অরবিন্দ St. Paul's School, London হইতে Cambridgeএ আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই বৎসরেও তিনি র্ণেলের দ্বারা রীতিমত প্রভাবান্বিত।

কংগ্রেস : এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস হয় এলাহাবাদে। সভাপতি -মিঃ জর্জ ইউল (Mr. George Yule)। এবারের কংগ্রেসের প্রতিও বরবিন্দের মন প্রসন্নই ছিল। সভাপতি মিঃ ইউল—

(ক) কলিকাতায় ex-Viceroy Lord Dufferin-এর 'Scotch

Dinner'-এর বক্তৃতার কঠোর সমালোচনা করিয়া বলিলেন, সীমান্ত প্রদেশ ('Frontier') ও বর্ম্মার উপদ্রবের জন্য তিনি (লর্ড ডাফ্‌রিন্) ভারতবাসীর হিতার্থে শাসনকার্য্যে সম্যক মনোযোগ দিতে পারেন নাই।

আমরা দেখিয়াছি, কংগ্রেসের জন্মের পূর্ব্ব বৎসর (১৮৮৪ খৃঃ) 'কংগ্রেসের জনক' বলিয়া আখ্যাত, মিঃ হিউম, লর্ড ডাফ্‌রিনের সহিত কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্পর্কে পরামর্শ করিয়াছিলেন।

(খ) সভাপতি মিঃ ইউল বলিলেন যে, ঈশ্বর যদি ভারতবর্ষের ভাগ্যকে ইংরেজ জাতির হস্তে অর্পণ করিয়া থাকেন, তবে ইংরেজ জাতি পুনরায় উহা ঈশ্বরের হস্তেই ফিরাইয়া দিয়াছে (হাস্যধ্বনি)।—"The 650 odd Members (of Parliament), who were to be the palladium of India's rights and liberties, have thrown 'the great and solemn trust of an inscrutable Providence' back upon the hands of the Providence to be looked after, as Providence itself thinks best" (*Laughter*).

মিঃ ইউলের আগে এবং পরে (W. C. Bannerjee—Dadabhai Naoroji—Sir Pherozeshah Mehta প্রভৃতি) এই 'inscrutable Providence'-এর উপর বিশ্বাস করিয়াছেন। কিন্তু ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লালমোহন ঘোষ মাদ্রাজ কংগ্রেসে এই 'Providence'-এর যুক্তিকে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। লালমোহন ঘোষের পূর্ব্বে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, অরবিন্দও এই 'inscrutable Providence'-এর যুক্তিকে বিল্‌কুল্ বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

এই বৎসর ১৮ই এপ্রিল Parnell-এর জাল সহিসহ এক চিঠি Times পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঐ চিঠিতে Phoenix Park-এর হত্যা সম্পর্কে তাঁহার হানুভূতিসূচক মনোভাবের জন্য এখন তিনি অনুতাপ করিতেছেন—এইরূপ লেখা থাকে। প্রকারান্তরে এই পত্রের মর্ম্মে Parnell যেন Phoenix Park-হত্যার সঙ্গে নিজের স্বীকারোক্তিতে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিতেছেন। কিন্তু এই চিঠি Parnell-এর লেখা কি-না, সে-বিষয়ে সন্দেহ হওয়ায় Gladstone একটি

Select Committee দ্বারা সত্য কি মিথ্যা অনুসন্ধান করিবার প্রস্তাব করেন। Parnell এই প্রস্তাবে সম্মত হ'ন। কিন্তু Government কি ভাবিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। পরে জানা গিয়াছে যে, Pigott নামে এক ব্যক্তি ঐ পত্র জাল করিয়াছিল। Gladstone এই ক্ষেত্রে Parnellকে আনুকূল্য করিলেন—স্পষ্টই দেখা গেল।

বয়স আঠার বৎসর (১৮৮৯।১৫ই আগষ্ট—১৮৯০।১৪ই আগষ্ট):

স্ত্রীর পত্রে 'আঠার বৎসর': অরবিন্দ ১৯০৬-এর ৩০শে আগষ্ট, তাঁহার স্ত্রীকে পত্রে লিখিয়াছিলেন যে—তাঁহার জীবনে 'চৌদ্দ বৎসর বয়সে' যে বীজ 'অঙ্কুরিত' হয়, 'আঠার বৎসর বয়সে তাহার প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল'। সুতরাং এই বৎসরটি তাঁহার জীবনের একটি অতি স্মরণীয় বৎসর। কোন ঘটনা তাঁহার মনে একটা দৃঢ় সংকল্প আনিয়া দিয়াছিল—তাহার এক অনুমান ভিন্ন আর কোনও উল্লেখযোগ্য প্রমাণ দিতে পারিতেছি না। অবশ্য, অনুমানও প্রমাণের একটা অঙ্গ।

অরবিন্দ পার্ণেল-সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইতেছেন ও 'their politics' সরজমিনে উপস্থিত থাকিয়া ওয়াকিবহাল হইতেছেন। বুঝা যায় Parnell-পরিচালিত Ireland-এর স্বাধীনতা-আন্দোলন তাঁহার তরুণ মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়াছিল। এই বৎসরেই তাহার জন্মভূমি ভারতবর্ষকে ইংরাজের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য তিনি কৃতসংকল্প হইলেন। এবং ইংরেজের রাজনীতি-কৌশল ও ধাপ্পাবাজি তাঁহার মনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল Phoenix Park-হত্যার জন্য পার্ণেলকে মিথ্যা করিয়া জড়াইবার যে চেষ্টা, তা ব্যর্থ হওয়ায় ষড়যন্ত্রকারিগণ ('their politics') আবার তাঁহাকে একটা মিথ্যা divorce suitএ (বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলায়) জড়াইবার চেষ্টা করেন। পার্ণেল আগাগোড়াই অসম্ভব রকম স্তব্ধতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

লণ্ডন হইতে কেম্ব্রিজ: এই বৎসর (১৮৯০ খৃঃ) অরবিন্দ St. Paul's School, London হইতে I. C. S. পরীক্ষা দিবার জন্য Cambridgeএ আগমন করেন। তাঁহার ছাত্রজীবনে বিলাত প্রবাসকালে এই কেম্বিজে

সাড়ে-তিন বৎসর অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই কেম্ব্রিজের সাড়ে-তিন বৎসর তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবনের গতি সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে (* ক)।

রাজনারায়ণ বসু ও স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ : ১৮৮৯-এর ২৫-২৬শে ডিসেম্বর, এই দুই তারিখে স্বামীজীকে আমরা দেওঘরে দেখিতে পাই। এই সময়ে তিনি দেওঘরে রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী-সভা'র স্রষ্টা এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা'র সুপ্রসিদ্ধ বক্তা, স্বামী বিবেকানন্দকে পাশ্চাত্যদেশে 'বেদান্ত দর্শনের একেশ্বরবাদ' প্রচার করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩-এর ৩১শে মে তারিখে Chicago অভিমুখে যাত্রা করেন। রাজনারায়ণ বসুর পরিবারে ইহার স্মৃতি এখনও জাগ্রত আছে।

কংগ্রেস : এই বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন বোম্বাই সহরে হয়। সভাপতি —স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ। সভাপতির বক্তব্য প্রধানতঃ এইরূপ :

(১) ইংরাজ-রাজনীতির মহিমাময় বিকাশস্বরূপ কংগ্রেসের জন্মলাভ হইয়াছে (the direct result of the noblest efforts of British statesmanship)।

(২) ইহার উদ্দেশ্য, জাতীয় জীবনের পুনরুদ্ধার এবং দেশের বাস্তব কল্যাণ-সাধন (to revive National life, and to increase the material prosperity of the country); এবং এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক (constitutional) উপায়েই সাধিত হইবে। কিন্তু, লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস "আমাদিগের ঘোরতর বিপক্ষে, এবং সামাজিক ও সরকার-সেবীবৃন্দের মিলিত শক্তিও আমাদিগের প্রতিকূলে। লণ্ডনের সংবাদপত্রগুলিও আমাদের স্বপক্ষে নয়, এবং পার্লামেন্টের যে-কয়জন ইংরেজ সভ্য ভারতবর্ষ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল

(* ক) "From St. Paul's he went up to Cambridge to read for the I. C. S. Examination."—[*Indian Writers on English Verse—p. 122*]

"He had brought himself up amid poverty in Manchester, St. Paul's School in London, and at Cambridge."—[*The New Spirit In India, Nevinson—p. 221*]

আছেন তাঁহারাও সরকারপক্ষেই ঝুকিয়া থাকেন।" ("The India Office is strong against us together with the influences of the services and of society. The London Press is not favourable to us. And those Members of Parliament who have Indian experience rank themselves mostly on the official side.")

(৩) তবে সুখের বিষয় যে, ১৮৮৫ সালে রুশিয়া একবার আক্রমণের হুমকি দেখাইয়াই রীতিমত ভড়কাইয়া গিয়াছে। কেননা ভারতে আশানুরূপ বিদ্রোহী জনজাগরণের সূচনার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। অর্থাৎ, ইংরেজের দুর্ভাগ্যের অবকাশে স্বার্থসুবিধার অন্বেষণ ভারতবর্ষ কোনদিনই করিতে চাহে না। "Russia after a 'pretended advance' in 1885 depended on a hope foı rising of the native population······But India does not treat England's difficulty as her opportunity."

অরবিন্দ এই বৎসর পর্য্যন্ত—তাঁহার স্বীকারোক্তিমতে—কংগ্রেসের পক্ষপাতীই ছিলেন।

বয়স উনিশ বৎসর (১৮৯০।১৫ই আগষ্ট—১৮৯১।১৪ই আগষ্ট) :

এই বৎসর, ১৮৯০-এর ডিসেম্বর মাসে, অরবিন্দের পিতা, অরবিন্দের মাতুল যোগেন বসুকে খুলনা হইতে দেওঘরে একটি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্রখানি অতিশয় দীর্ঘ হইলেও আমরা উহা পাদটীকায় উদ্ধার করিতে বাধ্য হইলাম। কেননা ঐ চিঠিখানিতে অরবিন্দের তৎকালীন জীবনেতিহাসের উপর প্রচুর আলোকপাত হইয়াছে।

এই চিঠি বিশ্লেষণ করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে—

(১) ডাঃ কে. ডি. ঘোষ ১৮৯০-এর ডিসেম্বরে খুলনায় সিভিল সার্জ্জন এবং অরবিন্দের মাতুল যোগেন বসু বৈদ্যনাথ-দেওঘরে আছেন। অরবিন্দের পাগল মাতা বারীন্দ্রকুমার এবং সরোজিনীকে লইয়া রোহিনীতে আছেন। অরবিন্দের মাতা অতিশয় উন্মাদগ্রস্তা (* ক)। বারীন্দ্র ও সরোজিনীকে

(* ক) "একটা পাগল বামুন মাঝে মাঝে আসতো ভিক্ষা করতে, তাকে

তাহাদের পাগল মায়ের কাছ হইতে সরাইয়া আনিবার জন্য ডাঃ কে. ডি.

মা দিতেন দিদিকে ধরে আনতে লেলিয়ে। দাড়োয়া নদীর বাঁক থেকে, মাঠের মধ্যে থেকে—এমনিতর আধ পথের কত না জায়গা থেকে পাগলটা আনতো দিদির চুলের মুঠি ধরে।”—[আমার আত্মকথা, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—পৃঃ ৩০]

“আমাদের বাড়ীতে জনমানুষ কখনও আসতো না, সে অঞ্চলে প্রসিদ্ধ পাগলী মেমসাহেবের ভয়ে ও-বাড়ীর ত্রিসীমানায় কাউকে ঢুকবার সাহস রাখতে দেখিনি। মা মাঝে মাঝে রেগে উগ্রচণ্ডী হয়ে থাকতেন; তখন বাড়ীর হাতার মধ্যে অপরিচিত মানুষ দেখলে চীৎকার করে গালাগাল দিতেন, ছোরা দেখাতেন, দরকার হ'লে তাড়াও করতেন। তারা তখন প্রাণ ভয়ে পালাতে পথ পেতো না।”—[ঐ—পৃঃ ৩৬]

“আমার বেশ মনে আছে তখন শীতকাল, বোধ হয় অগ্রহায়ণ কি পৌষ মাস। ......হঠাৎ একটা গুণ্ডাকসমের গাঁট্টাগোট্টা মানুষ এসে মাকে বললো, 'মেম সাহেব, ফুল লেগা।' সে এক কোঁচড় ফুল মায়ের সামনে ঝপ করে ছুঁড়ে দিয়ে আমার দু হাত চেপে ধরলো, তারপর আমাকে টানতে টানতে নিয়ে দে দৌড়! পিছনে পিছনে রৈ রৈ রবে হল্লা করতে করতে ছুটলো আরও দশ বার জন জোয়ান। মা তো রেগে কাঁই, দৌড়ে ভিতরে গিয়ে ছোরা এনে উর্দ্ধশ্বাসে গুণ্ডার পালকে তাড়া! আর মাটিতে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে টানতে টানতে আমাকে নিয়ে গুণ্ডার পালের প্রাণ হাতে করে ছুট।”—[ঐ—পৃঃ ৩৭-৩৮]

“··লেনের একটা দোতলা বাড়ীতে নিয়ে ওরা আমায় তুললো। ···নীচে ছুটে এসে আমায় কোলে করে নিলেন এতক্ষণের রহস্যে ঘেরা রাঙ্গা মা।

“দীর্ঘছন্দ সবল সুঠাম দেহ, অপূর্ব্ব রূপ সারা যৌবন-সুঠাম অঙ্গ বয়ে ঝরে পড়ছে। বয়স আন্দাজ ১৮।১৯—অন্ততঃ এখন তাই মনে হয়। আমার জরাজীর্ণ শতছিদ্র কাপড় ছাড়িয়ে মা আমায় গরম জলের গামলায় ফেলে সাবান ও স্পঞ্জ দিয়ে মুছে তুললেন, ধোয়া কাপড় পরিয়ে বুকে চেপে ধরে সে কি আদরের ঘটা। সন্তানহীনা সেই বালিকার প্রাণ হৃদয় মন সব অন্তরটুকু আমি এক মুহূর্ত্তে হরণ করে নিয়েছিলুম। দিদি এসে মুখটি চূণ করে সামনে দাঁড়াল। রাঙ্গা মায়ের সঙ্গে দিদির আমার বনতো না, চির-অভিমানিনী সহজে-কোপনা দিদির সঙ্গে কারই বা তখন বনতো।

“এই···গলির বাড়ীটি দিয়ে আরম্ভ হোলো আমার কলকাতার জীবন।”—[ঐ—পৃঃ ৩৯-৪০]

“রোহিণীর বাড়ীতে শুধু একবারমাত্র বাবা এসেছিলেন বলে আমার মনে আছে। একদিন আমি ও দিদি বাইরে খেলা করছি, কে একজন হোমরা চোমরা গোছের মানুষ এলো। ভিতরে যখন আমাদের ডাক পড়লো তখন

ঘোষ দেওঘরে যোগেন বসুকে অনুরোধ করিতেছেন ও টাকা পাঠাই-তেছেন (* খ)।

আমার এইটুকু মনে আছে যে, লম্বা দাড়ীওয়ালা ভীষণদর্শন কার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমি আর দিদি সারা ঘরটার দেয়ালের ধারে ধারে ছুটোছুটী করছি আর সেই মানুষটি দুই হাত বাড়িয়ে আমাদের বুকে নেবার জন্যে পাগলের মত আসছে। তারপর অজস্র খেলনা বিস্কুটের রমণীয় স্তূপের মাঝে কখন যেন আমাদের আত্মসমর্পণের পালা সুখের সিন্দুর দোল আহা! সে বাবা এখন তাঁর শ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল ছেলেকে ভুলে কোথায় যে গেল!" —[আত্মকথা, বারীন্দ্রকুমার—পৃঃ ৩১]

"মাসের মধ্যে দু' একবার বাবা আসতেন আর ২।৪ দিন থেকে চলে যেতেন। কলকাতায় থাকার সময় তাঁর সঙ্গে আমরা যেতুম গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে খোলা ফিটনে বসে; এই সময়টির জন্য আমার tip-top সাহেব বাবার পাশে মা বসতেন বুক-খোলা গাউন পরে নানা ফুল-ফলে ভরা লেডিজ হ্যাট মাথায় দিয়ে রুমাল হাতে। সে বেশেও রূপসী মা আমার গড়ের মাঠ ও ইডেন গার্ডেন আলো করে চলতেন তাঁর সম্রাজ্ঞীর বাড়া লাবণ্যে ও শ্রী-গরিমায়। এই মা যে কে, কোথা থেকে এসে কবে আমার বাবার শূন্য জীবন সুখের প্লাবনে ভরে দিয়ে তাঁর ভাঙ্গা সংসার আবার গড়ে তুলেছিলেন তা অনেকদিন আমি জানতুম না।··মা কি জিনিষ তা আমি শৈশব ভরে কখনও জানি নি। এই অজানা রাঙ্গা মা আমার সে আস্বাদ আমায় প্রথম দেন।···

"দু' তিন মাস পরে একবার করে আমরাও যেতুম খুলনায় বাবার কর্ম্মস্থলে। সে খড়ের ছাওয়া বাড়ীখানি ছবির মত এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। ···ভিতরে বড় হল ঘর, তাতে ডিনার টেবিল।···প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের মধ্যে এই বাড়ীখানি। দূরে বাবুর্চিখানা, ঘোড়ার আস্তাবল, মুরগী হাঁসের ঘর, গোশালা।" —[ঐ—পৃঃ ৪৬-৪৭]

"এই সময় জীবনের এই দু' বছরে দেখেছি মায়ের সে কি আ প্রাণ চেষ্টা বাবাকে মদ ছাড়াতে, সুপথে আনতে। কলকাতা থেকে না বলে কয়ে হঠাৎ খুলনার বাড়ীতে এসে পড়তেন বাবার নৈতিক অনাচার ধরবার জন্যে। এই দৃপ্তা গরীয়সী মেয়েটির পদ্ম চোখের ভ্রূকুটি আর অশ্রুকে বাবা যে কি মর্ম্মান্তিক ভয়টা করতেন তা ছিল একটা দেখবার জিনিষ। খুলনায় মা থাকলে বাবার হুইস্কির বোতল থাকতো মায়ের কাছে, অনেক কাকুতি মিনতি করে ভিক্ষাস্বরূপ দিনে এক আধ পেগ পেতেন।"—[ঐ—পৃঃ ৬০]

(* খ) *Khulna, Dec. 2, 1890.*

My Dear Jogen,

I got two letters from you last month and one from

(২) ডা: কে. ডি. ঘোষ বিলাতে অধ্যয়নরত তাঁহার তিন পুত্র সম্পর্কেই অত্যন্ত উচ্চ আশা পোষণ করিতেছেন। বিশেষত: অরবিন্দ সম্পর্কে

---

father enclosing three scraps from *Swarna*. But did not reply to any of them for reasons which require a long explanation. I din't write in reply to father as I could not forgive myself if anything that slipped from my pen or tongue offended him. I lost my father when I was first 12 years old and I went to the length of offending a dear mother by marrying, as I did, to get such a father as Rajnarain Bose. It is true, circumstances, over which neither he nor I had a control, made me lose even him. But I would sooner cut my tongue off than offend him by any word. Yet you know I am not a child. I understand the responsibility of my own actions. If ever I knew what it is to procreate children, I am sure, I could not have mustered courage enough to marry. You are no doubt aware that it is said in the old Testament that God said : "Go and Multiply". Of course, those words are put into the mouth of God by Moses. But that 'great mind' intended simply to explain a Natural Law in that manner. As far as my reading goes, I think that Darwin was an addendum to Moses. Moses said that: Go and multiply. Darwin said: "Mind, only the fittest of those you multiply will survive". Now turn and twist the principles of ethics as you like. Even your devotion to an Almighty God will not justify your procreating beasts or idiots. Look how far-reaching the consequences will be. You will not only be the progenitor of one beast or one idiot, but, by their natural passions, you will multiply their kind to infinity. If brutes by 'instinctive' selection improve the breed, should man, who has reached the age of reason so far, forget himself as to procreate a species behind his own ? The two maxims I have followed in my life, and they have been my ethics and religion, are: to improve my species by giving to the world children of a better breed of my own, and to improve the children of those who have not the power of doing it themsel-

বলিতেছেন যে—"অরবিন্দ ভবিষ্যতে তাঁহার নিপুণ শাসনকার্য দ্বারা

ves. That is what I call devotion, not attained by empty prayers which means inaction and worship of a god of your own creation. A real god is God's creation, and when I worship that by action I worship Him. It is easy to propound a plausible theory, but it is difficult to act in a world where you are hampered by a stupid public opinion and stereotyped notions of religion and morality. My life's mission has been to fight against all these stereotyped notions. God Almighty has strewn thorns in my way, and I am ready to fight against His will. The three sons I have produced I have made giants of them. I may not, but you will, live to be proud of three nephews who will adorn your country [*Father's Prophecy :* "*Ara*, I hope, will yet glorify his country by a brilliant administration. I shall not live to see it········"] and shed lustre to your name. Who knows what the next generation will achieve, and if I can make three products of mine to take the lead in that achievement, what more can I expect in the action of a lifetime. *Beno* will be his 'father' in every line of action—self-sacrificing but limited in his sphere of action. *Mano* will combine the feelings of his father, the grand ambitions of a cosmopolitan spirit that hate and abhor angle and corner feelings with the poetry of his (great) grandfather Rajnarain Bose. *Ara*, I hope, will yet glorify his country by a brilliant administration. I shall not live to see it, but remember this letter if you do. I tell you what Oscar Browning, the great son of the great father, said to him when he was at tea with one of the dons of his college (he is at King's College, Cambridge now, borne there by his own ability) : "I have been examiner for scholarships for 13 years and during that time there was not presented papers [Baffled By The Son—*so wrote his father, Dr. K. D. Ghose, then Civil Surgeon at Khulna in 1890 when Aurobindo was studying at Cambridge*] like yours, and your essay was excellent."

This essay was a reckless product—a comparison of

ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করিবে।" এবং অরবিন্দ যে একখানি চিঠি

Shakespeare and Milton. Here I will give you Arabindo's own words ; it may be tiresome to you, but it may break the monotony of your rural life there:

"Last night I was invited to coffee with one of the dons and in his rooms I met the great O. B., otherwise Oscar Browning who is the feature *par excellence* of King's. He was extremely flattering (and) passing from the subject of cotillons to that of scholarship; he said to me, 'I suppose you know you passed an extraordinarily high examination. I have examined papers at thirteen examinations and I have never during that time examined such excellent papers as yours (meaning my classical papers at that examination). As for your essay, it was wonderful.' (In this essay, a comparison between Shakespeare and Milton,) I indulged in my Oriental tastes to the top of their bent ; it overflowed with rich and tropical imagery ; it abounded in antithesis and epigrams and it expressed my real feelings without restraint or reservation. I thought myself that it was the best thing I had ever done, but at school it would have been condemned as extraordinarily Asiatic and bombastic. The great O. B. afterwards asked me where my rooms were and when I had answered he said, 'That wretched hole' ; (and) then turning to Mahaffy, 'How rude we are to our scholars ! We get great minds to come down here and then shut them up in that box. I suppose it is to keep their pride down'."

My dear brother, do tell me, shall you not be proud of such a nephew ? I have sacrificed my all to produce him and no less ones, and do you not think that you should feel it your duty to produce another ornament to your country ? If the future is to be judged by the past, you can depend upon it that you shall have no reason to rue the day that you separated a product of my brain from your sister for your country's sake. Poor *Swarna*, decrepit in health as she is, I have recovered from at least an untimely grave. Do-

তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছিলেন, সেই চিঠির কিয়দংশ অরবিন্দের পিতা do, do if you can save a boy (*Barin*—the youngest) who may yet be the grandest nephew that you could boast of. Why sacrifice the living for the dead ? Your sister is dead to the world, to all who have sacrificed anything for her sake. Now shall you sacrifice a boy, who, in your opinion, is brilliant and may be the means of doing good to the world, for the sake of a brother's feeling towards a sister ? I have sisters, and I can sympathise with you ; but your sister's son is your own flesh and blood, and what feeling it is that will enable you to sacrifice one whose claim to posterity is greater than that of those who have lost their usefulness ?

DEC. 4.

Since writing···I got a severe attack of fever. I also got your letter. I have sent my friend Babee Chintamoney Bhanja. He will hand over a C. note of Rs. 500/- to you to quiet down urgent creditors. This will be my last remittance if *Barin* is not sent, and I will wash my hands of the matter for you after this. You know very well that I cannot bring *Swarna* to me, having to work for the livelihood of a horde of people and the education of my sons and daughter. Those whims and mad fits I have satisfied for years and spent no less than Rs. 2600/-, quite a fortune in doing so. I am no longer young and able to undergo all trouble and privations for anything in this world.

Do all you can. I have sent my friend depending on your promise of serving me. He will go well-armed to steal the boy away if that were possible, and in that you must not resist. The father has absolute right over his children, so the police cannot interfere when they are commissioned by me.

Believe me. *Yours affly,*

(Sd/-) *K. D. Ghose.*

এই চিঠিখানি আমার বন্ধু, 'দেশবন্ধু-স্মৃতি' লেখক ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় আমাকে দিয়াছেন। এই চিঠিখানি পাওয়ার জন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। কেননা ইহা একটি নূতন আবিষ্কার।

অরবিন্দের মাতুলকে লিখিয়া জানাইতেছেন। অরবিন্দের পরীক্ষক অস্কার ব্রাউনিং (Oscar Browning) অরবিন্দের পরীক্ষা-পত্রের যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা অরবিন্দ পিতাকে লিখিয়া জানাইয়াছেন। সম্পূর্ণ চিঠিখানি পড়িলেই তৎকালীন সকল অবস্থা বিশদরূপে জানা যাইবে।

(৩) এই চিঠিতে ডাঃ কে. ডি. ঘোষ তাঁহার নিজের চরিত্র অত্যন্ত নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কে পিতার কোন্ কোন্ গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে কিরূপ পাইয়াছেন তাহাও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। এই চিঠির মধ্যে অরবিন্দের বিলাতে থাকাকালীন একটি অকৃত্রিম ও নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। পিতাপুত্রের মধ্যে যে চিঠিপত্র লেখা হইত, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

অরবিন্দ ও I. C. S. পরীক্ষা : এই বৎসর অরবিন্দ I. C. S. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। 'গ্রীক' ও 'ল্যাটিন্' (Greek and Latin) ভাষায় অরবিন্দ প্রথম স্থান অধিকার করিলেন, এবং তাঁহার সহপাঠী মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌ট্ (Beachcroft) দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন। কে জানিত আলিপুর বোমার মামলায় (১৯০৮-৯ খৃঃ) এই মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌ট্ বিচারকের আসনে উপবিষ্ট হইবেন এবং অরবিন্দ মৃত্যুদণ্ড আশঙ্কা করিয়া কাঠগড়ায় প্রধান আসামীরূপে দণ্ডায়মান হইবেন!

অরবিন্দ কিন্তু ঘোড়ায়-চড়ার পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিলেন না। তাঁহার ভগ্নী শ্রীযুক্তা সরোজিনী ঘোষ আমাদিগকে (১৭।৫।৪০ তারিখে) বলিয়াছেন —"সেজদা তখন তাস খেলিতেছিলেন। তাঁহাকে উঠিবার জন্য তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি আর একটু খেলিয়া উঠিবেন বলিয়া দেরী করিতেছিলেন। তাহার পর যখন তিনি পরীক্ষা দিতে গেলেন তখন সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় আর তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয় নাই।" এই কথা তিনি 'সেজদা' (শ্রীঅরবিন্দ) ও 'মেজদা' (শ্রী মনোমোহন ঘোষ) -এর নিকট শুনিয়াছেন (* গ)।

(* গ) আর একটি বিবরণ এই যে—তিনি পরীক্ষা দিতে উপস্থিতই হইতে পারেন নাই। "...the intervention of a supernatural power which intervened at the last moment and almost physically restrained him from walking out of his room."—[*Life-work of Sri Aurobinda, by Jyotish Chandra Ghose*—*p. 8*]

আমারা পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে, যেহেতু অরবিন্দ দেশে ফিরিয়া ইংরাজের অধীনে চাকরি করিবেন না স্থির করিয়াছেন, স্বতরাং তিনি ইচ্ছা করিয়াই ঘোড়ায়-চড়ার পরীক্ষায় উপস্থিত হন নাই। কেবল তাঁহার পিতার আগ্রহাতিশয্যেই I. C. S. পরীক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ চাকুরি করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

তবে পাদটীকায় যে আর একটি 'দৈব' ঘটনার উল্লেখ আছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতিশয় সীমাবদ্ধ। কাজেই কিছু বলিতে অক্ষম। এবং তজ্জন্য সম্যক দুঃখিত।

কথিত আছে, ডাঃ কে. ডি. ঘোষ অরবিন্দের এই ঘোড়ায়-চড়া পরীক্ষায় ফেলের কথা শুনিয়া এতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে (অরবিন্দকে) অবিলম্বে দেশে ফিরিবার জন্য চিঠি দিয়াছিলেন। এবং ইহার পরে কেমব্রিজে থাকাকালীন আর কোন খরচপত্রও পাঠান নাই। এই কথার সত্যাসত্য আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না।

অরবিন্দ কিন্তু দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি Cambridge-এ Tripos পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলেন (* ঘ)।

বারীন্দ্র ও সরোজিনীর রোহিনী হইতে কলিকাতায় Gomes Laneএ আগমন: ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ কেন বারীন ও সরোজিনীকে তাদের মায়ের নিকট হইতে চুরি করিয়া আনিতেছেন, এবং কেনই বা তাঁহার পাগল স্ত্রীকে কাছে আনিতেছেন না, তার সন্তোষজনক কারণ যোগেন বসুকে বিশদরূপে তাঁহার দীর্ঘ পত্রের শেষভাগে লিখিয়া জানাইয়াছেন। পুত্রকন্যার

(* ঘ) অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা (অরবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রী) শ্রীমতী লতিকা ঘোষ, বি. এ. (কলিকাতা) বি. লিট্. (অক্স্‌ন্), তাঁহার অক্স্‌ফোর্ড (Oxford)-এ প্রদত্ত B. Litt. 'thesis' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"From St. Paul's he (Aurobinda) went up to Cambridge to read for the Indian Civil Service Examination. In 1890, he took the Examination and stood high in order of merit. At the departmental examination, however, he failed in riding and was disqualified from service. Shortly afterwards, he entered King's College, Cambridge, as a scholarship-holder. From King's College he graduated, in 1892, with a first class in the classical tripos."

প্রতি কর্ত্তব্য ও মমত্ববোধের জন্যই তিনি এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নতুবা তাঁহার স্ত্রীকে রোহিনীর মাঠে, বাংলোতে, আয়া-বাবুর্চ্চি দিয়া একা রাখিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার স্ত্রী এতই উন্মাদগ্রস্তা ছিলেন যে, রোহিনী হইতে নিকটে দেওঘরের পুরাণদহে, তাঁহার শ্বশুর রাজনারায়ণ বসুর বাড়ীতে রাখাও সম্ভবপর ছিল না। ("Those whims and mad fits I have satisfied for years and spent no less than Rs 2600, quite a fortune, in doing so. I am no longer young and able to undergo all these trouble and privations for anything in this world.") ডাঃ কে. ডি. ঘোষকে দোষ দেওয়া যায় না। বরং তাঁহার প্রতি সহানুভূতিরই উদ্রেক হয়।

বাবুর্চি-আয়া রাখিয়া রোহিনীর খরচ, ছেলেমেয়ে রাখিবার জন্য Gomes Laneএর খরচ, নিজের থাকিবার জন্য খুলনার খরচ, তিনটি ছেলে বিলাতে আছে তাদের খরচ—একজন সিভিল সার্জেনের পক্ষে এই চারিদিকের খরচ কুলাইয়া উঠা সহজ ব্যাপার নয়। তাছাড়া, তিনি স্বভাবতঃ পরদুঃখকাতর সহজ দাতা ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল লিখিয়াছেন—"But Kristodhone Ghose's purse was always open for his needy relations····· the poor, the widow and the orphan loved him for his selfless pity, and his soulful benevolence."—(*Karmayogin*—August, 1909).

অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা লিখিয়াছেন যে—তাঁহার পিতামহ জীবনের শেষভাগে বাজে কাজে অর্থের অপব্যয় করিয়াছেন এবং সেইজন্য বিলাতে নিয়মিতভাবে পুত্রদের শিক্ষার জন্য টাকা পাঠাইতে পারেন নাই। "···towards the end of his life, squandered all his money on worthless objects with the result that the children in England scarcely ever had regular supplies of money."—(*Indian Writers of English Verse—p. 103*)। পিতা মনোমোহন ঘোষ বিলাতে অর্থকষ্টে পড়িয়াছিলেন, সুতরাং কন্যার দুঃখ ও ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পিতামহের অবস্থাটাও এই সময় বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত ছিল। শ্রীমতী লতিকা ঘোষ এক্ষেত্রে তাঁহার পিতামহের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করিতে পারেন নাই।

ডাঃ কে. ডি. ঘোষ নিজে রোহিনীতে গিয়া স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে দেখিয়াছেন। এবং দেখিয়া বুঝিয়াছেন, বারীন ও সরোজিনীকে সেখানে রাখিলে পড়াশুনা ত হইবেই না, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত সংশয়াপন্ন হইতে পারে। বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন—"অসহ্য ভয়ের ও দুঃখের শোণিত-রেখায় আঁকা শৈশবের এই রোহিনীর জীবন।"—('আত্মকথা'—পৃঃ ৩০)।

ডাঃ কে. ডি. ঘোষ খুলনা হইতে কলিকাতায় গোমেস লেন (Gomes Lane)এ মাঝে মাঝে আসিতেন এবং Gomes Lane হইতে বারীন্দ্রকুমার তাঁহার 'রাঙ্গা-মা'র সঙ্গে খুলনায় পিতার কাছেও যাইতেন। ডাঃ কে. ডি. ঘোষের উপর বারীন্দ্রের 'রাঙ্গা-মা'র খুব প্রভাব ছিল।

ডাঃ ঘোষ Star Theatre-এর একজন 'পেট্রন' ছিলেন। এবং খুলনায় প্রদর্শনী ও উৎসবাদিতে তিনি নিজে টাকা খরচ করিয়া ষ্টার থিয়েটারের দলকে খুলনা নিয়া যাইতেন। তিনি একজন আমীর লোক ছিলেন। বারীন্দ্রকুমার লিখিতেছেন —"বাবার জীবিতকালে কাকাদের, দেওঘরবাসী মাতামহদের ও ন'মেশোমশাই-দের কারুর সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক ছিল না।"—('আত্মকথা'—পৃঃ ১১)।

১৮৯০-এর ডিসেম্বরশেষে, অথবা ১৮৯১-এর জানুয়ারীর প্রথমে বারীন্দ্রকুমার ও সরোজিনী রোহিনী হইতে কলিকাতায় গোমেস লেনে স্থানান্তরিত হন। তখন বারীন্দ্রের বয়স ১১ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

কংগ্রেস: ১৮৯০-এর ডিসেম্বরমাসে কংগ্রেস হয় কলিকাতায়। সভাপতি —ফিরোজ শা' মেহেতা। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ। অরবিন্দের জীবনী-আলোচনায় এই কংগ্রেসের গুরুত্ব খুব বেশী। কেননা, এই বৎসর হইতেই কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর (১৮৮৯ খৃঃ) পর্য্যন্ত, অর্থাৎ কংগ্রেসের জন্মবৎসর (১৮৮৫ খৃঃ) হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত, তিনি কংগ্রেসের পক্ষপাতী ছিলেন। এইবার (ষষ্ঠ বৎসর) হইতে তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মারণাস্ত্র হস্তে গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি স্যার ফিরোজ শা' মেহেতাকে তিনি বিলাত হইতে বরোদায় ফিরিয়া মাত্র চার মাস পরেই ('New Lamps for Old' —*Induprakash* ১৮৯৩। আগষ্ট) এই বক্তৃতার জন্য ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, অরবিন্দের পিতৃবন্ধু, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষকেও তিনি রেহাই দেন নাই।

স্তার ফিরোজ শা' মেহেতা এই বলিয়া আরম্ভ করিলেন: পার্সীরা কি ভারতবাসী নহে? (Are Parsis not Indians?) মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে পার্সীরা ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, সুতরাং মুসলমানেরা যদি ভারতবাসী হয় তবে পার্সীদের ভারতবাসী হইবার দাবী আরও শক্তিশালী। মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে কিছুটা বিরোধ থাকা সত্ত্বেও তাহারা এক শাসনের অধীনে বাস করিয়া এক জাতীয়ত্ব দাবী করিতে পারে। কংগ্রেসের শিক্ষিত সভ্যেরা অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ শাসন-সংস্কার দাবী করিতে পারে। কেননা, ইতিহাস—বিশেষতঃ ইংলণ্ডের ইতিহাস—আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষাই দেয়।

তারপর, তিনি কংগ্রেসের জন্মদাতা হিউম্ সাহেবের (Mr. Hume) প্রশংসা করিলেন, সুরেন্দ্র ব্যানার্জির অপূর্ব্ব বাগ্মীতার অজস্র প্রশংসা করিলেন ("the rare and unrivalled powers of oratory—which we have learned to admire in Mr. Surendranath Banerjee ···when he was pleading the cause of his countrymen at the bar of the English people"), দাদাভাই নৌরজীর প্রশংসা করিলেন এবং পরিশেষে একটি ইংরাজি কবিতা পাঠ করিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন।

বিসমার্কের পদচ্যুতি: এই বৎসরে বিস্মার্কের (Bismarck) পদচ্যুতি ঘটে। ইয়োরোপের আকাশে মধ্যাহ্নের সূর্য্য যেন সহসা নিভিয়া গেল। তরুণ জার্ম্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম বিস্মার্ককে প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করেন। সেদিনের ইয়োরোপের জার্ম্মান সাম্রাজ্যের ঐক্য-প্রতিষ্ঠাতা কুশাগ্র-বুদ্ধি, ধুরন্ধর বিস্মার্ক অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং অপরাজেয় কুটনীতিবিদ্‌রূপে পরিচিত ছিলেন। অরবিন্দ নিশ্চয়ই এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যু: এদিকে বাংলাদেশে ১৩ই শ্রাবণ (1891, 29th July) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেহত্যাগ করিলেন।

> "সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
> তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।
> নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে এলে দয়ার অবতার!
> কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একটিবার।"
>
> —(সত্যেন দত্ত)

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুসংবাদ বিলাতের বাঙ্গালী ছাত্রমহলে নিশ্চয়ই গিয়া

পৌঁছিয়াছিল। অরবিন্দ নিশ্চয়ই এ সংবাদ শুনিয়া থাকিবেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে—"বিধাতা যখন সাতকোটী বাঙ্গালী তৈরী করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভুলিয়া একজন মানুষ তৈরী করিয়া ফেলিলেন।" রাজা রামমোহনের পরে এতবড় পুরুষসিংহ আর দেখা যায় না।

বয়স কুড়ি বৎসর (১৮৯১। ১৫ই আগষ্ট—১৮৯২। ১৪ই আগষ্ট) :

পার্ণেলের মৃত্যু ও অরবিন্দের কবিতা : অরবিন্দ আগাগোড়াই পার্ণেলের গুণমুগ্ধ—পার্ণেলের দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবান্বিত। যদি তুলনা করা যায়, তবে বলিতে হয় যে—Miss Margaret Elizabeth Noble (ভগ্নী নিবেদিতা) যেমন এই সময়ে লণ্ডনে প্রিন্স্ ক্রোপট্‌কিনের (Prince Kropotkine) দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, অরবিন্দও তেমনি কেম্বি্জে বসিয়া আয়র্ল্যাণ্ডের এই মহান্ নেতা পার্ণেলের দ্বারা প্রায় একই সময়ে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। এই বৎসর পার্ণেলের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর, অরবিন্দ তৎক্ষণাৎ এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন।

CHARLES STEWART PARNELL

(1891)

O pale and guiding light, now
star unsphered,
Deliverer lately hailed, since by
our lords
Most feared, most hated, hated
because feared,
Who smot'st them with an edge
surpassing swords !
Thou too wert then a child of
tragic earth,
Since vainly filled thy luminous
doom of birth.

—*Aurobindo Ghose.*

অরবিন্দকে Parnell কতখানি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, এই কবিতাটি পড়িয়াই তাহা বুঝা যায়। কবিতাটি মাত্র ছয় ছত্রের, কিন্তু আগুনে ভরা। আমরা আরও একটা জিনিষ দেখিতে পাইলাম যে, অরবিন্দ কবিতার মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিলেন। এবং এই কবিত্ব প্রকাশের মধ্যে স্বাধীনতা-আন্দোলনের বীর-পুরুষকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পনে বুঝিলাম যে, তিনিও একজন স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনকারীদিগের শ্রেণীভুক্ত তরুণ যুবক। কবি ও দেশপ্রেমিক—এই দুইটি ভাবের মধ্য দিয়া আমরা তাঁহার জীবনের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইলাম।

কংগ্রেস : ১৮৯১-এর ডিসেম্বরে কংগ্রেস হয় নাগপুরে। সভাপতি—মিঃ পি. আনন্দ চার্লু। এইবারকার কংগ্রেসেও অরবিন্দের জীবনী আলোচনার প্রয়োজন। কেননা, সভাপতি আনন্দ চার্লু মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় প্রমান করিবেন যে, ভারতবাসীরা এক জাতি এবং কংগ্রেস এই জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—কংগ্রেস এই জাতীয়তার প্রতিমূর্ত্তি।

অরবিন্দ সভাপতি মহাশয়ের এই মন্তব্যের প্রতিবাদ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে করিবেন। কংগ্রেসের এই জাতীয়তাবাদ বিল্‌কুল্‌ ঝুটা, মেকি—বলিয়া অরবিন্দ প্রতিপন্ন করিবেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থাৎ এই কংগ্রেস-মঞ্চে এক জাতি—কেননা, "Citizens of one country, subordinate to one power, subject to one supreme Legislature, taxed by one authority, influenced for weal or woe by one system of administration, urged by like impulses to secure like rights and to be relieved of like burdens". গত বৎসর স্যার ফিরোজ শা' মেহেতা এই কথাই বলিয়াছিলেন।

অরবিন্দ ও কেম্ব্রিজে 'ট্রাইপস্‌' পরীক্ষা : আমরা শ্রীমতী লতিকা ঘোষের গ্রন্থ হইতে পাই যে, অরবিন্দ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজে ট্রাইপস্‌ (tripos) পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি যে ৪০ পাউণ্ড স্কলারশিপ পাইয়াছিলেন, তাহা দ্বারাই পড়ার খরচ নিজেই বহন করিতেছিলেন। আমরা আরও একটা কথা শুনিয়াছি যে, তিনি প্রথমস্থান অধিকার করিয়া পাশ করিলেও ডিগ্রী লন নাই। যদি ইহা সত্য হয়, তবে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কেননা, যিনি I. C. S. পরীক্ষায় চতুর্থস্থান অধিকার করিয়া,

এবং Latin ও Greekএ প্রথমস্থান অধিকার করিয়া ইচ্ছা করিয়া ঘোড়ায়-চড়ার পরীক্ষা দিলেন না—না-দিয়া ফেল্ করিলেন—তাঁহার পক্ষে ডিগ্রী না-লওয়া তুচ্ছ কথা।

অরবিন্দ নীরব মানুষ। কিন্তু এই নির্ব্বাক যুবকের সংকল্প কত দৃঢ়, ভাবিলে বিস্মিত না-হইয়া পারা যায় না।

কেম্ব্রিজ 'মজলিশ' ও অরবিন্দ: অরবিন্দের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ ঘোষ ১৯৪১-এর জানুয়ারী মাসে আমাদের জানাইয়াছেন যে—

(ক) অরবিন্দ কেম্ব্রিজ থাকাকালীন সেইখানেই চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

(খ) ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ দাদাভাই নৌরোজীর নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে, দাদাভাই নৌরোজীর পক্ষে বক্তৃতাদি করেন এবং অন্যান্য কার্য্য করেন।

(গ) কেম্ব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের একটা 'মজলিশ' ছিল। অরবিন্দ সেই মজলিশে ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্পের্ক কতকগুলি গরম গরম বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্পর্কে অরবিন্দের আগ্রহ কেম্ব্রিজে থাকার সময়ই দেখা যায়। India Society সেই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপ্লবাত্মক বোমা নিক্ষেপাদির কল্পনা সেই সময় হইতেই আইসে।

এই সম্পর্কে মিঃ বিনয়ভূষণ ঘোষকে কতকগুলি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠান হইয়াছিল। ঐসকল প্রশ্নের উত্তর (১৯৪১-এর জানুয়ারীশেষার্দ্ধে) যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবিকল উদ্ধৃত করা গেল: Q.—Give all you know of Arabindo Ghose's life at Cambridge—(i) His growing interest in politics, both Indian and English ? (ii) Did any idea of actively serving India politically take form in his mind during this period ? (iii) He helped in the election of some Indian M. P.—what do you know about this ?

A—(i) Indians had a Debating Society at Cambridge called 'Cambridge Mejlis'. He took an active part in that. He met *Mr. C. R. Das* at Cambridge.

(ii) In the Mejlis he made a number of ***strong speeches,***

specially *about India.* That showed his interest. At that time India Society was started. *The idea of terrorist activity (Bombing) came at that time.*

(iii) Probably *Dadabhai Naoroji.*

অরবিন্দের জীবন সম্পর্কে এই সকল নূতন কথা জানিতে পারিয়া আমরা বিনয়ভূষণ ঘোষের নিকট কৃতজ্ঞ।

দেখা যাইতেছে যে, কেম্ব্রিজে থাকাকালে অরবিন্দ (১৮৯১-৯২ খৃঃ) ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্পর্কে শুধু গরম গরম বক্তৃতাই করেন নাই, পরন্তু "The idea of terrorist activity (bombing) came at that time." তিনি এই মজলিশের সম্পাদক হইয়াছিলেন।

LOTUS & DAGGER গুপ্তসমিতি : আরও একটি সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, এই সময় 'Lotus & Dagger' নামে ভারতীয়দের একটি গুপ্তসমিতি তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লণ্ডনেও এই সমিতির শাখা ছিল। এই গুপ্তসমিতির উদ্দেশ্য ছিল কোনও সশস্ত্র উপায়ে ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজকে তাড়াইয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা।

সুতরাং কেম্ব্রিজে থাকাকালীন এই সকল গুপ্তসমিতির কার্য্যে যিনি ব্যাপৃত, তিনি ইংরাজের অধীনে চাকরি লইয়া দেশে ফিরতে পারেন না। এবং কংগ্রেসের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে লাভ করিবার কথাও ভাবিতে পারেন না।

পার্লামেণ্টে দাদাভাই নৌরোজীর নির্ব্বাচন : আমরা অরবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়ভূষণ ঘোষের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি যে—

(ক) অরবিন্দ দাদাভাই-এর নির্ব্বাচন-ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(খ) I. C. S. পরীক্ষার্থী চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত কেম্ব্রিজে অরবিন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন : ১৮৯০ খৃষ্টাব্দেই 'দেশবন্ধু' চিত্তরঞ্জন দাশ I. C. S. পরীক্ষা দিতে 'রেভেনালি' জাহাজে চড়িয়া বিলাতে গিয়া উপনীত হন এবং লণ্ডনে অবস্থান করেন। এবং জানা যাইতেছে যে, উভয়ের দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল।

দাদাভাই নৌরোজী Parliamentএ নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইলেন। Lord Salisbury 'that black man of India' বলিয়া দাদাভাই নৌরোজীর প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাইয়াছিলেন। I. C. S. পরীক্ষার্থী যুবক চিত্তরঞ্জন আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি Salisburyকে পাল্টা বক্তৃতায় এই জাতীয় অপমানের প্রতিবাদ করিলেন। Gladstone-এর সভাপতিত্বে যুবক চিত্তরঞ্জন ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিলেন। তিনি আরও বক্তৃতা দেন। ইংলণ্ড তরবারি দ্বারা ভারতবর্ষকে জয় করিয়াছে এবং তরবারি দ্বারাই রক্ষা করিবে—James Maclean-এর এই 'sword theory'র বিরুদ্ধে তিনি প্রচণ্ড বক্তৃতা করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"England, gentlemen, did no such thing"—এবং এই রকম কথা বলা—"is absolutely base and quite unworthy of an Englishman." চিত্তরঞ্জনেরও প্রথম প্রকাশ—প্রথম আরাব ভবিষ্যৎ বিষাণ ফুৎকারের পূর্ব্বাভাষ আমরা শুনিতে পাইলাম।

ভারতসচিবের নিকট এই কারণে চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে রিপোর্ট ছিল; এবং সম্ভবতঃ এই কারণে I. C. S. পরীক্ষায়, তিনি নিজে বলিয়াছেন "I headed the list of unsuccessfuls.":

কি অদ্ভুত কাণ্ড! কি অরবিন্দ, কি চিত্তরঞ্জন—দুইজনই দুইটি বিভিন্ন কারণে I. C. S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। এই বৎসর মিঃ গ্লাড্‌ষ্টোন (Mr. Gladstone) ৪র্থ বার ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হইলেন।

বয়স একুশ বৎসর (১৮৯২।১৫ই আগষ্ট—১৮৯৩। মার্চ):

অরবিন্দ ও বরোদার মহারাজ গায়েকবাড়: বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন—"ভারতে জনপ্রিয় স্যার হেনরী কটন ছিলেন দাদাবাবু রাজনারায়ণ বসুর বিশেষ বন্ধু। বড়দা তাঁর ছেলে জেম্‌স্ কটনের কাছে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে যান; জেম্‌স্ কটন তাঁকে গায়কবাড়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় গায়েকবাড় তাঁকে প্রাইভেট সেক্রেটারী করে দেশে নিয়ে আসেন।"—(বারীন্দ্রকুমার, 'আত্মকথা'—পৃঃ ১৯-২০)।

অরবিন্দের সহিত গায়েকবাড়ের প্রথমসাক্ষাৎ লণ্ডনে হয় বলিয়া শোনা যায়। প্রথমসাক্ষাতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। বরোদার তরুণ গায়েকবাড় অরবিন্দকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার শৈশব হইতে

দীর্ঘ ১৩ বৎসরের বিলাত প্রবাসের বিচিত্র ইতিহাস, তাঁহার I. C. S. পরীক্ষায় পাশ, কেম্‌ব্রিজে 'tripos' পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার,—ইয়োরোপের ছয়টি ভাষায় সুপণ্ডিত, ভারতের মুক্তিসাধনার জন্য অবিচল দৃঢ়তা, সাহেবীয়ানা-বর্জিত এই নীরব প্রতিভাবান যুবক প্রথমসাক্ষাতেই বরোদার তরুণ মহারাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

তারপরে, গায়েকবাড় পড়িবার জন্য কেমব্রিজে আসিলেন। এক বৎসরের কিছু অল্পকাল গায়েকবাড় কেম্‌ব্রিজে পাঠ করিয়াছিলেন। সেই সময় অরবিন্দ গায়েকবাড়ের শিক্ষক এবং প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন।

ঘোড়ায়-চড়া পরীক্ষায় ফেল হওয়ার পর অরবিন্দের পিতা অরবিন্দকে আর কোন খরচপত্র পাঠান নাই বলিয়া শোনা যায়। ৪০ পাউণ্ড (£ 40) স্কলারশিপ পাইয়া অরবিন্দ কেম্‌ব্রিজে 'ট্রাইপস্' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এখন গায়েকবাড়ের শিক্ষকতা করিয়া ভারতে ফিরিবার পূর্ব্বে নিজের খরচ-পত্র নিজেই বহন করিলেন। দেশে ফিরিতে অরবিন্দের আর মাত্র ৭ মাস বাকি। গায়েকবাড়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও শিক্ষক এবং বন্ধু হইয়া তিনি ১৮৯৩-এর মার্চ মাসে সোজা মহারাজের সঙ্গে দীর্ঘ ১৪ বৎসর পর বরোদায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ইংলণ্ডে শিক্ষা সমাপনান্তে বরোদার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ—অরবিন্দের জীবনে এ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইহা বরোদায় পরবর্ত্তী ১৪ বৎসরে অরবিন্দের জীবন ও তাঁহার কার্যাবলী সম্ভব করিয়াছে।

কংগ্রেস : ১৮৯২-এর ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস হয় এলাহাবাদে। সভাপতি—ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি (W. C. Bannerjee)। অরবিন্দের বিলাত প্রবাসের এই শেষ বৎসর। অরবিন্দ কেম্‌ব্রিজে থাকিয়া ভারতের কংগ্রেসের কার্যাবলী অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত নিরীক্ষণ করিলেন। অরবিন্দের পরবর্ত্তী জীবনে এই কংগ্রেস এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা, বরোদায় ফিরিয়া মাত্র ৪ মাস পরেই (১৮৯৩, ৭ই আগষ্ট) কংগ্রেসকে প্রচণ্ডবিক্রমে আক্রমণ করিবেন। তাঁহার আক্রমণের বিষয়বস্তু হইবে প্রধানতঃ ১৮৯০ খৃঃ হইতে ১৮৯২ খৃঃ পর্যন্ত, পর পর ৩টি কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ।

এইবারের কংগ্রেসে সভাপতি ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী বলিলেন—

(ক) দাদাভাই নৌরোজীর এইবারের কংগ্রেসে সভাপতি হইবার কথা ছিল।

যদিও তিনি Central Finsbury হইতে পার্লামেণ্টে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তথাপি নির্ব্বাচনের পরবর্ত্তী ঝামেলা শেষ না-হওয়ায় তিনি আসিতে পারেন নাই। পার্লামেণ্টের সদস্য হওয়ার উদ্দেশ্য, ইংরেজের সহিত লর্ড সলিস্‌বেরী-কথিত কালা আদ্‌মি (black man)-এর একসঙ্গে বসিবার গর্ব্ব নয়; পরন্তু ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল শাসন ('Responsible Government') প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য।

(খ) কংগ্রেস-রাজনীতির সহিত সমাজ-সংস্কার জড়িত হইতে পারে না। কেননা, ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম্মের লোক বাস করে, প্রত্যেক ধর্ম্মের সহিত ঐ ধর্ম্মের লোকদের সমাজ-ব্যবস্থা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সুতরাং কি করিয়া একজন হিন্দু একজন মুসলমানের সহিত একত্র বসিয়া উভয়ের সমাজ-সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে পারে। "How is it possible for a Hindu gentleman to discuss with a Parsee or a Mahomedan gentleman matters connected with Hindu social questions ?···because, all different social systems are "more or less interwoven with their respective religions" (* ক)। তিনি আরও বলেন যে, "আমাদের বিধবাদের যদি বিবাহ না হয়, আমরা যদি অল্প বয়সে ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেই এবং আমাদের স্ত্রীকন্যাগণ

(* ক) সভাপতির কথায় বোঝা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা সংস্কার করিতে হইলে যে-সকল ধর্ম্মের সহিত ঐ সমাজ-ব্যবস্থা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সেই সকল ধর্ম্মের সংস্কার আগে প্রয়োজন। সমাজ একটি জীবন্ত প্রাণীবিশেষ (organism)। ইহার এক অঙ্গের সহিত অপর অঙ্গ অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। সুতরাং ধর্ম্মের সংস্কার শিকায় তুলিয়া রাখিয়া যেমন সমাজ-সংস্কার সম্ভব নয়, তেমনি সমাজ-সংস্কার শিকায় তুলিয়া রাখিয়া রাষ্ট্রের সংস্কার সম্ভব নয়। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক—রাজা রামমোহন রায়—বহু পূর্ব্বে এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন : "Some change must be wrought in the system of their (Hindus') religion, at least for political advantage and social comfort".

রাজা রামমোহন শুধু ধর্ম্ম-বিজ্ঞানেরই (Science of Religion) প্রতিষ্ঠাতা

যদি আমাদের সহিত একত্রে গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত স্বাধীনভাবে মেলামেশা না-করেন বা অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে পড়িতে না-যান—তবে কি আমরা স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী হইয়া এই শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার করিতে পারিব না" (* খ)?

(গ) তিনি ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন।

মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন ও আইরিশ্ হোমরুল বিল : পার্ণেলের (Parnell) মৃত্যুর ২ বৎসর পর আবার মিঃ গ্ল্যাড্ষ্টোন (Mr. Gladstone) এই বৎসর আয়র্ল্যাণ্ডের জন্য 'হোমরুল বিল' (Home Rule Bill) আনিলেন। হাউস্ অব্ কমন্স্ (House of Commons) তাহা পাশ করিল, কিন্তু হাউস্ অব্ লর্ডস্ (House of Lords) তাহা বাতিল করিয়া দিল। এই সম্পর্কে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের 'রিফর্ম বিল' (Reform Bill)-এর কথা মনে পড়ে। রাজা রামমোহন রায় তখন বিলাতে ছিলেন। ঐ 'বিল' পাশ না-করিলে তিনি ইংরেজ জাতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ("As I publicly avowed that in the event of the Reform Bill being defeated, I would renounce my connection with this country"—*Rammohan Roy, Letter, dated July 31, 1832, to William Rathbone Esq. , from 48 Bedford Square, London).* এই সময়কার Parnell-বীরত্বমুগ্ধ অরবিন্দ, ১৮৩২-এর Reform Bill আন্দোলনের রাজা রামমোহনের কার্যাবলী (* গ) স্মরণ করিয়াছিলেন

নহেন, পরন্তু সমাজ-বিজ্ঞানেরও (Sociology) প্রতিষ্ঠাতা। স্বামী বিবেকানন্দ যে বলিয়াছেন, 'সমাজ-সংস্কার করিতে গিয়া রাজা রামমোহন ধর্ম্ম-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়া ভুল করিয়াছিলেন'—একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কেননা, নিকৃষ্ট ধর্ম্ম-ব্যবস্থার সহিত উৎকৃষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার সামঞ্জস্য হইতে পারে না।

(* খ) স্বামী বিবেকানন্দও পরবর্ত্তীকালে অনুরূপ একটি কথা বলিয়াছিলেন : "If the prosperity of a nation is to be gauged by the number of husbands its widows get, I am yet to see such a prosperous nation."

(* গ) ১৮৩২ খৃঃ Reform Bill-এর 'second reading' যখন চলিতেছে তখন রাজা লিখিতেছেন—

কি-না, বুঝিবার উপায় নাই। নবযুগের স্রষ্টা রাজা রামমোহনকে বিস্মরণ হওয়া অন্ততঃ কোন বাঙ্গালীরই কর্তব্য নয়। ইংরাজের রাজনীতির ('their politics') বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া অরবিন্দে যেরূপ দেখা যাইবে, তাহার ৬০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহনের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়া আরও প্রখরভাবে ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনার মধ্য দিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ পাইতেছে।

অরবিন্দের ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন ও ডাঃ কে. ডি. ঘোষের মৃত্যু ঃ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, সম্ভবতঃ মার্চ্চমাসে বরোদার মহারাজের সহিত একই জাহাজে চড়িয়া অরবিন্দ দেশে ফিরিতেছেন। কোন্ জাহাজে তাঁহারা দেশে

"The struggles are not merely between the reformers and anti-reformers, but between liberty and tyranny throughout the world ; between justice and injustice and between right and wrong.

"But from a reflection on the past events of history, we clearly perceive that liberal principles in politics and religion have been long gradually, but steadily, gaining ground, notwithstanding the opposition and obstinacy of despots and bigots."—[*Rammohan Roy—24 Bedford Square—April 27, 1832*]

Reform Bill পাশ হইয়া যাওয়ার পরে লিখিতেছেন—

"I am *now* happy ...... on the *complete* success of the Reform Bills, notwithstanding the violent opposition and want of political principle on the part of the aristocrats. The nation can no longer be a prey of the few who used to fill their purses at the expense, nay to the ruin, of the people for a period of upwards of fifty years. The Ministers have honestly and firmly discharged their duty, and provided the people with means of securing their rights. I hope and pray that the people, the mighty people of England, may now in like manner do theirs, cherishing public spirit and liberal principles, at the same time banishing bribery, corruption and selfish interests, from public proceedings."[—*Rammohan Roy, 48 Bedford Square, London—July 31, 1832*]
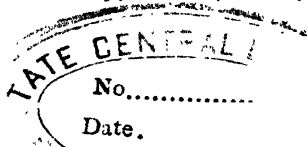
ফিরিতেছেন, সেই জাহাজের খবর পর্য্যন্ত ডাঃ কে. ডি. ঘোষ টেলিগ্রামে জানিতে পারিলেন। শ্রীযুক্তা সরোজিনী ঘোষ আমাদিগকে বলিয়াছেন যে—"তারপরে Bombay Grindlay & Co.কে অরবিন্দের পিতা টেলিগ্রাম করিলেন যে, ঐ জাহাজ কবে আসিয়া বম্বে পৌঁছবে। উত্তর আসিল, 'জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে।' সত্যই সেই জাহাজ ডুবিয়াছিল এবং সেই জাহাজেই অরবিন্দের দেশে ফিরিবার কথা ছিল। ডাঃ কে. ডি. ঘোষ তখন খুলনায়। বিকালে টমটমে চড়িয়া হাওয়া খাইতে যাইবেন এমন সময় টেলিগ্রাম আসিল। টেলিগ্রাম পড়িয়া এক পা গাড়ীর পা-দানিতে দিয়া আর এক পা বাড়াইতেই পড়িয়া গেলেন। ধরাধরি করিয়া বিছানায় নেওয়া হইল। ৩।৪ দিন পর এই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল (* ক)।" কিন্তু ঐ ডুবিয়া-যাওয়া জাহাজে অরবিন্দ আসেন নাই, পরের জাহাজে আসিয়াছিলেন। একটি বিরাট শোভাযাত্রা স্তূপাকার পুষ্পমাল্যে শোভিত ডাঃ কে. ডি. ঘোষের শব লইয়া শশ্মান অভিমুখে যাত্রা করিল। সমস্ত খুলনা সহর শোকে ম্রিয়মান হইয়া পড়িল।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী ঘোষ ৫।৭।৪০ তারিখে আমাদিগকে বলিয়াছেন যে : "ডাক্তার কে. ডি. ঘোষের মাতা কৈলাসকামিনীর নিকটে কৃষ্ণধনের মৃত্যু-সংবাদ এক বৎসর লুকাইয়া রাখা হয়। শেষে যখন তিনি জেদ ধরিলেন, 'তার হাতের লেখা এনে দেখাও', তখন বাধ্য হয়ে তাঁকে জানাতে হয়। শোনামাত্র তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। একমাস মূর্চ্ছিতাবস্থা থাকে। রমেশচন্দ্র দত্ত, কে. জি. গুপ্ত এবং ডাঃ কে. ডি. ঘোষের অন্যান্য বন্ধুবান্ধবেরা ডাঃ ঘোষের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া Gomes Laneএর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ডাঃ

(* ক) Dr. D.C. Majumder, M.R.C.P.(London) ১৯।১১।৪১ তারিখে আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে Dr. K. D. Ghose-এর মৃত্যু হইয়াছে ; কেননা, ১৮৯০।৫ই ডিসেম্বর ডাঃ মজুমদারের জন্মতারিখ, এবং তাঁহার বয়স যখন মাত্র ২ বৎসর তখন ডাঃ কে. ডি. ঘোষ খুলনা সহরে তাঁহাকে Pyæmic abscese-এর দরুণ অস্ত্রোপচার করিয়া কয়েক মাস নিয়মিত চিকিৎসা করেন। যতদূর দেখিতেছি, ১৮৯৩-এর মার্চ্চমাসে ডাঃ কে. ডি. ঘোষের মৃত্যু হয়। তিনি এতদূর জনপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁহার শবদেহ লইয়া একটি বৃহৎ ও সমারোহপূর্ণ শোভাযাত্রা শ্মশানঘাটে গিয়াছিল।

ডাঃ মজুমদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সতীশচন্দ্র মজুমদার ঐ শোভাযাত্রার অনুগমন করিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে ইহা জানাইয়াছেন।

ঘোষ নাকি দুঃখ করিয়া বলিতেন—'বিধাতাকে যদি পেতুম, জিজ্ঞেস্ করতুম, এত দুঃখ আমার কপালে লিখেছিলেন কেন?' ডাঃ ঘোষ ছিলেন 'very fair-complexioned with long beard'। কৃষ্ণধন ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁর চিতার পার্শ্বে খুলনার সমস্ত লোক এসেছিল শেষসাক্ষাতের জন্য। তাদের অনুরোধে শবের মুখ খুলে দেওয়া হয়।"

খুলনার ম্যুন্সিপাল অফিসের সম্মুখে শোভাবর্দ্ধনের জন্য একটি বৃহদাকারের জলের ফোয়ারা নির্ম্মাণ করা হয়। ডাক্তার কে. ডি. ঘোষের সম্মানার্থে তাঁহার স্মরণচিহ্নস্বরূপ ঐ ফোয়ারার গাত্রে ডাক্তার কে. ডি. ঘোষের নাম খোদিত হয়। খুলনাবাসীর এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাঁহারা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ধন্যবাদের পাত্র।

ডাঃ কে. ডি. ঘোষের মৃত্যুর পরেঃ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের সহিত অরবিন্দের পিতা ডাঃ কে. ডি. ঘোষেব অতিশয় বন্ধুত্ব ছিল। এই ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের থিয়েটার রোডের বাড়ীতেই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে, ১৫ই আগষ্ট অরবিন্দ ভূমিষ্ঠ হন। এখন এই ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের বাড়ীতেই ডাঃ কে. ডি. ঘোষের উইল লইয়া গোলযোগের সৃষ্টি হইল (* খ)।

(* খ) "বাবার উইল মনোমোহন ঘোষের বাড়ীতে পড়া হোলো, তাতে তিনি আমার গর্ভধারিণী মা স্বর্ণলতার ব্যবস্থা ক'রে সমস্ত টাকা ও বিষয়আশয় এবং ছেলেমেয়ের ভার রাঙ্গা মায়ের হাতে দিয়ে যান।··বাবা মারা যাবার পর যখন কৌন্সিলী মনোমোহন ঘোষের বাড়ীতে উইল পড়া হয়ে রাঙ্গা মা হ'লেন বিষয়-আশয়ের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, তখন এই ব্যাপারটাকে রদ করবার জন্যে আমার ব্রাহ্ম আত্মীয়দের মধ্যে পড়ে গেল একটা আপ্রাণ চেষ্টা।···আমার একজন আত্মীয় (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন চূড়া) এসে মায়ের সঙ্গে কথায়বার্ত্তায় উইলখানি একবার দেখিতে চাহিলেন। সরল মেয়ে মা আমার উইলখানা তাঁর হাতে এনে দেবামাত্র তিনি পকেটস্থ করে বললেন, 'তুমি ছেলেমেয়ে পাবে না, আর টাকাকড়ির দাবী যদি কর এই উইল জাল ও তোমাকে বাজারের বেশ্যা বলে কোর্টে প্রমাণ করা হবে।' এই বলে ধর্ম্মপ্রাণ মানুষটি দিব্য গজেন্দ্রগমনে প্রস্থান করিলেন।···এই দ্বিতীয় বিবাহ বিবাহই নয়। আইনের চোখে একটু তিন অনুযায়ী প্রথম বিবাহের পর এ বিবাহ বে-আইনী অপরাধ।···অনেক বাকবিতণ্ডা ঘোরাঘুরির পর রফা হল রাঙা মা খোরপোষ বাবদ পাঁচ হাজার টাকা মাত্র পাবেন, ছেলেমেয়ে থাকবে মাতুলালয়ে দেওঘরে, তিন চার মাস অন্তর তিনি তাদের দেখতে পাবেন। আমাকে ও দিদিকে

তারপর বারীন্দ্রকুমার '১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে' দেওঘরে রাজনারায়ণ বসুর বাড়ীতে আসিয়া স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং পিতার মৃত্যুর পরেই বারীন্দ্রকুমার ও সরোজিনী দেওঘরে তাঁদের মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর বাড়ীতে আসিলেন। রোহিনীতে তাঁহাদের পাগল মা একা আছেন, এবং দেওঘরে বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু ডাঃ কে. ডি. ঘোষের মৃত্যুর পরও ৬ বৎসর এবং কয়েক মাস পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

অরবিন্দ দেশে ফিরিলে পর পিতার সহিত তাঁহার সাক্ষাত হইয়াছিল—এমন কথা কেহই বলেন না। এবং আমরাও সাক্ষাতের কোন প্রমাণ পাই না। পিতা-পুত্রের আর সাক্ষাৎ হইল না, অথচ অরবিন্দের পিতা অরবিন্দের উপর কত আশাই না পোষণ করিয়াছিলেন—কত গর্ব্ব করিয়া অরবিন্দের মাতুলকে চিঠি লিখিয়াছিলেন (১৮৯০-এর ২রা ডিসেম্বর)। কত নিরাশা ও অপ্রত্যাশিত আঘাত বুকে লইয়া অরবিন্দের পিতা দেহত্যাগ করিলেন। এই পরদুঃখকাতর দয়ার্দ্রহৃদয় তেজস্বী পুরুষের এই অভাবনীয়রূপে জীবনাবসান অরবিন্দের পক্ষে নিশ্চয়ই এক মর্ম্মান্তিক ঘটনা। ইহাকে কি বলিব ?—নিয়তি।

নিয়ে গাড়ী করে মা চললেন সেই আত্মীয়টির বাড়ীতে, জীবন্ত দু'টি তাঁর প্রাণপুত্তলীকে বিসর্জ্জন দিতে…।"—[আত্মকথা—পৃঃ ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯]

চার

বরোদায় চৌদ্দ বৎসর

"Purification by Blood & Fire"

১৮৯৩—১৯০৬ খৃঃ

- কংগ্রেস (New Lamps for Old)
- বঙ্কিম-প্রসঙ্গ
- পারিবারিক পরিস্থিতি
- সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
- স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকা
- লাহোর কংগ্রেস (সভাপতি—দাদাভাই নৌরজী)
- অরবিন্দ ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

বয়স বাইশ বৎসর (১৮৯৩। এপ্রিল—১৮৯৪। ১৪ই আগষ্ট):

অরবিন্দ ১৪ বৎসর বিলাতে থাকিয়া গাইকোয়াড়ের সঙ্গে বরোদায় ফিরিয়াছেন। এখন তিনি গাইকোয়াড়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী। বিলাতে দীর্ঘ প্রবাসের পর দেশে ফিরিয়া ৪ মাস পরেই তিনি 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ ছাপাইলেন। 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক কে. জি. দেশপাণ্ডে কেম্ব্রিজে অরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন। সুতরাং প্রবন্ধগুলি অনায়াসেই ছাপা হইয়া গেল। কিন্তু হইলে কি হয়, এই প্রবন্ধগুলি বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। তা'ছাড়া অরবিন্দ কী মন লইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন—এই প্রবন্ধগুলি তাহার একটি সুস্পষ্ট পরিচয়। এই দুই দিক হইতেই

এই প্রবন্ধগুলি একটা ইতিহাস রচনা করিয়াছে। এখন প্রবন্ধগুলিকে দেখা যাক (*ক)।

প্রবন্ধগুলির নাম—প্রাচীনপন্থীদের সম্মুখে নূতন আলোক (New Lamps for Old).

প্রথম প্রবন্ধ (৭ই আগষ্ট, ১৮৯৩)

১। আমি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে উদ্যত হইয়াছি। দুই বৎসর পূর্ব্বে (১৮৯১, জুলাই মাসে) ইহা আমি করিতে পারিতাম না। আমি তখন কংগ্রেসের অনুরক্ত ছিলাম। দেশের এইরূপ একটি বড় প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেসের নামজাদা নেতাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করায় আমার প্রতি অনেকেই অসন্তুষ্ট হইবেন জানি। কিন্তু এক অন্ধ যদি আর এক অন্ধকে লইয়া পথ চলে, উভয়েই তবে গর্ত্তে পড়িয়া যায়—এই আশঙ্কা করিয়া আমি দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছি।

২। দেশপ্রেমিক কোন বড় নেতার ব্যক্তিগত চরিত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা আমরা না-করিতে পারি, কিন্তু কংগ্রেসের মত একটি প্রতিষ্ঠানকে আমরা সমালোচনা না-করিয়া পারি না। কেননা, ইহার উপর দেশের মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ভর করিতেছে। মূর্ত্তি-পূজকেরা যেমন একটা মূর্তিকে শুধু পূজাই করে, তাহার দোষ-গুণ বিচার করে না—আমরা কংগ্রেসকে নিশ্চয়ই সেরূপ করিতে পারি না।

৩। কংগ্রেস নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলিতে পারে না—ইংরেজ শাসক-বর্গকে অসন্তুষ্ট করিতে ভয় পায়। প্রধানমন্ত্রী মিঃ গ্ল্যাড্‌ষ্টোনকে না-জানিয়া অযথা তাঁহার প্রশংসা করে, অথচ পার্লামেণ্টে ভারতের কথা আলোচনার সময় মিঃ গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ভারতের বিরুদ্ধে তর্ক করেন। ভারতে ইংরেজ শাসন ঈশ্বরের দান বলিয়া আমরা না-হক্ মিথ্যা কথা ঘোষণা করি।

(*ক) আমার বন্ধু বম্বে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন, আই. সি. এস. নিজব্যয়ে 'ইন্দুপ্রকাশ'-এর 'New Lamps for Old' এবং 'Bankim Chandra Chatterjee' প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেজন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

মন্তব্য-

(ক) ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। W. C. Banerjee প্রথম সভাপতি হন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্টমাসে অরবিন্দ এই প্রবন্ধগুলি লেখেন। তখন কংগ্রেসের মাত্র আটটি অধিবেশন শেষ হইয়াছে।

(খ) ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট হইতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট—এই দুই বৎসরে কংগ্রেস সম্পর্কে অরবিন্দের মতের ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটে। সুতরাং বিলাতপ্রবাসের শেষ দুই বৎসরে, বিলাতে অবস্থানকালেই অরবিন্দের মন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বাঁকিয়া বসে। সুতরাং প্রমাণ হয় যে, বিলাতপ্রবাসের শেষ দুই বৎসরে কংগ্রেস-রাজনীতির প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ (২১শে আগষ্ট, ১৮৯৩)

১। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমি কংগ্রেসের পক্ষপাতী ছিলাম (the ghost of my ancient enthusiasm)। কংগ্রেস একটি সভা মাত্র। এই বৃহৎ সভা দেশের জন্য কোন কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করিতে অক্ষম (the Congress is too unwieldy a body for any sort of executive work)।

২। মিঃ ফিরোজ শা' মেহতা আদালতে ওকালতি করিবার পদ্ধতি কংগ্রেস সভায় আমদানী করিয়াছেন। তিনি বলেন—কংগ্রেস আমাদিগকে একত্রে বসিয়া কাজ করিতে শিখাইয়াছে। তাহা ঠিক কথা নয়। কংগ্রেস একত্রে বসিয়া কথা বলিতে শিখাইয়াছে মাত্র।

৩। কংগ্রেস শুধু মধ্যবিত্তদের লইয়া গঠিত হইয়াছে। নিম্নস্তরের বিশাল জনসাধারণকে (the great mass of the people) স্পর্শও করে নাই।

৪। ইংরেজ শাসকবর্গের বিরুদ্ধে কড়া কথা বলার কোন অর্থ হয় না। কেন-না, তাহারা অতিশয় সাধারণ মানুষ ('commonplace man')। আমাদের দুর্ব্বলতা বাহিরে নয়, আমাদেরই ভিতরে ('Our actual enemy is not any force exterior to ourselves, but our own crying weaknesses, our cowardice, our selfishness, our hypocrisy, our purblind sentimentalism.')।

৫। কংগ্রেস যদি বিরুদ্ধ-সমালোচনা সহ্য করিতে না-পারে, তবে যত শীঘ্র ইহা লুপ্ত হইয়া যায়, ততই ভাল ('If the Congress cannot really face the light of a free and serious criticism, then the sooner it hides its face the better.')।

৬। নয় বৎসর আমরা কংগ্রেসকে পূজা করিয়াছি। ধর্ম্মভাবপ্রণোদিত ঠাকুর-পূজার মত পূজা করিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছে (For nine years it has been exempt from the ordeal; we have been content to worship it with that implicit trust which all religions demand, but which sooner or later leads them to disaster and defeat.)।

মন্তব্য—

(ক) কংগ্রেসের দোষত্রুটি যথাযথ সমালোচনা না-করায় এবং রাঢ়দেশের ধর্ম্ম-ঠাকুরের মত কংগ্রেসকে কেবল ফুলচন্দনে পূজা করার দরুণই কংগ্রেসের অধঃপতন হইয়াছে। অতএব নির্ভীকভাবে কংগ্রেসের দোষত্রুটি সমালোচনা করিতে হইবে—ইহাই অরবিন্দের সুস্পষ্ট অভিমত। কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদী একটি দল কংগ্রেসকে সমালোচনা করিবার জন্য কংগ্রেসের ভিতরে থাকিবে, অথবা বাহিরে থাকিবে—এ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ অরবিন্দ দিলেন না। তিনি কংগ্রেসের একটা বিরুদ্ধ-সমালোচনার প্রয়োজনের কথা বলিলেন মাত্র। এই বিরুদ্ধ-সমালোচনা যথেচ্ছভাবে কোন একজন ব্যক্তি করিবে, অথবা কোন বিশিষ্ট দল করিবে—অরবিন্দের কথায় তাহারও কোন আভাষ পাওয়া গেল না।

তৃতীয় প্রবন্ধ (২৮শে আগষ্ট, ১৮৯৩)

১। আমি বলি (I say) কংগ্রেসের আদর্শ ভুল, কর্ম্মপদ্ধতি ভুল, নেতারা বিল্‌কুল্ নেতৃত্বের অযোগ্য।

২। কংগ্রেস জাতীয় (National) আখ্যা পাইতে পারে না। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা যে বলে, ইহাতে মুসলমান নাই বলিয়া জাতীয় নয়—সে-কথা ঠিক নয়। কেননা, ইহাতে যথেষ্ট মুসলমান প্রতিনিধি আছে এবং কংগ্রেস মুসলমানদের অভাবঅভিযোগ ও দাবী সম্পর্কে অতিশয় বেশী সচেতন।

৩। কংগ্রেস জাতীয় নয় এই বলিয়া যে—ইহাতে ভারতের জনসাধারণ বা

তাহাদের প্রতিনিধি নাই। ইহাতে শুধু আছে ইংরেজ আমলের ভুঁইফোঁড় উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, খবরের কাগজের সম্পাদক, চাকুরিজীবি, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ও একশ্রেণীর বণিকসম্প্রদায়। আর আছে, কিছুটা জমিদার ও সঙ্গতিপন্ন রায়ত। ইহারা কেহই জনসাধারণের প্রতিনিধি নয়।

৪। ইংলণ্ডে লিব্যর্‌ল্ সম্প্রদায় যদি একটি সভা করিয়া বলে যে, তাহারা ইংরেজ জাতির একমাত্র প্রতিনিধি—তাহা যেমন ঠিক হইবে না, সেইরূপ কংগ্রেসকেও 'জাতীয়' বলিলে ঠিক হইবে না। বস্তুতঃ, ইহা একটি দলের বা সম্প্রদায়ের 'বাৎসরিক সভার অনুষ্ঠান' মাত্র। হাউস্ অব কমন্সের সহিতও আমাদের কংগ্রেসের কোন তুলনা হইতে পারে না। কেননা, হাউস্ অব কমন্স যাহা স্থির করিবেন তাহা তাঁহারা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন। কিন্তু কংগ্রেস বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদননিবেদন করিবেন, তাহা তাঁহারা নিজেরা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন না। সুতরাং হাউস্ অব কমন্স ও আমাদের কংগ্রেস এক বস্তু নয়।

৫। মিঃ ফিরোজ শা' মেহেতা কলিকাতা কংগ্রেসের (১৮৯০খৃঃ) সভাপতি-রূপে বলিয়াছেন যে—জনসাধারণের মধ্যে (mass) কোনরূপ রাজনৈতিক চেতনা নাই, তাহাদের অভাবঅভিযোগ তাহারা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষ হইতে কংগ্রেসের শিক্ষিত ভারতবাসীরাই জনসাধারণের অভাবঅভিযোগ প্রকাশ করে; সুতরাং কংগ্রেস জাতীয়ও বটে, 'পপুলার'ও বটে। মিঃ মনমোহন ঘোষও মিঃ মেহেতাকে সমর্থন করিয়া বলেন যে—কংগ্রেস ডেলিগেটরা তাহাদেরই প্রতিনিধি, যাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বা চিন্তা জাগ্রত হইয়াছে; সুতরাং কংগ্রেস 'জাতীয়' সন্দেহ নাই।

মন্তব্য—

(ক) মিঃ ফিরোজ শা' মেহেতা ও মিঃ মনমোহন ঘোষ যুক্তি দিয়া দেখাইতেছেন যে, কংগ্রেস জাতীয়। অরবিন্দ অন্যপক্ষে যুক্তি দিয়া দেখাইতেছেন যে, কংগ্রেস জাতীয়ও নয় লোকপ্রিয় (Popu'ar)ও নয়। 'মাথা নাই তার মাথা ব্যাথা'। যে প্রতিষ্ঠান দেশের জনসাধারনের সহিত কোন যোগরক্ষা করে না এবং যোগরক্ষা করা প্রয়োজন মনে করে না, তাহা কি করিয়াই বা জাতীয় হইতে পারে আর কি করিয়াই বা লোকপ্রিয় হইতে পারে? অরবিন্দের যুক্তি এক্ষেত্রে অখণ্ডনীয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসের

উপরেই অরবিন্দের আক্রমণ তীক্ষ্ণধার অসি চালনার মত দেখা যাইতেছে। মিঃ ফিরোজ শা' মেহেতা ও তাঁহার পিতৃবন্ধু মনোমোহন ঘোষকে তিনি কোনক্রমেই এবং কোনদিকেই রেহাই দিতেছেন না।

(খ) মিঃ ফিরোজ শা' মেহেতা বলিয়াছেন (১৮৯০ খৃঃ) : নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে যতদিন না রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়, ততদিন শিক্ষিত ব্যক্তিরাই তাহাদের প্রতিনিধিত্ব করিবেন—ইতিহাস আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষাই দেয়। ('If the masses were capable of giving articulate expression to definite political demands, then the time would have arrived, not for consultative councils but for representative institutions, ... it is because they are still unable to do so that the function and the duty devolve upon their educated and enlightened compatriots to feel, to understand and to interpret their grievances.'—*Congress Speech, 1890*)। মিঃ ফিরোজ শা' মেহেতার এই যুক্তি অরবিন্দের মনঃপূত হয় নাই। এবং তাঁহার ইতিহাসের শিক্ষাকে তিনি কেবল ইংলণ্ডের ইতিহাসেই আবদ্ধ বলিয়া ভ্রমাত্মক মনে করিয়াছেন।

চতুর্থ প্রবন্ধ (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩)

১। কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতি আদালতে ওকালতি করার মত। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে বিচারক বৃটিশ জাতির নিকট ভারতবাসী মোকদ্দমা রুজু করিয়াছে। মেহেতা, W. C. Bannerjee প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টারগণ ওকালতি করিতেছেন।

২। মেহেতা ও মনমোহন ঘোষ উভয়েই একমত হইয়া বলিতেছেন যে—ইতিহাস আমাদিগকে শিক্ষা দেয় (History teaches us) যে, অশিক্ষিত জনসাধারণের অভাবঅভিযোগ শিক্ষিতেরাই উত্থাপন করিয়া আন্দোলন করিয়া থাকেন। এবং তাহারই ফলে জাতি ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

৩। এই দুই ব্যক্তি এক ইংলণ্ডের ইতিহাস ব্যতীত ইউরোপের আর কোন দেশের ইতিহাস পড়েন নাই, বিশেষতঃ ফরাসী দেশের ইতিহাস আদৌ পড়েন নাই। ফরাসী জাতি ধাপে ধাপে বা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর

হয় নাই। ফরাসীদেশের অশিক্ষিত বিশাল জনসাধারণ ও সর্ব্বহারার দল (the vast and ignorant proletariat) অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্র হইয়া (purification by blood and fire) মাত্র পাঁচ বৎসরে তের শতাব্দীর অত্যাচার মুছিয়া ফেলিয়াছে (blotted out in five terrible years the accumulated oppression of thirteen centuries)। ইতিহাস আমাদিগকে এ শিক্ষাও দেয়।

৪। তাছাড়া Ireland, Italy, America, Athens ও Rome স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে ইতিহাস দেয়, তাহা মেহেতা ও মনমোহন ঘোষের উক্তির সমর্থন করে না।

৫। মেহেতা ও মনমোহন ঘোষ প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা কেবল ইংলণ্ডের আদর্শ ভারতবাসীর সম্মুখে রাখিয়া কংগ্রেসকে পরিচালিত করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু আমি ইহা সমীচীন মনে করি না। ইংলণ্ডের ধারা ও পদ্ধতি ভারতবাসীদের উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয় না।

মন্তব্য—

(ক) অরবিন্দ এখানে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসে মিঃ মেহেতার সভাপতির অভিভাষণ ও মিঃ মনমোহন ঘোষের অভ্যার্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণের উপর কশাঘাত করিয়াছেন। মিঃ মনমোহন ঘোষ তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে—আমরা ইংরেজের শাসনকার্য্যের কিছুটা সংস্কার ও পরিবর্ত্তন চাই মাত্র ('sole object of improving the administration of the country')। মিঃ মেহেতাও তা-ই চান। কিন্তু অরবিন্দ চান ইংরেজ শাসনের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ। সুতরাং এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গী, একে অন্য হইতে একেবারে বিপরীত। অরবিন্দ এই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই কংগ্রেস ও তাহার নেতাদের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিয়াছেন। অরবিন্দের এইকালে তাঁহার কংগ্রেস-সমালোচনা নূতন, মৌলিক, গুরুত্বপূর্ণ এবং দূরদর্শীতার পরিচায়ক। আবার অনেকের মতে, ইহা সম্পূর্ণ বাস্তবতাহীন এবং কল্পনা-প্রসূত বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

(খ) অরবিন্দ এখানে ফরাসী-বিদ্রোহের প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি অতিশয় প্রাঞ্জল ভাষায় বলিতেছেন যে—ফরাসী জাতি যেমন প্রকাণ্ড এবং সশস্ত্র বিদ্রোহে, অগ্নি ও রক্তস্নানে

পবিত্র হইয়া, পাঁচ বৎসরের মধ্যে তের শতাব্দীর অত্যাচার মুছিয়া ফেলিয়াছিল, ভারতবাসীকেও তাহাই করিতে হইবে। এরকম পিলে-চমকানো সর্ব্বনেশে কথা যেহেতো, মনমোহন ঘোষ প্রমুখকে নিশ্চয়ই হতভম্ব করিয়া দিয়াছিল। কাজেই ধীর-স্থির মহামতি র্যাণাডেকে ইহা যে অতিমাত্রায় বিচলিত করিবে এবং তাঁহার জজিয়তির আসন টলটলায়মান করিয়া তুলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, ফরাসী দেশের নিম্ন-শ্রেণীর জনতার মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনা ছিল, যে অস্ত্রসজ্জা ছিল, রাজনৈতিক চেতনাহীন নিরস্ত্র নিরক্ষর ভারতের নিম্নশ্রেণীর জনতার মধ্যে তাহার কিছুই ছিল না। যে অবস্থায় ফরাসী জাতি বিদ্রোহ করিয়া তাহাদের রাজা ও রাণীর মুণ্ড কাটিয়া নিজেরা স্বাধীন হইয়াছিল, কী সংস্কারগত দুর্বলতায়, কী অসামর্থ্যে ভারতবাসী তাহা পারিত না? আমাদের আশঙ্কা হয়, বাল্যাবধি চৌদ্দ বৎসর বিলাতে থাকিয়া অরবিন্দ দেশের জনসাধারণের অবস্থা সম্যক অবগত হইতে পারেন নাই। কাজেই তিনি ফরাসী দেশের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিয়াছেন। ষ্ট্যালিন পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, "The export of Revolution is nonsense", অর্থাৎ বিপ্লব আমদানী বা রপ্তানীর মত কোন পণ্যদ্রব্য নয়।

পঞ্চম প্রবন্ধ (৩০শে অক্টোবর, ১৮৯৩)

১। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী বৃটিশ হাউস্ অব কমন্সকে স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরেজ জাতির স্বাধীনতার প্রতীক বলিয়া কংগ্রেসী বক্তৃতার উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অসাধারণ বাগ্মী হইলেও তাঁহার চিন্তাধারায় কোন গভীরতা নাই; তাঁহার চাইতে Mathew Arnold-এর চিন্তাধারায় অনেক বেশী গভীরতা আছে। Mathew Arnold একজন ভারতবন্ধু ইংরেজ। তিনি ইংরেজ জাতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে—ইহাদের মধ্যে প্রথমস্তরের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ভোগবিলাসী জড়বাদী, দ্বিতীয়স্তরের মধ্যবিত্তেরা ক্ষুদ্র ও নীচাশয় এবং নিম্নস্তরের ব্যক্তিরা পশু ভিন্ন আর কিছুই নয় (aristocracy materialised, middle-class vulgarised and lower-class brutalised)।

২। ইংরেজ জাতির কোন উচ্চআদর্শ নাই, কোন বৃহৎ কল্পনা নাই; তাহারা সম্মুখে যেটুকু দেখিতে পায়, তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই দেখে না। কিন্তু ফরাসীরা ইহার ঠিক বিপরীত। তাহাদের উচ্চআদর্শ

আছে, সুবৃহৎ কল্পনা আছে, কৃষ্টি (culture) আছে। সমগ্র ইউরোপে ফরাসী সর্ব্বাপেক্ষা সভ্যজাতি (French mind is clearer, subtler, lighter than the English. France is the most civilized of modern countries.)। ইংরেজের মন ঘোরে হাউস্ অব কমন্সের চারিপাশে, ফরাসীর মন ঘোরে Theatre, French Academy ও Municipal প্রতিষ্ঠানের চারিপাশে। আর আমেরিকাবাসীর মন ঘোরে Stock Exchange-এর চারিদিকে। ইংরেজের কিছুটা রাজনৈতিক প্রতিভা আছে। ফরাসী, ইংরেজ ও আমেরিকা হইতে নকল করিয়া এই দুই-এর সংমিশ্রণে তাহাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও ফরাসী কিছুটা সামাজিক উপায় (Social method) অবলম্বন করিয়াছে।

৩। প্রাচীন Athensবাসীদের সহিত বর্ত্তমান ফরাসী জাতির তুলনা চলে। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। শিল্পরসবোধ, কৃষ্টি, উচ্চআদর্শ—উভয়ের মধ্যেই দৃষ্ট হয়।

৪। আমি যেসব ভারতবাসীর জন্য লিখিতেছি, তাহারা ইংরেজী শিক্ষায় ইংরেজীভাবাপন্ন (they are nurtured on English diet)। ঘটনাক্রমে ইংরেজ ভারতবর্ষের রাজা হইয়াছে এবং শিক্ষিত ভারতবাসীর ইংরেজীভাবাপন্ন হওয়া, ইহাই কারণ। কিন্তু প্রাচীন Athensবাসী ও বর্ত্তমান ফরাসী জাতির সহিত আমাদের চরিত্রগত সাদৃশ্য বেশী (We are far more allied to the French and Athenian)। ইংরেজ চরিত্রের সহিত আমাদের কোন সাদৃশ্য নাই। অথচ ইংলণ্ডের নিকট হইতেই বস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সামাজিক আদর্শ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি। ইহা পণ্ডশ্রম হইতেছে; আমাদের জাতীয় চরিত্রে ইহা খাপ খাইবে না। ইহা ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য (misfortune) ব্যতিরেকে আর কি বলা যায়। কেননা, জাতীয় চরিত্রের বিরোধী আদর্শ ও পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান ভারতবাসী কিছুতেই পুনর্জীবিত ও শক্তিশালী হইতে পারিবে না।

মন্তব্য—

(ক) স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, প্রাচীন গ্রীক মারফৎ বর্ত্তমান ফরাসী

হইয়াছে ; এবং ফরাসীরা ইউরোপে সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য জাতি। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলিয়াছেন, ফরাসী জাতির সহিত বাঙ্গালী জাতির চরিত্রগত সাদৃশ্য আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই দুই মনীষীর সহিত অরবিন্দের ঐতিহাসিক গবেষণা ও মতবাদে আশ্চার্য মিল রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু আবার এদিকে ভগিনী নিবেদিতা বলিয়াছেন যে, আইরিশদের সহিত বাঙ্গালী জাতির চরিত্রের সাদৃশ্য আছে।

(গ) লর্ড ক্লাইভ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌল্লাকে পরাজিত করিয়া বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইয়া দেড় শত বৎসর বাঙ্গালীকে শিক্ষা-দীক্ষায় ইংরেজীভাবাপন্ন করিবার সুযোগ পাইয়াছে। কিন্তু ক্লাইভ না হইয়া ফরাসী সেনাপতি ডুপ্লে (Dupleix) যদি বাঙ্গালাদেশ জয় করিতেন, বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষে যদি ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইত, বাঙ্গালীরা যদি ফরাসী ভাষা শিখিয়া ফরাসীভাবাপন্ন হইত—তবে কি ফরাসী ইতিহাসের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালী অথবা ভারতবাসীরা প্রাকাশ্য বিদ্রোহের (armed revolt) অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্র হইয়া অরবিন্দ কথিত পাঁচ বৎসরে তের শতাব্দীর রাজ-অত্যাচার মুছিয়া ফেলিতে পারিত? ইংরেজের অধীনতা ও ফরাসীর অধীনতায় কী পার্থক্য হইত—তাহা বুঝিয়া উঠা বাস্তবিকই কঠিন। হয় ত এই দুই অধীনতায় বিশেষ কোন পার্থক্যই দেখা যাইত না। ভারতে ফরাসী-অধিকৃত স্থানগুলির দৃষ্টান্ত আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করিবে। শ্রীঅরবিন্দের শেষজীবনের পণ্ডিচেরীই একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ (১৩ই নভেম্বর, ১৮৯৩)

১। প্রাচীন রোম্যানদের সহিত বর্ত্তমান ইংরেজদের ভাল ও মন্দে অনেক সাদৃশ্য আছে। রোম্যানদের সাম্রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যশাসনের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল; ইংরেজদেরও তাই। ইংরেজদের high capacity for political administration আছে। ফরাসীদের ইংরেজের মত রাজ্য-শাসনের ক্ষমতা নাই। তাহাদের রাজ্যশাসন পদ্ধতি ইংরেজদের ব্যর্থ-অনুকরণ মাত্র। ফরাসীদেশে ভাল লোকেরা রাজনীতি করে না।

২। ফরাসীদের নিম্নস্তর হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজ-জীবনে যে সন্তোষ আছে, ইংরেজদের তা নাই। ইংরেজদের নিম্নস্তর পাপ, দারিদ্র্য ও সমাজ-বিরোধী অপরাধে মগ্ন এবং দৈনন্দিন জীবিকা-উপার্জ্জনের কাজে যন্ত্রের মত

পরিচালিত হইয়া অবকাশবিনোদনের জন্য পাশবিক ভোগলিপ্সায় লিপ্ত হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে শান্তি পায় না (degraded in their worst failure to the crudest forms of vice, pauperism and crime, and in their highest attainment restricted to a life of unintelligent work relieved by brutalising pleasures)।

৩। মিঃ মেহেতা মনে করিতে পারেন, প্রাচীন রোম্যানদের কথা বর্ত্তমান ভারতবাসীদের তুলনায় আসে কেন? আমাদের বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু তাহা নয়। রোম্যানদের অনুকরণ করিয়াছে ইংরেজ, ইংরেজদের অনুকরণ করিতেছি আমরা। কংগ্রেস মধ্যবিত্তশ্রেণীর জন্য রাজনৈতিক অধিকার চাহিতেছে, কিন্তু নিম্নস্তরের ভারতবাসীদের কথা ভাবিতেছে না। প্রাচীন রোম ও বর্ত্তমান ইংরেজ জাতির নিম্নস্তর যেভাবে সামাজিক সাম্যবাদ হইতে বঞ্চিত, কংগ্রেস ভারতবর্ষে তাহাই ঘটাইতেছে। কিন্তু সমগ্র মানব জাতি নিম্নস্তরের উত্থানের উপর নির্ভর করিয়া গণতন্ত্র ও সামাজিক সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে (the whole trend of humanity shaping towards democracy and socialism on the calibre and civilization of the lower-class, depends the future of the entire race)। কংগ্রেস এই গণতন্ত্র ও সামাজিক সাম্যবাদ হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়াছে।

৪। ইংলণ্ড ও আমেরিকা তাহাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গর্ব্ব করে বটে, কিন্তু এই দুই দেশে শ্রমিকরা (Labour) মূলধনের মালিকদের প্রতি (Capital) অতিশয় হিংস্রভাবে আক্রোশ পোষণ করে। সুতরাং ইংলণ্ড ও আমেরিকায় নিম্নস্তর উপেক্ষিত হওয়ায় ফরাসীদেশের মত সামাজিক সাম্যবাদ ঐ দুই দেশে নাই।

মন্তব্য—

(ক) অরবিন্দ যে রোম্যানদের সহিত ইংরেজদের তুলনা করিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়ও রোম সাম্রাজ্যের সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের তুলনা করিয়া এই উভয় সাম্রাজ্যের সাদৃশ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অরবিন্দের গবেষণা রামমোহন-নিরপেক্ষ বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কেননা, পরবর্ত্তীকালে অরবিন্দ রাজা রামমোহন সম্পর্কে এবং তাঁহার গবেষণা সম্পর্কে কিছুই বলেন নাই।

(খ) অরবিন্দ ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা করিয়া (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, সমগ্র মানবজাতি গণতন্ত্র (Democracy) ও সামাজিক সাম্যবাদের (Socialism) দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এবং মানব জাতির ভবিষ্যৎ প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতির নিম্নস্তরের উত্থানের উপর নির্ভর করিতেছে। এক্ষেত্রেও ১৮৩২ সালে ইংলণ্ডে Reform Bill পাশের সময় রাজা রামমোহন অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন যদিও Socialism কথাটা তখন তেমন চালু হয় নাই এবং রাজা রামমোহন নিজেকে Socialist বলিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এমন কি, বিলাতে Owen-এর সহিত আলোচনা-কালে তিনি Socialism-এর বিরোধী ছিলেন।

(গ) স্বামী বিবেকানন্দ নূতন ভারতের অভ্যুত্থানকে ভারতের নিম্নস্তরের উত্থান বলিয়া সাদরে অভিনন্দন জানাইয়াছেন এবং অন্য কোন নামে নিজেকে অভিহিত করিতে না-পারিয়া নিজেকে Socialist অর্থাৎ সাম্যবাদী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারার আশ্চর্য্য মিল রহিয়া গিয়াছে। আরও অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ মিল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ও চিত্তকে পুলকিত করিয়াছে।

(ঘ) রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ মানব-সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাসী এবং প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির, দরিদ্র ও পদদলিত নিম্নশ্রেণীর উত্থানের উপরেই মানবসভ্যতার এই ক্রমোন্নতি নির্ভর করিতেছে—এই মত দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন।

সপ্তম প্রবন্ধ (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৯৩)

১। আমি এতাবৎ যাহা লিখিয়াছি, তাহা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুখরোচক (palatable) হইবে না। তাঁহারা বলিবেন, ইউরোপের ঐসব দেশের খবরে আমাদের কি প্রয়োজন? কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আমাদের নিজস্ব ভারতীয় জিনিষকে রক্ষা করিতে হইলে পাশ্চাত্য দেশের ভাব, আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতিকে সাদরে আমাদের মধ্যে আমন্ত্রণ করিতে হইবে। নতুবা আমাদের যাহা নিজস্ব তাহা ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিব না ("The most important objective is, and must inevitably be, the admission into India of Occidental ideas, methods and culture: even if we are ambitious to conserve what is sound and beneficial

in our indigenous civilization, we can only do so by assisting very largely the influx of Occidentalism. ……We are to have what the West can give us, because what the West can give us is just the thing and the only thing that will rescue us from our present appalling condition of intellectual and moral decay.") ।

২। মিঃ মেহেতা বলেন, সমাজের নিম্নস্তরের সর্ব্বহারাদের দুর্দ্দশা ও অজ্ঞানতা দূর করা অনাবশ্যক এবং সেজন্য পরিশ্রম করার এখনও সময় আসে নাই (Mr. Mehta says, "the awakening of the masses from their ignorance and misery is entirely unimportant and any expenditure of energy in that direction entirely premature.")। সর্ব্বহারাদের সম্পর্কে প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু বলে, কিন্তু কেহই কিছু করে না (…of that vast unhappy proletariat about which everybody talks and nobody cares.)। মিঃ মেহেতার কথার মধ্যেই বুঝি যে, সর্ব্বহারাদের উপেক্ষা করিয়া আমরা এক ঘোর সমাজ-বিপ্লবের বীজ বপন করিতেছি এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমার এই অভিযোগ যে, তাঁহারাই এই কার্য্য করিতেছেন।

৩। যখন কংগ্রেসের মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপর আমাদের কোনই আশাভরসা নাই, তখন এই নিমজ্জমান সর্ব্বহারাদের উপর নির্ভর করা ভিন্ন আর আমাদের কোনই উপায় নাই ("The proletariat among us is sunk in ignorance and overwhelmed with distress. But with that distressed and ignorant proletariat,—now that the middle-class is proved deficient in sincerity, power and judgement —with that proletariat resides, whether we like it or not, our sole assurance of hope, our sole chance in the future.") ।

৪। সমাজের নিম্নস্তরের সর্ব্বহারাদের উন্নত করিবার জন্য কংগ্রেস কোনই চেষ্টা করিতেছে না। অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই Proletariatদের মধ্য হইতে ভবিষ্যতে এক অতি ভয়ঙ্কর বিপ্লব (terrible, awful, bloody, disastrous) প্রধূমিত হইয়া উঠিবে।

৫। কংগ্রেস-রাজনীতিতে আমাদের নেতৃবৃন্দ শুধু জলে বুদ্‌বুদ্‌ লইয়া খেলা করিতেছেন মাত্র ('playing with bubbles')। Legislative Council, Simultaneous Examination, Separation of Executive & Judical Functions—এইগুলি জলের বুদ্‌বুদ্‌। কিন্তু অন্যদিকে গভীর সমুদ্রের তলদেশে যে আলোড়ন হইতেছে এবং যাহার উপরে কৃত্রিম সভ্য সমাজের প্রলেপ দেখা যাইতেছে—তাহা সমুদ্রের তলদেশের আলোড়নে একদিন ডুবিয়া, ভাসিয়া, মুছিয়া যাইবে ("the waters of the great deep are being stirred, and that surging chaos of the primitive man over which our civilised societies are superimposed on a thin crust of convention, is being strangely and ominously agitated.")। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ইহা লক্ষ্য করিতেছেন না। প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

মন্তব্য—

(ক) এই প্রবন্ধে অরবিন্দ অতিশয় প্রাঞ্জল ভাষায় বলিতেছেন যে, কংগ্রেস-উপেক্ষিত ভারতের নিম্নস্তরের ক্ষুধিত সর্ব্বহারার দল একদিন ক্ষিপ্ত হইয়া এমন বিপ্লবের সূত্রপাত করিবে, যাহাতে কংগ্রেস ও তাহার মধ্যবিত্তেরা কোথায় ডুবিয়া, ভাসিয়া, মুছিয়া যাইবে, তাহার চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। যদি এরূপ হয়, তবে কংগ্রেসই তাহার জন্য দায়ী। যাঁহারা অরবিন্দকে স্বপ্নবিলাসী বলিতে ইচ্ছুক, এক্ষেত্রে তাঁহারা তাহা বলিতে পারেন। কিন্তু মি: নেভিন্‌সনের সহিত (The New Spirit in India) একমত হইয়া আমরা বলিতে পারি যে—অরবিন্দ এমন এক স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, যাহা ভারতবর্ষে তখন অপর কেহ দেখেন নাই। এই দূরদৃষ্টি, স্বপ্নবিলাসী (mystic) অরবিন্দকে ভারতের অন্য সকল নেতা হইতে, লোকমান্য তিলক বিপিনচন্দ্র পাল লালা লাজপৎ রায় হইতেও পৃথক করিয়া একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন রূপ প্রদান করিয়াছে—তাঁহার চরিত্রের একটা বিশিষ্ট মর্য্যাদা ইতিহাসে রেখাপাত করিয়াছে—তাঁহার স্বপ্ন, যুক্তি-বহির্ভূত নয়।

(খ) স্বামী বিবেকানন্দ শূদ্র জাতির বা নিম্নস্তরের উত্থানের যে পরিকল্পনা আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, অরবিন্দের পরিকল্পনাও তদনুরূপ। অরবিন্দের পরিকল্পনাই আগে (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা

অনুযায়ী অরবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দকে এইকালের আধুনিক কমিউনিষ্ট গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

(গ) কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ আর শ্রীঅরবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। মিঃ মেহেতা ও মিঃ মনমোহন ঘোষের কংগ্রেসী-জাতীয়তা জাতির নিম্নস্তরকে যেরূপ উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে, শ্রীঅরবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম হইতেই আমাদিগকে ঠিক তাহার বিপরীত কথা শুনাইতেছেন। মেহেতা ও মনমোহন ঘোষ বলেন: নিম্নস্তরকে…তা …ঐ…কি বলে…তেমন দরকার নাই; আমরাই ত তাদের পক্ষে ওকালতি করিতেছি; ওতেই হবে। কিন্তু অপরপক্ষে শ্রীঅরবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন: ওতে হবে না; জাতির নিম্নস্তরের বিরাট জনতা নিজেরাই অগ্রসর হইয়া জাতির এই পরাধীনতার শৃঙ্খল দৃঢ়-হস্তে ছিন্ন করিবে; মধ্যবিত্ত ও উচ্চবর্ণেরা তফাৎ হইয়া যাও। এ একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী। ইহার মধ্যে মিল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অনুরূপ কথাই বলিয়া গিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে, গয়া কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে এই প্রলেটেরিয়েটবাদকে পুরোদমে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: "I protest against the concentration of power in the hands of the middle-class. I do not believe that the middlle-class will then part with their power. My ideal of Swaraj will never be satisfied unless the people co-operate with us in its attainment." ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর, দেরাডুন বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন: "I do not want that sort of Swaraj which will be for the middle-classes alone. I want Swaraj for masses, not for the classes. I do not care for the bourgeoisie. How few are they? Swaraj must be for the masses, and must be won by the masses." ১৯২২ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের অরবিন্দকেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অনুসরণ করিতেছেন। ইহাতে অরবিন্দের চিন্তাধারার দূরদর্শীতাই প্রমাণিত হইল।

অষ্টম প্রবন্ধ (৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪)

[১৮৯৩-এর ডিসেম্বরে লাহোরে কংগ্রেস হইয়া গিয়াছে। দাদাভাই নৌরোজী বিলাতে Finsbury হইতে পার্লামেন্টে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন। এই লাহোর কংগ্রেসের ১ মাস পর দাদাভাই-এর সভাপতির বক্তৃতা পাঠ করিয়া অরবিন্দ এই প্রবন্ধটি লিখিতেছেন।]

১। মধ্যবিত্তশ্রেণী (burgess body) পরিচালিত কংগ্রেসের সমগ্র জাতি যে একটা জীবন্ত প্রাণী (organism), এরূপ ধারণা নাই। নিম্নশ্রেণীর (proletariat) সহিত কংগ্রেসের মধ্যবিত্তশ্রেণীর (burgess-body) অঙ্গাঙ্গি যোগ আছে, এ ধারণা তাহাদের নাই। চারিপার্শ্বের অবস্থা সম্বন্ধেও তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। ইহা আমি বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সে-চেষ্টাও যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না।

২। আমাদের ভুঁইফোঁড় মধ্যবিত্তশ্রেণী একদিকে সহানুভূতিহীন 'বুরোক্র্যাসী' অন্যদিকে অসার নির্জ্জীব প্রলেটারিয়েটদের মধ্যস্থানে থাকিয়া শুধু নিজেরাই উচ্চ পদবী ও ক্ষমতা লাভের জন্য উদগ্রীব হইয়া কংগ্রেসী আন্দোলন সুরু করিয়াছেন।

৩। কংগ্রেসের এই ভুঁইফোঁড় মধ্যবিত্তেরা না জানে রাজ্যশাসনের কৌশল, না জানে অত্যাচারী শাসনকে যথাযথরূপে বাধা দিবার কৌশল; সে ক্ষমতা ইহাদের নাই। ইহাদিগকে পরিচালিত করিবার জন্য একজন উপযুক্ত নেতার (Messiah) প্রয়োজন। সেই নেতা নাই। ফ্রান্সে যেমন নেপোলিয়ান জন্মিয়াছিল, ভারতে তেমন কোন নেপোলিয়ান জন্মে নাই।

৪। ইউরোপীয়ানরা বলে যে, এশিয়ার জাতিসকল জড়পদার্থের মত স্থবির, তাহাদের কোন উন্নতিমুখী গতি দেখা যায় না। কেবল ইউরোপের জাতিসকলই প্রগতিশীল এবং উন্নতিমুখী। কিন্তু একথা আদৌ সত্য নয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সত্যই উন্নতিমুখী। গণতান্ত্রিক আমেরিকা ও অত্যাচারী রাশিয়াকে উন্নতিমুখী বলা যায় না। জার্মানী, ইটালী ও স্পেনে খুব কম উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। তবে ইউরোপের জাতিসকলের মধ্যে একটা গতি (fluidity) আছে। এবং সেই গতিমুখে তাহাদের ভবিষ্যৎ-উন্নতির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইহার দ্বারা ইউরোপীয়ানরা এশিয়াবাসীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (superior), এমন কথা বলা যায় না।

৫। আমাদের দেশে প্রাচীন উচ্চশ্রেণীরা (nobility) রাজ্যশাসন করিত ; এখন তাহারা ধ্বংসোন্মুখ। ইংরেজ আমলের নূতন মধ্যবিত্তেরা রাজনীতি ও রাজ্যশাসনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং আমরা একটা বিদেশী শাসন দ্বারা পরিচালিত, শোষিত ও পর্যুদস্ত হইতেছি—এই ত আমাদের অবস্থা।

৬। আমাদের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শাসকবর্গ কখনও মনে করেন না যে, আমরা প্রাচীন আর্য্যজাতির বংশধর। তাঁহারা মনে করেন, আমরা অসভ্য ও বর্ব্বর। আমাদের কোনই ইতিহাস নাই। যাহা আছে তাহা কতকগুলি এলোমেলো ঘটনার বনজঙ্গলে পূর্ণ।

মন্তব্য—

(ক) অরবিন্দ আমাদের মধ্যবিত্তশ্রেণীকে অতিশয় কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীরাই নির্জীব, অচেতন ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করিয়াছে। অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসে ফাঁসীর মঞ্চে যাঁহারা জীবনের জয়গান গাহিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই মধ্যবিত্তশ্রেণী হইতে আসিয়াছেন। অরবিন্দ নিজেও স্বদেশীযুগে এই মধ্যবিত্তশ্রেণীদের লইয়াই রাজনীতি চর্চ্চা করিয়াছেন এবং তারপর মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারের সময় মধ্যবিত্তশ্রেণীর এই বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন যে—মর্লির শাসন-সংস্কার শিক্ষিত শ্রেণীর ক্ষমতা হ্রাস করিবে এবং এই শিক্ষিত শ্রেণীই জাতির মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্বরূপ ("this reform would diminish the political power of the *educated class which was the brain and backbone of the nation.*")। নিম্নশ্রেণী সম্পর্কে অরবিন্দের ধারণা ফরাসীদেশের নিম্নশ্রেণীদের দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবান্বিত। পূর্ব্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানেরা সংখ্যায় অধিক। স্বদেশী আন্দোলনের বয়কট ব্যাপারে এই নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা ইংরেজ শাসক ও মুসলমান নেতাদের কুপরামর্শে যেরূপ হিন্দুবিদ্বেষ ও দেশদ্রোহিতা প্রকাশ করিয়াছে এবং এই মুসলমান নিম্নশ্রেণীরা যে এতদূর পর্য্যন্ত ইহা করিতে পারে ১৮৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দের তাহা বিবেচনায় আসে নাই। আমাদের নিম্নশ্রেণী সম্পর্কে অরবিন্দের ধারণা বহুলাংশে কল্পনাপ্রসূত। অবশ্য ফরাসীদেশে রোমান-ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের মধ্যে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কলহে অগ্নি ও জ্বলিয়াছে রক্তস্রোতও প্রবাহিত হইয়াছে। St. Bartholomew ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু ফরাসীদের ধর্ম্ম-কলহ শেষপর্য্যন্ত Liberty, Equality

ও Fraternityর পতাকা হস্তে শুধু রাজারাণীর মুণ্ড কাটিয়া ফরাসীদেশকে অত্যাচার-মুক্ত করে নাই, পরন্তু যীশুখ্রীষ্টের অভ্যুদয়ের পর সমগ্র ইউরোপে আবার একটা নূতন আলো বিকীর্ণ করিয়াছে—নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে স্বদেশীযুগে নিম্নস্তরের হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্ম-কলহে এরূপ কোন-কিছুই করিতে পারে নাই। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানে এই কলহ বাঙ্গালাদেশে স্বদেশীযুগের অধঃপতন ঘটাইয়াছে।

(খ) অরবিন্দের অনুরূপ কথা স্বামী বিবেকানন্দ অন্য আকারে বলিয়াছেন। স্বামীজি বলিয়াছেন—পৃথিবীর কোন দেশেই, কোন জাতির মধ্যেই সত্ত্বগুণ নাই। তবে ইউরোপের দেশগুলিতে রজোগুণের প্রাবল্য, আর এশিয়ার দেশগুলিতে বিশেষতঃ আমাদের ভারতবর্ষে তমোগুণের প্রাবল্য। ইউরোপ রজোগুণ হইতে উন্নতির পথে সত্ত্বগুণে পৌছিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষকে সত্ত্বগুণে পৌছিতে হইলে তমো হইতে রজোগুণের মধ্য দিয়া সত্ত্বগুণে পৌছিতে হইবে। সুতরাং ভারতের পক্ষে এক্ষণে রজোগুণ অর্থাৎ ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োজন। স্বামীজির মতে, তমোগুণাশ্রিত ভারতে অহিংসারূপ সত্ত্বগুণের আমদানী করিলে উহা ধোপে টিকিবে না। সত্ত্বগুণ রজোগুণের উপরে শিকড় গাড়িতে পারে, তমোগুণের উপর পারে না। অতএব, ভারতের জন্য চাই রজোগুণ। স্বামীজির সিদ্ধান্তের সহিত মূলতঃ শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধান্তে মিল রহিয়াছে। তবে, উভয়ের প্রকাশভঙ্গী কিছুটা ভিন্ন রকমের।

(গ) 'অরবিন্দ' এই প্রবন্ধে দাদাভাই-এর বক্তৃতার কোন সমালোচনা প্রত্যক্ষভাবে করিলেন না। হয়ত জানুয়ারীর (১৮৯৪ খৃঃ) কোন প্রবন্ধে করিয়া থাকিবেন, উহা আমরা পাই নাই।

একাদশ প্রবন্ধ—(৫ই মার্চ্চ, ১৮৯৪)

১। যেসকল সিভিলিয়ানরা ইংলণ্ড হইতে আমাদের শাসন করিবার জন্য এখানে আগমন করে, তাহারা ভাল বংশের ছেলেও নয়, তাহাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং তাহাদের ব্যবহার ও আচরণ দাম্ভিকতায় পূর্ণ (bad in training, void of culture, in instruction poor, it is in plain-truth a sort of education that leaves him with all his original imperfections on his head, unmannerly, uncultivated, unintelligent.)।

২। হিঃ হিউম কংগ্রেসের জন্মদাতা। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ। ইনি

ইংরেজ আমলে মধ্যবিত্তশ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য কংগ্রেস গঠন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সর্বহারা নিম্নশ্রেণীকে (Proletariat) তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যেন তাহারা কেহই নয়, কিছুই নয়। কিন্তু আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে—তাহারাই সব, তাহারাই সবকিছু, তাহাদের হাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ রাজনীতি, আশা-আকাঙ্খার চাবিকাঠি। আজ তাহারা অসার নির্জীব জড়পদার্থের মত আছে বটে, কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় একদিন যদি তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, তবে প্রলয়কাণ্ড ঘটিবে। একথা কি মিঃ হিউমের বিবেচনায় আসে নাই? আসা উচিত ছিল ("Mr. Hume's conception is narrow and impolitic. He must have known, none better, what immense calamities may often be ripening under a petty and serene outside. He must have been aware, none better, when the fierce pain of hunger and oppression cuts to the bone, what awful elemental passions may start to life in the mildest, the most docile proletariats. ... ... In Mr. Hume's formation, the proletariat remained, for any practical purpose, a piece off the board. Yet the proletariat is, as I have striven to show, the real key of the situation. Torpid he is and immobile, he is nothing of an actual force, but he is a very great potential force, and whoever succeeds in understanding and eliciting his strength becomes by the very strength the master of the future.") ।

৩। সুতরাং মধ্যবিত্তশ্রেণীর কর্তব্য নিম্নস্তরকে (proletariat) সঙ্গে লইয়া তাহাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি বিধান করা।

মন্তব্য—

(ক) ইংরেজ সিভিলিয়ানদের সম্পর্কে অরবিন্দ একাধিকস্থানে এরূপ কঠোর সমালোচনা এবং তাহাদের জাতজন্মের উপর এমন তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন যে, বিলাতপ্রবাসের শেষ দুইবৎসরে তিনি ইচ্ছা করিয়াই ইহাদের দলভুক্ত হইতে চাহেন নাই। এবং আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, তিনি ইচ্ছা করিয়াই ঘোড়ায়-চড়া পরীক্ষায় ফেল করিয়া সিভিলিয়ান চাকুরীর উপর যবনিকা টানিয়া দিয়া তাহাদের উপর একটা আক্রোশ লইয়াই দেশে ফিরিয়াছেন। যদিও তাঁহার পিতা ডাঃ কে. ডি. ঘোষ ১৮৯০খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর

একখানা স্মরণীয় চিঠিতে এমন আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, অরবিন্দ আমাদের শাসন-বিভাগে একটি উজ্জ্বল রত্ন হইবে এবং তাহার বিচক্ষণ শাসনকার্য দ্বারা দেশকে গৌরবান্বিত করিবে ("Auro, I hope, will yet glorify his country by brilliant administration")। কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই অরবিন্দ তাঁহার পিতার এই আশা ও স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত করেন নাই। ইংরেজ শাসনের মূলোচ্ছেদ করার ব্রত যিনি গ্রহণ করিয়া সিভিলিয়ান গোষ্ঠির মুখে থুথু দিতে দিতে দেশে ফিরিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ইংরেজের অধীনে দেশবাসীর উপর শাসনকার্য চালান কিছুতেই সম্ভব নয়। সিভিলিয়ান অরবিন্দ কল্পনার অতীত বস্তু।

(খ) কংগ্রেসের জন্মদাতা হিউম সম্বন্ধে অরবিন্দ যে সমালোচনা করিয়াছেন, সেরূপ আর কেহই করেন নাই। ইহা মৌলিকতায় পরিপূর্ণ এবং অতিশয় যুক্তিপূর্ণ।

গোটাদুই প্রবন্ধ 'ইন্দুপ্রকাশে' পাওয়া গেল না, তথাপি এই প্রসঙ্গে অরবিন্দের চিন্তাধারা বুঝিতে উপরের প্রবন্ধগুলিই যথেষ্ট। অরবিন্দের মনের পরিচয় আমরা পাইলাম। তাঁহার মানসিক বিকাশের ইতিহাসে এই প্রবন্ধগুলিই পাদপীঠ অর্থাৎ প্রথম স্তর বলিয়া ধরা যায়।

অরবিন্দ তাঁহার জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজ শাসনের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়াই দেশে ফিরিয়াছেন। সুতরাং এই প্রবন্ধগুলি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়—বিলাতপ্রবাসের শেষ দুইবৎসরে ইহা তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত। তিনি ইংরেজের শাসন উচ্ছেদ করিবার জন্য চাহিতেছেন একটা বিপ্লব—জাতিকে অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্র করিয়া ফরাসী বিদ্রোহের মত একটা রক্তাক্ত বিদ্রোহ। এইরূপ যাঁহার মনের অভিপ্রায় তাঁহার পক্ষে ইংরেজের অধীনে সিভিলিয়ান চাকুরি করা কি সম্ভব? এবং তাঁহার পিতার আশা (to 'glorify his country by brilliant administration') পূর্ণ করা কি সম্ভব? একথা সত্য নয় যে, তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ফেল হওয়ার দরুন আক্রোশবশতঃ এদেশে ইংরেজ শাসনের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন এবং সেইজন্যই তিনি 'ইন্দুপ্রকাশের' এই প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন।

অরবিন্দের মনের পরিচয় পাইলাম। এখন এই প্রবন্ধগুলি কংগ্রেস

নেতৃবৃন্দের মনে ও যুবকদের মনে কি আলোড়ন সৃষ্টি করিল, তাহা আমরা দেখিব। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অতিশয় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। আবার অন্যদিকে, যুবকেরা অত্যন্ত উৎসাহ দেখাইয়া এই প্রবন্ধগুলির প্রতি আকৃষ্ট হইল। অরবিন্দের কথাই তুলিয়া দিতেছি। অরবিন্দ লিখিতেছেন—

"মনে পড়ে, আমি পনের বৎসর আগে বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া যখন বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় কংগ্রেসের নিবেদন-নীতির তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন স্বর্গগত মহাদেব গোবিন্দ র‍্যাণাডে যুবকদের মনে এই প্রবন্ধগুলির ফল হইতেছে দেখিয়া, তাহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে, আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইবামাত্র আধঘণ্টা পর্যন্ত এই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কোন কার্য্যভার গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। তিনি আমার উপর জেল-প্রণালী সংশোধনের ভার দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। র‍্যাণাডের অপ্রত্যাশিত উক্তিতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, এবং সেই ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম।" —(কারাকাহিনী, ৩য় সংস্করণ—পৃঃ ৪৪-৪৫)।

এখন অরবিন্দের কথাগুলি বিশ্লেষণ করা যাক—

(১) মিঃ র‍্যাণাডে তখন বোম্বাই হাইকোর্টের জজ। কংগ্রেসের জন্মদাতা হিউম সাহেব মিঃ র‍্যাণাডে সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে—ভারতবর্ষে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সর্বক্ষণ যদি কোন একজন ব্যক্তি দেশের জন্য চিন্তা করিয়া থাকেন, তবে সেই ব্যক্তি হইতেছেন মিঃ র‍্যাণাডে ('If there is one man in India who in the whole twenty-four hours of the day thinks of his country that man is Mr. Ranade.')। মিঃ র‍্যাণাডে, মিঃ গোখেলের দীক্ষাগুরু। তিনি কংগ্রেসের নিবেদন-নীতির সম্পূর্ণ সমর্থক। কাজেই রক্তাক্তবিপ্লব-বিরোধী তো বটেই।

(২) শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধগুলি সেখানকার যুবকদের মন আকৃষ্ট করিতেছে। এবং যুবকেরা আকৃষ্ট হওয়ায় মিঃ র‍্যাণাডে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়াছেন।

(৩) মিঃ র‍্যাণাডে আধঘণ্টা পর্য্যন্ত যুবক অরবিন্দকে এইরূপ প্রবন্ধ লিখিতে নিষেধ করিয়া বিষয়ান্তরে লেখনী চালনা করিতে সদুপদেশ দিয়াছিলেন।

(৪) মিঃ র‍্যাণাডের কথায় যুবক অরবিন্দ আশ্চর্য্যও হইয়াছিলেন অসন্তুষ্টও হইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহ করেন নাই। মিঃ র‍্যাণাডের কথাই মানিয়া লইয়া বিষয়ান্তরে অর্থাৎ 'বঙ্কিম প্রসঙ্গে' লেখনী চালনা করিয়াছিলেন।

দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখিয়াছেন—

"কংগ্রেসের অন্ধ সেবকগণ তাঁহার (অরবিন্দের) যুক্তি খণ্ডন করিতে না পারিয়া তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহুদর্শী, বিজ্ঞোত্তম মহামতি র্যাণাডে মহাপণ্ডিত মনীষী হইলেও, তিনিও নাকি অরবিন্দের যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার প্রবন্ধে কংগ্রেসের অনিষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় র্যাণাডে তাঁহাকে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনায় বিরত হইতে অনুরোধ করেন। অরবিন্দ তাঁহার সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি 'ইন্দুপ্রকাশে' কংগ্রেস সম্বন্ধে কোন কথার আলোচনা করেন নাই।"—("অরবিন্দ-প্রসঙ্গ'—পৃঃ ৫৯)।

কংগ্রেসের প্রাচীনপন্থীরা অরবিন্দ-প্রদর্শিত নূতন আলোক (New Lamps for Old) দেখিতে চাহিল না। তাহাদের চক্ষু ঝলসাইয়া গেল—এ আলোক সহ্য করিতে পারিল না। কিন্তু আবার অন্যদিকে যুবকেরা এই নূতন আলোকের দিকে পতঙ্গের মত ছুটিয়া আসিল। এই প্রবন্ধগুলি তখনকার কংগ্রেসের অনিষ্ট করিতে পারে—এই আশঙ্কাও প্রাচীনপন্থীদের মনে জাগিয়াছিল। সুতরাং প্রবন্ধগুলি অরবিন্দের দিক হইতে পণ্ডশ্রম হয় নাই—কংগ্রেসের ইতিহাসে ইহা একটি গভীর রেখাপাত করিয়া গিয়াছে।

বঙ্কিম প্রসঙ্গ

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে অরবিন্দ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লেখা বন্ধ করিয়া দিলেন। এবং বঙ্কিমের মৃত্যুর তিন মাস সাতদিন পরেই অরবিন্দ বঙ্কিম সম্বন্ধে সাতটি প্রবন্ধ লিখিলেন। ১৮৯৪-এর ৮ই এপ্রিল বঙ্কিমের মৃত্যু হয়। বঙ্কিমের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অরবিন্দ বঙ্কিম সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি এই—

SARASWATI WITH THE LOTUS

(Bankim Chandra Chatterjee, Obiit 1894)

Thy tears fall fast, O mother, on its
bloom,
O white-armed mother, like honey fall
thy tears ;
Yet even their sweetness can no more
relume

The golden light, the fragrance heaven
rears,
The fragrance and the light for ever
shed
Upon his lips immortal who is
dead.

ইহার পরেও অরবিন্দ বঙ্কিম সম্বন্ধে আর একটি কবিতায় লিখিয়াছেন. "The sweetest voice that ever spoke in prose."

এই কবিতা লিখিবার পরে ১৮৯৪।১৬ই জুলাই হইতে ১৮৯৪।২৭শে আগষ্ট— এই দেড় মাসের মধ্যে অরবিন্দ বঙ্কিম সম্পর্কে সাতটি প্রবন্ধ লিখিলেন। অরবিন্দের ভগিনী শ্রীযুক্তা সরোজিনী ঘোষ আমাদিগকে বলিয়াছেন যে—অরবিন্দ I. C. S. পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা নিয়াছিলেন ; এবং বঙ্কিম তাঁহার পাঠ্য ছিল। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষাতেই তিনি বঙ্কিমের উপন্যাস কেম্ব্রিজে থাকাকালীন পাঠ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা বলিতে না পারিলেও তিনি উহা পড়িতে ও বুঝিতে পারিতেন।

দীনেন্দ্রকুমার রায় অরবিন্দের বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষক ছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে দীনেন্দ্রবাবু বরোদায় অরবিন্দের সহিত একঘরে দুই বৎসর বাস করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অরবিন্দ নিজেই পড়িতেন, বেশ বুঝিতে পারিতেন। কথোপকথনের ভাষা তিনি ভাল বুঝিতে পারিতেন না।" দীনেন্দ্রবাবু প্রত্যক্ষদর্শী। সুতরাং তাঁহার কথা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। এক্ষণে প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রবেশ করা যাক।

১ম প্রবন্ধ (১৮৯৪।১৬ই জুলাই)—যৌবন এবং কলেজে পাঠ্যাবস্থা ('Youth and College-life') :

অরবিন্দ লিখিতেছেন যে—বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮।২৭শে জুন কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৪।৮ই এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর জীবিতকাল মাত্র ৫৬ বৎসর। তিনি হুগলী কলেজে, টুলো পণ্ডিতের টোলে, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে বিদ্যাভ্যাস করেন। বঙ্কিম এবং যদুনাথ বসু, এই দুইজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি-এ পাশ ছাত্র। অতঃপর মাত্র ২০ বৎসর বয়সে, যশোরে বঙ্কিম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে বহাল হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন।

তারপর অরবিন্দ বলেন—যেরূপ সামাজিক আবেষ্টনের মধ্যে মানুষ শৈশব হইতে বর্দ্ধিত হয়, সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবেষ্টন ভবিষ্যতে জীবনের

গতিপথকে নির্দ্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং দেখিতে হইবে বঙ্কিমের উঠন্ত বয়সে তাঁর চারিদিকের আবেষ্টনটি কিরূপ ছিল।

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে ইহার আলোচনা দেখা যায়।

২য় প্রবন্ধ (১৮৯৪।২৩শে জুলাই)—বঙ্কিমের সময়ে বাংলাদেশের অবস্থা ('The Bengal He lived in') :

বঙ্কিমের যখন ১২ বৎসর বয়স তখন আমরা ঠিক উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৫০ খৃঃ) আসিয়া পৌছি। অরবিন্দ বলেন—১৮৫০খৃষ্টাব্দের বাংলাই বঙ্কিমের মনের খোরাক জোগাইয়াছে। রামমোহন রায় এক নূতন ধর্ম্ম হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। রামমোহন অপেক্ষাও বড়, রাজনারায়ণ বসু ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ঐ ধর্ম্মকে আরো নূতন পথে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন (* ক)। অক্ষয়-কুমার ও মধুসূদন—এই দুই দত্তসন্তান একজন নূতন গদ্য আর একজন নূতন পদ্য সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ('scholar, sage and intellectual dictator') নূতন বাংলা ভাষা এবং নূতন বাঙ্গালী সমাজ সৃষ্টি করেন। আর জ্ঞানের বিশালতায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সমকক্ষ কাহাকেও দেখা যায় না। মধুসূদনের বন্ধু গৌর বসাক এবং নূতন বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—ইঁহাদের নামও উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন হিন্দু, সংসার মায়া বলিয়া বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি খুঁজিয়াছিল। কিন্তু নব্য বাংলা ঠিক তার বিপরীত জিনিষ খুঁজিতেছিল। জীবনের আনন্দ, উল্লাস ও ভোগপ্রবণতাই ("Life's joy, warmth and sensuousness") তাঁর লক্ষ্য ছিল। এই সুর অনেকটা ষোড়শ শতাব্দীর অনুরূপ, অনেকটা গ্রীক প্যাগানিজমে ফিরে যাওয়ার মত—যা' এখন (১৮৯৪ খৃঃ) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে দেখা যাইতেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ সম্বন্ধে অরবিন্দের অভিপ্রায় বুঝা গেল। তিনি বাল্যকাল হইতে বিলাতে থাকিয়া বাংলাদেশ সম্বন্ধে, ২২ বৎসর মাত্র বয়সে, যতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন, দেশে থাকিয়াও অনেকে এতটা ওয়াকিবহাল

(* ক) "Rammohun Roy arose with a new religion in his hand, which was developed on original lines by *men almost greater one thinks than he,* by Rajnarain Bose and Debendranath Tagore".—['*Bankim Ch. Chatterji*'—*23rd July, 1894*]

নহেন। অরবিন্দ বলিতেছেন—রাজনারায়ণ বসু ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়েই রাজা রামমোহন হইতে বড়। সম্ভবতঃ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ রামমোহনের সকল রকম লেখা ও রচনাবলীর সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত হইবার সুযোগ পান নাই। পাইলে এরকম ভ্রমাত্মক ও উদ্ভট জল্পনা তাঁহার লেখনী হইতে বহির্গত হইবার কথা নয়।

তারপর অরবিন্দ, মধুসূদন কতগুলি ভাষা জানিতেন, তা বলিলেন। যথা—ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, ইটালীয়ান, ফরাসী। শেষে তরুদত্ত সম্বন্ধে অজস্র প্রশংসা করিলেন—যাহা এপর্য্যন্ত আর কেহ করে নাই (* খ)।

বঙ্কিমের সমসাময়িক দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ মিত্রের কথা বলিলেন। বঙ্কিমের পরে ('After Bankim came the Epigoni') হেম, নবীন ও রবীন্দ্রনাথের কথা এইভাবে শেষ করিলেন যে—তাঁহারা সেলী প্রমুখ ইংরেজ কবিদের দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবান্বিত ('too obviously influenced by Shelley and the English poets')।

তারপর অরবিন্দ কেশব সেনের ধর্ম্ম আর কৃষ্ণদাস পালের রাজনীতিকে প্রাণ খুলিয়া গালি দিলেন। এমন গালি কেহ দেয় নাই। হিন্দু কলেজকে নব্য যুগের নার্সারী বলিয়া সম্মান দিলেন। এবং ইহা ঠিকই করিলেন।

বঙ্কিম শেষবয়সে যখন ধর্ম্মে মন দিলেন তখনও সন্ন্যাসকে যে তিনি তাঁহার ধর্ম্মমতে প্রশ্রয় দেন নাই, এজন্য অরবিন্দ বঙ্কিমকে অতিশয় সুস্থমস্তিষ্কযুক্ত ব্যক্তি বলিলেন ('the clear serenity of the man showed itself in his refusal to admit asceticism among the essentials of religion')। ১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচারী গিয়া শ্রীঅরবিন্দকে দেখিয়া বলিয়াছেন—"মধ্যযুগের খৃষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাই

(* খ) "Toru Dutt, that unhappy and immature genius, who unfortunately wasted herself on a foreign language and perished while yet little more than a girl, had, I have been told, a knowledge of Greek. At any rate, she could write English with perfect grace and correctness, and French with energy and power. Her novels gained the ear of the French public and her songs breathed fire into the hearts of Frenchmen in their fearful struggle with Germany".—['*Bankim Ch. Chatterji*'—*July 23, 1894*]

চরিতার্থতা বলেন নি।" রবীন্দ্রনাথ নিজের পক্ষেও বলিয়াছেন—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" সুতরাং বঙ্কিম, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ—ইঁহারা সকলেই 'সন্ন্যাসের রিক্ততা'র বিরুদ্ধে একমত। ইঁহারা তিনজনই সন্ন্যাসের বিরোধী।

অতএব প্রথম হইতেই স্বামী বিবেকানন্দের সহিত অরবিন্দের এইখানে সুস্পষ্ট মতভেদ লক্ষ্য করা যাইতেছে। মিঃ র‍্যাণাডে একবার সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে বলায়, তার কিছু পরেই, স্বামীজী মিঃ র‍্যাণাডেকে, যাকে বলে খুড়িয়া দিয়াছিলেন। ইহা সর্ব্বজন বিদিত। দেখা যাইতেছে, সন্ন্যাস সকলের ধাতে সয় না। গার্হস্থ্যও তাই। ধাতবিশেষ আছে। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ একধাতের লোক নহেন।

অরবিন্দ যে বরোদায় বসিয়া এইসকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ—ইহাতে এই প্রদেশের তিনজন বিখ্যাত ব্যক্তির উল্লেখ আছে। যথা—(১) ডাঃ ভাণ্ডারকার, (২) মিঃ র‍্যাণাডে, (৩) মিঃ তেলাং।

তারপর প্রতিভার বিকাশে সামাজিক আবেষ্টনের গুরুত্ব নির্দ্দেশ করিয়া (*গ) এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে উহা নাই বলিয়া প্রাণ ভরিয়া গালি দিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ বাংলাদেশকে কতটা জানিতেন—এই প্রবন্ধ না-পড়িলে তা বুঝা যায় না।

৩য় প্রবন্ধ (১৮৯৪।৩০শে জুলাই)—বঙ্কিমের কর্ম্ম-জীবন ('His Official Career') :

অরবিন্দ বলেন—বঙ্কিমের কর্ম্মজীবনে ২১ বৎসর বয়সে তাঁহাকে যশোরে দেখিতে পাই এবং ৫৩ বৎসর বয়সে তাঁহাকে আলিপুরে দেখিতে পাই। ইতিমধ্যে যশোর-কাঁথি-খুলনা-সুন্দরবন-বহরমপুর-মালদহ-হুগলী-সেক্রেটারিয়েট-

(* গ With a limited creature, like man, the power of the environment is immense. Genius, it is true, exists independently of environment and by much reading and observation may attain to self-expression ; but it is environment that makes self-expression easy and natural, that provides sureness, verve, stimulus. Here lies the importance to the mind in its early stage of self-culture of fine social surroundings,"—['*Bankim Ch. Chatterji'—July 23, 1894*]

আলিপুর-আরামবাগ (উড়িষ্যা)-হুগলী পুনরায় সর্বশেষে আলিপুর তিনি হাকিমি করেন। মৃত্যুর ২।৩ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে তিনি রুগ্ন অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন।

খুলনাতে তিনি নীলকর সাহেবদের অত্যাচার দমন করেন। সুন্দরবনে জলদস্যুদের সায়েস্তা করেন।

নীলকর সাহেবদের প্রজাপীড়ন সম্পর্কে, অরবিন্দ খুব কড়া কথা বলিয়াছেন। যথা: "Ruffians from Europe"—"brutality"—"rascalities"—ইত্যাদি।

উচ্চপদস্থ সাহেব কর্ম্মচারীদের সহিত বঙ্কিমের যেসকল সংঘর্ষ হয় সে-কথাও অরবিন্দ উল্লেখ করিয়াছেন। এবং এইরকম একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সম্পর্কে তিনি আদৌ সাধু ভাষা প্রয়োগ করেন নাই (* ঘ)। সমালোচনায় অরবিন্দ নির্ভীক।

যশোরে বঙ্কিমের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। কিন্তু দীনবন্ধু মিত্রের সহিত আমৃত্যু বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। কাঁথিতে বঙ্কিম দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবং এই বিবাহকে অরবিন্দ বলেন, 'more fortunately'।

দ্বিতীয়বার বিবাহে অরবিন্দের আপত্তি নাই। সমর্থন আছে।

৪র্থ প্রবন্ধ (১৮৯৪।৬ই আগষ্ট)—বঙ্কিমের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ('His Versatility'):

অরবিন্দ বঙ্কিমের বহুমুখী প্রতিভার বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, তিনি পণ্ডিত-কবি-রচনালেখক-ঔপন্যাসিক-দার্শনিক-আইনজ্ঞ-সমালোচক-ম্যাজিষ্ট্রেট-ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন। ইহার কারণ, তিন হাজার বৎসরের একটা প্রাচীন সভ্যতার সন্তান বলিয়া প্রতিভা স্বভাবতঃই বহুমুখী হয়। সাহিত্যে আবার যাঁহারা সমালোচক তাঁদের প্রতিভা বহুমুখী হইতে বাধ্য হয়। যেমন—জার্ম্মানিতে গেটে; ইংলণ্ডে সেক্সপিয়ার, ফিল্ডিং, ম্যাথু আর্ণল্ড।

কিন্তু বঙ্কিম জানিতেন যে, গদ্য-সাহিত্যেই তাঁহার প্রতিভার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ-ক্ষেত্র। এবং তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই।

অরবিন্দ বলেন—একটা বহুমুখী প্রতিভা যদি সকলদিকেই অবাধ

(* ঘ) "...Munro, the Presidency Commissioner, a farouche bureaucrat with the manners of an Englishman and the temper of a badly-educated hyena."—['*Bankim Ch. Chatterji*'—*July 30, 1894*]

বিকাশে প্রশ্রয় পায়, তবে সে কোনদিকেই কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। কেননা, মানুষের মন এমন একটা পদার্থ—যা অন্য পদার্থের মতই চারিদিকে অপব্যয়িত হইলে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (*৬)। সুতরাং আগে হইতেই নিজের পথটি বাছিয়া লইতে হইবে। নইলে বিপদ।

মিঃ তেলাং বহুদিকে লিখিতে গিয়া এবং বিশেষত: ইংরেজী ভাষায় লিখিতে গিয়া মৃত্যুর পর বড়কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

ভারতবাসীদের ইংরেজীতে লেখা অরবিন্দ পছন্দ করিলেন না। পরের প্রবন্ধে এ-বিষয়ে আরো জোর দিয়া বলিবেন। হয়ত মতটি ভাল। কিন্তু আমাদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়া গেল।

বঙ্কিম ৪০ বৎসর পরিশ্রম করিয়া মাত্র ১০ খানি উপন্যাস, ২ খানি ধর্ম্ম-সংক্রান্ত পুস্তক এবং আরকিছু বিবিধ রচনা মাত্র রাখিয়া গিয়াছেন। অরবিন্দ বলেন—পরিমাণে কম হইলেও ইহা খাঁটি সোনা ('Small in quantity, it is pure gold in quality')।

৫ম প্রবন্ধ (১৮৯৪।১৩ই আগষ্ট)—বঙ্কিম সাহিত্যের ইতিহাস ('His Literary History'):

অরবিন্দ বলেন—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি সর্ব্বপ্রথম বাল্যকালেই বঙ্কিমের প্রতিভা দেখিতে পায়। মধুসূদন যেমন প্রথমে ইংরাজী ভাষায় কবি হইতে চাহিয়াছিলেন, বঙ্কিমও সেইরূপ প্রথমে ইংরাজীতে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। এবং মধুসূদন ও বঙ্কিম উভয়েই তাঁহাদের ভুল বুঝি। পরে ইংরাজী ছাড়িয়া বাঙ্গলাভাষা অবলম্বন করিয়াছিলেন। অরবিন্দের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, মানুষ যে-ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষায় রীতিমত শিক্ষা না-পাওয়া সত্ত্বেও সে তাহার কথিত ভাষার মধ্য দিয়াই নিজের প্রতিভাকে প্রকাশ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুযোগ পায়।

(*৬) "..the mind is as mortal and as much subject to wear and tear as any perishable thing, forgetting that specialism is one condition of the highest accomplishment, forgetting that our stock of energy is limited, and that what we expand in one direction, we lose in another. We insist on burning the candle at both ends."—[*'Bankim Ch. Chatterji,' Aug. 6, 1894*]

মানুষ তার কথিত ভাষা অবহেলা করিতে পারে, ভুলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ঐ ভাষায় জন্মস্বত্বে যে অধিকার, তাহা সে কখনও হারায় না। সাহিত্যে মৌলিক কিছু নূতন সৃষ্টি করিতে হইলে, মানুষের কথিত ভাষাই তাহার সব চেয়ে বড় আশ্রয়। একটা বিদেশী ভাষায় নূতন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব নয় (* চ)। বঙ্কিম এবং মধুসূদন ইহা বুঝিতে পারিয়াই, একজন Captive Ladyর পর আর দ্বিতীয় ইংরাজী কাব্য লেখেন নাই, এবং আর একজন Rajmohun's Wife-এর পর দ্বিতীয় নভেল লিখেন নাই। শ্রীঅরবিন্দ নিজে কিন্তু বাংলা ভাষাতে বেশীকিছু লিখেন নাই।

বঙ্কিম খুলনাতেই প্রথম উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন এবং বহরমপুরে তাঁহার ঔপন্যাসিক জীবনের শেষ আমরা দেখিতে পাই। বহরমপুরেই তিনি 'বঙ্গদর্শন' বাহির করেন এবং এই প্রকার মাসিক পত্রিকার অনুকরণে প্রসিদ্ধ 'ভারতী' পত্রিকা দেখা দেয়। অরবিন্দ পর পর বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির নাম করেন। বঙ্কিমের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, তিনি যৌবনে ভোগবিলাসী ছিলেন। একজন শিল্পী (artist) যেরূপ দৃষ্টিতে মনুষ্য জীবনের রস ও রূপকে দেখে ও আস্বাদন করে, বঙ্কিম তাহাই করিয়াছেন; এবং সন্ন্যাসজীবনের বর্ব্বরোচিত রিক্ততা ও শূন্যতা হইতে এবং ভোগবিমুখ নিছক ত্যাগের আদর্শ হইতে তাচ্ছিল্যের মৃদু হাস্যে মুখ ফিরাইয়াছেন (* ছ)। জীবনের শেষ অঙ্কে যখন

(* চ) "The language which a man speaks and which he has never learned, is the language of which he has the nearest sense and in which he expresses himself with the greatest fulness, subtlety and power. He may neglect, he may forget it, but he will always retain for it a hereditary aptitude, and it will always continue for him the language in which he has the safest chance of writing, with originality and ease. To be original in an acquired tongue is hardly feasible".—[*'Bankim Ch. Chetterji',—Aug. 13, 1894*]

(* ছ) He (Bankim) had been a sensuous youth and a joyous man. Gifted supremely with the artist's sense for the warmth and beauty of life, he had turned with a smile from the savage austerities of the ascetic and with a shudder from the dreary creed of the Puritan".—[*'Bankim Ch. Chatterji' —Aug. 13, 1894*]

মৃত্যুর ছায়া তিনি দেখিতে পাইলেন, তখন দর্শন ও ধর্ম্মসংক্রান্ত রচনাসকল তিনি লিখিতে লাগিলেন। ফলে তাঁহার মধ্যে যে রসপিপাসু ও রসপ্রকাশ শিল্পী ছিল, তাহার মৃত্যু হইল এবং তিনি একজন দার্শনিক ও ধর্ম্মসংস্কারকরূপে দেখা দিলেন। কিন্তু তাঁহার দশটি উপন্যাস দশটি অমর কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ বাঁচিয়া রহিল।

তারপর অরবিন্দ সাহিত্যে বঙ্কিমের স্থান নির্দ্দেশ ('his place in literature') করিতে গিয়া বলিলেন যে—বাঙ্গালীর গদ্য-সাহিত্যে বঙ্কিমের দ্বিতীয় নাই। ইংরাজী ভাষার উপন্যাস-লেখকদের সহিত তুলনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, তিনি সকল ইংরাজ উপন্যাস-লেখক অপেক্ষা নির্দ্দোষ শিল্পী ('faultless artist')। চরিত্র-অঙ্কনে ইংরাজ ঔপন্যাসিকদের পিতা হেন্‌রী ফিল্‌ডিং-এর সহিত তাঁহার সাদৃশ্য আছে; কিন্তু দার্শনিক চিন্তায়, জীবন-কাব্যের অপরিসীম সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে ও প্রকাশে, বঙ্কিম ফিল্‌ডিং হইতেও বড়। মূর্খ ব্যক্তিরা নাজানিয়া, না-বুঝিয়া, স্কটের সহিত তুলনা করিয়া বঙ্কিমের অপমান করিয়া থাকেন। অরবিন্দ এই কার্য্যকে বলিয়াছেন, 'সিল্‌লি' (silly)—স্কটের বিশেষ কোন রচনাপদ্ধতি (style) নাই, সুনির্ম্মল পরিহাস (humour) নাই, স্কটের চরিত্রগুলি পুতুল মাত্র, প্রাণ নাই। স্কট বড়জোর একটা কাঠামো তৈরী করিতে পারিত, কিন্তু তাহার উপর মূর্ত্তি গড়িয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত না। এইখানে বঙ্কিমের বিশেষত্ব এবং কৃতিত্ব। বঙ্কিমের সৃষ্ট চরিত্রগুলির কথায় ও কাজে এত সামঞ্জস্য দেখা যায় যে, ঐ চরিত্রগুলিকে সত্যিকার জীবন্ত পুরুষ ও নারী বলিয়া ভ্রম হয়। বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলির মধ্যে যে আশ্চর্য্য প্রেম ও কাব্যরস অনুভূত হয়, ইংরাজী উপন্যাসে ব্রণ্টে ভগিনীত্রয় (Brontes) ও জর্জ মেরেডিথ (George Meredith) ব্যতিরেকে কুত্রাপি তাহার জুড়ি মেলে না। নারীচরিত্রের রহস্য অঙ্কনে যে নাটকীয় প্রতিভার প্রয়োজন, বঙ্কিমে তাহা ছিল। সমসাময়িক ইংরাজী উপন্যাসের মধ্যে সন্তরণ করিয়া দেখিলে একটিও জীবন্ত নারীচরিত্র দেখা যায় না। এখানে ফিল্‌ডিং (Fielding) পরাজিত; স্কটের নারীচরিত্রগুলি যেন মোমের পুতুল—'রেবেকা' (Rebecca) একটি রঙ্গীন পুতুল ভিন্ন আর কিছুই নহে। এমন কি, থ্যাকারে (Thackeray)-এর মধ্যেও জীবন্ত নারীচরিত্র তিনটি কি বড়জোর চারিটি হইবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্সপীয়র (Shakespeare) এই নারী-

চরিত্রের রহস্য-অঙ্কনে নিপুণ ছিলেন। আর ছিলেন—ইংরাজী সাহিত্যে মেরেডিথ্, আর বাঙ্গলা সাহিত্যে বঙ্কিম।

তারপরে অরবিন্দ ব্রাহ্মসমাজ-সংস্কারকদিগের উপর একচোট নিলেন। নিয়া বলিলেন যে, সংস্কারকেরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ধার করিয়া একটা রঙীন চশমা পরিয়া হিন্দুর জীবনযাত্রার সারপদার্থ কিছুই দেখিলেন না। এবং হিন্দু স্ত্রীলোকদের জীবনে নিছক দাসত্ব ভিন্ন আর কিছুই দেখিলেন না। এবং সেই দাসত্বের সঙ্গে কেবল দেখিলেন—সঙ্কীর্ণতা আর অজ্ঞানতা। কিন্তু বঙ্কিম কবির দৃষ্টি লইয়া এই হিন্দুনারীর মনের তলায় লুক্কায়িত অনেক গভীর জিনিষ দেখিতে পাইলেন। তিনি হিন্দুনারীর প্রাণের ভালবাসা দেখিলেন এবং মহত্ত্ব দেখিলেন; হিন্দুনারীর গভীর প্রেমানুরাগ, তাঁহাদের একনিষ্ঠতা ('Steadfastness'), কোমলতা এবং তাঁহাদের মিষ্ট স্বভাব—এক কথায়, বঙ্কিম হিন্দুনারীর সমস্ত প্রাণটাই দেখিতে পাইলেন। এবং এই হিন্দুনারীর চরিত্র বঙ্কিম-লিখিত উপন্যাসের প্রতি-পাতায় যেন জ্বলিতেছে—ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়। সংস্কারকেরা বঙ্কিমের এই হিন্দুনারীকে পরিত্যাগ করিয়া সমাজে এক নূতন ধরনের নারীচরিত্র সৃষ্টি করিতেছেন—যাহাদের প্রাণ নাই এবং যাহারা অত্যন্ত হাল্কা এমন সব জীব, যাহারা কেবল ছেনালী ঘটকালী ও পিয়ানো বাজাইতে মজবুত ("a soulless and superficial being fit only for flirtation, match-making and playing on the Piano")।

এ কথার উপরে আমাদের কথা বলিতে ভাষা জোগায় না; শুধু নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া এই নিষ্ঠুর সমালোচনার তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত অথবা বিষাক্ত বৃশ্চিকদংশনের মর্ম্মজ্বালা যে-শ্রেণীর নারীরা আপন বক্ষে অনুভব করিবেন তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পা নয়, কেননা সেটা স্পর্দ্ধার কথা—সমবেদনা জানাইতেছি। সমালোচনায় অরবিন্দ স্পষ্টভাষী, কিন্তু নির্দ্দয়। তারপরে অরবিন্দ কুণ্ঠিতচিত্তে বলিয়াছেন যে, বঙ্কিমের 'ষ্টাইল' সম্বন্ধে কিছু বলা তাঁহার পক্ষে দুঃসাহস।

কিন্তু এতটা যিনি লিখিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে দুঃসাহস বলিয়া কোন-কিছু আছে মনে হয় না। অরবিন্দ বলেন যে, বঙ্কিমের ষ্টাইলের সৌন্দর্য্য—ঋজুতা শক্তি এবং মিষ্টতা বর্ণনা করা তাঁহার লেখনীর পক্ষে অসাধ্য।

তারপরে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য একটি কথা অরবিন্দ বলিয়াছেন—অনুপম সৌন্দর্য্যানুভূতি বঙ্কিমী রচনার বৈশিষ্ট্য। এবং এই বৈশিষ্ট্য তিনি পাইয়াছেন ইয়ুরোপীয় আদর্শ (models) হইতে। পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন যে—শিল্পীর যে রসানুভূতি হইতে 'শকুন্তলা'র জন্ম হইয়াছে, 'কপালকুণ্ডলা' ও 'বিষবৃক্ষ'-এর জন্ম তাহা অপেক্ষা কম নয় (* জ)। সুতরাং অরবিন্দের মতে, 'কপালকুণ্ডলা' 'বিষবৃক্ষই' বঙ্কিমের উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং বঙ্কিম কালিদাসের সহিত তুলনীয়। বঙ্কিমের যে সমালোচনা অরবিন্দ তাঁহার মৃত্যুর বৎসরেই করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্তও তাহার তুল্য সমালোচনা কেহ করিতে পারেন নাই। অরবিন্দের বাঙলা সাহিত্যের জ্ঞান ও তাঁহার সমালোচনা-প্রতিভার উজ্জ্বলতা বিদ্যুতের ঝলকের মত আমাদের চক্ষুকে প্রতিহত করিতেছে।

বঙ্কিম সম্বন্ধে আরও দুইটি প্রবন্ধের বিষয় বলিতে হইবে। কেননা, অরবিন্দ মোট সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা পাঁচটি সম্বন্ধে বলিয়াছি, আরো দুইটি বাকী।

৬ষ্ঠ প্রবন্ধ (১৮৯৪।২০ আগষ্ট)—বঙ্কিম বাঙ্গলার জন্য কী করিয়াছেন ('What he did for Bengal') :

অরবিন্দ বলেন, এইবার আরও দুইটি বিষয়ে বঙ্কিম সম্বন্ধে বলা দরকার। ১ম—বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিম-সাহিত্যের স্থান। ২য়—বাঙ্গালী জাতির উপর এই সাহিত্যের প্রভাব।

মধুসূদন ও বঙ্কিমের পূর্ব্বে বাঙলা-সাহিত্যের সুর যেন শুধু একতারা যন্ত্রে ('instrument with but one string to it') বাজিতেছিল। এক ভারতচন্দ্র ব্যতীত আর কোন বড় প্রতিভা বাঙলা-সাহিত্যে দেখা যায় না। বেতাল পঞ্চবিংশতি (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ?) ব্যতীত গদ্যে কিছু ছিল না। বাঙলা-পদ্যও একটা একঘেয়ে মিষ্টি সুরে ভরা ছিল মাত্র। তেজস্বিতা, সূক্ষ্মতা ও বিভিন্ন দিকে অবাধ বিস্তার—এ সকলেরই অভাব ছিল। তারপরে আসিলেন মধুসূদন ও বঙ্কিম। মধুসূদনের হাতে বাঙ্গলাভাষার নাকে কাঁদুনি মেয়েলী সুর পরিত্যক্ত হইল। তার পরিবর্ত্তে তিনি আনিলেন সমুদ্রের গর্জ্জন।

(* জ) "The *Sakuntala* itself is not governed by a more perfect graciousness of conception or suffused with a more human sweetness than *Kopal Kundala* and the *Poison-Tree*".—[*'Bankim Ch. Chatterji'—Aug. 13, 1894*]

স্বয়ং মিলটনের শয়তানের বজ্রনির্ঘোষ মাইকেলের প্রত্যেক ছত্রে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

তারপরে আসিলেন বঙ্কিম। বঙ্কিমই নূতন গদ্যের জন্মদাতা। কিন্তু মাইকেল ও বঙ্কিমের পূর্ব্বেও অনেকে সাহিত্যক্ষেত্রে নামিয়া ইঁহাদের দুই জনের জন্য পথ প্রস্তুত করিতেছিলেন। যথা—রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙ্গলার নাটক-লেখকেরা।

বাঙ্গলাদেশে ইংরাজি-শিক্ষা প্রচলনের প্রথম ফল এই দাঁড়াইল যে—ইংরাজি-নবিসেরা, যা'কিছু ইংরাজি তা-ই ভাল বলিতে লাগিলেন, আর যা'কিছু বাঙ্গলা তাই ঘৃণা করিতে লাগিলেন। অবশ্য বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয় দত্ত, ইঁহারা উভয়ে ইংরাজিনবিস বাঙ্গালীবাবুদের ভ্রান্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া ঠিকপথে চলিবার সঙ্কেতধ্বনি করিলেন। ঠিক এই সময় মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা' ও 'তিলোত্তমা' প্রকাশিত হইল। এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডে মার্লো-রচিত 'টাম্বুরলেন' (Tamburlain) অথবা উনবিংশ শতাব্দীতে হুগো-রচিত 'হার্ণানি' (Hurnani) যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল, 'শর্ম্মিঠা' ও 'তিলোত্তমা' তাহাই করিল। বাঙ্গলা সাহিত্যে ইঁহারাই প্রথম রোমাণ্টিক সুর ধ্বনিত করিল—যাহা এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যকে পরিচালিত করিতেছে। কিন্তু সংস্কৃতনবিস পণ্ডিতেরা সাহিত্যে এই রোমাণ্টিক অভ্যুদয়ের এবং এই মাইকেলী ঢং-এর বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি, স্বয়ং বিদ্যাসাগর ('then the intellectual dictator of Bengal') চমকিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পরিশেষে সংস্কৃতনবিসদের (classical literature) পরাজয় হইল এবং মাইকেলী রোমাণ্টিক-সাহিত্যের জয় হইল। 'তিলোত্তমা' প্রকাশেই উভয় দলের কলহের সূত্রপাত দেখা দিল (Tilottoma had been the *causus belli*) এবং 'মেঘনাদবধ'-এ বাঙ্গালা-সাহিত্যে ক্লাসিকের দল একেবারে কুপোকাৎ—নস্যাৎ হইয়া গেল ('that marvellous epic, the Meghanadabadha was the *coup de grace*')। বিদ্যাসাগর যেদিন মেঘনাদ কাব্যের প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিলেন সেইদিন সংস্কৃতনবিসদের নাভিশ্বাস উপস্থিত হইল।

তারপর মধুসূদনের পরেই আসিলেন বঙ্কিম। মাইকেলের বিরুদ্ধে যাঁহারা তুমুল কোলাহল করিয়াছিলেন, বঙ্কিমের বিরুদ্ধে তাঁহারা তত বেশী কিছুই

করিতে পারিলেন না। মধুসূদন সংস্কৃতনিসজ্জর বিরুদ্ধে জয়ী হইবার পর বঙ্কিম অপে কাকৃত শান্তিপূর্ণ আসরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এইবার অরবিন্দ, মাইকেলের সহিত বঙ্কিমের সাহিত্যে ও জীবনে একটা তুলনা করিয়াছেন। মধুসূদন নূতন পদ্য-সাহিত্যের রাজা। আর বঙ্কিম নূতন গদ্য-সাহিত্যের রাজা। অরবিন্দের মতে, উভয়েই রাজা —প্রজা কেহই নহেন। মাইকেলী সাহিত্যকে তিনি অতি উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন (* ক)। বঙ্কিমের জীবনকে মাইকেলের জীবনের সঙ্গে তুলনা করিয়া তিনি বঙ্কিমকে অধিকতর সৌভাগ্যবান বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, বঙ্কিমের প্রভাব ক্রমশঃই অধিকতর বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। ফলে, একজন মারাঠি বা গুজরাটি যদি কোন বড় কথা বলিতে চান তবে তিনি তাহা বলেন ইংরাজিতে আর বাঙ্গালী বলেন বাঙ্গলাতে। অরবিন্দের মতে, বঙ্কিমের প্রভাবেই বাঙ্গালীর এই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আর এই পরিবর্ত্তনের ফলে বাঙ্গালী একটা সঙ্ঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। তারপর অরবিন্দ বলেন, আমাদের কথাবার্ত্তার মধ্য হইতেও ক্রমশঃ ইংরাজী বলা-কওয়া উঠিয়া গিয়া নিছক শুদ্ধ বাংলার প্রচলন হইবে, এবং এবিষয়ে বঙ্কিমের সহযোগী কালীপ্রসন্ন ঘোষের অবদান ও প্রভাবকে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই ত গেলো ষষ্ঠ প্রবন্ধের মোটামুটি কথা।

(* ক) "As we read the passage of that Titanic personality (Madhusudan) over a world too small for it, we seem to be listening again to the thunder-scenes in Lear, or to some tragic piece out of Thucydides or Gibbon narrating the fall of majestic nations or the ruin of mighty kings. No sensitive man can read it without being shaken to the very heart.

"Bankim's influence has been far-reaching and every day enlarges its bounds. What is its result ? Perhaps it may be very roughly summed up thus : when a Mahrathi or Gujerati has anything important to say, he says it in English ; when a Bengali, he says it in Bengali. That is, I think, the fact which is most full of meaning for us in Bengal",—[*'Induprakash'—20th Aug. 1894.*]

যে-কালে অরবিন্দ এইসকল কথা লিখিয়াছিলেন সেকাল আর নাই। গত ৬২ বৎসরে প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে 'হাজার বছরের পুরানো বাংলা' আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এইকালে, বঙ্কিমের পরবর্তী যুগেও বাংলা-সাহিত্য একটা গৌরবময় ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছে। বঙ্কিমের পর এই দীর্ঘ বৎসরগুলিও রবীন্দ্রনাথ যে 'রাবেন্দ্রিক যুগ' বাঙ্গলা-সাহিত্যকে উপঢৌকন দিয়া গিয়াছেন সে-সম্বন্ধে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দের পক্ষে কিছু লেখা সম্ভব হয় নাই—যাহা আমাদের পক্ষে এখন না-লেখা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। মাইকেলে যে-যুগ আরম্ভ, বঙ্কিমে তাহা শেষ হয় নাই। বঙ্কিমের মধ্য দিয়া আজও পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথেই তাহা পরিপুষ্ট ও পরে পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। এখনকার মাপকাঠিতে অরবিন্দের তখনকার গবেষণাকে বিচার করিলে ঠিক বিচার হইবে না।

প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে ভারতচন্দ্র ব্যতীত অরবিন্দ আর কাহাকে দেখিলেন না, নাম পর্য্যন্ত করিলেন না। ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক রামপ্রসাদেরও নয়। ভারতচন্দ্র যে মহাকবিকে অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াছেন সেই কবিকঙ্কনের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। ইহাতে বুঝি বঙ্কিম সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি লিখিবার সময় অরবিন্দ তাঁহার দাদামহাশয় রাজনারায়ণ বসুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা" পাঠ করেন নাই। যদি করিয়া থাকেন তবে অরবিন্দ কবিকঙ্কনের নামোল্লেখ করিলেন না কেন? মাইকেল ও বঙ্কিম সম্বন্ধে অরবিন্দের সমালোচনা রাজনারায়ণ বসুর সমালোচনার পরে হইলেও, উহা পাঠের পর লেখা হইয়াছে কি-না বুঝা গেল না। যিনি রাজনারায়ণ ও অরবিন্দকে এ-বিষয়ে তুলনামূলক বিচার করিবেন, তিনিই আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের একটা মস্ত উপকার করিবেন। আর অরবিন্দের এই প্রবন্ধগুলি এতদিন পর্য্যন্ত কিন্তু কেহ জানিতই না। ...যতদূর দেখিলাম রাজনারায়ণবাবু মাইকেলকে দেখিয়াছেন জাতীয়তার দিক দিয়া, আর অরবিন্দ দেখিয়াছেন কবি-প্রতিভা আর কাব্যসৃষ্টির দিক দিয়া (* খ)। দুই দিক

(* খ) মাইকেলের সহাধ্যায়ী ও পরমবন্ধু পরলোকগত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—"জাতীয় ভাব বোধ হয় মাইকেল মধুসূদনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোন বাঙ্গালী কবিতে তাহা হয় না।.........বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে কবিকঙ্কণ যেমন জাতীয়ভাবসম্পন্ন তেমন অন্য কোন কবি নহেন।.........মিল্টনে যেরূপ ভাবের গভীরতা, শব্দবিন্যাসের রাজগাম্ভীর্য্য ও

দিয়াই দেখা চলে। এ-বিষয়ে আর অধিক বলিতে গেলে অনেক ছড়াইয়া পড়ে।

৭ম প্রবন্ধ (১৮৯৪।২৭ আগষ্ট)—**আমাদের ভবিষ্যতের আশা** ('Our Hope in the Future') :

অরবিন্দ বলেন, বঙ্কিম-সাহিত্য একটা বিদ্রোহের যুগ আনয়ন করিয়াছে। এই বিদ্রোহের চিহ্ন সব দিকেই দেখা যাইতেছে। যেমন 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের' প্রভাব কমিয়া আসিতেছে, লোকের মন আবার হিন্দুধর্ম্মের দিকে ফিরিয়া যাইতেছে, বাঙ্গালা-ভাষা সংস্কৃতের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে এবং তরুণদের মধ্যে অতি উগ্র রকমের জাতীয়ভাবের উন্মেষ দেখা যাইতেছে। কেশব সেন ও কৃষ্ণদাস পাল ধর্ম্মে ও রাজনীতিতে বাঙ্গলার যে তরুণ সম্প্রদায়কে মাতাইয়াছিলেন, দাসসুলভ ইংরাজের অনুকরণকারী সেই তরুণের দল আর নাই। তাহাদের স্থানে যে তরুণের দল আসিয়াছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে বঙ্কিমের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইঁহারা কেশব সেন ও কৃষ্ণদাস পালকে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। বঙ্কিম-অনুপ্রাণিত এই তরুণের দল সম্পূর্ণভাবে একটা জাতীয় উদ্দীপনায় মাতোয়ারা হইয়া বাঙ্গলাদেশকে এবং তাহার অতীত ও বর্ত্তমান গৌরবকে ভালবাসিতে ও ভক্তি করিতে শিখিয়াছে। এই তরুণদের উপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ—অরবিন্দ স্পষ্ট বলেন—নির্ভর করিতেছে না ১ম, বিজাতীয় কংগ্রেসের উপর এবং ২য়,

---

রচনার জমজমাট দৃষ্ট হয়, মাইকেলের কবিতাতে ততটা দৃষ্ট হয় না।....... এই সকল ও অন্য বহুবিধ দোষ সত্ত্বেও কে না স্বীকার করিবে যে, মাইকেল মধুসূদন একজন অসাধারণ কবি?"—[বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা—পৃঃ ৩৪-৩৬]

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন: "জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন'।"

বঙ্কিমের জাতীয়তাবোধ মাইকেলী সাহিত্যকে বিজাতীয় বলিল না। কিন্তু রাজনারায়ণের জাতীয়তাবোধ, বিজাতীয় বলিল। জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, অরবিন্দ বঙ্কিমকে অনুসরণ করিলেন—রাজনারায়ণকে করিলেন না। মহামনীষাসম্পন্ন সমালোচকেরাও একই বস্তুর সমালোচনায় দেখা যাইতেছে, শুধু পৃথক নয়, বিরোধী সিদ্ধান্তেও গিয়া উপনীত হ'ন। তাঁহাদের বিভিন্ন ও বিরোধী মতবাদ সমালোচনা-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপর ("The future lies not with Indian un-National Congress or the Sadharan Brahmo Samaj.")

ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী ইহা অপেক্ষা প্রাঞ্জল হইতে পারে না।

তারপর অরবিন্দ বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে খুব উচ্চপ্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে—বাঙ্গালী এমন একটা জাতি যার সাহস, বুদ্ধি-কৌশল এবং কল্পনাশক্তি পৃথিবীর যে-কোনও বুদ্ধিমান জাতি অপেক্ষা বড়। এবং যদি এই বাঙ্গালী জাতি অধ্যবসায় ও শারীরিক বলে বলীয়ান হয়, তবে একদিন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী জাতিতে পরিণত হইবে। বঙ্কিম-অনুপ্রাণিত তরুণ বাঙ্গালীর মধ্যে এক নূতন স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হইতেছে। রাজনীতিতে চিরদিনই বাঙ্গালী পথপ্রদর্শন করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে এবং 'বাঙ্গালী কাল যাহা ভাবিবে, ঠিক এক সপ্তাহ পরে সমগ্র ভারতবর্ষ তাহাই ভাবিবে'। বাঙ্গলার যে একটা নিজস্ব সভ্যতা আছে, সেই সভ্যতার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, বাঙ্গালীর যেন কখনও তাহা বিস্মরণ না হয়। 'বাংলার প্রাণ'-এর বিরুদ্ধে যে বাঙালী, সে যেন কখনও বেইমানি না করে (* গ)।

অরবিন্দের প্রাণখোলা কথা বুঝা গেল। আমাদেরও মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিল। কিন্তু বাংলাদেশে বেইমানের ত কখনও অভাব হয় নাই—হয় না। বঙ্কিম, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন—ইঁহাদের চক্ষে বাংলার যে রূপ একদিন উদ্ভাসিত

(* গ) "…a people spirited, bold, ingenious and imaginative, high among the most intellectual races of the world, and if it can but get perseverance and physical elasticity, one day to be high among the strongest."

"……we see the embryo of a new generation soon to be with us, whose imagination Bankim has caught and who care not for Keshab Chandra Sen and Kristo Das Pal, a generation National to a fault, loving Bengal and her new glories……"

"In politics, he (the Bengali) has always led and still leads…*for what Bengali thinks to-morrow, India will be thinking to-morrow week.*"

"Let Bengal be only true to her own soul, and there is no Province in which she may not climb to greatness."—[*Induprakash—27th Aug., 1894*]

হইয়াছিল—ইতিহাসের ধারায় তাহা অম্লান, অক্ষয় অমর হইয়া রহিয়াছে। "বাংলার রূপ গেল মুছে" বলে যদি কেহ আজ না-হক্ বাচালতা করে তবে বুঝিতে হইবে বাংলাদেশে তাঁহার জন্ম ঠিকমত হয় নাই।

বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির প্রতি এই রকম স্তবস্তুতি করা অরবিন্দের পক্ষে একটু অতিরিক্ত বলিয়া যদি কেহ মনে করেন, তবে তাহার নিকট অরবিন্দ ক্ষমা চাহিয়াছেন এই বলিয়া যে—ইহা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক, কেননা তিনি নিজে একজন বাঙালী (* ঘ)।

আমরা বলি, ইহা আরও স্বাভাবিক এইজন্য যে, অরবিন্দ বিলাতে শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত দীর্ঘ প্রবাসের পর দেশে ফিরিবামাত্রই অকুতোভয়ে প্রকাশ করিলেন যে—তিনি বঙ্কিমের একজন অতিশয় গুণমুগ্ধ ভক্ত। বঙ্কিম-ভক্তের পক্ষে বাঙ্গালী-প্রীতি স্বাভাবিক। আর অরবিন্দ যে বিলাত হইতে ফিরিয়াই বঙ্কিম-ভক্তরূপে দেখা দিলেন, ইহা আশ্চর্য্য। অথচ ইহাই তাঁহার চরিত্রের এক অতি গৌরবময় উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসের ধারায় এই বৈশিষ্ট্য স্থান পাইবে এই বলিয়া যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ২০ বৎসর পূর্ব্বেই অরবিন্দ বঙ্কিম-অনুপ্রাণিত বাঙ্গলার প্রাণের পক্ষপাতী। এবং বাঙ্গালীকে তিনি খাঁটি বাঙ্গালী হইতে পরামর্শ দিতেছেন। মনে রাখিতে হইবে, ইহা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ব্যাপার। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইতে তখনও ৬ বৎসর বাকী, এবং স্বামী বিবেকানন্দের রণডঙ্কা পাশ্চাত্য দেশে তুমুল কোলাহল ও জয়ধ্বনি মাত্র ১১ মাস পূর্ব্বে জাগাইয়া তুলিয়াছে। কালপুরুষের (Zeitgeist) ইঙ্গিতে একই সময়ে এদেশে এবং ওদেশে অরবিন্দ এবং বিবেকানন্দ একই বিজয়ভেরী নিনাদিত করিতেছেন। ইঁহারা দুই জনে একই সময় স্বদেশ-প্রেমের মন্ত্রে জাতিকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেছেন—ইতিহাসের কষ্টিপাথরে ঘষিয়া আমরা তাহাই দেখিতে পাইতেছি।

তারপরে অরবিন্দ এই প্রবন্ধে বাঙ্গালী হিন্দুমেয়েদের সম্বন্ধেও অনেক ভাল কথা বলিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গলা-সাহিত্যকে বাঙ্গালী মেয়েরাই পাঠ করিয়া

(* ঘ) "A Bengali may be pardoned who looking back to a splendid beginning and on to a hopeful sequel, indulges in proud and grandiose hopes."—[*Induprakash—27th Aug., 1894*]

জীবন্ত রাখিয়াছেন। তাঁহারাই বাঙ্গলা-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠিকা এবং চিরদিনই যেন তাঁহারা ঐরূপ থাকেন। তাঁহারা বাপ-ঠাকুর্দ্দার ভাষা বলিতেন, বুঝিতেন। এবং তাঁহারা বিদেশী ভাষার নিকট আত্মবিক্রয় করেন নাই ("they adhered to the language our forefathers spoke, and did not sell themselves to the tongue of the foreigner.")। বিদেশী ভাষার নিকট আত্মবিক্রয় করাটাকে অরবিন্দ শ্লেষ করিতেছেন। নিয়তি কিন্তু পরিহাস করিতে ছাড়ে নাই।

স্পষ্ট দেখিতেছি, ফিরিঙ্গিভাবাপন্ন ইংরাজী শিক্ষিতা মেয়েদের চেয়ে অরবিন্দ দেশীভাবাপন্ন হিন্দুমেয়েদের পক্ষপাতী বেশী। এই সময়টা তাঁহার মনের এইরূপ ভাবই ছিল। শুধু এই সময়টা কেন, ইহার পরেও ৭।৮ বৎসর অর্থাৎ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে তাঁহার বিবাহ পর্য্যন্ত, এইরূপ মনের ভাব না-থাকিলে তিনি স্বজাতির মধ্যে হিন্দু মতে হিন্দুভাবাপন্ন মেয়েকে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতেন না। এবং কেশব সেনের আঠার শ' বাহাত্তুরে 'তিন' আইনের বিবাহ অগ্রাহ্য করিতেন না। বঙ্কিমের উপন্যাসে বিধবা-বিবাহ আছে যৎকিঞ্চিৎ; কিন্তু তিন আইনের বিবাহ নাই। ইহা অরবিন্দ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসের নারী-চরিত্রগুলির প্রভাব, দেশে ফিরিবার পর, উঠন্ত বয়সে অরবিন্দের কল্পনা-রাজ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। আর ইহা শুধু অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ।

তারপর চিত্র ও ভাস্কর্য্য সম্পর্কে একটা অতি গোলযোগপূর্ণ কথার মধ্যে আসিয়া পড়া যাইতেছে। অরবিন্দ বলেন—চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতিতে হিন্দুশিল্পীর কল্পনা ('imagination') উচ্চশ্রেণীর নয়। বরং অত্যন্ত একটা বিশ্রী রুচির পরিচয় পাওয়া যায় ("The favourite style is evidence of a debauched eye and a perverted taste.")।

অরবিন্দ পরবর্ত্তী জীবনে হিন্দু-আর্ট সম্বন্ধে তাঁহার এই মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এখন কথা—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দের এইরূপ মতবাদের কারণ কি?

প্রথম কারণ—মনে হয়, তখন তিনি গ্রীকশিল্পরসানুভূতি (Greek aesthetic sense) দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবান্বিত ছিলেন বলিয়া হিন্দু-আর্ট

সম্বন্ধে তাঁহার ঐরূপ বিকৃত ধারণা জন্মিয়াছিল (* ঙ)। গ্রীকশিল্পরসানুভূতি যে আর্টের জন্ম দিয়াছে, অরবিন্দের চক্ষু তখন কেবল সেই গ্রীক-আর্টের উপরেই নিবদ্ধ ছিল। তখন তিনি গ্রীক-আর্টের রসেই মশগুল ছিলেন। হিন্দু-শিল্পরসানুভূতি হইতে যে আর এক শ্রেণীর (type) আর্ট প্রাচীনকালে আমাদের এই সুপ্রাচীন দেশে দ্রাবিড় ও আর্য্যাবর্ত্তে, মৌর্য্য ও গুপ্ত যুগে জন্ম লাভ করিয়াছিল, অরবিন্দ তখন তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কারণ তখন তিনি সংস্কৃত জানিতেন না এবং হিন্দু-আর্টের নিদর্শনগুলি এদেশে ঘুরিয়া নিজচক্ষে দেখেন নাই। সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে হিন্দুকৃষ্টি ও সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, তখন তাঁহার সে-পরিচয় লাভ হয় নাই। হিন্দুর ধর্ম্ম ও দর্শনের সঙ্গে হিন্দুশিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ-যুগকেও হিন্দু-সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ধরিয়া নিতেছি। অরবিন্দ তখন হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শনের ভিতর দিয়া হিন্দুশিল্পের বৈশিষ্ট্যকে দেখিতে পান নাই।

দ্বিতীয় কারণ—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে প্রাচীন হিন্দু-আর্টের কোন সমাদর লাভ এমন কিছুই হয় নাই, যাহা পরবর্ত্তীকালে হইয়াছে। সুতরাং গ্রীক আর্টের দ্বারা প্রভাবান্বিত অরবিন্দ হিন্দু-আর্টের প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই, অবিচার করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার প্রতিভার তীক্ষ্ণতা ও চরিত্রের মহত্ব ফুটিয়া উঠিল যখন তিনি হিন্দু কৃষ্টি ও সভ্যতা আয়ত্ত করিয়া হিন্দু-আর্টের অনুপম উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের মহান্ ভাবসকল উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। প্রাচীন আর্ট ছাড়িয়া দিয়া অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রবর্ত্তিত প্রাচীন আদর্শে নুতন চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিকে এবং চিত্রশিল্পকে—তিনি বর্ত্তমানে আলোচ্য বঙ্কিমের সৃষ্টি ও পরবর্ত্তী যুগে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি অপেক্ষাও মহৎ ও বড় বলিয়া ঘোষণা করিতে কোনই দ্বিধা করেন নাই। ইহা যেমন অরবিন্দের শিল্পরসবোধ, তেমনি তাঁহার বলশালী চরিত্রের পরিচয়—তাহাতে সন্দেহ নাই।

(* ঙ) "...but Hindu paintings and Chinese architecture exhibit the same superb mastery as Greek sculpture. *To the Greek aesthetic sense all non-Greek types are uncouth or monstrous, if not ugly.*"— [*Dr. Sir Brajendranath Seal—Literature, Four Arts Annual, 1936-37*]

আর্টের সমঝদার ও সমালোচক হিসাবে অরবিন্দের স্থান সকলের উপরে। তাঁহার মধ্যম অগ্রজ, স্বর্গীয় অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের মৃত্যুর পর এক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ নাই বলিলেও হয়।

অরবিন্দ নিজেকে একজন বাঙ্গালী বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন—বাঙ্গলার গৌরবকে প্রচার করিয়াছেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। এবং ইহা মিথ্যা কিছু নয়। কিন্তু তিনি একজন গ্রীক-প্রভাবান্বিত বাঙ্গালী—শুধু বাঙ্গালী নন। এইখানেই তাঁহার চরিত্রের জটিলতা এবং বৈশিষ্ট্য, দুইই। জীবনের পথে এই জটিলতাপূর্ণ চরিত্রের গতিভঙ্গী যথাযথ অনুসরণ করা—আশঙ্কা হয়, যিনি যাই বলুন, শুধু 'বোধি' (Intuition) দ্বারা হইবে না, বুদ্ধি (Intellect) চাই। জীবনের অদ্ভুত ঘটনাগুলির একের পর আর যথাযথ বিন্যাস চাই, বিশ্লেষণ চাই, একটার সঙ্গে আর একটার যোগ আছে কিনা দেখা চাই। এসব তো বুদ্ধি ছাড়া হবার উপায় নাই। জীবনকে বাদ দিয়া—জীবনের গৌরবময় উজ্জ্বল ঘটনাগুলিকে মুছিয়া ফেলিয়া তা আর যাই হোক—জীবনচরিত হয় না। একটা মানুষ, তা সে যত বড় চিন্তাশীল হোক না কেন, শুধু একরাশ চিন্তাই তাঁহার জীবনচরিত নয়।

বাঙলার গৌরব সম্পর্কে বলিতে গিয়াই অরবিন্দ চিত্রশিল্পের কথা বলিতেছিলেন। অরবিন্দ বলিতেছেন, বাঙালীর পক্ষে চিত্রশিল্পটাই ধাতসই বস্তু ('alien sphere') নয় (* ৮)। তথাপি একজন বাঙালী ইটালিতে গিয়া ইটালিয়ানদের মধ্যে চিত্রবিদ্যায় খুব নাম কিনিয়াছেন—ইহা গৌরবের বিষয়। কেননা, ইটালি চিত্রশিল্পের একটি পীঠস্থান। ইহা র‍্যাফেল (Raphael), দাভিঞ্চি (Da Vinci) ও এঞ্জেলো (Angelo)র জন্মভূমি।

অরবিন্দ সম্ভবতঃ শশীকুমার হেসকে লক্ষ্য করিয়া এই কথাগুলি বলিতেছেন। ইহার পাঁচ বৎসর পর বরোদাতেই শশীকুমার হেসের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ

(* ৮) কিন্তু চিত্রশিল্প সম্বন্ধে অরবিন্দ তাঁহার এই মত পরে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে 'কর্ম্মযোগিন্' পত্রিকায় তিনি লিখিয়াছেন—"*No Indian has so strong an instinct for form as the Bengalee.* He has an all-powerful impulse towards delicacy, grace and strength, and it is these qualities to which the new school of art, of which Abanindranath Tagore is the founder and master, has instinctively turned in its first inception."

পরিচয় হইবে। শশীকুমার হেসের পর বাঙ্গলার চিত্রশিল্পে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে নূতন চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, ঐ চিত্রকলাপদ্ধতিকে সিস্টার নিবেদিতার সহিত একযোগে, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে 'কর্ম্মযোগিন্' পত্রিকায়, জাতীয় ভাবের ('national spirit') পরিপোষক বলিয়া অরবিন্দ উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন। পরে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে 'আর্য্য' পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথের এই চিত্র-শিল্পকে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি অপেক্ষা বড় বলিয়াছেন ("the art of the Bengal painters is very significant, more so even than the prose of Bankim or the poetry of Tagore. The art is a true new creation.")।

অরবিন্দ, বঙ্কিমের পরে বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারায় হেমচন্দ্র, নবীন, কামিনী সেন, স্বর্ণকুমারীর নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে—ইঁহারা কেহই মধুসূদন বা বঙ্কিমের সমতুল্য নয়। কিন্তু ইহা প্রমাণ করে না যে, বাঙ্গলা সাহিত্যে সৃজন-শক্তি লোপ পাইয়াছে। অরবিন্দ বলেন, শতাব্দীর ব্যবধানে সেক্সপীয়র এবং মিলটন আসিয়াছিলেন, কিন্তু তার পরে কীট্‌স্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, টেনিসন আসিয়াছে সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় সেক্সপীয়র, দ্বিতীয় মিলটন আসেন নাই। তেমনি বাঙ্গলা-সাহিত্যেও দ্বিতীয় মধুসূদন, দ্বিতীয় বঙ্কিম আসেন নাই। বহু শতাব্দীর ব্যবধানে ইঁহাদের আগমন সম্ভব হয়। যেমন, দান্তে (Dante) এবং ব্যোকেশিও (Boccacio) একের পর আর আসিয়াছিলেন, কিন্তু তারপরে বের্নী (Berni), বোয়ার্ড (Boiard), আল্‌ফিরি (Alfieri), ত্যসো (Tusso) আসিলেও দ্বিতীয় দান্তে, দ্বিতীয় ব্যোকেশিও আসেন নাই। অরবিন্দ বলেন—মধুসূদন ও বঙ্কিম তিনটি জিনিষ দিয়াছেন। ১ম—বাঙ্গলা ভাষা। ২য়—বাঙ্গলা-সাহিত্য, যাহা বর্ত্তমান ইয়োরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্লাসিক সাহিত্যের সহিত সমান আসনে তুলনীয়। আর, ৩য়—দিয়াছেন আমাদের মধ্যে একটা জাতীয়তাবোধ।

কেবল একমাত্র দেশ গ্রীস, যে স্রোতের মত একের পর আর ধারাবাহিকরূপে বড় বড় প্রতিভার জন্ম দিয়াছে। অরবিন্দ বলেন—গ্রীস যাহা পারিয়াছে, হিন্দু তাহা পারিবে না কেন? আমরা যে বলিয়াছি অরবিন্দ গ্রীসের চক্ষু দিয়া হিন্দুকে দেখিয়াছেন—এখানেই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

তারপরে অরবিন্দ প্রাণ ভরিয়া আবার কংগ্রেসকে গালাগালি দিয়া ("the Congress in Bengal is dying of consumption")—'বোনার্জি', 'ব্যানার্জি' ও লালমোহন-মনোমোহন ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতিকে কটু ব্যঙ্গোক্তি

করিয়া [*"O Sage politicians, and subtle economists"..."place-hunting politician"..."noisy social reformer"..."O Sages of the bench and sophists of the bar"...*] কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদ অপেক্ষা বঙ্কিমী জাতীয়তাবাদকে তুলনায় বড় এবং ভাল ('more inspiring patriotism') বলিয়া এবং তরুণদের মধ্যে ইহার প্রভাব ক্রমশঃ অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এতগুলি প্রবন্ধের মধ্যে অরবিন্দ আর দশখানি নভেলের সঙ্গে কেবল 'আনন্দমঠ'-এর নামটি উল্লেখ করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন। তখনও পর্য্যন্ত কি 'আনন্দমঠ' তাঁহার মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই? অথচ 'আনন্দমঠ'-এর 'বন্দেমাতরম্' গীতটি অরবিন্দ স্বদেশীযুগে মন্ত্রের মত সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার সে সাধনা ত ব্যর্থ হয় নাই। ইতিহাস তাহা ভোলে নাই। 'আনন্দমঠ'-এর গল্পে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে-সকল ডাকাতি ও লুণ্ঠতরাজের কথা আছে, স্বদেশীযুগে পুলিশ তাঁহাকে ঐসকল কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে অরবিন্দ যখন 'কর্ম্মযোগিন্' অফিস হইতে লুকাইয়া, প্রথম চন্দননগর, পরে পণ্ডিচেরী—প্রস্থান করেন, তখন ঐ 'কর্ম্মযোগিন্' পত্রিকায় তিনি তাঁহার অনুপম ভাষায় প্রতি সপ্তাহে 'আনন্দমঠ'-এর ইংরাজী অনুবাদ বাহির করিতেছিলেন। অনুবাদ অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি প্রস্থান করিলেন। দেখা যাইতেছে, ১৮৯৪ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ—এই ১৬ বৎসর একাদিক্রমে অরবিন্দ বঙ্কিমের দ্বারা পুরাদস্তুর প্রভাবান্বিত ছিলেন। এবং সেই প্রভাব শুধু সাহিত্যে নয়, রাজনীতিতেও বটে।

আমরা কংগ্রেস ও বঙ্কিম সম্পর্কে অরবিন্দের আলোচনা শেষ করিলাম। কংগ্রেস হইতে বঙ্কিমে আসাতে একটা পরিবর্ত্তনের কথাও উল্লেখ করিয়াছি। এবং সে-কথা কিছু মিথ্যা নয়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে যে একটা যোগসূত্র আছে তাহা বঙ্কিমপ্রসঙ্গ শেষ হইবার পর সহজেই সকলের চক্ষে ধরা পড়ে। কংগ্রেস ও বঙ্কিম, দুইটি পৃথক্ বিষয়ের আলোচনায় আমরা একই অরবিন্দকে পাই। যে উগ্র জাতীয়তাবাদী অরবিন্দ তখনকার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণধার তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই উগ্র জাতীয়তাবাদী অরবিন্দই বঙ্কিমকে পুষ্পচন্দনে পূজা করিয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট প্রকাশ যে, অরবিন্দ অতি উগ্র রকমের জাতীয়তাবাদী।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, কংগ্রেসের জাতীয়তা ও বঙ্কিমের জাতীয়তার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, অরবিন্দ দেশে ফিরিয়াই তাহা লক্ষ্য করিলেন। স্বদেশীযুগে এই বঙ্কিমী জাতীয়তাই অরবিন্দ প্রভৃতিরা কংগ্রেসের উপর আরোপ করিতে চাহিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেদিন মুক্তকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন—

"আজি বাঙ্গলা দেশের
হৃদয় হ'তে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে
বাহির হ'লে জননি!
(ওগো মা) তোমায় দেখে
দেখে আঁখি না ফিরে,
তোমার দুয়ার আজি
খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥
ডান হাতে তোর খড়্গ-জ্বলে
বাঁ-হাত ক'রে শঙ্কাহরণ
তোর দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাট-নেত্র অগ্নিবরণ;
(ওগো মা) তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে,
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে ॥"

এই গানে রবীন্দ্রনাথের উপর বঙ্কিমের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়। অবনীন্দ্রনাথ-ঠাকুরও ভারতমাতার চিত্র আঁকিয়াছিলেন।

১৮৭১ সালের শেষে অরবিন্দের পিতা যখন বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আসিলেন তখন রাজনারায়ণ বসু আক্ষেপ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"আমি এমন আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে তিনি (কৃষ্ণধন ঘোষ) বিলাতে অবস্থিতি-নিবন্ধন দেশীয় ভাব হারাইবেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিলাত হইতে তিনি সম্পূর্ণ ইংরাজ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।" কিন্তু পিতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, পুত্র সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না। অরবিন্দ বিলাতে দীর্ঘ প্রবাসের পর ইংরাজ হইয়া ফিরিয়া আসেন নাই। বরং অতি উগ্র রকমের জাতীয়তাবোধে ভরপুর হইয়া তিনি ফিরিয়াছেন। অবশ্য ইহাই একদিকে ইংরাজি সভ্যতার

পারিপূর্ণতর প্রভাব বলিয়া বোঝা যায়। এবং তাঁহার এদেশে জীবননাট্যের প্রথম অঙ্কে, ১৮৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় কংগ্রেস ও বঙ্কিম উপলক্ষ্যে যে আত্মজীবনীর পরিচয় তিনি নিজে লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবননাট্যের পরের অঙ্কগুলিতে নানা পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সম্পূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

পারিবারিক পরিস্থিতি (পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ): অরবিন্দ দেশে ফিরিবার কিছু পূর্ব্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। সুতরাং দেশে ফিরিয়া তিনি পিতাকে দেখিতে পান নাই। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যখন ডাঃ কে. ডি. ঘোষ তাঁহার গর্ভবতী স্ত্রী, তিন পুত্র ও শিশুকন্যাকে বিলাতে রাখিয়া দেশে আসেন, সেই সময় অরবিন্দ সবে ৮ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। বিলাতে পিতার সহিত ৮ বৎসরের বালক অরবিন্দের সেই শেষ দেখা। আর জীবনে তিনি পিতাকে দেখিতে পাইলেন না। অথচ আমরা দেখিয়াছি, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ কেম্‌ব্রিজ হইতে পিতাকে দীর্ঘ পত্র লিখিতেছেন। ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ, অরবিন্দের সেই পত্র পড়িয়া পুত্র সম্বন্ধে কতই না গর্ব্ব করিতেছেন এবং কত উচ্চ আশা পোষণ করিয়া অরবিন্দের মাতুল যোগেন বসুকে পত্র লিখিতেছেন। অরবিন্দ দেশে ফিরিয়া যে তাঁহার পিতাকে দেখিতে পাইলেন না, ইহা একটা খুব বড় রকমের ট্রাজেডি।

বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন—"বাবার জীবিতকালে কাকাদের, দেওঘরবাসী মাতামহদের ও ন-মেশোমশাইদের (কৃষ্ণকুমার মিত্র) কারু সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক ছিল না।"—(আত্মকথা—পৃঃ ৭১)।

ডাঃ কে. ডি. ঘোষের মৃত্যুর পরেই বারীন্দ্রকুমার দেওঘরে মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর বাড়ীতে আসিয়া (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ভগিনী সরোজিনীও তখন সেইখানেই ছিলেন।

এইবার আমরা অরবিন্দকে লইয়া বরোদা হইতে কলিকাতা আসিব এবং কলিকাতা হইতে দেওঘর ও রোহিনীতে যাইব। অরবিন্দের মাতামহ ও তাঁহার উন্মাদরোগগ্রস্তা গর্ভধারিণীর সহিত অরবিন্দ এই বৎসর দেখা করিতে যাইবেন। অরবিন্দের কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীযুক্তা সরোজিনী ঘোষ ৫।৭।৪০ তারিখে আমাদিগকে এইরূপ বলিয়াছেন—"দেওঘরে মেজদা (মনোমোহন) এবং সেজদা (অরবিন্দ)-এর মধ্যে কে আগে গেলেন, সে-বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে। তবে, যেদিন সেজদাকে নিয়ে বড়দা (বিনয়ভূষণ) গেলেন,

সেদিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আগে একখানা টেলিগ্রাম আসে, তারপর সেজদা আসেন। খুব কচি মুখ, মাথায় বড় বড় চুল, বিলিতি ছাঁটে বাবরী কাটা। সেজদা খুব লাজুক ছিলেন। মেয়েরা যখন তাঁকে ঘিরে পড়ে, তিনি লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলেন। দাদাবাবু (রাজনারায়ণ বসু) সেজদাকে কোলাকুলি দিয়ে তুলে নিলেন।

"মার সঙ্গে রোহিনীতে গিয়ে সেজদা দেখা করিয়াছিলেন। মা চিন্‌তে পারেন নি; বলেন—'আমার অরবিন্দ ছোট ছিল, এত বড় তো নয়'। আরও বলেন—'আমার অরবিন্দের আঙুল কাটা ছিল'। বাস্তবিকই ছেলেবেলায় সেজদার আঙুল বোতলে কেটে গিয়েছিল, তারপর থেকে একটা cross mark ছিল। সেজদা আঙুল দেখিয়ে সনাক্ত হয়। বড়দাকেও এইভাবে চিনেছিলেন। তাঁর চিবুকের কাটা দাগ দেখিয়ে identification মঞ্জুর করাতে হয়। কিন্তু মেজদার বেলায় হলে মুস্কিল। মেজদার গোঁফ দেখে মা বল্লেন—'আমার মানসকুমারের গোঁফ ছিল না তো'।"

অরবিন্দ তাঁহার মাতামহ ও গর্ভধারিণীর সহিত দেওঘর ও রোহিণীতে কিরূপ-ভাবে সাক্ষাৎ করিলেন, তাহা আমরা দেখিলাম। বৃদ্ধ মাতামহ রাজনারায়ণ বসু উৎকণ্ঠিত চিত্তে নিশ্চয়ই এই সাক্ষাতের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার উন্মাদরোগগ্রস্তা জননী কথঞ্চিত স্মৃতিভ্রংশ হওয়ায় এই মাতা-পুত্রের সাক্ষাতের গুরুত্ব হয়তো তেমন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি ৭ বৎসরের অরবিন্দের কথাই মনে রাখিয়াছিলেন—২১ বৎসরের অরবিন্দের কথা ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই। এমন কি ২১ বৎসরের অরবিন্দকে তিনি চিনিতেও পারিলেন না—অস্বীকার করিয়া বসিলেন। ভাগ্যে শৈশবের আঙুল কাটার দাগটি তখনও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই, গেলে অরবিন্দকে পুত্র বলিয়া তিনি স্বীকার করিতেন কি-না সন্দেহ। মাতা-পুত্রের এই সাক্ষাতে মায়ের অবস্থা দেখিয়া নিশ্চয়ই অরবিন্দ মনে দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন।

অরবিন্দের মাথায় তখন ইংরাজী ধরনের বাবরীওয়ালা লম্বা চুল ছিল। ইহা তখনকার দিনের ইংরাজ কবিদের একটা ফ্যাসান ছিল। আর: বস্তুতঃ অরবিন্দ তখন তো একজন ইংরাজ কবিই ছিলেন!

অরবিন্দের পিতামহের নাম ছিল কালীপ্রসাদ ঘোষ। তিনি গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরী করিতেন এবং তিনশত টাকা মাসিক বেতন পাইতেন। অরবিন্দের পিতামহীর নাম ছিল শ্রীযুক্তা কৈলাসকামিনী ঘোষ। অরবিন্দের

পিতামহের মৃত্যুর পর তিনি কাশীধামে গিয়া বাস করিতেছিলেন। অরবিন্দের পিতা ডাঃ কে. ডি. ঘোষ তাঁহার মাতা কৈলাসকামিনীকে মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া পাঠাইতেন এবং প্রতি মাসে নিজহাতে একখানা করিয়া চিঠি দিতেন। অরবিন্দের পিতামহীকে অরবিন্দের পিতা অতিশয় ভক্তি করিতেন। অরবিন্দের পিতা অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। "তিনি মায়ের ইচ্ছামত ১০০০৲ ব্যয় করিয়া কাশী বিশ্বনাথের মন্দির-গাত্রে একটি সোণার পাত আঁটিয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ প্রতি বৎসর দুইবার কাশী গমন করিয়া তাঁহার মাতাকে দেখিয়া আসিতেন। অরবিন্দের পিতামহী কৈলাসকামিনী অরবিন্দের বিবাহকাল (১৯০১ খৃঃ) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। অরবিন্দের বিবাহ কলিকাতাতে হয়। এবং ইহা সবর্ণ বিবাহ। অসবর্ণ অথবা তিন আইনের রেজিষ্ট্রীকৃত বিবাহ নয়। ইহা জানিতে পারিয়া অরবিন্দের পিতামহী অত্যন্ত খুসী হইয়াছিলেন। কেননা, তিনি গোঁড়া রক্ষণশীল নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন।

ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ বিলাত যাইবার পূর্ব্বে নিষ্ঠাবান উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিবার পর মনে সংশয়বাদীতা প্রবেশ করিয়াছে। ইহা রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছেন। বারীন্দ্রকুমার বলিতেছেন—"দাদাবাবু বলতেন—বাবা ছিলেন আদর্শ চরিত্রের ছেলে, ধর্ম্মে তাঁর ছিল খুব টান। তাঁর ছেঁড়া-খোঁড়া কাগজের মাঝে এই সেদিন অবধি তাঁর রচিত ভক্তিগদগদ শ্যামা-সঙ্গীত আমি দেখেছি।...আমার ঠাকুরমা অতি বড় গোঁড়া নিষ্ঠাবতী মেয়ে ছিলেন।"—(আত্মকথা, বারীন্দ্র—পৃঃ ১০-১১)।

সুতরাং আমরা অরবিন্দের, পিতার ধর্ম্ম-জীবনের তিনটি স্তর পর পর দেখিতে পাইতেছি।

১ম—উপনিষদের ভিত্তির উপর আদি ব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদ।

২য়—পাশ্চাত্য সংশয়বাদ।

৩য়—শ্যামা-সঙ্গীতে ভক্তিগদগদ ভাব।

এই পরিবর্ত্তনগুলি যদি সত্য হয়, তবে ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা জীবন্ত ধর্ম্ম-জীবনের চিহ্ন দেখা যাইতেছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ : অরবিন্দ বঙ্কিম-প্রসঙ্গেও আবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়াছেন। শুধু কংগ্রেস কেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপরেও তাঁহার বিরুদ্ধ-মনোভাব তিনি অকুতোভয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। অরবিন্দ শুধু কংগ্রেস-

বিরোধীই নহেন, অতিমাত্রায় ব্রাহ্মসমাজ-বিরোধীও বটে। এদেশে আসিয়া প্রথম বৎসরে তাঁহার জীবনের উন্মেষকালে এই অবস্থা আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি।

অরবিন্দ তিন-পুরুষে ব্রাহ্ম। তাঁহাদের পরিবার ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। অথচ তাঁহার মনে নিজের সমাজের বিরুদ্ধে এতটা তিক্ত উৎকট ভাব কোথা হইতে আসিল? অরবিন্দের পিতামাতার বিবাহকে রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন যে—"আমার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম অনুষ্ঠান, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্মমতে দেওয়া"—(আত্মচরিত—পৃঃ ৮০)। অরবিন্দের পিতামাতার ব্রাহ্মধর্ম্মমতে বিবাহ হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্ম পিতামাতার সন্তান। তাঁহার মাতামহ রাজনারায়ণ বসু আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন দিকপাল ব্যক্তি। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন যে—"বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি (ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ) একজন নিষ্ঠাবান উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন"—(আত্মচরিত—পৃঃ ১৯১-৯২)। প্রথমযৌবনে ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ নিশ্চয়ই নিষ্ঠাবান উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। নতুবা রাজনারায়ণ বসু তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন কেন? এখন অরবিন্দ এদেশে আসিয়া প্রথম বৎসরেই বলিলেন যে—আমরা কংগ্রেসও চাই না, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও চাই না। এই দুই হইতে আমাদিকে দূরে থাকিতে হইবে। আমরা কেশব সেনও চাই না, কৃষ্ণদাস পালও চাই না। তবে আমরা কি চাই? উত্তরে তিনি বলিতেছেন—আমরা চাই বঙ্কিম। সুতরাং স্পষ্ট দেখা গেল যে, বঙ্কিমের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াই তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী হইয়াছেন।

অরবিন্দ বলিতেছেন: ১ম—বঙ্কিমের প্রেরণায় তরুণ যুবকদলের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব কমিয়া আসিতেছে ('Waning influence of the *Sadharan Brahmo Samaj*')। ২য়—আমাদের ভবিষ্যৎ বঙ্কিম-অনুপ্রাণিত তরুণদের উপরেই নির্ভর করিতেছে এবং বিজাতীয় কংগ্রেসের উপর আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপর নির্ভর করিতেছে না ("Our future lies not with Indian un-National Congress or the *Sadharan Brahmo Samaj*")।

ইহার তিন-চার বৎসর পূর্ব্বে (1890-91, Calcutta Review—p. 92) ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখিয়াছেন যে, বঙ্কিম একটা নব্য হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। এই আন্দোলনের দুইটি শাখা ছিল—একটির প্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্র, আর একটির প্রবর্ত্তক পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও কুমার

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (* ক)। অতএব বঙ্কিমকে আমরা নব্য হিন্দুধর্ম্মের প্রবর্ত্তকরূপে পাইলাম। এই নব্য হিন্দুধর্ম্ম বহুলাংশে ব্রাহ্ম-বিরোধীরূপে দেখা দিয়াছিল। সুতরাং অরবিন্দ, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ৩।৪ বৎসর পরে এবং বঙ্কিমের মৃত্যু-বৎসরেই বুঝিয়াছিলেন যে—বঙ্কিম ব্রাহ্ম-বিরোধী হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সূত্রপাত করিয়াছেন। এক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনাথ পূর্ব্বগামী, অরবিন্দ ব্রজেন্দ্রনাথের পাশ্চাতে আসিয়াছেন।

অরবিন্দ যেমন বিলাতের রাজনীতির অনুকরণকারী কংগ্রেস চান না। তেমনি বিলাতের অনুকরণকারী ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী নহেন। ব্রাহ্মসমাজ, ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে বিলাতের অনুকরণ করিয়াছে। সুতরাং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথায়, এই ফেরঙ্গ-ভাবাপন্ন ব্রাহ্মসমাজ অরবিন্দ চান না। আমাদের কিছু বক্তব্য আছে: (১) অরবিন্দ রাজা রামমোহনকে যে উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন নাই, সে-প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। (২) রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা', 'জাতীয় গৌরব','বৃদ্ধ হিন্দুর আশা'—ইহাও তখন বিবেচনায় আনেন নাই, যাহা স্বামী বিবেকানন্দ আনিয়াছিলেন। (৩) সমাজ-

---

(* ক) "One of the two branches of the Hindu Revival in Bengal headed by Pandit Sasadhar Tarka Churamani and Kumar Sree Krishna Prasanna Sen···the other movement led by Babu Bankim Chandra Chatterjee as its theologian, Babu Chandra Nath Bose as its essayist and critic, and Babu Nabin Chandra Sen as its epic poet···Nabajiban (*the New Life*) a journal was started as the organ of Neo-Hinduism···Evidently the views on man and the universe held by thinkers like Mill, Spencer and Darwin, have vitally affected Bankim Chandra's interpretation of Hindu religion and philosophy; but the profoundest influence of all has been that of Auguste Comte, whose Positive Polity and Religion unconsciously apper in almost everything that our author has to say on domestic, social and political ideals and institutions and the creation and conservation of national life specially in his novels Devi Chaudhurani and Ananda Matha."—[*New Essays in Criticism by Dr. Brajendranath Seal, 1903—p. 88, 89, 92*]

প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে (১৮৯০-৯১) Calcutta Review—p. 92.

সংস্কারে সতীদাহ-নিবারণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাল্যবিবাহ নিষেধ, বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন, অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন, স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা— ইহার সমস্তটাই বিল্‌কুল্ ঝুটা বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। কেননা, তাঁহার মতে উহা শুধু বিলাতের অনুকরণ মাত্র। ব্রাহ্ম এবং ইংরেজী শিক্ষিত মেয়েদের ড্রইংরুম-বিলাসিনী ও Flirtationপটু বলিয়া বিশ্রী গালাগালি দিয়াছেন। অন্যদিকে হিন্দু মেয়েদের হৃদয়ের কোমলতা, একনিষ্ঠতা ও চরিত্রের মাধুর্য্য ইত্যাদির অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। ১৪ বৎসর বিলাতে থাকিয়া এদেশে বরোদা প্রবাসের প্রথম বৎসরে তিনি একটাও বাঙ্গালী ব্রাহ্ম মেয়ে অথবা বাঙ্গালী হিন্দু মেয়ে দেখেন নাই। ইহার আগাগোড়াই কল্পনাপ্রসূত। ব্রাহ্ম বলিতে তিনি শুধু কেশব সেনকেই বুঝিয়াছেন। পরন্তু, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বসুকে বুঝেন নাই। কিংবা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, ইঁহারাও ব্রাহ্ম। ইঁহাদের না-বুঝিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপর অবিচার করিয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রতিক্রিয়াশীল (Reactionary) মনের পরিচয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকা : ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া কখনও কখনও এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনার সম্মুখে আসিয়া পড়িতে হয়। আমরা এইরূপ একটি ঘটনার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি। যে-সময়ে এবং যে-মাসে (১৮৯৩।সেপ্টেম্বর) অরবিন্দ বরোদায় বসিয়া তীব্র কশাঘাত দ্বারা কংগ্রেসের পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার চিকাগো সহরে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়ভেরী নিনাদিত করিতেছেন। অরবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক। অরবিন্দ রাজনীতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন, আর স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম্মের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। এই দুই ইতিহাসবরেণ্য শক্তিশালী পুরুষ একই সময়ে, একজন রাজনীতি আর একজন ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া ইতিহাসের পথে প্রথম পদক্ষেপ করিলেন। আমরা বিস্মিত হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছি—উৎসুকনেত্রে ইহাদের দুইজনের গতিপথ নিরীক্ষণ করিতেছি।

অরবিন্দ বলিয়াছেন যে—প্রতিভা তাহার আবেষ্টন হইতে মনের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বিকশিত হয়। সুতরাং দেশে ফিরিবার পাঁচ মাস পরেই অরবিন্দের চক্ষু ও মনের সম্মুখে আমেরিকাতে স্বামী বিবেকানন্দের বিরাট অভ্যুদয় এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা বলিয়া যে প্রতীয়মান হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং এই

আশ্চর্য্য ঘটনা হইতে তিনি যে তাঁহার তরুণ মনের খাদ্য সংগ্রহ করিবেন, তাহাও সুনিশ্চিত। ১৮ই সেপ্টেম্বর অরবিন্দ 'ইন্দুপ্রকাশে' কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাঁহার চতুর্থ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আর ১৯শে সেপ্টেম্বর চিকাগো সহরে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা করেন। সময়ের কি আশ্চর্য্য মিল দেখা যাইতেছে।

স্বামীজী যখন চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে যান, তখন তিনি দম্ভভরে এই কথা বলিয়াছিলেন—"I go forth to preach a religion of which Buddhism is nothing but a rebel child, and Christianity but a distant echo." এত বড় দম্ভভরা কথা পরাধীন জাতির একজন লোকের পক্ষে বলা অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার। হইলে কি হয়, স্বামীজী শুধু চমকপ্রদ কথা বলিয়া জগতবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করেন নাই। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকাতে তাঁহার কাজ—তাঁহার কথা অপেক্ষাও অধিক বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায় তিনি 'Sisters and Brothers of America' বলিয়া প্রথম বক্তৃতা করেন। এবং এই বক্তৃতার পরের দিন তিনি সমগ্র আমেরিকার নিকট পরিচিত হন। ১৯শে সেপ্টেম্বর হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি প্রথম বক্তৃতা করেন। ২২শে সেপ্টেম্বর হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা করেন। ২৫শে পুনরায় 'হিন্দুধর্ম্মের সার' নামক আর একটি বক্তৃতা করেন। এই সবগুলি বক্তৃতাতেই তিনি হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব বিরুদ্ধবাদীদের শরবর্ষণের সম্মুখে স্ফীতবক্ষে সমুন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিপন্ন করেন। ২৫শে তারিখের বক্তৃতায় তিনি সাত হাজার শ্রোতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলেন—"আপনারা হিন্দুর ধর্ম্ম ও শাস্ত্র কে কে অধ্যয়ন করিয়াছেন হাত তুলুন।" ৭০০০-এর মধ্যে ৪।৫ খানা মাত্র হাত উঠিল। ইহা দেখিয়া স্বামীজী তীব্র ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন—"তথাপি আপনারা আমার ধর্ম্মের সমালোচনা করিতে স্পর্দ্ধা করেন।"

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি (১৮৬১ খৃঃ) 'জাতীয় গৌরব' এবং তাহার ১০ বৎসর পর (১৮৭১ খৃঃ) 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতা দিয়া এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' পুস্তক লিখিয়া 'নবজীবন' পত্রিকায় ছাপাইয়া রাজনারায়ণ বসু হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের জন্য একটা আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছেন। এইসকল বিভিন্ন ধারা বঙ্কিমের পূর্ব্বেই ইতিহাসের গতিপথে চলিতে চলিতে

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকাতে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া বিজয়ভেরীর মত নিনাদিত হইল। আমেরিকায় স্বামীজীর কণ্ঠোচ্চারিত হিন্দুধর্ম্মের এই জয়ধ্বনি ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিল। আমরা বাঙ্গালী তো আনন্দে আস্ফালন করিয়া উঠিলাম। অরবিন্দ এই বিপর্য্যয় কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিলেন! এই ঘটনায় তাঁহার চিন্তাস্রোত আর একটা নূতন দিকে প্রবাহিত হইতে চলিল।

কংগ্রেস: এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে দাদাভাই নৌরোজীর সভাপতিত্বে লাহোরে যে কংগ্রেস হয় এবং দাদাভাই যে বক্তৃতা দেন, তাহা তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। ইহার আগের বৎসর (১৮৯২ খৃষ্টাব্দে) W. C. Bonnerjee এলাহাবাদে দাদাভাই সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—"Our leader, our revered leader Dadabhai Naoroji (*three cheers*) was expected to occupy the position I am now occupying." পার্লামেণ্ট নির্ব্বাচনের হাঙ্গামায় দাদাভাই আসিতে পারেন নাই। এবার আসিয়াছেন। দাদাভাই নৌরোজী—(১) Mr. Ranade বোম্বাই হাইকোর্টের জজ হওয়াতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। (২) Central Finsbury হইতে তিনি পার্লামেণ্টে সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়াতে ভারতবন্ধু ব্রাইট, ফসেট, ব্রাড্‌লো, গ্ল্যাডষ্টোন ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। (৩) লালমোহন ঘোষের নির্ব্বাচনী উদ্যমকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করিলেন। (৪) ভারতের জাতীয়তা সম্পর্কে ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িকতা বাদ দিয়া সকলের আগে তিনি 'ভারতবাসী' এই কথা বলিলেন। কিন্তু পরিশেষে (৫) তিনি ইহাও বলিলেন যে, ইংরেজের ন্যায়পরায়ণতায় তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অটল রাজভক্তি দেখাইয়া আমাদিগকে ধীরে-সুস্থে, বৈধ-উপায় অবলম্বনে কংগ্রেস-রাজনীতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে উপদেশ দিলেন (* ক)।

[* ক] (১) "I am glad Mr. Mahadev Govinda Ranade is appointed as judge of the Bombay High Court. I am sure Mr. Ranade will prove himself worthy of the post. I have known him long and his abilities and learning are well-known.

(২) "Mr. Gladstone on two occasions not only expressed his satisfaction to me at finding an Indian in the House but expressed also a strong wish to see several more.

দাদাভাই-এর এই বক্তৃতা অরবিন্দের নিশ্চয়ই মনঃপূত হয় নাই, কেননা তখনও তিনি 'ইন্দুপ্রকাশে' কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির তীব্র প্রতিবাদ-প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে সমানে লিখিয়া যাইতেছেন। আমরা অরবিন্দের দেশে আগমনের পর প্রথম বৎসরে তাঁহার চারিপাশের নানারকমের পরিস্থিতি যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। কিন্তু এই বৎসর তাঁহার নিজের অবস্থা সম্পর্কে সামান্য একটু উল্লেখ করিতে হইবে।

অরবিন্দ ও পাশ্চাত্য সভ্যতা : এই বৎসরটা শ্রীঅরবিন্দের জীবনে একটা সন্ধিক্ষণ—যেমন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দও একটা সন্ধিক্ষণ ছিল। কিন্তু তখন তিনি ছিলেন মাত্র ৭ বৎসরের বালক। একাদিক্রমে ১৪ বৎসর বিলাতে থাকিয়া আজ তিনি ২১ বৎসর বয়সে দেশে ফিরিয়াছেন সত্য—তিনি একজন বাঙ্গালী যুবক, তাও সত্য—এবং তার অপেক্ষাও সত্য, তিনি প্রাচীন গ্রীসের উত্তরাধিকারী তখনকার দিনের ইয়োরোপ-এর নিকট হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অতি উজ্জ্বল হীরামাণিক্যখচিত অন্ততঃ দশটি অঙ্গুরীয় দশ আঙ্গুলে পরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বহুভাষাবিৎ। হইলে কি হয়, এত বড় পণ্ডিত এবং ইংরাজী ভাষায় সুকবি

My mind also turns to those good friends of India—Bright, Fawcett, Bradlaugh and others.

(৩) "As you are all aware, though it was long my wish, my friend the Hon'ble Mr. Lal Mohan Ghose made the first attempt and twice contested Deptford with as little chances of success. But adverse circumstances proved too strong for him.

(৪) "I have never worked in any other spirit than that I am an Indian (*cheers*) whether I am a Hindu, a Mahomedan, a Parsi, a Christian or of any other creed, I am above all an Indian. Our country is India. Our nationality is Indian (*loud cheers*).

(৫) "I have never faltered in my faith in the British Character. The British are justice-loving fair-minded people …Go on with moderation, with loyalty to the British Rule and patriotism towards our country (*prolonged cheers*)."— [*Extracts from Mr. Dadabhai Naoroji, M. P's. Presidential Speech at Lahore Congress—1893*]

বাঙ্গালী যুবক—বাংলা কথা বলিলে বুঝিতেও পারেন না, নিজে তো বাংলায় কথা বলা দূরের কথা (* খ)। এতবড় বিপর্য্যয় কাণ্ড অরবিন্দের মত মেধাবী মনীষাসম্পন্ন বাঙ্গালী যুবকের ভাগ্যে আর কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণ নাই। অরবিন্দের জীবন প্রথম হইতেই শুধু বৈচিত্র্যে পূর্ণ নয়। মাঝে মাঝে এক একটা অপূর্ব্ব অদ্ভুত ঘটনার প্রকাশ আমাদিগকে কৌতূহলী তো করেই, স্তম্ভিতও করে। তিনি যে-অবস্থায় পতিত হইয়া—নিজের জাতির সভ্যতা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিয়া—বাল্যকাল হইতে ইংরাজ পরিবারে বাস করিয়া—ইংরেজের স্কুল-কলেজে ইংরাজ বালকদের সঙ্গে একত্র পাঠ করিয়া—ইউরোপের প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যগুলির মধ্য দিয়া মোটামুটি সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতা আয়ত্ত করিয়া—এই অল্প বয়সে ইংরাজী সাহিত্যে নিজে একজন কবি বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া—প্রাচীন গ্রীসের নবীন সংস্করণ হইয়া আর একটা তাহা অপেক্ষাও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সম্মুখীন হইলেন, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। অবশ্য মূলতঃ এই ভারতীয় সভ্যতাকে হিন্দু-সভ্যতা বলিয়াই এক্ষেত্রে ধরিয়া লইতে হইবে। কোনরূপ সংস্কার—কু বা সু—লইয়া তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করেন নাই। বাধামুক্ত সর্ব্বসংস্কার-মুক্ত চিত্তে তিনি পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে গ্রহণ করার সুযোগ এক ভগিনী নিবেদিতা ছাড়া আর কাহারও হয় নাই। রামমোহনের নয়—মাইকেলের নয়। কেশবচন্দ্রের নয়—বঙ্কিমের নয়। বিবেকানন্দের নয়—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের নয়। বিপিনচন্দ্র পালের নয়—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নয়। নেতাজী সুভাষেরও নয়। ইঁহারা সকলেই প্রথমে হিন্দু-সভ্যতা আয়ত্ত করিয়া পরে পাশ্চাত্য সভ্যতা আয়ত্ত করিয়াছেন। অরবিন্দের পক্ষে পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করার সুযোগ অথবা দুর্যোগ—যে যাই বলুক—এক অপূর্ব্ব স্বাতন্ত্র্য গৌরবে সমুজ্জ্বল। অরবিন্দ যেরূপ পরিপূর্ণভাবে বাল্যকাল হইতে পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করিয়াছেন এমন আর কাহারও জীবনে দেখা যায় না।

(* খ) "His parents had been half-anglicized, and had never fully taught him his own language, so that he could not write Bengali correctly, or make a speech in the only tongue, as he said, that really went to the heart of the people."—[*The New Spirit in India, Nevinson—p. 22.*]

বয়স বাইশ বৎসর (১৮৯৪।১৫ই আগষ্ট—১৮৯৫।১৪ই আগষ্ট) :

কবি অরবিন্দ ★ কবি চিত্তরঞ্জন
কবি বিবেকানন্দ ★ কবি রবীন্দ্রনাথ

মাদ্রাজ কংগ্রেস : প্রেসিডেন্ট—আলফ্রেড্ ওয়েব্ (Alfred Webb)

স্বামী বিবেকানন্দ ★ বিপিনচন্দ্র পাল ★ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ★ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন ★ মনোমোহন ঘোষ ★ অরবিন্দ ও বঙ্কিম

কবি অরবিন্দ : এইবার আমরা কবি অরবিন্দে আসিয়া পৌঁছিতেছি। তার অর্থ ইহা নয় যে, এই বৎসর তিনি প্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার কেম্ব্রিজে অধ্যয়নের শেষ দুই বৎসর (১৮৯০-৯১-৯২) যখন তাঁহার বয়স ১৮ হইতে ২০ বৎসর মাত্র, সেই সময় তাঁহার মধ্যে কবিত্বের বিকাশ ও প্রকাশ দেখিতে পাই। তারও পূর্ব্বে যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৪ বৎসর (১৮৮৬ খৃঃ) তখনই তিনি প্রথম কবিতা লিখিতে সুরু করেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার জীবনে ১৪ বৎসর বয়সটাকে বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই বৎসরে তাঁহার জীবনের যে মহৎ উদ্দেশ্য, তাহা বীজ আকারে প্রথম দেখা দেয়—একথা তিনি তাঁহার স্ত্রীকে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন, আমরা দেখিয়াছি। কোন্ ঘটনায় এই বৎসরটাকে তিনি গুরুত্ব দিতেছেন, তাহা আমরা নিশ্চয়রূপে নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অথচ দেখিতেছি যে, এই বৎসরেই তাঁহার কবি-জীবনের সূত্রপাত। ১৮৮৮-এর জানুয়ারী মাসে 'To The Cuckoo' বলিয়া তিনি একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। St. Paul's School Magazine-এ ঐ কবিতাটি ছাপা হইয়াছিল।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেও তিনি কবিতা লিখিয়াছেন এবং পরেও তিনি কবিতা লিখিয়াছেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে যদি তিনি প্রথম কবিতা লিখিয়া থাকেন এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যদি বরোদায় লিখিত তাঁহার কবিতা বঙ্গদেশে 'কর্ম্মযোগিন্'এ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং যদি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ১৬।১৭ তারিখে পণ্ডিচারীতে যোগমগ্ন অবস্থায় বসিয়াও কবিতা লিখিয়া থাকেন (এবং তার পরও

লিখিয়াছেন)—তবে তাঁহার কবি-জীবনের বিস্তৃতি লণ্ডন St. Paul's School হইতে কেম্ব্রিজ King's College ও বরোদা হইয়া 'কর্ম্মযোগিন্'-এর সম্পাদক-রূপে কলিকাতায় ৬নং কলেজ স্কোয়ার ভেদ করিয়া, ইংরাজের রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া, সুদূর পণ্ডিচারী পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহা প্রত্যক্ষ। অরবিন্দ কবি। ১৪ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার লেখনী অপূর্ব্ব কবিতাসকল লিখিয়া গিয়াছে। এবং এই কবিতার স্রোতে তাঁহার জীবন ভাসিয়া চলিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের জীবনী আলোচনায় কবিতার স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে না-হইলেও, সর্ব্বাপেক্ষা নীচেও নয়। সত্যই তিনি কবিতা এবং দেশকে সমান ভালবাসিয়াছেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'সাগর সঙ্গীত'-এর ইংরাজী অনুবাদ পণ্ডিচারীতেই দেখিতে পাই।

শ্রীঅরবিন্দের কবি-জীবনে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের গুরুত্ব এই জন্য যে, তিনি কেম্ব্রিজে অধ্যয়নকালে যে-সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, সেইগুলি এই বৎসর Songs To Myrtilla নাম দিয়া বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে উপহারস্বরূপ বিতরণ করিবার জন্য প্রথম প্রকাশ করিলেন।

পরে অবশ্য ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আরও গুটিপাঁচেক (* গ) নূতন কবিতা ইহার সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় পণ্ডিচারীতে শ্রীঅরবিন্দ একজন যোগমগ্ন তাপস ব্যক্তি। তথাপি তাঁহার অজ্ঞাতসারে বা অমতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে—একথা ভাবা যায় না। এত বড় দুঃসাহস কাহার হইবে? সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের জীবনী

(* গ) ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মার্ত্তিলার ২য় সংস্করণে রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যুতে লিখিত (১৮৯৯।সেপ্টেম্বর) অরবিন্দের কবিতাটি—

Not in annihilation lost, nor given
To darkness art thou fled from us and light,

সন্নিবিষ্ট হয় নাই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। কারণ কি অনুমান করা কঠিন? ২য় সংস্করণ প্রকাশের ভার যাঁহারা নিয়াছিলেন ইহা কি সেইসকল কর্ম্ম-কর্ত্তাদের অসাবধানতার ফল? কবিতাটি মার্ত্তিলার ২য় সংস্করণে সন্নিবিষ্ট না হওয়াতে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ২য় সংস্করণে মাইকেল আসিল, বঙ্কিম আসিল, আর রাজনারায়ণ উপিয়া গেল—ইহা শ্রীঅরবিন্দের নিশ্চয়ই অভিপ্রেত নয়। তবে এমনটি কেন হইল—কেইবা জানে, আর কেইবা বলিবে!

আলোচনায় এই কেম্বিজে লিখিত কবিতাগুলির গুরুত্ব অবশ্যই মানিয়া লইতে হয়।

এখন দেখা যাক এই কবিতাগুলিতে তিনি কি কথা বলিতে চাহিয়াছেন। এই কবিতাগুলির মধ্যে তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনের প্রকাশ আমাদের মুখ্য আলোচনার বিষয়।

এই অল্প কয়েকটি কবিতার মধ্যে যেটি সকলের চেয়ে সুন্দর তার নাম 'Night By The Sea' এই কবিতাটিতে দেখিতেছি, কবি যেন প্রেমে একেবারে আত্মহারা—পাগল। তিনি তাঁহার তরুণী প্রণয়িনীকে—অবশ্য ইংরাজ বালিকা—ব্যাকুল প্রণয় সম্ভাষণে বলিতেছেন, "প্রিয়তমা এডিথ্ (বালিকাটির নাম) শোন, সমুদ্র কী কথা বলিতেছে (*'Hearken Edith to the Sea'*)।" তাহার পরক্ষণেই আবার বলিতেছেন—"এডিথ্, তুমি আমায় চুম্বন কর (*'Kiss me Edith'*)।" পরিশেষে প্রিয়তমা এডিথ্‌কে বলিতেছেন—

"In thy bosom's snow-white walls
Softly and supremely housed
Shut my heart up ; keep it closed
Like a rose of Indian grain,
Like that rose against the rain,
Close to all that life applauds,
Nature's perishable gauds."

আর একটি কবিতার নাম 'Estelle'। Estelle সম্ভবতঃ একটি ফরাসী বালিকার নাম। ইনি Edith নহেন। তরুণী Estelle'কে কবি বলিতেছেন—"এস্টেল, তুমি আকাশের দিকে চাহিয়া কী দেখিতেছ? ঐ সুনীল আকাশ কি তোমার অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে? না, ঐ গ্রহ-নক্ষত্র তোমার সৌন্দর্য্যকে প্রশংসা করিবে? তুমি আমার দিকে তাকাও। আমার হৃদয়-আকাশে সহস্র তারকারাজি তোমারি জন্য আলো জ্বালিয়া অপেক্ষা করিতেছে। আমার অন্তর-দুয়ার তোমার জন্য সর্ব্বক্ষণ খোলা রহিয়াছে।"

ESTELLE

Why do thy lucid eyes survey,
Estelle, their sisters in the milky way ?

The blue heavens cannot see
Thy beauty nor the planets praise,
Blindly they walk their old accustomed ways.
Turn hither for felicity.
My body's earth thy vernal power declares,
My spirit is a heaven of thousand stars,
And all these lights are thine and open doors on the,

এখানে আমরা দেখিতেছি একজন ইংরাজ যুবক একজন ইংরাজ অথবা ফরাসী তরুণীর নিকট প্রাণের পরিপূর্ণ আবেগে অকুণ্ঠিতচিত্তে ইংরাজী কবিতার নিখুঁত প্রকাশভঙ্গীতে প্রেম নিবেদন করিতেছেন। দেখিতেছি, ১৮ হইতে ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীঅরবিন্দ একজন পুরাপুরি ইংরাজ যুবক। তিনি একজন প্রেমিক ও কবি। ইংরাজী কবিতার মধ্য দিয়া তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেম নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মত বাধামুক্ত ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহা তাঁহার এই-সময়কার জীবনের একটি পরিপূর্ণ প্রকাশ—অত্যন্ত সুন্দর এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক, বিদেশী বিলাতী আবহাওয়ায় তিনি পরগাছা হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছেন না। যে আবহাওয়ার মধ্যে ৭ বৎসর বয়সের সময় তিনি গিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং তাহার পর একাদিক্রমে ১৪ বৎসর সেই আবহাওয়ার স্বাভাবিক নিয়মেই পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছেন, বিদেশী আবহাওয়া হইলেও ইহা তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ।

আরও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিচেরীর যোগমগ্ন তাপস অরবিন্দ তাঁর জীবনের এই অতীত অধ্যায়কে আমাদের নিকট উপঢৌকন-স্বরূপ প্রেরণ করিতে কার্পণ্য করেন নাই। সুতরাং আমরা অরবিন্দের জীবনের বিকাশপথে এই তরুণ ইংরাজ কবি ও প্রেমিককে উপেক্ষা ত করিতে পারিই না, বরং অতিশয় গৌরব ও গর্ব্বের সহিত গ্রহণ করিতেছি।

অরবিন্দ যে-বয়সে এইসকল কবিতা লিখিয়াছিলেন সেই বয়সটা কবিতা লিখিবার বয়স। যাঁহারা কবি নহেন, তাঁহারাও এই বয়সে কবিতা লিখিয়া থাকেন। আর যাঁহারা জন্মকবি, তাঁহারা ত লিখিবেনই। অরবিন্দের পক্ষে এইসকল কবিতা না-লিখিয়া উপায় ছিল না, কেননা তিনি একজন জন্মকবি।

কবিত্বের বীজ যেন তাঁহাদের বংশে আগাগোড়াই সুপ্ত দেখিতে পাই;

সুযোগ-সুবিধা পাইলেই অঙ্কুর গজাইয়া ওঠে। তাঁহার অগ্রজ অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ ইংরেজী সাহিত্যে একজন উচ্চদরের কবি। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মনোমোহন যখন অক্সফোর্ড (Oxford)-এ ছিলেন তখন তিনি তাঁহার আর তিনটি ইংরাজ বন্ধুর সঙ্গে মিলিয়া *Prima Vera* নামে একটি কবিতার পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। Laurence Binyon এবং Oscar Wilde তৎকালে মনোমোহনের ঐ কবিতার ও তাঁহার পাণ্ডিত্যের অজস্র প্রশংসা করিয়াছিলেন (* ঘ)।

Songs To Myrtilla হইতে অরবিন্দের যে দুইটি কবিতার উল্লেখ করা হইল (*Night By The Sea* এবং *Estelle*) তাহার মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজ কবি Keats-এর প্রভাব আছে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সুন্দরী তরুণীর প্রতি একটা মোহ বা আকর্ষণ সহজাত সংস্কারবশে Keats-এর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সেইসঙ্গে এক অতি করুণ বিষাদের সুরও Keats-এর কবিতায় কাছে। "O for a draught of vintage" (*Ode To A Nightingale*) বিষাদে-মাখা এই সুরটি Keats-এর কাব্যের শ্রীঅঙ্গে যেন সর্ব্বদাই জড়াইয়া আছে। অরবিন্দের আর একটি কবিতায়—"O Coil Coil"—Keats-এর প্রভাব সুস্পষ্ট। যথা—

"..................But I
Am desolate in the heart of fruitful months,
Am widowed in the night of happy things,
Uttering my moan to the unhoused winds,
O Coil, Coil, to the winds and thee."

(* ঘ) "No Indian has ever before used our tongue with so poetic a touch...... To us he is a voice among the great company of English Singers."—*Laurence Binyon.*

"His verses show us how quick and subtle are the intellectual sympathies of the Oriental mind and suggest how close is the bond of union that may some day bind India to us by other methods than those of commerce and military strength. Mr. Ghose ought some day to make a name in our literature."
—[*Pall Mall Gazette, 1890—Oscar Wilde*]

"Night By The Sea"তে সমস্ত জগৎ-সংসার ভুলিয়া তরুণী 'এডিথে'র বুকে লীন হইয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এবং—

"Close to all that life applauds,
Nature's perishable gauds."

এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে Keats-এর কাব্যের ব্যঞ্জনা হয়তো বা আছে (* ঙ)। কিন্তু Keats অল্প বয়সেই অনেকগুলি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার কাব্যের স্বরূপ ও স্বতন্ত্র সুর তিনি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। অরবিন্দের পরবর্ত্তী কাব্যগুলিতে ('Love and Death'; 'Baji Prabhou') Keats-এর কোনই প্রভাব আমাদের চোখে পড়ে না। বরং ballad হিসাবে Scott-এর প্রভাব আছে বলিয়া অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না।

Keats-এর Byron এর উপর কবিতায়—"Byron, how sweetly sad thy melody"—Keats-এর কাব্যের বিশেষ সুরটি প্রথমছত্রেই ধ্বনিত হইয়াছে। ইহা যে Keats-এর, তাহা অনুমান করিতে কিছুই কষ্ট হয় না। সমস্ত কবিতাটি এই সুরে ঝঙ্কৃত। কিন্তু ইহার সঙ্গে অরবিন্দের Goethe-এর প্রতি কবিতাটি তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, তাহাতে Keats-এর প্রভাব কিছুই নাই। Lyricএ যদি অরবিন্দের কোন স্বাতন্ত্র্য থাকিয়া থাকে তবে তাহাই আছে। আমরা কবিতাটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

GOETHE

A perfect face amid barbarian faces,
A perfect voice of sweet and serious rhyme,
Traveller with calm, inimitable paces,
Critic with judgment absolute to all fine,
A complete strength when men were maimed and weak,
German obscured the spirit of a Greek.

(* ঙ) "There is also a delicate, sensuous imagery and an earth contact which is reminiscent of Keats."—[*Indian Writers of English Verse—p. 128*]

"মাভিনা"র প্রথম কবিতাটিতে গ্রীক প্রভাব সুস্পষ্ট (* চ)। কবিতাটি লম্বা, সুতরাং তুলিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। অন্য কবিতাতেও গ্রীক প্রভাব আছে :

"But time was adverse. Thus too Heracles
In exile closed by the Olynthian seas,
Not seeing Thebes nor Dirce any more.
His friendless eyelids on an alien shore."

—(*'Lines on Ireland : 1895'* হইতে)

অরবিন্দের তরুণ বয়সের কাব্যে গ্রীক প্রভাব থাকা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। যে-বয়সে Cambridgeএ King's Collegeএ Classics অধ্যয়নরত ছাত্র অবস্থায় এইসকল কবিতা তিনি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে গ্রীক প্রভাব না থাকিলেই আমরা আশ্চর্য্য হইতাম।

কিন্তু শুধু কি অরবিন্দের কাব্যেই গ্রীক প্রভাব আছে? ইয়োরোপীয়ানদের ক্লাসিকের এত বড় একজন পণ্ডিত তিনি, তাঁহার শিক্ষা সংস্কার ও সমগ্র দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যেই গ্রীক প্রভাব প্রচুর বিদ্যমান।—এই কথাটি পরলোকগত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দের রাজনীতি আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাদের বলিয়াছিলেন। ডাক্তার শীলের মতে, শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীও গ্রীক প্রভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। সুতরাং ইয়োরোপীয়ান ক্লাসিকের পণ্ডিত কবি অরবিন্দের কাব্যে গ্রীক প্রভাব যে থাকিবে, ইহা তো স্বাভাবিক।

শ্রীঅরবিন্দের কাব্য-জীবনের সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইব যে বরোদায় অবস্থানকালে ১৮৯৫ হইতে ১৮৯৯—এই ৪ বৎসরকাল মধ্যে অতি দ্রুত তিনি সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গ্রীক হইতে হিন্দু-সভ্যতার দিকে মুখ ফিরাইতেছেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রচিত Love & Death কবিতাটিই তাহার প্রমাণ। ভৃগুর পুত্র রুরু ও মেনকার কন্যা প্রিয়ম্বদার পারণয় ও প্রেম-কাহিনী কেম্ব্রিজে কিংস্ কলেজে অধ্যয়নকালে ইউরোপীয়ান ক্লাসিকের আওতায় লেখা সম্ভব ছিল না। কবি-জীবনের মধ্য দিয়া যে পরিবর্ত্তন সূক্ষ্ম আকারে দেখা গেল—সমগ্র জীবনকে উত্তরোত্তর ইহা উদ্বেলিত

(* চ) "Some of the lyrics show strong Greek influence."
—[*Indian Writers of English Verse—p. 128*]

করিয়া প্রবাহিত হইবে, তাহা ক্রমে দেখা যাইবে। জীবনের ঘটনাপ্রবাহের যে যোগসূত্র, তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টাই পরম লোভনীয় বস্তু।

শ্রীঅরবিন্দের অগ্রজ অধ্যাপক মনোমোহনও নল-দময়ন্তীর উপর ইংরাজীতে এক নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়া উহা অসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় (৪ঠা জানুয়ারী, ১৯২৪) তাঁহার ইচ্ছামত 'লিয়ার' ও 'ম্যাক্‌বেথ্' তাঁহাকে পড়িয়া শুনান হইয়াছিল (* ছ)। এই ছোট ঘটনায় তাঁহার সমস্ত জীবনটির উপর একটি সোনালী আলো ঝলসিয়া গিয়াছে—তা' মৃত্যু যতই অন্ধকার হউক না কেন।

কি অরবিন্দ, কি মনোমোহন উভয় ভ্রাতাই প্রধানতঃ লিরিকের কবি। নাটক ইঁহারা লিখেন নাই। লিরিকে যে-সকল কবি-প্রতিভার বিকাশ তাহার একটা বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আছে। শ্রীঅরবিন্দের জীবনেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অরবিন্দ লিরিকের কবি, ব্যালাডের কবি—নাটকের নহেন।

শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থাকিতেই Baji Prabhou লিখিয়া থাকিবেন। এই কবিতাটিতে মারাঠার আবহাওয়া বেশ বুঝা যাইতেছে। লোকমান্য তিলকের সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে কি পরে ইহা লেখা হইয়াছে নির্ণয় করিতে পারিতেছিনা। তবে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দেও এই কবিতাটিকে তিনি প্রকাশ করিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন—ইহা বুঝা যাইতেছে। কবিতাটি মারাঠার বীরত্বে উদ্ভাসিত।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। অরবিন্দের কাব্যে গ্রীক আছে, ইংলণ্ড আছে, আয়রল্যাণ্ড আছে, মহারাষ্ট্র আছে—কিন্তু নাই শুধু বাঙ্গলাদেশ।

আর একটি অদ্ভুত ঘটনা। অরবিন্দ যখন বরোদায় "মাত্তিলা" প্রকাশ করিলেন ঠিক সেই সময় (১৮৯৫ খৃঃ) কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন "মালঞ্চ" প্রকাশ করিলেন। মাত্র এক বৎসর আগে তিনি দেশে ফিরিয়া সবে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ

(*ছ) 'As he lay dying, 'Lear' and 'Macbeth' were read aloud to him at his own desire. He was not yet *fifty-five*."

"His father (Dr. K. D. Ghose) transplanted him to England at the tender age of *seven*". —[*Introductory Memoir to songs of Love & Death, by Manmohan Ghose—p. 20-21.*]

লরেন্স বিনিয়নকে দুইটি তারিখ সম্বন্ধেই ভুল সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল: (ক) ৫৭ বৎসর বয়সে অধ্যাপক ঘোষের মৃত্যু হয়। (খ) ১২ বৎসর বয়সে তিনি বিলাত যান।

করিয়াছেন—তা যেমন, তেমন তিনি বাংলার সাহিত্য-জগৎকে স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন যে, তিনিও কবি। আর এই তরুণ বয়সে যখন কবিতা লিখিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই প্রেমের কবিতাও লিখিয়াছেন। তুলিয়া দেখাইতে হইলে মালঞ্চের অধিকাংশ কবিতাই তুলিয়া দিতে হয়। খুব ছোট একটা দিতেছি:

নিশীথে।

নুপুর খুলিয়া লও!
যদি এই রজনীর অন্ধকারে বাজে
আমাদের দু'জনের কলঙ্কের কথা!

বাংলার সাহিত্যসেবী মাত্রই জানেন যে চিত্তরঞ্জন তাঁহার পরবর্ত্তী কাব্যগুলিতে বৈষ্ণব কবিদের পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি নিজেও জানেন না যে, তিনি বৈষ্ণব—দেখিতেছি তখনো তিনি বৈষ্ণব। এটি "অভিসার" পথের কবিতা। বীজ আকারে এই বৈষ্ণবীয় উজ্জ্বল নীলমণি কথিত প্রেম যেন কবির অজ্ঞাতসারেই তাঁহার জীবনে ও কাব্যে অঙ্কুরোদ্গম করিয়াছে। পরবর্ত্তী জীবনে ইহার পূর্ণতম বিকাশ দেখিয়া বাঙ্গালী ধন্য হইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রথম বয়সের প্রেমের কবিতাগুলি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উভয়ের প্রেমে প্রথম বিকাশ হইতেই স্বাতন্ত্র্য আছে—বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু কবিতার প্রথম প্রকাশে উভয়েই প্রেমিক (কেহ নন্, একথা বলিতে পারিবেন না)।

'মার্ত্তিলা"য় ইংরেজের অধীন আয়রল্যাণ্ড স্বাধীন হইবে—এইরূপ একটি উদ্দাম ভাব আগুনের ফুলকির মত ছড়াইয়া পড়িতেছে। "মালঞ্চে" তা নাই।

"মালঞ্চে" নাস্তিক্যবাদের ছায়া আছে—"হায়, হায়, মিথ্যা কথা ঈশ্বর, ঈশ্বর।" ধর্ম্ম-প্রচারকের ভণ্ডামীর উপর তীব্র কশাঘাত আছে। "মার্ত্তিলা"য় এ প্রসঙ্গই নাই। ঈশ্বর সম্বন্ধে "মার্ত্তিলা" নীরব, নিস্তব্ধ। বুঝা যাইতেছে, বিলাতে থাকাকালীন অরবিন্দ খৃষ্টান হন নাই। খৃষ্টধর্ম্ম তাঁহাকে আচ্ছন্ন করে নাই। সত্যই তিনি প্যাগান বা গ্রীক।

"মালঞ্চে" আর একটা মনোভাব আছে, যা "মার্ত্তিলা"য় নাই। সেটি হইতেছে "মালঞ্চে"র 'বারবিলাসিনী' কবিতাটি। যে মহানুভবতা হইতে যুবক চিত্তরঞ্জনের লেখনীমুখে এই জ্বালাময়ী অপূর্ব্ব কবিতাটি জন্মলাভ

করিয়াছিল, সে বিশাল হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত। বাংলার কাব্য-জগতে ইহার জুড়ি আর একটা কবিতা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

"বারবিলাসিনী

* * *

এ ধরার কলঙ্ক তুলিয়া, পরেছি পুষ্পিত শিরে
এস পান্থ ধীরে ধীরে,
মর্ম্মহীন আবেগ লইয়া, তোমার কম্পিত তনু, আবেগ লইয়া
আমি রব কলঙ্ক বহিয়া।

* * *

নাহি প্রাণ, মধু দেহে মোর, নাহি সুখ, নাহি লজ্জা
জীবন বিলাস সজ্জা।
চাও পান্থ আঁখি পানে, লও ঘুম ঘোর,
মোহ-ভরা, মধু দেহ মোর।

* * *

ওগো আমি যৌবনে যোগিনী!
এ বিশ্ব লালসা ছাই, সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তাই
চলিয়াছি কলঙ্ক বহিয়া
মর্ম্মহীন কর্ম্মহীন, কলঙ্কবাহিনী,
চিরদিন যৌবনে যোগিনী।
কার অভিশাপে নাহি জানি
কোন মহাপ্রাণে ব্যথা দিয়াছিনু, তাই হেথা,
প্রাণহীন প্রেম বিলাসিনী
সবারে বিলাসী তাই বারবিলাসিনী
তারি শাপে চির কলঙ্কিনী।"

চিত্তরঞ্জনের কবি-প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়, আর শ্রীঅরবিন্দের জীবনচরিত আলোচনা করিতে বসিয়া তা সঙ্গতও নয়। তবে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, চিত্তরঞ্জনের "সাগর-সঙ্গীত" যদি একখানি উচ্চাঙ্গের কাব্য না হইত তবে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে যোগমগ্ন অবস্থায় থাকাকালীন ইংরেজী কবিতায় ইহার অতি সুন্দর অনুবাদ করিতেন না। ইহা চিত্তরঞ্জনের প্রতি অরবিন্দের একটা ঠুনকো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অছিলা নয় নিশ্চয়।

শ্রীঅরবিন্দ সে-শ্রেণীর মনুষ্য নহেন। ইহা—এক ইংরেজী কাব্যের কবি আর এক বাংলা কাব্যের কবিকে নিজের সমান আসনে তুলিয়া ধরিয়া প্রেমালিঙ্গন করিতেছেন মাত্র। সুন্দর দৃশ্য। "সাগর সঙ্গীত" অনুবাদের সময়ে শ্রীঅরবিন্দ বাংলা জানেন না—একথা আর বলা চলে না। দীনবন্ধু মিত্রের "হ্যাকচ প্যাকচ" না-বুঝিবার যুগ অনেক কাল অতীত হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জনের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে আরো অনেক উচ্চপ্রশংসা আছে (* জ)।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আমরা জানিলাম যে, গায়কবাড়ের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী (যদি তখন তিনি সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার না-হইয়া থাকেন) একজন কবি। আবার আশ্চর্য্য, অদ্বৈত বেদান্ত প্রচারের সন্ন্যাসী তিনিও এই বৎসরে কবিতা লিখিলেন "The Song Of The Sannyasin" (*composed at the Thousand Islands Park, New York, in July 1895*)। স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র বেদান্তের বক্তৃতাগুলির সারমর্ম্ম এই কবিতাটিতে পাশ্চাত্য জগতের কাছে এই বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে:

(* জ) *Sagar Sangit*—were the Poems that he himself thought the best to render into English Prose, while Srijut Aurobinda Ghose has made rederings of them in verse. ……A question that I have already been asked—"Do I not overrate Chittaranjan Das's Poetry ?" *Kejane, Kejane.* If the man who could write such a prayer as the following Poem is not a poet whose work is good and worthy of study, then I have no understanding at all of the matter. …… There is no dilletantism in Chittaranjan's poetry : it is not an affair of 'felicitous phrases' wrought for their own sake, or of experiments in metre. He sang because his heart was full. …… In Deshabandhu's mind singing and living were one : song is life and life is song …… When Mr. Middleton Murry, as in his recently published book on Keats, speaks of his 'inirradicable conviction that poetry is not irrelevant to life' in opposition to those who profess to regard it as outmoded, he is making a confession of faith identical with Chittaranjan's"—[*Religious Lyrics of Bengal by John Alexander Chapman—pp. 78-85.*]

"There is but One—the Free—the Knower—Self
Without a name, without a form, or stain."

তারপরে আরো ভয়ঙ্কর কথা—

"No man who thinks of woman
As his wife can ever perfect be !"

কবিতায় যে এমন সাংঘাতিক কথা কেহ বলিতে পারে ইহা ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কি অরবিন্দ, কি চিত্তরঞ্জন এই দুই অবিবাহিত যুবকের মধ্যে সম্ভবতঃ কেহই তাহা ভাবিতে পারেন নাই। অথচ এই বৎসরেই, সাহসে দুর্জ্জয় এই বাঙ্গালী সন্ন্যাসী আমেরিকা ও ইংলণ্ডকে এই কবিতাই শুনাইয়া দিলেন। শুনাইবার পর আবার এই বৎসরেই তিনি দোসরা কবিতায় লিখিলেন—

MY PLAY IS DONE

(*Written in the Spring of 1895 at New York, U. S. A.*)

Ever rising, ever falling with the waves of time,
still rolling on I go
From fleeting scene to scene ephemeral,
with life's currents' ebb and flow
Oh ! I am sick of this unending farce ;
these shows they please no more

* * *

For me is nothing. How I long to get
beyond the crust
Of name and form ! Ah, ope the gates
to me they open must.
Open the gates of light, O Mother,
to me Thy tired son
I long, Oh, long to return home,
Mother, my play is done.

সত্যিইত এতবড় খেলা ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আর কোন্ বাঙ্গালী খেলিয়াছে ? কবিতাটি পুরা রামপ্রসাদী ভাবের উপর দণ্ডায়মান। অথচ পাশ্চাত্য জগৎ

এই অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন ভাবের ইংরেজী কবিতা সেদিন নির্ব্বাকবিস্ময়ে কাণ পাতিয়া শুনিয়াছিল।

প্রাইভেট সেক্রেটারী—ব্যারিষ্টার—সন্ন্যাসী—বোধ হয় বাঙ্গালী বলিয়াই এরা সকলেই কবি। কিন্তু এই বৎসরে বা কিছু আগে-পরে, বাংলার কাব্যাকাশ কোন্ সুরে ঝঙ্কৃত হইতেছে আভাসে তাহার কিছুটা পরিচয় না-জানিলে, এই কাব্য আলোচনার সমস্ত প্রসঙ্গটাই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত এবং অর্থহীন হইয়া পড়িবে। বরোদায় 'মার্ত্তিলা' প্রকাশের ৬ বৎসর আগে, অথচ 'মার্ত্তিলা'র কবিতাগুলি যখন কেম্ব্রিজে লেখা হইতেছে ঠিক সেই সময়টাতে বাংলাদেশে বসিয়াই বাঙ্গালী শুনিয়াছে—

"এমন দিনে তারে বলা যায়,—এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝর ঝরে, তপনহীন ঘন তমসায়॥
* * *
দু'জনে মুখোমুখী গভীর দুখে দুখী আকাশে জল ঝরে অনিবার,
জগতে কেহ যেন নাহি আর।"

—(৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬, 'মানসী')

তারপরে—

"তোমারেই ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
* * *
আমরা দু'জনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হ'তে।
* * *
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি
সকল কালের সকল কবির গীতি।"

—(২রা ভাদ্র, ১২৯৬, 'মানসী')

পরে—

"গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা, ধান-কাটা হোলো সারা
ভরা নদী ক্ষুরধারা খর-পরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা॥"

—(ফাল্গুন, ১২৯৮, 'সোনার তরী')

ঠিক এই বৎসরেই 'মার্ত্তিলা'র শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতাগুলিও কেম্ব্রিজে লেখা হইতেছিল। পরে যে-বৎসর 'মার্ত্তিলা'র কবিতাগুলির রচনা শেষ করিয়া কবি বরোদায় ফিরিতেছেন, ঠিক সেই বৎসরে যদি তিনি বরোদায় যাইবার পথে কলিকাতা হইয়া যাইতেন, তবে শুনিতে পাইতেন—"Night By The Sea"তে প্রিয়তমা এডিথের বুকে "সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব" মনে করিয়া তিনি যেমন একান্তে বিলীন হইয়া থাকিবার ব্যাকুল বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন আবার অন্যদিকে বাংলাদেশের কবি সেই বৎসরেই প্রিয়তমাকে ডাকিয়া ঠিক উল্টা কথা বলিতেছিলেন—

"যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো এসো, মোর
হৃদয় নীরে।
* * *
আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তলসম,
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে
* * *
যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে,
* * *
যদি গাহন করিতে চাও, এসো নেমে এসো হেথা
গহন তলে
* * *
যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দেও
সলিল মাঝে।"

—(১১ই আষাঢ়, ১৩০০, 'সোনার তরী')

বরোদায় দুইটি বৎসর কাটাইবার পর যখন "মার্ত্তিলা" প্রকাশিত হইল ঠিক তখন বাংলার কাব্যাকাশে উদিত হইতেছে—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে—
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীলগগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল চরণে
তুমি চঞ্চলগামিনী।

মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলকগন্ধ উড়িছে—মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী।
* * *
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে—
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী,—
তুমি অন্তর ব্যাপিনী।"
—(১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২, 'চিত্রা')

অরবিন্দ তখনো বাংলা শিখিতে আরম্ভ করেন নাই। কাজেই এই কবিতাটি তিনি তখন পড়িতে পারেন নাই। যদি পারিতেন তবে Shelley, Wordsworth, Keats, Browning-এর দেশ হইতে নিজের দেশে ফিরিয়া ক্ষোভ করিবার কোন হেতু পাইতেন না। অবশ্য ক্ষোভ তিনি কখনো করেন নাই।

উপরে উদ্ধৃত কবিতাটির রচনার মাত্র ৫ দিন পরে বাংলার কাব্যাকাশে উদিত হইল—"উর্ব্বশী" (* ঋ):

(* ঋ) কবি অরবিন্দও "উর্ব্বশী" সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তিনি শুধু কালিদাসের "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া কালিদাসের "delicious humour" অত্যন্ত নিপুণ ও নিখুঁতভাবে রক্ষা করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দেন নাই, পরন্তু উর্ব্বশী (Urvasi) নামে একটি পৌরাণিক গল্পের উপর ভিত্তি করিয়া—কতকটা মিল্‌টনী ছন্দে—অতি বিস্তৃত চারিসর্গে সমাপ্ত একটি মৌলিক কবিতা বরোদায় থাকাকালে "লক্ষ্মীবিলাস প্রেস" হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের কাব্য-আলোচনা করিতে গিয়া *Indian Writers of English Verse*-এর বিদুষী লেখিকা এই কবিতাটির উল্লেখমাত্র করেন নাই। করা উচিত ছিল। ইহাতে অরবিন্দের উপর অবিচার করা হইয়াছে।

এই "উর্ব্বশী" (Urvasi) কবিতাটির খোঁজ প্রথম আমাদিগকে দিয়াছেন, আমাদের বন্ধু শ্রীশৈলেশনাথ বিশী। পরে শ্রীমতী শোভারাণী দত্ত তাঁহার পিতৃবন্ধু এবং শ্রীঅরবিন্দের একজন সহকর্মী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে আনিয়া আমাদিগকে দেখিতে সুযোগ দিয়াছেন। এজন্য আমরা ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

উর্ব্বশী রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অরবিন্দকে কম আকৃষ্ট করে নাই, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি।

"সুর সভাতলে যবে নৃত্য করো পুলকে উল্লসি
হে বিলোল হিল্লোল উর্ব্বশী।

*　　*　　*

তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা।

দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে॥"

ইহা গ্রীক নয়—নিতান্তই পৌরাণিক হিন্দু। কবি ইহাকে যে-রূপে রূপান্তরিত করিয়াছেন তাহাতে এই কবিতাটি দেশকালের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

যে-বৎসর অরবিন্দ দেশে ফিরিয়া আসেন সেই বৎসর রবীন্দ্রনাথ "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটি লেখেন।

"জানিনা কে, চিনি নাই তারে,
শুধু এইটুকু জানি তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানব যাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কাণে
তাঁহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্ত মাঝে, দিয়াছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি। মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে।"...ইত্যাদি

—(২৩শে ফাল্গুন, ১৩০০, 'চিত্রা')

কিন্তু এই কবিতাটি লিখিবার সময় কবির সম্মুখে গায়কবাড়ের নবীন প্রাইভেট সেক্রেটারী কোন অস্পষ্ট ছায়াপাত পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। আমার বলিবার কথা এই যে, "এবার ফিরাও মোরে"র কবি, "জানিনা কে, চিনি নাই তারে" বলিয়া ১৪ বৎসর আগে যে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন (১৩১৪, ৭ই ভাদ্র)—"অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" ঐ তাঁহাকেই তিনি জানিলেন

এবং চিনিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথাই এক্ষেত্রেও মনে জাগে: আগে সুর আগমনী গায়—পরে, রূপ মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেয়।

কংগ্রেস: এই বৎসর মাদ্রাজে কংগ্রেস হয়। মিষ্টার আলফ্রেড্ ওয়েব (Mr. Alfred Webb) সভাপতি হ'ন। তিনি একজন Irishman। অভিভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন—

"My nationality is the principal ground for my having been selected····· I have felt the bitterness of subjection in my own country"···ইত্যাদি।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের বোমার মামলায় গভর্ণমেণ্টের পক্ষের সুপ্রসিদ্ধ কৌঁসিলী Mr. Eardley Norton তখন একজন কংগ্রেস-বীর। তিনি তখন মাদ্রাজে ছিলেন। তিনি লিখিতেছেন—"···in 1894, at Madras, 1200 sat under the presidency of Mr. Alfred Webb, a Home Rule Member of Parliament who undoubtedly exercised a strong fascination over his hearers." মিঃ নর্টন, শ্রীঅরবিন্দের জীবনের প্রথম ব্যাখ্যাকার (Interpreter), দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকার কৌঁসিলী মিঃ সি. আর. দাশ। অরবিন্দের জীবনী আলোচনায় মিঃ নর্টনের প্রয়োজন আছে। যাহা হউক এ সমস্ত কথা অরবিন্দ নিশ্চয়ই তখন পাঠ করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ: এই বৎসরের আর একটি বড় ঘটনা—আমেরিকাতে স্বামী বিবেকানন্দের জয়ডঙ্কা খুব জোরে বাজিয়া উঠিয়াছে (* ক)। এই বৎসরে ৫ই সেপ্টেম্বর উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখার্জ্জী মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউনহলে এক বিরাট সভা হয়। ঐ সভাতে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের ধনী মানী ও পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া চিকাগো ধর্ম্মসভার সভাপতি ও

(* ক) "Life-size portraits of Swami Vivekananda are found hung up in the streets of Chicago with the words 'Monk Vivekananda' beneath them, and thousnds of passers-by comprising men of all classes, are observed to do obeisance to these portraits in the most reverential way"—[*Indian Mirror* – *12th April, 1894*]

মহাবোধি সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ ধর্ম্মপাল মহোদয় এই কথা ১৮৯৪।১২ এপ্রিলের "ইণ্ডিয়ান মিরর" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দকে পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্ম্মকে জয়যুক্ত করার জন্য ধন্যবাদ জানাইয়া পত্র লেখেন। ওই পত্রের উত্তরে ১২ই অক্টোবর চিকাগো হইতে Dr. Burrows রাজা প্যারীমোহনকে জানাইয়াছিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসীর নিকট পরিচিত হইবার পর তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্মের নিকট তাঁহাদের বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে (* খ)।

এই বৎসরে আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের বিরাট অভ্যুদয়কে অরবিন্দ নিশ্চয়ই বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে বিমুগ্ধচিত্তে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন।

এই বৎসরটায় জাতিকে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিবার জন্য যেন চারিদিক হইতে একটা আবহাওয়া বহিয়া চলিয়াছে। কংগ্রেসের বাহিরেই যেন এই আবহাওয়া বেশী জোরে প্রবাহিত হইতেছে। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের জন্মবৎসর হইতেই জাতিকে আত্মনিষ্ঠ হইবার জন্য তীব্র কশাঘাত করিতেছেন (* গ)। রবীন্দ্রনাথের লেখায় আমরা কোনদিনই কংগ্রেসের 'মডারেট' নীতির সমর্থন দেখি না।

কিন্তু ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেও অরবিন্দ বাংলা শিখিতে আরম্ভ করেন নাই।

(* খ) "...He (Swami Vivekananda) has aroused much intelligent interest in the study of religion. Lecturerships and Professorships are being founded in our chief Universities. The People of America cherish for India a deep and grateful love. *We believe that we have much to receive from your ancient sacred literature.* Your's......

(*Sd.*) John Henry Burrows.

(* গ) "হয় মরিব নয় বাঁচিব, এই কথাই ভাল। মরিবার ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার দরকার নাই। ক্রমোয়েল যখন ইংলণ্ডের দাসত্ব-রজ্জু ছেদন করিতেছিলেন, তখন তিনি মরিতেও পারিতেন বাঁচিতেও পারিতেন; ওয়াশিংটন যখন আমেরিকায় স্বাধীনতার ধ্বজা উঠাইয়াছিলেন, তখন তিনি মরিতেও পারিতেন বাঁচিতেও পারিতেন! পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এমন কেহ মরে, এমন কেহ বাঁচে—তাহাতে আপত্তি কি! নিরুদ্যমই প্রকৃত মৃত্যু। আমরা না হয় বাঁচিব, না হয় মরিব—তাই বলিয়া কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া দাদামশায়ের কোলের কাছে বসিয়া সমস্তদিন উপকথা শুনিতে পারিব না। তোমার কি ভয় হয়, পাছে তোমার বংশে বাতি দিবার কেহ না থাকে! জিজ্ঞাসা করি, এখনই বা কে বাতি দিতেছে! সমস্তই যে অন্ধকার!"--['চিঠিপত্র', ১২৯২ (১৮৮৫ খৃ:)]

"..রাজনীতিক্ষেত্রে কর্ম্মের দায়িত্বহীন নাকি-সুরের নালিশ—রাজ-

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের লেখা বা ভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া তিনি 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' ভাবমূলক 'ইন্দুপ্রকাশের' প্রবন্ধগুলি লেখেন নাই। রবীন্দ্রনাথ বয়সে অরবিন্দ অপেক্ষা ১১ বৎসর বড়।

বিপিনচন্দ্র পাল: পরবর্ত্তী জীবনে বিপিনচন্দ্র পাল শ্রীঅরবিন্দের একজন সহযোগী ও সহকর্ম্মী। কিন্তু এই বৎসর বিপিনচন্দ্র প্রথমাপত্নী বিয়োগের শোকে অতিশয় মুহ্যমান। এমন কি, তিনি গেরুয়া রঙের আলখাল্লা পরিয়াছেন এবং মাথায় পাগড়ী পর্য্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। অরবিন্দ হইতে বিপিনচন্দ্র বয়সে ১৪ বৎসরের বড় (* ঘ)।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব: শ্রীঅরবিন্দের জীবনে ১২ বৎসর পর, বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময়, আর একটা বড় জীবন আসিয়া জড়াইয়া পড়িবে। তাঁহার নাম উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয়। রেভারেণ্ড ও বাগ্মী ও তৎকালীন একজন কংগ্রেস নেতা সুপ্রসিদ্ধ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনি একজন আত্মীয়। এই ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী দুই বৎসর পূর্ব্বে (১৮৯২ খৃঃ) Roman Catholic সম্প্রদায়ের খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার জীবনও গতিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। একদিন (১৯০৬ খৃঃ) তাঁহার জীবনও শ্রীঅরবিন্দের জীবনকে আসিয়া আঘাত করিবে—উদ্দীপ্ত করিবে। সুতরাং অরবিন্দের জীবন আলোচনায় এই খৃষ্টান, হিন্দু স্বাজাত্যবোধে সম্পূর্ণ সচেতন, বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণ অথচ আকুমার ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর জীবন আলোচনার প্রয়োজন হইবে। কেননা, বাংলার স্বদেশীযুগে চরমপন্থী নেতাদের মধ্যেও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের

দ্বারে 'আবেদন এবং নিবেদনের' লজ্জাকর হীনতাকেও কবি (রবীন্দ্রনাথ) কম আঘাত করিতেন না।"—[সাধনার যুগ, ১৮৯১-৯৫, 'রবীন্দ্রনাথ', পৃঃ ৩২—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী]

(* ঘ) বিপিনচন্দ্র পালের প্রথমাপত্নীর নাম নৃত্যকালী দেবী; পিত্রালয় হুগলী ভাঁড়ারহাটী। তিনি উদয়রাম চট্টোপাধ্যায়ের ভগ্নী ছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নৃত্যকালী দেবীর মৃত্যুর পর প্রথম কয়মাস বিপিনচন্দ্র পাল সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরের বিপরীত ১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট অবস্থান করিতেন। ১৮৭১ সালে উহা Training Academyর গৃহ ছিল এবং রাজনারায়ণ বসুর সুপ্রসিদ্ধ "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ক বক্তৃতা এই গৃহেই দেওয়া হইয়াছিল।

বিপিনচন্দ্র পালের কন্যা Mrs. Nandir নিকট হইতে এই সংবাদটুকু সংগ্রহ করিয়া শ্রীমতী শোভারাণী দত্ত আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

প্রতিভায় স্বাতন্ত্র্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অরবিন্দ হইতে ব্রহ্মবান্ধব ১১ বৎসরের বড়।

ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন: এই বৎসরই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। চিত্তরঞ্জনের ছোট ভগ্নী প্রমদা দেবী বলেন: "আমার খুব মনে আছে, বিলাত হইতে আসিয়াই চিত্তদাদা ধুতি পরিলেন, পাঞ্জাবী গায়ে দিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রমদা তুই কবে এসেছিস?' আমি বলিলাম—'আমার অসুখ বলে তিন মাস থেকেই এখানে আছি।' তারপরে খুব বড় একটা থালায় আমাদের সকল ভগ্নীদের নিয়ে একত্র খেতে বসলেন, আর ছোট মামীমা বসে খাওয়াতে লাগলেন।...সবাই মাটিতে ব'সে, চিত্তদাদা খুব আমোদ ক'রে খেতে লাগলেন, তিনি খুব খেতেও পারতেন (* ঙ)।" অরবিন্দ হইতে চিত্তরঞ্জন বয়সে মাত্র দুই বৎসরের বড়।

মনোমোহন ঘোষ: অরবিন্দের অগ্রজ অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষও এই বৎসর বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন (* চ)। তিনি Avoca জাহাজে আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁহার ন'মেশোমশায় হন। তিনি মনোমোহন ঘোষকে ষ্টেশনে গিয়া প্রথমে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া আসেন। পরে দেওঘরে রাজনারায়ণ বসুর নিকট লইয়া যান। এতদিন পর দেশে ফিরিয়া মনোমোহন তাঁহার আত্মীয়স্বজনদের "charming and cultivated folk" বলিয়া তাঁহার এক বন্ধুর নিকট পত্রে বর্ণনা করিয়াছেন (* ছ)।

(* ঙ) দেশবন্ধু-স্মৃতি—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ৭৭।

(* চ) পূজনীয়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী (২২।৬।৪০ তারিখে) আমাদিগকে বলিয়াছেন যে—"দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত মনোমোহন ও অরবিন্দ, এই উভয় ভ্রাতারই সৌহৃদ্য ছিল। তবে ব্যক্তিগতভাবে, মনোমোহন ঘোষের সহিতই তাঁহার (চিত্তরঞ্জনের) বেশী বন্ধুত্ব ছিল।" মিষ্টার বি. সি. চ্যাটার্জ্জী বলিয়াছেন—"অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জনের বেশ মাখামাখি ছিল। একজন ডাকিতেন—'অর'; আর একজন ডাকিতেন—'চিত্ত'।"

(* ছ) "I arrived on the 25th October (1894) and have since been staying at a beautiful country-place called Baidyanath, in my grand-father's house, all among the mountains and green sugar-cane fields and shallow rivers. My own people I find a charming and cultivated folk, and spent an extremely

মনোমোহন ঘোষ ইংরাজী সাহিত্যে একজন প্রসিদ্ধ কবি। শ্রীঅরবিন্দও ইংরাজী সাহিত্যে একজন কবি। সুতরাং দেখিতেছি উভয় ভ্রাতাই কবি এবং উভয়েই ইংরাজীতে কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। রাজনীতিতে শ্রীঅরবিন্দের সহিত মনোমোহনের কোনই সাদৃশ্য নাই। কিন্তু কাব্যানুশীলনে এবং কবিতা লেখায় আছে।

অরবিন্দ ও বঙ্কিম : বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯৪-এর ৮ই এপ্রিল দেহত্যাগ করেন। পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রী মহাশয় বঙ্কিমবাবুর চরিত্রের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিভাকে পূজা করিয়াছেন (* জ)। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বঙ্কিমের প্রতিভাকে যেরূপ উচ্চপ্রশংসায় সম্মানিত করিয়াছেন তাহা কেবল এক তাঁহার লেখনীমুখেই সম্ভব (* ঝ)।

শ্রীঅরবিন্দ এই বৎসরে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে দেবী সরস্বতীকে সম্বোধন করিয়া একটি ছোট কবিতা লিখিলেন। দেশে ফিরিয়া বরোদায় অবস্থানকালে সম্ভবতঃ এইটি তাঁহার প্রথম কবিতা। কবিতাটি আগেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

অরবিন্দ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কেম্বিজে থাকাকালীন Parnell-এর মৃত্যু উপলক্ষে

---

pleasant time among them. This I think very fortunate indeed—to find at once friends and that of one's own blood, so congenial and interesting as soon as I landed."—[*Songs of Love & Death*, p. 14 : Indian Writers of English Verse, p. 105]

(* জ) "বঙ্কিমবাবু চরিত্রাংশে কেশবচন্দ্র সেন বা মহেন্দ্রলাল সরকার বা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সমকক্ষ লোক ছিলেন না ; কিন্তু প্রতিভার জ্যোতিতে দেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।"—[রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—পৃঃ ২৮৫]

(* ঝ) মনে আছে প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্ব্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেকবার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি···তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন—ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ কথা কোন বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।"
—[রবীন্দ্রনাথ, ১৩০০]

যে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সুতরাং স্বভাব-কবি অরবিন্দের পক্ষে বঙ্কিমের মৃত্যু উপলক্ষে ছয় ছত্রের একটি কবিতা লেখা, কিছুই কঠিন কাজ নয়।

অরবিন্দ বঙ্কিমের প্রতিভাকে লক্ষ্য করিয়া মৃত্যুর পরক্ষণেই ঘোষণা করিলেন যে : বঙ্কিম দেহত্যাগ করিলেও তাঁহার প্রতিভা অমর—'immortal who is dead'। বঙ্কিম পরবর্ত্তীকালে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের উপর খুব বেশী রকম প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

'ঋষি বঙ্কিম' প্রবন্ধে অরবিন্দ লিখিয়াছেন—"He first of our great publicists, understood the hollowness and inutility of the methods of political agitation—which prevailed in his time and exposed it with merciless satire in his 'Lokarahasya' and 'Kamala Kanta's Daftar'···He bade us leave the canine method of agitation for the leonine. The Mother of his vision held trenchant stool in Her twice-seventy-million hands and not the bowl of the mendicant."

কংগ্রেস জন্মিবার দশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যে নরমপন্থী (moderate) রাজনীতির অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন (* ঐ)। কিন্তু, অরবিন্দের 'মডারেট'-পন্থা-বিরোধী 'ইন্দুপ্রকাশে'র প্রবন্ধগুলি নিশ্চয়ই বঙ্কিমের এইসকল বাংলা প্রবন্ধগুলি দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে পারে নাই। ইহা প্রত্যক্ষ। সুতরাং

(* ঐ) "দুই রকমের পলিটীক্স্ দেখিলাম, এক কুকুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। বিষমার্ক এবং গর্শাকফ্ এই বৃষের দরের পলিটিশুন ; আর উলসী হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত অনেকে এই কুকুরের দরের পলিটিশুন।—['পলিটিক্স্'—'কমলাকান্তের দপ্তর']

"তোমায় সত্য বলিতেছি, কমলাকান্ত! তোমাদের জাতির ঘ্যান্‌ঘ্যানানি আর ভাল লাগে না। দেখ, আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমিও শুধু ঘ্যান্ ঘ্যান্ করি না—মধু সংগ্রহ করি, আর হুল ফুটাই। তোমরা না জান মধু সংগ্রহ করিতে, না জান হুল ফুটাইতে, কেবল ঘ্যান্ ঘ্যান্ পার। একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই, কেবল কাঁদুনে মেয়ের মত দিবারাত্রি ঘ্যান্ ঘ্যান্।"—['বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব' —'কমলাকান্তের দপ্তর']

"কমলাকান্তের দপ্তর" ১৮৭৪ হইতে ১৮৭৬ খৃঃ রচিত হয়।

বলিতে হয়, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের বাংলা লেখা দ্বারা কোনরূপ প্রভাবান্বিত না-হইয়াই কংগ্রেসের মডারেট নীতির বিরোধী হইয়াছিলেন। আমরা আগেও বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি—ইহা সাধারণভাবে 'their politics' এবং বিশেষভাবে Ireland-এর Parnell Politics দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিবে। থাকার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু রাজনীতির গরমপন্থীদের মধ্যেও Parnell ও বঙ্কিমে পার্থক্য আছে। উভয়েরই বৈশিষ্ট্য আছে। নিশ্চয়ই শ্রীঅরবিন্দ ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ 'ঋষি বঙ্কিম'-এর রচনার সময় মডারেট-পন্থা-বিরোধী রাজনীতির প্রতিধ্বনি শুনিয়া নিশ্চয়ই পরম পুলকিত হইয়াছিলেন। এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার প্রবলতম আকর্ষণের ইহাই অন্যতম কারণ।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্কিমের চরিত্রের উপর যে কটাক্ষপাত করিয়া গিয়াছেন, অরবিন্দ তাহারও উত্তর 'ঋষি বঙ্কিম'-এ দিয়াছেন (* ট)।

বয়স তেইশ বৎসর (১৮৯৫।১৫ই আগষ্ট—১৮৯৬।১৪ই আগষ্ট):

অরবিন্দ ও পার্নেল ★ C. R. Dass ভারতের Parnell কি-না ★ রাজা রামমোহন রায়—আয়র্ল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ড ★ স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগ্নী নিবেদিতা ★ অরবিন্দ ও ভগ্নী নিবেদিতা ★ পুণা কংগ্রেস (১৮৯৫ : সভাপতি—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) ★ তিলক-মহারাজ ও শিবাজী-উৎসব

অরবিন্দ ও পার্নেল : এই বৎসরে অরবিন্দের মনের পরিচয়, চিন্তার গতি আমরা লক্ষ্য করিতে পারি তাঁহার এই বৎসরেই লিখিত একটি কবিতা হইতে। পণ্ডিচারী হইতে প্রকাশিত 'মার্ত্তিলা'র (Myrtilla) দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা স্থান পাইয়াছে। কবিতাটির নাম 'Lines On Ireland' 1896'।

অরবিন্দ যে আয়র্ল্যাণ্ডের বিদ্রোহী নেতা পার্নেল (Parnell)-এর গুণমুগ্ধ

(* ট) "The Rishi is different from the Saint. His life may not have been distinguished by superior holiness, nor his character by an ideal beauty. He is not great by what he was himself but by what he has expressed."—*Aurobindo.*

তাহা আমরা দেখিয়াছি। পার্নেলের মৃত্যুর পর আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-আন্দোলন যাঁহারা চালাইতেছিলেন তাঁহারা একদিকে যেমন ভীরু ও দুর্বল, আবার অন্যদিকে তেমনি পার্নেলের প্রতি অকৃতজ্ঞতার কলঙ্কে কলঙ্কিত। অরবিন্দ এই সম্পর্কেই আগুনের ফুলকি ছড়াইয়া এই কবিতাটি বরোদাবাসের চতুর্থ বৎসরে লিখিয়াছিলেন (* ক)।

এই কবিতাটিতে অরবিন্দের চিন্তার গতি কোন্‌দিকে ধাবিত হইতেছে তাহার কিছুটা পরিচয় দিতেছি। অরবিন্দ বলিতেছেন—"নিঃসঙ্গ, নিঃশঙ্ক অবস্থায়, হে দেবোপম (পার্নেল) লোকাপবাদ সহ্য করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াছিলে কি শুধু তোমার কঠিন সাফল্যমুখী উদ্যোগ এইরূপ হীন ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হইবে বলিয়া? যখন চিরদাসত্ব-নিগড়ে নিষ্পিষ্ট ও আবদ্ধ জাতি তাহাদের মহান্ মুক্তিদাতার অবমাননা করে, কষ্টলব্ধ গৌরবের পরিবর্তে অলস অবহেলায় হেয়-ভাবে বারংবার ব্যর্থ-প্রচেষ্টায় স্বীয় চিত্তবৃত্তির দৈন্য প্রচার করে, ইতিহাসেও তখন ইহার দৃষ্টান্তের অভাব হয় না।"

"In lonely strength within thy godlike heart,
Obloquy faced, health lost the goal nigh won,
To see at last thy strenuous work undone ?
So falls it ever when a race condemned
To strict and lasting bondage, have contemned
Their great deliverer, self and ease preferring
To labour's crown, by their own vileness erring
Thus the uncounselled Israelites of old,
Binding their mightiest, for their own case sold,
Who else had won them glorious liberty
To his Philistian foes, as thine did thee."

(* ক) শ্রীঅরবিন্দের অগ্রজ স্বর্গীয় অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা লিখিয়াছেন—"The poems on Parnell and 'Ireland in 1896' are full of thought and fire, and sound an entirely different note. Aurovindo, an ardent admirer of Parnell, was shocked at Ireland's ingratitude for his services, and is full of contempt for the weak men, who were at the head of Irish

বার্ক যেমন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের কোন ঘটনা হইতে একটা চিরন্তন দার্শনিক সত্যে গিয়া উপস্থিত হইতেন, অরবিন্দের এই কবিতাটিতেও আমরা সেই রকমের একটা যুক্তিকৌশল দেখিতে পাই। তিনি আয়র্ল্যাণ্ডের একটা বিশেষ ঘটনা হইতে রাজনীতির একটা সাধারণ এবং সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে প্রযোজ্য মহান্ সত্যে উপনীত হইয়া কী আশাপ্রদ কথা গুরুগম্ভীরস্বরে বলিয়াছেন তাহা শুনুন:

বিদেশী শত্রুর আক্রমণ, যুদ্ধের বিভীষিকা, স্বদেশবাসীর দেশদ্রোহিতা, অকস্মাৎ বিপদ, প্রতিকূল নিয়তি, শতাব্দীর আবর্জ্জনা, ধ্বংসের তাণ্ডব, মহামারী —এসব কিছুই একটা জাতিকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারে না, তা' লোকে যাহাই বলুক না কেন। মানুষ তাহার নিজের অদৃষ্টকে নিজেই গড়ে বা ভাঙ্গে; কারা-প্রাচীর মানুষেই খনন করে, আবার স্বাধীন রাজমুকুট এই মানুষই তৈয়ার করে।

"For 'tis not foreign force, nor weight of wars,
Nor treason, nor surprise, nor opposite stars,
Not all these have enslaved nor can, what'er
Vulgar opinion bruit, nor years impair,
Ruin discourage, nor disease abate
A nation. *Men are fathers of their fate*;
They dig the prison, they the crown command."

এই কবিতাটি উপলক্ষ্য করিয়া অরবিন্দ সম্বন্ধে যে-কয়েকটি কথা আমাদের মনে উদিত হইয়াছে তাহাই বলিতেছি:

১ম। অরবিন্দ যে বলিয়াছেন, 'দেশ ও কাব্যকে আমি সমান ভালবাসি' একথা সম্পূর্ণ সত্য। আমরা পূর্ব্বেও দেখিয়া আসিয়াছি যে, তিনি কবি ও দেশপ্রেমিক—এক সঙ্গে দুই-ই।

২য়। অরবিন্দ বিলাতে অবস্থানকালেই সাধারণভাবে আইরিশ জাতির

affairs after his death. Deep political thought is voiced in these lines".

"For 'tis not foreign force, nor weight of wars"......etc. etc.—[*Indian Writers of English Verse—p. 129*]

স্বাধীনতা-আন্দোলনের সহিত এবং বিশেষভাবে পার্নেল-এর নেতৃত্ব ও বীরত্বের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া আসিয়াছেন।

৩য়। ১৮৯৩।৯৪ খৃঃ কংগ্রেসের 'আবেদন-নিবেদন নীতি'র 'তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ' প্রবন্ধ লিখিয়া মিষ্টার র‍্যাণাডের নিকট ধমক খাইবার পর তাঁহাকে কংগ্রেস রাজনীতি সমালোচনা করিতে দেখি না। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে, আইরিশ-রাজনীতি হইতেই তিনি কংগ্রেস-রাজনীতিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। আবার এই বৎসরে তিনি কংগ্রেস-রাজনীতি হইতে আইরিশ-রাজনীতিতে কবিতার মধ্য দিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। তাঁহার মন আয়র্ল্যাণ্ড হইতে ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষ হইতে আয়র্ল্যাণ্ড যাতায়াত করিতেছে।

৪র্থ। আর একটি অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, আইরিশ-রাজনীতির মধ্য দিয়াও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছেন ইংরাজের কূট রাজনীতি ('their polities') দ্বারা। আবার, ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতেও বাধাপ্রাপ্ত হইতেছেন ঐ সেই ইংরাজের কূট রাজনীতি ('their politics') দ্বারা। সুতরাং 'their politics' অর্থাৎ ইংরাজের রাজনীতি এই উভয় দেশেই তরুণ যুবক অরবিন্দের সম্মুখে একটা অলঙ্ঘনীয় বাধাস্বরূপ দণ্ডায়মান।

৫ম। সুতরাং অরবিন্দের জীবনে রাজনীতির উন্মেষকাল হইতেই ইংরাজের রাজনীতিকে তিনি সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে ত' পারেনই নাই, বরং বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে বাধ্য হইয়াছেন। এবং এই ইংরাজের রাজনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব স্বভাবতঃই তাঁহার মনে অঙ্কুরিত হইয়াছে এবং কালক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ। কিন্তু আর একটি গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া উঠিতেছে না। প্রশ্নটি এই—পার্নেল-পরিচালিত আইরিশ আন্দোলনের যে কৌশল অরবিন্দ সেই সময় উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের কংগ্রেসকেও কি তিনি সেই পার্নেলী বাধা-প্রদানের কৌশল অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন? অরবিন্দ শুধু পার্নেল মনুষ্যটিকেই ভালবাসেন নাই। স্বাধীনতার আন্দোলনে পার্নেলের বাধা-প্রদানের কৌশলকে যদি তিনি না সমর্থন করিতেন, তবে পার্নেলকে ত এতটা সম্মান দিতেন না, এবং পক্ষান্তরে ১৮৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস-নেতাদের 'আবেদন-নিবেদন'-রূপ ভিক্ষাবৃত্তির উপর এতটা বীতশ্রদ্ধ

হইতেন না। অথচ দেখিতেছি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে পার্লিমেণ্টারী বাধা ভারতবর্ষে চলিতে পারে না, কেননা ভারতবর্ষে তখনও পার্লিমেণ্ট নাই।

কংগ্রেসের 'আবেদন-নিবেদন-নীতির' উপর অরবিন্দ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ঠিক। কিন্তু ঐ 'আবেদন-নিবেদন' নীতির পরিবর্ত্তে তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসকে পার্নেলী প্রথা অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন, এ কথার প্রমাণ কোথায়? অবশ্য, অরবিন্দ কখনও তাঁহার কোনও রাজনীতি-সংক্রান্ত বক্তৃতায় বা লেখায় এ-কথা দাবী করেন নাই যে, তিনি কোনও কালে ভারতের রাজনীতিতে পার্নেলী-প্রথা প্রচলন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। স্বদেশী যুগে অরবিন্দ তাঁহার অন্যান্য সব দিক্‌পাল সহকর্ম্মীর সহিত মিলিয়া Passive Resistance-এর কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি ও বিপিনচন্দ্র পাল Passive Resistance-এর যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা ত' পার্নেলী-প্রথা নয়।

রাষ্ট্র-চেতনার উন্মেষকাল হইতেই অরবিন্দ জন্মস্বত্বে বাঙ্গালী যুবক হইয়াও স্থান কাল ও অবস্থার পরিবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া ইংরাজ রাজনীতির বিরুদ্ধে একজন আইরিশ যুবকের মত স্বাধীনতার স্পৃহা দেখাইয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, এই যুবক স্বভাবতঃই স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এবং এই স্বাধীনতার স্পৃহাই ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে কালে নূতন সুর ও নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ভারতের পার্নেল কি-না: এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর হইতেই বাঙ্গলার গান্ধীভক্ত উপ-নেতাগণ যে দাস-মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া 'ভারতের পার্নেল'-এর (*খ) সাফল্যমুখী উদ্যমকে ব্যর্থ করিয়া তাঁহার গৌরবময় স্মৃতির অবমাননা করিয়াছেন,

---

(*খ) **C. R. DASS—"INDIA'S PARNELL"**

"The man who made Dyarchy Impossible"—[*Daily Herald.* (London), *Wednesday, 17th June, 1925*]

দেশবন্ধু কিন্তু নিজেকে পার্নেল বলিয়া দাবী করা দূরের কথা, স্বীকার পর্য্যন্ত করেন নাই। তিনি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ত্রিচিনাপল্লীতে এক বক্তৃতায় স্পষ্ট বলিয়াছেন—"Because Indian legislatures are not sovereign legislatures, I have advised the country to follow *not the method of Parnell but a different plan altogether*······what has Parnellism or historical parallels to do with my plan ?"

তাহাতে অরবিন্দের প্রথম যৌবনে লিখিত তীব্র কশাঘাতপূর্ণ এই কবিতাটি, ১৯২৫-এর ১৬ই জুন-এর পর হইতে বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

রাজা রামমোহন রায়—আয়র্ল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড: আয়র্ল্যাণ্ড-প্রসঙ্গে এইবার আমাদিগকে একটু অতীতের দিকে ফিরিয়া রাজা রামমোহন রায়ের নিকট যাইতে হইবে। রামমোহন হইতে অরবিন্দ—একটি ধারা স্রোতের মত বহিয়া চলিয়াছে, একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আয়র্ল্যাণ্ড-প্রসঙ্গে আমরা সেই এক অবিচ্ছিন্ন ধারার গতিপথ লক্ষ্য করিয়া আমাদের কথা ঠিক কি-না প্রমাণ করিব। আমরা আয়র্ল্যাণ্ড-সম্পর্কে রাজা রামমোহন ও শ্রীঅরবিন্দের তুলনামূলক আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখিতে পাইব যে—

১। আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি রাজা রামমোহনই সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত দিতেছি:

(ক) রাজা রামমোহনের "মিরাত-উল্-আকবর" বলিয়া ফারসি (Persian) ভাষায় একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। "মিরাত-উল্-আকবর" অর্থ সংবাদসমূহের দর্পণ—"Mirror of Intelligence"। যতদূর মনে হয়, ১৮২১ খৃষ্টাব্দে (?) "মিরাত-উল্-আকবর" কলিকাতায় প্রকাশ ও প্রচার হইতেছিল। ঐ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটির নাম—"আয়র্ল্যাণ্ড এবং তাহার দুঃখ ও অসন্তোষের কারণ" (ইংরেজী অনুবাদ: Ireland—the Causes of its Distress and Discontent)। দুইটি কারণের কথা রামমোহন উল্লেখ করিতেছেন: একটি—আইরিশ জমিদারদিগের জমিদারী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করা। দ্বিতীয়টি—আয়র্ল্যাণ্ডের "রোমান ক্যাথলিক" অধিবাসীদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক রাজস্ব আদায় করিয়া তাহা 'প্রোটেষ্টাণ্ট" পাদ্রীদিগের ভরণপোষণ ও বিলাস-ব্যসনের জন্য ব্যয় করা (* গ)।"

(* গ) "Rammohun's Persian Weekly *Merat-ul-Akbar* contained an article on "Ireland—the Causes of its Distress and Discontent." In this he dwelt on the evils of absenteeism and the injustice of maintaining Protestant clergyman out of revenues wrung from the Roman Catholic inhabitants of Ireland."—[*Introduction* (p. xx) *The English Works of Raja Rammohun Roy,* Published by the Panini Office, Bahadurganj, Allahabad ; 1906]

১৮৯৬ খৃঃ হইতে ইহা ৭৫ বৎসর আগেকার কথা। রামমোহন হইতে অরবিন্দে এই আয়র্ল্যাণ্ড-প্রসঙ্গের ধারা ৭৫ বৎসর ব্যাপিয়া প্রবাহিত। আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত অরবিন্দের সহানুভূতি প্রকাশের ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন কলিকাতাতে বসিয়া ফারসি ভাষায় নিজের ফারসি সংবাদপত্রে প্রত্যক্ষভাবে আয়র্ল্যাণ্ড না দেখিয়া তাঁহার সহানুভূতি প্রকাশ ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

(খ) ১৮২৮-এর ১৮ই আগষ্ট মিঃ জে. ক্রফোর্ডকে তৎকালীন ভারতীয় জুরি-প্রথা আইন-সম্পর্কে লিখিতে গিয়া আয়র্ল্যাণ্ড-প্রসঙ্গে রাজা লিখিয়াছিলেন যে আয়র্ল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের অবস্থা ও অবস্থান সমান নহে। আয়র্ল্যাণ্ড ইংলণ্ডের অতি নিকটে অবস্থিত। আয়র্ল্যাণ্ড বিদ্রোহী হইলে ইংলণ্ড হইতে জাহাজে সৈন্য পাঠাইয়া তাহা দমন করা খুব সহজ। কিন্তু ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে বহুদূরে অবস্থিত। আইরিশ জনসাধারণের যে শিক্ষা সাহস ও উদ্যম দেখা যায়, তাহার চার ভাগের এক ভাগও যদি কোনদিন ভারতবাসীরা লাভ করিতে পারে, তবে স্থানের দূরত্ব এবং ভারতবর্ষের প্রচুর অর্থ ও তাহার প্রচুর লোক-বল থাকাতে—হয় ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, অথবা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এক দুর্দ্ধর্ষ শত্রুরূপে কার্য্য করিতে থাকিবে (* খ)। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনে সহানুভূতি

(* খ) "A new Jury Act came into operation in the beginning of 1827. On August 18th, 1828, Rammohun wrote to Mr. J. Crawford······"It should not be lost sight of that the position of India is very different from that of Ireland, to any quarter of which an English fleet may suddenly convey a body of troops that may force its way in the requisite direction and succeed in suppressing every effort of a refractory spirit. Were India to share one-fourth of the knowledge and energy of that country, she would prove from her remote situation, her riches and her vast population, either useful and profitable as a willing province, an ally of the British empire, or troublesome and annoying as a determined enemy." —[*Introduction* (pp. xxii—xxiii) *to the English Works* of Raja Rammohan Roy, published by the Panini Office, Bahadurganj, Allahabad, 1906]

প্রকাশ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ অপেক্ষা রাজা রামমোহন পূর্ব্বগামী—শুধু পূর্ব্বগামী নহে, ৭৫ বৎসর পূর্ব্বগামী। ১৮৯১ এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে যুবক অরবিন্দ পার্নেল ও আয়র্ল্যাণ্ড প্রসঙ্গে কবিতা লিখিবার সময় এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন কি-না. তাহা তাঁহার কোন লেখা হইতে আমরা প্রমাণ করিতে পারি না।

(গ) আয়র্ল্যাণ্ডের বিশেষ ঘটনা আলোচনা করিতে গিয়া অরবিন্দ যেমন কোনো এক জাতির স্বাধীনতা অর্জ্জন সম্পর্কে এক সুমহান চিরন্তন আদর্শের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে—

"Men are fathers of their fate
They dig the prison, they the crown command."

—তেমনি, 'মিরাত-উল্-আকবরে' আয়র্ল্যাণ্ড-প্রসঙ্গে সাদির কবিতা উদ্ধৃত করিয়া রাজা রামমোহন বলিয়াছেন—"এই সকল লোভী ও অত্যাচারী রাজপুরুষদিগকে রাজার শুভাকাঙ্ক্ষী বলিও না ; ইঁহারা যত বেশী পরিমাণে রাজস্ব আদায় করেন, ঠিক তত বেশী পরিমাণে ইঁহারা রাজার মর্য্যাদা ও খাতির নষ্ট করেন। হে রাজনীতিবিশারদগণ, রাজস্ব যেন প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানেই ব্যয়িত হয় এবং তবেই নিরন্তর ও আজীবন প্রজাকুল রাজভক্ত থাকিবে।"

How admirable is the observation of Saudi
(on whom be mercy !)

* * *

"Do not say that these rapacious ministers are the
well-wishers of His Majesty ;
For in proportion as they augment the revenue of the state,
they diminish his popularity ;
O statesman, apply the revenue of the king
towards the comfort of the people ;
Then during their lives they will be loyal to him."

২য়। রাজা রামমোহন শুধু আইরিশ জাতির স্বাধীনতার কথাই ভাবেন নাই, পরন্তু তাঁহার সময় ইয়োরোপ ও এশিয়ার জাতি-সকলের উত্থানের সহিত তিনি উল্লসিত ও পতনের সহিত শয্যাশায়ী হইয়া পড়িতেন—একথা সর্ব্বজনবিদিত। এবং এক্ষেত্রে তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিলে বড় বেশী দূরে

গিয়া ছড়াইয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় নিবৃত্ত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দও শুধু আয়র্ল্যাণ্ডের কথাই ভাবেন নাই, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে 'আর্য্য' প্রত্রিকায় তাঁহার 'Ideal of Human Unity' সন্দর্ভে তিনি পৃথিবীর জাতিসকলের উত্থান ও পতনের ইতিহাস, দর্শনের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় অতি সুন্দর আলোচনা করিয়া পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছেন।

একটা কথা মনে আসিতেছে। আয়র্ল্যাণ্ড সম্পর্কে বলিতে গিয়া রাজা রামমোহনের চোখের সম্মুখে ভারতবর্ষ ছিল, ইহা তাঁহার কথা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ হয়। কিন্তু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে 'Lines on Ireland' লিখিতে গিয়া যুবক অরবিন্দের সম্মুখে কি ভারতবর্ষ কোন ছায়াপাত করে নাই? আমাদের ত' মনে হয়—করিয়াছিল। (কেননা, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেই—দুই বৎসর পূর্ব্বে, তিনি ভারতবর্ষের মুক্তিকামী কংগ্রেস 'আবেদন-নিবেদন-নীতি'র ভুলপথ অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া 'তীব্র প্রতিবাদ' করিয়াছেন।) সুতরাং এই বৎসরে আয়র্ল্যাণ্ডের উপর কবিতা লিখিতে বসিয়া তিনি নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের মুক্তির পথে শুধু অন্ধকার দেখেন নাই।

অনেকের বিবেচনায়, অরবিন্দ-প্রসঙ্গে রামমোহনের কথা একটু বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছে। কিন্তু আর একটু না বলিয়া উপায় নাই। তাহার প্রথম কারণ—কথাটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। দ্বিতীয় কারণ—রামমোহন সম্পর্কে অরবিন্দ কতটা সচেতন, তাহা তাঁহার এত অজস্র লেখা হইতে কিছুই হদিস্ পাইতেছিনা। তাঁহার লেখাতে এত লোকের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোথাও রাজা রামমোহনের উল্লেখ দেখি না। উল্লেখ নাই দেখিয়া, উপেক্ষা অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। কেননা, রাজা রামমোহন উপেক্ষনীয় নহেন। রামমোহনের পরবর্ত্তীয়েরা—যিনি যে-বিষয়ে যাহাই আলোচনা করুন না কেন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত, তাঁহাদের আলোচ্য-বিষয় রাজা রামমোহনের সিদ্ধান্তের সহিত তুলনা করিয়া না-দেখিলে সে-আলোচনার ঐতিহাসিকতা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখিয়াছেন, "The Raja is the first begotten of our Illumination."।

কথা উঠিয়াছে আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লইয়া। সেই প্রসঙ্গেই রামমোহন ও অরবিন্দের তুলনামূলক আলোচনার সূত্রপাত করিতে হইয়াছে। আয়র্ল্যাণ্ড-

সম্পর্কে কথা বলিতে গিয়াই আবার কথা উঠিল, এশিয়া ও ইয়োরোপ এমন কি পৃথিবীর সকল জাতির স্বাধীনতা লাভের সমস্যা লইয়া। সুতরাং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও বাদ যাইতে পারে না। রামমোহন ও অরবিন্দ কেহই ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে বাদ ত দেনই নাই, বরং খুব জোর দিয়াছেন।

এখন বিবেচ্য দুইটি কথা। প্রথম—পৃথিবীর কয়েকটি জাতি স্বাধীন থাকিয়া অপর কয়েকটি জাতি তাহাদের অধীন থাকিলে দোষ কি? দ্বিতীয়—কোন একটা জাতির স্বাধীনতা কিসের উপর নির্ভর করে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, স্বাধীনতালাভে প্রত্যেক জাতির সমান অধিকার। সমগ্র মনুষ্যজাতি এক পরিবারভুক্ত। কেহ স্বাধীন কেহ পরাধীন থাকিবে—ইহা ভাল কথাও নয়, যুক্তিসিদ্ধও নয়। মনুষ্যজাতির প্রত্যেক অংশই অথবা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিসকল সমান উন্নতি লাভ করিবে। এই সম্পর্কে রাজা রামমোহনের যাহা লেখা আছে, তাহা হইতে এইরূপ একটি ধারণা আমাদের মনে জন্মিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের বহু বিক্ষিপ্ত লেখা হইতেও অনুরূপ ধারণাই আমাদের মনে আসে। যে-কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহার জন্য দায়ী রামমোহন হইতে অরবিন্দের কালের দূরত্ব, সমগ্র মানব-সমাজের বিভিন্নমুখী বিচিত্র বিকাশ এবং উভয়ের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। সমগ্র মানব জাতি এক অবিচ্ছিন্ন জীবন্ত প্রাণী।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর কিঞ্চিৎ জটিলতায় পূর্ণ। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন। অতএব ভারতবাসীরা মনে করেন যে, ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ চলিয়া গেলেই এবং সেই সঙ্গে আর কেহ আসিয়া ভারতবর্ষ দখল না-করিলেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। কিন্তু রাজা রামমোহনের কথা হইতে বুঝি যে, কেবলমাত্র বিদেশীর আক্রমণ অথবা অধীনতা হইতে মুক্তি পাইলেই কোন একটা জাতি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারে না। একটা স্বাধীন জাতি বুঝিতে, জেরেমি বেন্থাম (এই কথায় "most admired & beloved collaborator in the service of mankind") আরও অনেকটা কিছু বুঝিয়াছিলেন। যদি না বুঝিতেন, তবে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের Reform আন্দোলনে—Reform Bill পাস না হইলে ইংরাজকে একটা স্বাধীন জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা করিতেন না। শুধু Constitution মানিয়া চলাই, রাজার মতে, স্বাধীনতা নহে। আয়র্ল্যাণ্ড না হয় কতকাংশে ইংলণ্ডের অধীন ছিল, কিন্তু ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড

কোন বিদেশীয়দের দ্বারা আক্রান্ত বা পরাভূত ছিল না। পরন্তু, ইংরাজ জাতির মধ্যে মুষ্টিমেয় ধনাঢ্য লোক Reform Bill পাস হওয়ায় বাধা দিতেছিলেন। রাজা চটিয়া গিয়া William Rathboneকে চিঠি লিখিয়াছিলেন যে—যদি 'রিফরম বিল' পাস না হইত তাহা হইলে তিনি ইংরাজ জাতির সহিত সমস্ত প্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করিতেন (*"As I publicly avowed that in the event of the Reform Bill being defeated, I would renounce my connection with this country".)* । রাজা আরও বলিয়াছিলেন—সমগ্র জাতি (ইংরাজ জাতি) কতিপয় স্বার্থপর লোকের সুলভ মৃগয়ায় পরিণত হইতে পারে না; ঐ কতিপয় স্বার্থপর ব্যক্তি ইংরাজ হইলেও ইংরাজ নয়। রাজার কথাটাই অবিকল তুলিয়া দিতেছি—"The nation can no longer be a prey of the few who used to fill their purses at the expense, nay to the ruin, of the people for a period of upwards of fifty years." যে জাতি নিজের জাতিকে স্বাধীনতা দিতে কার্পণ্য করে, সে জাতির সহিত পূর্ণ অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করিবার জন্য রাজা রামমোহন প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সে জাতি ইংরাজ জাতি হইলেও 'পরওয়া নেহি'। সেদিন এবং আজও ইহা কত বড় কথা! সুতরাং রাজার কথা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে—ইংরাজ যদি আজ ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যায়, এবং অন্য কোন বিদেশী আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ বা দখল না করে, অথচ ভারত-বর্ষীয়দের মধ্যে এক অথবা কতিপয় (অন্য কোন ক্ষেত্রে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের ভাষায় '*it* or *they*') স্বার্থান্বেষী, মতলববাজ, ধনাঢ্য ভারতবাসী, আধুনিক ফাসিষ্ট প্রথায়, সমগ্র ভারতবাসীকে শাসন ও শোষণ করিতে থাকেন এবং এই নিপীড়িত ভারতবাসী যদি এই ফাসিষ্ট প্রথামত অত্যাচারী কতিপয় স্বদেশীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া জয়ী হইতে না পারেন, তবে রাজা রামমোহন ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলিবেন না—যেমন ইংলণ্ডকেও বলেন নাই।

রাজা রামমোহন ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর জাতিসকলের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির মধ্যেই মুষ্টিমেয় কতকগুলি ক্ষমতাশালী লোক সেই দেশের অধিকাংশ লোকের উপর জুলুম করে; আর ঐ অত্যাচারিত প্রপীড়িত অধিকাংশ লোক ঐ মুষ্টিমেয় অত্যাচারী স্বদেশীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সুতরাং রাজা বলিতেছেন যে,

প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এই দুই শ্রেণীর—অত্যাচারী ও অত্যাচারিত লোক আছে। বস্তুতঃ কলহ হইতেছে আদর্শের, কলহ হইতেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের, অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার। রামমোহন পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির মধ্যে স্বাধীনতালাভের জন্য এই আলোড়ন নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের কথারই পুনরুক্তি করিতে হইতেছে —"The struggles are not merely between the reformers and anti-reformers, but between liberty and tyranny throughout the world ; between justice and injustice and between right and wrong."

ইহা শুনিয়া অনেকে বলিবেন—তবে তো দেখিতেছি রাজনীতিক্ষেত্রে রামমোহন পুরা আদর্শবাদী। উত্তরে বলিতেছি—হাঁ, নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু এই আদর্শবাদের সহিত যে বাস্তবতা ও বস্তুতন্ত্রতার অপূর্ব্ব সমন্বয় তিনি নিজ প্রতিভার বিকাশে দেখাইয়াছিলেন, তাহা শুধু এদেশ কেন—তাঁহার সময় পৃথিবীর অন্য কোন দেশেও আর কেহ ঘটাইতে পারেন নাই। যখন তিনি লণ্ডনে বসিয়া ১৮৩২ খৃঃ এইসকল কথা লিখিতেছেন, সেই সময় আয়র্ল্যাণ্ড হইতে কতিপয় অর্থনীতিবিদ আয়র্ল্যাণ্ডের ভূমি-বন্দোবস্ত ও রাজস্ব সম্বন্ধে শিক্ষা করিবার জন্য রাজার হোটেলের চারিপাশে বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিয়াছিলেন। উচ্ছ্বসিত না-হইয়াও শান্তভাবে বলা যায়, বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কত বড় ইতিহাস!

রামমোহন সমগ্র মানবজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাস করিতেন। এবং তাঁহার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল পৃথিবীর সকল জাতির ইতিহাস পাঠ করিয়া। ধর্ম্ম ও রাজনীতিতে স্বাধীন মত ক্রমশঃই সুপরিস্ফুট হইতেছে—ইহাই ছিল রাজার সিদ্ধান্ত। প্রত্যেক জাতির মধ্যে 'ডেসপট ও বাইগট' (despot and bigot) আছে, তাহারা সর্ব্বত্রই স্বাধীন মত ও স্বাধীন ভাব প্রকাশিত হইতে বাধা দেয় ; কিন্তু, 'ডেসপট ও বাইগট'দের বাধা সত্ত্বেও ধর্ম্মে ও রাষ্ট্রে মতের ও কার্য্যের স্বাধীনতা ধীরে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে—রাজা রামমোহন সমগ্র মানবসমাজের গতি এইরূপ নিরীক্ষণ করিয়াছেন। পুনরায় রাজার কথাই পুনরুল্লেখ না-করিয়া পারিতেছি না—"But from a reflection on the past events of history, we clearly perceive that

liberal principles in politics and religion have been long gradually, but steadily, gaining ground, notwithstanding the opposition and obstinacy of despots and bigots." রাজার এই সিদ্ধান্তের সহিত "The Ideal Of Humanity"র সন্দর্ভগুলি তুলনীয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগ্নী নিবেদিতা : স্বামী বিবেকানন্দ এই বৎসর আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি আমেরিকা পরিত্যাগ করিয়া প্যারিস হইয়া লণ্ডনে গিয়া উপস্থিত হন। ৯ই সেপ্টেম্বর (১৮৯৫ খৃ:) প্যারিস হইতে তাঁহার চিঠি দেখি এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড হইতে তাঁহার চিঠি দেখিতে পাই। পুনরায় ৮ই ডিসেম্বর নিউইয়র্ক হইতেও তাঁহার চিঠি দেখিতে পাই। সুতরাং তিনি যে "Cyclonic Hindoo" আখ্যা পাইয়াছিলেন তাহার কারণ প্রত্যক্ষ। কিন্তু প্যারিস হইতে ৯ই সেপ্টেম্বরের চিঠিটি একটু মারাত্মক রকমের দেখিতে পাই। এই চিঠিতে দেখিতে পাই, স্বামীজীকে স্বদেশী এবং বেদেশী শত্রুগণ দুইদিক হইতে আক্রমণ করিল। স্বদেশী শত্রুরা অভিযোগ করিলেন যে—'স্বামীজী হিন্দুর অখাদ্য ভক্ষণ করিতেছেন'; বিদেশী শত্রুরা বলিলেন, তিনি 'কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগরূপ সন্ন্যাসীর ব্রত ভঙ্গ করিতেছেন'। অরবিন্দ কি তখন এই-সকল অভিযোগের কথা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলেন? 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি'। এই অভিযোগের উত্তরে স্বামীজী যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার মুখে শোনাই ভাল (* ক)। কথায় বলে, হাতী যখন বাজারের মধ্য দিয়া চলে

(* ক) "তোমরা যে মিশনারিদের আহাম্মকি বাজে কথাগুলো পড়ে সত্য সত্যই এতটা বিচলিত হয়েছো, তাতে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। অবশ্য আমি সবই খাই। যদি কলকাতার লোকেরা চায় যে, আমি হিন্দু-খাদ্য ছাড়া আর কিছু না খাই, তবে তাদের বোলো, তারা যেন আমার একটা রাঁধুনি ও তাকে রাখবার উপযুক্ত খরচ পাঠিয়ে দেয়। এককড়া কাণাকড়ি দিয়ে সাহায্য করবার মুরোদ নেই—এদিকে গায়ে পড়ে উপদেশ ঝাড়া .....

"অপরদিকে যদি মিশনারিরা বলে, আমি সন্ন্যাসীর কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগরূপ প্রধান দুই ব্রত কখনও ভঙ্গ করেছি, তবে তাদের বোলো যে, তারা মস্ত মিথ্যাবাদী।......

"আমি জাতিবিশেষের ক্রীতদাস নাকি? অবিশ্বাসী নাস্তিকগণ, তোমরা আর বাজে আহাম্মকি বোকো না।......

"তোমরা কি লজ্জিত হোচ্ছ না? আমি হিন্দুদের কি ধার ধারি? আমি কি তাঁদের প্রশংসার এতটুকু তোয়াক্কা রাখি—না, তাদের নিন্দায় ভয় করি?

কুকুরেরা তখন চীৎকার করিতে থাকে—কেননা, এই নশ্বর সংসারে হাতীর সঙ্গে সঙ্গে কুকুরেরাও বিদ্যমান রহিয়াছে।

তা যাহাই হউক, এই বৎসরের আর একটী প্রধান ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইবে। কেননা, এই ঘটনাটি কালে সম্প্রসারিত হইয়া অরবিন্দের ভবিষ্যৎ-জীবনের সহিত অচ্ছেদ্য রকমে জড়াইয়া পড়িবে।

স্বামীজী লণ্ডনে থাকাকালীন নভেম্বর মাসের এক রবিবারের সন্ধ্যায় কোন "West end drawing room"এ Miss Margaret Elizabeth Noble (ভগিনী নিবেদিতা)-এর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। এই সাক্ষাতের বিবরণ আপনারা ভগিনী নিবেদিতার মুখ হইতেই শুনিতে পাইবেন (* খ)।

ভগিনী নিবেদিতার নাম বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই শুনিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পাল ভগিনী নিবেদিতার চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে গিয়া অতি উচ্চ প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন (* গ)।

অরবিন্দ বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে স্বদেশীযুগে চরমপন্থী নেতারূপে ঝাঁপাইয়া পড়িবার পূর্বেই বরোদা থাকাকালীন ভগিনী নিবেদিতার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন (* ঘ)। স্বদেশীযুগের চরমপন্থী রাজনীতিতে অরবিন্দ

বৎস, আমি অসাধারণ প্রকৃতির লোক, তোমরা পর্যন্ত এখনও আমায় বুঝতে পারবে না।……

"তোমরা কি বোলতে চাও, তোমরা যাদের শিক্ষিত হিন্দু বলে থাক, সেই জাতিভেদচক্রে নিষ্পিষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন দয়ালেশশূন্য, কপট, নাস্তিক, কাপুরুষদের মধ্যে একজন হয়ে জীবনধারণ করবার ও মরবার জন্য আমি জন্মেছি? আমি কাপুরুষতাকে ঘৃণা করি। আমি কাপুরুষদের সঙ্গে ও রাজনৈতিক আহম্মকির সঙ্গে কোন সংস্রব রাখতে চাইনি।"—স্বামী বিবেকানন্দ।

(* খ) "The time came before the Swami left England, when I addressed him as 'Master'. I had recognised the heroic fibre of the man, and desired to make myself the servant of his love for his own people. But it was his *character* to which I had thus done obeisance.………It dawned on me slowly the massage of a new mind and a strange culture." —[*The Master As I saw Him*—Nivedita—*p. 12-15*]

(* গ) *The Soul of India*—Bepin Chandra Paul—*p.38-40.*

(* ঘ) "যখন মহারাজার অতিথি হ'য়ে সিষ্টার নিবেদিতা বরোদায় এসেছিলেন

ও ভগিনী নিবেদিতা, উভয়েই সমানধর্ম্মী ও সহকর্ম্মী ছিলেন। একথা সর্ব্ব-জনবিদিত। শ্রীঅরবিন্দ এই ভগিনী নিবেদিতার পরামর্শে—১৫ বৎসর পর (১৯১০, ফেব্রুয়ারী) ইংরাজ-রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতবাসের কল্পনা লইয়া ভারতবর্ষের ফরাসী রাজত্বে—প্রথম চন্দননগর, পরে পণ্ডিচারীতে (April 4, 1910) গিয়া অবস্থান করেন (*ঙ)। সুতরাং দেখিতেছি ভগিনী নিবেদিতার পরামর্শ ও প্রভাব এক অতি সঙ্কট-মুহূর্ত্তে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের গতিকে নিয়মিত করিয়াছে। আরও অনেক ঘটনায় যথাকালে আমরা দেখিতে পাইব যে, অরবিন্দের জীবনে ভগিনী নিবেদিতার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

এই প্রসঙ্গে শুধু একটি কথাই মনে হইতেছে যে, ১৮৯৫-এর নভেম্বর মাসে লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ভগিনী নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাতই কি

তখন বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করে আনতে যান। এই খানটায় এসে কলেজের বাড়ী দেখে নিবেদিতা বলেন, 'What an ugly pile—কি কদাকার স্তূপ'। আর তারপর একটুখানি এগিয়ে পুরানো ভারতীয় ষ্টাইলে গড়া গৃহস্থের ছোট্ট বাড়ী দেখে বলেন, 'Oh! how beautiful—আহা কি সুন্দর!' কলাজ্ঞানে ক' অক্ষর গোমাংস হ্যাট-কোটধারী রাজ-অমাত্যেরা তো অবাক! এত লাখ লাখ টাকার মিনার গম্বুজওয়ালা বাড়ী হলো কদাকার, আর একটুখানি কুঁড়ে হোলো সুন্দর! একজন তো অরবিন্দের কাছে এসে কানে কানে বলেই ফেললেন, 'I say, she is mad—ওহে! উনি তো পাগল।' সেজদা (অরবিন্দ) তখন. বরোদা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল কি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী তা আমার স্মরণ নেই।—['আমার আত্মকথা', বারীন্দ্র কুমার ঘোষ—পৃঃ ১৬৩-৬৪]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রবর্ত্তিত বাঙ্গালার নব-চিত্রকলা সম্পর্কে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ভগিনী নিবেদিতা ও শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই যে উচ্চপ্রশংসামূলক সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে উভয়ের মতসাদৃশ্য এবং চিন্তারাজ্যে উভয়ের যোগসূত্র অতিশয় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। মেদিনীপুর (১৩৪৭ সাল) কলাবিভাগের সভানেত্রীর আসন হইতে দেশবন্ধুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী তাঁহার অভিভাষণে ইঁহাদের উভয়ের মতবাদ অতি সুন্দররূপে তুলনা ও আলোচনা করিয়াছেন।

(*ঙ) "Sister Niveditaর পরামর্শ, পরিশেষে অজ্ঞাতবাস"...... (শ্রীঅরবিন্দ)।—['শতবর্ষের বাংলা', শ্রীমতিলাল রায়—পৃঃ ৯২]

"তিনি (শ্রীঅরবিন্দ) এইরূপ আত্মগোপনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার একান্ত আগ্রহাতিশয্যে তিনি এই পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন।"—['জীবনসঙ্গিনী', শ্রীমতিলাল রায়—পৃঃ ১৬০]

প্রথম এবং প্রধান কারণ নয়—যাহার ফলে ভবিষ্যৎকালে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের সহিত ভগিনী নিবেদিতার জীবন জড়াইয়া পড়িবে? কিসে কি হয়, বুঝা কঠিন; বলা আরও কঠিন। ঘটনাস্রোত প্রত্যক্ষ। একের পর আর ঘটনাগুলির মধ্যে কার্য্য-কারণসম্পর্ক প্রত্যক্ষ। তথাপি এই বৎসর নভেম্বর মাসে কেন ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পর পর ঘটনাস্রোতে কেনই বা তিনি একদিন অরবিন্দের জীবনের সহিত জড়াইয়া পড়িলেন? সংসারের সকল ঘটনা আমাদের বুদ্ধির আয়ত্তে নহে। শান্তমনে এই কথা মানিয়া চলাই ভাল।

ভগিনী নিবেদিতা অপেক্ষা শ্রীঅরবিন্দ বয়সে ৪ বৎসর ৯ মাস ১৮ দিন ছোট; এবং স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতা অপেক্ষা ৪ বৎসর ৯ মাস ১৫ দিন বড়। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ অপেক্ষা শ্রীঅরবিন্দ ৯ বৎসর ৭ মাস ছোট। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার সহকর্ম্মী সমসাময়িক নেতাদের মধ্যে বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠ।

কংগ্রেস: এইবার আমরা কংগ্রেসের কথা কিছু বলিব। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পুণা সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি হন। রাও বাহাদুর ভিড়ে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। তাঁহার বার্দ্ধক্য-হেতু তরুণ যুবক গোখ্‌লেকে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে দেন। গোখ্‌লে বলেন—যেহেতু ভারতবাসীরা একই রাজশক্তির অধীনে রাজভক্ত প্রজা সুতরাং ভারতবাসীদিগের মধ্যে একটা রাজনৈতিক জাতি গঠিত হইবার উপাদান আছে। তিনি আরও বলেন: এই জাতীয়তা গঠন ব্যাপারে প্রথমে ভাবিতে হইবে যে—আমরা ভারতবাসী, পরে হিন্দু মুসলমান পার্শি খৃষ্টান পাঞ্জাবী মারাঠি বাঙ্গালী মান্দ্রাজী। ইহা দাদাভাই নৌরোজীর কথার (১৮৯৩ খৃঃ) প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় পুণা সহরের মুসলমানেরা এইবার কংগ্রেসে যোগ দেন নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে কংগ্রেস এইবার হইতে কিঞ্চিৎ হিন্দু-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ইহার জন্য দায়ী ছিলেন লোকমান্য তিলক। দুই বৎসর পূর্ব্বে (১৮৯৩ খৃঃ) পুণা নগরীতে গো-বধ-নিবারণী সভা স্থাপিত হইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা বিরোধের সূত্রপাত করে। গরু হিন্দুদিগের মাতা, সুতরাং গো-বধ হিন্দুদিগের নিকট মাতৃহত্যার মত পীড়াদায়ক। সুতরাং দেখা গেল, গো-বধ নব-উন্মেষিত

জাতীয়তার বিঘ্নস্বরূপ। এই সকল রাজনৈতিক হিন্দুয়ানী ব্যাপারে তিলক মহারাজের হাত ছিল।

তিলক মহারাজ ও শিবাজী-উৎসব: তারপর সার্ব্বজনিক গণপতি-পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়া জাতীয়তার রূপ স্পষ্ট হিন্দু-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। পরিশেষে এই বৎসর (১৮৯৫ খৃঃ) তিলক মহারাজ মহারাষ্ট্রে 'শিবাজী-উৎসব' প্রবর্ত্তন করিলেন। মারাঠার নব-উন্মেষিত রাষ্ট্র-চেতনার সহিত হিন্দুত্বের ধর্ম্মবোধ ও মারাঠা জাতির অতীত গৌরববাহিনী বাণী, একত্রে মিশ্রিত হইয়া আর এক নব উন্মাদনার সৃষ্টি করিল। ইহাই পরবর্ত্তীকালে মারাঠার চরমপন্থী রাজনীতি বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে। ইহা লোকমান্য তিলকের কীর্ত্তি এবং র‍্যাণাডে-পরিচালিত ও গোখলে-বিঘোষিত মারাঠার নরমপন্থী রাজনীতির বিরোধী। আবার এইবৎসর বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মফঃস্বলে (বহরমপুরে) প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স হয়।

এ' তো গেল ইতিহাস। এখন অরবিন্দের কথায় আসা যাক। মহারাষ্ট্রে এই বৎসর যে হাওয়া প্রবাহিত হইতেছিল, বরোদায় থাকিয়া অরবিন্দ কি ইহার সংস্পর্শ হইতে মুক্ত ছিলেন? সম্ভব মনে করি না। যিনি মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসের 'আবেদন-নিবেদন নীতি'র 'তীব্র প্রতিবাদ' করিয়া, মারাঠার তরুণ মনকে আকৃষ্ট করিয়া মহামতি র‍্যাণাডের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই এই বৎসরে পুণা সহরের কংগ্রেস ও সেইসঙ্গে তিলক-প্রবর্ত্তিত 'সার্ব্বজনিক গণপতি পূজা' ও 'শিবাজী-উৎসব' হইতে একেবারে চক্ষু মুদিত করিয়া থাকিতে পারেন নাই। কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী, অভ্যর্থনা সমিতির অভিভাষণ পাঠক গোখ্‌লে, শিবাজী-উৎসব-প্রবর্ত্তক তিলক মহারাজ এবং এই বৎসর (১৮৯৫ খৃঃ) বোম্বে 'হিন্দু ইউনিয়ান ক্লাব'-এ 'The Telang School of Thought'-এর বক্তা র‍্যাণাডে—ইঁহারা সকলেই এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন দিক হইতে অরবিন্দের সোৎসুক দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, আমাদের এইরূপ অনুমান করিবার যথেষ্টই হেতু আছে। কালে এইসমস্ত নেতাদের সংস্পর্শে আসিয়া অরবিন্দ সংঘর্ষের মধ্য দিয়া নিজের চিন্তাগত ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যকে যে রূপ দিবেন, তাহা পরবর্ত্তী ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে।

তবে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, মারাঠার রাজনীতিক্ষেত্রে এই

সময় র‍্যাণাডে ও গোখ্‌লের 'আবেদন-নিবেদন নীতি'র যে রাজনীতি, অরবিন্দ তাহা পছন্দ করেন নাই; এবং পক্ষান্তরে তিলক-প্রবর্ত্তিত হিন্দুভাবাপন্ন চরমপন্থী রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। ফলে, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে 'কর্ম্মযোগিন্' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ গোখ্‌লেকে দেশদ্রোহী 'বিভীষণ' বলিয়া বিদ্রূপ ও ধিক্কার দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই (* ক)।

যে অরবিন্দ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে গোখ্‌লে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব, তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দমনীয় ও প্রচণ্ডতার সহিত গোখ্‌লের রাজনৈতিক মতবাদকে আক্রমণ করিয়া বসিলেন। অরবিন্দের ভবিষ্যৎ-জীবনের গতিপথকে লক্ষ্য করিয়া এবং সেই পথের একটু আভাস দিবার জন্যই আমাদিগকে এই কথাটির উল্লেখ এখানে করিতে হইল। পরন্তু মহামতি গোখ্‌লের রাজনৈতিক মতবাদের উপর কোনরূপ কটাক্ষ করা আমাদের অভিপ্রেত নয়।

বয়স চব্বিশ বৎসর (১৮৯৬।১৫ই আগষ্ট—১৮৯৭।১৪ই আগষ্ট):

অরবিন্দ ও রাজনারায়ণ বসু ★ কলিকাতা কংগ্রেস (১৮৯৬; প্রেসিডেণ্ট: রহিমতুল্লা মহম্মদ সিয়ানী) ★ তিলক মহারাজ ও 'প্লেগ'-ব্যাধি ★ র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যা (১৮৯৭।২২শে জুন, দামোদর ও চাপেকার কর্তৃক) ★ স্বামী বিবেকানন্দ ★ তিলক মহারাজ (গ্রেপ্তার—২৭শে জুন) ★ রমেশ দত্ত এবং র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যা

অরবিন্দ ও রাজনারায়ণ বসু: এখন হইতে প্রতি বৎসর পূজার ছুটীতে অরবিন্দ বরোদা হইতে কলিকাতা ও দেওঘর আসিয়া কিছুদিন থাকিয়া যাইতেন। তা যদি হয়, এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর নাগাদ যদি তিনি দেওঘর গিয়া মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর সহিত কিছুদিন বাস করিয়া থাকেন, তবে অনুমান করি মাতামহের সহিত অনেক বিষয়েই তাঁহার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

(* ক) "EXIT-BIBHISANA" (Aurobindo Ghose, "*Karmayogin*", 1909.)

১ম—কথাবার্ত্তা হইতে পারে, রাজনারায়ণবাবু অরবিন্দের পিতাকে তাঁহার প্রণীত 'ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা' গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া ঐ উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছিলেন যে, অরবিন্দের পিতা যেন "ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা লোকের আধ্যাত্মিক রোগ নিবারণ করেন।" কিন্তু অরবিন্দের পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। "সংশয়বাদিতা তাঁহার মনে প্রবেশ করিয়াছে।" শ্রীঅরবিন্দ নিজে বলিয়াছেন যে, তিনিও এক-কালে 'সংশয়বাদ' দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা এই বৎসরে বা কিছু আগে-পরে, বলা কঠিন।

২য়—রাজনারায়ণবাবু, অরবিন্দের পিতা বিলাত গমনকালে এক ইংরেজী কবিতা লিখিয়া "এমন আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বিলাতে অবস্থিতি-নিবন্ধন তিনি যেন দেশীয় ভাব না হারান। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিলাত হইতে তিনি (অরবিন্দের পিতা) সম্পূর্ণ ইংরাজ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।"

বৃদ্ধ রাজনারায়ণ এই দুইটি আপ্‌শোষের কথা দৌহিত্রকে নিশ্চয়ই বলিয়া থাকিবেন। হয়ত দৌহিত্রকে সতর্কও করিয়া থাকিবেন, যেন পূর্ব্বোক্ত দুইটি বিষয়ে অরবিন্দ তাঁহার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে বিরত থাকেন। 'বিলাত হইতে সম্পূর্ণ ইংরাজ হইয়া ফিরিবার' আশঙ্কা, দৌহিত্রকে দেখিয়া তখন বৃদ্ধ মাতামহের মনে উদয় হওয়া খুব স্বাভাবিক। শ্রীঅরবিন্দ তখন বাংলায় নিজে ত কথা বলা দূরের কথা, অপরে বলিলেও বুঝিতে পারেন না। অতএব বৃদ্ধের আশঙ্কার হেতু ছিল। আরো দুই বৎসর পরে রাজনারায়ণবাবুর 'অনুমোদন' অনুসারে দীনেন্দ্র কুমার রায় অরবিন্দকে বাংলা শিখাইতে 'গুরুমহাশয়' নিযুক্ত হইয়া বরোদা গমন করিবেন। অরবিন্দ ২৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মাতৃভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন।

কংগ্রেস : এখন কংগ্রেসের কথায় আসা যাক। সাক্ষাৎভাবে কংগ্রেসে যোগ না দিয়াও যে-দুইজন ব্যক্তি এই সময়টা কংগ্রেসের কার্য্যকলাপের উপর শ্যেনপক্ষীর মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছিলেন, তার মধ্যে একজন স্বামী বিবেকানন্দ এবং আর একজন শ্রীঅরবিন্দ।

১৮৯৬ ডিসেম্বরশেষে, কলিকাতায় বিডন-উদ্যানে কংগ্রেসের সভা হয়। সভাপতি ছিলেন রহিমতুল্লা মহম্মদ সিয়ানী। আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র। গেলবার পুণায় ভিড়ে মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইলেও যেমন যুবক গোখ্‌লেকে ঐ অভিভাষণ পাঠ করিতে

দেওয়া, হইয়াছিল, এবারেও স্যার রমেশ. হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ তাঁহার হইয়া অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। যেমন গেলবারে গোখ্‌লে, তেমনি এবারে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, অরবিন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯০৭ খৃঃ সুরাট কংগ্রেসে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি ছিলেন, আর লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে, বাংলার পক্ষে অরবিন্দ চরমপন্থীদের মুখপাত্রস্বরূপ সেবারের কংগ্রেসী দক্ষযজ্ঞে কথা না-বলিয়াও একটা বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে-সব কথা এখানে প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল মাত্র।

কিছুদিন মাত্র আগে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। তিনি অরবিন্দের পিতার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। অরবিন্দের পিতা তাঁহার বন্ধুর নামেই তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের নাম মনোমোহন ঘোষ রাখিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথককরণের জন্য যখন বিশেষ লেখালেখি করিতেছিলেন, সেই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে স্নানাগারে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৭ই অক্টোবর, ১৮৯৬)। রাজা রামমোহনের পর বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথককরণের জন্য আর কেহই এতটা চেষ্টা করেন নাই। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, স্যার রমেশের অভিভাষণ পাঠাকালে মনোমোহন ঘোষের জন্য শোক প্রকাশ করিলেন। কংগ্রেস সভাপতিও মনোমোহনের গুণাবলীর উচ্চপ্রশংসা করিয়া শোক প্রকাশ করিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে মনোমোহন ঘোষ, স্যার রমেশের নির্দ্দেশমত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

এই কংগ্রেসে ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু তখনকার শিক্ষা-বিলের প্রতিবাদ করিলেন, আর ব্যারিষ্টার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (পরে লর্ড সিংহ) ঝালোয়ারের মহারাজাকে বলপূর্ব্বক পদচ্যুত করায় প্রতিবাদ করিলেন। বুঝা যাইতেছে, নেটিভ ষ্টেটগুলি সম্পর্কে কংগ্রেস তখন উদাসীন ত ছিলই না, বরং ঐসব রাজ্যগুলিও কংগ্রেস রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। গাইকওয়ারের প্রাইভেট সেক্রেটারী অরবিন্দ ইহা তখন লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কেননা, প্রয়োজন হইলে বরোদা রাজ্যের ব্যাপারেও কংগ্রেস তখন আলোচনা করিবার অধিকার রাখিত। ঝালোয়ার আর বরোদায় তফাৎ নাই।

কংগ্রেস সভাপতি মিঃ সিয়ানীর অভিভাষণটি খুব শিক্ষাপ্রদ এবং চমৎকার।

দিকদিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতীয় রাজনীতির এমন সুসঙ্গত আলোচনা কম দেখা যায়। এই অভিভাষণের একটি বিশেষত্ব আছে। মুসলমান ভ্রাতাগণ কংগ্রেসে যোগ দিতেছেননা। না-দিবার কারণগুলি মিঃ সিয়ানী, একে একে ১৭ দফায় উল্লেখ করিয়াছেন। পরে এই ১৭টি কারণের প্রত্যেকটিকেই তিনি অপূর্ব্ব যুক্তিবলে একেবারে ভূমিসাৎ অথবা ভস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন।* কত বৎসরের আগেকার ইতিহাস হইলেও ইহা এত চমৎকার যে, এই অভিভাষণটি এখনও পঠনীয়, কেননা শিক্ষাপ্রদ। মিঃ সিয়ানী, মুসলমানদিগের জন্য রাজনীতির সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত গণতন্ত্র-বিরোধী, ১৪টি দূরের কথা, একটিও বিশেষ দাবী উত্থাপন করেন নাই।

অরবিন্দ দেশে ফিরিয়াই হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করিতেছিলেন। ইস্‌লাম সম্পর্কে তিনি খুব অল্প কথাই বলিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানের পৃথক পৃথক ধর্ম্ম সত্বেও, রাজনীতিক্ষেত্রে উভয়ের ঐক্যস্থাপন প্রয়াসে তাঁহাকে কোন দিন গলদঘর্ম্ম হইতে দেখি নাই। সুতরাং মিঃ সিয়ানীর অভিভাষণের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি তাঁহার দৃষ্টিকে কিভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন।

কিন্তু মিঃ সিয়ানী কংগ্রেসের কার্য্য-প্রণালী ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের কার্য্য হইতেছে গভর্ণমেণ্টের নিকট ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত অভাব-অভিযোগগুলি আবেদনপূর্ব্বক নিবেদন করা। ("That our business is to represent to Government our reasonable grievances and our political disabilities and aspiration.") এ কথা পাঠ করিয়া অরবিন্দ নিঃসন্দেহে খুসী হন নাই। পরন্তু ২ বৎসর আগে 'ইন্দুপ্রকাশে' লিখিত প্রবন্ধগুলির কথা স্মরণ করিয়া নিশ্চয়ই তাঁহার মনে 'কংগ্রেসের নিবেদন-নীতি'র 'তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ' ভাব জাগ্রত ও উদ্যত হইয়াছিল। তখনকার দিনে কংগ্রেসের নিবেদন-নীতির বিরুদ্ধে যাঁহারা প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অরবিন্দের স্থান সকলের ঊর্দ্ধে।

লোকমান্য তিলক এই কংগ্রেসে আসিয়াছিলেন। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-গুলিকে রাজস্ব প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাব তিনি করিয়াছিলেন। ইহাও নিছক নিবেদন-আবেদন নীতি সন্দেহ নাই। সুতরাং অরবিন্দের মনঃপূত না হওয়ারই কথা।

কংগ্রেস হইতেছিল বিডন-উদ্যানে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার নিকটেই বাস করিতেন। তাঁহারা কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণকে একটা জমকালো পার্টি দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ পার্টি উপলক্ষে একটি গান রচনা করিয়া নিজেই গাহিয়াছিলেন—

অয়ি ভুবন-মনোমোহিনি !
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরনি !
জনক-জননী-জননি !
নীল সিন্ধুজল ধৌত চরণতল,
অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল হিমাচল
শুভ্র তুষার কিরীটিনি !···ইত্যাদি

অরবিন্দের সহিত এখনও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয় নাই। তবে এইসব ব্যাপার উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিবেন।

যখন কলিকাতায় এই কংগ্রেস সেসন্ পুরাদমে চলিতেছিল তখন স্বামী বিবেকানন্দ ১৬ই ডিসেম্বর লণ্ডন হইতে বিদায় লইয়া ভারত-অভিমুখে রওনা হইয়া ফ্লোরেন্স রোম নেপল্‌স্ পম্পাই হইয়া ১৮৯৭।১৫ই জানুয়ারী কলম্বোতে আসিয়া পৌঁছিতেছেন। কলম্বোতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে তিনি জাহাজে থাকায় কংগ্রেসের খবরাদি পড়িতে পারেন নাই। কলম্বোতে পৌঁছিয়া পড়িয়া থাকিবেন।

কিন্তু অরবিন্দ যদি এই বৎসর অক্টোবরে দেওঘর হইয়া ডিসেম্বরে বরোদায় ফিরিয়া গিয়া থাকেন, তবে যে-চেয়ারে বসিয়া এবং যে-টেবিলের উপর রাখিয়া তিনি কংগ্রেসের নিবেদন-নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ লিখিয়া ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে 'ইন্দুপ্রকাশে' ছাপাইয়াছিলেন, সেই চেয়ারে বসিয়া ও সেই টেবিলের উপর রাখিয়াই এবারকার কংগ্রেসেরও জাজ্বল্যমান নিবেদন-নীতি প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন।

তখন তিনি কি ভাবিতেছিলেন তা নিতান্তই অনুমানসাপেক্ষ। এইটুকু উল্লেখ করিতে হইতেছে যে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়; এবং ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ সভাতে বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। দরিদ্র ও ভয়ার্ত্তের রক্ষাকর্ত্তা মনোমোহনের সাহেবিয়ানা, জাতীয় ভাব নষ্ট করে নাই।

অতীতে কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সগুলিতে বাঙ্গালীর উৎসাহ ও কৃতিত্ব আজ শুধু ইতিহাস!

তিলক মহারাজ ও প্লেগ : এইবার তিলক মহারাজের কথায় আসা যাক। 'মারাঠা যার পাদপীঠ' আর 'কেশরী যার বাহন', সেই নির্ভীক তেজস্বী ব্রাহ্মণ গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া কংগ্রেসের বাহিরে মারাঠার জাতীয় জীবনে 'গণপতি' ও 'শিবাজী' উৎসব প্রবর্ত্তন করিয়া এই নূতন তরঙ্গ তুলিয়াছেন—তা আমরা দেখিয়াছি। অনিবার্য্য গতিমুখে সেই তরঙ্গ কোথায় গিয়া আঘাত করিবে, তাহা এইবার আমরা দেখিতে পাইব। সমাজ-জীবনে তরঙ্গের উত্থান ও পতন আকস্মিক ঘটনা নয়। স্পষ্ট কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। অনেকগুলি কারণ একত্রে মিশ্রিত হইয়া একটি ঘটনা প্রসব করে। আমরা সবগুলি কারণ জানিতে পারি না। সুতরাং কারণ সম্বন্ধে নানারূপ মিথ্যা কল্পনার আশ্রয় লই। ফলে সত্য ইতিহাস চাপা পড়িয়া যায়, মিথ্যা ইতিহাস প্রশ্রয় পায়।

আমরা ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ শেষ করিয়া এখন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের কথা বলিতেছি। এই দুই বৎসরেই বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দেশের এই দুর্দ্দিনে তিলক বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। তিনি প্রথমে দুর্ভিক্ষের জন্য গভর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল না। পরিশেষে নিজে অনেক খাটিয়া "অল্পমূল্যে যাহাতে লোকে খাদ্যশস্য কিনিতে পারে, তিনি শীঘ্রই তাহার ব্যবস্থা করিলেন। আর অন্নদানেরও বন্দোবস্ত করিলেন।"

তারপরে প্লেগ? তিলক "রোগীদিগের জন্য হাসপাতাল খুলিলেন।...পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া প্লেগের রোগী দেখিতে লাগিলেন, আর স্বেচ্ছাসেবক হইয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর একটি কাজ ছিল হাসপাতালের তত্ত্বাবধান করা। প্লেগ হইয়াছে বলিয়া অনেককে সহরের বাহিরে ছাউনীতে রাখা হইত। তিলক তাহাদের জন্য অন্নছত্র খুলিলেন।" এ সব কাজ কংগ্রেসের নয়। কংগ্রেসের সহিত ইহার কোন সংশ্রবও ছিল না। ইহা 'গণপতি' ও 'শিবাজী' উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা তিলক মহারাজের কাজ। এবং এই কাজের মধ্য দিয়াই তিলকের প্রতিভা, তিলক-চরিত্রের যে স্বাতন্ত্র্য, যে বৈশিষ্ট্য, তার প্রকাশ দেখিতে পাই। অনুমান করি, বরোদায় আসিয়া অরবিন্দও ইহা লক্ষ্য করিতেছিলেন।

তারপর স্বয়ং সরকার বাহাদুর প্লেগদমনে অগ্রসর হইয়া গোরাসৈন্যদের পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিলেন। উদ্দেশ্য ভাল। কিন্তু সৈন্যেরা লোকের ঘরে ঢুকিয়া গা টিপিয়া দেখিতে লাগিল যে, প্লেগ হইয়াছে কি-না। অভিযোগ এইরূপ যে, মহিলারা পর্য্যন্ত বাদ গেল না। লোকসকল আতঙ্কগ্রস্ত হইল। হইবার কথাই। সর্দ্দার নাটু প্রতিবাদ করিতে গিয়া বিনা বিচারে সভ্রাতা নির্ব্বাসিত হইলেন। তিলকের 'মারাঠা' লিখিয়া বসিল—"যাহারা সহরে রাজত্ব করিতেছে (অর্থাৎ প্লেগদমন কার্য্যে নিয়োজিত) তাদের চেয়ে প্লেগ ভাল"। খুব ঝাঁঝাল এবং কড়া কথা সন্দেহ নাই। অবস্থাধীনে তিলক মোলায়েম হইতে পারিলেন না।

১৮৯৭ সালে প্লেগের জন্য শিবাজী-উৎসব শিবাজীর জন্মদিনে না-হইয়া তাঁহার অভিষেকের দিন ১৩ই জুন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। ১৮ই জুন তিলক তাঁহার পত্রিকা "কেশরীতে" উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ, উৎসবে পঠিত একটি কবিতা প্রকাশিত হইল। এই ঘটনার ৪ দিন পরে ২২শে জুন মিঃ র‍্যাণ্ড ও লেফটেনেণ্ট আয়ার্ষ্ট দামোদর ও চাপেকার নামক দুইজন মারাঠী যুবকের হাতে পথিমধ্যে গুলির আঘাতে নিহত হইলেন। মিঃ র‍্যাণ্ড পুণার প্লেগ-অফিসার ছিলেন।

দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকার নামক দুইজন যুবক মারাঠী বালক ও যুবাদের শারীরিক ব্যায়াম-চর্চ্চার জন্য এক সমিতি গঠন করেন। সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য "হিন্দুধর্ম্মের কণ্টক দূরীকরণ।"

র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যা: মিঃ র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যার পর সাহেবদের খবরের কাগজগুলি একেবারে মারমুখো হইয়া উঠিল। বলিল—তিলককে সায়েস্তা কর। তিলকই যত নষ্টের মূল। সাহেব-হত্যা, অভাবনীয় কাণ্ড! অথচ ইহা ব্যক্তিগত আক্রোশ নয়, ইহা সত্য রাজনৈতিক হত্যা! হুলস্থূল কাণ্ড পড়িয়া গেল।

শিবাজী-উৎসবের কয়েকদিন পরে এবং 'কেশরীতে' পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইবার পরে, এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া সরকার তিলককেই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী করিলেন।

এই হত্যার ৫ দিন মাত্র পরে, ২৭শে জুন তিলক গ্রেপ্তার হন।

অরবিন্দ নির্বাকবিস্ময়ে এই হত্যাকাণ্ড এত কাছে বরোদায় থাকিয়া নিশ্চয়ই নিরীক্ষণ করিলেন। আয়ারল্যাণ্ডে ফিনিক্স পার্কে হত্যার কথা তাঁহার মনে

আসিল। এই হত্যাটি যদি রাজনৈতিক কারণেই ঘটিয়া থাকে তবে ত ইহা শুধু কংগ্রেসী আবেদন-নিবেদন নীতি নহে। আর বিশেষতঃ তিলকের উপর শুধু সরকার বাহাদুরের নয়, অরবিন্দের সোৎসুক দৃষ্টিও নিপতিত হইল। এই ঘটনার পর, চাক্ষুষ আলাপ হউক বা না-হউক তিলক সম্বন্ধে আর উদাসীন থাকা অরবিন্দের পক্ষে একরূপ অসম্ভব বলিয়াই অনুমান করি।

স্বামী বিবেকানন্দ: এইবার স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলিব। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে লণ্ডনে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাতের কথা বলিয়াছি। তারপর প্রসঙ্গক্রমে বিচ্ছিন্নভাবে স্বামীজীর কথা উল্লেখ করিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু এইবার একটু গুছাইয়া বলিতে হইবে।

প্রথমবার লণ্ডনে স্বামীজী পুরা তিন মাসও থাকেন নাই—"কিঞ্চিদধিক তিনমাস"ত দূরের কথা। ১৮৯৫ খৃঃ ডিসেম্বরের প্রথমভাগেই তাঁহাকে নিউইয়র্কে ফিরিয়া যাইতে দেখি। নিউইয়র্কে তিনি ১৮৯৬ খৃঃ এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত থাকেন। গুণিলে দেখা যাইবে, ৪ মাস ৭ দিন তিনি নিউইয়র্কে ছিলেন।

লণ্ডনে থাকাকালীন তিনি যে-সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন, সেই সকল চিঠিতে তাঁহার তখনকার মনের ভাব কিছুটা জানা যায় (* ক)।

(* ক) "পৌরাণিক হিন্দু আমি কোন্ কালে, বা আচারী হিন্দু আমি কোন্ কালে? I do not pose as one. (আমি এরূপ একজন লোক বলিয়া ত নিজেকে জাহির করি না) বাঙ্গালীরা···কি বলে না-বলে, ওসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাকি? ওদের দেশে বার বছরের মেয়ের ছেলে হয়।···রাম! রাম! আহার গেঁড়িগুগলী, পান প্রস্রাব-সুবাসিত পুকুরজল, ভোজন-পাত্র ছেঁড়া-কলাপাতা এবং ছেলের গু-মিশ্রিত ভিজে মাটির মেজে, বিহার পেত্নী শাকচুন্নীর সঙ্গে, বেশ দিগম্বর কৌপীন ইত্যাদি, মুখে যত জোর! ওদের মতামতে কি আসে যায়রে ভাই? তোরা আপনার কাজ করে যা।"—[ই. টি. ষ্টার্ডির বাটী—ইংলণ্ড, ১৮৯৫]

বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনকে বিভিন্ন স্তরে এমন নিখুঁতভাবে অরবিন্দ দেখিবার সুযোগ পান নাই। কতটা মমত্ববোধ হইতে এইসকল কথা স্বামীজী লিখিয়াছেন এবং তিনি কতদূর স্পষ্টভাষী তাহা আমরা তাঁহার এই চিঠি হইতে বুঝিতে পারি। যাদের এইরূপ ব্যঙ্গ ও ভর্ৎসনা করিতেছেন, আবার তাদের জন্যই তিনি জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন।

এই চিঠিতেই লিখিতেছেন—"নবেম্বর মাসের শেষাশেষি আমেরিকায় যাব, অতএব বইপত্র ঐখানে পাঠাবে।"

তারপর নিউইয়র্ক থাকাকালীন যে-সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাতেও তাঁহার মনের ভাব জানা যায় (* খ)।

নিউইয়র্ক হইতে আবার তিনি দ্বিতীয়বার লণ্ডনে গেলেন—এপ্রিলের মাঝামাঝি (১৮৯৬ খৃঃ)। এবারেও ভগিনী নিবেদিতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নিবেদিতা একদিনেই স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই। ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। যেমন স্বামীজীও একদিনেই পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই। অনেক রকম পরখ করিয়া তবে শিষ্য হইয়াছিলেন। অন্ধভক্তিতে না-হক্ শিষ্য হইবার দুর্ব্বলতা কি বিবেকানন্দ, কি নিবেদিতা

এর ঠিক পরের চিঠিতেই লিখিতেছেন—"আসছে সপ্তাহের শেষে আমি আমেরিকায় যাব।"—[১৮৯৫]

(* খ) "তিনমাস বাদে আমি ইংলণ্ডে আসিতেছি। পুনরায় হুজুগের বিশেষ চেষ্টা দেখিবার জন্য। তারপর আসছে শীতে ভারতবর্ষ আগমন।......নিজেরা কিছু করে না এবং অপরে কিছু করিতে গেলে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়, এই দোষেই আমাদের জাতের সর্ব্বনাশ হয়েছে।"—[নিউইয়র্ক, ২৪।১।১৮৯৬]

"উঠে পড়ে লেগে যা, পরোয়া নেই। ...খুব সাবাস্। একজন মান্দ্রাজে যা, একজন বম্বে যা। তোলপাড় কর—তোলপাড় কর দুনিয়া। কি বলব, আপশোষ, যদি আমার মত দুটা-তিনটা থাকত—ধরা কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যেতুম।...তোলপাড় কর—তোলপাড় কর। একটাকে চীনদেশে পাঠিয়ে দে, একটাকে জাপানদেশে পাঠা"—[জানুয়ারী, ১৮৯৬]

অরবিন্দ যখন বরোদায় বসিয়া Lines On Ireland কবিতা লিখিতেছেন তখন আমেরিকা হইতে স্বামীজী বাঙ্গালাদেশে এই রকম সব চিঠি পাঠাইতেছেন। এ'ত চিঠি নয় যেন বিদ্যুতপ্রবাহ ছড়াইতেছেন।

"আদর্শকে সর্ব্বদা চক্ষের সাম্নে রাখিয়া তাহার দিকে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হও। প্রতিকার ব্যতীত, হিংসা ব্যতীত, বাসনা ব্যতীত কেহ সংসারে থাকিতে পারে না। যে অবস্থায় আদর্শকে সমাজে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় জগৎ এখনও সে-অবস্থায় পৌঁছে নাই। জগৎ যে-সমুদয় অশুভের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে উহাকে আদর্শানুরূপ করিয়া তুলিতেছে; অধিকাংশ লোককেই এই মন্থর উন্নতির পথ অবলম্বন করিতে হইবে। বিশেষ শক্তিমান পুরুষগণকে এই বর্ত্তমান অবস্থার মধ্য দিয়াই আদর্শে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতে হইবে।"—[১৩।২।১৮৯৬]

ইহার অনুরূপ সিদ্ধান্ত রামমোহনে দেখিয়াছি। অরবিন্দের সিদ্ধান্ত ইহার অনুরূপ কি-না যথাস্থানে পরে আলোচনা করিব। কেননা, মানব-সমাজের ক্রমোন্নতির কথা এখনো অরবিন্দে অঙ্কুরোদ্গম করে নাই।

কাহারও ছিল না। নিবেদিতা যখন স্বামীজীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ২৮ বৎসর। তখন তিনি ছিলেন একটা স্কুলের শিক্ষিকা। ভারতবর্ষে ভবিষ্যৎ-জীবনেও তিনি স্কুলের শিক্ষিকারূপেই জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

এই দ্বিতীয়বারও লণ্ডনে স্বামীজী তিন মাস ৭ দিনের বেশী থাকেন নাই। ২৮শে মে, ১৮৯৬ অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় (* গ)। অক্সফোর্ডে গিয়া তিনি ম্যাক্স্মুলারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মিসেস্ এ্যানি বেশান্ত তাঁর বাড়ীতে স্বামীজীকে একদিন বক্তৃতা দেওয়াইলেন। কর্ণেল অল্কট্ও ছিলেন। মিসেস্ মার্টিন একজন বিদূষী এবং প্রচুর অর্থশালিনী সম্ভ্রান্ত মহিলা, তাঁহার বাড়ীতে স্বামীজীকে নিয়া বক্তৃতা দেওয়াইলেন। ইংলণ্ডের রাজপরিবারের কতিপয় মহিলা আত্মগোপন করিয়া স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন ('There were also present some members of the Royal household, but these were strictly incognito'.)। এবার লণ্ডন হইতে এক চিঠিতে তিনি লিখিলেন—"ভারতে দুই মহাপাপ। মেয়েদের পায়ে দলান, আর জাতি জাতি করে গরীবগুলোকে পিষে ফেলা।"

লণ্ডন হইতে ১৮৯৬-এর জুলাইয়ের শেষসপ্তাহে তিনি দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। প্রথমে জেনেভায় গেলেন। পরে ২৫শে জুলাই স্বইজারল্যাণ্ড হইতে তিনি লিখিলেন—"আমি জগৎটাকে একেবারে ভুলে যেতে চাই। অন্ততঃ আসছে দু'মাসের জন্য এবং কঠোর সাধনা করতে চাই। উহাই আমার বিশ্রাম। পাহাড় এবং বরফ দেখলে আমার মনে এক অপূর্ব্ব শান্তিময় ভাব আসে।" আবার স্বইজারল্যাণ্ড থেকেই ২৩শে আগষ্ট লিখিতেছেন—"জগৎ রঙ্গমঞ্চে

(* গ) "গত পরশু অধ্যাপক ম্যাক্স্মুলারের সহিত আমার বেশ দেখাশুনা হইয়া গেল। তিনি একজন ঋষিকল্পলোক। তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইলেও তাঁহাকে যুবা দেখায়। এমন কি তাঁহার মুখে একটিও চিন্তার রেখা নাই। হায়, ভারতবর্ষ ও বেদান্তের প্রতি তাঁহার যেরূপ ভালবাসা তাহার অর্দ্ধেক যদি আমার থাকিত! তাহার উপর তিনি যোগশাস্ত্রের প্রতিও অনুকূল ভাব পোষণ করেন এবং উহাতে বিশ্বাস করেন। তবে বুজরুকদের তিনি একদম দেখিতে পারেন না।"—[লণ্ডন—৩০শে মে, ১৮৯৬]

যোগশাস্ত্রের প্রতি ম্যাক্স্মুলারের বিশ্বাস অরবিন্দকে নিশ্চয়ই হর্ষোৎফুল্ল করিবে এবং 'বুজরুকদের' উপর অবিশ্বাস নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিমর্ষ করিবে না।

আমার অভিনয় শেষ হয়েছে।” ‘তোল্‌পাড় কর, তোল্‌পাড় কর’—এইরূপ ঝটিকার আবর্ত্তের মাঝে মাঝে স্বামীজীর মধ্যে একটা ধ্যানগম্ভীর নির্ব্বিকল্প সমাধির আবেগ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। অরবিন্দ হয়ত ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। জেনেভা (ফ্রান্স), সুইজারল্যাণ্ড হইয়া তিনি জার্ম্মানীতে আসিলেন। সেখানে কীল সহরে, অধ্যাপক এবং অদ্বৈত মতের পূর্ণ সমর্থক পল ডয়সনের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অরবিন্দ অদ্বৈত বেদান্তের বিরোধী। সেদিক দিয়া অরবিন্দ স্বামী বিবেকানন্দের বৈদান্তিক অদ্বৈত মতেরও বিরোধী।

অক্টোবরে (১৮৯৬ খৃঃ) স্বামীজী আবার লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন। এইবার তৃতীয়বার। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা মাত্র দুইবারের কথাই লিখিয়াছেন। হয়ত তাঁহার মনে ছিল না।

লণ্ডনে ফিরিয়া তিনি লিখিতেছেন—“জার্ম্মানীতে অধ্যাপক ডয়সনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। কীলে (Kiel) আমি তাঁর অতিথি হয়েছিলাম। দু’জনে একসঙ্গে লণ্ডনে এসেছি।”—(লণ্ডন—৮ই অক্টোবর, ১৮৯৬)।

আবার লিখিতেছেন—“আমি খুব শীঘ্রই, সম্ভবতঃ ১৬ই ডিসেম্বর ভারতবর্ষে যাত্রা করছি। কারণ, পুনরায় আমেরিকা যাবার পূর্ব্বে আমার একবার ভারতবর্ষ দেখবার বিশেষ ইচ্ছা।”—(লণ্ডন—১৩ই নভেম্বর, ১৮৯৬)।

যে কথা সেই কাজ। ১৬ই ডিসেম্বর স্বামীজী লণ্ডন ত্যাগ করিয়া ফ্লোরেন্স—রোম—নেপ্‌লস—পম্পাই ঘুরিয়া ১৫ই জানুয়ারী ১৮৯৭ খৃঃ কলোম্বোতে পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়া তার পরের দিনই (১৬।১।১৮৯৭) কলম্বোর ফ্লোরাল-হলে প্রথম বক্তৃতা দিলেন—“পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ”। অরবিন্দ কি স্বামীজীর এই সময়কার গতিবিধি নিরীক্ষণ করেন নাই ?—মাদ্রাজে পৌঁছিলেন। পরে ২১শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা পৌঁছিলেন। ২৮।২।১৮৯৭ তারিখে শোভাবাজার রাজবাড়ীতে এক মহতী সভায় স্বামীজীকে অভিনন্দন দেওয়া হইল। কলিকাতায় একটা বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। সে আওয়াজ বরোদায় গিয়া নিশ্চয়ই অরবিন্দের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। অরবিন্দ বধির নহেন। মার্চ্চ-এপ্রিল স্বামীজী দার্জ্জিলিংএ কাটাইলেন। মে মাসে আবার কলিকাতা ফিরিলেন। জুন-জুলাই-আগষ্ট আলমোড়াতে কাটাইলেন। জুনমাসে যখন স্বামীজী আলমোড়াতে তখন ২২শে জুন দুই মারাঠী যুবক দামোদর ও চাপেকার মিঃ র‍্যাণ্ড ও লেফ্‌টেনেণ্ট আয়ার্ষ্টকে গুলির আঘাতে নিহত করিলেন, একথা বলা হইয়াছে।

২৭শে জুন তিলক মহারাজ গ্রেপ্তার হইলেন—একথাও বলা হইয়াছে। তিলকের সহিত স্বামীজীর পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। ১৮৯৩ খৃঃ আমেরিকা গমনের পূর্ব্বে তিনি পুণা সহরে তিলকের সহিত কয়েকদিন একত্রে বাস করিয়াছিলেন, একথাও আমরা বলিয়াছি। সুতরাং শুধু বরোদায় বসিয়া অরবিন্দ নয়, আলমোড়ায় বসিয়া স্বামী বিবেকানন্দও দামোদর ও চাপেকারের গুলিতে মিঃ র‍্যাণ্ড ও লেফ্‌টেনেণ্ট আয়ার্ষ্টের গুপ্তহত্যা এবং তজ্জন্য তিলক মহারাজের গ্রেপ্তার বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে নিরীক্ষণ করিলেন।

তিলক মহারাজের গ্রেপ্তার: ২৭শে জুন তিলককে গ্রেপ্তার করিবার পর তাঁহার অপরাধের জন্য বম্বে হাইকোর্টের সেসনে বিচার আরম্ভ হইল। বিচারপতি ষ্ট্রাচি (Mr. Justice Strachey) ৬ জন ইয়োরোপীয় ও ৩ জন দেশীয় জুরার (juror) লইয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। ৬ জন ইয়োরোপীয় জুরী তিলককে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। পক্ষান্তরে ৩ জন দেশীয় জুরী তিলককে নির্দ্দোষ বলিলেন। ফলে, বিচারপতি ষ্ট্রাচি তিলককে দেড় বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন। হাইকোর্টের ফুল-বেঞ্চে ইহার আর বিচার হইল না; বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করা হইল। সেখানকার বিচারের ফলও পূর্ব্বের মতই হইল। ইহা ১৫ই আগষ্ট পার হইয়া সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা। অরবিন্দ বরোদায় বসিয়া এবং বিবেকানন্দ আলমোড়া হইতে তিলকের এই বিচার ও তাহার ফল নিরীক্ষণ করিলেন।

এই মামলায় বিচারপতির রায় আমরা দেখি নাই। বাদী ও বিবাদীপক্ষের সওয়াল-জবাব আমরা শুনি নাই। সুতরাং এই বিচার সম্পর্কে আইনের দিক দিয়া কোন কথা বলিবার সুযোগ আমরা পাই নাই। তবে সর্ব্বসাধারণের উপর, বিশেষতঃ রাজনৈতিক মহলে, এই বিচারের ফল কিরূপ কার্য্য করিয়াছে তাহার কিছুটা পরিচয় আমরা দিব। এবং সেই পরিচয় দিবার পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশ তিলকের বিপদে কিরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা জানা দরকার।

"বাঙ্গালার লোক তিলকের বিপদে আপনাদিগকে বিপন্ন মনে করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে ব্যবহারজীবী পাঠাইয়াছিল—রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সে-কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। মোকদ্দমার পূর্ব্বে শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের এক পত্রের উত্তরে তিলক যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা যেন আমরা কখন বিস্মৃত না হই—'লোকের কাছে আমার প্রভাব ও সম্ভ্রম আমার চরিত্রের উপর

নির্ভর করে। আমি যদি অভিযোগে ভয় পাই, তবে আমার পক্ষে (দেশবাসীর শ্রদ্ধা হারাইয়া) মহারাষ্ট্রবাসে ও আন্দামানবাসে প্রভেদ থাকিতে পারে না। আমরা ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে কু-অভিসন্ধি হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি না; তবে যাহারা রাজনীতি চর্চ্চা করে, তাহাদের বিপদের সম্ভাবনা অনিবার্য্য। সরকার পুণার নেতৃগণকে অপমানিত করিতে চাহেন। আমি (ক্ষমাপ্রার্থনাকারী) গোখ্‌লের বা 'জ্ঞান-প্রকাশ' সম্পাদকের মত কাঁচা কাজ করিব না। আমরা দেশের লোকের সেবক; সঙ্কট-সময়ে শোচনীয় ভীরুতা দেখাইয়া তাহাদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে পারি না। তাহাতে তাহাদের অনিষ্ট করা হইবে।' মহারাষ্ট্র-দেশ বাদ দিলে বাঙ্গলা তিলকের বিপদে যত ব্যথা প্রকাশ করিয়াছিল, তত আর কোন প্রদেশ করে নাই।"—("কংগ্রেস", শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ; তৃতীয় সংস্করণ; পৃঃ ৭৩—৭৫)।

রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙ্গলাদেশ ও মহারাষ্ট্রে একটা সুস্পষ্ট যোগাযোগ অন্ততঃ এখন হইতেই প্রত্যক্ষ করা গেল। তিলকের চরিত্র তাঁহার এই উপরে-উল্লিখিত চিঠির মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তিলক বলিলেন—

"সঙ্কট-সময়ে শোচনীয় ভীরুতা দেখাইয়া তাহাদিগের (দেশবাসীর) অনিষ্ট সাধন করিতে পারি না। তাহাতে তাহাদের অনিষ্ট করা হইবে।" এই চিঠিতে আরও জানিতে পাই যে, তিনি গোখ্‌লের মত "কাঁচা কাজ" করিবেন না। সুতরাং এই "কাঁচা কাজ"টির ইতিহাসও আমাদিগের জানা দরকার।

"বম্বে থেকে একজন লোক এই অত্যাচারের কথা বিলাতে গোখ্‌লেকে লিখে পাঠান। ...গোখ্‌লে স্যর উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণকে সমস্ত কথা জানালেন। তিনি এই বিষয় নিয়ে পার্লামেণ্ট প্রশ্ন উত্থাপন কর্ল্লেন। গোখ্‌লেও খবরের কাগজে এসব কথা (বম্বে-গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার) প্রকাশ করে দিলেন। বিলাতে এই নিয়ে একটা মহা গোলযোগের সৃষ্টি হ'লো। অনেকেই বম্বে-গভর্ণমেণ্টকে দোষ দিতে লাগলেন। পার্লামেণ্ট থেকে বম্বে-গভর্ণমেণ্টের কাছে এ-বিষয়ে কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠানো হ'লো। কিন্তু বম্বে-গভর্ণমেণ্ট একেবারে সোজা-সুজি জবাব দিলেন: 'এ সম্পূর্ণ রচা কথা, এর মূলে এতটুকু সত্য কথা নাই। যারা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এত বড় একটা অন্যায় দোষারোপ কর্‌ছে, তারা এর প্রমাণ দিক।' পার্লামেণ্ট থেকে ওয়েডারবার্ণের কাছে প্রমাণ চাওয়া হ'লো। ওয়েডারবার্ণ গোখ্‌লেকে প্রমাণ দিতে বল্লেন।...গোখ্‌লে প্রমাণ দিতে না-পারায়

ওয়েডারবার্ণ পার্লামেণ্টের সভায় সকলের সম্মুখে ক্ষমা চাইলেন। কেউ বলেন, পত্রলেখক র‍্যাণাডে ছাড়া আর কেউ নয়। অপর কোনো সাধারণ লোক হ'লে গোখ্‌লে কখনও ওয়েডারবার্ণের মত লোককে অমনভাবে অপদস্থ হ'তে দিতেন না। র‍্যাণাডে তখন হাইকোর্টের জজ, তাঁর নাম প্রকাশিত হ'লে তাঁকে গভর্ণমেণ্টের কাছে আরও অধিক অপদস্থ হ'তে হতো। ......এই জন্যে গোখ্‌লেকেও ভুগতে হ'য়েছিল। তিনি যখন দেশে ফিরে আসেন, তখন বম্বে বন্দরে তাঁর জাহাজ ভিড়বামাত্র সেখানকার পুলিশ-কমিশনার সাহেব তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন—বিলাতে তিনি বম্বে-গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অযথা অপবাদ রটিয়ে বম্বে-গভর্ণমেণ্টকে লোকের চোখে যে হীন করেছেন, সে জন্যে তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। গোখ্‌লে বল্লেন—'আমি বিলাতে বম্বে-গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যা' বলেছি তা' সত্য বলে জেনেই বলেছি; কিন্তু তার যখন প্রমাণ দিতে পারছি না, তখন নিশ্চয়ই সে অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাইবো।' ....তাঁর (গোখ্‌লের) এই ক্ষমা চাওয়া ব্যাপার নিয়ে দেশে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হ'লো। অনেকে গোখ্‌লের এই আচরণকে অত্যন্ত অন্যায় মনে করে তাঁর নিন্দা করতে লাগলেন। সংবাদপত্রে পর্য্যন্ত তাঁর নিন্দা রটনা হ'তে লাগলো। লোকের চোখে তিনি যেন একটু হীন হয়ে পড়লেন। ...... ১৮৯৭ সালে অমরাবতীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। গোখ্‌লে সেই কংগ্রেসে বক্তৃতা দিতে উঠ্‌লে তাঁর বক্তৃতা পণ্ড করে দিয়ে তাঁকে অপমানিত করবার জন্য শ্রোতারা হিস্ হিস্ শব্দ ক'রে তাঁকে আসন গ্রহণ করতে বাধ্য করে। সেই অপমানে গোখ্‌লে এতদূর মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়েছিলেন যে, তারপর ক্রমাগত ছয় বৎসর কংগ্রেসে যোগদান কর্ল্লেও কখনও বক্তৃতা দেন নি।"—(গোখ্‌লে—শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত; বৈশাখ, ১৩৪৭; দেব সাহিত্য কুটীর; পৃঃ ২৪-২৫)।

আমরা শুনিতে পাইলাম গোখ্‌লের এই ক্ষমা-চাওয়া ব্যাপারটা তখনকার দিনে একটা গোখ্‌লে-বিরোধী আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। বরোদায় বসিয়া অরবিন্দ শুধু তিলক নয়, মহামতি গোখ্‌লের এই কার্য্যটাও স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। অরবিন্দের জীবনের ধারা গতিমুখে অনুসরণ করিতে গিয়া মহারাষ্ট্রের তিলক ও গোখ্‌লে প্রসঙ্গ সংক্ষেপে উত্থাপন না-করিয়া উপায় নাই; কেননা, পরবর্ত্তীকালে যখন তিনি বাঙ্গলার তথা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হইবেন তখন আমরা দেখিতে পাইব যে—একদিকে তিনি যেমন তিলকের পক্ষপাতী ও পক্ষভুক্ত তেমন অন্য দিকে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট রকমের গোখ্‌লে-বিরোধী। তিলককে নেতা বলিয়া মানিতে তাঁহার কুণ্ঠা নাই, কিন্তু মহামতি গোখ্‌লেকে বর্তমান ভারতের "বিভীষণ" (অর্থাৎ দেশদ্রোহী) বলিয়া খবরের কাগজে লিখিতেও কোন কুণ্ঠা নাই। সুতরাং অরবিন্দ-চরিত্র বুঝিতে হইলে চিন্তা করিতে হইবে যে, তিলক-চরিত্রের কোন্‌দিকটা তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং গোখ্‌লে-চরিত্রের কোন্‌দিকটা তাঁহাকে গোখ্‌লের বিরুদ্ধে এতটা বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এইদিক হইতে দেখিতে গেলে তিলক ও গোখ্‌লে-চরিত্রের প্রভাব এই বৎসর হইতেই অরবিন্দের মনের উপর কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিলক-চরিত্রের প্রতি আকর্ষণ এবং অন্যদিকে গোখ্‌লে-চরিত্রের প্রতি বিদ্বেষ—ও এমন কি ঘৃণা—এই দুই হইতেই, আমরাও অরবিন্দের চরিত্রকে দেখিতে পাইব, বুঝিতে পারিব। শুধু তিলক নয়, গোখ্‌লে ব্যতীত অরবিন্দকে বোঝা যাইবে না। আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, বাঙ্গলা তথা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ হইবার ১০ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই অরবিন্দ মারাঠার রাজনীতির দুইটি ধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছিলেন। ইহার একটি র‍্যাণাডে-গোখ্‌লে পরিচালিত নরমপন্থা ধারা; আর একটি তিলক-পরিচালিত গরমপন্থী ধারা। অরবিন্দকে কোনদিন আমরা নরমপন্থীদের দলে দেখি নাই। প্রথম হইতেই তিনি গরম বা চরম পন্থীদের দলভুক্ত। ইহা অরবিন্দ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

মহামতি গোখ্‌লের ক্ষমা চাহিয়া জেল বা শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া আর 'সঙ্কট-সময়ে শোচনীয় ভীরুতা' না-দেখাইয়া তিলকের দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বরণ করিয়া লওয়া—এই দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির কার্য্যের মধ্য দিয়াই মারাঠা-রাজনীতির প্রথমতঃ নরমপন্থী ও দ্বিতীয়তঃ গরমপন্থী দলের বৈশিষ্ট্য ইতিহাস-পথে এই সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিল।

এখন যাঁহারা এই অভাবনীয় হত্যাকাণ্ডটি সাক্ষাৎভাবে করিয়াছিলেন তাঁহাদের পরিচয় কিছু জানা দরকার। চাপেকারেরা মারাঠী যুবক, 'হিন্দুধর্ম্মের কণ্টক দূরীকরণের' জন্য সংঘবদ্ধ। ইহারা চারি ভাই—দামোদর, বালকৃষ্ণ, বাসুদেব ও আর এক ভ্রাতা। ইহাদের পিতা একজন নিষ্ঠাবান দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। কথকতা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন।

হত্যাকারী দামোদর পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া হত্যার অপরাধ স্বীকার করিল। চাপেকারদের দলের কোন লোক পুলিসকে হত্যাকারীদের সম্পর্কে সন্ধান দেওয়ার জন্য দামোদরের কনিষ্ঠ দুইভ্রাতা ওই বিশ্বাসঘাতক লোকটিকে হত্যা করিয়া ফেলিল; এবং তাহাতেও ক্ষান্ত না-হইয়া জনৈক পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবার কালে ধরা পড়িল। এবং ধরা পড়িয়া মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করিল। দামোদরেরও ফাঁসীর হুকুম হইয়াছিল। শোনা যায়, মৃত্যুদণ্ডের আদেশের পর তিলক দামোদরকে জেলের মধ্যেই একখানি গীতা পাঠাইয়া দেন। দামোদর সেই তিলক-প্রদত্ত গীতা হস্তে 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণং' বলিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়া পড়েন। বালকৃষ্ণও অব্যাহতি পান নাই।

দেখিতেছি চাপেকারেরা চারিভ্রাতাই এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এবং তাহাদের একটি গুপ্তদল ছিল বলিয়া আভাস পাই। তিলকের সহিত এই গুপ্তদলের ও চাপেকারদের কোন সম্পর্ক ছিল কি-না, অনুমান করা কঠিন।

যদি এই হত্যা রাজনৈতিক কারণে ঘটিয়া থাকে, তবে কংগ্রেসের 'আবেদন-নিবেদন নীতি'র সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই। কাহাকেও হত্যা করা— তাহার নিকট আবেদনও নয়, নিবেদনও নয়। এবং কাজটা মোটেই অহিংস নয়। সুতরাং এই হত্যা গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেসের অহিংস-নীতির বিরোধী। চাপেকারদের এই র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টকে হত্যা, তখনকার দিনের আবেদন-নিবেদন-নীতির পক্ষপাতী কংগ্রেস এবং এখনকার দিনের অহিংস-নীতির পক্ষপাতী কংগ্রেস—উভয়েরই বিরোধী। সুতরাং এই হত্যাকাণ্ডটি সর্ব্বকালের কংগ্রেস-বিরোধী কার্য্য। কিন্তু তিলক মহারাজ তখন হইতেই কংগ্রেসের একটি স্তম্ভ। তিনি কি করিয়া এই কংগ্রেস বিরোধী হত্যাকাণ্ডের সহিত জড়িত হইলেন? এবং শুধু জড়িত নয়, তাঁহার জড়ানো ব্যাপারটা আইনের চক্ষে প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত প্রমাণ হইয়া গেল। তবে কি তিলক মহারাজ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থাকিয়াই কংগ্রেসের বাহিরে কংগ্রেস-বিরোধী একটা গুপ্ত ষড়যন্ত্রকে 'গণপতি' ও 'শিবাজী' উৎসবের আবরণ দিয়া ঢাকিয়া এতদিন প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছিলেন? সত্য ইতিহাস জানা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এই ইতিহাস অরবিন্দের জানিবার কথা নহে।

রমেশচন্দ্র দত্ত ও র‍্যাণ্ড-আয়ার্ষ্ট হত্যা: রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত বরোদা

থাকিতেই পরে একসময় অরবিন্দের পরিচয় হইয়াছিল। অরবিন্দের জীবনচরিত আলোচনায় রমেশচন্দ্রকে বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট হত্যার ব্যাপারে রমেশচন্দ্র কি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা জানা দরকার। অরবিন্দ শুধু মহামতি গোখলের ক্ষমা চাওয়া দেখিয়াই চক্ষু মুদিত করেন নাই। রমেশচন্দ্র তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব মনে করি না। কারণ রমেশচন্দ্র তখন বিলাতে থাকিয়া এই সম্পর্কে যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছিলেন। তিনি এই হত্যাকে কাপুরুষোচিত বলিয়া ধিক্কৃত করিয়াছিলেন। অন্যপক্ষে পুণা সহরে 'পিউনিটিভ্' পুলিশের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং খবরের কাগজ দলনের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল—*Daily News*এ দুইখানি পত্র লিখিয়া রমেশচন্দ্র তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন (* ক)।

(* ক) "About this time the 'Poona Outrages' attracted a good deal of attention both in England and India, and, as was to be expected, Mr. Dutt took a prominent part in the discussions on the subject. On the 30th June, Reuter wired that Government had proclaimed the occupation of Poona City by a punitive police force owing to the conduct of the inhabitants. Mr. Dutt wrote two letters to the *Daily News* on the subject, and his views appear to have not a little influenced the opinion of that important organ of public opinion. In his first letter of the 2nd July, on which Mr. Dutt signed himself 'Loyal Indian', he wrote: The cowardly assassination of Lieutenant Ayerst and the attempted murder of Mr. Rand have aroused the just indignation of Englishmen in India and in England······and every friend of peace and order, be he Englishman or be he Indian, hopes that the perpetrators of the foul deed will be hanged amidst the just exultations of loyal Indian multitudes.

"Mr. Dutt wrote a second letter to the *Daily News* and observed: Criticism of government action, when rightly understood, is a help to good government······if I were plotting against the Government of India, the first thing I would hope for, wish for, would be the gagging of the Vernacular Press, and of all newspapers conducted by my

বয়স পঁচিশ বৎসর (১৮৯৭।১৫ই আগষ্ট—১৮৯৮।১৪ই আগষ্ট) ঃ

তিলকের কারাদণ্ড ও বাংলাদেশ ★ অরবিন্দ ও রাজনারায়ণ বসু ★ কংগ্রেস ★ ভারতে বিবেকানন্দ

তিলকের কারাদণ্ড ও বাংলাদেশ ঃ এইবার একটু অতি সংক্ষেপে বাংলাদেশের কথায় আসা যাক। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের বাংলাদেশ একপলকে একটু দেখিয়া নিলে, বাংলা ও মারাঠার যে যোগাযোগের কথা আগে বলিয়া আসিয়াছি —তা বুঝা যাইবে ভাল। "মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালী, একসঙ্গে চলো"— রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যতের এই কবিতাটিও যথাকালে বুঝা যাইবে ভাল।

"শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা জাতিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে, একথা বাঙ্গালী ও মারাঠীর মধ্যে প্রথম জাগিয়াছিল। বাংলাদেশে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ও স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার পি. মিত্র প্রভৃতি কতিপয় উৎসাহী-হৃদয় কলিকাতায় ১৮৯৭ সালে যুবকদের লইয়া একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতির উদ্দেশ্য ছেলেদের নৈতিক, মানসিক, দৈহিক উন্নতিসাধন। ইহাই পরযুগে অনুশীলন সমিতির সূচনা। 'অনুশীলন' কথাটি বঙ্কিমবাবুর নিকট হইতে গৃহীত। প্রথমে ইহাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। সেখানে আত্মরক্ষার নানাবিধ কৌশল ও লাঠিখেলার চেষ্টা চলিত। ……লাঠিখেলা ও আখড়ার সঙ্গে ঐ সময়ে গুপ্ত সমিতির কল্পনা ও তাহা গড়া হইতেছিল ; তবে তাহাদের কোন বিশেষ কার্যকলাপ তখনও দেশে প্রত্যক্ষ হয় নাই। পৃথক ও বিক্ষিপ্তভাবে গুপ্ত সমিতি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা, দেশকে স্বাধীন করিবার বাসনা—অনেকের মনেই দেখা দিয়াছিল এবং তাহা লাভের উপায় সম্বন্ধে বিচিত্র ও উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ও স্বদেশীযুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলাদেশে এইশ্রেণীর বিপ্লববাদ প্রচারিত হইতেছিল। যথার্থ বিপ্লব-কর্মের বিষ দেশ-মধ্যে তখনো প্রবেশ লাভ করে নাই।"—(ভারতের জাতীয় আন্দোলন—প্রঃ মুঃ, পৃঃ ১২৪-২৫)।

স্বদেশীযুগের পূর্ব্বে, অর্থাৎ প্রাক্-স্বদেশীযুগে বাংলাদেশে যে-আকারেই

---

countrymen. The suppression of such papers will be like the extinguishing of street-lights to the burglar".—[*Life and Work of Romesh Chunder Dutt*, by J. N. Gupta, M. A., I. C. S.—p. 222-24]

হউক যদি কোন শ্রেণীর বিপ্লববাদ সত্যি প্রচারিত হইয়া থাকে—তবে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বরোদাবাসের পঞ্চম বৎসরে, অরবিন্দ মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য দেওঘর বা কলিকাতা আসিয়া আর বাকী সারা বৎসরটি বরোদায় থাকিয়া তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন কি-না, আমরা জানি না। মারাঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার উদীয়মান ভাবধারাও এসময়ে তাঁহার মনের বেলাভূমিতে আসিয়া আঘাত করিতেছিল কি-না, কে বলিবে? প্রকাশ্যভাবে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার চরমপন্থী রাজনীতিক্ষেত্রে অরবিন্দ আসিয়া প্রথম অবতীর্ণ হন। কিন্তু অপ্রকাশ্যভাবে ১৮৯৩ খৃঃ হইতেই তাঁহার মন ভারতের রাজনীতির ঝড়ো বাতাসে আলোড়িত হইতেছিল, ইহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। সুতরাং ১৮৯৩ হইতে ১৯০৬ খৃঃ—এই চৌদ্দ বৎসর অরবিন্দের মনের তলায় ভারতীয় রজনীতির কিরকম সব পরিকল্পনা পারিপার্শ্বিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে জন্ম লাভ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল, তাহা আজো পর্য্যন্ত এক অতি বিস্ময়াবহ অলিখিত ইতিহাস। এই ইতিহাসের অনুসন্ধান করিতে গিয়াই র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট হত্যায় তাঁহার মনোভাব আমাদের কল্পনা ও অনুমান করিতে হইতেছে।

র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের গুপ্তহত্যা নিরীক্ষণ করিয়া, অরবিন্দের মন প্রকাশ্যে কোন সাড়া দেয় নাই সত্য। কিন্তু এই ঘটনা তাঁহার মনকে খুব শক্ত রকমে নাড়া দিয়াছিল—ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

পার্নেলের কারাদণ্ড, ফিনিক্স পার্কের হত্যাকাণ্ড, পার্নেলকে এই হত্যা-কাণ্ডের সহিত জড়িত করিবার জন্য পিগটের জালচিঠি—এ সমস্তই একে একে তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

ফিনিক্স পার্কের হত্যার সহিত যেমন পার্নেলকে জড়িত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যার সহিত তেমনি তিলককেও জড়িত করিবার চেষ্টা হইয়াছে—ইহা অরবিন্দ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার চিন্তার গতি এইদিকে ধাবিত হওয়াই খুব স্বাভাবিক; কেননা, তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, 'their politics' কিছু তাঁহার অবিদিত নয়। আর এই 'their politics'-ই উভয় ক্ষেত্রে একের পর আর কার্য্য করিয়াছে। অরবিন্দকে যেমন আমরা পার্নেলের গুণমুগ্ধ দেখিয়া আসিয়াছি, তেমনি এখন হইতে আমরা তাঁহাকে তিলকের গুণেও মুগ্ধ দেখিতে পাইব—কারণ তার যাহাই থাক। এবং কারণ অবশ্যই আছে। বিনা কারণে অরবিন্দ তিলকের গুণমুগ্ধ হন নাই।

র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যার পশ্চাতে কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারীদের দল ছিল কি-না, তাহা লইয়া দুইটি মত আছে। একটি মত বলে—ছিল। আর একটি বলে —ছিল না। যাঁহারা বলেন ছিল, তাঁহাদের যুক্তি এই যে—সিপাহী-বিদ্রোহের (১৮৫৭ খৃঃ) সময় মারাঠা যোগ দেয় নাই। এখন (১৮৯৭ খৃঃ) মারাঠা ভারতব্যাপী একটা বিদ্রোহের সূত্রপাত করিবে। র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের গুপ্তহত্যা মাত্র তাহারই পূর্ব্বাভাস। অপর একদল বলেন—ওসব কিছু নয়, কতকগুলি মাথা-খারাপ চেংড়া ছোকরার বদখেয়াল মাত্র।

"সিডিশন কমিটি বলেন যে—বোম্বাই-এর 'সার্ব্বজনিক গণপতি পূজা', 'শিবাজী-উৎসব' ও র‍্যাণ্ড-হত্যা বিপ্লবকর্ম্মের প্রথম সূচনা।"—(ভারতের জাতীয় আন্দোলন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ১২৭)।

অরবিন্দ ও রাজনারায়ণ বসু: আর একটা অদ্ভুত খবর পাওয়া যাইতেছে। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু নাকি এককালে "বৈপ্লবিক জল্পনা করিতেন"

"স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু ও ঠাকুরবাড়ীর কয়েকজন যুবকে মিলিয়া অতি উদ্ভট রকমের বৈপ্লবিক জল্পনা করিতেন বলিয়া শোনা যায়"।—(ভারতের জাতীয় আন্দোলন—প্রঃ মুঃ, পৃঃ ১২৪)।

"ঠাকুরবাড়ীর কয়েকজন যুবকের" মধ্যে যুবক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, কি ছিলেন না—বুঝা গেল না। "শোনা যায়"—কথাটাও অত্যন্ত অস্পষ্ট। অবশ্য স্পষ্ট প্রমাণ কেহ এতাবৎ অনুসন্ধান করেন নাই। করিলে, কেঁচো খুঁড়িতে কোন্ সাপ বাহির হইবে—কে জানে?

একটা কথা স্পষ্ট করিয়া বলাই ভাল। "রাষ্ট্রবিপ্লব-প্রয়াসী যুবকদলের মন্ত্রদাতা ও গুপ্তনেতা বলিয়া পুলিসের বিবেচনায় ও পরে বিখ্যাত কৌঁসুলী নর্টনের সওয়ালে ও যুক্তিজালে যিনি এককালে অভিযুক্ত ও আচ্ছন্ন তাঁহার জীবনচরিত আলোচনায় অন্ততঃ মারাঠা ও বাংলার গুপ্তসমিতির ইতিবৃত্ত ধামাচাপা দিয়া অগ্রসর হইলে, শ্রীঅরবিন্দের ইতিহাসে স্মরণীয় এই অদ্ভুত জীবন, চিরঅন্ধকারে—যেমন আছে—তেমনি ঢাকা থাকিবে। তার পরিবর্ত্তে মিথ্যার আবর্জ্জনা এবং কাল্পনিক উদ্ভট সব তত্ত্বকথা তাঁহার জীবনের উপর স্তূপীকৃত হইবে—যেমন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আরো অনেক মহাপুরুষের জীবনে ইতিপূর্ব্বে হইয়াছে। এবং আমাদের দেশে সে-বিপদের আশঙ্কা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

আমরা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট হত্যা সম্পর্কে অরবিন্দের মনোভাব লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিতেছি মাত্র। কিন্তু ইহার ঠিক তিন বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯৩ খৃঃ ঐ কংগ্রেসের 'নিবেদন নীতির' বিরুদ্ধে তাঁহার মনোভাবের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছি। এবং দেখিয়াছি যে—তিনি কংগ্রেসের নিবেদন নীতিকে আক্রমণ করিতে গিয়া পুরাদস্তুর সর্ব্বহারা (Proletariat)দের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। "সহরবাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ('burgess')-এর হাতের পুতুল হইয়া কংগ্রেস সাময়িকভাবে থাকিলেও, শেষপর্য্যন্ত সর্ব্বহারার দলই কংগ্রেস ও দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করিবে। কেননা, জঠরানল ও অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া এই নিরীহ সর্ব্বহারার দল একদিন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে"…ইত্যাদি (* ক)।

এই সমস্ত কথা লিখিয়া যিনি মহামতি র‍্যাণাডের নিকট ধমক খাইয়াছিলেন, তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিকে এখন আমরা সসম্মানে অভিবাদন করিতেছি। অরবিন্দ যদি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পুরাদস্তুর সমাজতন্ত্রবাদী (Socialist) অথবা সাম্যবাদী (Communist) না-ও হইয়া থাকেন তবে প্রোলেটেরিয়েটবাদের যে খুব কাছাকাছি গিয়া তিনি পৌঁছিয়াছিলেন, ইহা "ইন্দুপ্রকাশের" প্রবন্ধগুলি হইতে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। অরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তাধারার অর্থনীতির আলোচনা চিরদিনই খুব কম দেখা যায়। কাজেই সোভিয়েট রুশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বহু পূর্ব্বে অরবিন্দের ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে এই অভিনব ভবিষ্যৎদৃষ্টিসম্পন্ন মতবাদগুলির আরো বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। কেননা,'ইন্দু-প্রকাশে' যাহা বীজ আকারে সুপ্ত, ঘাতপ্রতিঘাতে নানা পরিবর্ত্তনের

(* ক) "Mr. Hume, must have been aware, none better, when the fierce pain of hunger and oppression cuts to the bone, what awful elemental passions may start to life in the mildest, the most docile proletariats……. Yet the proletariat is, as I have striven to show, the real key of the situation. Torpid he is and immobile ; he is nothing of an actual force, but he is a very great potential force, and whoever succeeds in understanding and eliciting his strength, becomes by the very fact, master of the future.…the only policy that has any chance of eventual success is to base his cause upon an adroit management of the proletariat."—[*New Lamps for Old*—Induprokash, 5th March, 1894]

বধ্য দিয়া কালে তাহাই শ্রীঅরবিন্দের পরিণত পরিপুষ্ট মতবাদস্বরূপ ইতিহাসে স্থান পাইবে। মন্দিরের চূড়ার স্বর্ণকলস অপেক্ষা ঐ মন্দিরের মৃত্তিকাগর্ভে নিহিত ভিত্তির মূল্য ও প্রয়োজন কম নহে। 'ইন্দুপ্রকাশের' প্রোলিটেরিয়েট-বাদকে বীজস্বরূপ কেন মনে করিতেছি, তাহার কারণ ইহাতে গুপ্ত-সমিতি—Passive Resistance, বিশেষতঃ Spiritual Communism (আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ) কিছুই বিকশিত হয় নাই। 'ইন্দুপ্রকাশের' প্রবন্ধগুলিতে অরবিন্দের রাজনৈতিক মতবাদ এপর্য্যন্ত কেহ কুত্রাপি আলোচনা করেন নাই।

সে কথা থাক। র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট হত্যার তিলকের শাস্তিতে পরবর্ত্তীকালে (১৯১৮ খৃঃ) শ্রীঅরবিন্দ যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তিলকের প্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতিই প্রকাশ পাইয়াছে (* ক)। আমরা দেখিয়াছি এই

(* ক) "The second period brought in a wider conception and a profounder effort. For now it was to re-awaken not only the political mind, but the soul of the people by linking its future to its past; it worked by a more strenuous and popular propaganda which reached its height in the organisation of the *Shivaji* and the *Ganapati* festivals.···He (Mr. Tilak) developed a language and a spirit and he used methods which Indianised the movement and brought into it the masses.···To bring in the mass of the people etc. are the indispensable conditions for a great and powerful political awakening in India. Others, writers, thinkers, spiritual leaders, had seen this truth. Mr. Tilak was the first to bring it into the actual field of practical politics.

"This second period of his labour for his country culminated in a longer and harsher imprisonment which was, as it were, *the second seal of the divine hand* upon his work; for there can be no diviner seal than suffering for a cause.··· The second (punishment in connection with Rand and Ayerst murder) found him already the inspiring power of a great re-awakening of the Maratha spirit; it left him an uncrowned king in the Deccan and gave him that high reputation throughout India, which was the foundation-stone of his present commanding influence."—[*Bal Gangadhar Tilak*, An Appreciation by Babu Aurobindo Ghose—1918]

হত্যা সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত বিলাতে বলিয়াছেন যে—হত্যাকারীদের (দামোদর, চাপেকার প্রভৃতি) রাজভক্ত ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের সম্মুখে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ফাঁসিকাঠে লট্‌কাও।

গোখ্‌লে বোম্বে পৌঁছিয়াই গভর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন—আমি বোম্বে-গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিলাতে যা বলিয়াছিলাম তা প্রত্যাহার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছি।

তিলক বাংলার শিশিরকুমার ঘোষকে লিখিলেন, "I am not a *kacha* reed like your professor Gokhale—গোখ্‌লের মত আমি কাঁচা কাজ করিব না। সঙ্কটসময়ে শোচনীয় ভীরুতা দেখাইয়া দেশবাসীর অনিষ্ট সাধন করিতে পারিব না।" তিলক দামোদর-চাপেকারকে জেলের মধ্যে সহানুভূতির চিহ্নস্বরূপ একখণ্ড গীতা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সহানুভূতির যোগাযোগ কিছুটা দেখা যায়। গভর্ণমেণ্টের বিবেচনায় তিলকের এই সহানুভূতিই অতি মারাত্মক রকমের সাংঘাতিক বস্তু।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী অমরাবতী কংগ্রেসের পক্ষে, কংগ্রেস-মণ্ডপের মধ্যে দাঁড়াইয়া তারস্বরে ঘোষণা করিলেন—'আমরা তিলককে নিরপরাধ মনে করি।' প্রিভি কাউন্সিল তিলককে দোষী সাব্যস্ত করা সত্ত্বেও কংগ্রেস তাহা মানিল না। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। অরবিন্দ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে লিখিলেন যে—তিলকের এই শাস্তির মধ্যে তিনি ভগবানেরই শ্রীহস্ত দেখিতে পাইয়াছেন।

এই বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে তিলক-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করিল। আর তিলক-চরিত্রের এই জলন্ত বৈশিষ্ট্য অরবিন্দের মনকে আকৃষ্ট করিল। তিলকের প্রতি অরবিন্দের প্রথম আকর্ষণের ইহাই কার্য্য-কারণসম্পর্ক বলিয়া মনে হয়। ক্রমে এই আকর্ষণ আরো ঘনীভূত হইতে দেখা যায়। অথচ র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যা হইতেই ইহার উদ্ভব অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

শ্রীঅরবিন্দ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এই সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে একদিকে যেমন তিলকের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম সহানুভূতি দেখা যায় তেমনি অন্যদিকে কংগ্রেস সম্পর্কে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে 'নিবেদন নীতির' বিরুদ্ধে তাঁহার অভিনব প্রোলেটেরিয়েট্ মতবাদের সহিত অতিশয় সামঞ্জস্যও দেখা যায়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিলক সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখিলেন যে, তিলক জনসাধারণের সহিত কংগ্রেসের সংযোগ ঘটাইয়াছেন:

"Tilak used methods which Indianised the movement and brought into it the masses….To bring in the mass of the people…is an indispensable condition for a great and powerful *political awakening* in India."

তারপরে লিখিয়াছেন যে—যদিও অপর সব লেখক বা চিন্তানায়কেরা এ-কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, তথাপি রাজনীতির বাস্তবক্ষেত্রে তিলকই ইহা প্রথম আনয়ন করেন :

"Others, writers, thinkers, spiritual leaders, have seen this truth. Mr. Tilak was the first to bring it into the actual field of practical politics."

"Others, writers, thinkers"দের মধ্যে আমরা শ্রীঅরবিন্দের প্রতি সসম্মানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে পারি এই বলিয়া যে, ইনিও একালে এ-সম্পর্কে একজন প্রথম ও প্রধান চিন্তানায়ক। 'ইন্দুপ্রকাশের' প্রবন্ধগুলিই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে 'ইন্দুপ্রকাশে' অরবিন্দ লিখিতেছেন :

"Yet the Proletariat is, as I have striven to show, the real key of the situation. Torpid he is and immobile ; he is nothing of an actual force but he is a great potential force, and whoever succeeds in understanding and eliciting his strength, becomes by the very fact master of the future · the only policy that has any chance of eventual success, i to base his cause upon an adroit *management of the Proletariat.*" —(*New Lamps for Old*—Induprokash, 5th March, 1894).

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ—২৫ বৎসরের ব্যবধান। রাজনীতি ও তার বহিঃপ্রকাশ কংগ্রেস সম্পর্কে—'নিবেদন নীতি'র বিরুদ্ধে—ও প্রোলিটেরিয়েটবাদের (নিম্নস্তরের অভ্যুত্থান ?) পক্ষে ও সমর্থনে অরবিন্দের চিন্তাধারা একই পথে সমান প্রবাহমান। তাঁহার তীক্ষ্ণ শ্যেনদৃষ্টি দেশের সর্ব্বহারা ('the proletariat') ও নিম্নস্তরের জনসাধারণ ('the mass')-এর উপর নিবদ্ধ। রাজনীতির চিন্তাধারায় অরবিন্দের মানসিক বিকাশের পথে ইহা একটি নূতন আবিষ্কার না-হইলেও, এই তত্ত্বটি এবং অরবিন্দের

চিন্তায় এই তত্ত্বের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা আমাদের দৃষ্টিকে সমধিক আকর্ষণ করিয়াছে। অরবিন্দের ভবিষ্যৎদৃষ্টিসম্পন্ন এই প্রতিভাকে আমরা বরমাল্যে ভূষিত করিতেছি। প্রতিভায় তিনি দীপ্তিমান—তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

এইবার অরবিন্দকে লইয়া (১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ) আমরা একবার দেওঘর তাঁহার মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে দেওঘরে রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে আড়াই বৎসর তিনি পক্ষাঘাত রোগে শয্যাগত ছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ-অঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছিল; ডান হাত তিনি উঠাইতে পারিতেন না। কেহ দেখা করিতে আসিলে, বাম হাতে নমস্কার অথবা প্রতি-নমস্কার করিতেন এবং তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাইতেন (* খ)। যতদূর দেখিতেছি তাহাতে ১৮৯৭ খৃঃ এপ্রিল মাস বা তাহার কাছাকাছি সময় হইতে রাজনারায়ণ বসু পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হ'ন। কিন্তু শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি সুস্থ মস্তিষ্ক লইয়াই ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

অরবিন্দ শারদীয় পূজা অথবা বড়দিনের ছুটীতে দেওঘরে গিয়া থাকিবেন। ইহার পরের বৎসর [১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের "শীতের প্রারম্ভে, পূজার কয়েক সপ্তাহ পর" —দীনেন্দ্রকুমার রায়] তিনি রাজনারায়ণ বসুর সহিত দেওঘরে গিয়া শেষসাক্ষাৎ করিবেন। সুতরাং এবারের সাক্ষাৎ, শেষসাক্ষাতের ঠিক আগের সাক্ষাৎ।

অরবিন্দের সহিত রাজনারায়ণ বসুর সাক্ষাৎ ও এই সময়কার কথোপকথন অরবিন্দের কোন জীবনচরিত-লেখকই এড়াইয়া যাইতে পারেন না। কেননা, এই সময়ে বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসুর চিন্তাধারার সহিত অরবিন্দ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতেছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে রাজনারায়ণ বসুর প্রভাব অরবিন্দের মানসিক বিকাশের ইতিহাসে আমরা যথেষ্ট দেখিতে পাইব।

রোগশয্যাশায়ী, "জাতীয় গৌরব", "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা", "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা"র নিকট হইতে এই সময় অরবিন্দ কি কোন প্রেরণাই পান নাই (* গ)? তাহা

(* খ) শ্রীঅরবিন্দের ভগিনী শ্রীযুক্তা সরোজিনী ঘোষ এই ঘটনা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এবং তিনি ১৮।১।৪১ তারিখে ইহা আমাদিগকে বলিয়াছেন।

(* গ) "রাজনারায়ণ বসু মহাশয় আমার বিবাহের ২।১ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই দেওঘরে বাস করিতেছিলেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদিগকে লইয়া ব্রহ্মোপসনা করিতেন। তৎপর পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইতিহাস ও বিভিন্ন

সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অরবিন্দের মানসিক বিকাশের পথে জ্ঞান-বৃদ্ধ রাজনারায়ণের স্থান কাহারও অপেক্ষা নিম্নে নয়।

ভারতে বিবেকানন্দ : যৌবনকালে রাজনারায়ণ বসু যদি ঠাকুরবাড়ীর কয়েকজন যুবক লইয়া উদ্ভট রকমের কোন বৈপ্লবিক জল্পনা সত্যি করিয়া থাকেন, তবে প্রাণাধিক দৌহিত্রকে কি তাহা তিনি অনুপম উচ্চহাস্যের সহিত সবিস্তারে বলেন নাই (* ঘ)? ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে দেওঘরে দেখিতে পাই। এই সময় স্বামীজী, শয্যাশায়ী বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সে প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। এই ৩রা জানুয়ারীর আগে ও পরে অরবিন্দের সহিত রাজনারায়ণ বসুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অতএব অরবিন্দ, বৃদ্ধ রাজনারায়ণের মুখে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কেও সাক্ষাৎভাবে অনেক কথাই শুনিয়া থাকিবেন। রাজনারায়ণের মধ্য দিয়া অরবিন্দের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের একটা যোগাযোগ আমরা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেছি।

কিন্তু এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, স্বামী বিবেকানন্দও প্রথমজীবনে ব্রাহ্ম-সমাজে গিয়া যোগ দিয়াছিলেন। একথা স্বামীজী পরবর্ত্তী জীবনে গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।

এই বৎসর (১৮৯৭ খৃঃ) ৩রা ডিসেম্বর (বাংলা ১৯শে অগ্রহায়ণ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তিন আইনের ব্রাহ্মমতে শ্রীযুক্তা বাসন্তীদেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহ-রাত্রেই তিনি তাঁহার নবপরিণীতা সহধর্ম্মিণীকে প্রতিজ্ঞা করান যে—যদি তাঁহাদের সন্তানাদি হয়, তবে ঐ সন্তানদিগের অসবর্ণ বিবাহ দিবেন সত্য, কিন্তু

জাতির অবস্থা বর্ণনা করিতেন। ভারতে হিন্দুজাতির কি প্রকারে অভ্যুদয় হইয়াছিল, কেনই বা তাহাদের পতন হইয়াছিল তদ্বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিতেন।"—[কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত—পৃঃ ২০৮]

সুতরাং যাহা রাজনারায়ণ বসুর প্রাত্যহিক আলোচনার বিষয়, অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের সময় তাহার ব্যতিক্রম ত হয়ই নাই, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

(* ঘ) অরবিন্দ দেওঘরে থাকাকালীন প্রচুর সিগারেট্ খাইতেন। বড় বড় কাগজের বাক্সে করিয়া সিগারেট্ যাইত। ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের পুত্র (শ্রীসুকুমার মিত্র)—শ্রীঅরবিন্দের মাসতুত ভাই অনেক সময় অরবিন্দের সহিত একত্রে দেওঘরে বাস করিয়াছেন। তিনিই আমাদিগকে ইহা বলিয়াছেন। অরবিন্দের সহিত সুকুমার বাবুর খুব সৌহৃদ্য ছিল।

রেজেষ্ট্রী মার্কা Act III—1872র আশ্রয় কদাপি গ্রহণ করিবেন না। এ-প্রতিজ্ঞা দেশবন্ধু তাঁহার প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী সহধর্ম্মিণীর সাহচর্য্যে তাঁহার জীবিতকালে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ইহাই অভিনব সমাজ-সংস্কার। হিন্দুর স্বাজাত্যবোধের বেদীতে, যজ্ঞাগ্নি সম্মুখে ইহার প্রতিষ্ঠা। বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের ভবিষ্যৎ-গতিমুখে দেশবন্ধুর এই সমাজ-সংস্কারের গুরুত্ব ক্রমে উপলব্ধি করা যাইবে।

কংগ্রেস : এইবার কংগ্রেসের কথায় আসা যাক। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অমরাবতীতে কংগ্রেস হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ খপর্দ্দে, এবং সভাপতি শঙ্করণ নায়ার। খপর্দ্দে তিলকের সহকর্ম্মী, ছোট ভাইয়ের মত। তিলক এই কংগ্রেসের সময় কারারুদ্ধ। সুতরাং মিঃ খপর্দ্দে তিলকের জন্য ব্যথা বুকে চাপিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ শেষ করিলেন।

''বাঙ্গালার অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক প্রতিনিধিদের কথায় স্থির হয়, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে তিলকের নামোল্লেখ করিবেন এবং সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিলকের জয়ধ্বনি করিবেন। তাহাই হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের মতে তিলকের ও পুণার সংবাদপত্র-সম্পাদকদিগের কারাদণ্ডবিধান করিয়া সরকার ভুল করিয়াছেন। আমার হৃদয় তিলকের প্রতি সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। তাঁহার জন্য সমগ্র জাতি আজি অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। আমার মত, এদেশের সংবাদপত্র-সেবক সকলেই তিলককে নিরপরাধ মনে করেন'।"—(কংগ্রেস—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ; পৃঃ ৭৫-৭৬)।

শিশিরকুমার ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে ছাড়াও 'বাঙ্গালার অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কেরা তখনকারদিনের সুরেন্দ্রনাথকে দিয়া কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থাকিয়াই তিলকের প্রতি বাংলার সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাইলেন। বাংলা ও মারাঠায় যোগাযোগের কথা আগে বলিয়াছি। এই-সব ঘটনা তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতে হইতেছে।

এইবার কংগ্রেস-সভাপতির কথায় আসা যাক। সভাপতি মহাশয় প্লেগ দমনকল্পে বম্বে-গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিলেন। গোরা সৈন্যরা স্ত্রীলোকদিগকে আক্রমণ ও অপমান করিয়াছিল—এ কথা বলিলেন। তিলকের 'মারাঠা' কাগজে এইসব অভিযোগের কথা লেখা হইয়াছিল এবং তাহার অব্যবহিত পরেই র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যাকাণ্ড ঘটে। কিন্তু ইহা একের পর

একটা ঘটনামাত্র—কোন যোগাযোগ নাই। সাহেবদের কাগজগুলি ভয় পাইয়া একটা গুপ্ত ষড়যন্ত্রের মিথ্যা সন্দেহ করিতেছে মাত্র। বস্তুত 'পিউনিটিভ পুলিশ' নিয়োগ অথবা দেশীয় কাগজগুলির শাস্তিবিধান করাতে কোন বুদ্ধির পরিচয় নাই। তিলকের বিচার একটা প্রহসন মাত্র, কেননা দেশীয় ও ইয়োরোপীয় জুরার সমানভাগে দেওয়া হয় নাই (* ৬) ইত্যাদি।

অরবিন্দ নিশ্চয়ই সভাপতি শঙ্করণ নায়ারের অভিভাষণের তিলক সম্পর্কিত অংশটি বরোদায় বসিয়া উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এবং এই র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যাকাণ্ডের বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহার মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল নিশ্চয়ই। তিনি তখন কি ভাবিতেছিলেন কল্পনা করিতে কৌতূহল হয় বটে, কিন্তু নিশ্চয়রূপে জানিবার কোন উপায় নাই।

ভারতে বিবেকানন্দ : ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট আসিয়া পৌঁছিলে শ্রীঅরবিন্দের ২৬ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। এই ১২ মাসে এক বৎসর কালের মধ্যে, অরবিন্দের জীবনের ও জাতীয় জীবনের মধ্যে যে-সকল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত দেখা গিয়াছে, তাহার কিছুটা বিবরণ আমরা দিয়াছি—আর কিছুটা এইবার দিব। এই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া চলিয়াছে, তাহাই অরবিন্দের জীবনকে বিকাশের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। একথা মিথ্যা যে, জাতীয় জীবনের বড় বড় ঘটনাগুলি তাহার তরুণ মনকে আঘাত করে নাই। এই বৎসরের র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের গুপ্তহত্যা এবং তজ্জন্য

(* ৬) "Soldiers···generally believed to have insulted women. A Hindu lady was assaulted by a soldier · to these and similar complaints···the *Mahratta* complained, 'Plague is more merciful to us than its human prototypes now reigning in the city'···President of the Plague Committee was murdered—an unfortunate coincidence. The Anglo-Indian papers in times of excitement proved positively mischievous.·· The Anglo-Indian Press demanded punishment by name of Mr. Tilak···the man who had strongly attacked and denounced the measures of Government···Mr. Tilak was prosecuted and, after a farce of a trial, convicted."—[*From the Presidential Address* by the Hon. Mr. C. Sankaran Nair at the Thirteenth (1897) Congress at Amraoti.]

তিলকের কারাদণ্ড যেমন তাঁহার মনকে আঘাত করিয়াছে, তেমনি এই বৎসরে স্বামী বিবেকানন্দের গতিবিধি ও বক্তৃতাও একটা নূতন জ্যোতিষ্কের মত তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিয়া উদিত হইয়াছে। এবং বিদ্যুৎবর্ষী সেই জ্যোতিষ্কের গতিবিধি তিনি সোৎসুক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। ইহাতে আপত্তি অথবা সন্দেহের কিছুই নাই।

যে কালপুরুষের (Zeitgeist) ইঙ্গিতে জাতীয় জীবনের বড় বড় ঘটনাগুলি কার্য্য-কারণসম্পর্কে একের পর আর আসিয়া দেখা দেয়, তাহার রহস্য নিরূপণ করা সহজ নয়। যে-সময় র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের গুপ্তহত্যা এবং তাহার ফলে তিলকের কারাবাস চলিতেছে, সেই বৎসরেই স্বামী বিবেকানন্দ অদম্য উৎসাহে দেশময় অদ্বৈত বেদান্তের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার অগ্নিময় বাণী প্রচার করিতেছেন। বাহির হইতে দেখিলে, এইসকল বিস্ময়াবহ ঘটনার মধ্যে কোন যোগাযোগ হয়ত লক্ষ্য করা যাইবে না। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে যে, জাতীয় জীবনে একই সময় যুগপৎ উত্থিত এইসকল ঘটনা বিক্ষিপ্ত হইলেও মূলতঃ বিচ্ছিন্ন নয়। যোগ আছে। কেননা, এই কালপুরুষের (Zeitgeist) ইঙ্গিতে একই জাতির জীবনে এবং একই সময়ে, এইসকল ঘটনা বিকশিত হইতেছে—আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এইসকল ঘটনা জাতীয় জীবন বিকাশের চিহ্নস্বরূপ। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে 'ইন্দুপ্রকাশে' অরবিন্দ-লিখিত বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সাতটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা এই স্পষ্ট ধারণায় উপনীত হইয়াছি যে, পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়ভেরী-নিনাদকারী স্বামী বিবেকানন্দ নিজের দেশে ফিরিয়া নিজের জাতিকে চলিবার পথে ভবিষ্যতের জন্য যে-সকল কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে অদ্বৈত বেদান্তের আবরণে বজ্রনির্ঘোষে বক্তৃতা করিতেছিলেন, তাহা অরবিন্দের তরুণ মনকে শুধু আঘাত করে নাই—আকৃষ্টও করিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে অরবিন্দের লেখা হইতে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। অরবিন্দ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে যে-সকল কাজ করিতে বলিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা (১৯০৯ খৃষ্টাব্দেও) করিয়া উঠিতে পারি নাই। সুতরাং অরবিন্দের কথা হইতে বোঝা যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দের সমস্ত প্রেরণা স্বদেশীযুগের বিকাশের মধ্যেই নিঃশেষিত হয় নাই! জাতীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণা, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দেও পূর্ণতা লাভ করে নাই—ইহাই অরবিন্দের অভিমত। এবং অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন :

"That which Vivekananda received and strove to develop, has not yet materialised."—(*Karmayogin, 1909*)

পাশ্চাত্য দেশে স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত-প্রচারকে যথেষ্ট গর্ব্বের সহিত অরবিন্দ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার প্রমাণও তাঁহার নিজের লেখা হইতেই আমরা পাইয়াছি। অরবিন্দ এইরূপভাবে বিভোর হইয়া লিখিয়াছেন, যেন আমরা স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য দেশকে জয় করিয়াছি। স্পষ্ট "conquer" এই শব্দটি তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। অরবিন্দের নিজের লেখাই কিছুটা ফুট-নোটে তুলিয়া দিতেছি (* ক)।

এই ধরণের আরও লেখা আছে, বাহুল্যভয়ে তুলিয়া দিলাম না।

অরবিন্দের লেখা হইতে স্পষ্ট বুঝিতেছি যে—তিনি চিন্তা করিয়া দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন যে, দক্ষিণেশ্বরে (শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব) যে কার্য্যের সূচনা হইয়াছে, তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া দূরের কথা, ঐ কার্য্যের অন্তর্নিহিত গূঢ় উদ্দেশ্য (অন্ততঃ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) আমরা সম্যকৃরূপে বুঝিয়া উঠিতেই পারি নাই। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের পর দক্ষিণেশ্বরের কার্য্য বুঝিবার দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছেন কি-না, তাহা আমরা জানি না।

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে অবস্থানকালে কবে কখন এক দেশ হইতে অন্যদেশে গিয়াছেন, তাহারই বর্ণনা এতাবৎ দিয়াছি; কোথায় তিনি কি কথা বলিয়াছেন তাহা বেশীকিছু একটা বলা হয় নাই। কিন্তু বরোদায় অরবিন্দের অবস্থানকালের পঞ্চম বৎসরে স্বামী বিবেকানন্দ দেশে ফিরিয়া যে-সকল কথা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে দুই-একটির উল্লেখ করিতে হইবে এই জন্য যে, ঐ সকল কথা অরবিন্দের জীবন-আলোচনায় একান্ত প্রয়োজন হইবে।

(* ক) "The going forth of Vivekananda, marked out by the master as the heroic soul destined to take the world between his two hands and change it, was the first visible sign to the world that India was awake not only to survive but to *conquer*.

"The work that was begun at Dakshineswar is far from finished, it is not even understood. That which Vivekananda received and strove to develop, has not yet materialised."—[*Karmayogin, 1909*]

১৮৯৭ খৃঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর কলিকাতায় স্বামী বিবেকানন্দের অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলেন। এই অভিনন্দনের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলিলেন :

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। ...কলিকাতাবাসী যুবকগণ, ওঠো, জাগো, কারণ শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। ...সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না। ...ওঠো, জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলিপ্রার্থনা করিতেছেন। ...ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিবল আছে, ধনবল আছে; কিন্তু কেবল আমার মাতৃভূমিতেই (বাঙ্গলা) উৎসাহাগ্নি বিদ্যমান। এই উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে। অতএব হে কলিকাতাবাসী যুবকবৃন্দ, হৃদয়ে এই উৎসাহাগ্নি জ্বালিয়া জাগরিত হও। ...হৃদয়ে উৎসাহাগ্নি জ্বালিতে হইবে। লোকে বলিয়া থাকে, বাঙ্গালী জাতির কল্পনাশক্তি অতি প্রখর; আমি উহা বিশ্বাস করি। আমাদিগকে লোকে কল্পনাপ্রিয় ভাবুক জাতি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে; কিন্তু, বন্ধুগণ! আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ইহা উপহাসের বিষয় নয়, কারণ, হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাসেই হৃদয়ে তত্ত্বালোকের স্ফুরণ হয়। বুদ্ধিবৃত্তি, বিচার-শক্তি খুব ভাল জিনিষ হইতে পারে; কিন্তু উহা বেশীদূর যাইতে পারে না। ভাবের মধ্য দিয়াই গভীরতম রহস্যসমূহ উদ্ঘাটিত হয়। অতএব, বাঙ্গালীর দ্বারাই—ভাবুক বাঙ্গালীর দ্বারাই এই কার্য্য সাধিত হইবে।"

কংগ্রেসের বাহিরে ইহা যে একপ্রকার নূতন স্বদেশ-প্রেমের আবির্ভাব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার ঠিক আড়াই বৎসর পূর্ব্বে (১৮৯৪।২৭শে আগষ্ট তারিখে) অরবিন্দ বরোদায় বসিয়া "ইন্দুপ্রকাশে" যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে কংগ্রেসের বাহিরে ঠিক এইরূপ একটি মহৎ ও উদ্দীপনা-ময় স্বদেশপ্রেমের আবির্ভাব ও জাতীয় জীবনে তাহার আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ২২ বৎসরের যুবক অরবিন্দের মধ্যে এতটা ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি নিশ্চয়ই সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বামী বিবেকানন্দের কলিকাতায় অভিনন্দনের উত্তরের আড়াই বৎসর পূর্ব্বে, কলিকাতাকে ভাল করিয়া না-দেখিয়াই অরবিন্দ কলিকাতা সম্বন্ধে যে-সব কথা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেও আমরা তাঁহার অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টির এবং অপক্ষপাত অথচ নির্ম্মম সমালোচনা-শক্তির পরিচয় পাই। তাঁহার নিজের লেখাই তুলিয়া দিতেছি :

"The Congress in Bengal is dying of consumption;

annually its proportions sink into greater insignificance ; its leaders, the Bonnerji's and Banerji's and Lalmohun Ghose's have climbed into the rarified atmosphere of the Legislative Council and lost all hold on the imagination of the young-men. *The desire for a nobler and more inspiring patriotism is growing more intense ;* and in the rise of an indigenous Trade Party we see the handwriting on the wall. This is an omen of good hope for the future ; for *what Bengal thinks tomorrow, India will be thinking tomorrow week.*"

এই প্রবন্ধেই কলিকাতা সম্পর্কে তিনি যে কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা তাঁহার সেইসময়কার মনের ও অভিপ্রায়ের একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্য দেশে বিজয়ভেরী নিনাদ করিতেছেন, ঠিক সেই সময় দেশ হইতে তাঁহার অনুপস্থিতকালে বরোদায় বসিয়া অরবিন্দ লিখিতেছেন—"...this revolution is yet in the infancy. Visible on every side, in the waning influence of the Sadharan Brahmo Somaj, in the triumph of the Bengali language, in the return to Hinduism...."বাঙ্গলাদেশে ব্রাহ্ম-যুগের অবসানের পর আর একটা নব্য হিন্দু-যুগের আবির্ভাব হইতেছে, ইহা অরবিন্দ স্পষ্ট নিরীক্ষণ করিতেছেন। বঙ্কিম-প্রসঙ্গেই অরবিন্দ এই নব্য হিন্দু-যুগের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু অরবিন্দের লেখার তিন-চার বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শী ও (*Calcutta Review*, 1890-91) বঙ্কিম-প্রসঙ্গে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন।

মহামতি গোখ্‌লের প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে অরবিন্দ লিখিয়াছেন—"What Bengal thinks tomorrow, India will be thinking tomorrow week." ইহা আমরা এতদিন জানিতাম না। এখন জানিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি। অথচ, গোখ্‌লে বাঙ্গলাদেশকে কত বেশীদিন ধরিয়া জানিয়া তবে ঐ কথা বলিয়াছেন। আর অরবিন্দ সাক্ষাৎভাবে বাঙ্গালাদেশকে ভাল করিয়া না-দেখিয়াই ঠিক অনুরূপ কথাই গোখ্‌লের ১২ বৎসর আগে বলিয়াছেন। "ইন্দুপ্রকাশে" প্রকাশিত অরবিন্দের এই লেখাটি গোখ্‌লে পড়িয়াছিলেন কি-না, জানিবার উপায় আর এখন নাই। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে

অরবিন্দ কলিকাতার উপর কিরূপ নির্ম্মম কশাঘাত করিতেছেন, তাহার আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি :

"Calcutta is yet a stronghold of the Philistines ; officialdom is honeycombed with anti-national tradition ; in politics and social reform, the workings of the new movement are yet obscure. The Anglicised Babu sits in the high place and rules the earth for a season. It is he who perorates on the Congress, who frolics in the abysmal fatuity of interpellation on the Bengal Legislative Council, who mismanages civic affairs in the smile of the City Corporation. He is the man of the present, but he is not the man of the future. On his generation, *a generation servilely English and swayed by. Keshab Chunder Sen and Kristo Das Pal,* Bankim had little effect."—[*Bankim Chandra Chatterji—VII* (Our Hope In The Future) '*Induprokash*' ; *27th August, 1894*]

বাঙ্গালী জাতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের পর স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছেন তাহার অনুরূপ কথা, স্বামী বিবেকানন্দের আগে ও পরে, অরবিন্দ অনেকবার বলিয়াছেন (* ক)। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতা-অভিনন্দনের উত্তরে

(* ক) "When a Mahratha or Gujerati has anything important to say, he says it in English ; when a Bengali, he says it in Bengali"—[Bankim Chandra Chatterji—*Induprokash* ; *Aug. 20th, 1894*]

"The Bengali nation is a people spirited, bold, ingenious, and imaginative, high among the most intellectual races of the world ; and if it can but get perseverance and physical elasticity, one day to be high among the strongest." —[Bankim Chandra Chatterji—*Induprokash* ; *Aug. 27th, 1894*]

"The Indian peoples generally, *with the possible exception of emotional and idealistic Bengal,* have nothing or very little

যদিও বলিয়াছেন (* খ)…"বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনও কোনো দেশের যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই।"—এবং বঙ্গীয় যুবকদিগকে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন, "কিছুতেই ভয় পাইও না। তোমরা অদ্ভুত কার্য্য করিবে। যে মুহূর্ত্তে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি শক্তিহীন। ভয়ই জগতের সমুদয় দুঃখের মুখ্য কারণ, ভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার, নির্ভীক হইলে এক মুহূর্ত্তে স্বর্গ পর্য্যন্ত আবির্ভূত হয়।" …তথাপি তিনি বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ধর্ম্মের আবরণে যে-সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছে সেই সকল দোষ অত্যন্ত নির্ভীকভাবে স্পষ্ট করিয়া বলিতে কোনই দ্বিধা করেন নাই (* গ)। আমাদের দেশে সাধারণতঃ যাঁহারা কোন

---

of the revolutionary temper."—[Bal Gangadhar Tilak—*An Appreciation by Babu Aurobindo Ghose, 1918*]

(* খ) "আমি প্রায় অতীত দশ বৎসর ধরিয়া সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি—তাহাতে আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশ হইবে, যাহাতে ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে। নিশ্চয় বলিতেছি, এই হৃদয়বান উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর হইতেই শত শত বীর উঠিবে, যাহারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রচারিত সনাতন আধ্যাত্মিক সত্যসকল প্রচার করিয়া ও শিক্ষা দিয়া জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত—এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবে। তোমাদের সম্মুখে এই মহান্ কর্ত্তব্য রহিয়াছে।"—[কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর—"ভারতে বিবেকানন্দ" ; পৃঃ ৩৭৬-৭৭]

(* গ) "যে জঘন্য বামাচার তোমাদের দেশকে নাশ করিয়া ফেলিতেছে, উহা অবিলম্বে পরিত্যাগ কর।…যখন আমি দেখি, আমাদের সমাজে বামাচার কি ভয়ানকরূপে প্রবেশ করিয়াছে, তখন উহা আমার অতি ঘৃণিত নরকতুল্য স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই বামাচার সম্প্রদায়সমূহ আমাদের বাঙ্গলা দেশের সমাজকে ছাইয়া ফেলিয়াছে।…বামাচার তন্ত্রসকলই বাঙ্গালীর শাস্ত্র।"—[কলিকাতা ষ্টার থিয়েটারে 'সর্ব্বাবয়ব বেদান্ত' বক্তৃতা—"ভারতে বিবেকানন্দ", পৃ: ৪০৭-৮]

কিন্তু এখানে উল্লেখ না-করিয়া পারিলাম না যে, স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাঙ্গলাদেশকে তন্ত্রশাস্ত্রের জননী বলিয়া অসীম গৌরব অনুভব করিয়াছেন। যথা—"কপিলদেবপ্রিয়া, ন্যায়শাস্ত্রপ্রসূতি, তন্ত্র-শাস্ত্রজননী বঙ্গমাতা কতকাল আত্মবিস্মৃতা হইয়া নীচানুকরণরতা থাকিবেন?"—["পুষ্পাঞ্জলি"—একাদশ অধ্যায়]

বাঙ্গলাদেশ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত উচ্চপ্রশংসা এবং তাঁহার

বিশেষ অবতার-পুরুষ অথবা আমাদের জাতির ইতিহাস লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহারা হয় কেবলই গুণ দেখেন অথবা কেবলই দোষ দেখেন। স্বামী বিবেকানন্দ ঐ-শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি আমাদের জাতির দোষ ও গুণ উভয় দিকেই সমান দৃষ্টি রাখিয়া কথা বলিয়া গিয়াছেন।

আমরা দেখিলাম পাশ্চাত্য দেশ হইতে নিজের দেশে ফিরিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বাঙ্গালার যুবকদিগকে সর্ব্বপ্রথম বলিতেছেন—"তোমরা কিছুতেই ভয় পাইও না, যে মুহূর্ত্তে ভয় পাইবে সেই মুহূর্ত্তে তোমরা শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। কোন কাজ করিতে হইলে শক্তির প্রয়োজন। অতএব তোমরা নির্ভীক হও।" স্বামীজীর এই কথা শুনিবার পর বঙ্গীয় যুবকগণ কোন্‌দিকে কতটা কি পরিমাণে নির্ভীক হইয়াছেন, সে উত্তর দিবার দায়িত্ব তাঁহাদের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। বাঙ্গলার তরুণদের ইতিহাসও ইহার কিছুটা উত্তর দিতে পারিবে। সেই সমগ্র ইতিহাস একনিঃশ্বাসে বলা যায় না। ক্রমে ক্রমে—যেদিকে যতটুকু সাধ্যে কুলায়—শ্রীঅরবিন্দের দীর্ঘজীবন আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহার কিছুটা অবশ্যই বলিতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বঙ্গীয় যুবকদিগকে নির্ভীক হইতে বলিয়াছেন, পরবর্ত্তীকালে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক অরবিন্দ বঙ্গীয় যুবকগণকে এইরূপ নির্ভীক হইবার কথাই বলিয়াছেন। Macaulay সাহেব তাঁহার *Warren Hastings* প্রবন্ধে বাঙ্গালী জাতিকে অত্যন্ত ভীরু বলিয়া অপবাদ দিয়া গিয়াছেন (* ঘ)। ফলে, ঐসকল অপবাদ পাঠ করিয়া একদল ইংরাজী-শিক্ষিত

ইতিহাস সম্পর্কে গভীর গবেষণা অল্পাধিক সকলেই কিছুটা অবগত আছেন। কিন্তু মনীষী ভূদেব বাঙ্গলাদেশকে যেরূপ স্তব-স্তুতিতে বন্দনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্বামী বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের পূর্ব্বগামী বলিয়া এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মহামনীষী ভূদেব ঐ 'পুষ্পাঞ্জলী' গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন—

"এই বঙ্গভূমি সমুদায়ই মহাতীর্থ। ইহার মৃত্তিকা দেবাদিদেব মহাদেবের শরীর-বিধৌত বিভূতি। ইহার জল তাঁহার জটাজুটোচ্ছিষ্ট ব্রহ্মবারি। এখানকার পাদপগণ দেববৃক্ষ। এখানকার ফলমূলশস্যাদি সাক্ষাৎ অমৃতপূর্ণ। ইহা ভূলোকের নন্দন কানন। এখানকার নরনারীগণ দেবদেবী। কালধর্ম্মবশে ইহারা পাতালশায়ী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ঐ রসাতলগামী গঙ্গাবারি কি ভস্মমাত্রাবশিষ্ট সগরসন্তানদিগকে উদ্ধার করেন নাই?"

(* ঘ) "A war of Bengalis against Englishmen was like a

বাঙ্গালী আরও অধিক ভীরুতা প্রাপ্ত হইয়াছেন (* ঙ)। এবং কালে, প্রতিক্রিয়া-মুখে আর একদল বাঙ্গালী যুবক নির্ভীক সন্ত্রাসবাদী বোমারু হইয়াছিলেন।

আলিবর্দ্দির সময়ে "বর্গীর হাঙ্গামা"র পর হইতেই বাঙ্গালী যে কিছুটা ভীরুতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই। পলাশীর যুদ্ধের ৬৬ বৎসর পর রাজা রামমোহন রায়ও—যিনি বাঙ্গালী জাতির গৌরব সম্বন্ধে এযুগে কাহারও অপেক্ষা কম সচেতন ছিলেন না এবং যিনি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় বিচারে তর্কযুদ্ধ করিতে গিয়া বাঙ্গালীর স্বাজাত্যাভিমানের উপর দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত উঁচু গলায় বলিয়া গিয়াছেন…"ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপ-জীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন, যেহেতু সত্য ও ধর্ম্ম সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, এমত নিয়ম নহে।"—(ব্রাহ্মণ-সেবধি, ১ম ভাগ)।…তিনিই সত্যের অনুরোধে, তাঁহার সময়কার নিজের জাতিকে "ভীরু" বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। সত্যদ্রষ্টা পুরুষেরা কখনও তাহা করেন না (* চ)।

war of sheep against wolves, of men against demons. The physical organisation is feeble even to effiminacy. During many ages he has been trampled upon by men of bolder and more hardy breeds. Courage, independence, veracity, are qualities to which his constitution and his situations are equally unfavourable. His mind bears a singular analogy to his body. It is weak even to helplessness, for purposes of manly resistance……."—[*Warren Hastings*—Macaulay]

(* ঙ) "The taunt of cowardice is like one of those prophecies that fulfil themselves. It implants the cowardice that it derides ; and if you call a people timid, they begin to shake …and what was far worse, the educated Bengalis had been taught to regard themselves as the cowards of the world too, just because Macaulay had delighted himself one morning with a brilliant passage of rhetoric."—[*The New Spirit in India*—Nevinson, p. 224]

(* চ) "কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের

অরবিন্দ স্বদেশীযুগে ঠিক স্বামী বিবেকানন্দের অনুরূপ কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালী যুবককে সাহসী হইতেই বলিয়াছেন; এবং এই সাহস ব্যতিরেকে দেশের উদ্ধার ও জাতির উদ্ধার সম্ভব নয়—একথাও স্পষ্ট বলিয়াছেন। তাঁহার নিজের কথাই তুলিয়া দিতেছি :

"Courage is your principal asset. Heroism, says Emerson, feels and never reasons, and therefore is always right. If you are to work out the salvation of your country, you will have to do it with heroism······ The rapturous contemplation of a new and better state for your country is your only hope. What great element is wanting in a life guided by such a hope?"—[*Bande Mataram*—January 21, 1908]

অরবিন্দের জীবন-আলোচনার পদ্ধতি : মাত্র এক বৎসর কালের মধ্যে জীবনের অল্প কয়েকটি ঘটনাকে আবদ্ধ করিয়া আলোচনা ও বিচার করা—সুবিচার হয় না, সুসঙ্গতও হয় না। এই বৎসরের একটি ঘটনাকে ইহার অতীত বৎসর দিয়া বিচার করিলে মনে হইবে যে, ইহা যেন অতীত বৎসরের একটি ঘটনার ফলস্বরূপ। আবার ভবিষ্যৎ বৎসর দিয়া বিচার করিলে মনে হইবে—ইহা যেন ভবিষ্যতের একটি ঘটনার কারণস্বরূপ। একই ঘটনার মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যৎ যুগপৎ অবস্থান করিতেছে। সুতরাং এই বৎসরের সীমায় আবদ্ধ শ্রীঅরবিন্দের জীবনের কোন একটি ঘটনাকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে—বৎসরের এই সীমারেখা হইতে কিছুটা অতীতে যাইতে হইবে, আবার কিছুটা ভবিষ্যতেও ছুটিতে হইবে। যুবক অরবিন্দের মনের উপর জাতির বৃহত্তর জীবনের যে-সকল ঘটনা আসিয়া আঘাত করিতেছে, সেই ঘাত-প্রতিঘাতের বিদ্যুৎবিচ্ছুরিত রোশনাইতে অরবিন্দের জীবনের ক্রমবিকাশকে আলোকিত করিয়া দেখিতে হইবে। নতুবা নানা জটিলতাপূর্ণ তাঁহার অতি অদ্ভুত জীবনকে বুঝিতেও পারিব না এবং সহজবুদ্ধিসম্পন্ন আর পাঁচজনকে বুঝাইতেও পারিব না। প্রত্যেক আলোচ্য বৎসরের পেছনে এবং সামনে আমাদের বারংবার ছুটাছুটি না-করিয়া উপায় নাই।

নাম মাত্রে লোক ভীত হয়, তথায় এরূপ দুর্ব্বল, দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মতঃ কি লোকতঃ প্রশংসনীয় হয় না।"—[ব্রাহ্মণ-সেবধি—১ম ভাগ]

এই বৎসরে জাতির বৃহত্তর জীবনে যে-দুইটি বড় ঘটনা রেখাপাত করিয়াছে, তাহার একটি র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের গুপ্ত-হত্যা। আর একটি হইতেছে সমগ্র জাতির পুনরুত্থানকল্পে স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা। এবং ভারতবর্ষের নানা-স্থানে ঘুরিয়া বহু বক্তৃতাদিতে সেই সুমহৎ পরিকল্পনার প্রকাশ। র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট প্রসঙ্গ আমরা শেষ করিয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা আরম্ভ করিয়াছি—শেষ করি নাই।

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—কেন, এ বৎসর কংগ্রেস কি জাতির বৃহত্তর জীবনের বড় ঘটনা নয়? উত্তরে বলা যায়: অবশ্য বড় ঘটনা—তাঁহাদের কাছে, যাঁহারা এই কালে কংগ্রেসের নেতার পদ গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসকে পরিচালিত করিতেছেন। এই সকল দেশ-বিখ্যাত নেতাদের মধ্যে আমরা অনেককে দেখিতে পাই। সাহেবদের মধ্যে হিউম, পার্শীদের মধ্যে দাদাভাই নৌরোজী এবং স্যার ফিরোজ শা মেহেতা, মারাঠীর মধ্যে সহানুভূতিসম্পন্ন র‍্যাণাডে আর বাঙ্গালীর মধ্যে প্রধান দুই বোনার্জ্জী এবং বানার্জ্জী (W. C. Bonerji এবং সুরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী) এবং ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয় (মিষ্টার মনোমোহন ঘোষ এবং মিঃ লালমোহন ঘোষ)। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ ইঁহাদের সকলের কথাই কঠোর সমালোচনার সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। এ ছাড়াও আরো অনেকে আছেন, তবে আলোচ্যকালে এঁরাই প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। কংগ্রেস-তরণীর এঁরাই তখনকার কর্ণধার। ইঁহাদের কাছে কংগ্রেস অবশ্যই বড় ঘটনা।

কিন্তু যাঁহার জীবনচরিত আলোচনা করা হইতেছে সেই তরুণ যুবক অরবিন্দের কাছে পাঁচ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই কংগ্রেস বড় ঘটনা নয়। যে-বৎসর তিনি বিলাত হইতে প্রথম দেশে ফিরিয়া আসিলেন সেই বৎসরেই প্রকাশ করিলেন যে, কংগ্রেস জাতির জীবনে বড় ঘটনা নয়; এবং উল্লিখিত সকল কংগ্রেস-নেতাই একযোগে জাতিকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিতেছেন! সর্ব্বনাশ! কংগ্রেসের এরূপ সুস্পষ্ট বিরুদ্ধ-সমালোচনা এক অরবিন্দ ব্যতিরেকে ভারতবর্ষে আর কেহই করেন নাই। কংগ্রেসের ইতিহাস যখন ঠিকমত লেখা হইবে, তখন নিশ্চয়ই অরবিন্দের এই প্রতিবাদকে সসম্ভ্রমে উল্লেখ করিতে হইবে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস-বিরোধী সমালোচনার মধ্যে আমরা যুবক অরবিন্দের মনকে খুঁজিয়া পাই; এবং সেই মনের অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে বুঝিতে পাই। তখনকার কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব লইয়াই ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ

পর্য্যন্ত কলিকাতা আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বরোদা-প্রবাসকালে তাঁহাকে শান্ত-সমাহিতচিত্তে বিস্তর পড়াশুনা করিতে দেখি, মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ করিতে দেখি; কলিকাতায় আসিয়া নিজের পছন্দমত ক'নে বাছিয়া হিন্দুমতে বিবাহ করিতে দেখি; এমন কি, স্বভাব-কবি তিনি, সুতরাং কবিতাও লিখিতে দেখি। কিন্তু দেখিনা তাঁহাকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আর কোন প্রবন্ধ লিখিতে, অথবা প্রকাশ্যে কোন রাজনীতি চর্চ্চা করিতে। বিলাত হইতে ফিরিয়া দেশের মাটীতে পা দিতে-না-দিতেই তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াই আবার পরক্ষণেই আচম্‌কা কেন যে নিভিয়া গেলেন তার কারণ নিশ্চয়ই আছে। হঠাৎ প্রজ্বলিত হইবার যেমন কারণ আছে, আবার হঠাৎ নির্ব্বাপিত হইবারও তেমনি কারণ আছে। বিনা কারণে ইহা ঘটে নাই। কি যে কারণ, তা নিতান্তই অনুমানসাপেক্ষ। গাইকওয়ারের অধীনে চাকরীও একটা কারণ হইতে পারে। শুধু র‍্যাণাডের ধমক্ একমাত্র কারণ না-ও হইতে পারে। তাঁহার মনের গতি লক্ষ্য করিতে হইলে আমাদিগকে এইসকল ঘটনা পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিতে হইবে। আর তাঁহার জীবনের অভাবনীয় গতিপথ লক্ষ্য করিয়া ঐ গতিপথকে যথাযথ অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে—জীবনচরিত-লেখকের এই ত কাজ।

স্বামী বিবেকানন্দ ও রাজনারায়ণ বসু: এইবার স্বামী বিবেকানন্দের এই বৎসরের গতিবিধি নিরীক্ষণ করা যাক। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের প্রথমেই আমরা স্বামীজীকে কাশ্মীরে দেখিতে পাই (৮ই সেপ্টেম্বর)। ৫ই নভেম্বর তাঁহাকে লাহোরে দেখিতে পাই। এবং লাহোর হইতে দেরাদুন, দিল্লী, আলয়ার, জয়পুর, খেতড়িতে দেখিতে পাই। খেতড়ির পরে অরবিন্দের কর্ম্মস্থল বরোদা হইতেও নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল, দেখিতে পাই। কিন্তু স্বামীজী শরীর অসুস্থ হওয়ায় বরোদায় যাইতে পারেন নাই। স্বামীজী বরোদায় গেলে অরবিন্দের সহিত নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ হইত, যেমন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভগিনী নিবেদিতার সহিত হইয়াছিল। ১৯০২ খৃঃ ভগিনী নিবেদিতা বরোদা গিয়াছিলেন। আমরা দেখিতেছি, স্বামীজীর সহিত অরবিন্দের বরোদাতে সাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগ আসিয়াও কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। ইহাকেই বলে ঘটনাচক্র। এই চক্র কখন কোন্‌দিকে কেন ঘুরে, তার কারণ অনেক সময় আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত। অল্প কিছুটা আমরা জানিতে পারি, এই মাত্র।

আমরা স্বামীজীকে কলিকাতার দিকে ফিরিতে দেখিতেছি এবং এই ফিরিবার

পথে, ৩রা জানুয়ারী তারিখে তাঁহাকে আমরা স্পষ্ট দেওঘরে দেখিতে পাইতেছি। দেওঘরে রাজনারায়ণ বসু তখন পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। ইহার পরের বৎসর (১৮৯৯ খৃঃ) সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ এই ৩রা জানুয়ারীর কাছাকাছি সময়ে দেওঘরে রাজনারায়ণ বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য রাজনারায়ণ বাবু স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। স্বামীজী রাজনারায়ণ বাবুর বাড়ীতে আসিয়া নিজে রন্ধন করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবু শয্যাশায়ী অবস্থাতেই স্বামীজীর ভোজনের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। বারান্দাটি ঘেরাও করিয়া দিয়াছিলেন। উভয়ের প্রতি উভয়ের একটা সম্ভ্রম-শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধের পরিচয় আমরা পাই। একজন আর একজনের নিকট অপরিচিত আগন্তুক নহেন। যেন উভয়েই উভয়ের মনের মানুষ। "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা", "জাতীয় গৌরব", "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা"র নিকট স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমাদরে পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের উপর এই দুই বৈদান্তিক হিন্দুর প্রভাব প্রচুর রেখাপাত করিয়াছে। স্বাজাত্যবোধ—স্বদেশের কল্যাণ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতেই অরবিন্দের লেখাতেই প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই। শ্রীঅরবিন্দের পরবর্ত্তী জীবনে "আর্য্য" পত্রিকার লেখাতে (১৯১৪ হইতে ১৯২১ খৃঃ) বেদান্ত আলোচনায় শ্রীঅরবিন্দকে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত অদ্বৈতবাদের কথঞ্চিৎ প্রতিবাদ করিতে দেখিতে পাই; এবং কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথায় যিনি "বেকন্ পড়িয়া বেদের সিদ্ধান্ত" করিয়াছেন, সেই রাজনারায়ণ বসুর "সগুণ ব্রহ্ম" প্রতিপাদন-মূলক বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতে দেখিতে পাই। রাজা রামমোহন এযুগে সর্ব্বপ্রথম বেদান্ত প্রচার করেন। তিনি শাঙ্কর অদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে, বেদান্ত আলোচনায় তিনি রাজা রামমোহন দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের শাঙ্কর অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ, তাহা রাজা রামমোহন ও স্বামী বিবেকানন্দের স্পষ্ট বিরোধী এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু ও এমন কি পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের অনুগামী। তবে শ্রীঅরবিন্দের প্রকাশ-ভঙ্গী পৃথক। প্রাঞ্জল আদৌ নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ৩রা জানুয়ারীর কাছাকাছি যদি রাজনারায়ণ বসুর সহিত দেখা করিয়া থাকেন, তবে ইহার ৮ মাস পরে সম্ভবতঃ অক্টোবর মাসে অরবিন্দ

দীনেন্দ্রকুমার রায়কে বাংলা শিখাইবার গুরুমহাশয় নিযুক্ত করিয়া কলিকাতা হইতে সঙ্গে লইয়া দেওঘর যাইবেন। রাজনারায়ণ বসুর সহিত অরবিন্দের সেই শেষ দেখা হইবে। এখানে এইটুকু বলিয়া রাখা ভাল যে, ১৮৯৮ খৃঃ রাজনারায়ণ বসুর সহিত জানুয়ারীর প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দের এবং অক্টোবর নাগাদ অরবিন্দের শেষ সাক্ষাৎ হয়।

রাজনারায়ণ বাবু কি অরবিন্দকে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাতের কথা সবিস্তারে বলেন নাই? স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবুর কিরূপ ধারণা, তাহা কি তিনি দৌহিত্রকে বলেন নাই? রাজনারায়ণ বাবুর মুখ হইতে স্বামীজী সম্বন্ধে যে-সকল অভিমত অরবিন্দ শুনিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা কি তিনি প্রভাবান্বিত হন নাই?

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা: ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী, স্বামী বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতায় আসিয়া প্রথম পদার্পণ করিলেন। ১১ই মার্চ্চ ষ্টার থিয়েটারমঞ্চে আহূত কলিকাতার বিদ্বজ্জন-সমক্ষে একটি বৃহৎ সভায় স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে পরিচয় করাইয়া দিলেন। অরবিন্দের জীবনচরিত আলোচনাপ্রসঙ্গে ইহা এক অতি স্মরণীয় ঘটনা। কেননা, ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বাংলায় গুপ্ত সমিতির প্রবর্ত্তক, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের অধ্যক্ষ, "বন্দে-মাতরম্" কাগজের সম্পাদক ও "বন্দেমাতরম্" মোকদ্দমার আসামী, পরে আলিপুর বোমার মামলার প্রধান আসামী এবং পরিশেষে "কর্ম্মযোগিন্" ও "ধর্ম্ম" পত্রিকার সম্পাদকরূপে যে অরবিন্দকে একের পর আর, ইতিহাসে পাইয়া আসিয়াছি—সেই অরবিন্দের সহিত ভগিনী নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এ যোগাযোগ বাংলার তৎকালীন চরমপন্থী রাজনীতির উপর প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেও, অন্য অনেক বিষয়েও (যেমন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকলা-পদ্ধতি) অরবিন্দের সহিত ভগিনী নিবেদিতার চিন্তা-ভাবনার সাদৃশ্য, অর্থাৎ এক কথায় মনের মিল ছিল। সুতরাং এই বৎসরে ভগিনী নিবেদিতার কলিকাতায় প্রথম আগমন অরবিন্দের জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা। সুতরাং ইহার উল্লেখ প্রসঙ্গক্রমে করিতে হইতেছে।

ভগিনী নিবেদিতাকে ষ্টার থিয়েটারের সভা উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র দেশবাসীর নিকট পরিচয় করাইয়া দিবার অব্যবহিত পরেই স্বামীজী দার্জ্জিলিঙ্ চলিয়া যান।

তাঁহার শরীর ভাল ছিল না। কিন্তু তৎকালে কলিকাতায় প্লেগের হাঙ্গামা উপস্থিত হওয়ায় তিনি ৩রা মে দার্জ্জিলিঙ্ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং অসহায় প্লেগ-রোগীদের সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থার জন্য তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে আহুতি দিবার জন্য উদ্যত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা একজন। স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে এদেশে পদার্পণ করিবার মাত্র তিন মাস পরে ভগিনী নিবেদিতা নিজের জীবন উপেক্ষা করিয়া প্লেগ-রোগীদের সেবায় সানন্দে আত্মনিয়োগ করিলেন। তখনকার দিনে ইহা অতি অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া সকলে মনে করিয়াছিল। আমাদের দেশের কোন অবতার পুরুষের পাশ্চাত্য শিষ্যাকে এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অদ্যাবধি কেহ দেখে নাই। ভগিনী নিবেদিতা অতুলনীয়া, তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত উৎসাহের আতিশয্যে এতদূর পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন—

"বেশান্ত নিবে সে নৈবেদ্য
অর্পিত যা নিবেদিতায় ?"

·········সুতরাং অন্যে পরে কা কথা ?

প্লেগ-রোগীদের সেবা করিতে হইলে টাকার প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দকে এই প্রশ্ন করা হইলে পর স্বামীজী প্রকৃত সন্ন্যাসীর মত উত্তর করিলেন— "আমি আগামী কল্যই আমার এই মঠের জমি বিক্রয় করিয়া প্লেগ-রোগীদের সেবার জন্য টাকা সংগ্রহ করিব" ("I will sell the Math to-morrow")। ভগিনী নিবেদিতা একথা শুনিলেন।

বোম্বাই-এ প্লেগ উপলক্ষ্যে আমরা তিলকের কার্য্যাবলী দেখিয়া আসিয়াছি। প্লেগ-রোগীদের সাহায্যকল্পে স্বামী বিবেকানন্দের চেষ্টা তিলকের অনুরূপ কার্য্যকেই অনুসরণ করিয়াছে। এক্ষেত্রে তিলক পূর্ব্বগামী।

স্বামীজীর আর আড়াই মাস মাত্র ভ্রমণ বাকী। তাহা হইলে আমরা ১৮৯৮।১৪ই আগষ্টে আসিয়া পৌঁছিব এবং সেই সঙ্গে অরবিন্দের জীবনের ২৬ বৎসর পূর্ণতা লাভ করিবে। আমরা অরবিন্দের জীবনের ২৬ বৎসর মধ্যেই কিছুকাল ঘুরপাক খাইতেছি। স্বামীজীর এই আড়াই মাস ভ্রমণকালে দু'একটি এমন ঘটনার উল্লেখ করিব, যাহার সহিত শ্রীঅরবিন্দের জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা কোন-না-কোন সময়ে এই উভয় চরিত্রের মধ্যে তুলনায় হয়তো বা একটা সাদৃশ্য, না হয়তো একটা বৈষম্য আমাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিবে।

কলিকাতায় প্লেগের হাঙ্গামা কিছু নরম পড়িলেই তিনি মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্ (ভগিনী নিবেদিতা) এবং আরও তিনজন পাশ্চাত্য শিষ্যা ও অপর কয়েকজন সন্ন্যাসী-শিষ্য লইয়া অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দেখিবার জন্য কাশ্মীর যাত্রা করিলেন। এদেশে নিবেদিতাকে লইয়া ইহাই তাঁহার প্রথম ভ্রমণ। ২৫শে জুন তাঁহারা কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে পৌঁছিলেন। ৪ঠা জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসে একটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান করিয়া ঐ দিনটিকে বিশেষ ভক্তির সহিত স্মরণ করিলেন। বিদেশের একটা জাতি যেদিন স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল সন্ন্যাসী সেই দিনটিকে স্মরণীয় বলিয়া অভিবাদন করিলেন। বিবেকানন্দের মায়াবাদ তাঁহার নিজের জাতির এবং পৃথিবীর অন্য জাতির স্বাধীনতা-অর্জ্জনকে জাতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া সম্মান করিল। আমেরিকার স্বাধীনতার সহিত ৪ঠা জুলাই তিনি পৃথিবীর সকল জাতির স্বাধীনতা কামনা করিলেন। জগৎ মায়া বলিয়া পৃথিবীর জাতিসকলের স্বাধীনতা-অর্জ্জন ব্যাপারটিকে কোন মতেই উপেক্ষা করিলেন না। ৪ঠা জুলাইয়ের প্রতি তিনি নিজে ইংরাজীতে একটি কবিতা পর্য্যন্ত লিখিলেন (* ক)। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টি স্বামীজীর পূর্ব্বে রাজা রামমোহনে আমরা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাইয়াছি, এবং সে-কথা সবিস্তারে বলাও হইয়াছে। একটি বিষয়ের

(* ক) On the 4th of July, 1898, he was travelling, with some American disciples, in Kashmir, and as part of a domestic conspiracy for the celebration of the day—the anniversary of the Declaration of Independence—he composed the following poem, to be read aloud at the early breakfast. The poem itself fell to the keeping of *Sthira Mata* :

> Behold the dark clouds melt away,
> That gathered thick at night, and hung
> So like a gloomy pall, above the earth !
> Before thy magic touch, the world
> Awakes. The birds in chorus sing
>
> * * * *
>
> Oh Sun ! today thou sheddest *Liberty* !
>
> * * * *
>
> The light of *Freedom* on mankind.
> Move on, Oh Lord, in thy resistless path !

প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। রামমোহন ও বিবেকানন্দে শাঙ্কর মায়াবাদ নিজের জাতির এবং অপর জাতির স্বাধীনতা অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় বাধা দেয় নাই—সাহায্য করিয়াছে।

১৮ই জুলাই স্বামীজীকে আমরা ইসলামাবাদে ফিরিয়া আসিতে দেখি। সেখান হইতে একা নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া অমরনাথ গমন করিলেন। পথিমধ্যে অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁবুর নীচে রাত্রি যাপন করিতে করিতে তাঁহারা ২রা আগষ্ট অমরনাথে গিয়া পৌঁছিলেন।

পথিমধ্যে কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশের ও আমাদের সামাজিক জীবনের তুলনা করিলেন (* খ)। দেশে একটা নেতা হইতে হইলে যে তার কি কর্ত্তব্য তাহা বলিলেন (* গ)। আলমোড়া থাকিতে একজন নিরীহ ভদ্রব্যক্তি স্বামীজীকে প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা

Till thy high noon o'erspreads the world,
Till every land reflect thy light,
Till men and women, with uplifted head,
Behold their shackles broken, and
Know, in springing joy, their life renewed !

(* খ) "You are so morbid you Westerns ! You worship sorrow ! All through your country I found that. Social life in the West is like a peal of laughter, but underneath it is a wail. It ends in a sob. The fun and frivolity are all on the surface : really, it is full of tragic intensity. Now here, it is sad and gloomy on the outside but underneath are carelessness and merriment."—[*The Master As I Saw Him*—by Nivedita p. 149]

(* গ) "The Swamiji said, 'I am persuaded that a leader is not made in one life. He has to be born for it. For the difficulty is not in organisation, and making plans ; the test, the real test, of a leader, lies in holding widely different people together, along the line of their common sympathies. And this can only be done unconsciously, never by trying'."
—[*Ibid ; pp. 150-151*]

করিলে স্বামীজী দৃপ্ত ভাষায় উত্তর করিলেন—'অত্যাচারীর গালে চর লাগাও (* ঘ)'।

অমরনাথে, মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শিব দর্শন করিলেন। নিবেদিতাও মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া নিবেদিতাকে স্বামীজী বলিলেন যে, শিব তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছেন (* ঙ)।

বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর (১৮৯৮।১৫ই আগষ্ট—১৯০০।১৪ই আগষ্ট):

দীনেন্দ্রকুমার রায়—'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' ★ মাদ্রাজ কংগ্রেস (১৮৯৮/ডিসেম্বর; সভাপতি—আনন্দমোহন বসু) ★ তিলকের কথা ★ বিপিনচন্দ্র পাল ★ স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা ★ রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যু ★ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস (১৮৯৯/ডিসেম্বর ; সভাপতি—রমেশচন্দ্র দত্ত) ★ তিলকের কথা ★ স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা]

দীনেন্দ্রকুমার রায়—'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' : ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাস হইতে দুই বৎসরের কিছু অধিককাল অরবিন্দের বরোদা-প্রবাসের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ'-এ আমরা পাই। দীনেন্দ্রকুমার বলেন যে, তিনি অরবিন্দকে বাংলা শিখাইবার জন্য এই সময় বরোদায় গিয়া তাঁহার সহিত বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং দীনেন্দ্রবাবু তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী। প্রত্যক্ষদর্শীর কথা নির্ভরযোগ্য বলিয়াই মনে হয়। অরবিন্দ পূজার ছুটীতে দেওঘর আসিয়াছিলেন। তখন রাজনারায়ণ বসু জীবিত। দেওঘর হইতে তিনি কলিকাতায় ন' মেসোর বাড়ীতে

(* ঘ) The Swami turned on him in surprised indignation. "Why thrash the strong, of course !"—he said. "You forget your own part in this *Karma*. Yours is always the right to rebel !"—[*The Master As I Saw Him* by Nivedita—p. 152]

(* ঙ) "The Swami had observed every rite of the pilgrimage, as he came along. He had told his beads ;

(কৃষ্ণকুমার মিত্র, ৬নং কলেজ স্কোয়ার) কয়েক দিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। অরবিন্দ কলিকাতা হইতে দীনেন্দ্রকুমারকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় দেওঘর যান। পরে সেখান হইতে তাঁহার কর্ম্মস্থল বরোদায় গমন করেন।

বাংলা শিখিবার জন্যই দীনেন্দ্রকুমারকে গুরুমহাশয় নিযুক্ত করিয়া অরবিন্দ বরোদায় সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। "তিনি কোনও সপ্তাহে দুই একদিন বাংলা পড়িতেন ; আবার দশ পনের দিন ধরিয়া বাংলা পুস্তক খুলিতেনও না।" —(অরবিন্দ-প্রসঙ্গ—পৃষ্ঠা ৪৯)। এখানে একটী প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। প্রশ্নটী এই— ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম সম্বন্ধে এবং সেই সম্পর্কে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে যে নিপুণ সমালোচনা তিনি করিয়াছিলেন, তাহাতে কি মনে হয় তিনি বাংলা জানিতেন না ? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে অনেক রকম কথা বলিয়াছেন। আমরা দীনেন্দ্রবাবুর কথাই মানিয়া লইতেছি : 'কথোপ-কথনের ভাষা তিনি ভাল বুঝিতে পারিতেন না'—'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অরবিন্দ নিজেই পড়িতেন, বেশ বুঝিতে পারিতেন।' দেশী বা বিলাতী সিভিলিয়ানরা খবরের কাগজ অথবা বাংলা নভেল পড়িবার জন্য দ্বিতীয় ভাগ না-পড়িয়াই যেরূপ সৌখীনভাবে বাংলা শিখিয়া থাকেন, অরবিন্দ সেরকম বাংলা শিখিতে চাহেন নাই। সুতরাং "ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি পুস্তকপাঠে মন সংযোগ করেন।"

বঙ্কিম-প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, অরবিন্দ ভারতচন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রকে প্রতিভাবান্ বলিয়াছেন। তাঁহার শিল্পরসবোধ ভারতচন্দ্রকে

---

kept fasts, and bathed in the ice-cold waters of five streams in succession, crossing the river-gravels on our second day. And now, as he entered the Cave, it seemed to him, as if he saw Siva made visible before him. Amidst the buzzing, swarming noise of the pilgrim-crowd, and the overhead fluttering of the pigeons, he knelt and prostrated two or three times, unnoticed ; and then, afraid lest emotion might evercome him, he rose and silently withdrew. He said afterwards that in these brief moments he had received from Siva the gift of *Amar*,—not to die, until he himself had willed it." —[*Ibid* ; p. 158-59]

অশ্লীল বলিয়া উপেক্ষা করে নাই। চারি বৎসর পর এখন আবার দেখিতেছি যে, তিনি পুনরায় 'অন্নদামঙ্গল' পাঠে মন সংযোগ করিলেন। 'অন্নদামঙ্গলের' মধ্য দিয়া তিনি বাঙালীর ধর্ম্ম-জীবন ও সাহিত্যের অনেকখানি পরিচয় পাইলেন। বাংলার শিবের মুখে তিনি নিশ্চয়ই শুনিলেন :

"চেতরে চেতরে চেত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ ॥
যে জন চেতনামুখী সেই সদাসুখী।
যে জন অচিত্তচিত্ত সেই সদা দুখী ॥
এত বলি অন্নদেহ কহিছেন শিব।
সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব ॥

......সেই সঙ্গে হীরা মালিনীর বেসাতির হিসাবও তিনি পাঠ করিয়াছিলেন।

"দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' ও 'লীলাবতী' তিনি পড়িয়াছিলেন। 'সধবার একাদশীর' নিমচাঁদ নিশ্চয়ই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এবং তখনকার বাঙালী শিক্ষিত সমাজের এক অতি realistic চরিত-চিত্রও তিনি দেখিয়াছিলেন। পরে 'লীলাবতী' পড়াইতে গিয়া দীনেন্দ্রকুমারকে কিরূপ গলদঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কথাই তুলিয়া দিতেছি :

"'দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' পড়াইবার সময় একটা ছড়ার ব্যাখ্যা করিতে আমাকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল :

'মদের মজাটি গাঁজা কাটি কচ্ কচ্,
মামীর পিরীতে মামা হ্যাঁকচ প্যাঁকচ।'

"ইহার ঠিক অনুবাদ করা, আমি ত দূরের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক দিগ্‌গজেরও অসাধ্য! বিস্তর চেষ্টা করিয়াও হ্যাঁকচ-প্যাঁকচ কি তাহা অরবিন্দকে বুঝাইতে পারি নাই। 'পিরীতের হ্যাঁকচ প্যাঁকচ' অরবিন্দ বোধ হয় জীবনে বুঝিতে পারিবেন না; পারিলে তাঁহার এ দুর্দ্দশা হইবে কেন?"

"স্বর্ণলতা পাঠ করিয়া অরবিন্দ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চিরপ্রবাসী বাঙ্গালীর ছেলে অরবিন্দ বাঙ্গালার গার্হস্থ্য-চিত্রে পরিতৃপ্ত হইবেন, ইহা বিস্ময়ের কথা নহে; কিন্তু এই উপন্যাসের শেষাংশ পাঠ করিয়া তাঁহাকে কিছু হতাশ হইতে দেখিয়াছিলাম। 'স্বর্ণলতা' পাঠ করিতে করিতে, শশাঙ্কশেখরের গৃহে যেখানে আগুন লাগিল সেই স্থানে আসিয়া অরবিন্দ পুস্তক বন্ধ করিলেন; বলিলেন,

গ্রন্থকার এই স্থানেই গল্পের 'আর্ট' নষ্ট করিয়াছেন। কথাটি কতদূর সঙ্গত সাহিত্যামোদী পাঠক তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।"

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে সাহিত্যামোদী পাঠকবর্গ ভাবিয়া দেখিলেও তাঁহাদের পক্ষে গল্পের আর্ট কোথায় নষ্ট হয় বুঝিয়া ওঠা সহজ নয়, কঠিন। অরবিন্দ বাংলা শিখিতে বসিয়া যে সূক্ষ্ম সমালোচকের দৃষ্টি দিয়া 'স্বর্ণলতা'কে দেখিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন—তাহা বঙ্গ-সাহিত্যামোদী পাঠকদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। অরবিন্দ হয়ত বাংলা-সাহিত্যের উপর এইরূপ আরও অনেক সমালোচনা মুখে মুখে দীনেন্দ্রবাবুর নিকট করিয়া থাকিবেন। অশঙ্কা হয় উহার সমস্তটা দীনেন্দ্রবাবুর লেখনীমুখে ফুটিয়া ওঠে নাই। আরও ছিল, আমরা পাই নাই।

"অরবিন্দ স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা প্রবন্ধগুলি পাঠে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেন। আমাকে (দীনেন্দ্রবাবুকে) বলিতেন, স্বামীজীর ভাষায় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, ভাষার ভাবের এরূপ ঝঙ্কার, শক্তি ও তেজ অন্যত্র দুর্লভ।"

" 'বর্ত্তমান ভারত' ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য বাংলা প্রবন্ধ স্বামী বিবেকানন্দ লেখেন নাই, আর যা তাঁহার বাংলা লেখা আছে সেগুলিকে প্রবন্ধ বলা চলে না।" সম্ভবতঃ দীনেন্দ্রবাবু স্বামী বিবেকানন্দের সমস্ত বাংলা লেখাই প্রবন্ধ পর্য্যায়ে ফেলিয়া থাকিবেন। তা যা-ই হউক, অরবিন্দ ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দের বাঙ্‌লা লেখার উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন, ইহা বুঝা গেল।

দীনেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন, "অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলীও কিনিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। আমাদের এই কোকিল-কবির প্রতি তিনিও যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সকল কবিতাই প্রকাশের যোগ্য বলিয়া তাঁহার মনে হইত না।" দীনেন্দ্রবাবু রবীন্দ্রনাথকে মাত্র 'কোকিল-কবি' বলিয়াছেন। ইহা হয়ত অনেকের মনঃপূত হইবে না। দীনেন্দ্রবাবুর নিকট অরবিন্দের বাঙ্‌লা শিক্ষার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণ পরিচয় বলিয়া মানিয়া লইতে ইচ্ছা হয় না। দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী" ও "লীলাবতী" পাঠের কথা দীনেন্দ্রবাবু খোলাখুলি বলিয়াছেন, কিন্তু বসুমতী আফিস হইতেই যদি দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী আনা হইয়া থাকে তবে

তাহার মধ্যে "নীলদর্পণ"ও ছিল। সুতরাং "নীলদর্পণ" বাদ দিয়া নিশ্চয়ই অরবিন্দ দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী পড়েন নাই। যিনি চার বৎসর পূর্ব্বে এক অত্যাচারী নীলকর সাহেবকে সায়েস্তা করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" পাঠে যথেষ্ট মনঃসংযোগ করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু "নীলদর্পণের" অনুল্লেখের একটা হেতু এই মনে হয়—দীনেন্দ্রবাবু ১৯২৩ খৃষ্টাব্দেও অরবিন্দের জীবনে রাজনীতির ছোঁয়াচটা বেমালুম অস্বীকার বা মুছিয়া ফেলিবার পক্ষপাতী। কেননা, "নীলদর্পণ" শুধু নাটক বা আর্ট নয়। ইহা এক ভয়ঙ্কর বস্তু। আজ বাংলার তরুণ সাহিত্যের যুগে ইহার গুরুত্ব বোঝা কঠিন। দীনেন্দ্রবাবুর পক্ষেও হয়ত ইহা বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছিল। কেননা, ইহা—

"নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-
ক্ষেমকরেণ-কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম্।"

দীনেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অরবিন্দ নিজেই পড়িতেন; বেশ বুঝিতে পারিতেন।" দীনেন্দ্রবাবুর সার্টিফিকেট পড়িয়া হাসি পায়। এবং স্পষ্ট বোঝা যায় যে, চার বৎসর পূর্ব্বে অরবিন্দ বঙ্কিম সম্বন্ধে যে সাতটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই অবগত ছিলেন না। দীনেন্দ্রবাবুর নিকট অরবিন্দ বঙ্কিম আদৌ পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কেননা, দীনেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন—উহা তিনি নিজেই পাঠ করিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, অরবিন্দ তাঁহার বাঙলার গুরুমহাশয়কে বঙ্কিম সম্বন্ধে তাঁহার সাতটী প্রবন্ধের কথা কিছুই বলেন নাই। যদিও চার বৎসর পূর্ব্বেই অরবিন্দ দীনেন্দ্রবাবু অপেক্ষা বঙ্কিম সম্বন্ধে অনেক কিছু বেশী জানিতেন। ইহার প্রমাণ আমরা বঙ্কিম-প্রবন্ধেই পাইয়াছি। দীনেন্দ্রবাবু "অরবিন্দের সহিত প্রথমসাক্ষাতে বড়ই নিরাশ হইয়াছিলেন।" কেননা—"পায়ে শুঁড়ওয়ালা সেকেলে নাগরা জুতা, পরিধানে আহমদাবাদের মিলের বিশ্রী পাড়ওয়ালা মোটা ধাদি, কাছার আধখানা খোলা, গায়ে আট মেরজাই, মাথার লম্বা লম্বা গ্রীবাবিলম্বিত বাবরীকাটা পাতলা চুল, মধ্যে চেরা সিঁথি, মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ, চক্ষুতে কোমলতা-পূর্ণ স্বপ্নময় ভাব, শ্যামবর্ণ ক্ষীণদেহধারী এই যুবক ইংরাজী, ফরাসী, লাটিন, হিব্রু, গ্রীকের সজীব ফোয়ারা শ্রীমান্ অরবিন্দ ঘোষ। দেওঘরের পাহাড় দেখাইয়া বলি কেন

বলিত—'ঐ হিমালয়', তাহা হইলেও বোধ হয়, ততদূর বিস্মিত ও হতাশ হইতাম না।"

দীনেন্দ্রবাবু প্রকৃত আর্টিষ্টের মত অরবিন্দের তখনকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটা সজীব চিত্র দিয়াছেন। অরবিন্দ-শিষ্য এক মতিলাল রায় ভিন্ন ইহা আর কেহ পারেন নাই। অরবিন্দের অনুজ বারীন্দ্রকুমার ঘোষও নহেন। যদিও অন্য অপেক্ষা তিনি অরবিন্দের সহিত বরোদা, কলিকাতা ও পণ্ডিচারীতে অনেক বেশী সময়—দীর্ঘ বৎসর একত্র বাস করিয়াছিলেন। দীনেন্দ্রবাবু বলিতেছেন যে—

(১) "প্রভাতে তিনি প্রত্যহ এক গ্লাস ইসবগুল মিশ্রিত জলপান করিতেন। ইসবগুল ভিন্ন তাঁহার একদিনও চলিত না। বরোদার বাজারে উহার অভাব হইলে স্থানান্তর হইতেও আনাইয়া লইতেন। ব্যায়ামে তাঁহার অনুরাগ ছিল না, তবে প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রায় এক ঘণ্টা বারান্দায় দ্রুত পায়চারী করিতেন। তিনি সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন, কিন্তু স্বয়ং গান-বাজনা জানিতেন না।"

(২) "অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কাব্যালোচনায় রত থাকিতেন বলিয়া অরবিন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইতে একটু বেলা হইত। চারি পাঁচ টাকা মূল্যের একটা মুখখোলা 'ওয়াচ' সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে থাকিত; পড়িবার টেবিলে একটী ছোট টাইমপীস্ ঘড়ি থাকিত। অরবিন্দ সকালে চা খাইয়া কবিতার খাতা খুলিয়া বসিতেন। এই সময়ে তিনি মহাভারতের অনুবাদ করিতেছিলেন। বাঙ্গলা ভাল বুঝিতে না পারিলেও, সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত তিনি সুন্দর বুঝিতে পারিতেন।"

(৩) "ছোট আকারের 'গ্রে-গ্রানাইট' রঙের চিঠি-লেখার কাগজে প্রথমে কবিতাগুলি লিখিতেন; প্রায়ই কাটাকুটি করিতেন না। লিখিবার পূর্ব্বে সিগারেট টানিতে টানিতে খানিকটা ভাবিয়া লইতেন, তাহার পর তাঁহার লেখনীমুখে ভাবের মন্দাকিনী প্রবাহিত হইত। তিনি দ্রুত লিখিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু লিখিতে আরম্ভ করিয়া লেখনীকে বিরাম দিতেন না। সে সময়ে কেহ তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিরক্ত হইতেন; কিন্তু সে বিরক্তি অন্যে বুঝিতে পারিত না।"

(৪) "বেলা প্রায় দশটা পর্য্যন্ত লেখাপড়া করিয়া অরবিন্দ স্নানাগারে প্রবেশ করিতেন। স্নানের পর পুনর্ব্বার খাতা লইয়া বসিতেন

এবং সকালে যতটুকু লেখা হইত, তাহারই আবৃত্তি করিতেন। কোনও কোনও ছত্র দুই তিনবার পাঠের পর, আবশ্যক মনে হইলে, তাহার দুই একটী শব্দের পরিবর্ত্তন করিতেন। এগারটার পূর্ব্বেই টেবিলে খানা আসিত। আহার করিতে করিতে অরবিন্দ সংবাদপত্র দেখিতেন। বরোদা-রাজ্যের খাদ্য আমার মুখে রুচিত না; কিন্তু অরবিন্দ তাহাতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। এক একদিন রান্না এমন কদর্য্য হইত যে, তাহা মুখে তুলিতে পারা যাইত না! কিন্তু অরবিন্দ অকুণ্ঠিত ভাবে তাহা গলাধঃকরণ করিতেন; পাচকের নিকট একদিনও তাঁহাকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে দেখি নাই। তিনি বাংলা দেশের রন্ধনেরই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন; অনেক সময় আমাদের রান্নার প্রশংসা করিতেন। একটা তরকারী, ভাজা, ডাল, মাংস বা মাছ, রুটী ও ভাত—ইহাই প্রত্যহ খাইতে হইত। ভাতের পরিমাণ কম, রুটীর পরিমাণ অধিক। ভাতটা যেন একটা উপলক্ষমাত্র—না হইলেও তাঁহার চলিত মনে হয়। প্রত্যহ দুই বেলা মাংস অসহ্য মনে করিয়া, একবেলা মাংস ও অন্য বেলা মাছ খাইতেন। ঠাকুর কোনও কোনও দিন চাটনীও করিত, কিন্তু হয় তাহাতে ঝাল, না হয় লবণ বেশী দিয়া লেহনের অযোগ্য করিয়া তুলিত। পাচক যেভাবে মাংস রাঁধিত তাহা 'কারি'ও নহে 'কালিয়া'ও নহে—না ঝোল, না চড়চড়ি; অতিরিক্ত মশলা দিয়া সে তাহা অখাদ্য করিয়া তুলিত।… অরবিন্দ অত্যন্ত অল্পাহারী ছিলেন। অল্পাহারী ও মিতাচারী ছিলেন বলিয়াই গুরুতর মানসিক পরিশ্রমেও তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন ছিল।"

(৫) "অরবিন্দের একখানি 'ভিক্টোরিয়া' গাড়ী ছিল। ঘোড়াটা খুব বড়, কিন্তু চলনে গাধার দাদা! চাবুকেও তাহার গতিবৃদ্ধি হইত না! গাড়ীখানি যে কত কালের তাহা কেহ বলিতে পারিত না। অরবিন্দর সকলই বিচিত্র! যেমন পোষাক পরিচ্ছদ, তেমনই গাড়ী, তেমনই বাড়ী।…অরবিন্দ আহারান্তে কলেজে চলিয়া যাইলে সেই নির্জ্জন বাসায় একাকী থাকিতে আমার কষ্ট হইত।"

(৬) "গ্রীষ্মকালে দুঃসহ রৌদ্রে খাপরা তাতিয়া আগুনের মত হইত। আবার শীতকালে এমন কন্‌কনে শীত যে, যেন বুকের রক্ত পর্য্যন্ত জমিয়া যাইবার উপক্রম হইত! কিন্তু অরবিন্দ শীত, গ্রীষ্মে সমান নির্ব্বিকার! কি শীতে, কি গ্রীষ্মে একদিনও তাঁহাকে কাতর দেখি নাই। এই বাঙ্গলোতে দিনে মাছি ও রাত্রে মশার উপদ্রবে আমি অস্থির হইয়া উঠিতাম। রাত্রে শয্যার

শয়ন করিয়া মনে হইত, মশাগুলা আমাকে মাঠে টানিয়া লইয়া গিয়া শোষণ করিবে। ঘরের খাপরাগুলি পুরাতন; ঘরখানি বহুদিন অসংস্কৃত অবস্থায় খালি পড়িয়া ছিল। বর্ষাকালে খাপরার ভিতর দিয়া মেঝেতে টুপ টাপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িত। আমাদের দেশের অনেক বড়লোকের গোশালাও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান। কিন্তু এমন কদর্য্য গৃহে বাস করিতে অরবিন্দের বিন্দুমাত্র আপত্তি বা কুণ্ঠা দেখি নাই। তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে দীর্ঘকাল সেই জীর্ণ গৃহে বাস করিয়াছিলেন। অরবিন্দ রাত্রি একটা পর্য্যন্ত দুঃসহ মশক-দংশন উপেক্ষা করিয়া, টেবিলের ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া, 'জুয়েল ল্যাম্পে'র আলোকে সাহিত্যালোচনা করিতেন। তাঁহাকে পুস্তকের উপর বদ্ধ-দৃষ্টি অবস্থায়—একই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সেই স্থানে উপবিষ্ট দেখিতাম। যোগনিমগ্ন তপস্বীর ন্যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ঘরে আগুন লাগিলেও বোধ হয় তাঁহার হুঁস হইত না! তিনি এইভাবে প্রতিদিন রাত্রি জাগরণ করিয়া ইউরোপের নানা ভাষার কত কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন পাঠ করিতেন, তাহার সংখ্যা ছিল না। অরবিন্দের পাঠাগারে ইউরোপের নানা ভাষার গ্রন্থ স্তূপীকৃত ছিল। ফরাসী, জার্ম্মাণ, রাশিয়ান, ইংরাজী, গ্রীক, লাটিন, হিব্রু প্রভৃতি কত ভাষার কত রকমের পুস্তক, তাহার পরিচয় আমার জানা ছিল না। চসার হইতে সুইন্‌বরণ পর্য্যন্ত সকল ইংরাজ-কবির কাব্যগ্রন্থ তাঁহার পাঠাগারে সঞ্চিত ছিল। অসংখ্য ইংরাজী উপন্যাস আলমারীতে, গৃহকোণে, ষ্টীল্‌ট্রাঙ্কে পুঞ্জীভূত ছিল। হোমারের ইলিয়াদ, দান্তের মহাকাব্য, আমাদের রামায়ণ মহাভারত, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থাবলী সমস্তই অরবিন্দের পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল। রুশিয় ভাষার তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন, কি চিত্রশিল্পে কি সাহিত্যে, রুশিয়া একদিন ইউরোপের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। কথাটা আমার নূতন মনে হইত। তিনি কোনও সপ্তাহে দুই একদিন বাঙ্গলা পড়িতেন; আবার দশ পনের দিন ধরিয়া বাঙ্গলা পুস্তক খুলিতেনও না।"

(৭) "অরবিন্দ কখনও সাজ-পোষাকের পক্ষপাতী ছিলেন না; বিলাসিতার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না; এমন কি রাজ-দরবারে যাইবার সময়েও তাঁহাকে সাধারণ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে দেখি নাই। মূল্যবান জুতা, জামা, টাই, কলার, ফ্লানেল লিনেন, পঞ্চাশ রকম আকারের কোট, হ্যাট, ক্যাপ—এ সকল তাঁহার কিছুই ছিল না। কোনও দিন তাঁহাকে হ্যাট ব্যবহার করিতে দেখি

নাই। যে টুপীগুলি এদেশে "পিরালী টুপী" নামে সাধারণতঃ পরিচিত, তিনি তাহাই ব্যবহার করিতেন।"

(৮) "তাঁহার শয্যাও তাঁহার পরিচ্ছদের ন্যায় নিতান্ত সাধারণ ও আড়ম্বর-হীন ছিল। তিনি যে লৌহ খট্টায় শয়ন করিতেন, ত্রিশ টাকা মূল্যের কেরাণীও সে খট্টায় শয়ন করা অগৌরবের বিষয় মনে করে! কোমল ও স্থূল শয্যায় শয়নে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। বরোদা মরুসন্নিহিত স্থান বলিয়া সেখানে শীত গ্রীষ্ম উভয়ই অত্যন্ত প্রবল; কিন্তু মাঘ মাসের শীতেও অরবিন্দকে কোনও দিন লেপ ব্যবহার করিতে দেখি নাই। "কম্বলবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"—অরবিন্দ অল্প মূল্যের সাধারণ কম্বলে লেপের অভাব পূর্ণ করিতেন। পাঁচ সাত টাকা মূল্যের একখানি নীল আলোয়ান তাঁহার শীতবস্ত্র ছিল। যতদিন তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য-নিরত পরদুঃখকাতর আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য কিছু মনে হইত না; যেন জ্ঞানসঞ্চয়ই তাঁহার জীবনের ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কর্ম্মকোলাহল-মুখরিত সংসারে থাকিয়াও যেন তিনি কঠোর তপস্যায় মগ্ন।"

সমস্ত দিন রাত্রির মোটামুটি একটা হিসাব পাওয়া গেল। অরবিন্দ তখন কলেজে অধ্যাপক। বাড়ীতে কবিতা লেখেন। বিস্তর পড়াশুনা করেন।

দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন—"অরবিন্দের কর্ম্মজীবনের প্রথমাংশ কয়েক বৎসর বরোদায় অতিবাহিত হইয়াছিল। বরোদায় তাঁহার প্রবাস-যাপনসম্বন্ধে তাঁহার জীবন-আখ্যায়িকা লেখকগণের আলোচনাযোগ্য কোন কথা জানিবার সম্ভাবনা আছে কিনা সন্দেহ। কারণ, সেই সুদীর্ঘকাল বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার প্রায় কোন সম্বন্ধ ছিল না; বরং তাঁহার মারাঠী বন্ধুরা তাঁহার জীবনের সেই সময়ের ঘটনা কিছু কিছু অবগত আছেন। আমিও অল্প যাহা জানি তাহা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল।"

সুতরাং দীনেন্দ্রকুমারের কথা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীঅরবিন্দের (১৮৯৩—১৯০৬ খৃঃ) এই ১৪ বৎসরের বরোদা-প্রবাসের ইতিহাস বাঙ্গালীরা কেহই কিছু জানে না, এবং জানিতে পারিবেও না। অবশ্য মারাঠীরা কেহ কেহ কিছু কিছু জানেন, তবে তাহাতে বাঙ্গালীর কি? আর দীনেন্দ্রবাবু, অবশ্য তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ যাহা অভিজ্ঞতা আছে—বাঙ্গালী পাঠককে অকপটে বিতরণ করিয়াছেন।

তারপর দীনেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন—

"ব্যারিষ্টার নর্টন সাহেব তাঁহাকে রাজদ্রোহী প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভারতের দরিদ্র প্রজার শোনিততুল্য সহস্র সহস্র মুদ্রা 'শ্যাম্পেন'-পানি অপেক্ষাও সহজে গলাধঃকরণ করিবেন, বোমার মামলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে একথা আমার কল্পনার অতীত ছিল।...অরবিন্দকে রাজদ্রোহী প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমলা-তন্ত্রের এই আয়োজনে আমরা বিস্মিত হই নাই।...অরবিন্দ এইরূপ খ্যাতি বা অখ্যাতি লাভ করিবার পর ইংরাজি ও বাঙ্গালা অনেক কাগজে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই বাহির হইয়াছে। শুনিলাম, কিছুদিন পূর্ব্বে কে একজন পালিত তাঁহার একখানি জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া দেশবিদেশে তাঁহাকে পরিচিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অরবিন্দ এখনও যৌবনের সীমা অতিক্রম করেন নাই, এখনও তাঁহার জীবনাখ্যায়িকা লিখিবার সময় আসে নাই। বিশেষতঃ জীবিত ব্যক্তির জীবনচরিত প্রকাশ নানা কারণে সঙ্গতও নহে; তবে গরজ বড় বালাই। যাঁহার জীবনের কাহিনী বিক্রয় করিলে দু'পয়সা লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাঁহাকে অসময়ে আসরে নামাইয়া নাচাইবার লোভ সংবরণ করা অনেকেরই পক্ষে কঠিন। কিন্তু তাঁহার কথা শুনিবার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেন; এবং আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে বাঙ্গালাদেশে যাহারা মানুষের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা অরবিন্দের জীবনকথার আলোচনা করিয়া আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিবে। এই জন্যই অরবিন্দ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতা সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের পর লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি।"

দীনেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে, "অরবিন্দ রাজদ্রোহী একথা আমার কল্পনার অতীত ছিল।" আবার পরক্ষণেই লিখিতেছেন, "আমলাতন্ত্রের এই আয়োজনে আমরা বিস্মিত হই নাই।" এই "আমরা" কে কে, তাহা তিনি খুলিয়া লিখিয়া যান নাই। আমাদের কথা এই, যাহা তাঁহার "কল্পনার অতীত" ছিল, ঠিক তাহাই ঘটিতে দেখিয়া তিনি কেন যে বিস্মিত হইলেন না—ইহাই আমাদের নিকট এক অপূর্ব্ব বিস্ময়! দেখিতেছি, আমলাতন্ত্র এবং অরবিন্দ, এই উভয়ের সম্পর্কেই দীনেন্দ্রবাবুর ধারণা অত্যন্ত কাঁচা। অরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্য্যকলাপ সম্পর্কে—১৮৯৯, ১৯১১ এবং ১৯২৩ খৃঃ এই কোন সময় সম্বন্ধেই তাঁহার ধারণা মিথ্যা কল্পনারাজ্যকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে হয় তিনি সত্যকে গোপন করিয়াছেন, অথবা তিনি

কিছুই জানিতেন না। কোন জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে এ দুই-এর যে-কোন একটাই অতি দুরপনেয় কলঙ্ক।

দীনেন্দ্রবাবু অরবিন্দের সঙ্গে বরোদা থাকাকালে কয়েকজন দেশবিখ্যাত লোকের সঙ্গে বরোদাতেই অরবিন্দের সাক্ষাত-পরিচয় ঘটে। দীনেন্দ্রবাবু তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। একজন রমেশচন্দ্র দত্ত। তিনি অরবিন্দের মহাভারত অনুবাদের উচ্চপ্রশংসা করিয়াছিলেন। পরে যখন মিঃ দত্ত বরোদা-রাজ্যের দেওয়ানীপদে কার্য্য করিতেছিলেন সেই সময় (১৯০৬ খৃষ্টাব্দে) অরবিন্দ বরোদা হইতে বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য অধ্যাপনার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলায় চলিয়া আসেন। চিত্রকর শশীকুমার হেসের সঙ্গেও অরবিন্দের ঘনিষ্ট পরিচয় হয়। দীনেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন :

"অরবিন্দের সহিত পূর্ব্বে তাঁহার পরিচয় না থাকিলেও অরবিন্দের মেসো-মহাশয় "সঞ্জীবনী"-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহিত তিনি অতি ঘনিষ্ঠ-ভাবেই পরিচিত ছিলেন। তিনি যখন ইউরোপে ছিলেন সেই সময় তাঁহার লিখিত বিলাতের পত্র প্রায় প্রতি সপ্তাহে 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত হইত। শশী-কুমারবাবু চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য অনেকদিন ইটালীর ফ্লরেন্স ও মিউনিক নগরে ছিলেন; প্যারিসেও দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। প্যারিসে অবস্থান-কালে তিনি একটি ফরাসী মহিলার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া মিস্ ফ্লামার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শশীকুমার বাবু সাধারণ সমাজভুক্ত ব্রাহ্ম; কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীলা ফরাসী মহিলার সহিত 'ব্রাহ্মমতে' শশীকুমারের বিবাহ হয়—সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অনেকেই ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রেম তাঁহারা তেমন উদারভাবে ও অনুকুলচক্ষে দেখেন নাই। এজন্য শশীকুমার আমাদের কাছে বড়ই দুঃখ করিতেন। কিন্তু অরবিন্দ আমাকে বলিয়াছিলেন—এইরূপ বিবাহে আপত্তি করিয়াছেন বলিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোকদেরও দোষ দেওয়া যায় না। যাহা হউক, মহদাশয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সদাশয়তায় ও অনুগ্রহে মিস্ ফ্লামা নির্ব্বান্ধব কলিকাতায় বিপন্ন হন নাই, এবং পরে তাঁহাদের বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল। শশীকুমার-বাবু তাঁহার প্রণয়িনীর সহিত ফরাসী ভাষাতেই পত্র ব্যবহার করিতেন, কারণ মিস্ ফ্লামা বাঙ্গলা বা ইংরেজী জানিতেন না। শশীকুমার ফরাসী ও ইটালীয় সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইলেও ইংরাজী ভাল জানিতেন না, এমন কি, আমাদের

সহিত আলাপ করিবার সময় তিনি বেশ তাড়াতাড়ি ইংরাজী বলিতে পারিতেন না। অরবিন্দ আমাকে বলিয়াছিলেন—শশীকুমার চিত্রকর, এ পরিচয় না পাইলেও তাঁহাকে দেখিয়াই তিনি বলিতে পরিতেন—এই যুবক চিত্রকর। তাঁহার চেহারায় যথেষ্ট অসাধারণত্ব ছিল। প্রথম দর্শনে সাহেবী পোষাকে শশীকুমারকে আমি বাঙ্গালী বলিয়া বুঝিতে পারি নাই; এমন গৌরবর্ণ বাঙ্গালীর ভিতর খুব অল্পই দেখা যায়। অরবিন্দ বলিয়াছেন—শশীকুমারকে দেখিয়া ইটালিয়ান বলিয়া ভ্রম হয়। তাঁহার গোঁফদাড়ি একটু কটা ছিল।...

"আমি প্রায় প্রত্যহই শশীকুমারের সঙ্গে অপরাহ্লে 'গেষ্ট হাউসে' বেড়াইতে যাইতাম। এক একদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের গল্প হইত। অরবিন্দও মধ্যে মধ্যে যাইতেন। তিনি শশীকুমারের স্বদেশ-প্রেম, সাহিত্যানুরাগ ও চিত্রকলাভিজ্ঞতার প্রশংসা মুক্তকণ্ঠেই করিতেন; কিন্তু তাঁহার বিলাসপ্রিয়তার সমর্থন করিতেন না।...তিনি বরোদার 'গেষ্ট হাউসে' অরবিন্দকে দুই তিন দিন সম্মুখে বসাইয়া তাঁহার একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তুলির দুই একটি টানে মূর্ত্তিখানি যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছিল।"

দেখা যাইতেছে যে, দীনেন্দ্রবাবুর কথা সত্য হইলে, 'অজ্ঞাতকুলশীলা ফরাসী মহিলার' সহিত "ব্রাহ্মমতে" শশীকুমারের বিবাহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা আপত্তি করায় অরবিন্দ এই আপত্তির বিরুদ্ধে ত' কিছুই বলিলেনই না, বরং এই আপত্তি তিনি সমর্থন করিলেন। ইহা এই জন্য সম্ভব মনে করি যে, ১৮৯৪ খৃঃ হইতেই তিনি বঙ্কিমের নভেল পড়িয়া বাঙ্গালী হিন্দু মেয়েদের উপর খুব বেশী শ্রদ্ধা পোষণ করিতেছেন এবং এমন কি বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে যাহারা ফেরঙ্গভাবাপন্ন 'ফ্লার্টেশন' (flirtation)পটু এবং 'ড্রয়িংরুমের পিয়ানো-বিলাসিনী', তাহাদিগকে আদৌ সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। একথা আমরা পূর্ব্বেও তাঁহার লেখা হইতে প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি।

তারপর একবার কলিকাতা আসিলে দীনেন্দ্রবাবু অরবিন্দকে লইয়া "সাহিত্য"-সম্পাদক তীক্ষ্ণধার সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সহিত দেখা করিতে যান। দীনেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"অল্পভাষী অরবিন্দের দুই চারিটি কথা শুনিয়াই সমাজপতি মহাশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন অরবিন্দের হৃদয় কি উপাদানে নির্ম্মিত। প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময় অরবিন্দ বরোদার সংশ্রব ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলে স্বদেশপ্রেমিক সমাজপতি মহাশয়ের সহিত তাঁহার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল।"

দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন যে—'বসুমতী'-সম্পাদক পাঁচকড়িবাবুর "সরস টিপ্পনি পাঠ করিয়া অরবিন্দ খুব আমোদ পাইতেন"। পাঁচকড়িবাবু ও সুরেশ সমাজপতির মতিগতি সুস্পষ্ট রকমে ব্রাহ্ম-বিরোধী ছিল; অথচ অরবিন্দ এই দুইজনের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজ অপেক্ষা স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত নব্য হিন্দুত্বের আবহাওয়াই তখন অরবিন্দের মনকে আন্দোলিত করিতেছিল।

তারপর আসিলেন আর একজন বাঙ্গালী যুবক। তাঁহার নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি 'বাঘা যতীন' (মুখোপাধ্যায়) নহেন; তথাপি—'চিতাবাঘ' বলিয়াই মনে হয়। তিনি পরিশেষে 'নিরালম্ব স্বামী' হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। বিপ্লববাদী রাজনীতিকেরা—নিরাশ প্রণয়ীর মত শেষ-জীবনে 'যোগী' সাজিয়া ধর্ম্মে মন দেন। আমাদের দেশে ইহা সাধারণ ঘটনা। যতীন্দ্রনাথ সৈন্যবিভাগে ঢুকিবার জন্য বরোদায় গিয়াছিলেন। দীনেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন ঃ

"একটি দীর্ঘকায় বলবান বাঙ্গালী যুবক একটি লোটা ও লম্বা লাঠি সম্বল করিয়া বরোদা ক্যাম্পে আমাদের বাসায় উপস্থিত হয়। তাহার নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহার বাড়ী কোথায়, সংসারে কে আছে, কি উদ্দেশ্যে সে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা আমাদের কাছে প্রকাশ করে নাই। প্রথমে সন্দেহ হইয়াছিল—লোকটা হয়ত গোয়েন্দা। তাহার অল্পদিন পূর্ব্বে র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যাকাণ্ড লইয়া দক্ষিণ-ভারতের সর্ব্বত্র ভয়ানক হৈ-চৈ আরম্ভ হইয়াছিল; বিপ্লববাদীদের সন্ধানে চারিদিকে অসংখ্য গোয়েন্দা ঘুরিতেছিল।...

"যতীন্দ্রনাথের সাহস, উত্তম, উচ্চাভিলাষের পরিচয় পাইয়া অরবিন্দ বিস্মিত হইলেন, এবং সে যাহাতে সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে পারে—সেজন্য যথেষ্ট আগ্রহও প্রকাশ করিলেন। ফৌজে বাঙ্গালীর প্রবেশ নিষেধ বলিয়া যতীন্দ্রনাথ স্বীয় বাঙ্গালীত্ব গোপন করিয়া পুরুবিয়া ব্রাহ্মণ সাজিল এবং বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বন্দ্য'টুকু উহ্য রাখিয়া 'উপাধ্যায়' এই লাঙ্গুলটুকু নিজের নামে যোগ করিয়া অরবিন্দের বন্ধু লেফ্‌টেনাণ্ট মাধব রাও যাদবের শরণাপন্ন হইল, যদি তিনি দয়া করিয়া তাহাকে সাধারণ পদাতিক সৈন্যরূপেও গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করেন। অরবিন্দ বলিয়াছিলেন—যদি কোন স্বাধীন দেশ হইত এবং যতীন্দ্রনাথ সমর-

বিভাগে প্রবেশের সুযোগ পাইত, তাহা হইলে কালে সে বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারিত; কিন্তু হায়, বাঙ্গালীর ছেলে মসীজীবী হইবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ না করিয়া অসিজীবী হইবার আশায় সারা ভারত চষিয়া বেড়াইতেছে। তাহার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছিল কি-না বলিতে পারি না, কারণ তাহার পরই আমি দেশে ফিরিয়া আসি। কিন্তু গোয়েন্দার দল যে তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিল—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি বরোদা ত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্বে কোথা হইতে হঠাৎ এক টেলিগ্রাম পাইলাম, তাহার উত্তর দেওয়ার খরচা পর্য্যন্ত আগাম দেওয়া হইয়াছিল। টেলিগ্রামে লেখা ছিল—'মিলিটারী যতীন্দ্রনাথ কোথায়, এবং সে কি করিতেছে, জানাও।' এত লোক থাকিতে আমার কাছে টেলিগ্রাম পাঠাইবার কারণ বুঝিতে পারিলাম না; আমার নামঠিকানাই বা কর্তারা কিরূপে পাইল? যাহা হউক, এই টেলিগ্রামের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। যতীন্দ্রনাথের আর কোন সংবাদও আমি পাই নাই।"

দীনেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"যাঁহারা অরবিন্দকে প্রকাণ্ড রাজদ্রোহী বা বিপ্লববাদের প্রবর্ত্তক মনে করিয়া তাঁহার প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতেন—এবং হয়ত এখনও করিয়া থাকেন, তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, অরবিন্দের পুস্তকাগারস্থ সেই গ্রন্থস্তূপের মধ্যে বিপ্লববাদের সমর্থক কোনও গ্রন্থ—revolutionary literature—আমি কোনও দিন দেখিতে পাই নাই। মহামহিমান্বিত ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি অবজ্ঞাসূচক কোনও উক্তি কোনও দিন তাঁহার মুখে শ্রবণও করি নাই। ইংরেজের সিভিল-সার্ভিসে প্রবেশের অধিকারে বঞ্চিত হইয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাস, সম্ভবতঃ কাহারও কাহারও মনে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়াই আমার ধারণা।...

"বস্তুতঃ, ইংরাজকে ভারত-ছাড়া করিবার দুরভিসন্ধি যে কোনদিন তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছিল—তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও দুই বৎসরের অধিককাল তাঁহার সহিত দিবারাত্রি এক কক্ষে বাস করিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও তাহা বুঝিতে পারি নাই। যে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা তাঁহার মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল—তাহাতে রাজভক্তি-হীনতার আরোপ অসঙ্গত বলিয়াই আমার মনে হইত।"

দীনেন্দ্রবাবুর লেখা হইতে বুঝিতেছি যে, বোমার মামলায় অব্যাহতি

পাইবার এক বৎসর পরে (১৯১১ খৃষ্টাব্দে) যাহাই হউক—১৯২৩ খৃষ্টাব্দেও তিনি অরবিন্দের বিপ্লবাত্মক (revolutionary) রাজনৈতিক জীবন একেবারে অস্বীকার করিয়া যাইতেছেন। অরবিন্দের জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা শোচনীয় দুর্ঘটনা আমি কল্পনা করিতে পারি না। সব সত্য সবসময়ে প্রকাশ করা যায় না, ইহা ঠিক; নতুবা শ্রীঅরবিন্দ নিজেই তাঁহার আত্মজীবনী লিখিতেন, সম্পূর্ণ সত্য তিনি লিখিতে পারেন না বলিয়াই আত্মজীবনী লিখেন নাই। কিন্তু দীনেন্দ্রবাবুর মত গায়ে-পড়িয়া অরবিন্দের সত্যিকার বিপ্লবাত্মক রাজনৈতিক জীবন—ধামাচাপা নয়, বেমালুম অস্বীকার করার মত নির্বুদ্ধিতা, মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয় বলিয়াই, সাহিত্যে ও সমাজে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়। আমরা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার পক্ষপাতী নই।

দীনেন্দ্রবাবু 'এক কক্ষে' অরবিন্দের সহিত 'দুই বৎসরের অধিককাল বাস করিয়াও' যে অরবিন্দের রাজনৈতিক মতিগতি বুঝিতে পারেন নাই—তাহা হইতে অনুমান হয় যে, তাঁহার বুঝিবার অপেক্ষা না-বুঝিবার ক্ষমতা কম ছিল না। ইহা সম্ভব নয় যে 'New Lamps for Old' (১৮৯৩)—'Bankim Chandra Chatterjee' (১৮৯৪) সম্বন্ধে যিনি নিজের রাজনৈতিক মত স্পষ্ট খোলাখুলিভাবে লিখিয়াছিলেন, তিনি সহসা দীনেন্দ্রবাবু আসাতে ঐ প্রকার উগ্র রাজনৈতিক চিন্তা হইতে একেবারে নিবৃত্ত হইলেন। আসলে দীনেন্দ্রবাবুর সহিত অরবিন্দ রাজনীতি সম্বন্ধে কোন কথাবার্তা বলেন নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, অরবিন্দ অধিকারী ভেদ বুঝিতেন। দীনেন্দ্রবাবুকে তিনি রাজনৈতিক কথাবার্তা বলিবার উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করেন নাই। দীনেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন—"ইন্দুপ্রকাশের প্রবন্ধগুলির মর্ম্ম কি তাহা আমি কখনও তাঁহাকে (অরবিন্দকে) জিজ্ঞাসা করি নাই" (পৃঃ ৬০, অঃ-প্রঃ)। ঠিক কথা। সকলের সঙ্গেই সকল কথা বলা যায় না। দেখা যাইবে যে, ইহার অব্যবহিত পরেই যতীন্দ্র ও বারীন্দ্রের সহিত অরবিন্দ রাজনীতি সম্পর্কে যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, দীনেন্দ্রকুমারকে সেইসকল কথা তিনি বলেন নাই। অরবিন্দকে দেখিয়াই দীনেন্দ্রবাবু সাব্যস্ত করিলেন যে—এইরূপ অধ্যয়নরত নিরীহ ব্যক্তি, স্বল্পভাষী, মিতাহারী ও সংযমী পুরুষ কখনও বিপ্লবাত্মক রাজনীতির পথে উচ্ছৃঙ্খল পদক্ষেপে বিচরণ করিতে পারেন না। বিপ্লববাদীদিগকে দেখিয়া লোকে যেন সহসা তাঁহাদিগকে ধরিতে না-পারে, এইরূপ চেষ্টা করাই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। দীনেন্দ্রবাবু অরবিন্দকে ধরিতে পারেন নাই।

এই বৎসর (১৮৯৯।সেপ্টেম্বর) রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যু হয়। ইহার আগের বৎসর (১৮৯৮।অক্টোবর) দেওঘর হইয়া বরোদায় যাইবার সময় রাজনারায়ণ-বাবু জীবিত ছিলেন। সুতরাং ১৮৯৮-এর অক্টোবরেই অরবিন্দ ও দীনেন্দ্রবাবুর সহিত দেওঘরে রাজনারায়ণবাবুর শেষসাক্ষাৎ হয়। ১৮৯৯-এর সেপ্টেম্বরে যখন দেওঘরে রাজনারায়ণবাবুর মৃত্যু হয়, তখন অরবিন্দ বরোদায় ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যুর পরেও অরবিন্দ দীনেন্দ্রবাবুকে লইয়া দেওঘর হইয়া বরোদায় যাতায়াত করিয়াছেন। দীনেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন—

"সেই তাঁহার (রাজনারায়ণ বসু) সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ—প্রথম এবং শেষ সাক্ষাৎ। তাহারপরও বরোদা যাইবার সময় প্রত্যেকবারই অরবিন্দের সঙ্গে দেওঘর দিয়া গিয়াছি; কিন্তু রাজনারায়ণবাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া তেমন সুখ আর কখনও পাই নাই। দেবগৃহের দেবতা মন্দিরশূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, শূন্য মন্দিরের আর কোনও আকর্ষণ ছিল না; কেবল তাঁহার পবিত্র স্মৃতি পুষ্পগন্ধের ন্যায় সেই পবিত্র ভবন তখনও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। যোগীনবাবুকে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, 'আপনার বাবা খুব হাসিতে পারেন, এমন প্রাণ খুলিয়া আর কাহাকেও হাসিতে দেখি নাই; এই দারুণ রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও এত হাসি।' আমার কথা শুনিয়া যোগীনবাবু বলিয়াছিলেন, 'এত কি হাসি দেখিলেন, বাবা যখন দ্বিজেন্দ্রবাবুর (রাজনারায়ণ-বাবুর পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) সঙ্গে গল্প করেন, আর দুই বন্ধুতে হাসিতে থাকেন, তখন মনে হয় বাড়ীর ছাদটা বুঝি হাসির তরঙ্গে ভাসিয়া যাইবে।"

দীনেন্দ্রবাবু আরও লিখিতেছেন—

"অনেক সময় তাঁহাকে (অরবিন্দ) বন্ধুগণের নিকট টাকা ধার করিতে দেখিয়াছি। তিনি বেতন পাইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার মাতা ও ভগিনীকে খরচের টাকা পাঠাইতেন। তাঁহার ভগিনী তখন বাঁকীপুরে 'অঘোর পরিবারে' থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। কখন কখন অসময়েও তাঁহাদের কাছে অরবিন্দকে মনিঅর্ডার করিতে দেখিয়াছি।...

"একদিন কথায় কথায় আমি অরবিন্দকে বলিয়াছিলাম, 'আপনাকেই ত মাসে মাসে আপনার মাকে ও ভগিনীকে টাকা পাঠাইতে দেখি, আপনার দুই দাদাও ত অনেক টাকা উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা উহাদের জন্য খরচপত্র

পাঠান না?' অরবিন্দ বলিয়াছিলেন—তাঁহার বড় দাদা খেয়ালী লোক, তাঁহার হাতে পয়সা থাকে না; একা মানুষ, তথাপি তিনি খরচে কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। আর মেজদা' নূতন বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহার ধারণা 'বিবাহটা-ব্যয়সাধ্য বিলাসিতা'; অরবিন্দ expensive luxury শব্দ ব্যবহার করিয়া-ছিলেন। মা পাগল, সময়ে সময়ে তাঁহাকে ঘরে পুরিয়া রাখিতে হইত; কিন্তু মায়ের প্রতি অরবিন্দের অসাধারণ ভক্তির পরিচয়ে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এক এক সময় তিনি হাসিয়া বলিতেন, 'আমি পাগল মায়ের পাগ্‌লা ছেলে।' তাঁহার সহোদরা, তাঁহার মাসতুত ভগিনী প্রভৃতি সকলকেই তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; তাঁহাদিগকে পত্রাদি লিখিতেন, টাকা পাঠাইতেন।"

আরও লিখিতেছেন—

"অরবিন্দের এক কাকা সেই সময় ভাগলপুরের কমিশনারের অফিসের হেড্ ক্লার্ক ছিলেন। একবার অরবিন্দ কাকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভাগলপুরে গিয়াছিলেন। কাকার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়াছিলেন, মনে আছে। বস্তুত: পিতৃবংশের সহিত অরবিন্দের তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল বলিয়া মনে হয় না; তিনি মাতুল ও মাতামহেরই অধিক ভক্ত এবং মাতুলবংশের পক্ষপাতী ছিলেন। ...... অরবিন্দ মাতুল, ভাই, ভগিনী, মাসতুত ভগিনী, মাসীমা ('সঞ্জীবনী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের পত্নী) প্রভৃতিকে মধ্যে মধ্যে পত্রাদি লিখিতেন, কিন্তু পিতৃগোষ্ঠীর কাহাকেও প্রায়ই পত্র লিখিতেন না। ভ্রাতৃগণকেও খুব কম পত্র লিখিতেন। ...... অরবিন্দ বলিতেন, নিজের কথা যত কম প্রকাশ করা যায় ততই ভাল। এই জন্যই বোধ হয় তিনি কথাও কম বলিতেন।...... বরোদায় অরবিন্দ তেমন জনপ্রিয় (popular) ছিলেন না। ইংরাজীতে একটা প্রবচন আছে, প্রতিভা ও জনপ্রিয়তার একত্র সমাবেশ দেখা যায় না। ...... অরবিন্দ মারাঠী ভাষা বেশ বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু ভাল বলিতে পারিতেন না; তবে বাঙ্গলা অপেক্ষা ভাল বলিতে পারিতেন। গল্প করিতে করিতে অরবিন্দ খুব হাসিতেন।"

অরবিন্দ এখনও অবিবাহিত। এই অবিবাহিত অবস্থায় বরোদাপ্রবাস-কালে তাঁহার পিতৃবংশ এবং তাঁহার দাদামহাশয় রাজনারায়ণ বসুর বংশের সহিত তাঁহার যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, সেই চিত্রটি দীনেন্দ্রবাবু সুন্দর অঙ্কিত করিয়াছেন। পিতৃবংশের সহিত তাঁহার যে বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল না, ইহা আমরাও পূর্ব্বে দেখিয়া

এবং বলিয়া আসিয়াছি। এই জন্যই অরবিন্দের জীবন-চরিত লিখিতে গিয়া তাঁহার পিতৃবংশের বিশেষ কোন খোঁজ কেহ দিতে পারিতেছেন না। এমন কি, কোন্নগরে তাঁহার পিতৃবংশের বাস্তুভিটা যে কোথায় ছিল, তাহাও যথাযথ নিরূপণ করা এখন একপ্রকার দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য পিতৃবংশের তিনি একজন দীপ্তিমান মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডস্বরূপ। কিন্তু তাহার নীচেই গাঢ় অন্ধকার। ইতিহাসে যে-সকল বড় বড় প্রতিভা দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের সম্বন্ধে সচরাচর এইরূপই ঘটিয়া থাকে। যেমন, ঠাকুর-পরিবারে রবীন্দ্রনাথের নীচেই অন্ধকার দেখিতেছি।

দীনেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন— "অরবিন্দকে কখনও রাগ করিতে দেখি নাই।" ইহা একটী মস্তবড় চরিত-চিত্র। শুধু রাগ নয়, তাঁহার আনন্দও তিনি প্রকাশ করিতেন না। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যখন অরবিন্দের রামায়ণের ও মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদের অজস্র প্রশংসা করিয়াছিলেন তখন "দত্ত মহাশয়ের এই প্রশংসাতেও অরবিন্দকে কিছুমাত্র হর্ষোৎফুল্ল দেখি নাই। সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, নিন্দা-প্রশংসায় অরবিন্দ চিরদিন সমান নির্ব্বিকার।" যে স্থিরধীর বলশালী চরিত্র লইয়া তিনি সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই পরিচায়ক।

দীনেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন—"আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের পুত্র হইলেও থিয়েটারের নামে তাঁহাকে খড়্গহস্ত হইতে দেখি নাই—যদিও অনেক ব্রাহ্ম লুকাইয়া থিয়েটার দেখেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি দুই একদিন 'ষ্টার থিয়েটারে' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। একদিন বোধ হয় 'চন্দ্রশেখরের' অভিনয় দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি থিয়েটারে বানর-নাচের পক্ষপাতী ছিলেন না। থিয়েটারে উদ্দেশ্যহীন অশ্লীল অসার নাটকের অভিনয় হয়, ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না।"—কেহই করে না।

দীনেন্দ্রবাবু অরবিন্দের পিতা ডাঃ কে.ডি. ঘোষ সম্পর্কে অপর অন্যান্য সকলের মতই বিশেষ কিছুই জানিতেন না। ইহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কেননা, অরবিন্দ নিজেও তাঁহার পিতা সম্পর্কে কোথাও বিশেষ কিছু প্রকাশ করেন নাই। এক বারীন্দ্রকুমার যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা কিছুটা তুলিয়া দিয়াছি। অনেকের মতে, উহা নাকি না তুলিয়া দিলেই ভাল ছিল।

দীনেন্দ্রবাবু অরবিন্দের পিতাকে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন।

কিন্তু ডাক্তার কে. ডি, ঘোষ আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা আদৌ ছিলেন না। অরবিন্দ যে ষ্টার থিয়েটারে 'চন্দ্রশেখরের' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন, ইহাতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি অযথা ব্যঙ্গোক্তি করা দীনেন্দ্র-বাবুর পক্ষে উচিত হয় নাই। ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ সামাজিকভাবে যদিও বা ব্রাহ্ম ছিলেন তথাপি ঐ ষ্টার থিয়েটারেরই যে তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক অর্থাৎ মুরুব্বীব্যক্তি ছিলেন, একথা দীনেন্দ্রবাবু জানিতেন না। আমরা ইহা দেখিয়াছি ও বলিয়া আসিয়াছি।

অরবিন্দ জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতেন। দীনেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন—"জ্যোতিষ শাস্ত্রে অরবিন্দের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। মানব জীবনের উপর গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রভাব আছে ইহা তিনি স্বীকার করিতেন। ...... আমি অরবিন্দের অনুরোধে বারাসাত গভর্ণমেণ্ট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দিয়া তাঁহার একখানি জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলাম।" ঐ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নাকি বলিয়াছিলেন, "গার্হস্থ্য জীবনের সুখ তাঁহার (অরবিন্দের) অদৃষ্টে বড় নাই।" তা না-থাকুক। অনেকেরই থাকে না।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে অরবিন্দের বিশ্বাসের কথা আমরা শুনিলাম। কিন্তু প্ল্যানচেটে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে আনিয়া তাহার কথা শুনিবার জন্য কৌতূহল ও বিশ্বাস অরবিন্দের "প্রগাঢ়" না হউক গাঢ় ছিল—তাহা দীনেন্দ্রবাবু কিছু দেখেন নাই। আর ইহাও হইতে পারে যে, এই সময় অরবিন্দ প্ল্যানচেটের প্রতি তাদৃশ আকৃষ্ট হন নাই, পরে যেরূপ হইয়াছিলেন বলিয়া বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও মতিলাল রায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন! মানবজীবনে গ্রহনক্ষত্রাদির প্রভাব এবং মৃত ব্যক্তির আত্মার অস্তিত্বে ও কথোপকথনে বিশ্বাস, এই সময় হইতেই অরবিন্দের মনে অঙ্কুরোদ্গম করিতেছিল। তাঁহার মানসিক বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া এই অঙ্কুরোদ্গম বিস্মৃত হওয়া চলে না। ইহা যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি স্মরণীয়ও বটে।

আর একটী কথা বলিয়াই দীনেন্দ্রবাবুর 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' আমরা অতিক্রম করিয়া যাইব। দীনেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন, "সেই সময় অরবিন্দ বিবাহের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। শীঘ্রই তিনি বিবাহ করিবেন।"

১৯০১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল (বৈশাখ) মাসে তিনি কলিকাতায় আসিয়া ভূপাল

বসুর কন্যা মৃণালিনী দেবীকে হিন্দুমতে বিবাহ করেন। দীনেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তখন অরবিন্দের ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে।

১৮৯৮।১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯০০।১৪ই আগষ্ট—পুরা দুই বৎসর। এই দুই বৎসর অরবিন্দ দীনেন্দ্রকুমারের নিকট বাংলা পড়িতেছেন, তা বলিয়াছি। কিন্তু দিনেন্দ্রকুমারের কথায় এই 'যোগনিমগ্ন তপস্বীর ন্যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য' অরবিন্দের চারিপার্শ্বে এই দুই বৎসরে স্রোতের ধারামুখে বহু-বিচিত্র অনেক-কিছু ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রথমে দেখিতে হইবে, সেই ঘটনাগুলি কী? তারপরে দেখিতে হইবে, সেইসব ঘটনার সঙ্গে অরবিন্দের কোন যোগাযোগ আছে কি নাই? থাকিলে বলিতে হইবে—আছে। না থাকিলে বলিতে হইবে—নাই।

কংগ্রেস : প্রথমে কংগ্রেসের কথাই ধরা যাক্। এই বৎসর (১৮৯৮।ডিসেম্বর) কংগ্রেস মাদ্রাজে হয় এবং Mr. A. M. Bose সভাপতি হন। ৫ বৎসর পূর্ব্বে অরবিন্দ তাঁহার দেশবাসীকে দুইটী বিষয় সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। এই একটি বিজাতীয় ভারতীয় কংগ্রেস (Indian un-National Congress) আর একটী বঙ্গদেশের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ (* ক)। এ দুইয়ের উপরেই অরবিন্দ সমান খাপ্পা। ইহা যেমন স্পষ্ট ও প্রচণ্ড তেমনি অকপট। অরবিন্দের এই সময়ের মনের পরিচয় একটুও ঘোলাটে নয়। ইস্পাতের তরবারির মত ধারালো ও উজ্জ্বল।

কিন্তু বিপদ এই, Mr. A. M. Bose একজন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা এবং এ-বৎসর কংগ্রেসের সভাপতি। একে মনসা, তাতে ধূপের গন্ধ। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে মিঃ বসুর উপর অরবিন্দের তেমন শ্রদ্ধার ভাব থাকিতে পারে না—যাহা মিঃ তিলকের উপর আছে। মিঃ তিলক এই কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ অরবিন্দ যে 'আবেদন-নিবেদন-নীতির' বিরোধী, তার প্রাচুর্য্য এবং বাহুল্য সভাপতির বক্তৃতায় খুব বেশী। কাজেই সভাপতির বক্তৃতা অরবিন্দের মনঃপূত না হইবারই কথা। তারপরে কথা : Mr. A. M. Bose অরবিন্দের 'ইন্দুপ্রকাশে' লিখিত কংগ্রেস-বিরোধী প্রবন্ধগুলি পাঠ

(* ক) "With that generation (created by Bankim) the future lies and not with the Indian un-National Congress or the Sadharan Brahmo Samaj".—[*Bankim Chandra Chatterji—VII* ; Induprokash—27th Aug., 1894]

করিয়াছিলেন কি-না—যেমন Mr. Ranade করিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট বিচলিতও হইয়াছিলেন। ৭ই আগষ্ট, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ 'ইন্দুপ্রকাশে' Mr. Gladstone সম্পর্কে খুব ধারাল মন্তব্য করিয়া লিখিয়াছেন যে, Mr. Gladstone ভারতবর্ষের একজন শত্রু (* খ)। অরবিন্দ তৎকালে পার্ণেলমুগ্ধ, গ্ল্যাডষ্টোনমুগ্ধ হওয়া তাঁহার সাজে না। পার্ণেলমুগ্ধ হওয়ার দরুন গ্ল্যাডষ্টোন-বিরোধী হওয়াই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। ইহার ৫ বৎসর ৫ মাস পর Mr. A. M. Bose সম্ভবত 'মহাত্মা' Gladstone-এর অতি বিস্তৃতভাবে চরণ-বন্দনা করিয়া তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন (* গ)। অরবিন্দ কংগ্রেস-সভাপতির এই দাসসুলভ মোসাহেবীয়ানায় নিশ্চয়ই ঘৃণা বোধ করিয়াছিলেন। চটিয়া ত আগে হইতেই আছেন। ১৮৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দে New Lamps For Old ইহার প্রত্যক্ষ জাজ্বল্যমান প্রমাণ।—অতঃপর নাটুভ্রাতৃদ্বয়কে ১৮ মাস পর্য্যন্ত বিনা বিচারে আটক রাখাতে কিছুটা মামুলী কাঁদাকাটা করেন। পার্ণেলের বিরুদ্ধে জালিয়াৎ Pigott-এর কথাটাও উল্লেখ করেন। এবং শেষ অর্দ্ধছত্রে মিঃ তিলকের কারামুক্তি ঘোষণা করিয়া, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টকে প্রাণ খুলিয়া ধন্যবাদ দিয়া তবে বাঁচেন।

ইহাই তখনকার দিনের কংগ্রেসের 'আবেদন-নিবেদন নীতি'। শুধু গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে দোষ চাপাইলে ত চলিবে না! মডারেট্-বিভীষিকা গভর্ণমেণ্ট বিভষিকা অপেক্ষা কম নয়। বেশীও হইতে পারে।

(* খ) "It was true that we went out of our way to flatter Mr. Gladstone, a statesman who is not only quite unprincipled and in no way to be relied upon, but whose intervention in an Indian debate has always been of the worst omen to our cause."—[*New Lamps For Old*—I ; Induprokash, August 7, 1893]

(* গ) "···it was the privilege of the President of the Indian National Congress to send a telegram conveying our best wishes to Mr. Gladstone. That privilege will not be mine ······And if it is not my privilege today, standing in this place to send an earthly wire to Mr. Gladstone, let us in this great gathering—the greatest and the highest that educated India knows—with bowed heads, take to heart

অরবিন্দ বলিয়াছেন—কংগ্রেসের এই ভিক্ষানীতি মেকী, অচল। এতে কিছুই হবে না। এই নীতিতে কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই নীতি অনৈতিহাসিক (* ঘ)।

তিলকের কথা: কংগ্রেসের পর তিলকের কথায় আসা যাক। যদিও কংগ্রেস-সভাপতি Mr A. M. Bose, তিলক কংগ্রেসে উপস্থিত থাকা সত্বেও না করিলে নয়, তাই তাঁহার নামমাত্র উল্লেখ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন —কিন্তু গেলবারে কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথ ইহা অপেক্ষা গভীর সহানুভূতি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, তিলকের শাস্তির জন্য সমস্ত ভারতবাসী অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। অবশ্য অশ্রুবর্ষণ ছাড়া অন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না!

৬ই সেপ্টেম্বর তিলক কারামুক্ত হইয়া বাহিরে আসেন। তাঁহার কারাদণ্ডের মেয়াদ দেড় বৎসর ছিল, কিন্তু ৬ মাস পূর্ব্বেই গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। জানিয়া রাখা ভাল, ইহা কংগ্রেসের চাপে হয় নাই। ইহা হইয়াছে বৃদ্ধ পণ্ডিত Max Muller-এর প্রভাবে। Max Muller মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে, তিলককে জেলে আবদ্ধ রাখিলে শুধু একজন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয় না, পরন্তু সমগ্র মানবজাতির ক্ষতি করা হয়। তিলককে অবশ্য শেষ মুহূর্ত্তেও ক্ষমা চাহিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। সে-অনুরোধ তিনি ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন (* ঙ)। প্রস্তরে কর্দ্দম নাই। তিলক-চরিত্রে দুর্ব্বলতার স্থান নাই।

his great memory, cherish with affection the lessons of his noble life, and send our spirit's greeting of love and reverence to him in that world which he has now entered⋯."—[*Presidential Speech* by Mr. A. M. Bose—Madras, 1898]

(* ঘ) ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেস হয়। মিঃ মনোমোহন ঘোষ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং (তখন) মিঃ ফেরোজ শা মেহেতা কংগ্রেসের সভাপতি হন। এই দুই কংগ্রেসী নেতার বক্তৃতাকেই ১৮৯৩ খৃ:, ১৮ই সেপ্টেম্বর অরবিন্দ তীক্ষ্ণ সমালোচনার কুঠারাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন। এই দুই কংগ্রেসী নেতা 'History teaches us' বলিয়া কংগ্রেসী আবেদন-নীতির সমর্থন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে অরবিন্দ দেখাইয়াছেন যে—ইঁহারা উভয়েই হয় ইতিহাস পড়েন নাই, অথবা পড়িয়া থাকিলে ইতিহাসের ইঙ্গিত বোঝেন নাই।

(* ঙ) "Tilak was released on 6th September, 1898 from the

গণপতি উৎসব (১৮৯৩ খৃঃ), শিবাজী উৎসব (১৮৯৫ খৃঃ)-এর প্রতিষ্ঠাতা, র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট-এর গুপ্ত-হত্যায় (১৮৯৭ খৃঃ) উৎসাহদাতা বলিয়া অভিযুক্ত এবং এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত তিলক—ডিসেম্বরমাসে কংগ্রেস-মণ্ডপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আবার কংগ্রেসে উপস্থিত দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট বেশী ভীত হইলেন, কিম্বা স্বয়ং সভাপতি মহাশয় এবং মাতব্বর মডারেট্ নেতাগণ বেশী ভীত হইলেন—তাহা নিরূপণ করা কঠিন। যে নূতন দল কংগ্রেসে চরমপন্থী (Extremist) বলিয়া সুখ্যাতি বা অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল, সেই চরমপন্থী দলের নেতা-স্বরূপ ১৮৯৬ খৃঃ হইতেই তিলক কংগ্রেসের অর্গলবদ্ধ মডারেট্-দরজার উপর লোহার হাতুড়ী পিটিতেছিলেন। কোনই ফল হইতেছিল না। কেননা, ফিরোজ শা মেহেতা প্রমুখ সকল প্রদেশের মাতব্বর মডারেট্ নেতা কংগ্রেসের সর্ব্বেসর্ব্বা। অরবিন্দ-কথিত 'প্রোলিটেরিয়েটের' নাম-গন্ধও কংগ্রেসের ধারেপাশে নাই।

১৮৯৯-এর ৪ঠা জুলাই তিলক "কেশরী" কাগজের সম্পাদকের ভার পুনরায় গ্রহণ করিয়া লিখিলেন—"মডারেট্ ও Extremist দল, যখন স্বায়ত্বশাসন লাভের

Yeravada Jail nearly six months prior to the termination of the prescribed period of eighteen months. This belated grace was accelerated by the influentially signed petition presented by the late Professor Max Muller to H. M. the Queen Victoria. Prof. Max Muller knew Mr. Tilak as the author of 'Orion', and it was largely due to his efforts that the sense of justice of Lord Sandhurst was at last awakened. There was still a display of petty-mindedness in insisting upon an application for clemency from Mr. Tilak himself. But Mr. Tilak, who had manfully rejected such a humiliating offer before he was convicted, was not the man to yield now.

"Prof. Max Muller's interest in Mr. Tilak enabled the latter to spend much of his enforced leisure profitably. Mr. Tilak was allowed the use of candles for a couple of hours at night, and he utilized this opportunity to push on his researches into Vedic antiquities."—[*The Life Of Lokamanya Tilak*, by D V. Athalye—Swadeshi Publishing Co., Poona, 1921—p. 101]

জন্য কেহই আইনভঙ্গ করিতে প্রস্তুত নন, তখন এই দুই দলের মধ্যে ঝগড়াঝাটির কোন অর্থই হয় না (* চ)।"

১৮৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ আইনভঙ্গের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলেন নাই। পরন্তু ফ্রান্স ও আয়র্ল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া ইহার উল্টা কথাই বলিয়াছেন। প্রথম হইতেই দেখিতেছি যে, অরবিন্দ ও তিলকে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। পরবর্ত্তীকালে যখন অরবিন্দ রাজনীতিক্ষেত্রে তিলকের দলভুক্ত হইবেন, তখনও উভয়ের মধ্যে এই সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকিয়া যাইবে। অরবিন্দ ও তিলকে পার্থক্য আছে। অথচ বরোদায় প্রবাসকালে যে-দুইটি ব্যক্তির প্রভাব অরবিন্দের জীবনের উপর আসিয়া পতিত হইয়াছিল—তাহার মধ্যে প্রথম তিলক, দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণযোগী লেলে।

বিপিনচন্দ্র পাল : যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অরবিন্দ দেখিতে পারেন না, দুঃখের বিষয় বিপিনচন্দ্র তখন সেই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তি। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার সম্পাদকরূপে মিলিত হইয়াছিলেন। অবশ্য এই মিলনে বিচ্ছেদেরও একটি সূক্ষ্ম রেখা বিদ্যমান ছিল। কেননা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গুপ্ত-হত্যাদি কর্ম্ম বিপিনচন্দ্র আদৌ সমর্থন করেন নাই। অরবিন্দ বিপিনচন্দ্রের সহিত এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হইতে পারেন

(* চ) র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যার (১৮৯৭ খৃঃ) পর বোম্বাইয়ের মডারেট্ ও চরমপন্থী দল নিজেদের মধ্যে আত্মঘাতী কলহে প্রবৃত্ত হইল। গভর্ণমেণ্ট এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ব্যাপকভাবে ধরপাকড় ও অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তিলক তখন এই সম্পর্কে তাঁহার বাহন "কেশরী"তে লিখিলেন :

"Both the political parties are agreed as to the rights we want to get from the rulers. If this is so, where is the room for 'Moderation' and 'Extremism'? None of us ever dream of breaking or transgressing the laws of the land while demanding our rights. What then is the difference !" —[*Keshari*—July 4, 1899]

গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার লাভের কথাই তিলক বলিতেছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাহিতেছেন না। অরবিন্দ (New Lamps For Old—1893-94) কেবলমাত্র কতকগুলি অধিকার চাহেন নাই—তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার কথাই ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে অরবিন্দ ও তিলকের মধ্যে গোড়া হইতেই পার্থক্য রহিয়াছে।

নাই। অরবিন্দ শুধু তিলক হইতে নয়, বিপিনচন্দ্র হইতেও পৃথক। এই পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্যই ত অরবিন্দের বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব। বিপিনচন্দ্র ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য ব্রাহ্মরা একটি বৃত্তি দিতেন। অক্সফোর্ডের ম্যানচেষ্টার কলেজে এক বা দুই বৎসর পাঠ করিবার জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হইত। তিনি এই বৃত্তি লাভ করেন। চারি-ছয় মাস এই কলেজে পাঠ করিবার পরে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। তিনি ভারতীয় সভ্যতা-সাধনার সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সাধনার তুলনামূলক বিচার করিয়া বিলাতে ও মার্কিনে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে থাকেন। ভারতে ইংরাজ-শাসনের বিরোধী বিলাতের সমাজতন্ত্রবাদের প্রবর্ত্তক চিন্তানায়ক হাইণ্ডম্যানের সহিত এই সময়ে তাঁহার আলাপ হয়। ইঁহারই সাহায্যে আধুনিক জগতের রাজনীতির অনেক গূহ্য কথা ও তথ্য তিনি বুঝিতে পারেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা: আমরা ১৮৯৮।২রা আগষ্ট স্বামী বিবেকানন্দকে অমরনাথে ফেলিয়া আসিয়াছি। তারপর ৩০শে সেপ্টেম্বর দেখিতেছি, তিনি একাকী ক্ষীরভবানীর মন্দিরের দিকে যাত্রা করিতেছেন। ক্ষীরভবানীর মন্দির মুসলমানেরা ভগ্ন করিয়াছিল। তাহা দেখিয়া তিনি ভাবিলেন যে, তিনি উপস্থিত থাকিলে ইহা ভগ্ন হইতে দিতেন না। কিন্তু হঠাৎ তখন তিনি এক দৈববাণী শুনিলেন। ক্ষীরভবানী বলিলেন, "তুই আমাকে রক্ষা করিবি, না আমি তোকে রক্ষা করিব?" স্বামীজীর চমক ভাঙ্গিল। কর্ত্তৃত্বাভিমান দূর হইল, নিজেকে মহাশক্তির হস্তে একটী যন্ত্র বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এই দৈববাণীর পর হইতে স্বামীজীর দেহে ও মনে একটা অবসাদের ভাব আসিয়া পড়িল। ক্ষীরভবানী যাত্রার পূর্ব্বে তিনি "Kali The Mother" (মৃত্যুরূপা মাতা) যে কবিতাটী লিখিয়াছিলেন, তাহা অবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

"তোর ভীম চরণনিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালি তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো আয় মোর পাশে!"

—(অনুবাদক: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

নিরঙ্কুশ অদ্বৈত বেদান্তবাদী, বিপ্লব ও সংহারের প্রতীক কালীর ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। ইহা কি শুধু আকস্মিক ঘটনা, অথবা ইহার মধ্যে কালপুরুষের (Zeitgeist) ইঙ্গিত আছে? কে জানে, কে বলিতে পারে? ১৮ই অক্টোবর তিনি বেলুড়ে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া বলিলেন,

"অমরনাথ থেকে ফেরবার সময় শিব আমার মাথায় ঢুকেছেন, কিছুতেই নাবছেন না।" একটা পরিবর্ত্তনের ছায়া যেন দেখা দিতেছে। ১২ই নভেম্বর শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা। বেলুড়মঠে শ্যামাপূজা হইল। ঐ দিন ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। ৯ই ডিসেম্বর বেলুড়মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অস্থি তাম্রপাত্রে রক্ষিত হইল এবং তাঁহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা হইল। স্বামীজীর অভীপ্সিত কার্য্য সুসম্পন্ন হইল।

১৯শে ডিসেম্বর স্বামীজী ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বৈদ্যনাথ গেলেন। ১৮৯৯ খৃঃ সম্পূর্ণ জানুয়ারী মাস তিনি বৈদ্যনাথে ছিলেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি বেলুড়মঠে ফিরিয়া আসেন। ১৮৯৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে রাজনারায়ণ বসুর দেওঘরে মৃত্যু হয়। ১৮৯৮ খৃঃ ডিসেম্বরের শেষসপ্তাহে অথবা ১৮৯৯ খৃঃ জানুয়ারীর যে-কোন সময়ে স্বামীজী, পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী রাজনারায়ণ বাবুর সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের সময় অরবিন্দের কনিষ্ঠা ভগিনী কুমারী সরোজিনী ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী এবং তিনি একাধিকবার আমাদিগকে একথা বলিয়াছেন (* ছ)।

(* ছ) স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় যাইবার পূর্ব্বে দেওঘরে রাজনারায়ণ বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এ কথায় স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কিঞ্চিৎ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এই সন্দেহ দূর করিতে চাহিলে রাজনারায়ণ বসুর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা লজ্জাবতী বসুর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 'সাধনাশ্রমে' আছেন। বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাতের সময় লজ্জাবতী বসু প্রভৃতি আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৯-এর জানুয়ারী মাসে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত রাজনারায়ণ বসুর যে সাক্ষাৎ হয়, তাহার প্রমাণোল্লেখ করিয়াছি। এই সম্পর্কে স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের পুত্র শ্রীসুকুমার মিত্র আমাদিগকে যাহা লিখিয়া জানাইয়াছেন, তাহা তুলিয়া দিতেছি। সুকুমার মিত্র, শ্রীঅরবিন্দের মাসতুতো ভাই।

6, College Square
26. 5. 1940

"রাজনারায়ণ বসুর সহিত অরবিন্দের বহুবার সাক্ষাৎ হইয়াছে। বৎসরে দুই-তিনবারও হইয়াছে।

"বিবেকানন্দ অনেকবার দেওঘরে গিয়াছেন—পক্ষাঘাতে রাজনারায়ণ বসু শয্যাশায়ী থাকার পরে এবং বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিবার পরেও গিয়াছেন।

এই সময়ে স্বামীজী শিষ্যদিগকে নিজের জন্য মুক্তির চেষ্টাকে ভীষণ স্বার্থপরতা বলিয়া উপদেশ দিতে থাকেন। এবং নিজে নরকে গিয়া পরের কল্যাণ সাধন করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে থাকেন। যিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী-তলে বসিয়া অখণ্ডের ধ্যানে ডুবিয়া থাকিবার জন্য লোলুপ হইয়াছিলেন, তাঁর মুখে সত্যিই এক নূতন বাণী পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হইতে লাগিল। সেই বজ্রধ্বনি কি বাঙ্গলার আকাশে আজ নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে? তার দূরাগত কোন প্রতিধ্বনিও কি আর শুনা যায় না?…

"নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? মুক্তি কামনাও ত মহাস্বার্থপরতা। ফেলে দে ধ্যান—ফেলে দে মুক্তি-ফুক্তি। …দেখছিস না—নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হয়েও তোদের সেবা কর্‌তে শিখেছে? আর তোরা নিজের দেশের লোকের জন্য তা করতে পারবিনি? যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে—চলে যা সেই দিকে। নয় মরেই যাবি। তোর আমার মত কীট হচ্ছে—মরছে। তাতে জগতের কী আস্‌ছে যাচ্ছে? একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই, তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভাল।"

কোন বাঙ্গালী এপর্যন্ত কোন মারাঠীভাষার পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছেন কি-না জানি না। কিন্তু দেশাত্মবোধে উদ্দীপিত মারাঠী পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার এক পাঞ্জাবী বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া এই সময় স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। স্বামীজীর মন এই সময়ে দুইটি দিকে ধাবিত হইতেছিল। এক, অরবিন্দ যাহাদিগকে প্রোলেটিরিয়েট বলিয়াছেন, তাহাদের উদ্ধার; দুই, বিপ্লব ও সংহারের প্রতীক কালীর উপাসনা। সুতরাং স্বামীজী দরিদ্রদের কথা লইয়াই বেশী আলোচনা করিলেন। বেদান্তের কথা কিছুই হইল না। ইহাতে পাঞ্জাবী

"অরবিন্দ ও বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছে বলিয়া জানি না। হরি জানিতে পারে। সে ডায়মণ্ডহারবারে থাকে, মধ্যে মধ্যে আসে।

"রাজনারায়ণের মৃত্যুর পরও অরবিন্দ বহুবার বৈদ্যনাথে গিয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া উপরোক্ত ঠিকানায় থাকিতেন।"

ভবদীয়
শ্রীসুকুমার মিত্র

বন্ধুটি বলিয়া ফেলিলেন, 'আজকের দিনটাই বৃথা গেল'। কথাটা শুনিবামাত্রই স্বামীজী সিংহের মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন—

"মহাশয়! যেপর্য্যন্ত আমার জন্মভূমির একটি কুকুর পর্য্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে আহার প্রদানই আমার ধর্ম্ম। ইহা ছাড়া আর যা কিছু—অধর্ম্ম।"

১৮৯৯-এর ২০শে জুন গোলকুণ্ডা জাহাজে আরোহণ করিয়া স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাসহ বিলাতে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা ছয় সপ্তাহ জাহাজে ছিলেন। এই ছয় সপ্তাহের কথা ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার "The Master As I Saw Him" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থে যেরূপ গভীর গবেষণামূলক বিশ্লেষণের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা এ পর্য্যন্ত আর কেহই পারেন নাই। ভগিনী নিবেদিতা উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্যা—যেমন স্বামী বিবেকানন্দ উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। ১৬ই আগষ্ট স্বামীজী ইংলণ্ড হইতে আমেরিকার দিকে রওনা হইলেন। ১৫ই আগষ্ট অরবিন্দের জীবনে ২৮ বৎসর আরম্ভ হইল।

উপরোক্ত ছয় সপ্তাহের বিবরণ ভগিনী নিবেদিতা যাহা লিখিয়াছেন—তাহাতে স্বামীজী সম্বন্ধে আমরা যে-কথা বলিয়া আসিয়াছি, তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। স্বামীজী এই সময় বলিতেন—

"I love terror for its own sake", he went on, "despair for its own sake, misery for its own sake. Fight always. Fight and fight on, though always in defeat. That's the ideal. That's the ideal"—(Page—232).

ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার গ্রন্থে (Page—205) The Swami & Mother-worship অধ্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দের আত্মশক্তিকে মাতৃভাবে পূজার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অতিশয় চমকপ্রদ। এই অধ্যায়টি স্বামীজীর জীবনের উপর যে আলোকপাত করিয়া গিয়াছে, তাহা আধুনিক সাধক-সাধিকাদের চক্ষের সম্মুখে এক অচিন্ত্যনীয় অপূর্ব্ব জগতে প্রবেশের দ্বার খুলিয়া দিবে। অথচ এই অপূর্ব্ব জগতের সহিত জননী জন্মভূমি, এই দেশের মাটী, অবিচ্ছিন্ন যোগে সংযুক্ত আছে।

ভগিনী নিবেদিতার দুইটি কথা মাত্র উল্লেখ করিয়া শেষ করিব। প্রথম—

ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে কিরূপে কালীর ধ্যান ও পূজা সংক্রামিত হইল তাহার একটি দৃষ্টান্ত, তাঁহার নিজের কথা হইতেই তুলিয়া দিতেছি :

Being with him one day when an image of Kali was brought in, and noticing some passing expression, I suddenly said, "Perhaps, Swamiji, Kali is the Vision of Siva ! Is she ?" He looked at me for a moment. "Well ! Well ! Express it in your own way," he said gently. "Express it in your own way."—(Page—211).

গুরু-শিষ্যার এবং শিক্ষাপদ্ধতির এ এক অতি মহান্ চিত্র। অরবিন্দ যখন দিনেন্দ্রকুমারের নিকট বরোদায় বসিয়া বাংলা পড়িতেছেন, সেইকালে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে শ্রীশ্রীকালীর সংহার-মূর্ত্তির আবির্ভাব আমরা দেখিতেছি। ইহার ৮ বৎসর পরে অরবিন্দের মধ্যে শ্রীশ্রীকালীর আবির্ভাব দেখিতে পাইব। উহা রাষ্ট্রনৈতিক তন্ত্র-সাধনার যুগ।

ইতিমধ্যে একদিন স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা একছত্রও লিখিয়া যান নাই।

অরবিন্দ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত কোনদিন সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন কি-না জানি না। যাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সে-ই বলে জানি না। যদি সাক্ষাৎ করিতেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি একজন উপনিষদের সগুণ ব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন যোগীকে দেখিতে পাইতেন—যাঁহার জীবন একটি জীবন্ত উপনিষদ The Life Divine, অথচ যিনি একজন ব্রাহ্ম ছিলেন।

দ্বিতীয়—ভগিনী নিবেদিতা, স্বামীজীর এই উপনিষদের অদ্বৈতবাদমূলক নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে কালীর ধ্যানে মনোনিবেশ করায় কথঞ্চিৎ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। এবং ইহার সামঞ্জস্য কোথায়, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন (* জ)।

(জ *) "In England and America he was never known to preach anything that depended on a special form. The realisation of Brahman was his only imperative, the Advaita

স্বামীজীর ব্রহ্ম হইতে কালীতে আগমন—কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নরেনকে মাকালীর চরণেই সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। মহাপুরুষদের জীবনেও এই রকম পরিবর্ত্তনের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কেননা, সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তাঁহাদের মন আরো অধিক ক্রিয়াশীল—মনের গতিবেগ আরো দ্রুত এবং প্রচণ্ড।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনেও ১৬ বৎসর পরে এইরকম একটা পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সে-পরিবর্তন স্বামীজীর পরিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করিয়া নয়। বরং ঠিক উন্টা ধারায় প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। স্বামীজী বেদান্ত হইতে শক্তি উপাসনায় অর্থাৎ তন্ত্রে আসিতেছেন। ১৮৯৮ খৃঃ হইতেই ইহার সূত্রপাত। অন্যদিকে ১৯১৪ খৃঃ 'আর্য্য' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীঅরবিন্দ তন্ত্র হইতে বেদান্তে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিতেছেন।

---

philosophy his only system of doctrine, the Vedas and Upanishads his sole scriptural authority."—[*The Master As I Saw Him* by Sister Nivedita—p. 206]

"He was evidently afraid that my intellectual difficulty would lie where his own must have done, in the incompatibility of the exaltation of one definite scheme of worship with the highest Vedantic theory of Brahman."—[*Ibid ; p. 213*]

"Thus we are admitted to a glimpse of the struggle that goes on in great souls for the correlation and mutual adjustment of the different realisation of different times. On the one side the Mother, on the other side Brahman. We are reminded of the Swami's own words heard long ago : 'The impersonal God, seen through the mists of sense, is personal.' In truth it might well be that the two ideas could not be reconciled. Both conceptions could not be equally true at the same time. It is clear enough that in the end, as a subjective realisation, either the Mother must become Brahman, or Brahman the Mother. One of the two must melt into the other, the question of which, in any particular case, depending on the destiny and the past of the worshipping soul."—[*Ibid ; p. 216-17*]

ইহাও সম্ভবতঃ আকস্মিক নয়। অর্থ আছে। অরবিন্দ-শিষ্য শ্রীমতিলাল রায় লিখিয়াছেন—

"...১৯১০ খৃঃ হইতে ১৯১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত যুগগুরুর সঙ্কেতেই তন্ত্রসাধনার যে ভীম-অগ্নি আমার ভিতর দিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহা যখন সারা ভারতে প্রলয় সৃষ্টির উপক্রম করিল, তখন শ্রীঅরবিন্দই হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—'থাম'! তন্ত্রসাধনার প্রয়োজন ততক্ষণ, যতক্ষণ না উহা বেদান্ত প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তন্ত্রের লক্ষ্য বেদান্তের প্রতিষ্ঠা। ইহার নিজস্ব মূল্য কিছুই নাই। এক কথায় ইহার প্রয়োজন আর একেবারেই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি আমায় অতঃপর তাঁহার 'আর্য্য' পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহের আদেশ দিলেন।...যাঁহারা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় রাষ্ট্রনৈতিক তন্ত্র-সাধনায় সে-যুগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এইসকল উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া আমার তৎকালীন বৈপ্লবিক সঙ্গিগণ একটু বিচলিত হইলেন।"—(জীবন-সঙ্গিনী; প্রবর্ত্তক, ১৩৪৬, জ্যৈষ্ঠ—পৃঃ ১৯৬-১৯৭)।...হইবার কথাই!

১৮৯৮ খৃঃ স্বামীজী বেদান্ত হইতে তন্ত্রে; ১৯১৪ খৃঃ শ্রীঅরবিন্দ তন্ত্র হইতে বেদান্তে—এই যে আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন ইহার প্রকৃত রহস্য নিরূপণ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এক অনুমানের উপরে নির্ভর। অবশ্য অনুমানের প্রামাণ্য মর্য্যাদা নব্যন্যায়ের দেশে উপেক্ষণীয় নয়। এই যা ভরসা।

অরবিন্দ যখন দীনেন্দ্রকুমারের নিকট বাংলা শিখিতেছেন—তার প্রথম বৎসরের চারিপার্শ্বের ঘটনাগুলির কথা বলা হইয়াছে। এইবার দ্বিতীয় বৎসরের (১৮৯৯।১৫ই আগষ্ট—১৯০০।১৪ই আগষ্ট) ঘটনাগুলির কথা বলিব। অরবিন্দের জীবন-চরিতের চারিপার্শ্বে জাতীয় জীবনের এই ঘটনাগুলি দুর্গাপ্রতিমার পশ্চাতে চালচিত্রের মত। সেকালের পটুয়াদের চালচিত্তিরই এক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ।

রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যু: ১৮৯৯।সেপ্টেম্বর দেওঘরে রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর উপর অরবিন্দ একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন কবিতাটি এই:

TRANSIIT, NON PERIIT

(My grandfather, Rajnarain Bose, died September, 1899)

Not in annihilation lost, nor given
To darkness art thou fled from us and light,

O strong and sentient spirit ; no mere heaven
Of ancient joys, no silence eremite
Received thee ; but the omnipresent thought
Of which thou wast a part and earthly hour
Took back its gift. Into that splendour caught
Thou hast not lost thy special brightness. Power
Remains with thee and the old genial force
Unseen for blinding light ; not darkly lurks :
As when a sacred river in its course
Dives into ocean, there its strength abides
Not less because with vastness wed and works
Unnoticed in the grandeur of the tides.

—*Aurobindo Ghose*

রাজনারায়ণ বসুর প্রতি অরবিন্দের কতদূর গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তা এই কবিতাটিতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

রাজনারায়ণ বসু ৭৩ বৎসর (১৮২৬-১৮৯৯ খৃঃ) জীবিত ছিলেন। ১৮৪৩ খৃঃ তিনি উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ করেন। ১৮৪৯ খৃঃ তিনি—(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, (খ) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, (গ) মদনমোহন তর্কালঙ্কার, (ঘ) রামগতি ন্যায়রত্ন (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখক)—প্রভৃতিকে ইংরেজী ভাষা শিখাইতেন। গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ভরিয়া যে জীবন তার চতুর্দ্দিকে এইরূপ জ্ঞানের আলোক ছড়াইয়া গিয়াছে, মৃত্যুর পরে সহসা পরমাত্মার মধ্যে উপস্থিত হইয়া তিনি যাহাই করিতে থাকুন—ইহা প্রত্যক্ষ যে, বিংশ শতাব্দীর জাতীয় জীবনে তাঁহার নিজের কথায় "national feeling" অর্থাৎ জাতীয়তা-বোধের উদ্বেলিত তরঙ্গ-শীর্ষে রাজনারায়ণ বসু জীবন্ত। মৃত কিছুতেই নহেন। তাঁহার শ্বেত-শ্মশ্রু-সমন্বিত শির গৌরবে উন্নত—প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। পরমাত্মার মধ্যে অমরত্ব অপেক্ষা জাতির মধ্যে, ইতিহাসের মধ্যে অমরত্ব কিছু কম কথা নয়। কল্পনা অপেক্ষা প্রত্যক্ষের উপরেই এ-যুগের লোক বেশী বিশ্বাস করিতে চায়। গত শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে, ঐতিহাসিক অমরত্বের দাবী কাহারো অপেক্ষা রাজনারায়ণ বসুর কম নয়। বরং অনেকেরই অপেক্ষা বেশী।

কোন কোন দিকে শ্রীঅরবিন্দের মধ্যেই আমরা রাজনারায়ণ বসুকে জীবিত দেখিতে পাই। যেমন—উপনিষদের আলোচনায়। যদি রাজনারায়ণবাবু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীর তরুণ যুবকদের লইয়া এক সময়ে রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট বৈপ্লবিক কর্ম্ম-প্রচেষ্টার জল্পনা-কল্পনা করিয়া থাকেন, তবে অরবিন্দের মধ্যে আমরা বৈপ্লবিক রাজনারায়ণকেই দেখিতে পাই।

আবার কোন কোন দিকে অরবিন্দ, রাজনারায়ণের জীবন্ত প্রতিবাদ। তা-ও দেখিতে পাই। রাজনারায়ণ নরপূজা ও অবতারবাদের ঘোর বিরোধী। কেশব সেন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে অবতার হওয়ার কালে (* ঝ) রাজনারায়ণ বিষম প্রতিবাদের ঝটিকা বহাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দকে লইয়াও যে-আকারের যুগলে নরপূজা প্রচার হইতেছে, রাজনারায়ণবাবু জীবিত থাকিলে ইহার যেমন প্রতিবাদ করিতেন, তেমন প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা আজ বাংলাদেশে হিন্দু বা ব্রাহ্ম কাহারও নাই।

রাজনারায়ণ—বৈদান্তিক, বিপ্লবী, অবতার-বিরোধী। শ্রীঅরবিন্দ—বৈদান্তিক, বিপ্লবী, স্বয়ং অবতার।

কংগ্রেসের কথা: এবার কংগ্রেস হয় লক্ষ্ণৌ সহরে (১৮৯৯।ডিসেম্বর)। এবারেও সভাপতি বাঙ্গালী। যদি দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "বোধ হওয়া" সত্য হয়, তবে কংগ্রেসের সভাপতি হইবার মাত্র অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত বরোদায় অরবিন্দের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয়। "অরবিন্দ রামায়ণ ও মহাভারতের স্থানবিশেষের অনুবাদ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি (রমেশচন্দ্র দত্ত) তাহা দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন"।—(অঃ-প্রঃ, পৃঃ ৩৮)।

সভাপতির অভিভাষণে গেলবারে আনন্দমোহন বসু যেমন তিলকের মুক্তি-বার্ত্তা অর্দ্ধছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন—এবারে রমেশ দত্ত নাটু ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তিবার্ত্তা প্রকাশ করিলেন।

বোম্বাইয়ে প্লেগ—প্লেগের চেয়েও ভীষণ, প্লেগ দমনের জন্য অত্যাচার—অত্যা-

---

(* ঝ) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে—মুঙ্গেরে কেশবচন্দ্র যখন অবতার হইলেন (১৮৬৮ খৃঃ) তখন ব্রাহ্মিকাগণ তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া মাথার চুল খুলিয়া তাঁহার চরণযুগল মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। ইহাকে নিঃসন্দেহে শ্রীচৈতন্য যুগের 'ভক্তির স্রোত' ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে। ইহাই ব্রাহ্ম-সমাজে নরপূজার পরাকাষ্ঠা।

চাষের জন্য র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের গুপ্তহত্যা—গুপ্তহত্যার জন্য তিলকের কারাদণ্ড, নাটুভ্রাতৃদ্বয়ের নির্ব্বাসন এবং পরে মুক্তি—পক্ষান্তরে ঐ প্রসঙ্গে গোখ্‌লের হীন কাপুরুষোচিত ক্ষমা-ভিক্ষা এবং র‍্যাণাডেকে বাঁচাইতে গিয়া গোখ্‌লের এই কাপুরুষতায় কংগ্রেস-মণ্ডপে (১৮৯৭—১৯০২ খৃঃ) ছ'টি বৎসর গোখ্‌লের বক্তৃতা বন্ধ ইত্যাদি যখন চলিতেছে, তখন ১৮৯৯।ডিসেম্বরশেষে রমেশ দত্ত লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে সভাপতির বক্তৃতা দিতেছেন। অরবিন্দ বরোদা কলেজে ছাত্র পড়াই-তেছেন ; রামায়ণ-মহাভারত ইংরেজী কবিতায় অনুবাদ করিতেছেন, দীনেন্দ্র-কুমারের নিকট "পিরীতের হ্যাকচ প্যাকচ" বাংলা পড়িতেছেন। এবং দীনেন্দ্রকুমার আক্ষেপ করিতেছেন যে, মেধাবী ও মনীষী হইলে কি হয়—অরবিন্দ দীনবন্ধু-লিখিত "পিরীতের হ্যাকচ প্যাকচ" বুঝিতে পারিতেছেন না।

রমেশ দত্ত কৃষকদের দুর্গতির কথা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়া, দুর্ভিক্ষের হেতু উদ্‌ঘাটন করিয়া, আমাদের বাণিজ্য ও শিল্পের শোচনীয় ধ্বংসের ইতিহাস বিবৃত করিয়া বলিলেন দুইটি কথা। ১ম—বৈধ অর্থাৎ আইনসঙ্গত উপায় ভিন্ন কংগ্রেস অন্য কোনরূপে আইন-ভঙ্গকারী উপায় কদাপি অবলম্বন করিতে পারিবে না। ২য়—তবে জরুরী বা সঙ্গীন অবস্থায় কংগ্রেস বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবে। পরবর্ত্তীকালে গান্ধী-চিত্তরঞ্জনের যুগে এই বিশেষ অধিবেশনের চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। অরবিন্দ রমেশ দত্তের বক্তৃতা নিশ্চয়ই পড়িয়াছিলেন। প্রবীণ I. C. S. চাকুরিয়া ব্যক্তির আইনসঙ্গত বক্তৃতা—Fire এবং Blood-এর উপাসক অরবিন্দের মনঃপূত না হইবারই কথা। পরে রমেশ দত্ত (১৯০৪।আগষ্ট—১৯০৭।জুলাই) বরোদা রাজ্যে রাজস্ব-সচিবের কাজ করেন। অরবিন্দ ১৯০৬ খৃঃ বরোদা কলেজের অধ্যাপকের কাজে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। বরোদা ত্যাগের পূর্ব্বে অরবিন্দ অন্ততঃ ২ বৎসর রমেশ দত্তের সহিত পরস্পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বরোদা রাজ্যে চাকরি করেন। কিন্তু রমেশ দত্তের I. C. S. কন্যাজামাতা মিঃ জে. এন. গুপ্ত শ্বশুরের এমন এক জীবনচরিত লিখিয়াছেন, যাহাতে চাকরির কথা ভিন্ন—জীবনও নাই, চরিতও নাই; অভ্যাস বড় দোষ। চাকরীও একটা অভ্যাস। জে. এন. গুপ্ত রমেশ দত্তের জীবনীতে অরবিন্দের নামটি পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। ১৯০৯।৩০শে নভেম্বর বরোদা রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় রমেশ দত্তের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর তিন দিন পর, চারি দিনের দিন অরবিন্দ

'কর্মযোগিনে' রমেশ দত্তের দোষ ও গুণের তুল্য বিচার করিয়া সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন (* এ)।

তিলকের কথা : এইবার তিলকের কথায় আসা যাক। এবারও তিলক কংগ্রেসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হওয়া দোষের কথা নয়, কিন্তু তিনি এক ভয়ঙ্কর কথা বলিলেন। লর্ড স্যাণ্ডহার্ষ্টের (বম্বে) রাজত্বকাল প্লেগের দারুণ অত্যাচারে পূর্ণ বলিয়া, এই কুশাসনের বিরুদ্ধে এবং সেই সঙ্গে লর্ড স্যাণ্ডহার্ষ্টের বিরুদ্ধেও কংগ্রেস-মণ্ডপে দাঁড়াইয়া একটি মন্তব্য পেশ করিতে চাহিলেন। শুনিয়া সভাপতি রমেশ দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, তাহা হইলে তিনি সভাপতির চেয়ার হইতে উঠিয়া যাইবেন। অনেক বলিয়া-কহিয়া সভাপতি মহাশয়কে তাঁহার চেয়ারে বসাইয়া রাখা হইল। আর এদিকে মডারেট

(* এ) "Of all the great Bengalis of his time Romesh Dutt was perhaps the least original. His administrative faculties were of the second order, not of the first ; though he stood for a time foremost among the most active of Congress politicians and controversialists, he was neither a Ranade nor a Surendranath, had neither the gift of the organiser and political thinker nor the gift of the orator ; he had literary talent of an imitative kind but no literary genius ; he wrote well on scholastic subjects and translated pleasantly and effectively, but was no great Sanskrit scholar : he cannot rank with Ranade or even with Gokhale as an economist, yet his are the most politically effective contributions to economic literature in India that recent years have produced······His history of ancient Indian civilisation is a masterly compilation, void of original research, which is rapidly growing antiquated······The best things he ever did were, in our view, his letters to Lord Curzon and his Economic History······Without Economic History and its damning story of England's commercial and fiscal dealings with India we doubt whether the public mind would have been ready for the Boycott. In this one instance it may be said that *he not only wrote history but created it.*"—Aravindo Ghose.

নেতাগণ ষড়যন্ত্র করিয়া মিঃ তিলকের মন্তব্য পেশও করিতে দিলেন না এবং তাঁহার যা বক্তব্য তাহাও বলিতে দিলেন না।

সুরাট-কংগ্রেস এখনও ছয় বৎসর দূরে। কিন্তু ছয় বৎসর পূর্ব্বেই আমরা সুরাটের দক্ষ-যজ্ঞ অভিনয়ের সূচনা এই লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসে দেখিতে পাইলাম।

ভারতসচিব লর্ড হ্যামিল্টন রমেশচন্দ্র দত্তের বক্তৃতা পড়িয়া বলিয়াছিলেন যে, দত্ত মহাশয় এই গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদসাধন করিয়া ইহার স্থানে ভারতবাসীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শাসন আনিতে চাহেন *(but he Mr. Dutt wished to substitute another phase, that government in India should be conducted by the people)*। এই সমালোচনা শুনিবামাত্র দত্ত মহাশয় "তোবা" করিয়া ইহা অস্বীকার করিলেন। তিনি স্পষ্ট বলিলেন—আমি আমার বক্তৃতায় কোথাও এরকম কথা বলি নাই—"Nowhere in my speech have I proposed to substitute the present form of Government in India by a system of Government by the people.···In the Government I desired to have some representation of the popular element. I proposed the appointment of one Indian member in each provincial Executive Council etc., but the proposal certainly does not amount to substituting the present form of Government in India by a system of Governmet by the people." স্পষ্ট কথার দোষ নাই। দত্ত মহাশয় by the people-এর শাসন চান না। সুতরাং অরবিন্দের "India for India's sake" দত্ত মহাশয়ের অভিপ্রেত নয়। দত্ত মহাশয় কংগ্রেসের মডারেট নীতিবাদের একটি আলোকস্তম্ভ। অরবিন্দ কিন্তু ছয় বৎসর পূর্ব্বেই এই আলোকস্তম্ভের আলোককে পথভ্রান্তকারী মরীচিকা বলিয়া ভারতবাসীকে বারংবার সাবধান করিয়া দিয়াছেন। অরবিন্দ এক্ষেত্রে আদর্শবাদী। তাঁহার আদর্শ বাস্তব হইতে বিচ্ছিন্ন অথবা বাস্তবের সহিত সংযুক্ত, ইহা ধীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার বিষয়।

মিঃ তিলক অরবিন্দের মত অতদূর উচ্চ আদর্শবাদীও নহেন, আবার দত্ত মহাশয়ের মত অত নীচু মডারেট নীতিবাদীও নহেন। তিলকের আদর্শবাদ যদি কিছু থাকে—আমরা মনে করি, আছে—তবে তাহা বাস্তবকে ছাড়াইয়া

নহে, বাস্তবের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অরবিন্দ ও রমেশ দত্তের মাঝামাঝি স্থানে আমরা তিলককে দণ্ডায়মান দেখিতে পাই।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা: এইবার এই এক বৎসরকালের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার গতিবিধি অনুসরণ করা যাক্। আমরা দেখিয়াছি ১৮৯৯।১৬ই আগষ্ট স্বামীজী ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া নিউইয়র্কে রওনা হইলেন। নিউইয়র্কে মাত্র কয়েক ঘণ্টা ছিলেন। সেখান হইতে ১৫০ মাইল দূরে মিঃ ও মিসেস্ লিগেটের অতিথিরূপে তাঁহাদের পল্লীভবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মাসখানেক পর ভগিনী নিবেদিতাও ইংলণ্ড হইতে সেই পল্লীভবনে গিয়া স্বামীজীর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে নিউইয়র্কে ১৫ই অক্টোবর স্বামী অভেদানন্দ বেদান্ত সমিতির জন্য একটি গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার এক সপ্তাহ পর হইতে বেদান্তের বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তরক্লাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৮ই নভেম্বর তারিখে ঐ বেদান্ত সমিতির গৃহে স্বামীজী আসিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন এবং নিউইয়র্কের নিকটবর্ত্তী বোষ্টন, ডিট্রয়েট, ব্রুকলিন্ সহরে গমনাগমন করিলেন। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ক্যালিফোর্ণিয়ার দিকে রওনা হইলেন। পথে অবশ্য চিকাগোতে থামিতে হইয়াছিল। ১৮৯৯ ডিসেম্বর হইতে ১৯০০ জুন পর্য্যন্ত, এই সাত মাস কাল তিনি একাদিক্রমে ঐ স্থানে বাস করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে ৮ই ডিসেম্বর তিনি বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিলেন। এই সময় হইতেই তিনি শিষ্য ও শিষ্যাদিগকে রাজযোগ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। আধুনিক সাধকসাধিকাদের মধ্যে সম্প্রতি যোগের প্রতি যে একটা আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়, ১৯০০ ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামীজী ক্যালিফোর্ণিয়াতে তাহার সূত্রপাত করেন। পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার উপলক্ষ্যে পাতঞ্জল প্রভৃতি শাস্ত্র-নির্দিষ্ট যোগশিক্ষার প্রবর্ত্তন এযুগে এ-ই প্রথম। ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে তিনি ক্যালিফোর্ণিয়ার রাজধানী সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার গোল্ডেন্ গেট হলে (Golden Gate Hall) 'সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের আদর্শ" নামক বিখ্যাত বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ১৮ই এপ্রিল স্বামীজী তাঁহার শিষ্যা মিস্ ম্যাকলিয়ডকে এক স্মরণীয় পত্র লিখিলেন। যথা—"লড়াই-এ হারজিত দুই-ই হ'ল—এখন পুঁটলীপাঁট্‌লী বেঁধে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় বসে আছি। 'অব শিব পার কর মেরে নাইয়া'—হে শিব, হে শিব। আমার তরী পার করে নিয়ে যাও

প্রভু!" মে মাসের শেষে স্বামীজীর শিষ্য ও শিষ্যা লিগেট-দম্পতী লণ্ডন হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন যে—জুলাই মাসে তাঁহারা প্যারিসে যাইবেন, স্বামীজীও যেন সেই সময় প্যারিসে গিয়া তাঁহাদের অতিথি হ'ন। প্যারিসে একটি বিরাট প্রদর্শনী হইবে। ঐ প্রদর্শনীর 'ধর্ম্মের ইতিহাস সভার' পক্ষ হইতে স্বামীজীও প্যারিসে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ পাইলেন। সুতরাং ক্যালিফোর্ণিয়া হইতে তিনি চিকাগো ও ডিট্রয়েটে কিছুক্ষণের জন্য থামিয়া, নিউইয়র্কে ফিরিয়া বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠিত বাড়ীতে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। ইহা সম্ভবতঃ জুন মাসের প্রথম দিকেই হইবার কথা। কেননা, এই সময়ে ভগিনী নিবেদিতাকেও আমরা স্বামীজীর সহিত নিউইয়র্কে দেখিতে পাই।

১৯০০ জুন মাসে নিউইয়র্ক সহরে স্বামীজীর প্রেরণায় ও তথাকার বেদান্ত সমিতির আগ্রহে ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রত্যেক শনিবার ও রবিবার বৈকালে অনেকগুলি বক্তৃতা দিলেন। ১৭ই জুন তিনি হিন্দু নারীদিগের জীবনের উচ্চ আদর্শ সম্পর্কে এক অতি মনোরম বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ২৪শে জুন "প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা" সম্পর্কে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া আর এক বক্তৃতা দিলেন (* ট)। তখন কোন ওকাকুরা বা অবনীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ বা পরিচয় হয় নাই। সুতরাং ভারতীয় শিল্পকলায় স্বামীজীর নিকটেই তাঁহার প্রথম হাতেখড়ি হইয়াছিল। ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে স্বামীজীর

(* ট) এইসকল বক্তৃতার কিছু কিছু অংশ "*The Master As I Saw Him*" গ্রন্থের Appendix C to Chapter XVI ও Appendix D-তে পাওয়া যায়। এই অংশগুলি হইতে দুইটি প্রসঙ্গ আমরা উল্লেখ করিব। ১ম—Freedom। ভগিনী নিবেদিতা বলিতেছেন: "However mistaken we may be, as to the method, all our struggle is really for Freedom. We seek neither misery nor happiness, but Freedom……You Americans are always looking for more pleasure, more enjoyment. You cannot be satisfied. True, but at bottom what you seek is Freedom……What then can satisfy man? Not gold. Not joy. Not beauty. One Infinite alone can satisfy him, and that Infinite is himself. When he realises this, then alone comes Freedom."—মনস্তত্ত্বের দিক হইতে Freedom-এর এক নূতন ব্যাখ্যা আমরা পাইলাম। ইহা স্বামীজী অনুপ্রাণিত বলিয়াই মনে হইতেছে। ২য়—The Worship of the Divine Mother। ভগিনী নিবেদিতা বলিতেছেন: "Mother-worship is a

গবেষণা ও পরিকল্পনা লইয়া এ পর্য্যন্ত কোনই আলোচনা কেহ করেন নাই। শুধু কি ভারতীয়, স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশের শিল্পকলা সম্বন্ধেও একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"ইউরোপীয় ভাস্কর্য্য চিত্র প্রভৃতির কথা বারান্তরে উদাহরণ সহিত বলিবার ইচ্ছা রইল। সে এক প্রকাণ্ড বিষয়।"—(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—পৃঃ ১২৪)।

ভগিনী নিবেদিতার এই দুইটি বক্তৃতার সঙ্গে অরবিন্দের যোগ আছে। ৬ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৯৪ খৃঃ) বঙ্কিম-প্রসঙ্গে অরবিন্দ বাঙ্গালী হিন্দুমেয়েদের জীবনের আদর্শ সম্পর্কে অনেক প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতার সহিত তিনি একমত। পরবর্ত্তীকালে প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা সম্পর্কে অরবিন্দ যে-সব কথা বলিয়াছেন, তাহাতেও ভগিনী নিবেদিতার সহিত তাঁহার মতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

ভগিনী নিবেদিতার উল্লিখিত দুইটি বক্তৃতায় স্বামীজীর যে যথেষ্ট প্রেরণা

---

distinct philosophy in itself. Power is the first of our ideas. It impinges upon man, at every step. Power felt within. is the soul ; without, nature. And the battle between the two makes human life. All that we know or feel is but the resultant of these two forces.···The Mother-idea was born. Activity, according to Sankhya, belongs to *Prakriti*, to nature—not to *Purusha*, or soul. Of all feminine types in India, the mother is pre-eminent··· The thinker of this philosophy has been struck by the idea that *one* power is behind all phenomena···with *Sakti* comes the idea of One Universal Power. 'I stretch the bow of Rudra, when He desires to Kill,' says *Sakti*. The Upanishads did not develop this thought ; for Vedanta does not care for the God-idea." এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার মুখে আমরা সাংখ্যের প্রকৃতি ও শাক্তের শক্তির কথা শুনিলাম। কিন্তু বৈষ্ণবের হ্লাদিনীর কথা শুনিলাম না। কেননা, হ্লাদিনী Mother নহেন—'কৃষ্ণকে আহ্লাদে, তার নাম আহ্লাদিনী' (চৈঃ, চঃ)। কিন্তু হ্লাদিনীও প্রকৃতি এবং শক্তির মত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী।

তা যাই হউক, এক্ষেত্রেও ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর দ্বারাই অনুপ্রাণিত বলিয়া মনে হইতেছে। বাঙ্গালী সাধকের নিকট Mother-worship বিলাস নয়—শক্ত বস্তু।

বিদ্যমান, তাহা আমরা উক্ত দুই বিষয়ে স্বামীজীর লেখা হইতে বুঝিতে পারি। স্বামীজী, ভগিনী নিবেদিতা ও অরবিন্দ—এইকালে ই হারা তিনজনেই প্রায় অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। এইদিক দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর নিজহাতে গড়া ইস্পাতের একখানি তরবারি—যেমন ধারালো, তেমনি চক্‌চকে ও উজ্জ্বল। ২০শে জুলাই স্বামীজী নিউইয়র্ক হইতে প্যারিসের দিকে রওনা হইয়া গেলেন। এবং প্যারিসে পৌঁছিয়া সেই পূর্ব্বতন লিগেট-দম্পতীর অতিথি হইলেন। ইহার পরেই প্যারিস প্রদর্শনীর কথা।

অরবিন্দও সেই সঙ্গে তাঁহার চারিপার্শ্বের ঘটনাগুলি লইয়া আমরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষধাপে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ইহার পরেই আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম সোপানে আসিয়া উপস্থিত হইব। উনবিংশ অপেক্ষা বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের সহিত অরবিন্দের জীবন অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমরা দেখিতে পাইব, অরবিন্দ বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার সৃষ্টির আলোচনা-প্রসঙ্গে স্রষ্টাকে অধিকতর স্পষ্টরূপে দেখা যাইবে—যদিও তাঁহার জীবনের কোন কোন অংশ এক অতি ভয়াবহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইতেছে।

বয়স আটাশ বৎসর (১৯০০।১৫ই আগষ্ট—১৯০১।১৪ই আগষ্ট) :

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী ★ অরবিন্দের বিবাহ ★ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ★ স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা ★ কংগ্রেস

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী : উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইয়া গেল। সম্মুখে বিংশ শতাব্দীর প্রবেশদ্বার। গত শতাব্দীর সমারোহপূর্ণ ইতিহাস আমরা অতিক্রম করিয়া আসিলাম।

রাজা রামমোহনের মূর্ত্তিপূজা-বিরোধী ধর্ম্মসংস্কার, সতীদাহ নিবারণরূপ সমাজ-সংস্কার এবং স্বাধীন ভারতরূপ রাজনৈতিক স্বপ্ন আমরা দেখিয়াছি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক বেদের অভ্রান্ততা ও প্রামাণ্যমর্য্যাদা অস্বীকার, রাজনারায়ণ বসুর হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির উদ্দীপনা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন, মাইকেলের মেঘনাদ বধ, বঙ্কিমের উপন্যাস বিশেষতঃ আনন্দমঠ, কেশবচন্দ্রের তিন-আইনের জাতিভেদ-

ভঙ্গকারী অসবর্ণ বিবাহ, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়, স্বামী বিবেকানন্দের 'ফেলেদে নিজের মুক্তি, ফেলেদে ধ্যান ; মানুষ কি কথা, দেশের একটা কুকুর যতদিন অভুক্ত থাকবে, ততদিন তাকে আহার দেওয়াই আমার ধর্ম্ম, আর সব অধর্ম্ম'—ইত্যাদি বজ্রধ্বনির মধ্যে ১৯০০।ডিসেম্বরে উনবিংশ শতাব্দী তাহার শেষ চিতাশয্যা রচনা করিল। ৯।১২।১৯০০ রাত্রে স্বামীজী ইউরোপ হইতে বেলুড়মঠে ফিরিয়া আসিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দেড় বৎসর স্বামীজী দেশে অবস্থান করিয়াই বেলুড়মঠে দেহরক্ষা (৪ঠা জুলাই, ১৯০২) করিলেন। এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইল।

অরবিন্দ ২৯ বৎসর বয়সে এই বিংশ শতাব্দীর প্রবেশদ্বারে প্রথম পদার্পণ করিতেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে আমরা স্বামীজীর জীবনকে একটা জগদ্ব্যাপী আলোড়নের মধ্যে দেখিয়া আসিয়াছি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে অথবা প্রথম দশকের শেষার্দ্ধে (১৯০৬-১৯১০ খৃঃ) অরবিন্দের জীবনকেও আমরা দ্বাদশ সূর্য্যের কিরণে উদ্ভাসিত দেখিতে পাইব। উনবিংশের সহিত বিংশ শতাব্দীর যোগসূত্র, অরবিন্দের জীবনের মধ্যে আমরা অনুসন্ধান করিব। এবং এই যোগসূত্র বা যোগাযোগ বাহির করিতে পারিলেই শ্রীঅরবিন্দের জীবনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে।

অরবিন্দের বিবাহ : আমরা দীনেন্দ্রকুমার রায়ের নিকট শুনিয়াছি—"এই সময় অরবিন্দ বিবাহের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন" (অঃ-প্রঃ, পৃঃ ৬২)। এইরূপ উৎসুক হওয়ার ফলে তিনি খবরের কাগজে স্পষ্ট বিজ্ঞাপন দিলেন যে, তিনি বিবাহ করিবেন এবং সেজন্য পাত্রী চাই। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসু অরবিন্দের শ্বশুরের খুব বন্ধু ছিলেন। তিনিই অগ্রবর্ত্তী হইয়া ঘটকালী করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় গিরীশবাবুর বাড়ীতেই অরবিন্দ নিজে আসিয়া ক'নে দেখিয়া পছন্দ করিয়া গেলেন। বিবাহের কথা পাকা হইয়া গেল। অরবিন্দ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত যুবক, অরবিন্দের শ্বশুর ভূপাল বসু বিলাতফেরৎ হিন্দু। অরবিন্দ ও ভূপালবাবু, ভাবী জামাতা ও ভাবী শ্বশুর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার হিন্দু হইলেন। কনের খুড়া কিংবা জ্যাঠা, কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কলিকাতা বৈঠকখানা রোডস্থিত কোন এক ভাড়াটে বাড়ীতে অরবিন্দের বিবাহকার্য্য একেবারে নিখুঁত হিন্দুমতে (সুতরাং নায় শালগ্রামশিলা এবং যজ্ঞাগ্নি সম্মুখে) সুসম্পন্ন হইল।

বিবাহ-বাসরে উপস্থিত ছিলেন—লর্ড সিংহ, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, গিরীশ বসু, স্যার জগদীশ বসু প্রভৃতি।

১৯০১। এপ্রিলের শেষভাগে (১৬ই বৈশাখ, ১৩০৮) বিবাহ হয়। তখন অরবিন্দের ২৯ বৎসর পূর্ণ হইতে সাড়ে তিন মাস বাকী; আর তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষ তখন ১৪ বৎসর অতিক্রম করিয়া সবে দেড় মাস হয় পঞ্চদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। অরবিন্দের স্ত্রীর জন্ম-তারিখ ৬ই মার্চ্চ, ১৮৮৭ খৃঃ (২৫শে ফাল্গুন, ১২৯৪ সাল)।

বিবাহের অব্যবহিত পরেই অরবিন্দ তাঁহার নব-পরিণীতা স্ত্রীকে লইয়া প্রথম দেওঘর গেলেন, পরে নৈনিতাল পাহাড়ে গেলেন এবং সেখান হইতে পুনরায় তাঁহার কর্ম্মস্থল বরোদায় ফিরিয়া গেলেন।

অরবিন্দের স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে যে ফটো আমরা দেখিতে পাই, তাহা বিবাহের পর এই নৈনিতালেই তোলা হয় (* ক)।

(* ক) শ্রীঅরবিন্দের শ্যালক ডাঃ শিশিরকুমার বসু তাঁহার এক আত্মীয়কে শ্রীঅরবিন্দের বিবাহ সম্পর্কে যে-সকল কথা লিখিয়া জানাইয়াছিলেন, আমরা তাহা হইতে অবিকল নকল করিয়া এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

1. Sri Arabindo advertised in news-papers for a bride. My father's lifelong friend Late Principal Grish Ch. Bose of Bangabasi College negotiated the marriage. Sri Arabindo saw my sister in Grish Babu's house personally, and selected his bride.

2. Marriage ceremony was performed according to strict Hindu rites. Sri Arabindo being a Brahmo and my sister being the daughter of an England returned Hindu, both of them had to be purified by *Prayaschitta* before marriage. My uncle gave away the bride.

3. Principal guests at the marriage were: late Lord Sinha, Boymkesh Chakravorty, Principal G. C. Bose, Late Sir J. C. Bose and others.

4. Location of the marriage: in a rented house in Baitak-Khana Road, Calcutta.

5. Date of marriage of Sri Arabindo: 16th Baisak, 1308 (April, 1901). My sister at the time of her marriage had

বিবাহ হইয়া গেল। অরবিন্দ সস্ত্রীক বরোদায় ফিরিলেন। এ বৎসরে অরবিন্দের জীবনে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘটনা। ১৯০১।১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তিনি সস্ত্রীক বরোদাতেই অবস্থান করিবেন, ইহাও ঠিক।

এখন অরবিন্দের এই বিবাহ সম্পর্কে যে গুটিকয়েক কথা আমাদের মনে জাগিতেছে, তা এই অবসরে বলিয়া ফেলাই ভাল।

আমরা দেখিয়াছি যে—অরবিন্দের পিতা ডাঃ কে. ডি. ঘোষ শুধু ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত ব্যক্তি নহেন, তিনি একেবারে পুরাদস্তর সাহেব। তাঁহার মত সাহেবিয়ানা তখনকার দিনে W. C. Banerjiর মত দু'একজন ব্যক্তি ছাড়া আর কাহাকেও করিতে দেখা যায় না। ব্রাহ্মসমাজ ও পাকা সাহেবিয়ানার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, এবং ৭ বৎসর বয়স হইতে একাদিক্রমে ১৪ বৎসর বিলাতে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়াই ফিরিঙ্গী-ভাবাপন্ন মেয়েদের প্রাণ খুলিয়া "ইন্দুপ্রকাশে" গালি দিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, নিজের অর্দ্ধেক বয়সের একজন বালিকাকে এমন নিখুঁত হিন্দুমতে বিবাহ করিলেন কেন? তাঁহার সম্মুখে যে দুইটি বিবাহের দৃষ্টান্ত ছিল, তাহা ত অরবিন্দের বিবাহের অনুরূপ নয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৮৯৭।৩রা ডিসেম্বর (বাংলা : ১৯শে অগ্রহায়ণ) তিন-আইন মতে ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করেন। অরবিন্দের মধ্যম অগ্রজ অধ্যাপক ও কবি মনোমোহন ঘোষ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিন-আইন মতেই ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত একটি অতি সুন্দরী ব্রাহ্মণকন্যাকেই বিবাহ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও অধ্যাপক মনো-মোহন ঘোষ উভয়েই বিবাহ-ব্যাপারে জাতিভেদ ভঙ্গ করিয়াছেন, আইনের আশ্রয় লইয়াছেন এবং হিন্দুমতে বিবাহ করেন নাই। অরবিন্দ নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কেননা, একজন তাঁহার বন্ধু এবং আর একজন তাঁহার সহোদর ভাই।

তারপরে ১৮৬৪ খৃঃ অরবিন্দের পিতা যে বিবাহ করেন, রাজনারায়ণ বাবু যদিও ঐ বিবাহকে ব্রাহ্ম-বিবাহ বলিয়াছেন, কিন্তু উহাতে জাতিভেদ ভঙ্গ করাও

---

just completed her 14th year. Sister's birth-day was 6th March, 1887 (25th Falgoon, 1294).

6. Soon after marriage, Sri Arabindo returned to Baroda with his wife *via* Deoghar and Nainital. The popular photogragh in which Sri Arabindo is seen with his wife was taken at Nainital.—[*25. 11. 41. Ranchi—Sisir Bose*]

হয় নাই এবং আইনের আশ্রয়ও লওয়া হয় নাই। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের তিন-আইনের বিবাহ করা সম্ভব নয়। কিন্তু শুনা যায়—ডাঃ কে. ডি. ঘোষ তাঁহার প্রথম দুই পুত্র জন্মিবার পরে, এবং অরবিন্দ মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় নাকি তাঁহার দুই দুইটি পুত্রবতী ও গর্ভবতী স্ত্রীকে পুনরায় ১৮৭২ খৃঃ তিন-আইন মতে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহা সত্য হইলে, একথা অরবিন্দের অবিদিত ছিল না। ডাঃ কে. ডি. ঘোষের মত নির্ভীক ব্যক্তির পক্ষে এরূপ আশ্চর্য্য কাণ্ড করা কিছু অসম্ভবও নয় (* খ)। সুতরাং এত সব সত্ত্বেও অরবিন্দ যে জাতি রক্ষা করিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, হিন্দুমতে বিবাহ করিলেন—ইহাতে অরবিন্দের তখনকার মনের একটা সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা পাই। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে থাকিতে চাহেন না। তিনি হিন্দু সমাজভুক্ত হইতে চাহেন। * এবং হইলেনও তাই। এখন প্রশ্নঃ অরবিন্দের এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি?

শুধু হিন্দুর অখাদ্য খাইয়াছিলেন বলিয়াই কি তিনি গোবর খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন—না, হিন্দুর স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা, হিন্দুর স্বাজাত্যবোধ ও জাতীয় গৌরবে তিনি উদ্দীপিত হইয়াছিলেন?

বিবাহের পূর্ব্বে অরবিন্দের মনের ইতিহাসের পাতা কিছুটা উল্টাইয়া দেখা প্রয়োজন।

প্রথম—বিবাহের ৯।১০ বৎসর পূর্ব্বে কেম্ব্রিজে থাকাকালীন অরবিন্দ যে-সকল প্রেমের কবিতা লিখিয়াছিলেন—তা আমরা দেখিয়াছি। ঐ সময় Edith ও Estelle নামে দুইটি মেয়ের নাম করিয়া তিনি প্রাণ খুলিয়া প্রেমের কবিতা লিখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বিবাহের কথা ভাবেন নাই।

(* খ) ডাঃ কে. ডি. ঘোষের বিবাহ ১৮৬৪ খৃঃ হয়। সুতরাং ১৮৭২ খৃঃ Act III অনুযায়ী বিবাহ হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দের ছোট মাসী শ্রীযুক্তা লজ্জাবতী বসু আমাদিগকে ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের পুত্র শ্রীসুকুমার মিত্র দ্বারা (১৩।৬।৪০) জানাইয়াছেন যে, "১৮৭২-এর পর ডাঃ কে. ডি. ঘোষ তাঁহার বিবাহ পুনরায় Act III অনুযায়ী রেজেষ্ট্রী করিয়াছিলেন। কারণ? যাহাতে তাঁহার পুত্র শ্রীঅরবিন্দ I. C. S. পাশ হইলে তাঁহার পিতা-মাতার বিবাহ আইনতঃ গ্রাহ্য হইতে পারে।" কিন্তু ইহাতে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গেল। কেননা, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পর অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের জন্মের পর ডাঃ কে. ডি. ঘোষ তাঁহার বিবাহ Act III অনুযায়ী রেজেষ্ট্রী করিলে, প্রথম তিন পুত্র সহ অরবিন্দ আইনের চক্ষে অবৈধ সন্তান বলিয়া পরিগণিত হন।

Edithকে বলিয়াছিলেন—"তুমি আমায় চুম্বন কর" ("Kiss me Edith")। তারপর বলিয়াছিলেন—"তোমার বুকের মধ্যে আমায় লুকাইয়া রাখ"—

"In thy bosom's snow white walls
Softly and supremely housed
Shut my heart up ;—"

Estelleকে বলিয়াছিলেন—"আমি তোমায় সুখ দিব, আমার দিকে তাকাও। আমার অন্তর-দুয়ার তোমার জন্য সর্ব্বক্ষণ খোলা রহিয়াছে"

"Turn hither for felicity,
And all these lights are thine and
open doors on thee."…ইত্যাদি।

এডিথ-এষ্টেলে মস্‌গুল তরুণ অরবিন্দ তখন পুরাদস্তুরই ইংরেজ যুবকের মত ইংরেজ অথবা ফরাসী তরুণীর নিকট প্রেম নিবেদন করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসমাজ, প্রায়শ্চিত্ত, হিন্দুমতে ১৪ বছরের ক'নে বিবাহ—এসব কিছুই তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। তাঁহার ভাবী পত্নী মৃণালিনীর বয়স তখন তিন কি চার হইবে। আর ঐ তিন-চার বৎসরের শিশুই যে তাঁহার ভাবী ধর্ম্মপত্নী, একথাই বা তিনি জানিবেন কি করিয়া ?

দ্বিতীয়—১৮৯৪ খৃঃ বিবাহের ৭ বৎসর পূর্ব্বে "ইন্দুপ্রকাশে" বঙ্কিম-প্রসঙ্গে অরবিন্দ লিখিয়াছেন—

"বঙ্কিম হিন্দু-মেয়েদের প্রাণে প্রেম ও হৃদয়ে মহত্ত্ব দেখিতে পাইয়াছিলেন। হিন্দু মেয়েদের প্রেমের গভীরতা, একনিষ্ঠতা, কোমলতা প্রভৃতি বঙ্কিমের উপন্যাসের পাতায় পাতায় জ্বলিতেছে।…

"ব্রাহ্ম-সংস্কারকেরা যে-শ্রেণীর আধুনিক-শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়ে তৈয়ার করিতেছেন—ঐসকল মেয়েরা প্রাণহীন ; তাহারা কেবল জানে ভাসা ভাসা পিরীত করিতে, বিবাহ করিতে, আর পিয়ানো বাজাইতে। আমরা এ-রকম মেয়ে চাই না।…

"বাংলার মেয়েদের অভিবাদন করি। কেননা, তাঁহারা বাংলা-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠিকা। তাঁহারা বাংলা সাহিত্যকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা বিদেশী ভাষার নিকট আত্মবিক্রয় করেন নাই।…

"আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে বঙ্কিম-অনুপ্রাণিত স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপিত তরুণ-তরুণীদের উপর। এবং নির্ভর করিতেছে না দুইটি অনুষ্ঠানের উপর। একটি বিজাতীয় কংগ্রেস, আর একটি বিজাতীয় সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ (* গ)।"

সুতরাং বিলাত হইতে ফিরিয়াই এডিথ এষ্টেলের মোহ তাঁহার কাটিয়া গেল। বঙ্কিমের উপন্যাস দ্বারা তিনি অতিমাত্রায় প্রভাবান্বিত হইয়া, ঐ উপন্যাসের নায়িকা আশা করিয়া, তিনি গোবর খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ১৪ বৎসরের হিন্দু-মেয়েকে নির্জলা হিন্দুমতে বিবাহ করিলেন।

শুধু আবেদন-পীড়িত কংগ্রেস নয়, বিজাতীয় ভাবাপন্ন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপরেও তিনি সমান খাপ্পা। সুতরাং ব্রাহ্ম-সমাজে এবং ব্রাহ্মমতে বিবাহ ত দূরের কথা, তিনি বিবাহার্থী হইয়া কোন ব্রাহ্ম-মেয়েকে দেখিতে পর্য্যন্ত অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। এখন এই বিবাহের বৎসরটায় চারিদিকে ঘটনাগুলির দিকে তাকাইয়া দেখা যাক্।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব : ইঁহার কথা কিছুই বলা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চার অধ্যায়ে'র গোড়াতেই প্রথমবারে ইঁহার সম্বন্ধে যা লিখিয়াছিলেন,

---

(* গ) "Bankim saw what was lovely and noble in Hindu woman, her deep heart of emotion, her steadfastness, tenderness and loveliness, in fact her woman's soul ; and all this we find burning in his pages and diviner by the touch of a poet and an artist.···Our social reformers······have turned out a soulless and superficial being fit only for flirtation, match-making and playing on the piano,"—[*Induprokash—13th August, 1894*]

"All honour then to the women of Bengal, whose cultural appreciation kept Bengali literature alive ! ·· ··· and who adhered to the language of our forefathers spoke and did not sell themselves to the tongue of the foreigner. ··· A generation whose imagination Bankim has caught, with that generation the future lies and not with Indian un-National Congress or the Sadharan Brahmo Samaj."—[*Induprokash—27th August, 1894*]

এবং বোলপুর আশ্রমের গোড়াপত্তনে ইঁহার পরামর্শ ও সহায়তার কথা যাহা লেখেন নাই—এই উভয় ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ অবিচার করিয়াছেন। কেননা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে। সুখের বিষয় 'চার অধ্যায়ে'র পরবর্ত্তী সংস্করণে ব্রহ্মবান্ধব-সম্পর্কিত সত্যমিথ্যা উক্তিগুলি কবিগুরু নিজেই তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া মুছিয়া দিয়া গিয়াছেন।

অরবিন্দ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরোদার চাকরি ছাড়িয়া বাংলাদেশে আসিবার পর হইতেই ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যু (১৯০৭।২৭শে অক্টোবর) পর্য্যন্ত দেশের জন্য বাংলার তৎকালীন চরমপন্থী রাজনীতিক্ষেত্রে একত্রে কাজ করিয়াছেন। যেমন অপর সকলে, তেমনি অরবিন্দও ব্রাহ্মবান্ধবকে অশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

অরবিন্দের বিবাহ-বৎসরে ব্রহ্মবান্ধব কি করিতেছেন, যদিও তাহাই আমরা দেখিব, তথাপি যে-ব্যক্তি অরবিন্দ জন্মিবার ১১ বৎসর আগে (১৮৬১ খৃঃ) কলিকাতায় ভূমিষ্ঠ হইয়া নিজের স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মত লইয়া জীবনকে গড়িতেছেন, ভাঙ্গিতেছেন, ভাঙ্গিয়া গড়িতেছেন—তাঁহার অতীত জীবনের ৪০ বৎসর এমনি একটা ইতিহাস যাহা না-জানিলে বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা, এই নির্ভীক অমিততেজা ব্রাহ্মণের জীবন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে গতানুগতিক পথে একেবারেই চলে নাই। আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মবান্ধবের জীবন নির্ভীকতা, মননশীলতা ও স্বাধীন চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে। সুতরাং এরকম জীবন বুঝিয়া উঠা সহজ নয়—কঠিন!

ব্রহ্মবান্ধব সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার সত্য নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার খুল্লতাত ছিলেন প্রসিদ্ধ দার্শনিক এবং খৃষ্টান কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রহ্মবান্ধবের ধর্ম্ম-জীবনের রূপান্তর এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার। প্রথমে তিনি কেশবচন্দ্রের শিষ্য হইয়া ব্রাহ্ম হইলেন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি সিন্ধুদেশে (Sind) গমন করেন। সেইখানেই তিনি খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। আর যেটুকু বাকী থাকিল, তা খুল্লতাত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রীতিমত খৃষ্টধর্ম্মের দীক্ষা দিয়া খৃষ্টান করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আরও কথা আছে। কেশব-ভক্তের পক্ষে খৃষ্টধর্ম্মে আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এককালে কেশবচন্দ্রের মধ্যেই 'খৃষ্ট-বিভীষিকা' দেখিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবান্ধবের খৃষ্টান-ধর্মজীবনেও সংঘাত আছে। তিনি এক সম্প্রদায়ে চিরদিন আবদ্ধ থাকিবার ব্যক্তি নহেন। কাজেই প্রথমে হইলেন তিনি রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী—গৃহী নাম পরিত্যাগ করিলেন। পরে প্রোটেষ্টাণ্ট হইতে তাঁহার বেশী বিলম্ব হইল না।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হন। এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বেদান্তের প্রতি অনুরাগ আরও বৃদ্ধি পায়।

অরবিন্দের বিবাহ-বৎসরে ব্রহ্মবান্ধবের জীবনে আবার একটা নূতন পরিবর্তন দেখা দেয়। ইহা ব্রহ্মবান্ধবের চিন্তাধারার এক অতি গৌরবময় স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য। এই বৎসরে তিনি N. Gupta-এর সহিত একত্রে "The Twentieth Century" কাগজে এবং 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তাঁহার নূতন মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন ঠিক অরবিন্দের বিবাহ-বৎসর কেন, বিবাহের মাসে (April, 1901) 'বঙ্গদর্শনে' তাঁহার স্বাধীন চিন্তাধারার পরিচয় পাই (* গ)।

১৯০১ খৃঃ এপ্রিল মাসে বিবাহের পূর্ব্বে অরবিন্দ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু-সমাজে ফিরিয়া আসিলেন—ইহা আমরা দেখিয়াছি। ঠিক একমাস পরে (১৯০১।জুন) ব্রহ্মবান্ধব একদিন হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—'আমাদের কিঞ্চিৎ গোবর খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে'('We must make প্রায়শ্চিত্ত, We must eat a little of cow-dung')। ইহার এক মাস পরে (১৯০ ।আগষ্ট) 'The

(* গ) "অনেকে হিন্দু-চিন্তার সহিত হিন্দু-ধর্ম্মমতসমূহ মিশাইয়া ফেলেন। তদ্রূপ ইউরোপীয় চিন্তা বলিতে ইউরোপে প্রচলিত ধর্ম্মমত বোঝেন। এইরূপ অন্যান্য ধর্ম্মারোপ ঘোর প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইউরোপীয় চিন্তা-প্রণালীর জন্মস্থান গ্রীকদেশ। কিন্তু বর্ত্তমান ইউরোপীয় ও প্রাচীন গ্রীকধর্ম্মে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, চিন্তা-প্রণালী ধর্ম্মমত হইতে পৃথক।

"হিন্দুস্থানে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়; ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছে—বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং। কিন্তু সমাহিত হইয়া দেখিলে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায় যে, একই চিন্তাস্রোত সকল বিভিন্নতার নিম্নদেশে ধারাবাহিকক্রমে চলিয়া আসিতেছে। সেই একনিষ্ঠতার গতি নির্দ্ধারণ করা যাউক।"—[বঙ্গদর্শন—April, 1901]. *The same thought pervades the pages of the TWENTIETH CENTURY.*

Twentieth Century' কাগজে ব্রহ্মবান্ধব এই প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিলেন (* ঘ)। ইহার ৬ বৎসর পরে মৃত্যুর মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে (১৯০৭।আগষ্ট) তিনি সত্যি হিন্দুমতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গলায় উপবীত ধারণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবান্ধবের জীবনও ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছে।

অরবিন্দের বিবাহ-বৎসরে ব্রহ্মবান্ধবের মতিগতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেল। দেখা গেল প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু-সমাজে ফিরে আসা সম্পর্কে একই সময়ে উভয়েই এক মত পোষণ করিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা : ১৯০০।১০ই জুলাই স্বামীজী নিউইয়র্কে ফিরিলেন। ২০শে জুলাই প্যারিস রওনা হইলেন। ২৩শে অক্টোবর প্যারিস হইতে বিদায় নিলেন। পুরা তিন মাসকাল স্বামীজী প্যারিসে ছিলেন। স্বামীজীর এই প্যারিস-প্রবাস একটি স্মরণীয় ঘটনা। স্বামীজীর বক্তৃতা ও লেখা সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে—চিকাগো-কন্‌ফারেন্স (১৮৯৩ খৃ·) অপেক্ষা প্যারিস-প্রদর্শনী (১৯০০ খৃঃ) দ্বারা স্বামীজী বেশী আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দেশাত্মবোধ, বাঙ্গালী-প্রীতি—এই প্যারিস-প্রদর্শনীতে স্বামীজীর মধ্যে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত বিকীর্ণ বিস্ফুরিত হইয়াছিল (* ঙ)। প্যারিস পরিত্যাগ করিয়া তিনি ভিয়েনা,

(* ঘ) "By social expiation is not meant internal purification but the performance of a humiliating act prescribed by the injured society as a public confession of sorrow for the guilty attempt of breaking social integrity.

"Social penances do not necessarily involve the question of religious faith. Hindu-society has never enforced uniformity in belief."—[*Twentieth Century*—August, 1901]

(* ঙ) "আজ ২৩শে অক্টোবর ; কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হইতে বিদায়। এ-বৎসর এ-প্যারিস সভ্য জগতের এক কেন্দ্র, এ-বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিক্‌দেশ সমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশদেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্ব্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলীমণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়,

হাঙ্গারি, সার্ভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, কনষ্টাণ্টিনোপল্, এথেন্স, ইজিপ্ট ভ্রমণে দেড় মাস অতিবাহিত করিয়া ১৯০০।৯ই ডিসেম্বর রাত্রিকালে অপ্রত্যাশিত-ভাবে বেলুড়মঠে প্রাচীর টপকাইয়া প্রবেশ করিয়া সকলকে চমকিত ও আনন্দিত করিলেন। এজীবনের মত পাশ্চাত্য দেশভ্রমণ এইখানেই শেষ হইল। সম্মুখে বিংশ শতাব্দীর আর মাত্র দেড়টি বৎসর বাকী।

১৭ দিন বেলুড়মঠে থাকিয়া ২৭শে ডিসেম্বর মায়াবতী আশ্রমে চলিয়া গেলেন। এক মাসের কিছু কম মায়াবতী থাকিয়া ১৯০১।২৪শে জানুয়ারী বেলুড়মঠে আবার ফিরিয়া আসিলেন। স্বামীজীর মায়াবতীতে তিন সপ্তাহ অবস্থানকালে ছুইটি ঘটনা বিশেষ স্মরণীয়।

প্রথম—মায়াবতী 'অদ্বৈত আশ্রমে' পরমহংসদেবের পূজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কেননা, কোনরূপ নরপূজা বা বাহ্য পূজানুষ্ঠান অদ্বৈতবাদীদের মতে অনাবশ্যক। ইহা লইয়া গোল বাধিল। পরে শ্রীশ্রীমা স্বামীজীকে সমর্থন করায় 'অদ্বৈত আশ্রমে' পরমহংসদেবের পূজা উঠিয়া গেল। সব গোলযোগ মিটিয়া গেল। স্বামীজী কত বড় অদ্বৈতবাদী ছিলেন, ইহা তার একটি প্রমাণ।

দ্বিতীয়—১৯০০। ডিসেম্বরশেষে লাহোরে কংগ্রেস হয়। সেই সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের সভা (Social Conference) হয়। মিঃ র‍্যাণাডে ঐ সভায় যে বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহাতে অবিবাহিত সন্ন্যাসীদের উপর রীতিমত কটাক্ষ ছিল। মিঃ র‍্যাণাডে বাংলাদেশের বিবাহিত ব্রাহ্ম নেতাদের ; যথা : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির নাম করিয়া বলেন যে—ইঁহারা সকলেই বিবাহ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন।

স্বামীজী মিঃ র‍্যাণাডের প্রতিবাদ করিয়া প্রবন্ধ ছাপাইলেন। স্বামীজী সন্ন্যাসের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। স্বামীজী বলিলেন—

বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু-গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হ'তে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস! একা, যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা-মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী, সাধ্বী, সর্ব্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধন করেন। ধন্য দম্পতী!"—['পরিব্রাজক']

"বেঁচে থাকুন র‍্যাণাডে ও সমাজ-সংস্কারকের দল। কিন্তু হে ভারত, হে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত ভারত! ভুলোনা বৎস, এই সমাজে এমন সব সমস্যা রয়েছে এখনও তুমি বা তোমার পাশ্চাত্য গুরু, যার মানেই বুঝতে পারছে না, মীমাংসা করা ত দূরের কথা।"

অরবিন্দ এই সময় বিবাহ করিতে 'উৎসুক'। স্বামীজী অপেক্ষা অন্তত: এক্ষেত্রে এইকালে তিনি র‍্যাণাডেকেই সমর্থন করিয়া থাকিবেন। কেননা, র‍্যাণাডে বৈদিকযুগে সন্ন্যাস ছিল না—এই কথা বলিয়া বক্তৃতা দিলেন ("Asceticism had not overshadowed the land, and life and its sweets were enjoyed in a spirit of joyous satisfaction.")। ইহার অনুরূপ কথা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম-প্রসঙ্গে অরবিন্দ নিজেও লিখিয়াছেন—তা আমরা দেখিয়াছি।

অরবিন্দের বিবাহের মাত্র তিন মাস আগে স্বামীজী ও র‍্যাণাডের মধ্যে সন্ন্যাস বনাম গার্হস্থ্য লইয়া যে তর্ক হয়, তা উপভোগ্য বটে।

১ মাস ২৪ দিন বেলুড়মঠে অবস্থান করিয়া স্বামীজী ১৯০১।১৮ই মার্চ্চ ঢাকা রওনা হইলেন। এক সপ্তাহ ঢাকা থাকিয়া তিনি লাঙ্গলবন্ধে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া আবার ঢাকা ফিরিয়া আসিলেন। পরে নাগ মহাশয়ের বাড়ী দেওভোগ গমন করিলেন। পরে কামাখ্যা ও চন্দ্রনাথ দর্শনে গমন করিলেন। তথা হইতে শিলং গেলেন। পরে মে মাসের মাঝামাঝি আবার বেলুড়মঠে অসুস্থ শরীর লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বহুমূত্র ও হাঁপানি রোগে ভুগিতেছিলেন।

স্বামীজি যখন ঢাকা ও আসাম ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় অরবিন্দ কলিকাতায় আসিয়া বিবাহ করিয়া দেওঘর হইয়া মধু-চন্দ্রমা (honey-moon) যাপনের জন্য নৈনিতাল গিয়া সস্ত্রীক ফটো তুলিলেন।

স্বামীজীর পীড়া কমিল না। জুন মাস কাটিয়া গেল। জুলাই মাসে গুরু-ভ্রাতাগণ কবিরাজ ডাকিয়া স্বামীজির চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। জলপান একদম নিষেধ হইয়া গেল। এইরূপে ১৯০১।আগষ্ট মাস আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভগিনী নিবেদিতার কথা এ বৎসরে বিশেষ কিছুই নাই। কেননা,

১৯০০।সেপ্টেম্বরে ফরাসীদেশে ব্রিটেনীতে ভগিনী নিবেদিতাকে স্বামীজী আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দেন। ভগিনী নিবেদিতা একাকী ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন। ইংলণ্ডে থাকিয়া তিনি তাঁহার বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন। এই সময় তিনি রমেশ দত্তের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—"In London, late in 1900, and throughout 1901, it was the pleasure and privilege of my friends and myself to see much of Mr. Dutt in many ways."

সুতরাং ১৯০১।আগষ্ট মাসে ভগিনী নিবেদিতা ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছেন। এবং ভগিনী নিবেদিতা ইংলণ্ডে থাকাকালে অরবিন্দের বিবাহ হইয়া গেল।

কংগ্রেস: ১৯০০।ডিসেম্বরশেষে লাহোরে কংগ্রেস হয়। সভাপতি—নারায়ণ চন্দ্রাভর্ক। "তখনই চন্দ্রাভর্ক মহাশয়ের হাইকোর্টের জাজ হইবার সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। তিনি কংগ্রেসের সভাপতির আসন হইতে সরাসরি 'ধূলাপায়ে' যাইয়া হাইকোর্টের জাজের আসনে উপবেশন করেন।…সভাপতির অভিভাষণে যতটা সতর্কতা ও সংযম ছিল, ততটা তেজ ছিল না।"—('কংগ্রেস, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—পৃ: ৮৫-৮৬)।

মিষ্টার চন্দ্রাভর্ক বলিলেন: ভারতবর্ষে পর পর দুইটি ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। এবং লর্ড কার্জ্জন এই দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের জন্য গত অক্টোবরে যে আশ্বাস দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। এই দুর্ভিক্ষ ভাইস্রয়ের সহানুভূতি উদ্রেক করিয়াছে এবং ইংরেজ আমলাতন্ত্রের সহিত দেশবাসীর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিয়াছে। লর্ড কার্জ্জন ভারতবাসীর হৃদয় জয় করিয়াছেন…ইত্যাদি ("That Lord Curzon has won the hearts of the people and the people trust in him, goes without saying.")। এবং তারপরে কংগ্রেসকে "loyal trust in the sense of justice and righteousness of the Government of Her Majesty the Queen-Empress" বলিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সুতরাং এবারকার সভাপতির বক্তৃতা অরবিন্দের মনঃপূত না হইবারই কথা।

বয়স উনত্রিশ বৎসর (১৯০১।১৫ই আগষ্ট—১৯০২।১৪ই আগষ্ট) :

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা ★ রেভারেণ্ড ওডা ও মিঃ ওকাকুরা ★ স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাব—ভগিনী নিবেদিতা ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ★ ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ ★ বিপিনচন্দ্র পাল ★ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ★ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভগিনী নিবেদিতা ★ কলিকাতা কংগ্রেস (১৯০১ ; প্রেসিডেণ্ট—দীন্‌শা ওয়াচা) ★ বাংলাদেশে শিবাজী উৎসব ★ শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ও ব্যারিষ্টার পি. মিত্র ★ বাংলাদেশে বিপ্লবকর্ম্মের সূত্রপাত—অরবিন্দের নেতৃত্ব

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা : স্বামীজী বেলুড়মঠেই অবস্থান করিতেছেন। শরীর ভাল নয়। চিকিৎসা চলিতেছে। স্বামীজীর সন্ন্যাসে অধিকার লইয়া নানাদিক হইতে নানারকম প্রশ্ন উঠিয়াছে। ইহা আমাদের সামাজিক আবেষ্টনের একটি বিশেষ কুৎসিত পরিচয়।—তিনি পাশ্চাত্যদেশে কয়েক বৎসর কাটাইয়া আসিয়াছেন, হিন্দুর অখাদ্য খাইয়াছেন, বিলাতী মেম তাঁহার শিষ্যা, গেরুয়া পরেন বটে কিন্তু ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন! এরকমটা আগে কেহ দেখে নাই। গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসমান সমাজ নূতন কিছু দেখিলেই আঁত্‌কে উঠে, নিন্দাও করে। গঙ্গাবক্ষে 'চল্‌তি নৌকার আরোহিগণ বেলুড়মঠ দেখিয়াই নানারূপ ঠাট্টা-তামাসা করিত এবং এমন কি সময় সময় অলীক অশ্লীল কুৎসার অবতারণা করিয়া নিষ্কলঙ্ক স্বামীজীর অমল-ধবল চরিত্র আলোচনাতেও কুণ্ঠিত হইত না।' লোকনিন্দারূপ রাক্ষসীর হস্ত হইতে স্বামী বিবেকানন্দের মত ব্যক্তিরও নিস্তার নাই। অপরের কা কথা। এই সকল নিন্দা কানাঘুষা শুনিয়া স্বামীজী বলিতেন— "হাতী চলে বাজারমে, কুত্তা ভুকে হাজার। সাধুনকো দুর্ভাব নেহি, যব নিন্দে সংসার।' কুত্তা ? ঠিক মুখের মত জবাব। কিন্তু তবু কুত্তা ভুকে!

১৯০১। অক্টোবর মাসে স্বামীজী বেলুড়মঠে দুর্গাপূজা করিলেন। ক্রমে লক্ষ্মীপূজা ও শ্যামাপূজাও হইল। এ তিনটি পূজাতেই কুমারটুলী হইতে মূর্ত্তি আনা হইল। যিনি মায়াবতী আশ্রমে পরমহংসদেবের ছবিপূজা এই বলিয়া আপত্তিকরিলেন যে—অদ্বৈতবাদীর পক্ষে নরপূজা নিষ্প্রয়োজন, তিনি বেলুড়-মঠে মূর্ত্তি আনিয়া লৌকিক বাহ্যপূজা কেন প্রবর্ত্তন করিলেন? বিশেষতঃ সন্ন্যাসীর নামে সংকল্প করিয়া কোন পূজা চলে না—অশাস্ত্রীয়। ইহার এই এক তাৎপর্য্য আছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে—এই সকল পূজানুষ্ঠান দেখিয়া চল্‌তি নৌকার গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসমান আরোহিগণ আশ্বস্ত হইবেন যে, বেলুড়মঠ হিন্দু-মঠ এবং স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু। মূর্ত্তিপূজা ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী। বেলুড়মঠ ব্রাহ্মসমাজ নহে। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত। অতএব বেলুড়মঠ বাংলার রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের অন্তর্ভুক্ত।

অরবিন্দ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী এবং বেলুড়মঠের পক্ষপাতী ব্যক্তি। স্বামীজী উনবিংশ হইতে বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করিয়া প্রথম বৎসরেই 'ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ' করিলেন—'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্'; কেননা, 'দিগ্‌দেশ কম্পিত করতে হবে' (* ক)।

ঠিক এই বৎসর হইতেই বরোদায় থাকিয়াই অরবিন্দ 'দিগ্‌দেশ কম্পিত'

(* ক) "খোল-করতাল বাজিয়ে লম্ফ-ঝম্ফ করে দেশটা উচ্ছন্ন গেল। একে ত এই Dyspeptic (পেটরোগা) রোগীর দল, তাতে অত লাফালে-ঝাঁপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চসাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি, দেখ্‌বি খোল-করতালই বাজছে! ঢাক-ঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? তুরী-ভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐ সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানষি বাজনা শুনে শুনে, কীর্ত্তন শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল। এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে? কবিকল্পনাও এ-ছবি আঁকতে হারমেনে যায়! ডমরু-শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুল্‌তে হবে 'মহাবীর মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' শব্দে 'দিগ্‌দেশ কম্পিত কর্ত্তে হবে'। যে-সব musicএ (গীতবাদ্যে) মানুষের soft feelings (হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ) উদ্দীপিত করে, সে-সকল কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখ্‌তে হবে। খেয়াল-টপ্পা বন্ধ করে ধ্রুপদ গান শুন্‌তে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আন্‌তে হবে। এইরূপ ideal follow (আদর্শের অনুসরণ) করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ—দেশের কল্যাণ।"—স্বামী বিবেকানন্দ

করিবার যে আয়োজন, বাংলাদেশে দুই দুইটি দূত একের পর আর পাঠাইয়া তা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গেল, নূতন শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে বাতাস কোন্‌দিকে প্রবাহিত হইতে চলিল। এক যায়, আর আসে—এইত ইতিহাস।

এবার ডিসেম্বরে কলিকাতায় কংগ্রেস। কংগ্রেস হইতে ধূলিপায়ে কতিপয় সদস্য, বিশেষতঃ মিঃ তিলক, বেলুড়মঠে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ঠাকুরঘর হইতে পূজা শেষ করিয়া স্বামীজী অবতরণ করিতেছেন, এমন সময় তিলক মহারাজকে পুরোভাগে রাখিয়া সদস্যেরা জোড়হস্তে দণ্ডায়মান। স্বামীজী দেশাত্মবোধের বাণী বজ্রগম্ভীর স্বরে নিনাদিত করিলেন প্রথমবার আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বেই স্বামীজী তিলক মহারাজের অতিথি হইয় তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। আবার জীবনসায়াহে স্বামীজী তিলক মহারাজের সহিত মিলিত হইলেন। অস্ত যাইবার পূর্ব্বে উনবিংশ শতাব্দী, বিংশ শতাব্দীকে স্পর্শ করিয়া গেল। এই স্পর্শ কি অরবিন্দ পান নাই'

রেভাঃ ওডা ও মিঃ ওকাকুরা ঃ কংগ্রেস অধিবেশনের কিছু পূর্ব্বে এ দুইজন জাপানী ভদ্রলোক বেলুড়মঠে স্বামীজীর নিকট আসিয়া উপস্থি হইলেন। এবং বেলুড়মঠেই কিছুদিন বসবাস করিলেন। চিকাগোর ম জাপানে একটি ধর্ম্ম-মহাসভা হইবে এবং স্বামীজী যাহাতে ঐ সভায় উপস্থি হ'ন তার জন্য এই দুই জাপানী ভদ্রলোক স্বামীজীকে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী বলিলেন, তাঁহার শরীর অসুস্থ। শরীর সুস্থ থাকিলে তিনি অবশ্যই যাইবেন।

ওকাকুরা প্রাচ্য দেশীয় আর্টের এক অতি উচ্চশ্রেণীর সমঝদার ব্যক্তি। প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে তিনি একজন আদর্শবাদী। তিনি স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া ১৯০২ খৃঃ জানুয়ারী মাসে বুদ্ধগয়া দেখিতে গেলেন এবং সেখান হইতে কাশীতীর্থে আসিলেন। কাশীতে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া ওকাকুরা স্বামীজীর নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব-মেলার পূর্ব্বেই কাশী হইতে বেলুড়মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

ভগিনী নিবেদিতা ১৯০২।৯ই জানুয়ারী 'মোম্বাসা' (Mombassa) জাহাজে চড়িয়া রমেশ দত্তের সহিত একত্রে ইংলণ্ড হইতে ভারতাভিমুখে রওনা হইলেন এবং ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমভাগে মাদ্রাজে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। মাদ্রাজে সুব্রহ্মণ্য আয়ার—রমেশ দত্ত ও ভগিনী নিবেদিতা উভয়কেই অভিনন্দন জানাইলেন। ঐ অভিনন্দনের উত্তরে রমেশ দত্ত ভগিনী নিবেদিতার অতি উচ্চপ্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ জানাইলেন (* খ)। অতঃপর ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর নিকটে আসিয়া দেখা করিলেন এবং স্বামীজীর দেহত্যাগের পূর্ব্বে মাত্র চারি মাসকাল স্বামীজীর সঙ্গলাভ করিবার সুযোগ পাইলেন। এই চারি মাসের মধ্যে সম্ভবতঃ বেলুড়মঠেই ভগিনী নিবেদিতার সহিত ওকাকুরার প্রথম পরিচয় হয়। পরে এই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

বেলুড়মঠে ওকাকুরার সহিত ভগিনী নিবেদিতার প্রথম পরিচয়—সেকালের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশসকল নিজে ঘুরিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু প্রাচ্য দেশগুলি ত দেখেন নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত আমাদের সভ্যতার তুলনা ও সেই সম্পর্কে কথাবার্ত্তা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচ্যদেশের পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি জাতির প্রাচীন সভ্যতার সহিত বিশেষ কোন তুলনা ও আলোচনা হয় নাই। অবশ্য একেবারে হয় নাই—ইহা বলা যায় না। অল্প সামান্য কিছুটা হইয়াছে।

ওকাকুরা আর্টের দিক হইতে একটা অভিনব প্রাচ্য-প্রীতি প্রচার করিতে লাগিলেন। এই প্রাচ্য-প্রীতি ভগিনী নিবেদিতাকেও পাইয়া বসিল। ভগিনী নিবেদিতা ওকাকুরার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এবং ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল আলোচনার পরে ওকাকুরা মাত্র এক বৎসর পরে (১৯০৩ খৃঃ) '*Ideals Of The East*' নামে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ ছাপাইলেন। ভগিনী নিবেদিতা বাগবাজার, ১৭নং বোসপাড়া লেন, হইতে ঐ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিলেন। আমাদের দেশে আর্টের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইঁহারা উভয়েই

(* খ) "I received your telegram a few days ago at Colombo, kindly inviting me and my gifted fellow-passenger, Sister Nivedita, to speak at a public meeting on our arrival at Madras. I felt an unspeakable joy that you should have thus accorded your hearty greetings to a lady, who is now one of us, who lives our life, shares our joys and sorrows, partakes of our trials and troubles, and labours with us in the cause of our Mother-land."—[*Reply by Romesh Chandra Dutta* to an address given by G. Subramaniya Iyer—Madras.]

প্রাচ্য-প্রীতির প্রভাব এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণের নিষেধ তীব্র এবং স্পষ্টভাবে প্রচার করিলেন। অতএব এই সময়কার ইতিহাসে ওকাকুরা ও নিবেদিতা একটি প্রসঙ্গ; উল্লেখ না-করিলে ভুল করা হইবে।

ওকাকুরা বেলুড়মঠে আসিবার অল্প কিছু আগে বা পরে, অরবিন্দ-কথিত (১৮৯৩ খৃঃ) 'প্রলেটেরিয়েট'দের সম্পর্কে কি ভাব পোষণ করিতেন—স্বামীজী তাহার একটা স্পষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার দেহরক্ষার মাত্র ৫।৬ মাস পূর্ব্বের ঘটনা (* গ)। ওকাকুরা ১৯০২ খৃঃ নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

(* গ) একদিন স্বামীজী কেষ্টাকে বলিলেন—"ওরে, তোরা আমাদের এখানে খাবি?" কেষ্টা বলিল—"আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন আর খাই না, এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের ছোঁয়া নুন খেলে জাত যাবেরে বাপ্।" স্বামীজী বলিলেন,—"নুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারি রেঁধে দেবো। তা হলে ত খাবি?" কেষ্টা ঐ কথায় স্বীকৃত হইল। অনন্তর স্বামীজীর আদেশে মঠে সেই সকল সাঁওতালদের জন্য লুচি, তরকারি, মেঠাই, মণ্ডা, দধি ইত্যাদি জোগাড় করা হইল এবং তিনি তাহাদের বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে কেষ্টা বলিল—"হাঁরে স্বামী বাপ্—তোরা এমন জিনিষটি কোথায় পেলি—হামরা এমনটা কখনো খাইনি।" স্বামীজী তাহাদের পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন—"তোরা যে নারায়ণ—আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হলো।" অনন্তর মঠের সন্ন্যাসিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখ, এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হ'ল? 'পরহিতায়' সর্ব্বস্ব অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিষ কখন কিছু ভোগ হয়নি। ইচ্ছা হয়, মঠ-ফঠ সব বিক্রী ক'রে দিই, এই সব গরীবদুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই। আমরা ত গাছতলা সার করেছি। আহা! দেশের লোক খেতে-পরতে পারছে না—আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি? ওদেশে যখন গিয়েছিলুম, মাকে কত বল্লুম—'মা! এখানে লোক ফুলের বিছানায় শুচ্ছে, চর্ব্যচুষ্য খাচ্ছে, কি না ভোগ করছে—আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে—মা!—তাদের কোন উপায় হবে না'? ওদেশে ধর্ম্মপ্রচার করতে যাওয়ায় আমার এই আর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে, এদেশের লোকের জন্য যদি অন্নসংস্থান করতে পারি।

"দেশের লোকে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে, এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজানো, ঘণ্টা নাড়া, ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা—সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ কংগ্রেসে দেশের সর্ব্বসাধারণের, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে যোগ (mass-contact) নাই বলিয়া যে তিক্ত এবং তীব্র অভিযোগ করিয়াছেন সেই mass-contact-এর একটা রূপ ১৯০১ খৃষ্টাব্দের শেষ-ভাগে অরবিন্দ বরোদা হইতে বেলুড়মঠের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেন। যে-সকল নেতা আমাদের দেশে এই কাল মধ্যে আপন আপন চরিত্রে ও প্রতিভায় এই mass-contact-এর দীপ্তি দেখাইয়া গিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের অগ্রণী। এইখানেই মধ্যযুগের সন্ন্যাসের আবরণের মধ্যে প্রদীপ্ত অতি আধুনিক (modern) আদর্শ। স্বামী বিবেকানন্দ মধ্যযুগের নহেন। তিনি এখনও বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ কাল দাবী করিতেছেন।

ক্রমে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এবং তিনি তাঁহার আসন্ন-মৃত্যু বুঝিতে পারিলেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে একদিন তিনি আপন মনে যাহা

বড় লোকদের বুঝিয়ে কড়িপাতি যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্র-নারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

"আহা, দেশে গরীব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড—যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্চে—যে মেথর মুদ্দফরাস একদিন কার্য্য বন্ধ করলে সহরে হাহাকার রব উঠে—হায় তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে-দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাইরে! এই দেখ না—হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে—মান্দ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া কৃশ্চিয়ান হয়, আমাদের সহানুভূতি পায় না ব'লে। দিন রাত কেবল তাদের বলছি—'ছুঁস্‌নে' 'ছুঁস্‌নে'। দেশে কি আর দয়াধর্ম্ম আছে রে বাপ্! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝেঁটা—মার লাথি! ইচ্ছে হয়—তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডি ভেঙ্গে ফেলে, এখনি যাই—'কে কোথায় পতিতকাঙ্গাল দীনদরিদ্র আছিস'—বলে, তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগ্‌বেন না। আমরা এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা করতে পারলুম না, তবে আর কি হল? হায়! এরা দুনিয়াদারী কিছুই জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান কর্‌তে পারছে না। দে, সকলে মিলে এদের চোখ খুলে দে—আমি দিব্য চোখে দেখ্‌ছি, এদেরও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছে, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্ব্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চার না হলে, কোনও দেশ কোন কালে কোথায় উঠেছে, দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও, ঐ দেহ দিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—ইহা নিশ্চিত জান্‌বি।"

বলিতেছিলেন, স্বামী প্রেমানন্দজী তাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছিলেন—"যদি এখন আর একজন বিবেকানন্দ থাকিত, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিত বিবেকানন্দ কী করিয়াছে!" কিন্তু "কালে অবশ্য অনেক বিবেকানন্দ জন্ম গ্রহণ করিবে।" নিজের সম্বন্ধে স্বামীজীর আত্ম-সংবিৎ খুব প্রখর ছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি কী করিয়া গেলেন।

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাব : ১৯০২।৫ই জুলাই অতি প্রত্যুষে স্বামী সারদানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিলেন যে—গত রাত্রি নয়টার সময় স্বামীজী দেহরক্ষা করিয়াছেন।

চিঠির অক্ষরগুলি যেন ভগিনী নিবেদিতার চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। পত্রবাহকের সঙ্গে তিনি তৎক্ষণাৎ বেলুড় রওনা হইলেন। মঠে গিয়া ভগিনী নিবেদিতা দোতালায় স্বামীজর ঘরে একাকী প্রবেশ করিলেন। ঘর অত্যন্ত অন্ধকার। সমস্ত দরজা ও জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বামীজীর দেহের উপর হরিদ্রা রঙের ফুল দিয়া ঢাকা রহিয়াছে। ভগিনী নিবেদিতা শবের পার্শ্বে বসিলেন। তিনি স্বামীজীর মাথা নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইলেন এবং মেজের উপর হইতে একখানি হাত-পাখা কুড়াইয়া স্বামীজীকে বাতাস দিতে লাগিলেন। এবং বেলা দুইটা পর্য্যন্ত কাছে বসিয়া পাখাহাতে স্বামীজীর মৃতদেহ বাতাস করিলেন। তিনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন—কোন কথাও বলিলেন না। অশ্রুপাতও করিলেন না। তাঁহার শোক বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শিষ্যেরা ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল। নিবেদিতা স্বামীজীর মস্তক আপন ক্রোড় হইতে নামাইয়া স্তূপীকৃত ফুলের উপরে সযত্নে রক্ষা করিলেন। হৃদরোগ অথবা সন্ন্যাস (Apoplexy) রোগে স্বামীজীর মৃত্যু হইল, তাহা ডাক্তারেরা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। নাকে ও মুখে রক্তের চিহ্ন দেখিয়া সন্ন্যাস রোগ বলিয়াই ধারণা হয়।

চিতাপার্শ্বে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব : ১৯০২।৫ই জুলাই শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বোলপুর হইতে কলিকাতা ফিরিবার পথে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব "হাবড়া ষ্টেশনে শুনিলেন কাল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সম্বরন করিয়াছেন।...দৌড়িয়া ভাগীরথীতীরস্থ বেলুড়মঠে চলিলেন।...বন্ধুবান্ধবগণ সজল নয়নে মৃতদেহের পার্শ্বে দণ্ডায়মান। একটা প্রেরণা হইল—তোমার

যতটুকু শক্তি আছে ততটুকু কাজে লাগাও,বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গিজয়-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা কর। ·কে যেন অন্তরে আসিয়া এই কথা বলিয়া মর্ম্মে আঘাত করিল।...বিলাত যাইবেন—সেই মুহূর্ত্তে স্থির করিলেন।" —(উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সিংহ ; পৃঃ ৪৬)।

স্বামীজীর মৃত্যুর পরদিনেই তাঁহার সদ্য মৃতদেহের নিকট প্রেরণা পাইয়া উপাধ্যায় 'ফিরিঙ্গিজয়-ব্রত' উদ্‌যাপনের নিমিত্ত তিন মাসের মধ্যেই বিলাত গমন করিলেন। উপাধ্যায়ের যে-কথা সেই কাজ। ১৯০২।৫ই অক্টোবর তিনি সত্যিই মাত্র ২৭৲ টাকা পকেটে লইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। একেই বলে সন্ন্যাসী—আর একেই বলে সংকল্প।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রজ্জ্বলিত চিতার সম্মুখে ভগিনী নিবেদিতার সহিত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রথম দেখা-সাক্ষাৎ হয়।

মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে হইতে আমরা স্পষ্ট লক্ষ্য করিতেছি যে, স্বামীজী দুইটি জিনিষের ওপর জোর দিতেছেন। প্রথম—বাঙ্গালী ছেলেকে 'মহাবীর' 'মহাবীর' ধ্বনিতে 'দিগ্‌দেশ কম্পিত কর্ত্তে হবে'। দ্বিতীয়—গণ-সংযোগ (mass-contact) এবং নুন-ছাড়া-তরকারী রেঁধে 'কেষ্টা'কে খাইয়ে, এই গণ-সংযোগের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বামীজীর এই বাণী আমরা পাই যে: আমাদিগকে প্রথম 'মহাবীর' হইতে হইবে—মৃত্যুভয় থাকিলে মহাবীর হওয়া যায় না, অতএব মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে হইবে। দ্বিতীয়, গণ-সংযোগ করিতে হইবে। ইহা গান্ধী-যুগের 'পাওয়ার পলিটিক্‌স'-এর গণ-সংযোগ হইতে স্বতন্ত্র। দুই, এক বস্তু নয়। গান্ধী-যুগের গণ-সংযোগ কতকটা বেনের ব্যবসা আর বাকিটা তামাসা। আরও অন্যান্য দিকে চাহিয়া দেখা যাক্‌।

ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ: স্বামী বিবেকানন্দের দেহ-ত্যাগের মাত্র দুই সপ্তাহ পরেই ভগিনী নিবেদিতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হইলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবিতকালেই ভগিনী নিবেদিতার রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও বক্তৃতাদি মঠের সন্ন্যাসীদিগের মনে রীতিমত ভয়ের সঞ্চার করিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের জন্য ভগিনী নিবেদিতাকে এতদিন তাঁহারা কেহ কিছু বলিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, মঠের তৎকালীন

প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে স্পষ্ট বলিলেন যে, "হয় তুমি তোমার বৈপ্লবিক রাজনীতি ছাড়, আর না হয় আমাদের মঠের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন কর।" মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ সকলে একবাক্যে ভগিনী নিবেদিতাকে বলিলেন যে—"তুমি আমাদের কথা শুনিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ (vow of obedience), কাজেই তুমি অবাধ্য হইতে পার না; আর বিশেষতঃ, তোমার ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়? তোমাকে রাজনীতি ছাড়িতেই হইবে।"

ভগিনী নিবেদিতা ধীরভাবে সমস্ত শুনিলেন। পরে মুখে মৃদুতা অন্তরে দৃঢ়তা লইয়া, রাজনীতি ছাড়িতে অস্বীকার করিলেন (categorically refused)। তিনিও স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্পষ্ট বলিলেন—"আমি রাজনীতি ছাড়িতে পারি না। আমি ইহার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আমি বরং মরিতে প্রস্তুত, কিন্তু রাজনীতি ছাড়িতে প্রস্তুত নহি" ("I cannot act otherwise", said she to Swami Brahmananda, "I am indentified with this idea and I would die rather than abandon it")।—[ভগিনী নিবেদিতার ফরাসী ভাষায় লিখিত জীবনচরিত, পৃঃ ২৩৭ হইতে অনূদিত]।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে বলিলেন, "তুমি স্বেচ্ছায় আমাদের মঠ ছাড়িয়া যাইতেছ—এই কথা একখানি প্রকাশ্য চিঠিতে কলিকাতার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রগুলিতে লিখিয়া পাঠাও" ("The abbott wanted her to write in the form of an Open Letter, to be published in the principal journals of Calcutta—a manifesto stating that she was separating herself willingly from the Math.)।"—[ভগিনী নিবেদিতার ফরাসী ভাষায় লিখিত জীবনচরিত, পৃ: ২৩৭ হইতে অনূদিত]।

ভগিনী নিবেদিতা তাহাই করিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দের চরিত্রগত ও আদর্শগত পার্থক্য স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৫ খৃঃ হইতে ১৯০২ খৃঃ পর্য্যন্ত যে নিবেদিতাকে শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়া ভারতের সেবাকার্য্যে প্রয়োগ করিবার জন্য তৈয়ারী করিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও মঠের অপরাপর সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে বিপজ্জনক ভাবিয়া পরিত্যাগ করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার জীবিতকালে এইরূপটি হইত কি-না সন্দেহ।

বিপিনচন্দ্র পাল : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—অরবিন্দ যার উপর ১৮৯৪ খৃঃ বেজার খাপ্পা—বিপিনচন্দ্রকে মিশনারী অর্থাৎ তাঁহাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচারক করিবার জন্য ১৮৯৮ খৃঃ খরচা দিয়া বিলাত প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য—অক্সফোর্ড ম্যানচেষ্টার কলেজে তিনি তুলনামূলক ধর্ম্মবিজ্ঞান শিক্ষা করিবেন। করিলেনও তাই। পরে ১৯০০ খৃঃ তিনি আমেরিকা যান। সেইখানে তাঁহার মতের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। ধর্ম্ম ছাড়িয়া রাজনীতি প্রচারের গুরুত্ব ও প্রয়োজন বেশী—এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হন (* ক)। ১৯০১ খৃঃ এই পরিবর্ত্তিত মনোভাব লইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে ফিরিয়া এই বৎসরেই মডারেট্ আবেদন-নীতির বিরোধী আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল, নূতন জাতীয়তাবাদী "নিউ ইণ্ডিয়া" (The New India) সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন। এই ইংরেজী পত্রিকার প্রচ্ছদপটে নানা অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিতা সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রীর

(* ক) বিপিনচন্দ্র যখন মার্কিণে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন, তখন নিউইয়র্কে এক মার্কিণবন্ধু হস্তমর্দ্দন করিয়া জানান—জগতের সকল জাতির সহিত এক সঙ্গে চলিতে না পারিলে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত কোন ধর্ম্মমত কেহ শুনিবে না। বিপিনচন্দ্রের এই অভিজ্ঞতার কথা তাঁহার ভাষায় : "কথাগুলি যেন আমার প্রাণের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত খোঁচাইয়া দিল। আর নিউইয়র্কের হোটেলের পাঠাগারে এই মার্কিণ বন্ধুর এই অপ্রত্যাশিত সম্বর্দ্ধনার মধ্যেই মনে হয় আমার অজ্ঞাতসারে সেই মাঘের অপরাহ্নে আমার অন্তরে আমার নূতন স্বাদেশিকতার জন্ম হয়। তখন হইতেই বুঝিলাম, যতদিন না ভারতের রাষ্ট্রীয় দাসত্ব ঘুচিয়াছে এবং আমরা চারিদিকের স্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠ জাতিসকলের মাঝখানে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি ততদিন আমাদিগের যাহা দিবার আছে জগতের লোক তাহা গ্রহণ করিবে না। ভারতবর্ষ যতদিন ইউরোপের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে ততদিন তাহার রত্নভাণ্ডার বিদেশীয়েরাই লুটিয়া লইবার চেষ্টা করিবে। সে নিজের হাতে সে ভাণ্ডারের চাবি খুলিয়া বিশ্ব-মানবের জ্ঞানকোশের সমৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবে না। এই কথাটা এমন সোজাসুজি ভাবে আর কেহ কহে নাই। আর আমিও আধুনিক ভারতের সকল সাধনের পূর্ব্ববর্ত্তী সাধন যে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ, একথাটা সমুদয় জ্ঞান ও সমুদয় ভাব দিয়া ধরিতে পারি নাই।" মার্কিণ-প্রবাসের এই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয় লইয়া ১৯০১ খৃঃ বিপিনচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসেন এবং "নিউ ইণ্ডিয়া" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া রাজনৈতিক জীবনের আত্মশক্তির উপরে নির্ভর করিবার কথা প্রচার করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্য এবং রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। লর্ড কার্জন তখন ভারতবর্ষের বড়লাট। ইহার মধ্যে প্রয়োজনীয় অংশ বিপিনচন্দ্রের নিজের কথাতেই বলা হইয়াছে।

ছবি বাহির হইল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নিজকৃত কর্ম্মের বিপরীত ফল দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। স্বামী বিবেকানন্দ জীবন-সায়াহ্নে, বিপিনচন্দ্রের "নিউ ইণ্ডিয়া" দেখিয়া সম্ভবতঃ খুশিই হইয়া থাকিবেন। কেননা, স্বামীজীর দেহ-ত্যাগের অব্যবহিত পরেই ভগিনী নিবেদিতা এই কাগজের সংস্রবে আসিয়া (১৯০২ খৃঃ) নিয়মিতভাবে "নিউ ইণ্ডিয়াতে" তাঁহার The Web Of Indian Life ছাপাইতে লাগিলেন। ১৯০১ খৃঃ ডিসেম্বরশেষে বিপিনচন্দ্রকে আমরা কলিকাতা কংগ্রেস-মণ্ডপে দেখিতে পাই। সুতরাং আবেদন-নীতি-বিরোধী চরমপন্থী "নিউ ইণ্ডিয়া" এবারকার কংগ্রেস অধিবেশনের কিছু পূর্ব্বেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ১৯০১ খৃঃ হইতেই বিপিনচন্দ্র রাজনীতিক্ষেত্রে চরমপন্থী।

অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র বাংলার চরমপন্থী রাজনীতিক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে একত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু উভয়ের প্রবেশ-দ্বার সম্পূর্ণ পৃথক্। বিপিনচন্দ্র ধর্ম্মের বক্তৃতার অসারতা বুঝিতে পারিয়া অতি উগ্র রাজনৈতিক বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি দেশের জন্য এমন এক উৎকট স্বাধীনতা চাহিলেন—যার মধ্যে ইংরেজের কোন সংস্রব বা কর্তৃত্ব নাই। মডারেটদের কাঁদুনে বক্তৃতা একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে। বিপিনচন্দ্র সহজেই আসর জমাইয়া তুলিলেন। "নিউইণ্ডিয়া"—১৯০১ হইতে ১৯০৭ পর্য্যন্ত নূতন জাতীয়তার আদর্শ, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-কথিত এক অতি উচ্চ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। বিপিনচন্দ্রের রাজনীতি অন্ধকারে আচ্ছন্ন নয়। দিবালোকে সুস্পষ্ট। তিনি সোজাপথে প্রবেশ করিয়াছেন—তবে চড়া গলায় ইংরেজ-বর্জ্জিত স্বাধীনতার কথা বলিয়াছেন। এই যা। এবং ইহা কম নয়। সেকালে ইহা অনেক বড় কথা। একালেও ছোট কথা নয়।

আর অরবিন্দ? তিনি গোপনে, লোকে না দেখিতে পারে,—কাজেই অন্ধকারে পা টিপিয়া গা ঢাকিয়া, খিড়কির দরজা দিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি খুন করিয়া, ডাকাতি করিয়া, দেশের জন্য স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবেন। সুতরাং সোজাপথে, দিবালোকে সদর দরজা দিয়া তিনি বিপিন-চন্দ্রের মত প্রবেশ করিতে পারেন নাই। উভয়েই চরমপন্থী নেতা, কিন্তু এক শ্রেণীর নেতা নহেন। মডারেট্ নেতা হইতে বিপিনচন্দ্র

যতটা তফাৎ, অরবিন্দ তার চেয়ে অনেক বেশী তফাৎ। অরবিন্দের জুড়ি নাই—মিঃ তিলকও নহেন। তিনি নূতন—সম্পূর্ণ পৃথক—স্বতন্ত্র।

স্যার ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল: (জন্ম—১৮৬৪।৩রা সেপ্টেম্বর; মৃত্যু—১৯৩৮।৩রা ডিসেম্বর: ৭৪ বৎসর তিন মাস) বিংশ শতাব্দীর ১ম দশকে যে জাতীয়-আন্দোলন বাংলাদেশে জন্মলাভ করিয়া ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে সংক্রামিত হইয়া পড়ে, ব্রজেন্দ্রনাথ সেই বিরাট আন্দোলনের একজন প্রথম ও প্রধান সূত্রধার (* খ)। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের একজন সহপাঠী ('Fellow-

---

(* খ) "His (Brojendranath) was the talk that inspired and rationalised the political thought and activity that has come to be known in history as the Nationalist Movement in the first decade of the present century that had Rabindra Nath Tagore for its minstrel, and Upadhyaya Brahmabandhav and Bipin Chandra Pal for its philosophers and preachers.

"And when we know that Acharya Brajendra Nath Seal was a fellow-student of Swami Vivekananda, there appears to be a fitness of time and place and circumstances in which he played his part in the evolution of thought that has re-made India since the eighties of the last century. Those years were marked by a *revolt of educated India* against the values that British method of administration and enlightenment had introduced in India.

* * *

"Glimmerings of this message of India's storied past had begun to reach the educated men and women of India when the generation to which Swami Vivekananda and Dr. Brajendra Nath Seal belonged was called upon to take up the destiny of their country in their own hands. In this work the former found his inspiration in the life of Ramkrishna Paramhansa Dev and the latter in the life and thought of Raja Rammohon Ray. From certain points of view these two men can be regarded as the confluence where met the East and the West. They are representatives of the

Student') এবং বিশ্বস্ত বন্ধু। স্বামীজীর সম্মুখে আদর্শ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। আর ব্রজেন্দ্রনাথের সম্মুখে আদর্শ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। স্বামীজী যেমন রাজা রামমোহনকে বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং রাজার নিকট হইতে (ক) বেদান্ত, (খ) হিন্দু-মুসলমান একতা, (গ) স্বদেশ-প্রেম শিক্ষালাভ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—আবার অন্য পক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে নরদেহে দেবতা (Divine Man) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

১৮৯৮ খৃঃ বিপিনচন্দ্র যখন বিলাত গমন করেন, তার পূর্ব্ব হইতেই বিপিনচন্দ্র ব্রজেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বাঙ্গালীর বর্ত্তমান শতাব্দীর নূতন জাতীয়তাবোধের স্বরূপ বুঝিতে আরম্ভ করেন। যে দার্শনিক ভিত্তির উপর বিপিনচন্দ্র বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার মূলে ব্রজেন্দ্রনাথের প্রেরণা ও উদ্দীপনা ছিল প্রচুর। স্বামীজীর যিনি এত বড় একজন গুণগ্রাহী বন্ধু, শতাব্দীর ১ম দশকে বিপিনচন্দ্রের চিন্তাস্রোতের মধ্য দিয়া আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই। ব্রজেন্দ্রনাথ এই নূতন জাতীয়তা-বোধের একজন স্রষ্টা। ব্রজেন্দ্রনাথের জ্ঞানের বিস্তার ও গভীরতা আলোচনা করিবার মত শক্তি আমার নাই। আর যদি বা কিছু থাকে তবে তাহা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

বিপিনচন্দ্রের 'নিউ ইণ্ডিয়া'র যে মতবাদ, তার মূলেও ব্রজেন্দ্রনাথের প্রেরণা ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া বিপিনচন্দ্র 'নিউ ইণ্ডিয়া' লিখিতেন।

যে বৎসর বিপিনচন্দ্র বিলাত যান ঠিক তার পরের বৎসর (১৮৯৯ খৃঃ) ব্রজেন্দ্রনাথ যান রোমে। রোমে সে-বৎসর প্রাচ্যদেশীয়দের এক কংগ্রেস হয় (Orientalists' Congress)। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রাচ্যদেশীয়দের মধ্যে ভারত-

attempt of an old social polity to reform itself under the stress and strain of an alien invasion into the region of thought and into the region of active life. Brajendra Nath Seal interpreted this spiritual travail, and in this interpretation contributed his best to the enrichment of the life of modern Bengal, of modern India. This is his title to glory."—[*Hindusthan Standard —Dec. 4, 1938*]

বর্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ নিমন্ত্রিত হন। বিবেকানন্দ-বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ সেদিন উপযুক্ত সম্মান পাইয়াছিলেন। চিকাগো ও রোম গত শতাব্দীর শেষ দশকে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে দুই বাঙ্গালী যুবকের চিন্তাধারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। কিন্তু ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো সহরে আমেরিকাবাসী স্বামীজীর মুখে শুনিয়াছেন অদ্বৈত বেদান্ত অথবা শাঙ্কর বেদান্ত। তার ছয় বৎসর পর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রোম নগরে প্রাচ্যদেশীয়দের কংগ্রেস ব্রজেন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছে হিন্দুর বৈষ্ণবধর্ম্ম, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্ম। কিন্তু কি বিবেকানন্দ কি ব্রজেন্দ্রনাথ, কেহই হিন্দুর তান্ত্রিক ধর্ম্ম বিশেষতঃ বাঙ্গালীর তান্ত্রিক অথবা শাক্ত ধর্ম্মের অপূর্ব্ব তত্ত্বের কথা কহেন নাই। জানিয়াও তাঁহারা হয়তো বিদেশে ইহা প্রচার করেন নাই। কিন্তু রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া অরবিন্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর তন্ত্রে হোমশিখা সমান প্রজ্বলিত দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা রামমোহন রায় তান্ত্রিক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তান্ত্রিক ছিলেন। বাঙ্গালীর তন্ত্রে, তত্ত্বে ও সাধনে রাজা রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণ বিগত শতাব্দীর প্রথম ও শেষে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। বিগত শতাব্দীতে রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণ বাঙ্গালীর তন্ত্রের ধারক ও বাহক শুধু নয়, পরন্তু জীবন্ত বিগ্রহ।

ব্রজেন্দ্রনাথের কথা হইতেছে। তিনি রোমে বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম্মের রসতত্ত্ব-ব্যাখ্যা করিলেন। সেই প্রাচ্যদেশীয় বিদ্বৎ-জনমণ্ডলী ব্রজেন্দ্রনাথের মুখে বাঙ্গালী বৈষ্ণবের রসতত্ত্বের বিশ্লেষণ শুনিয়া মুগ্ধবিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন(* গ)।

বাঙ্গালী উপলব্ধি করিয়াছেন যে, যুগল-প্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।

ব্রজেন্দ্রনাথের এই বৈষ্ণব ভাব—বিপিনচন্দ্রে সংক্রামিত হইয়াছে। এবং বিপিনচন্দ্রের বৈষ্ণব ভাব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনে সংক্রামিত হইয়াছে। কিন্তু তিনটি

(* গ) "Dr. Seal's reputation as a scholar and philosopher spread far and wide, and in 1899 he was appointed a delegate from India to the Orientalists' Congress held in Rome.

"He (Brojendranath) opened the Indian Section of the International Congress of Orientalists held in Rome, 1899, with his paper on 'The Test of Truth'. Read a paper in that section on 'Vaishnavism and Christianity'. Also read a paper on the 'Origin of Law and Hindus as Founders of

ভিন্ন প্রকৃতির ভূমিতে একই বৈষ্ণব ভাবের বীজ নিক্ষিপ্ত হইয়া তিনটি ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। একই ধর্ম্ম বিভিন্ন স্বভাব অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। ব্রজেন্দ্রনাথের কথা আজ এই পর্য্যন্তই থাক।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভগিনী নিবেদিতা : পাশ্চাত্য আদর্শ বর্জ্জন করিয়া প্রাচ্য আদর্শের অনুরাগী ভারতীয় নূতন চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি এই বৎসরেই বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নূতন চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির জন্মদাতা। এজন্য বাঙ্গালীর বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের প্রথম বৎসরেই তিনি স্মরণীয় এবং বরণীয়। ভগিনী নিবেদিতা এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিকে সূতিকাগার হইতে বাহির করিয়া তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত(১৯১১।১৩ই অক্টোবর) ইহার সুদীর্ঘ শৈশবকালে এই নবজাত শিশুকে যেরূপ অকৃত্রিম মাতৃস্নেহে লালনপালন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই বিদেশিনী মহিমময়ী মহিলার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে যদি বাঙ্গালী জাতি করজোড়ে দণ্ডায়মান না হয়, তবে তাহার ললাটে অকৃতজ্ঞতার কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। ইতিহাসে যে সম্মান ভগিনী নিবেদিতার প্রাপ্য আমরা এতাবৎ তাঁহাকে তাহা দিয়া আসি নাই। এ কথা সত্য যে, নূতন চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিতে প্রাচ্য আদর্শের প্রভাব ওকাকুরা ও ভগিনী নিবেদিতা উভয়ে মিলিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভাব সৃষ্টি করা এক কথা, আর ছবি আঁকা ভিন্ন কথা। নূতন প্রভাব অথবা নূতন আদর্শের অনুযায়ী ছবি ওকাকুরাও আঁকেন নাই, ভগিনী নিবেদিতাও আঁকেন নাই। ছবি আঁকিয়াছিলেন—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ওকাকুরা ও ভগিনী নিবেদিতার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল; কিন্তু এ-বিষয়ে কবি রবীন্দ্রনাথের

Social Science' in the History of Culture Section of the Congress."—[*Hindusthan Standard—Dec. 5, 1938*]

খৃষ্টান পণ্ডিতদের মত ছিল যে, খৃষ্টান ধর্ম্ম হইতেই হিন্দুর বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রমাণ করেন যে : (১) হিন্দুধর্ম্ম (উপনিষদ) হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি। (২) বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরিণত অবস্থায় মাদ্রাজ উপকূলে খৃষ্টান ধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতের ও সংঘাতের ফলে পরস্পর একে অন্যের নিকট হইতে ভাব ও রস গ্রহণ করিয়া ক্রমে উভয়েই পরিপুষ্ট হয়। (৩) শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম্ম রসতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও নূতন তত্ত্ব ক্রমে আবিষ্কার করিয়াছেন—যা খৃষ্টান ধর্ম্মে নাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম্মকে ব্রজেন্দ্রনাথ জগতের সম্মুখে প্রথম প্রচার করিয়াছেন।

সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল তার চাইতেও বেশী। এ কথা অবনীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনাতেও পাশ্চাত্য-বর্জ্জন এবং প্রাচ্য-প্রীতির প্রেরণা প্রবলাকার ধারণ করিয়াছিল।

অরবিন্দ অবনীন্দ্রনাথের এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিকে আমাদের জাতীয় ভাবের পরিপোষক বলিয়া, ভগিনী নিবেদিতার সহিত একমত হইয়া ইহার অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন সত্য—কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে অরবিন্দ জাপানী প্রভাব বেশী বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। জাপানী প্রভাব ভাল কি মন্দ, ইহা তিনি খোলসা না বলিলেও অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকে তিনি প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন—ইহা সত্য।

আমার ধারণা স্বামী বিবেকানন্দ হইতেই এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি সকলের আগে প্রেরণা পাইয়াছিল। সুতরাং ওকাকুরার সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই ভগিনী নিবেদিতা সম্ভবতঃ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট হইতেই এই নূতন চিত্রশিল্প সম্পর্কেও প্রেরণা পাইয়া থাকিবেন। আমি অনেক বৎসর পূর্ব্বে আমার এক গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি।

চিত্রশিল্প সম্বন্ধেও স্বামীজীর অন্তরদৃষ্টি খুব গভীর। বর্ত্তমান যুগে চিত্রশিল্পে ইউরোপের অনুকরণ যে ব্যর্থ ও লজ্জাকর—ইহা তিনি প্রথম হইতেই বুঝিয়া সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং চিত্রশিল্পে দেশের প্রাণ কোথায় ফুটিয়াছিল এবং কোথা হইতে তাহাকে পুনরায় অগ্রসর করাইয়া দিতে হইবে, তাহাও সুস্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"ওদের নকল করে একটা-আধটা রবিবর্ম্মা দাঁড়ায়। তাদের চেয়ে দিশি চাল-চিত্রি করা পোটো ভাল। তাদের কাছে তবু ঝক্‌ঝকে রঙ আছে। ওসব রবিবর্ম্মা-ফর্ম্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। বরং জয়পুরে সোনালি চিত্রি আর দুর্গা ঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল।"—(স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী, প্রথম সংস্করণ পৃঃ ৩৩৪—১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৮)।

অরবিন্দও রবিবর্ম্মার চিত্রাঙ্কনের উপর ঠিক স্বামীজীর মন্তব্য অনুকরণ করিয়া পরবর্ত্তীকালে যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। এক্ষেত্রে অরবিন্দ স্বামী বিবেকানন্দের অনুগামী।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনের উপর সাধারণভাবে প্রাচ্যদেশীয় আর্টের ও বিশেষভাবে জাপানের প্রভাব এবং সেই সঙ্গে আমাদের বিংশ শতাব্দীর

জাতীয়তাবোধের পরিপোষকতা সম্বন্ধে আর একখানি গ্রন্থে দেখিলাম খুব স্পষ্টভাবে লেখা রহিয়াছে। যথা—

"এইকালে জাপান হইতে মনীষী ওকাকুরা আসেন। জাতীয়তার উদ্বোধনকল্পে তাঁহার আগমনে যথেষ্ট আশা ও উৎসাহ সংযোগ হয়। ওকাকুরার স্বাধীনতার বাণী ইঁহাদের প্রাণে যে উদ্দীপনা ও তেজঃ সঞ্চার করে, তাহা ধুমায়মান স্বাদেশিকতার বহ্নিকে জাগাইয়া জাতীয় শিল্পকলা ও গূঢ় রাষ্ট্রীয়চর্চ্চার নূতন ভঙ্গীতেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। কলাগুরু অবনীন্দ্রনাথের কল্প-প্রতিভা তখন ভারতীয় শিল্প-সাধনায় নবযুগের জন্মদানে ব্যস্ত ছিল। ওকাকুরা এশিয়ার যুগপ্রেরণাকে সার্থক করিতে জাপানের সঙ্গে প্রাচ্য সভ্যতার কোহিনুর ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান কত প্রয়োজনীয় তাহা অনুভব করিয়াছিলেন ও সেই অনুভূতির সঞ্চার ইঁহাদের মধ্যে করিতেন। জাপানের আদর্শে ভারতের রাষ্ট্র-জাগরণ স্বপ্ন হইতে বাস্তবে নামে ইহা তাঁহার অন্তরের কামনা ছিল ও ইহার জন্য সকল রকম পরামর্শ দিতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। স্বদেশী যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গালী এরূপ কত স্বপ্নের রঙ্গীন নেশায় বিভোর ছিল তাহার ঠিকানা নাই। শুনা যায়, একবার লর্ড কার্জ্জনের জীবননাশের পর্য্যন্ত কল্পনা কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা হইয়াছিল। ইহাও স্বদেশী যুগের আগে। রাম না জন্মিতে রামায়ণের ন্যায় আরও যে সব ভাব ও প্রস্তুতি ফল্গু-প্রবাহের মত ভিতরে ভিতরে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার সকল কথা হয়ত এখানে খুলিয়া বলা চলে না। বারীন্দ্রকুমারের দল 'ভবানী মন্দিরের' ছক প্রচার করিয়া ইতিপূর্ব্বেই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।"—("শতবর্ষের বাংলা", শ্রীমতিলাল রায়, চন্দননগর, অগ্রহায়ণ ১৩৩১—পৃঃ ৫৮-৫৯)।

"ভবানী মন্দির" অরবিন্দ ১৯০৫ খৃঃ শেষভাগে বরোদাতে বসিয়া লিখিয়াছিলেন। বারীন্দ্রকুমার উহা ১৯০৬ খৃঃ প্রথমভাগে কলিকাতায় আসিয়া গোপনে ছাপাইয়া বিলি করিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্নঃ অবনীন্দ্রনাথের কল্প-প্রতিভার সহিত বারীন্দ্রকুমারের দলের 'ভবানী মন্দিরের' ছক প্রচারের কোন যোগাযোগ—কি ভাবের দিক হইতে, কি কাজের দিক হইতে— আছে কি-না ?

প্রশ্ন যেরকম গুরুতর, ইহার উত্তর আরও গুরুতর হইবারই সম্ভাবনা। যতদূর দেখিতেছি, অবনীন্দ্রনাথের কল্প প্রতিভা আর অরবিন্দের ভবানী-মন্দিরের

বিপ্লববাদের প্রতিভা যুগপৎ একই সময়ে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রথমার্দ্ধে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাঙ্গালীর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় বৎসরে পাশ্চাত্যকে এরূপ সাংঘাতিকরূপে বর্জ্জন করিয়া কেবল প্রাচ্য রীতির অনুকরণে, জাপানী শিল্পের প্রভাবে—কোন অবনীন্দ্রনাথ যেমন ছবি আঁকিতে পারিতেন না, তেমনি কোন অরবিন্দ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরে বিপ্লবাত্মক ভবানী-মন্দিরের ছক কল্পনা করিতে পারিতেন না। কালের গতি, তাহা যতই আমাদের অজ্ঞানতার জন্য অনিশ্চিত হউক—ইহা কার্য্য-কারণসম্পর্কিত নিয়ম মানিয়া চলে বলিয়াই নিয়মিত, অবশ্যম্ভাবী এবং অপরিহার্য্য। একশ' বছর পরের ঘটনা একশ' বছর আগে হইতে পারে না। বাঙ্গালীর উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে তাহাই প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে।

অবনীন্দ্রনাথের কল্প-প্রতিভা রাজনীতি নহে। তথাপি ইহা তৎকালীন বিপ্লববাদী রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয় না। শিল্পীর সৃষ্টিতে বিপ্লবের বার্ত্তা বহন করে—বাতাসে তাহা ছড়াইয়া পড়ে—মানুষ তাহা নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করে।

মোগল-যুগে রাজপুত ও মোগল চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিতে একটা নূতন উদ্দীপনা আসিয়াছিল। প্রধানতঃ ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। তখনকার চিত্রাঙ্কনের নূতন সৃষ্টিতে রাজপুত ও মোগল চিত্রাঙ্কনের একটা মিশ্রণ হইয়াছিল। কে কাহার হইতে বেশী গ্রহণ করিয়াছিল—রাজপুত হইতে মোগল বেশী নিয়াছিল, কি মোগল হইতে রাজপুত বেশী নিয়াছিল—তাহা চিত্রবিদ্যার সমঝ্‌দার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাই বলিতে পারেন। সম্ভবতঃ রাজপুত হইতেই মোগল বেশী নিয়াছিল। তথাপি রাজপুত ও মোগল মিশ্রণের চিত্রগুলিকে একটা নূতন সৃষ্টি অপেক্ষা প্রাচীনের পুনরাবৃত্তি বলিলে ভাল হয়। ইংরাজীতে ইহাকে revival বলে। কিন্তু বাঙ্গালীর বিংশ শতাব্দীর চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি কেবল কোন কিছুর 'রিভাইভ্যাল' নহে—নূতন সৃষ্টি। প্রাচীনের পুনরাগমন এই নূতন সৃষ্টিতে অবশ্যই আছে। এমন কি, এই পদ্ধতির তৃতীয়-শ্রেণীর শিল্পীরা অজন্তার প্রতিধ্বনি বা প্রতিচ্ছবি মাত্র—ইহা বলিলেও বলা যায়। কিন্তু অরবিন্দ-কথিত জাপানী প্রভাব সত্ত্বেও অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে চিত্র দিয়াছে, তাহার প্রথম বৈশিষ্ট্য: পাশ্চাত্য রীতিকে বর্জ্জন; দ্বিতীয়, প্রাচ্য রীতিকে গ্রহণ।

যদি ইহাকে "রিভাইভ্যাল" না বলা চলে এবং একটা কিছু নাম বলিতেই

হয়—তবে ইংরাজিতে যাহাকে Renaissance বলে, ইহাকে তাহা বলা চলে। বাঙ্গালীর বিংশ শতাব্দী শিল্পের রাজ্যে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির মধ্য দিয়া একটা "রেনেসাঁ"কে জন্ম দিয়া আরম্ভ হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ এই রেনেসাঁ-এর মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর তথা ভারতের বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের প্রথমেই অবনীন্দ্রনাথের স্থান খুব উচ্চে। যখন এই শতাব্দীর ইতিহাস ভাল করিয়া লেখা হইবে তখন এই কথা আরো বেশী পরিস্ফুট হইবে।

এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিতে একটা রহস্যের ব্যঞ্জনা, ইংরাজিতে যাহাকে বলে "মিষ্টিসিজম্" (mysticism) তাহা আছে। অরবিন্দের বিপ্লবাত্মক রাজনীতির মধ্যেও আমরা এক প্রকারের মিষ্টিসিজম দেখিতে পাইব। ক্রমে এই মিষ্টিক্-ভাব ঘোরালো হইয়া তাঁহার রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে।

কংগ্রেস : বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরে (১৯০১ খৃঃ) কংগ্রেস কলিকাতায় হয়। নাটোরাধিপতি জগদীন্দ্রনাথ রায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং দীনশা ওয়াচা কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'ন। বীডন-উদ্যানে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সরলাদেবীর প্রসিদ্ধ গানটি প্রথমে গীত হয়, "অতীত গৌরব-বাহিনী মম বাণী, গাহ আজি হিন্দুস্থান।" কংগ্রেসের ভিতরে বা বাহিরে "পাকিস্তান" তখনো দানা বাঁধিয়া দেখা দেয় নাই। সরলাদেবী ইহার ৪।৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই, রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বীররসাত্মক যথেষ্ট প্রেরণা সঞ্চার করিতেছিলেন। যে-সকল বাঙ্গালী মেয়ে এ-যুগে রাজনীতিতে যোগদান করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী।

"অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, র‍্যাণাডের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। তিনি বলেন—প্রাচীর সহিত প্রতীচীর মিলনের ফল কি হইবে, তাহার বিচারে এবং আমাদের জাতীয় উন্নতিকল্পে কিরূপে য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাবের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করা যায়, তাহার নির্দ্ধারণে র‍্যাণাডে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের পর আর কোন ভারতবাসী এ বিষয় এমনভাবে বুঝিতে পারেন নাই। এই বৎসর কংগ্রেসে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।"—("কংগ্রেস", হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—পৃঃ ৯০)।

কংগ্রেস-রাজনীতিতে রাজা রামমোহন ও র‍্যাণাডের দোহাই দিয়া, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘাতের কথাই ভাবা হইতেছে। পাশ্চাত্যকে বর্জ্জন করিয়া শুধু

প্রাচ্যপ্রীতির মোহ কংগ্রেসে আসিয়া তখনও বিংশ শতাব্দীর নূতন কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করে নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরেও কংগ্রেস অনেক অংশে উনবিংশ শতাব্দীতেই আছে। অনুকরণ—তা' সে পাশ্চাত্যেরই হোক্ অথবা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য-বর্জ্জিত শুধু সমগ্র এশিয়াখণ্ড-সম্ভূত প্রাচ্যেরই হোক্—অনুকরণ তো বটেই! আর অনুকরণের মধ্যে কি একটা স্বতন্ত্র জাতির নিজ স্বভাবের স্বাভাবিক এবং পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব হইতে পারে? যদি আমাদের পক্ষে ইংরেজ বা ফরাসীর অনুকরণ অবাঞ্ছনীয় হয়, তবে চীন বা জাপানের অনুকরণ বাঞ্ছনীয় হইবে কেন? বুদ্ধদেবের আগে হইতেই যে বাঙ্গালীর ইতিহাস আছে, তা কি একটা স্বতন্ত্র নিজস্ব সভ্যতা নহে? সেই সভ্যতার বিকাশ বাঞ্ছনীয়।

সভাপতি দীনশা ওয়াচা দাদাভাই নৌরোজীকে অনুসরণ করিয়া ভারতবাসীর দারিদ্র্যের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। এবং যে অর্থনৈতিক ও বিদেশী বাণিজ্যের চাপে পড়িয়া এই দারিদ্র্য দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে দরিদ্র ভারতবাসী মানুষের প্রয়োজনমত বাঁচিতে পারিতেছে না, বা জঙ্গলের পশু অপেক্ষাও ক্ষুধার তাড়নায় কষ্ট পাইতেছে ও হীন অবস্থায় কায়ক্লেশে টিকিয়া আছে—এই কথা বলিলেন।

সুতরাং এবারকার কংগ্রেস স্বামী বিবেকানন্দের কথারই প্রতিধ্বনি করিতেছে। অরবিন্দ নয় বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসে গণসংযোগ নাই বলিয়া যে অভিযোগ করিয়াছিলেন—তাঁহার কথিত সেই প্রোলেটেরিয়েটদের সম্বন্ধে এবার কংগ্রেস সহানুভূতিসূচক আলোচনা করিয়াছে এবং তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছে। ঐ কমিটিতে বালগঙ্গাধর তিলকও আছেন এবং মদন মোহন মালব্যও আছেন। কিন্তু অরবিন্দ যে পথে ভারতীয় প্রোলেটেরিয়েটদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন, সে কমিটি নিযুক্ত করার পথ নয়। জাতিকে অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্র হইবার পথ তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রেলেটেরিয়েটদের সম্বন্ধে কংগ্রেস হইতে অরবিন্দের কথা স্বতন্ত্র রকমের। অরবিন্দ মতে ও কাজে, মূলতঃ কংগ্রেসপন্থী নহেন—১৮৯৩ খৃঃ হইতেই আমরা তাহা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি।

এইবার কংগ্রেসে আমরা বিপিনচন্দ্র পালকে দেখিতে পাই। তিনি আমেরিকা হইতে সদ্য ফিরিয়া আসিয়াছেন একটি নূতন প্রেরণা লইয়া। তাহা হইতেছে এই যে, আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্মের বক্তৃতা দিয়া ভারতবর্ষকে

স্বাধীন করা যাইবে না। একটা পরাধীন দেশকে স্বাধীন করবার পথ, বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার নহে। স্বাধীন ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম্মই একদিন পৃথিবীতে ভারতবর্ষ প্রচার করিয়াছে। আজিও তাহার চিহ্ন আছে। পরাধীন ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, দেশকে স্বাধীন করা। অতএব বিপিনচন্দ্র 'নিউ ইণ্ডিয়া' কাগজ প্রকাশ করিয়া কংগ্রেস রাজনীতিতে বাঙ্গলার দিক হইতে বাঙ্গলার নিজস্ব যে স্বদেশী যুগের চরমপন্থী রাজনীতি, তাঁর সেই বিশেষ শ্রেণীর চিন্তাধারা প্রবর্তন করিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্রের প্রবেশ আমরা দেখিলাম। কিন্তু অরবিন্দের প্রবেপ এ পথে নয়, অন্য পথে। কংগ্রেসের সদর দরজা দিয়া অরবিন্দ রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নাই। অন্ধকারাচ্ছন্ন এক ভয়াবহ পিচ্ছিল পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

গান্ধীজীকে বাঙ্গলাদেশের এই কংগ্রেসে এই বৎসর প্রথম আমরা দেখিতে পাই। তখন তিনি কংগ্রেস-মণ্ডপে তেমন পরিচিত নহেন। সুতরাং একজন বাঙ্গালী—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গান্ধীজীকে কংগ্রেসের নিকট পরিচয় করাইয়া দিলেন।

দীন্‌শা ওয়াচা এই কংগ্রেসের সভাপতি হইলেও দাম্ভিক মেহেতা, ওয়াচার কর্ণধার ছিলেন। মেহেতা ছিলেন গোখ্‌লের শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু ছিলেন র‍্যাণাডে। গান্ধীজী বলিয়াছেন, রাজনীতিক্ষেত্রে গোখ্‌লে তাঁহার গুরু। সুতরাং, মেহতা তাঁহার গুরুর গুরু, অর্থাৎ পরম গুরু। মেহতার সহিত গান্ধীজীর একটা সাদৃশ্য আছে। মেহেতা যেমন কংগ্রেসে বাঙ্গালী প্রভাব সহ্য করিতে পারিতেন না, গান্ধীজীও তাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া কংগ্রেস হইতে সুভাষ-বিতাড়নের যে চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা পরবর্ত্তীকালে কংগ্রেসের ইতিহাসকে এমন এক দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়াছে, যাহা মেহেতার বাঙ্গালী-বিদ্বেষের মধ্যেও এতদূর স্পর্দ্ধা দেখাইতে পারে নাই।

গান্ধীজী কংগ্রেসে আসিয়া বলিলেন—দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবাসীদের উপর বড়ই অবিচার করা হয়; সে বিষয়ে কংগ্রেসের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। কংগ্রেস-রাজনীতিক্ষেত্রে আবেদন-হস্তে গান্ধীজীর প্রবেশপথ খুব স্পষ্ট এবং অরবিন্দের কংগ্রেস-রাজনীতির বাহিরে বিপ্লবাত্মক রাজনীতিক্ষেত্রে যে প্রবেশপথ তাহা গান্ধীজীর পথ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অরবিন্দের প্রবেশপথের বৈশিষ্ট্য দেখাইবার জন্যই এই সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে

উল্লেখ করা প্রয়োজন। নতুবা অরবিন্দের রাজনীতি ও তাঁহার জীবনচরিত বুঝা যাইবে না।

বাংলাদেশ ও শিবাজী উৎসব: "বোম্বাই প্রদেশে মারাঠা জাতির মধ্যে শ্রীযুক্ত তিলক যে নূতন প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। তিলক-প্রবর্ত্তিত 'শিবাজী-উৎসবের' তরঙ্গ বাংলাদেশেও আসিয়া লাগিয়াছিল। ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় সম্ভবত: ১৯০২ সালে মারাঠার এই বীরপূজা বাংলাদেশে প্রবর্ত্তিত করেন। তদবধি মহাসমারোহে কয়েকবার কলিকাতায় ও মফঃস্বলে 'শিবাজী উৎসবে'র সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী-উৎসব' সম্বন্ধে কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়াছে।......দুঃখের বিষয় তাঁহার এই বিখ্যাত কবিতাটি কাব্য-গ্রন্থে নাই।"—(ভারতে জাতীয় আন্দোলন, প্রঃ মুঃ—পৃঃ ১২৫)।

"৺সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় সম্ভবত: ১৯০২ সালে মারাঠার বীরপূজা বাংলাদেশে প্রবর্ত্তিত করিয়া মারাঠী ও বাঙ্গালীর মধ্যে এক জাতীয়তাসূত্রের সখ্য-সম্বন্ধ দৃঢ়তর করেন। তদবধি মহাসমারোহে কয়েকবার কলিকাতায় 'শিবাজী' উৎসবের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। রবিবাবুর সুবিখ্যাত কবিতা 'শিবাজী' এই উৎসব উপলক্ষ্যে বিরচিত হয়—জাতীয়তার মনীষী বিপিনচন্দ্রও সেদিন সোৎসাহে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।" —(শতবর্ষের বাংলা, মতিলাল রায়—পৃঃ ৫৮)।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিলক মহারাজ মহারাষ্ট্রে 'শিবাজী উৎসব' প্রথম প্রবর্তন করেন। সুতরাং ইহার সাত বৎসর পর বাংলাদেশে 'শিবাজী উৎসবে'র তরঙ্গাভিঘাত আমরা দেখিতে পাই। এই উৎসবের মধ্য দিয়া মারাঠার নূতন হাওয়া বাংলাদেশে আসিয়া লাগিতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ।

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ও ব্যারিষ্টার পি. মিত্র (অনুশীলন-সমিতি): "শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা জাতিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে, একথা বাঙ্গালী ও মারাঠীর মধ্যে প্রথম জাগিয়াছিল। বাংলাদেশে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ও স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার পি. মিত্র প্রভৃতি কতিপয় উৎসাহীহৃদয় কলিকাতায় ১৮৯৭ সালে যুবকদের লইয়া একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতির উদ্দেশ্য ছেলেদের

নৈতিক, মানসিক, দৈহিক উন্নতি-সাধন। ইহাই পরযুগে অনুশীলন সমিতির সূচনা। 'অনুশীলন' কথাটি বঙ্কিমবাবুর নিকট হইতে গৃহীত। প্রথম ইহাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। সেখানে আত্মরক্ষার নানাবিধ কৌশল ও লাঠি খেলার চেষ্টা চলিত। তখনকার শরীর-চর্চ্চা কিন্তু সাধারণ রাস্তা-ঘাটে, রেল-ষ্টিমারে গোরার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্তই চলিয়াছিল। লাঠিখেলা ও আখ্ড়ার সঙ্গে ঐ সময়ে গুপ্ত-সমিতির কল্পনা ও তাহা গড়া চলিতেছিল। তবে তাহাদের কোন বিশেষ কার্য্যকলাপ তখনও দেশে প্রত্যক্ষ হয় নাই। পৃথক ও বিক্ষিপ্তভাবে গুপ্ত-সমিতি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা, দেশকে স্বাধীন করিবার বাসনা, অনেকের মনেই দেখা দিয়াছিল এবং তাহা লাভের উপায় সম্বন্ধেও বিচিত্র ও উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ও স্বদেশী যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলাদেশে এই শ্রেণীর বিপ্লববাদ প্রচারিত হইতেছিল—যথার্থ বিপ্লবকর্ম্মের বিষ দেশমধ্যে তখনও প্রবেশ লাভ করে নাই।"—(ভারতে জাতীয় আন্দোলন, প্রঃ মুঃ—পৃঃ ১২৪-২৫)।

বাঙ্গলার বীর প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য, সীতারাম-উৎসব প্রভৃতি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের কত আগে বা কত পরে তাহা স্বর্গীয়া সরলা দেবী জানিতেন। সরলা দেবীর প্রেরণায় বাঙ্গালী শুধু মারাঠা বীর শিবাজী উৎসব করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই, সেই সঙ্গে বাঙ্গালী বীরদের উৎসবায়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তৎকালে মারাঠার সহিত বাঙ্গালার যে ঐক্যবোধ জাগিতেছিল, সেই ঐক্যবোধের মধ্যেও বাঙ্গলা তাহার ইতিহাসের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য খুঁজিতেছিল। মারাঠার সহিত ঐক্যের সঙ্গে বাঙ্গালী তাহার বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করিয়াছিল। এজন্য সরলা দেবীর প্রতিভা গৌরবের অধিকারী।

আমরা সরলা দেবী ও ব্যারিষ্টার পি. মিত্রের ব্যায়ামাগারের মধ্যেই ১৮৯৭ খৃঃ হইতে ভবিষ্যৎ 'অনুশীলন সমিতি'র বীজ দেখিতে পাইতেছি। এই বৎসরে তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইবে। মাটি বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুর বাহির হইয়া পড়িবে। ইহাতে অরবিন্দের হাত আছে, আমরা দেখিতে পাইব। "যুগান্তর" দল এখনও ভূমিষ্ট হয় নাই। তবে, বেশী দেরী নাই; শীঘ্রই ভূমিষ্ঠ হইবে। এবং এই দুই দলের শাখা-প্রশাখা বাঙ্গলাদেশে মফঃস্বলে ছড়াইয়া পড়িবে। এই দুই দলের সহিত সংশ্লিষ্ট নয় এমন অনেকগুলি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ ব্যায়াম-সমিতি মফঃস্বলে বিক্ষিপ্তভাবে দেখা দিবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে

গাত্রোত্থান করিয়া, চক্ষু-কচ্‌লাইয়া বাঙ্গালী জাতি স্পষ্ট এইসকল দৃশ্য দেখিতে পাইল।

বাঙ্গলাদেশে বিপ্লব-কর্ম্মের সূত্রপাত এবং অরবিন্দ তাহার নেতা :

"রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির পূর্ববর্ণিত বিপ্লববাদ হইতেছে বিপ্লবযুগের প্রথম স্তর ; তিলক, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ প্রভৃতি হইতেছেন বিপ্লবী-ভাবের প্রবর্ত্তক—ইহাই হইতেছে বিপ্লব-যুগের দ্বিতীয় স্তর। বিপ্লব-যুগের তৃতীয় স্তর হইতেছে যথার্থ বিপ্লবী-কর্ম। বিপ্লব-কর্ম আরম্ভ হয় বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে। কিন্তু সিডিশন কমিটি বলেন যে, বোম্বাইয়ের 'সার্বজনিক গণপতি-পূজা' 'শিবাজী-উৎসব' ও র‍্যাণ্ডহত্যা বিপ্লব-কর্ম্মের প্রথম সূচনা।......কিন্তু বাংলাদেশ ছাড়া বিপ্লবের বিষ আর কোথায়ও, এক পাঞ্জাব ছাড়া—তেমন করিয়া বিস্তার লাভ করে নাই।"—(ভারতে জাতীয় আন্দোলন ; প্রঃ মুঃ—পৃঃ ১২৭)।

দেখিতেছি, অরবিন্দকে তিলক-বিপিনচন্দ্রের সহিত বিপ্লবী ভাবের একজন প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে। বিপ্লব-কর্ম্মের সহিত তাঁহাকে সংযুক্ত করা হয় নাই। কিন্তু আমরা দেখিব যে, অরবিন্দ শুধু বিপ্লবী ভাবের প্রবর্ত্তক নন, পরন্তু বিপ্লবী কর্ম্মেরও প্রবর্ত্তক। দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁহার 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গে' বরোদায় যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত অরবিন্দের ঘনিষ্ঠতার কথা প্রত্যক্ষ দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। অরবিন্দই যতীন্দ্রনাথকে বরোদায় সেনাবিভাগে সুপারিশ করিয়া ভর্ত্তি করান। এই "মিলিটারী যতীন্দ্রনাথ"কে অরবিন্দই সরলা দেবীর নিকট চিঠি দিয়া বাঙ্গলাদেশে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, বাঙ্গলাদেশে রাজনৈতিক গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা। অরবিন্দ তখন গুজরাটের গুপ্ত-সমিতির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। সরলা দেবী ইহা বলিয়াছেন। এই ঘটনার কিছুকাল আগেই বোম্বাই প্রদেশে সরলা দেবীর সহিত অরবিন্দের প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। সুতরাং অরবিন্দ তাঁহার পরিচিত সরলা দেবীর নিকট যতীন্দ্রনাথকে পরিচয়-পত্র দিয়া প্রেরণ করেন। এই ঘটনা অরবিন্দের বিবাহের কিছু পরে হইবে।

যতীন্দ্রনাথের বাঙ্গালাদেশে আগমন সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন—

"এই প্ল্যাঞ্চেটী ব্যাপারে ক্রমশঃ আমাদের জীবনের নদীপথে তরীখানি বাঁক নিয়ে আবার অন্য পথে চলবার আয়োজন করে নিলো। রামমোহন, কি বিবেকানন্দ

বা অমনি কে এসে ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে আমাদের উত্তেজিত করতে লাগল দেশে নব আনন্দমঠে সন্তান-সেনা গড়বার জন্যে। তখন মহারাষ্ট্রের গুপ্ত-সমিতির নেতা ঠাকুর সাহেব জাপানে, গুজরাটের গুপ্ত-চক্রের দেশপতি (প্রেসিডেণ্ট) বরোদায়ই আছেন। তাঁর কাছে আদেশ পেয়ে বরোদা সেনা-বিভাগের কাজ ছেড়ে দিয়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় চলে গেছেন এবং সেখানে গুপ্ত-সমিতি গড়ে তুলছেন। আমার ডাক পড়লো দেশের তরুণদের ও ছাত্রসমাজের মনের ভূমিতে স্বাধীনতার বীজ বপন কর্ব্বার জন্যে ; যতীনদা কয়েকজন মাতব্বর ধরে টাকারই নাকি ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, তরুণদের হৃদয় জয় কর্ত্তে পারেন না। আমাকে বাংলাদেশে গিয়া সেইটি করতে হবে। পোষা হাতী দিয়ে যেমন করে হাতী ধরে, গনগনে আগুনে গড়া আমার তরুণ প্রাণের ছোঁয়াচ লাগিয়ে তেমনি তরুণ ধরবার ব্যবস্থার জন্যে গুপ্ত-মন্ত্রের দীক্ষা দিয়ে আমাকে দেশে পাঠানো হ'ল।”—('আমার আত্মকথা', বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—পৃঃ ১৮২-১৮৩)।

গুজরাটের গুপ্ত-চক্রের প্রেসিডেণ্ট বরোদায় ছিলেন। তিনিই যতীন্দ্রনাথকে বাঙ্গলাদেশে পাঠাইলেন। কিন্তু এই প্রেসিডেণ্টই যে অরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার তাহা চাপিয়া গেলেন। এই সময়কার যে-সকল কথা বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে যেখানেই অরবিন্দ আসিয়া পড়িয়াছেন সেইখানেই বারীন্দ্রকুমার তাঁহার 'সেজদার' নাম চাপিয়া গিয়াছেন। ইচ্ছা করিয়াই তিনি এরূপ করিয়াছেন অথবা তিনি অরবিন্দের অভিপ্রায় অনুসারে এরূপ করিয়াছেন, আমরা তাহা জানি না। এ যুগের বিপ্লব-কর্ম্মের কথা যে-সকল বিপ্লবীরা লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই একযোগে ষড়যন্ত্র করিয়া অরবিন্দের নাম চাপিবার প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু চাপিতে গিয়াও চাপিতে পারেন নাই।

বারীন্দ্রকুমারের লেখা হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে—এই বৎসরে প্রথমে যতীন, পরে বারীন, একের পর আর, এই উভয়কে বাঙ্গলাদেশে গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য অরবিন্দই প্রেরণ করিয়াছিলেন। কেননা, “তখন মহারাষ্ট্রের গুপ্ত-সমিতির নেতা, গুজরাটের গুপ্ত-চক্রের প্রেসিডেণ্ট (অরবিন্দ) বরোদায়ই আছেন।”

ঠাকুর সাহেব জাপানে। মহারাষ্ট্রের গুপ্ত-সমিতি পাইতেছি, ঠাকুর সাহেব

পাইতেছি—জাপান পর্য্যন্ত পাইতেছি। আর পাইতেছি গুজরাটের গুপ্ত-সমিতি এবং তার প্রেসিডেন্ট অরবিন্দ। এই বিপ্লব-কর্ম্মে ওকাকুরার কী যোগাযোগ ছিল, তা অরবিন্দের জানিবার কথা। তবে মহারাষ্ট্র হইতেই যে ইহা বাংলা-দেশে আসিল, ইহা প্রত্যক্ষ। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে জাপান আছে। অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতিতে জাপান আছে কি-না কে বলিবে। "ঠাকুর সাহেব জাপানে"—কথাটা সন্দেহের মাত্রা বৃদ্ধি করে। রাজনৈতিক গুপ্ত-হত্যাও এই গুপ্ত-সমিতির অন্তর্ভুক্ত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, সরলা দেবীর ব্যায়াম সমিতিতে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল। সরলা দেবী নিজেও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং এই বিষয়টি পরিষ্কাররূপে বুঝিবার জন্য পুণা-সহরে তিলকের নিকট ছুটিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং দেখিতে পাইতেছি, সরলা দেবীর পেশী দৃঢ় করার ব্যায়ামাগারে অরবিন্দ-প্রেরিত যতীন ও বারীন্দ্রের মধ্য দিয়া রাজনৈতিক গুপ্ত-হত্যার লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, বিক্ষোভের তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কেননা, রাজনৈতিক গুপ্ত-হত্যা একেবারে নূতন জিনিষ। অরবিন্দ ইহা 'সিন্ ফিন্'-দের আদর্শে গ্রহণ করিয়াছিলেন কি-না, বলা কঠিন। তাঁহার আইরিশ-প্রীতি, পার্ণেল-প্রীতি আমরা দেখিয়াছি। বিপ্লব-কর্ম্মের প্রেরণা, "terrorist activities —bombing," তিনি কেম্ব্রিজ থাকাকালীন পাইয়াছেন—একথা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়কুমার ঘোষ বলিয়াছেন। ইহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

ঠিক এই বৎসরেই যে বিপ্লব-কর্ম্মের সূত্রপাত বাঙ্গলাদেশে হয়, তাহা বারীন্দ্রকুমার নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন —

"১৯০২ সালে আমাদের প্রথম ষড়যন্ত্রের বীজ বপন; বলিতে গেলে একরকম তাহার ফলেই ১৯০৬ সালে স্বদেশীর দেশব্যাপী প্লাবনেও আমাদের কর্ম্মের যে একাগ্র যোগ ভাঙিয়াও ভাঙিতে পারে নাই, অন্তরের "অপাওয়া-পাওয়া"র ক্ষুধাই তাহাকে একদিন টলাইয়া দিল।"—(আত্মকাহিনী ; বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—পৃঃ ১-২)।

সুতরাং যতীন ও বারীনের বাঙ্গলাদেশে আসিবার তারিখটা যতটা সম্ভব আমরা বারীন্দ্রকুমারের নিকট হইতেই পাইলাম। এবং আরও দেখিলাম যে, অরবিন্দ শুধু আর পাঁচজনের মত একজন বিপ্লবী ভাবের প্রবর্ত্তক নহেন; পরন্তু, বাঙ্গলাদেশে বিপ্লবী-কর্ম্মের প্রথম এবং প্রধান প্রবর্ত্তক। বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে এইখানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য এবং স্থান। অরবিন্দ ঊনবিংশ

শতাব্দীর নহেন—একান্তই বিংশ শতাব্দীর একজন প্রধান পুরুষ। কিন্তু তাঁহার প্রথম আবির্ভাব প্রভাতের সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত নয়—পরন্তু অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ভয়াবহ পথে, গোপন পদক্ষেপে তিনি প্রবেশ করিতেছেন। এই আবির্ভাব নূতন—ভয়ঙ্কর—অথচ অদ্ভুত।

বয়স ত্রিশ বৎসর (১৯০২।১৫ই আগষ্ট—১৯০৩।১৪ই আগষ্ট):

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী ★ অরবিন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার বরোদায় প্রথম সাক্ষাৎ ★ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ★ ভগিনী নিবেদিতা ও গুপ্ত-সমিতির ১ম পর্ব্ব ★ ভগিনী নিবেদিতা ও 'The Web Of Indian Life' ★ মিঃ ওকাকুরা ★ রবীন্দ্র-নাথ ★ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ★ জগদীশচন্দ্র বসু ★ আহমেদাবাদ কংগ্রেস (১৯০২; সভাপতি—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ★ 'ডন সোসাইটি' ('Dawn Society') ★ ইয়োরোপের নবজন্ম ★ শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ও যতীন্দ্র ব্যানার্জি ★ অরবিন্দের আদেশে বারীন্দ্রের বরোদা হইতে বাংলায় আগমন ★ অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্ত-সমিতির উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ ★ শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ও বৈপ্লবিক ডাকাতি

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী: বিংশ শতাব্দীর নূতন আবেষ্টনের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের জীবন বৎসরের পর বৎসর ক্রমে কি ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিবে আমরা তাহা দেখিতে পাইব।

বাংলাদেশ পৃথিবী ছাড়া নয়। সুতরাং পৃথিবীর অপরাপর দেশের মত বাংলাদেশেও বিংশ শতাব্দী আসিয়াছে। এই শতাব্দীর ইতিহাস যাঁহারা সৃষ্টি করিবেন তাঁহারাও আসিয়াছেন—আসিতেছেন। অরবিন্দ এই নূতন ইতিহাসের কোন্ অংশ সৃষ্টি করিবেন, এই সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে তাঁহার স্থান কোথায়—এই সকল কথাই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয়।

কালের গতি অবিচ্ছিন্ন। নদীর স্রোতের মত বহিয়া চলিয়াছে। স্রোতে জোয়ার-ভাটা আছে, কিন্তু বিচ্ছেদ নাই। সেইরূপ চলিয়া গিয়াছে যে শতাব্দী, তার সহিতও বর্তমান শতাব্দীর বিচ্ছেদ নাই। সম্পূর্ণ যোগ আছে। গত শতাব্দীর শেষ দশকে বিরাট এক তরঙ্গমালা দেশ হইতে ছুটিয়া গিয়া আটলান্টিকের অপর পারে পাশ্চাত্য দেশে গর্জ্জন করিয়াছিল: ১৮৯৩ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা গেলেন; ১৮৯৮ খৃঃ বিপিনচন্দ্র প্রথমে ইংলণ্ড পরে আমেরিকা গেলেন; ১৮৯৯ খৃঃ ব্রজেন্দ্রনাথ ইটালী, রোমে গেলেন; ১৯০২-৩ খৃঃ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ইংলণ্ডে গেলেন—এদের মধ্যে কেহ হিন্দু কেহ ব্রাহ্ম কেহ খৃষ্টান, কিন্তু সকলেই বাঙ্গালী। এইসকল বাঙ্গালী মাত্র ১০ বৎসর কালের মধ্যে একের পর আর ইউরোপ ও আমেরিকা গিয়া বলিলেন যে—যদিও আমরা পরাধীন এবং তোমরা স্বাধীন জাতি, তথাপি দেখ আমাদের দর্শন, দেখ আমাদের ধর্ম্ম, দেখ আমাদের সভ্যতা; তোমাদের ইহা নাই। তোমরা আমাদের নিকট ইহা শিক্ষা লাভ করিতে পার। শুধু তাই নয়, ইহা না-শিখিলে তোমাদের এই চাক্‌চিক্যময় বৈদ্যুতিক সভ্যতা ৫০ বৎসরের বেশী আর টিকিবে না, তোমরা অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। পরাধীন ভেতো বাঙ্গালীর মুখে এতবড় কথা শুনিয়া পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞানী ব্যক্তিরা উপহাস করিলেন না। কথা ঠিক —তাঁহাদের অনেকে ইহা স্বীকার করিলেন। অরবিন্দ ১৮৯৩ খৃঃ দেশে ফিরিয়া অবধি ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহার পরেই বিংশ শতাব্দীর ১ম দশক। এই ১০ বৎসর কালের মধ্যেই অরবিন্দের জীবনকে আমরা দ্বাদশ সূর্য্যের দীপ্তিতে দীপ্তিমান দেখিতে পাইব। কালের গতি যদি অবিচ্ছিন্নই হয় তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের সহিত বিংশ শতাব্দীর ১ম দশকের যোগ আছেই। কী সে যোগ, কোথায় সে যোগ—অরবিন্দের জীবনী আলোচনায় যতটা প্রয়োজন খুলিয়া বলিতে হইবে। কেননা, অ-লিখিত ইতিহাসের অস্তিত্ব নাই। শ্রীঅরবিন্দের জীবনে এপর্য্যন্ত লিখিত অপেক্ষা অ-লিখিত ইতিহাসের অংশ বেশী। শুধু বেশী নয়—অনেক বেশী।

অরবিন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার বরোদায় প্রথম সাক্ষাৎ: ১৯০২ খৃঃ অক্টোবরে ভগিনী নিবেদিতা গায়কোবাড়ের নিমন্ত্রণ পাইয়া বরোদায় গমন করেন। সেখানে রমেশচন্দ্র দত্ত ভগিনী নিবেদিতাকে গায়কোবাড়ের সহিত পরিচয় করিয়া দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই সম্মানিত

অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য "তখন বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দও তাঁকে (নিবেদিতাকে) সম্বর্দ্ধনা করে আনতে ষ্টেশনে যান" (—বারীন্দ্র)। ষ্টেশন হইতে সহরে যাইবার পথে নিবেদিতা কলেজের মিনার গম্বুজওয়ালা বাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "What an ugly pile !"—ভারতীয় ষ্টাইলে গৃহস্থের ছোট্ট বাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "Oh, how beautiful !" একজন রাজ-অমাত্য অরবিন্দের কানে কানে বলিলেন, "I say, she is mad" ! এ-সকল বারীন্দ্রের লেখা হইতে আমরা জানিয়াছি ও উপভোগ করিয়াছি।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনে ১৮৯৫ খৃঃ নভেম্বর (লণ্ডন) তারিখটি স্মরণীয়। কেননা, ঐ তারিখে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আবার ১৯০২।অক্টোবর (বরোদা) তারিখটিও স্মরণীয়। কেননা, ঐ তারিখে অরবিন্দের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ভগিনী নিবেদিতার জীবনে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষৎ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, আবার ঠিক তেমনি শ্রীঅরবিন্দের জীবনে ভগিনী নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই প্রসিদ্ধ বিপ্লবীর অতীত ইতিহাস সংক্ষেপে দেখিয়া লইলে ভাল হয়। ভগিনী নিবেদিতা (Miss Margaret Elizabeth Noble) লণ্ডনে থাকাকালীন (1890-1895) প্রিন্স ক্রোপট্কিনের (Prince Kropotkine) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। ক্রোপট্কিনের 'Doctrine Of Mutual Aid', যাহা গভর্ণমেন্টের অস্তিত্বকে নিষ্প্রয়োজন মনে করে—সেই আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। এবং ঐ সময়ে Irish Home Rule আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে বিপ্লবের কেন্দ্রগুলিকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। আবার অন্য দিকে, ১৮৯২ খৃঃ শ্রীঅরবিন্দ কেম্ব্রিজে থাকাকালীন সন্ত্রাসবাদ (terrorism—bombing) দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া "Lotus & 'Dagger" নামে একটি গুপ্ত-সমিতি পরিচালনা করিয়াছিলেন। সুতরাং এই দুই বিপ্লবীর প্রথম মিলন ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এবং নিবেদিতা যখন অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতেছেন তখন বাংলাদেশে অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতির প্রথম পর্ব্ব পুরাদমে চলিতেছে। ভগিনী নিবেদিতা ও অরবিন্দ প্রথম সাক্ষাতের পরই, পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং উভয়ে উভয়ের শক্তি মিলিত করিয়া একই উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। ("They knew themselves to be the artisans of a

common work.")। তাঁহারা পরস্পরের দার্শনিক মতবাদ আলোচনা করিলেন। বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতা মায়াবাদী। তাঁহার মতে এই জগত মায়া। অন্যদিকে অরবিন্দ এই জগতে ভগবানের প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছেন—তিনি লীলাবাদী। ভগিনী নিবেদিতাই প্রথম অরবিন্দকে বলিলেন, "কলিকাতা আপনাকে চায় ; বাংলাই আপনার উপযুক্ত স্থান"। "(It was she who first said to him : Calcutta has need of you. Your place is in Bengal.")। অরবিন্দ উত্তর করিলেন, "না। আমি পশ্চাতে থাকিব। আমার কাজ মানুষ তৈরী করা"। ("No I remain in the background. My work is to create men.")। ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়া বলিলেন, "আপনি আমার উপর নির্ভর করিতে পারেন। আমি আপনার সহকর্ম্মী"। ("Count on me", said Nivedita giving her hand to him, "I am your ally")।—[ভগিনী নিবেদিতার ফরাসী জীবনচরিত—পৃঃ ২৩৩]।

নিবেদিতা মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া ১৯০৩।জানুয়ারী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়: ভগিনী নিবেদিতা যখন বরোদায় অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতেছেন, সেই মাসেই (৫ই অক্টোবর) উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব "ফিরিঙ্গিজয় ব্রত" গ্রহণ করিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। ১লা নভেম্বর নেপল্‌স্ (Naples) পৌঁছিলেন। ৫ই নভেম্বর অক্সফোর্ডে (Oxford) পৌঁছিলেন। মাত্র ১৩ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অক্সফোর্ডের কলেজগুলি খোলা ছিল। সুতরাং পৌঁছিয়াই একমাসেরও অল্পকাল মধ্যে যথাক্রমে তিনটি বক্তৃতা দিলেন। যথা—(১) Hindu Theism (হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বরবাদ), (২) Hindu Ethics (হিন্দুর নীতিশাস্ত্র), (৩) Hindu Sociology (হিন্দুর সমাজ-বিজ্ঞান)। ডাঃ কেয়ার্ড এই তিনটি বক্তৃতাতেই সভাপতি হইয়াছিলেন। তারপর Hindu Thought & The Western Culture সম্বন্ধেও একটি বক্তৃতা দিলেন।

হিন্দুধর্ম্মের নামে অদ্বৈতবাদ, পাশ্চাত্য দেশে একটু বেশী প্রচার হওয়াতে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মনে সন্দেহ হইয়াছিল—বুঝিবা হিন্দুদর্শনে ঈশ্বরের স্থান নাই। Hindu Theism বক্তৃতার পর এই সমালোচনা Joseph Rickaby

করিলেন যে—না, সব হিন্দুদর্শন অদ্বৈতবাদ প্রচার করে না। এবং উপাধ্যায় Oxfordএ প্রচলিত সকল দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধেই বিশেষ ওয়াকিবহাল পণ্ডিত-ব্যক্তি। "He argued earnestly that *not all* Hindu philosophy is Pantheistic. I was particularly struck with the thorough understanding he showed of the philosophies current in Oxford.…In Oxford he suffered from insufficient clothing and poverty." 'Hindu Sociology' বক্তৃতায় অনুমান করি, তিনি বর্ণাশ্রমের মহিমা প্রচার ও ব্রাহ্মণকে বর্ণের গুরু করিয়া দেওয়ার সংযুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকিবেন। রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা এই সময় বেজায় রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সমাজানুগত্যকে বিপিনচন্দ্র পাল উপাধ্যায়ের স্বাদেশিকতা বা স্বদেশপ্রেম বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন।

১৯০৩ খৃঃ কেম্‌ব্রিজ (Cambridge) Trinity College এ আবার তিনটি বক্তৃতা দিলেন—(১) হিন্দু নির্গুণ ব্রহ্ম, (২) হিন্দু ধর্মনীতি, (৩) হিন্দু ভক্তিতত্ব। আমি যতদূর শুনিয়াছি উপাধ্যায় দার্শনিক মতবাদে নির্গুণ ব্রহ্ম ও অদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের মত স্পষ্ট অদ্বৈতবাদ-বিরোধী। ডাঃ মেটাগার্প (Dr. Metaggarp) সবগুলি বক্তৃতাতেই সভাপতি হইয়াছিলেন।

সুতরাং Oxford ও Cambridge এ দার্শনিক ভূমিতে উপাধ্যায় "ফিরিঙ্গিজয় ব্রত" ছ'মাসেরও কম সময়ের মধ্যে উদ্‌যাপন করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের পর ইহা সহজ কাজ ছিল না। Mr. Stead উপাধ্যায়কে একদিন নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য Oxford আবার তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেল। এদিকে Cambridge বিশ্ব-বিদ্যালয়ে হিন্দু দর্শনের জন্য একটি নূতন অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করিবার কথা হইল। উপাধ্যায়ের বেদান্ত বক্তৃতাই ইহার কারণ।

উপাধ্যায় বিলাত হইতে হিন্দু-রক্ষণশীলতা সমর্থন করিয়া "বঙ্গবাসী" পত্রে কতকগুলি পত্র ছাপাইলেন। ফলে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত গোঁড়া ব্রাহ্মণ খৃষ্টান উপাধ্যায়কে সমর্থন করিতে লাগিলেন। এইখানে স্বামী বিবেকানন্দ হইতে উপাধ্যায় স্বতন্ত্র—পৃথক্। এতটা বামনাই, এতটা গোঁড়ামি স্বামীজী বরদাস্ত করেন নাই। কারণ, তিনি ছিলেন হিন্দু আর উপাধ্যায় ছিলেন খৃষ্টান ;

তিনি ছিলেন কায়স্থ আর উপাধ্যায় ছিলেন ব্রাহ্মণ। অবশ্য উভয়েই ছিলেন সন্ন্যাসী।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দেই দেশে ফিরিয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে হিন্দু দর্শনের অধ্যাপকপদে বরণ করিয়া কেম্‌ব্রিজে পাঠাইবার জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করিলেন। ফলে কিন্তু উহা ফাঁসিয়া গেল। একটা বিরুদ্ধ দল ছিল। উপাধ্যায় আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"ব্যথা হ'লো আমার, ছেলে হ'লো ওদের!"

ভগিনী নিবেদিতা ও গুপ্ত-সমিতির প্রথম পর্ব্ব: ভগিনী নিবেদিতা বরোদায় অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ১৯০৩জানুয়ারীতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এবং অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্ত-সমিতির প্রথম পর্ব্বের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে আবদ্ধ হইলেন।

"সিষ্টার নিবেদিতা বাংলার এই প্রথম বিপ্লব-কেন্দ্রটিকে তাঁর লাইব্রেরীর জাতীয়তা বিষয়ের প্রায় এক-দেড় শ' বই দিয়েছিলেন। কথা ছিল রাজনীতির স্কুল করে ইতিহাস, জীবনী ও ডিগ্‌বী রমেশ দত্ত নৌরজী আদির অর্থনীতির বই প্রভৃতি পড়িয়ে এখানে প্রথমে কতকগুলি পলিটিক্যাল মিশনারী গড়া হবে; এবং তার পরে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে তাদের পাঠিয়ে সমগ্র দেশ বিপ্লবের ছোট-বড় মৌচাকে ছেয়ে দেওয়া হবে। আমি হলুম প্রথম ছাত্র এই রাজনীতির ক্লাসের। তারপর জুটল এসে দেবব্রত, নলিন মিত্র, জ্যোতিষ সমাজপতি, ভূপেন দত্ত, ইন্দ্র নন্দী, এই ধরণের অনেক মানুষ। আমি এসে সখারাম গণেশ দেউস্কর মশাইকে এই বিপ্লব-কেন্দ্রটির সহিত পরিচয় করিয়ে দিলুম। দেশে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেবার এমন একটা দল আছে শুনে এই শিবাজী-ভক্ত মহারাষ্ট্র-সন্তান তো আনন্দে অধীর। তিনি তখনই এসে যতীনদার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে গেলেন এবং স্কুলের অর্থনীতির ক্লাসটির শিক্ষার ভার নিলেন।" —("বোমার কাহিনী"; বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—"স্বদেশ", অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮)।

বারীন্দ্রকুমার আমাদিগকে বলিয়াছেন—"Nivedita was connected with us since her first Baroda-visit"—বরোদা গমনের পর হইতেই নিবেদিতা আমাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন।

প্রাচ্য-প্রীতির কথা: আগে কিছু বলা হইয়াছে। এই শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে যে কলাকলা বিশেষতঃ চিত্রবিদ্যার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে পাশ্চাত্যকে বর্জ্জন এবং প্রাচ্য রীতিকে গ্রহণ—ইহাই বড় কথা। এবং তাহাও বলা হইয়াছে।

কিন্তু কেহ যেন মনে না-করেন যে, একজন জাপানী ভদ্রলোক (ওকাকুরা) এবং একজন আইরিশ ভদ্রমহিলা (ভগিনী নিবেদিতা) এই দুইজনে ষড়যন্ত্র করিয়া এই শতাব্দীর প্রথমে এই নূতন মতবাদকে আমাদের ইতিহাসে সূচিকা-ভরণের দ্বারা হঠাৎ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাচ্যদেশগুলি সম্বন্ধে গত শতাব্দীতে রাজা রামমোহন হইতে স্বামী বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত একটা সুস্পষ্ট ধারণা যে ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। রাজা রামমোহন এযুগে তুলনামূলক ধর্ম্মবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা—প্রাচ্যদেশগুলির ধর্ম্মমতসকল উল্লেখ করিয়া তুলনা করিয়াছেন। শুধু গ্রীস ও রোমের কথাই বলেন নাই, পরন্তু চীন ও ত্রিবৃৎ (তিব্বত) এবং তুর্কী ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশের উল্লেখ করিয়া ঐসকল দেশের ধর্ম্মমতের সহিত আমাদের জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের তুলনা করিয়াছেন। ইহা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের কথা ('অনুষ্ঠান')। পরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ চীনদেশে গমন করেন। সেখানে—

"হংকং পৌঁছিয়া তথা হইতে ক্যাণ্টনে যাইয়া সেখানকার ধর্ম্মমন্দির প্রভৃতি দর্শন ও মন্দিরস্থ ধর্ম্মযাজকগণের সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়াছিলেন। তথাকার দৃশ্য বর্ণনা এই: 'এখানে পাপীদিগের ভয়প্রদর্শন করিবার জন্য নরক-যন্ত্রণা ভোগের বিবিধ মৃৎমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। কোথাও ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র মনুষ্যের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রক্তপান করিতেছে, কোথাও বা কেহ কৃমিকীট দ্বারা অর্দ্ধভক্ষিত দেহে ছটফট করিতেছে, কেহ অগ্নিতে দগ্ধ, কেহ বা বিষে জর্জ্জরিত। অন্য কতবিধ ভয়ঙ্কর দৃশ্য রহিয়াছে তাহা দেখিলে মনে সহসা ভয়ের সঞ্চার হয়।' এই বর্ণনা হইতে কোন মতেই মনে হয় না যে, তিনি চীনদেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যথার্থভাবে খোঁজখবর লইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কংফুচির ধর্ম্ম বা 'তাও' ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই জানিতেন না। চীনদেশের শিল্প খুব আশ্চর্য্য; কিন্তু তাহার নিদর্শন নিঃসন্দেহে ক্যাণ্টনে তিনি পান নাই। চীনে নিতান্ত নিম্নস্তরের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমন্দির তিনি দেখিয়া থাকিবেন; সে-সকলের দ্বারা চীনের সভ্যতার কোন বিচার হয় না। যেমন আমাদের দেশের কোন সাধারণ মন্দির বা পূজারী ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আমাদের দেশের সভ্যতার বিচার হইতে পারে না।"—(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী—পৃঃ ৫৭৩)।

এবং ইহার পরে—

"...১৮৯৮ সালে ১১ই মার্চ্চ স্বামীজীর শিষ্যা সিষ্টার নিবেদিতা (মিস্ এম্. ই.

নোব্‌ল্) কলিকাতার ষ্টার থিয়েটারে 'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। স্বামীজী সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই উঠিয়া সিষ্টারকে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচয় করিয়া দিবার জন্য নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন:

সম্ভ্রান্ত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ!

আমি যখন এশিয়ার পূর্ব্বভাগে ভ্রমণ করিতেছিলাম একটী বিষয়ে আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমি দেখিলাম ঐসকল স্থানে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা বিশেষভাবে প্রবেশ করিয়াছে। চীন ও জাপানী মন্দিরসমূহের প্রাচীরে কতকগুলি সুপরিচিত সংস্কৃত মন্ত্র লিখিত দেখিয়া আমি যে কিরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম, তাহা আপনারা অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন। সম্ভবতঃ আপনারা অনেকেই জানিয়া সুখী হইবেন যে, ঐগুলি সমুদয়ই প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। আমাদের বঙ্গীয় পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে মহোৎসাহের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ উহারা আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।"—(ভারতে বিবেকানন্দ—পৃঃ ৬২০-২১)।

আর একদিক দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, গত শতাব্দীর চতুর্থভাগের প্রথম (১৮৭৫ খৃঃ) হইতেই বাংলাদেশে প্রাচ্য-প্রীতির গোড়াপত্তন হয়। শুধু ভূগোলের পরিচয় দ্বারা এই প্রাচ্য-প্রীতিকে মাপিলে ঠিক মাপা হইবে না। প্রাচ্য দেশগুলির ভৌগোলিক পরিচয় জানা অবশ্যই দরকার। তারপরে প্রাচ্য দেশগুলির ইতিহাস, ধর্ম্ম, সভ্যতা, রাজ্যবিস্তার, কলাকলার বিকাশ—এই সকলেরই পরিচয় থাকা দরকার। কিন্তু শুধু তাতেও হয় না। প্রীতি চাই। প্রীতি আসিবে কোথা হইতে? প্রাচ্যদেশের ভূগোলের পরিচয় হইতে প্রীতি আসে না। এই প্রীতি জাগাইয়া দিয়াছিলেন (১৮৭৫-১৮৮৬ খৃঃ) শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তাঁহার শেষজীবনের এই এগার বৎসর যাঁহারাই দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেই দেশীয় ভাব অর্থাৎ প্রাচ্য-প্রীতির ভাব জাগরিত হইয়াছিল—পাশ্চাত্যের মিথ্যা মোহ কাটিয়া গিয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের বৎসর (১৮৮৬ খৃঃ) হইতেই ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অবতাররূপে দেখা দিলেন এবং তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত (১৯০০ খৃঃ) এই চৌদ্দ বৎসর শিক্ষিত বাঙ্গালীর এক বড় অংশকে পাশ্চাত্যের মোহ কাটাইয়া দেশীয় ভাবের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অর্থাৎ প্রাচ্য-প্রীতির দিকে আকৃষ্ট

করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে গত শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই আমরা প্রাচ্য-প্রীতির গোড়াপত্তন দেখিতে পাই। ওকাকুরা ও ভগিনী নিবেদিতা যে-ক্ষেত্রে আসিয়া বীজ বপন আরম্ভ করিলেন, আমরা সংক্ষেপে সেই ক্ষেত্রের পরিচয় দিলাম মাত্র। নতুবা বলিবার আরো অনেক কথাই ছিল।

এই বৎসরে প্রাচ্য-প্রীতির অনেকগুলি নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। সব দিক দিয়া সকলগুলির সমান উল্লেখ সম্ভবপর হইবে না। আরো একটা কথা প্রথমে বলিয়া রাখা ভাল। এই প্রাচ্য-প্রীতি নূতন স্বদেশ-প্রীতির জন্ম দিয়াছে।

ভগিনী নিবেদিতা ও THE WEB OF INDIAN LIFE : যদিও ভগিনী নিবেদিতার "The Web Of Indian Life" প্রথমে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পুস্তক-আকারে প্রকাশিত হয়, তথাপি বিপিনচন্দ্রের "The New India" কাগজে এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দেই প্রকাশিত হইতে থাকে। এই গ্রন্থের প্রথম কথা—সমগ্র এশিয়াখণ্ডে অতি প্রাচীনকাল হইতেই আজ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে এক অখণ্ড সভ্যতা বিরাজমান। এশিয়ার এই সভ্যতা প্রাচ্য ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেও তাহার মজ্জাগত ঐক্য কখনও হারায় নাই। ইহা ইয়োরোপের সভ্যতা হইতে স্বতন্ত্র। দ্বিতীয় কথা—এশিয়াখণ্ডের এই বিশেষ সভ্যতার উদ্ভব-কেন্দ্র হইতেছে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ হইতেই প্রাচীন এশিয়ার সব দেশে ধর্ম্ম, সভ্যতা ও দার্শনিক চিন্তাপ্রবাহ মরু-গিরি-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া চলাচল করিয়াছে, প্রবাহিত হইয়াছে। তৃতীয় কথা—ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে এবং হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যে বিরুদ্ধতা থাকা সত্বেও এক অতি নিগূঢ় ঐক্য বিদ্যমান। এই বহু-বৈচিত্রের মধ্যে যে ঐক্য রহিয়াছে, এ যুগে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধের তাহাই মূল ভিত্তি। সমগ্র ভারতবর্ষের ঐক্যের ভূমিতে এই জাতীয়তাবোধকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য ভগিনী নিবেদিতা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শেষে নিজের জীবন পর্য্যন্ত দান করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভগিনী নিবেদিতার যে অবদান, তাহার তুলনা নাই। ইতিহাসে উহা চিরদিন বৈদ্যুতিক প্রেরণায় বাঙ্গালীকে তেজোদৃপ্ত রাখিবে। বিপিনচন্দ্র পাল এবং রবীন্দ্রনাথ ভগিনী নিবেদিতার প্রাচ্য-প্রীতিপূর্ণ এই গ্রন্থের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন (* ক)।

(* ক) "Her (Nivedita) unique devotion to our land and

মিঃ ওকাকুরা: তাঁহার Ideals Of The East গ্রন্থ এই বৎসরে (১৯০৩ খৃঃ) লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। একজন ইংরেজ (Mr. Murray) বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এই বলিয়া যে, একজন জাপানী ভদ্রলোক ইংরেজী ভাষায় এমন গ্রন্থ লিখিলেন কী করিয়া। আমরা কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার হাতের চিহ্ন এই গ্রন্থে দেখিতে পাইয়াছি। শুধু ভাবের ঐক্য নয়, ভাষারও মিল আছে। এই গ্রন্থ প্রণয়নে মিঃ ওকাকুরা ভগিনী নিবেদিতার নিকট বহু সাহায্য পাইয়াছিলেন। উভয়েরই চিন্তার সাদৃশ্য আছে। হয়ত দুই-জনে একসঙ্গেই চিন্তা করিয়াছিলেন, এমন প্রমাণও আমরা পাইয়াছি।

people had its reward in the almost complete understanding of some aspects at least of our life and institutions that was vouchsafed into her. The quick intellectual perceptions and broad spiritual sympathies of her Irish heritage enabled her to see the true soul of India. In her 'Web Of Indian Life' Sister Nivedita has presented a more correct interpretation of some aspects of our present-day life and thought, than is found in any other English book on India that I know of."—[*The Soul Of India*—Bipin Chandra Pal ; p. 39-40]

* * * *

"The reason which made us deeply grateful to Sister Nivedita, that great-hearted Western woman, when she gave utterance to her criticism of Indian life. She had won her access to the inmost heart of our society by the supreme gift of sympathy. Because she had a comprehensive mind and extraordinary insight of love, she could see the creative ideals at work behind our social forms and discover our soul that has living connexion with its past and is marching towards its fulfilment. Sister Nivedita, being an idealist, saw a great deal more than is usually seen by those foreigners who can only see things, but not truths. Sister Nivedita has uttered the vital truths about Indian life."—[*Introduction to the Web Of Indian Life*—Rabindra Nath Tagore ; Oct. 21, 1917]

সরলা দেবীর সহিত ওকাকুরার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু তা থাকা সত্ত্বেও এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ভগিনী নিবেদিতা যে চমৎকার নূতন ব্যাখ্যা এই শতাব্দীর প্রথমে আমাদের দিয়াছেন এবং মি: ওকাকুরাকে Ideals Of The East গ্রন্থ প্রণয়নে যেরূপ ভাবান্বিত করিয়াছেন, সরলাদেবী তাহা পারেন নাই। ভগিনী নিবেদিতা ওকাকুরার গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে—সমগ্র এশিয়াখণ্ডের প্রত্যেক প্রদেশে একই জীবন স্পন্দিত হইতেছে। ("...Asia, a united living organism, each part dependent on all the others, the whole breathing a single complex life.")। তারপরে লিখিতেছেন যে—ওকাকুরা তাঁহার গ্রন্থে প্রমান করিতেছেন যে, প্রাচীন মানব-সভ্যতার প্রসূতি এশিয়া চিরদিন এক এবং অখণ্ড। ("...that Asia, the Great Mother, is for ever One")। মি: ওকাকুরার গ্রন্থের প্রথম ছত্র হইতেছে যে, "Asia is One". সমগ্র এশিয়া এক। শুধু ভাবের নয়। ভাষার সাদৃশ্যও আশ্চর্য্য রকমের। ওকাকুরা বলিতেছেন যে, হিমালয় পর্ব্বত যদিও চীন ও ভারতবর্ষের সভ্যতার মধ্যে দণ্ডায়মান এবং যদিও চীনের কন্‌ফিউসিয়াসের সামাজিক সাম্যবাদ ও ভারতের বৈদিক সভ্যতার ব্যক্তিত্ববাদ কিঞ্চিৎ পৃথক্, তথাপি এই উভয় সভ্যতার আদান-প্রদানে হিমালয় পর্ব্বত যে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই, তাহার কারণ উভয় সভ্যতার মূলে ঐক্য বিদ্যমান। তারপর জাপানের কলাকলার কথা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এবং জাপানে নূতন স্বদেশ-প্রীতির কথাও বর্ণিত হইয়াছে। ঐ স্বদেশ-প্রেম এত উগ্র যে—যদি বুদ্ধ এবং কন্‌ফিউসিয়াস একত্রে জাপান আক্রমণ করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে জাপানীরা শাক্যমুনির মাথা কাটিয়া ফেলিবে এবং কন্‌ফিউসিয়াসের মাংস সমুদ্রের নোনা জলে নিক্ষেপ করিবে। ("...strike off the head of Sakya-Muni, and steep the flesh of Confucius in brine!") অতি ভয়ঙ্কর কথা! জাপানের এই খুনোখুনি স্বদেশ-প্রেমের ঢেউ বঙ্গোপসাগরের তটভূমিতে আসিয়া এইকালে মৃদুমন্দ আঘাত করিতেছিল, তাহার প্রমাণ আমরা পাই। বাংলাদেশে স্বদেশী যুগের দেশ-প্রীতি কত দিক হইতে প্রেরণা পাইয়াছে, তা আজ পর্য্যন্ত যথাযথ নিরূপিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ: এই শতাব্দীর প্রথম হইতেই এবং তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য-প্রীতির সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯০১, ২২শে

ডিসেম্বর তিনি বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রথম হইতেই শান্তিনিকেতনের গাছতলায় বসিয়া উপনিষদ পড়াইতে আরম্ভ করেন। উপাধ্যায়ের জীবনেও যেমন পাশ্চাত্যের অনুকরণের তীব্র প্রতিবাদ দেখা যায়, তেমনি প্রাচ্য-প্রীতির নিদর্শনও যথেষ্ট পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এই সময় বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়) সম্পাদনা করিতেছিলেন। ঐ সময় বঙ্গদর্শনে তিনি Lowes Dickinson's Letters of John Chinaman—জন চীনাম্যানের চিঠির অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনা করেন। ছেলেবেলায় তখন আমরা উহা পাঠ করিয়াছি এবং এখনও পর্য্যন্ত বেশ স্পষ্ট মনে আছে যে, ঐ সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সভ্যতার দোষত্রুটীগুলির উপর কিরূপ নির্ম্মমহস্তে কুঠারাঘাত করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে চীন তথা প্রাচ্য দেশের সভ্যতার প্রাচীন রীতি ও তাহার মহান্ ভাবসকলকে স্তব-স্তুতিতে বন্দনা করিয়াছেন। শতাব্দীর প্রথম হইতেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য-প্রীতিতে ভরপুর এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই প্রাচ্য-প্রীতিতেই ভরপুর ছিলেন। মাঝে স্বদেশী-যুগে এই প্রাচ্য-প্রীতি তাঁহার স্বদেশ-প্রীতিতে উদ্দীপিত হইয়া দেখা দিয়াছিল। সমগ্র এশিয়াখণ্ডে, এযুগে রবীন্দ্রনাথের মত প্রাচ্য-প্রীতি আর কাহারও দেখা যায় নাই। এজন্য সমগ্র এশিয়াবাসীর তিনি স্মরণীয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন: শতাব্দীর প্রথমের প্রাচ্য-প্রীতি ক্রমে স্বদেশী যুগে দেশ-প্রীতিকে জাগাইয়া দিল। তারপরে একটা গুপ্ত-হত্যা, রাজ-অত্যাচার ও অবসাদের যুগ কাটিয়া গেল। গান্ধী-যুগ আসিল। এযুগে বাঙ্গালার সিংহ চিত্তরঞ্জন গর্জ্জন করিলেন। ১৯২২, ডিসেম্বর গয়া-কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের আসরে আবার প্রাচ্য-প্রীতির অবতারণা করিলেন। তিনি এশিয়ার সকল জাতিকে এক হইবার পরামর্শ দিলেন। সমস্ত ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বীদের এক হওয়া অপেক্ষা সমস্ত এশিয়াবাসীর এক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বেশী, ইহাও বলিলেন। এশিয়ার জাতিগুলি নির্য্যাতিত, সুতরাং এই নির্যাতন দূর করিবার জন্য তাহাদের একটা ঐক্যসূত্রে মিলিত হওয়া দরকার। এবং ভারতবর্ষকেও এশিয়ার সমগ্র জাতিগুলির সহিত মিলিত হইবার পরামর্শ দিলেন (* খ)।

(* খ) "...The great Asiatic Federation, which I see in the course of formation. I have hardly any doubt that the Pan-Islamic movement, which was started on a somewhat narrow

প্রাচ্য-প্রীতি চিত্রবিত্থার মধ্য দিয়া ক্রমে কিরূপে কংগ্রেসের আসরে আসিয়া মাথা তুলিল ইহা আমরা দেখিলাম। এবং এই শতাব্দীর প্রথম বাইশ বৎসর প্রাচ্য-প্রীতির গতি ইতিহাসপথে পর্য্যবেক্ষণ ও নিরূপণ করিলাম। আমরা ১৯০২-৩ খৃষ্টাব্দে আবদ্ধ, অথচ প্রাচ্য-প্রীতির গতি অনুসরণ করিয়া ১৯২২ খৃষ্টাব্দের শেষধাপে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এদিকে আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। প্রাচ্য-প্রীতি—সে শুধু নিবেদিতা আর ওকাকুরার ষড়যন্ত্রের ফল নয়, ইহার যে ইতিহাস আছে, এই কথা বলাই উদ্দেশ্য।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু : ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় লর্ড আমহার্ষ্টকে একখানি চিঠি লেখেন। ঐ চিঠিতে তিনি এতদ্দেশীয়দের বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু গোঁড়া হিন্দুর দল কেবল সংস্কৃত শিক্ষার জন্য আব্দার করেন। রামমোহন লর্ড আমহার্ষ্টকে স্পষ্টই বলিলেন যে, ইউরোপবাসীরা বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াই পৃথিবীর অন্যান্য অংশের লোকদের অপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। "...Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, and other useful sciences which the natives of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world". সুতরাং এশিয়াবাসীর প্রথম কর্ত্তব্য ইউরোপ হইতে বিজ্ঞানের গাছ আনিয়া এশিয়ার মাটিতে রোপণ করা। "...Planting in Asia the arts and sciences of Modern Europe". ১৩৪ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহনের

basis, has given way, or is about to give way, to the great Federation of all Asiatic people. It is the union of the oppressed nationalities of Asia. Is India to remain outside this union? I admit that our freedom must be won by ourselves, but such a bond of friendship and love, of sympathy and co-operation, between India and all the liberty-loving people of the world is destined to bring about world-peace. World Peace, to my mind, means the freedom of every nationality and I go further and say that no nation in the face of the Earth can be really free when other nations are in bondage."—[*Presidential Address*—Gaya Congress, December, 1922 *by* C. R. Das]

মত অপর কোন এশিয়াবাসীর এতদূর ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ছিল না। এবং এশিয়া সম্পর্কে এতদূর সচেতনও কেহ ছিল না।

রাজা এশিয়া সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ভারতবর্ষকে শুধু স্বাধীন বলিয়াই কল্পনা করেন নাই, পরন্তু এশিয়ার আলোকস্তম্ভ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ('Enlightener of Asia')। প্রাচ্য-প্রীতির জন্যই পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের প্রয়োজন। ইহাই রাজা রামমোহনের ইঙ্গিত। মিস্ কলেট সত্যি বলিয়াছেন যে—রাজা এমন এক সভ্যতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছেন যাহা শুধু প্রাচ্য নয় শুধু পাশ্চাত্য নয়, এ উভয় হইতে অধিকতর বৃহৎ ও মহৎ। "The Rajah was no merely Occidentalized Oriental. He leads the way from the Orientalism of the past, not to, but through Western culture, towards a civilization which is neither Western nor Eastern, but something vastly, larger and nobler than both".

রামমোহনের এই চিঠি লেখার ৭৭ বৎসর পর ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর প্যারিস-প্রদর্শনীতে স্বামী বিবেকানন্দ বলিলেন—

"সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হইতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির —আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করিলেন,—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ ডাঃ জে. সি. বোস। একা যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্য-মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা-মহিমায় মুগ্ধ করিলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার—মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করিল! সমগ্র বিদ্বানমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী!"

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, ঐ শতাব্দীর শেষ বৎসরে তাহা কিছুটা সফল হইতে চলিল।

জগদীশ বসু আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বৎসরে (১৯০২ খৃঃ) আর এক-খানি নূতন গ্রন্থ লিখিলেন। এবার বিদ্যুতের উপর নয়, গাছপালার উপর। গ্রন্থের নাম "Response In The Living & Non-living". জগদীশ বসু প্রমাণ করিলেন যে, জীবজন্তুর মত গাছপালারও প্রাণ আছে। বিংশ শতাব্দীর উদ্বোধনে বাঙ্গালী রাজা রামমোহন-নির্দ্দিষ্ট পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিয়াছে, বর্জ্জন করে নাই। জগদীশ বসু তাহার প্রমাণ। ভগিনী নিবেদিতা ও জগদীশ বসু পরস্পর গুণমুগ্ধ ছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতা ও মিঃ ওকাকুরা উভয়েই একই বৎসরে তাঁহাদের গ্রন্থে জগদীশ বসুর নাম সম্মানের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের উল্লেখের রকম দেখিয়া মনে হয় যে, জগদীশ বসু সম্পর্কে তাঁহারা উভয়েই একত্রে পরামর্শ করিয়া তবে লিখিয়াছেন।

বাঙ্গালীর বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস লেখা এখানে আমাদের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু যে বৎসর জগদীশ বসু Response In The Living & Non-living লিখিলেন ঠিক সেই বৎসরই অরবিন্দ ঘোষ গুজরাটের গুপ্ত-সমিতির প্রেসিডেণ্ট থাকা অবস্থায় বাঙ্গালাদেশে গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য সরলা দেবীর নিকট চিঠি দিয়া প্রথমে পাঠাইলেন যতীন্দ্র ব্যানার্জ্জিকে (নিরালম্ব স্বামী), পরে পাঠাইলেন নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারকে।

কংগ্রেস : এবার আমেদাবাদে হয়। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি দ্বিতীয়বার সভাপতি হন। তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত দীর্ঘ। আমাদের অভাব-অভিযোগের বিস্তৃত ফর্দ্দ ফিরিস্তি করিয়া তিনি পেশ করিলেন। তিনি অসাধারণ বাগ্মী বলিয়া খ্যাত। মিঃ নেভিন্‌সন্ ইহার ৫ বৎসর পর (১৯০৭ খৃঃ) সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মীতার প্রশংসা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ইউরোপের প্রাচীন ও নবীন সকল প্রসিদ্ধ বাগ্মীদের সহিত তুলনা করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহাদের সমকক্ষ বলিয়াছেন। সিসেরো, পিট, গ্লাডষ্টোন কেহই বাদ যান নাই। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ কি!

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন—

সাম্রাজ্যবাদ আমাদের উন্নতির পথে বাধা। এই সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্য সকলের সহিত আমাদের সমান অধিকার নাই। আমাদের কাজ হইতেছে সেবা করা, দাসত্ব করা আর দূরে দাঁড়াইয়া জোড়হস্তে স্তব-স্তুতি করা এবং বন্দনাগীত গাওয়া, কিন্তু সাম্রাজ্যের অংশীদার হিসাবে আমরা দক্ষিণ-আফ্রিকায় (বুয়র যুদ্ধে ?) সৈন্য পাঠাইয়াছি।—যাতে নেটাল রক্ষা পাইল। আমরা চীনে সৈন্য পাঠাইয়াছি। আমাদের সৈন্যেরা পিকিনের দেয়ালে সাম্রাজ্যের বিজয়ধ্বজা প্রথিত করিয়া আসিল। আমাদের রাজভক্তির তুলনা নাই, অতুলনীয়। ভারত-সচিবের তাহা ধারণা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু আমাদের অবস্থা কিরূপ ? আমরা নিজের দেশে বিদেশী। অন্যান্য স্বাধীন উপনিবেশগুলির তুলনায় আমরা তাহাদের মধ্যে ক্রীতদাস (হেলট্) অপেক্ষাও অধম।"

মডারেট বক্তৃতার এরকম ঝাঁজ অন্য প্রদেশের আর কোন সভাপতি দেখাইতে পারেন নাই। ইহা সুরেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। সুরেন্দ্রনাথ বৃটিশ সাম্রাজ্যকে এমনভাবে ঢালিয়া সাজিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, যাহা অপেক্ষা বেশী অধিকার মহাত্মা গান্ধী লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে (১৯৩১ খৃঃ) দাবি করিতে পারেন নাই। এবং স্বদেশী যুগের পরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র পাল দার্শনিক-ভিত্তির উপর যে সাম্রাজ্যবাদের কথা বলিয়াছেন, তাহা সুরেন্দ্রনাথের সাম্রাজ্যবাদের প্রতিধ্বনি নয় সত্য, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের সাম্রাজ্যবাদ বিপিনচন্দ্রের সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী নহে। নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধের কথাই আমাদের মনে পড়ে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যেসব স্থানে সাদৃশ্য আছে তাহা আমরা দেখি না।

ডন্ সোসাইটি (Dawn Society) ও ভগিনী নিবেদিতা: সম্ভবতঃ এই বৎসরে প্রতিষ্ঠা হয়। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। এই সোসাইটিতে পরে ভগিনী নিবেদিতা আসিয়া যোগ দেন। এই সোসাইটি হইতে পরে ডন্ ম্যাগাজিন (Dawn Magazine) বলিয়া ইংরাজীতে মাসিক এক পত্রিকা বাহির হয়। ভগিনী নিবেদিতা তাহাতে প্রবন্ধ লেখেন। ১৯১০ জুন মাসে এই ম্যাগাজিনে ভগিনী নিবেদিতা যে প্রবন্ধ লেখেন তাহার নাম Unity of Life and Type in India. ১৯০২ খৃঃ বিপিনচন্দ্র পালের The New Indiaতে ভগিনী নিবেদিতা যে-সকল এবং যে-ধরনের প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ৮ বৎসর পরে ডনের প্রবন্ধটীও তাহারই অনুরূপ। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে The New India ছাপা বন্ধ হয়। সম্ভবতঃ তাহার পরে ভগিনী নিবেদিতা ডন্ ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ দিতে থাকেন অথবা 'নিউ ইণ্ডিয়া' এবং 'ডনে' যুগপৎ একই সময়ে তিনি লিখিয়া থাকিবেন। মূল কথা, এই উভয় কাগজের প্রবন্ধগুলিতে ভগিনী নিবেদিতা একই আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। ভারতবাসীর মনে প্রাচ্য-প্রীতি—ভারতবর্ষের একতা এবং নূতন জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯০৯-১০ খৃঃ অরবিন্দের 'কর্ম্মযোগিন্' পত্রিকাতেও ভগিনী নিবেদিতা নূতন জাতীয়তার পরিপোষক উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সুতরাং ১৯০২ হইতে ১৯১০ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি নিউ ইণ্ডিয়া, ডন্ ম্যাগাজিন, মডার্ণ রিভিউ ও কর্ম্মযোগিন্-এ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং বিপিন পাল, সতীশ মুখার্জ্জি ও অরবিন্দের সহিত ভাবের আদানপ্রদানে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়াছেন। বিপিনচন্দ্র পাল এবং সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জি উভয়েই বিজয়কৃষ্ণ

গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য। অশ্বিনীকুমার দত্তও তাই। এই তিনজনেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রাজনীতিতে চরমপন্থী নেতা বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা, বিজয়কৃষ্ণের দুই শিষ্য বিপিনচন্দ্র ও সতীশ মুখার্জ্জির সহিত মিলিত হইলেন। এ এক অপূর্ব্ব মিলন। ভগিনী নিবেদিতার মধ্য দিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলিল। রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—ইহারা প্রত্যেকেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে নূতন জাতীয়তাবোধে শক্তি সঞ্চার করিতে লাগিলেন। ভগিনী নিবেদিতার এই সময়কার এবং তাহার পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঊনবিংশের সহিত বিংশ শতাব্দীর পার্থক্য যেমন আছে, যোগও তেমনি আছে। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র ও অরবিন্দ—এই দুই শতাব্দীর মধ্যে যোগাযোগের একটি প্রধান সেতু।

অবিরাম বৃষ্টিপাতের মত যাঁহার লেখা বর্ষিত হয় সেই স্বনামধন্য বিনয়কুমার সরকার এই ডন্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকালে ইহার একজন উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিও ছিলেন।

পরে এই ডন্ সোসাইটি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সহিত মিলিত হইয়া যায়। অরবিন্দ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ঐ জাতীয় পরিষদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

ডন্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকালের কথাই হইতেছে। ঐ সময়ে ইহার আদর্শ কি ছিল তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝা কঠিন। অরবিন্দ এই শতাব্দীর প্রথমে ভারতের রেঁনেসা বা নবজন্ম বলিতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আর্য্য পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন, ডন্ সোসাইটিতে তাহার বীজ ছিল। এশিয়া এবং ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার একটা প্রেরণা ইহাতে ছিল। এবং এই প্রেরণা আসিয়াছিল ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতে। অরবিন্দ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে ভগিনী নিবেদিতা ডন্ সোসাইটির তরুণ যুবকদলের মধ্য দিয়া নূতন জাতীয়তাবোধের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবাত্মক রাজনীতি বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত প্রচার করিয়াছিলেন প্রচুর। সুতরাং অরবিন্দ যখন ভগিনী নিবেদিতার সংস্পর্শে আসিলেন তখন উভয়েই উভয়কে দেখিলেন পুরাদস্তুর বিপ্লববাদী। সুতরাং কি ভগিনী নিবেদিতা, কি শ্রীঅরবিন্দ ইঁহারা উভয়েই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে খাস ইংলণ্ড হইতে বিপ্লবাত্মক আদর্শ এবং বিপ্লবকর্ম্মের

প্রেরণা লইয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। বস্তুটী সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য, প্রাচ্য কিছুই নহে। এই শতাব্দীর প্রথম দশকেই ইহার বিস্ফোরণ আমরা দেখিতে পাইব। এবং তাহার প্রতিক্রিয়াও দেখিতে পাইব।

ডন্ সোসাইটি সম্পর্কে আমাদের বলিবার কথা এই যে, ইহা একসময়ে ভগিনী নিবেদিতার বাহন হইয়াছিল। সুতরাং বিপ্লবের আদর্শ হইতে ইহা খুব দূরে ছিল বলিয়া মনে হয় না। প্রথমটা অরবিন্দের সহিত এই সোসাইটির কোন যোগ আমরা দেখিতে পাই না। বিপিনচন্দ্রের 'নিউ ইণ্ডিয়া'র আদর্শ ডন্ সোসাইটির আদর্শ হইতে বেশী তফাৎ না-হইলেও, উহা আর একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। বিপিনচন্দ্রকে প্রেরণা দিতেছিলেন ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

এই সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বরোদা হইতে অরবিন্দ-প্রেরিত যতীন্দ্র ও বারীন্দ্রের আবির্ভাব। এবং এই আকস্মিক গুপ্ত আবির্ভাব যে-ইতিহাস রচনা করিবে, তাহাই এই সময়কার অরবিন্দের জীবনচরিত।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান্ হয়; পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়।"

ইউরোপের নবজন্ম: ডন্ সোসাইটিতে ভারতীয় কৃষ্টির (Indian Culture) একটা পুনর্জন্ম আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং প্রসঙ্গত: এখানে আর একটা কথাও সংক্ষেপে বলা দরকার। এই সময়ের দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ ও ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল উভয়ে একই রকমের একটি কথা একজন বাঙ্গালায় আর একজন ইংরাজীতে বলিয়া গিয়াছেন। কথাটা এই: বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে একটা রেঁনেসা (নবজন্ম) দেখা দিবে। এবং ভারতবর্ষই ইউরোপের এই নবজন্মের প্রেরণা জোগাইবে। অত্যন্ত চমকপ্রদ কথা সন্দেহ নাই।

স্বামীজী বলিতেছেন—

"হিন্দু ও গ্রীক এ যুগে পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয়ই অন্তর্হিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদের শারীরিক বা মানসিক বংশধরেরা বর্ত্তমান। ইউরোপ, আমেরিকা যবনদিগের (গ্রীক) সমুন্নত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান; আধুনিক ভারতবাসী আর্য্যকুলের গৌরব নহে। কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃকশক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।

"আমরা আধুনিক বাঙ্গালী—আজ অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ঐ যবন (গ্রীক) গুরুদিগের পদানুসরণ করিয়া ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্দ্ধা অনুভব করিতেছি।

"সমগ্র ইউরোপ আজ সর্ব্ববিষয়ে প্রাচীন গ্রীসের ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী। আধুনিক সময়ে পুনর্ব্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলনকাল উপস্থিত। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"—('ভাববার কথা'—পৃঃ ১৩-১৮)।

ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ ঠিক এই কথাই বলিতেছেন :

"সংস্কৃত সাহিত্যের আবিষ্কারের পর হইতেই ইউরোপের নবজন্ম আরম্ভ হইয়াছে ('The preparation for the greater European Renaissance of which I speak, began with what has been called the discovery of Sanskrit')। ইউরোপে বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তর রেঁনেসা (···greater European Renaissance of the coming century)।—১৮৯৯ খৃঃ রোমে তিনি এই কথা বলিতেছেন। সুতরাং coming century বলিতে হইতেছে। গ্রীস এই রেঁনেসার প্রেরণা আর যোগাইতে পারিবে না ("A new European Renaissance, if it is to come, must not therefore look to Greece for inspiration.")। ইউরোপে আজ ভয়ঙ্কর লোভ ও সজ্যাত, উন্মাদের ক্ষুধা এবং অত্যন্ত জঘন্য ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, বর্ব্বরতা এবং আত্মঘাতী সামরিক সাজসজ্জা (···fierce greeds and contentions, its "mad hunger and coarse sensualism, its gross barbarianism and destructive militarism) দেখা যাইতেছে। গ্রীসও এ-ব্যারামের ওষুধ আর দিতে পারিবে না ("Greek Philosophy, Greek Culture, has no cure for this malady.")। হিন্দুই কেবলমাত্র এই ব্যাধির ঔষধ ইউরোপকে দিতে পারে ("The speculative ardour, the Metaphysical genius, the science of the Absolute, of the Hindus, are exactly fitted to infuse a new blood into European Philosophy, and to rouse its dormant activity.")।

স্বামী বিবেকানন্দের "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ" ঠিক মিলিয়া গেল। এমন

আশ্চর্য্য মিল খুব কম দেখা যায়। এই মিলন লইয়াই বাঙ্গালীর বিংশ শতাব্দীর উদ্বোধন।

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ও যতীন্দ্র ব্যানার্জ্জি : সরলা দেবী, তাঁহার মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বোম্বাই প্রদেশে সোনারপুরে জজ ছিলেন (সম্ভবতঃ ১৮৯২ খৃঃ), তখন তিনি তাঁহার ঐ মাতুলের কাছে গিয়াছিলেন এবং মারাঠার নূতন জাতীয় আন্দোলনের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। পরে তিনি মাইসোর গিয়াছিলেন এবং কলিকাতা ফিরিয়া ১৮৯৭ খৃঃ জাতীয়তাবোধকল্পে লাঠিখেলা প্রভৃতি শক্তি-উপাসনা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। পরে আবার একবার তিনি তাঁহার মাতুল সত্যেন ঠাকুরের সহিত বরোদারাজ্যে গমন করেন। সেখানে অরবিন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সরলা দেবী তাঁহার এক বন্ধুর নিকট অরবিন্দের উপর গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করিয়া প্রশংসা করেন। কিন্তু ঐ বন্ধুটী অরবিন্দকে মুরুব্বিয়ানাভাবে এই কথা বলাতে অরবিন্দ ভাবিলেন, গ্রীক ভাবের দরুন সরলা দেবী তাঁহাকে জাতীয়তাবোধহীন ভাবিতেছেন। ইহাতে তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন এবং প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা ১৮৯৫ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হইবে।

সরলা দেবীর নিকট অরবিন্দের চিঠি লইয়া যতীন ব্যানার্জ্জি কলিকাতা আসিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যতীন ব্যানার্জ্জি অরবিন্দের আদেশে বরোদার সৈন্যবিভাগের কাজ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিলেন। সরলা দেবী ও যতীন ব্যানার্জ্জি কিছুদিন একসঙ্গে কাজ করিলেন এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যতীন ব্যনার্জ্জি বারীন্দ্রকুমারের সহিত ঝগড়া করিয়া রাজনীতি ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলেন। সেই ঘটনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সরলা দেবীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। সরলা দেবী বারীন ঘোষের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন নাই। তবে যতীন ব্যানার্জ্জির নিকট হইতে বারীন ঘোষের কার্য্যকলাপ তিনি সমস্তই শুনিতেন এবং বিদিত ছিলেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে যদি যতীন ব্যানার্জ্জি কলিকাতায় আসিয়া থাকেন তবে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে রাজনৈতিক গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া অরবিন্দ তাঁহার কনিষ্ঠ বারীন্দ্রকে যতীন্দ্রের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য বাংলাদেশে পাঠাইলেন। সরলা দেবী যতীন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়াছিলেন কিন্তু বারীন্দ্রের সহিত

আসেন নাই। একথা সরলা দেবী বলিয়াছেন এবং বারীন্দ্রও তাহা আমাদের নিকট স্বীকার করিয়াছেন।

যতীন্দ্র ব্যানার্জ্জির কিছু পরিচয় দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'অরবিন্দ প্রসঙ্গ' আলোচনার সময় দিয়াছি। কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। যতীন্দ্রের ইতিহাস অনেকটা লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। এক গল্প ছাড়া বিশেষ কেহ কিছুই বলিতে পারেন নাই। এমন কি বারীন্দ্রকুমারকে প্রশ্ন করিলে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, সেজদা যখন যতীনদাকে বাংলাদেশে পাঠান তখন কি উদ্দেশ্যে কেন পাঠান এ-সকল কথা তিনি আমাকে কিছুই বলেন নাই। তারপরে যখন বারীন্দ্রকুমারকে প্রশ্ন করা হইল—কে বাংলাদেশে যতীন্দ্র ব্যানার্জ্জিকে পাঠাইয়াছিল; উত্তরে তিনি বলিলেন, সেজদা (অরবিন্দ) পাঠাইয়াছিলেন।

সুতরাং দেখিতেছি—যতীন্দ্রকে পাঠাইবার সময় অরবিন্দ বারীন্দ্রের নিকট কিছুই প্রকাশ করেন নাই। গোপন করিয়াছেন। পরে যখন বারীন্দ্রকে পাঠান তখন যতীন্দ্রের বিষয় সব খুলিয়া বলিয়াছেন। মন্ত্রগুপ্তি ও বিচক্ষণতা, দুইই অরবিন্দে বিদ্যমান ছিল। যে কাজে অরবিন্দ অগ্রসর হইতেছেন, সেই কাজ করিবার উপযোগিতা তাঁহাতে ছিল। প্রথমেই যদি উপযোগিতার অভাব থাকিত তাহা হইলে এই কার্য্যে তিনি হাত দিতেন না। এই কাজের যোগ্যতা তাঁহার আছে। এই বিশ্বাস তাঁহার ছিল বলিয়াই যতীন্দ্র ও বারীন্দ্রকে তিনি একের পর আর বাংলাদেশে পাঠাইয়াছিলেন। যতীন্দ্রের কতদিন পরে বারীন্দ্রকে পাঠান হইয়াছিল, তাহা বারীন্দ্রকুমার এক্ষণে বলিতে পারেন না। স্মৃতিশক্তি ক্ষীণতার দোহাই দিয়া কাঁচা-পাকা গোঁফের ফাঁকে একটু মৃদু হাস্য করেন মাত্র।

এখন দেখা যাক, যতীন্দ্র ব্যানার্জ্জি কে। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া নিম্নলিখিত সংবাদ পাইয়াছি :

"জন্মস্থান—গ্রাম চান্না; জেলা বর্দ্ধমান; 'খানা' জংসানে নামিয়া যাইতে হয়। চান্নার ভিতরে—ফোড়ে নদীর ধারে নিরালম্ব স্বামীর আশ্রম এবং তাঁহার ভিটার নিকটবর্ত্তী স্থলে সাধক কমলাকান্তের বাশুলি মন্দির। নিরালম্ব স্বামীর স্ত্রীর নাম চিণ্ময়ী, নিঃসন্তান। দেখিতে রোগা এবং চক্ষু টেরা। নিরালম্বের স্বাস্থ্য সবল এবং নীরোগ এবং দেখিতে লম্বা (* গ)।"

(* গ) নিরালম্ব স্বামীর জনৈক বন্ধু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ২।৬।৪২ তারিখে আমরা এই খবরটুকু পাইয়াছি।

এইবার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথা তুলিয়া দিতেছি :

"গৃহস্থাশ্রমে নিরালম্ব স্বামীর নাম ছিল শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্দ্ধমান জেলার চন্না গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় তিপ্পান্ন বৎসর হইয়াছিল। প্রবাসীর সম্পাদক এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালা কলেজের প্রিন্সিপাল থাকিবার সময় শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তিনি কিছুকাল বরোদারাজ্যে সৈন্যবিভাগে কাজ করিয়াছিলেন এবং আধুনিক রণ-কৌশল অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি যখন বরোদায় ছিলেন তখন শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ তথাকার শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কথিত আছে—শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ যতীন্দ্রনাথের নিকট হইতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মন্ত্রলাভ করেন। অরবিন্দ, তাঁহার ভ্রাতা বারীন্দ্র, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি যখন আলিপুরে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র আদি অভিযোগে অভিযুক্ত হন, তখন যতীন্দ্রনাথও অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

"তাঁহার দেশভক্তি প্রবল ছিল। যত সাধু-সম্প্রদায়ের আখড়ায় তিনি আমা-দিগকে লইয়া যাইতেন। সর্ব্বত্রই মোহন্ত বা অন্য প্রধান সাধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে এবং সাধুসন্তদিগের বাণীতে ভারতবর্ষ কখন স্বাধীন হইবে সে বিষয়ে কিছু উক্ত আছে কি না। প্রায় সকলেই উত্তর দেন, ওরূপ সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁহারা উদাসীন। এবং কিছু জানেন না। কেবল গরীবদাসী সম্প্রদায়ের ১জন প্রৌঢ় সাধু, সন্ন্যাসী যতীন্দ্রনাথ নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করায় বলিলেন, 'আমাদের একখানি গ্রন্থে [বা একটা শাস্ত্রবাণীতে, ঠিক কিসে বলিয়াছিলেন এখন মনে নাই] আছে ভারতবর্ষ আটাশ বৎসর পর স্বাধীন হইবে। সন ১৩১২ হইতে আটাশ বৎসর ১৩৪০ সনে পূর্ণ হয়; ভবিষ্যদ্বাণীর সম্ভাব্যতা ও সত্যতায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, মনের মত ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁহাদেরও কতকটা গুপ্ত বিশ্বাস থাকিতে পারে। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, সাধুটীর কথা শ্রোতাদের ভাল লাগিয়াছিল।

"নিরালম্ব স্বামীর আশ্রম তাঁহার জন্মগ্রাম চন্নাতেই অবস্থিত ছিল। গত ১৯শে ভাদ্র তিনি দেহরক্ষা করেন।"—(প্রবাসী—১৩৩১, অগ্রহায়ণ)।

নিরালম্ব স্বামী সম্পর্কে প্রবাসীর উপরে উদ্ধৃত লেখাটি অত্যন্ত বাজে কথা। অরবিন্দ ঘোষ যতীন্দ্রনাথের নিকট ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মন্ত্র লাভ করিয়া-

ছিলেন, এই কথাটি 'কথিত আছের' উপর দিয়া চালাইবার চেষ্টা দায়ীত্বজ্ঞান-হীনতার পরিচায়ক।

প্রকাশ্য সৈন্য-বিভাগ হইতে গুপ্ত-সমিতির গহ্বর, দিবালোক হইতে অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকারে প্রবেশ। এই ভয়াবহ অন্ধকার গহ্বরে যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি কি নিজে ইচ্ছা করিয়া প্রবেশ করিলেন? যতীন্দ্র গোড়া হইতেই প্রকাশ্য দিবালোক বাছিয়া লইয়াছেন। সৈন্য-বিভাগের কার্য্য প্রকাশ্য দিবালোক। গুপ্ত-সমিতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু। সুতরাং যতীন্দ্র নিজে ইচ্ছা করিয়া গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশে আসেন নাই। সৈন্য-বিভাগ হইতে গুপ্ত-সমিতিতে অরবিন্দই তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং গুপ্ত-সমিতির কল্পনা অরবিন্দের—যতীন্দ্রের নহে। এই আভ্যন্তরিক প্রমাণেও রামানন্দ বাবুর "প্রবাসী"র 'কথিত আছে' কথার অলীকত্ব প্রমাণ হয়।

বারীন্দ্রকুমার স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, "অরবিন্দ এই সময় গুজরাটের গুপ্ত-সমিতির প্রেসিডেণ্ট।" সুতরাং গুজরাটের গুপ্ত-সমিতির প্রেসিডেণ্ট একজন বাঙ্গালীর পক্ষে তাঁহার নিজের দেশে গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা হওয়া খুব স্বাভাবিক; বরং এইরূপ ইচ্ছা না হওয়াই গুপ্ত-চক্রের প্রেসিডেণ্টের পক্ষে একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

সরলা দেবী অরবিন্দের সহিত ৪।৫ বৎসর আগে হইতে সাক্ষাৎ-পরিচয়ে সুপরিচিত। সুতরাং ১৮৯৭ হইতে ১৯০১ খৃঃ পর্য্যন্ত সরলা দেবীর বাংলাদেশের কার্য্যকলাপের উপর তিনি নিশ্চয়ই চক্ষু রাখিয়াছিলেন। এত লোক থাকিতে বিশেষভাবে সরলা দেবীর নিকট চিঠি দিয়া যতীন্দ্রকে পাঠাইবেন কেন? অরবিন্দ সরলা দেবীর ব্যায়ামাগারকে যতীন্দ্রনাথের পক্ষে গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত ক্ষেত্র মনে করিয়াই পাঠাইয়াছিলেন।

অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথকে প্রথম দিন দেখিয়াই ও তাঁহার সহিত কথা বলিয়াই শুধু খুশি নন, বিস্মিত হইলেন।

"যতীন্দ্রনাথের সাহস, উদ্যম, উচ্চাভিলাষের পরিচয় পাইয়া অরবিন্দ বিস্মিত হইলেন এবং সে যাহাতে সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে পারে সেজন্য যথেষ্ট আগ্রহও প্রকাশ করিলেন।"—(অরবিন্দ প্রসঙ্গ)।

ইহা প্রত্যক্ষদর্শী দীনেন্দ্রকুমার রায়ের উক্তি। এই উক্তি হইতে বোঝা যায়, অরবিন্দ যেন তাঁহার কাজের জন্য এই রকমের একটি লোক মনে মনে

খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। গুপ্ত-সমিতির কল্পনা অরবিন্দের মাথায় তখন থাকিলেও অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাকে সৈন্য-বিভাগেই প্রবেশ করাইলেন, গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠার জন্য নিযুক্ত করিলেন না। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, বাংলাদেশে গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার কল্পনা যতীন্দ্রের সহিত প্রথম-সাক্ষাতের সময় অরবিন্দের মনে তেমন দানা বাধিয়া উঠে নাই। তখন তিনি গুজরাটের গুপ্ত-সমিতির প্রেসিডেন্টপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন কি-না জানা যায় না। কেননা, ঠাকুর সাহেব জাপানে গেলে পর অরবিন্দ সেই পদে অধিষ্ঠিত হন। ঠাকুর সাহেব কবে ও কি উদ্দেশ্যে জাপানে গেলেন, একথা কেহ বলিতে পারেন না। ঠিক কোন্ সময়ে বাংলাদেশে গুপ্ত-সমিতির উপযোগিতা ও প্রতিষ্ঠার কথা অরবিন্দের মনে আসিয়াছিল, তাহা বারীন্দ্রকুমারও জানেন না। এক অরবিন্দই জানেন।

যতীন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া সরলা দেবীর সহিত মিশিয়া কি কাজ করিলেন, তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

যতীন্দ্রের সহকর্ম্মী বারীন্দ্রকুমার বলিতেছেন যে—

"যতীনদা কয়েকজন মাতব্বর ধরে টাকারই নাকি ব্যবস্থা কর্তে পেরেছেন, তরুণদের হৃদয় জয় কর্ত্তে পারেন নি। আমাকে বাংলাদেশে গিয়ে সেইটী করতে হবে।"

গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য টাকার দরকার। টাকাই প্রথম প্রয়োজন। সুতরাং যতীন্দ্র সেই প্রথম প্রয়োজন সমাধা করিয়াছেন। কয়েকজন মাতব্বর ধরিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভদ্রলোকের ছেলেদের লইয়া ডাকাতি করিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন এমন কথা বারীন্দ্রকুমার বলিলেন না। অবশ্য ইহা বলা-কওয়ার কথা নয়। কিন্তু বারীন্দ্রকুমার নিজের ও পরের সম্বন্ধে যে-সব কথা বলিয়াছেন, তাহাতে যতীন্দ্রনাথ ডাকাতি করিয়া টাকা সংগ্রহ করিলে সে-কথা বলিতে তাঁহার কোন বাধা ছিল বলিয়া মনে হয় না। অথচ ভদ্রলোকের ছেলেরা তখন (১৯০২, সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে টাকার জন্য মফঃস্বলে দুই-চার স্থানে ডাকাতি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সরলা দেবী ইহা বলিয়াছেন। শুধু বলেন নাই, ইহার জন্য তিনি রীতিমত বিব্রতও হইয়াছিলেন।

যতীন্দ্র কি এই ডাকাতির সহিত সংস্রবশূন্য ছিলেন? অরবিন্দ কর্ত্তৃক

বাংলাদেশে বিপ্লবকর্ম্মের যে প্রথম পর্ব্ব আমরা উদ্‌ঘাটন করিতেছি তাহার ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। মানিকতলার বাগানে বোমার ব্যাপার ২য় পর্ব্ব। ২য় পর্ব্বের ইতিহাস যাঁর যেমন খুশি লিখিয়া গিয়াছেন। কিছুটা পাওয়া যায়। কিন্তু অরবিন্দ-প্রেরিত যতীন্দ্র-বারীন্দ্রের অনুষ্ঠিত এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত যে ১ম পর্ব্বের ইতিহাস, তাহা পরবর্ত্তী বিপ্লববাদীরাই সম্যক্ অবগত নহেন, অপরে কা কথা। সুতরাং যতীন্দ্র গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য টাকা সংগ্রহার্থে ভদ্রলোকের ছেলেদের লইয়া ডাকাতি করিয়াছিলেন কি-না, তাহা সরলা দেবী এবং বারীন্দ্রকুমারের চেয়েও অরবিন্দের পক্ষে জানা ও বলা বেশী সম্ভব ছিল।

অরবিন্দের আদেশ পাইয়া বরোদা হইতে বাংলাদেশে বারীন্দ্রের আগমন: এই আগমনের তারিখ আমরা ১৯০২ খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধ ধরিয়া নিতেছি। তাহা অপেক্ষা আর সঠিক তারিখ জানিবার উপায় নাই। কেননা, বারীন্দ্রকুমারেরও ঠিক তারিখটী মনে নাই। ১৯০১-২ হইবে, তিনি এইরূপ বলিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন, "তরুণ ধরবার ব্যবস্থার জন্যে গুপ্ত-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে আমাকে দেশে পাঠান হ'ল।" মুখে আমাদিগকে স্পষ্ট বলেছেন যে, "সেজদা (অরবিন্দ) আমাকে গুপ্ত-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া পাঠাইয়াছিলেন।" সুতরাং প্রথম হইতেই বারীন্দ্র অরবিন্দের নাম লুকাইয়া যাইতেছেন এবং ইহা তিনি স্বীকারও করিয়াছেন। আমরা শুধু গুপ্ত-সমিতি নয় ঐ সমিতিতে প্রবেশের পূর্ব্বে অরবিন্দের নিকট হইতে গুপ্ত-মন্ত্রও পাইলাম।

এই গুপ্ত-মন্ত্র কী—বারীন্দ্র বলেন—আমার মনে নাই। এই গুপ্ত-মন্ত্রের রহস্য এখন আর জানিবার উপায় নাই।

বারীন্দ্র যখন ২২ বৎসর অতিক্রম করিয়া সবে ২৩ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন জ্যেষ্ঠের আদেশে গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠাকল্পে পূর্ব্বপ্রেরিত যতীন্দ্রকে সাহায্য করিবার জন্য বরোদা হইতে বাংলাদেশে অবতীর্ণ হইলেন। হিসাব করিয়া দেখিলাম, অরবিন্দ বারীন্দ্র হইতে ৮ বৎসরের বড়। যতীন্দ্র হইতে ৫ বৎসরের বড়। সুতরাং বারীন্দ্র হইতে যতীন্দ্র মাত্র ৩ বৎসরের বড়।

বারীন্দ্রের গতিবিধি: বারীন্দ্র লিখিতেছেন, "এই বৈদ্যনাথে ১৮৯৩ সাল থেকে আমার জীবনে পাঁচটী বছর কেটেছে"। পাঁচ বৎসরের কিছু বেশী হইবে।

কেননা, রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যুর সময় বারীন্দ্রের বয়স ১৯ বৎসরে পৌঁছিয়াছে। ১৪ হইতে ১৯, এই ৫ বৎসর দেওঘরে প্রবাসকালে তাঁহার জীবনে রাজনারায়ণ বসুর প্রভাব ছাড়াও আর একটা বড় ঘটনা আছে। সে ঘটনাটি এই—"পূজোর ছুটিতে সেজদাই (অরবিন্দ) বছর বছর আসতেন, আর আমাকে দেশপ্রীতি ও দেশসেবার সম্বন্ধে বোঝাতেন"। কিন্তু এই প্রভাবের মধ্যে পড়িয়াও বারীন্দ্রের 'রাঙা মা' উপিয়া যান নাই। দেওঘরে আসিয়া পাণ্ডাবাড়ী থাকিয়া তিনি দুইবার বারীন্দ্রকুমারকে দেখিয়া যান।

দেওঘর হইতে বারীন্দ্রকুমার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন। এবং দ্বিতীয় ডিভিসনে পাশ করিলেন। ইহা সম্ভবতঃ ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। তার পরের কথা বারীন্দ্রকুমার নিজেই বলিতেছেন:

"তখন এফ্ এ বা ফাষ্ট আর্টস্ পড়তে গেলুম পাটনায়, সেখানে বিধান বোর্ডিং-এ বাসা নিয়ে পাটনা কলেজে গিয়ে ভর্তি হলুম। এর ঠিক আগেই মেজদা মনোমোহন ঘোষ সেখানকার ইংরাজীর প্রফেসর ছিলেন, সবে মাত্র বদলি হয়ে তখন ঢাকা কলেজে গিয়েছেন।

"পাটনা কলেজে পড়েছিলুম বোধ হয় ছয় মাস। তারপর গ্রীষ্মের ছুটিতে দেওঘরে দিদিমার কাছে এসে যখন আছি তখন সস্ত্রীক মেজদা ঢাকা থেকে প্রথম দেওঘরে এলেন। ......মেজবৌদির আমাকে দেখে এত ভাল লাগলো যে, মেজদাকে বলে আমাকে একরকম অনিচ্ছাসত্বেও গ্রেপ্তার করে ঢাকা নিয়ে চললেন।" ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে বারীন্দ্রের লেখা-পড়া কিছুই হইল না। তিনি লিখিতেছেন, "কৃষির স্বপ্ন এই সময় আমায় পেয়ে বসেছিল"। কিন্তু বারীন্দ্রের এই কৃষির স্বপ্ন ছিল নিছক্ কাব্যরসে ভিজান। কৃষি—স্বপ্ন নয়, বাস্তব জিনিষ। টাকাও চাই, জমিও চাই। বারীন্দ্রের এ দুইয়ের একটাও নাই। বারীন্দ্রের মেজদা অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ বারীন্দ্রকে বলেছিলেন, "কলিকাতা গিয়ে যোগাড়যন্ত্র কর টাকা আমিই না হয় দেব।" বারীন্দ্র কলিকাতা এলেন, মেজদা টাকা দিলেন না। কৃষির স্বপ্ন হাওয়ায় উড়িয়া গেল।

বারীন্দ্রকুমার অগত্যা বাধ্য হইয়া কলিকাতা হইতে পুনরায় দেওঘর চলিয়া আসিলেন। এই চলিয়া আসিবার দুইটী কারণের মধ্যে একটী 'মেজদার প্রতিশ্রুতিভঙ্গ'। "তিনি আমাকে টাকা দেবার আশা দিয়ে দেশে পাঠালেন, কিন্তু পরে জানালেন তিনি টাকা দিতে অসমর্থ, কারণ তাঁর ছেলেপুলে হচ্ছে,

তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যয় আছে, ভাবী কন্যাগুলির বিবাহাদির উপায় করতে-হবে।" বারীন্দ্রকুমার 'কন্যাগুলি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মেজদার দুই কন্যার মধ্যে দ্বিতীয়া কন্যা তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। আর বিশেষতঃ কন্যাগুলি ভাবী হইতে পারে না। তাহাদের বিবাহাদি ভাবী হইতে পারে। সুতরাং দেখিতেছি বারীন্দ্রকুমার প্রবেশিকা পরীক্ষার পর দেওঘর হইতে যাত্রা সুরু করিয়া পাটনা—ঢাকা—কলিকাতা ঘুরিয়া পুনরায় দেওঘরেই ফিরিয়া আসিলেন। কলেজে পড়িবার সুযোগ ঢাকাতেও ছিল, বরোদাতেও ছিল। ঢাকায় তাঁহার মেজদা' মনোমোহন ঘোষ ঢাকা কলেজের অধ্যাপক। আর বরোদায় তাঁহার সেজদা অরবিন্দ ঘোষ বরোদা-কলেজের অধ্যাপক। মোট কথা বারীন্দ্রের তখন লেখাপড়ায় মন ছিল না। তিনি নিজের জীবনের সেই সময়কার যে-সকল ইতিহাস-কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার লেখাপড়ায় মন না থাকিবারই কথা। সে-সকল অতি বিশ্রী কথা।

তারপর বারীন্দ্র বর্দ্ধমানে তাঁর 'রাঙা মা'র কাছে চলিলেন টাকার খোঁজে। "তারপর আবার ডাউন ট্রেনে যাত্রা করলুম বর্দ্ধমানের পথে। রাঙা মা আমার তখন বর্দ্ধমানে একটী বাড়ী ভাড়া করে আছেন। সঙ্গে আছে বন্ধু সুরেন। মা তো আমাকে পেয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন, তখনই প্রতিশ্রুতি দিলেন তাঁর দপ্তরি পাড়ার বাড়ী বেচে আমায় কৃষির জন্য টাকা দেবেন। এই বর্দ্ধমানে একমাস থাকার পর কলকেতায় মেসে এসে উঠলুম যোগাড়যন্ত্র করে মায়ের বাড়ীখানি বিক্রমপুরে দেবার উদ্দেশ্যে।

"দু' তিন মাসের টাকা মেসে দেনা জমে গেল, ম্যানেজার মুখ অন্ধকার করে তাগাদা জানাতে লাগলেন। কোন উপায় না দেখে আমি গেলুম উড্ল্যাণ্ডসে কুচবিহার রাজবাড়ীতে বড়দা'র কাছে। বড়দা আমার দুঃস্থ অবস্থার কথা শুনে বললেন, 'আচ্ছা অমুক দিন আসিস্, যা পারি দেব'। নির্দ্দিষ্ট দিনে ভোর আটটায় গিয়ে দেখি দাদা ঘুমুচ্ছেন, আমাকে দেখে বালিসের তলায় হাত দিয়ে ত্রিশ না চল্লিশ টাকার নোট বার করে দিলেন, বললেন—এই নে, পরে আবার দেব।"

তারপর বারীন্দ্রকুমার তাঁহার পিতৃদত্ত অর্থে তাঁহার রাঙা মা যে বাড়ী কিনিয়াছিলেন তাহা বিক্রি করিয়া দিলেন। টাকা চাই। সুতরাং রাঙা মাকে তিনি পথে বসাইলেন। "মায়ের বাড়ীখানি তিন হাজার আড়াই হাজারে বিক্রি না

করেও আর উপায়ান্তর ছিল না। মায়ের বাড়ী বিক্রির টাকা ঋণ পরিশোধের পর গিয়ে দাঁড়াল মাত্র নয়শ' টাকায়।"

তারপরে বারীন্দ্রকুমার পাটনা গিয়া চায়ের দোকান খুলিলেন। কৃষির স্বপ্ন চায়ের দোকানে আসিয়া পরিণত হইল। "পাটনা কলেজের গেটের সামনে বাঁদিকে রাতারাতি সাইনবোর্ড উঠ্‌লো: B. Ghose's Tea Stall—Half Anna Cup,—Rich In Cream. রাঙা মাকেও কাছে এনেছি, একটা চাকর রেখেছি, আর চায়ের দোকান ফুলে ফেঁপে চপ্‌-কাটলেটের দোকানে পরিণত হয়েছে। ভিতর বাড়ীতে মা রাঁধতেন মাংসের কারি, চপ্‌ ও কাটলেট, আর আমি তা' চায়ের মজলিসে বেচতুম মাখন, রুটি ও ডিমের সঙ্গে সঙ্গে।" চায়ের দোকান অচিরেই শিঙে ফুকিবার যোগাড় হইল। বারীন্দ্র তাঁহার এক বন্ধুর নিকট হইতে ৯০৲ টাকা ধার করিয়াও চায়ের দোকানকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। বন্ধুটীর ৯০৲ টাকাও আর ফিরাইয়া দেওয়া হইল না। কোন কিছুকেই গড়িয়া তুলিয়া তাহাকে সার্থকতার পথে লইয়া যাওয়ার প্রতিভা বারীন্দ্র-কুমারের দেখা যাইতেছে না। একটা রঙীন নেশায় যে কাজ তিনি আরম্ভ করেন, তাহার শেষরক্ষা করিতে পারেন না। তারপর বারীন্দ্রকুমার লিখিতেছেন (আত্মকথা—পৃঃ ১৬০)—

"রাঙ্গা মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি স্থির করলুম যে, বরোদায় সেজদা শ্রীঅরবিন্দের কাছে গিয়ে কিছু মূলধনের চেষ্টা করবো। ...পরের দিন ভোরের ট্রেনে আমিও বাঁকিপুর ত্যাগ করলুম, আর বি. ঘোষের ষ্টলের চটকদার সাইন-বোর্ডখানি হঠাৎ গেল উবে।

"আমি যে মানিকতলা বাগানের বোমারে বারীন ঘোষ হতে চলেছি তা তখন আমিই বা জানবো কেমন করে?" প্রশ্ন—বারীন্দ্রকে কে বোমারু করিল? —"সেজদা অরবিন্দ তখন বরোদা-কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল কি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী তা আমার স্মরণ নেই।...

"সেজদা বেলা আটটা অবধি তখন ঘুমোতেন, তিনি শশব্যাস্তে এসে—একি তুমি এখানে এভাবে! শীগগির বাথরুমে যাও, কাপড় ছাড়ো, কাপড় ছাড়ো, বলে আমায় ঠেলতে ঠেলতে ওপরে চালান করে দিলেন।

"সেজদাকে অনেক ইঙ্গিত ইসারা দিয়েও বাঁকিপুরের চায়ের দোকানের জন্য টাকা বের হলো না। তিনি স্পষ্ট হাঁ-না, কিছুই না-বলে—বোবার শত্রু নেই নীতিটি অনুসরণ করে যেতে লাগলেন। টাকার সম্বন্ধে সেজদার কস্মিন-

কালে মারা ছিল না।—কিন্তু যেটা পছন্দ করতেন না সেটায় সিদ্ধির উদ্দেশ্যে উপুর হস্ত হবার পাত্র তিনি নন।—বাঁকিপুরে প্লেগ আরম্ভ হলো, চাকরটি প্লেগ হয়ে মৃত্যুমুখে পড়লো। সহরে ভয়াবহ প্লেগের ত্রাস—ঘরে ঘরে কান্নার আকাশ-ফাটা রোল, হাজারে হাজারে মানুষ দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে, রাঙা মা এক-বস্ত্রে গিয়ে পালবাবুর শরণ নিলেন, তাঁরা প্লেগের ছোঁয়াচের ভয়ে মাকে উঠানের দুয়ার অবধি ছাড়া আর বেশী ঢুকতে দিলেন না। ···এই সব খবর পেয়ে সেজদাকে অনেক বলেও ফেরবার বেলা ভাড়ার টাকাটুকুও যখন আমি পেলুম না অগত্যা তখন কলকেতায় বন্ধু স্বরেনকে তার করে দিলুম. আর আমার বরোদার আয়েসী কাব্য-জীবনের হলো আরম্ভ।"

ডাঃ কে. ডি. ঘোষ বারীনের রাঙা মাকে যে টাকা দিয়া গিয়াছিলেন তাতে অনায়াসে তাঁর সারা জীবন গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারিত। কিন্তু খেয়ালী বারীন তাঁহার রাঙামাকে শুধু 'একবস্ত্রে' সর্ব্বস্বান্তই করিলেন না, পাটনায় প্লেগের মুখে ফেলিয়া দিয়া বরোদায় নিশ্চিন্ত আলস্যে—'কবিতা লেখা, নভেল পড়া, সবজীবাগ আর শিকার' আরম্ভ করিয়া দিলেন! এ সব বারীন্দ্রের নিজের স্বীকারোক্তি। এর উপর কথা বলা চলে না। বোমারু হইবার প্রেরণা তখনো বারীন্দ্রের মধ্যে আসে নাই। কিছুটা পরেই আসিবে।

তারপরেই বারীন্দ্র লিখিয়াছেন (আত্মকথা—পৃঃ ১১৯-১৮০)—"ছেলেবেলায় দেওঘরের এই স্কুলজীবনে আমার মধ্যে প্রথম নৈতিক পঙ্কিলতা ঢোকে।" "জন্মাধিকারসূত্রে প্রবল কামশক্তি আমি পেয়েছিলাম"···ইত্যাদি। নিজের জন্মাধিকার সম্পর্কে এরকম লিখিতে কাহাকেও দেখা যায় না। বারীন্দ্রকে সমর্থন করিয়া তাঁহার একজন গুণমুগ্ধ বলিয়াছেন—কামশক্তি প্রবল হওয়া প্রতিভার লক্ষণ। অনেক 'প্রবল কামশক্তি'র সংস্পর্শে না আসিলে এরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে না। বেচারী প্রতিভা! আরো যে-সকল বিশ্রী কথা বারীন্দ্র নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তা যদি তাঁহার পরম আত্মীয়েরা উপভোগ করিয়া থাকেন তবে আমাদের কিছু বলিবার নাই। তারপরে তিনি লিখিতেছেন (আত্মকথা—পৃঃ ১৮২-৮৩)—

"তখন মহারাষ্ট্রের গুপ্ত-সমিতির নেতা ঠাকুর সাহেব জাপানে। গুজরাটের গুপ্ত-চক্রের দেশপতি (প্রেসিডেণ্ট) বরোদায়ই আছেন। তাঁর কাছে আদেশ পেয়ে বরোদা সেনাবিভাগের কাজ ছেড়ে দিয়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকেতায় চলে গেছেন এবং সেখানে গুপ্ত-সমিতি গড়ে তুলেছেন। আমার ডাক পড়লো

বাংলাদেশের তরুণদের ও ছাত্র সমাজের মনের ভূমিতে স্বাধীনতার বীজ বপন করবার জন্যে। যতীন দা' কয়েকজন মাতব্বর ধরে টাকারই নাকি ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, তরুণদের হৃদয় জয় করতে পারেন নি। আমাকে বাংলা-দেশে গিয়ে সেইটি করতে হবে। পোষা হাতি দিয়ে যেমন করে হাতি ধরে গনগনে আগুনে গড়া আমার তরুণ প্রাণের ছোঁয়াচ লাগিয়ে তেমনি তরুণ ধরবার ব্যবস্থার জন্যে, গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে আমাকে দেশে পাঠান হল।"

বারীন্দ্রকুমারের এই লেখাটুকু সম্পর্কে পূর্ব্বে উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অরবিন্দের নিকট গুপ্তমন্ত্রের দীক্ষা পাইয়া যতীন্দ্রের পর বারীন্দ্র গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯০২ খৃঃ বাংলাদেশে আগমন করিলেন। এই আগমনের গুরুত্ব ক্রমে আরো পরিস্ফুট হইবে। ইহা এক নূতন ইতিহাস রচনা করিবে।

গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯০২ খৃঃ অরবিন্দ নিজে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন কি-না?

আমরা প্রমাণ পাইতেছি—আসিয়াছিলেন, শুধু বাংলাদেশ বা কলিকাতায় আসেন নাই। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ও শেষভাগে মেদিনীপুর হেমচন্দ্র কানুনগোর বাড়ীতে দুই দুইবার গিয়াছিলেন। বারীন্দ্রকুমারও সঙ্গে ছিলেন। শেষবার অরবিন্দ একা আসিয়াছিলেন। প্রথমবারে অরবিন্দ ও বারীন্দ্র চাঁদমারী অর্থাৎ বন্দুক-ছোড়া শিখিবার স্থানে মাঠের মধ্যে একটি গর্ত্তে ঢুকে উভয়েই বন্দুক ছুড়িয়াছিলেন। গুপ্ত-সমিতির শাখাকেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্ল্যান বা মতলব করিতেছিলেন! শেষবার অরবিন্দ 'সত্যপাঠ' পড়াইয়া হেমচন্দ্রকে গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৯২৩ খৃঃ এ-সকল কথা মাসিক 'বসুমতী'তে ছাপা হইতে আরম্ভ হইয়া শেষ হইতে ১৯২৮ খৃঃ পর্য্যন্ত লাগে। পরে ১লা জুন, ১৯২৮ খৃঃ হেমচন্দ্র এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। সুতরাং ১৯০২ খৃঃ অরবিন্দ গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠাকল্পে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন—ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিবার পূর্ব্বে হেমচন্দ্রের নিকট হইতে আমরা আমাদের পূর্ব্বে উল্লিখিত কয়েকটি কথার সমর্থন ও প্রমাণ কিরূপ নিখুঁতভাবে পাইতেছি তাহাই আগে উল্লেখ করিব।

হেমচন্দ্র কতকগুলি সাঙ্কেতিক নাম ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

ক-বাবু—অরবিন্দ ঘোষ খ-বাবু—যতীন্দ্র ব্যানার্জ্জী

জ-বাবু—জ্ঞানবাবু...ইত্যাদি।

অপর সকলের নাম যথা, বারীন্দ্র প্রভৃতি খোলসা লিখিয়াছেন। কোন সঙ্কোচ করেন নাই। তিনি লিখিতেছেন—

"১৯০২ খৃঃ মাঝামাঝি একদিন 'অ' বাবুর কাছে শুনলাম 'ক' বাবু বাঙ্গলা-দেশে সিক্রেট সোসাইটী স্থাপনের চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের সর্ব্বত্র সিক্রেট সোসাইটি হয়ে গেছে। কলকাতার অনেক বড় বড় লোক তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

"দিনকতক পরে 'ক' বাবুর একজন ভীমাকৃতি সহকারী এসে হাজির হলেন। এঁকে 'খ' বাবু বলে উল্লেখ করব। তাঁর জিহ্বাখানি তাঁর ভীমবিনিন্দিত দেহখানি হইতে বেজায় লম্বা। তিনি যা বল্লেন তার প্রায় সবই অসম্ভব আজগুবি। সমস্ত ভারত ইংরেজ তাড়াবার জন্য তয়ের। করদ রাজ্যগুলি এবং প্রত্যেক প্রদেশের লক্ষ লক্ষ সৈন্য তলোয়ার সানাচ্ছে। এমন কি নাগা, গারো, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতিদেরও হাজার হাজার লোক পায়তাড়া দিচ্ছে; খালি বাংলাদেশ তয়ের নয় বলে তারা আটকে বসে আছে। সেইজন্যই তাকে দূতস্বরূপ 'ক' বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। এক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশকে তয়ের করে ফেলতেই হবে। কামান, বন্দুক প্রভৃতি হাতিয়ারের ভাবনা একটুকুও নেই। জেনারেল কাপ্তেনও তয়ের, কিন্তু বাঙ্গালী কমাণ্ডার ও কাপ্তেন ত চাই। যে আগে যোগ দেবে, তাকেই এইসব পদগুলি দেওয়া হবে। —(বাং-বি-প্র—পৃঃ ১০-১১)।

অরবিন্দই যে যতীন্দ্রকে গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার আরও একটী প্রমাণ ও সমর্থন পাওয়া গেল। এ বিষয়ে হেমচন্দ্র বারীন্দ্রকে সমর্থন করিলেন।

যতীন্দ্র সম্পর্কে হেমচন্দ্র আরও অনেক কথা লিখিয়াছেন। এখন আমাদের ১৯০২ খৃঃ অরবিন্দের বাংলাদেশে আগমন সম্বন্ধে হেমচন্দ্র কি লিখিয়াছেন তাহাই দেখিতে হইবে। হেমচন্দ্র লিখিতেছেন—

'ক'-বাবু (অরবিন্দ) এসে আমাদের দীক্ষা স্বয়ং দেবেন, এই আশা দিয়ে 'খ'-বাবু (যতীন্দ্র) ফিরে গেলেন।"—(পৃঃ ১৩)।

"তার কাছেই (জ্ঞানবাবু) 'ক' বাবুর এই পরিচয় তখন পেয়েছিলাম যে, তিনি একজন অসাধারণ বিদ্বান ও পলিটিক্সে তিনি বিশেষজ্ঞ। এ থেকে আমরা নিশ্চয় করে বুঝে ফেলেছিলাম যে, আমাদের আর কোন বিষয়ে মাথা ব্যথা করতে হবে না; খালি আদেশ পালন করলেই—বস্।

"একদিন বিকেলে দেখলাম, 'অ' (জ্ঞানবাবু) তাঁকে (অরবিন্দ) আমাদের বাড়ী নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে ছিল আমাদের স্বনামধন্য বারীনদা। গুরুর প্রতি ভক্তি ত আগে থেকেই পুরোমাত্রায় গজিয়েছিল। অধিকন্তু আমার (মেদিনীপুরের) বাড়ীতে তাঁর অযাচিত শুভাগমনটাই আমার কাছে একটা মস্ত জিনিষ। —(পৃঃ ১৮)।

"সত্যেন ও আরও দু' একজন এসে জুটলেন, আমরা আমাদের চাঁদমারী অর্থাৎ বন্দুক-ছোড়া শেখবার স্থানে সকলে মিলে গেলাম। সম্বন্ধে বারীন সত্যেনের ভাগিনেয়। মাঠের মাঝে একস্থানে কাঁকর খুঁড়ে নেয়াতে একটা প্রশস্ত গর্ত্ত হয়ে ছিল। তার মধ্যে বন্দুক আওয়াজ করলে বাইর থেকে বড় একটা শোনা যেত না। আমরা সেখানে নেমে গিয়ে প্রত্যেকে এক একটি আওয়াজ করলাম। ক-বাবু (অরবিন্দ) ও বারীন্দ্রের বন্দুক ধরবার কায়দা ও তাক দেখে তখন মনে হয়েছিল—তাঁদের এই প্রথম হাতেখড়ি।

"ক-বাবু (অরবিন্দ) বিশেষ করে অ-বাবুর সঙ্গেই কথা বলছিলেন। দু' এক কথায় বলতে গেলে সে মতলবটা এই ছিল যে, বাংলাদেশকে ছ'টি কেন্দ্রে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক কেন্দ্রে উপকেন্দ্র থাকবে। মেদিনীপুরে ত একটী কেন্দ্র ছিলই। তখন কলকাতার নাকি অনেক হুমরো-চুমরো ক-বাবুর (অরবিন্দর) সঙ্গে জুটেছেন, আর কেন্দ্র খুলবার চেষ্টা হচ্ছে।

"দীক্ষার মন্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত হ'লে আবার এসে দীক্ষা দেবেন, এই আশা দিয়ে 'ক'-বাবু (অরবিন্দ) পরদিন কলকাতা চলে গেলেন।

"আবার মাস কতক পরে অর্থাৎ ১৯০২ সালের বোধ হয় শেষে ক বাবু (অরবিন্দ) একা এসেছিলেন।

"যাই হোক, সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমার দীক্ষা আরম্ভ হ'ল। আমি তলওয়ার ও গীতা হাতে নিলাম। সেই সংস্কৃত মন্ত্র অর্থাৎ 'সত্যপাঠ' পড়বার হুকুম হ'ল। সংস্কৃত লেখাটি না প'ড়ে, আমি যা বলেছিলাম, যতদূর মনে পড়ে, তা হচ্ছে 'ভারতের অধীনতা মোচনের জন্য সব করব।' 'ক'-বাবু (অরবিন্দ) কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন—তার উত্তরে যা বলেছিলাম, তাতে বুঝি সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমায় সংস্কৃত মন্ত্র পাঠের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।"—(পৃঃ ১৯-২২)।

অতঃপর ১৯০২ খৃঃ অরবিন্দের বাংলাদেশে আগমন সম্পর্কে সন্দেহের আর কোনই অবকাশ থাকিল না।

১৯০১ খৃঃ এপ্রিলের শেষভাগে বিবাহ করিবার জন্য অরবিন্দ বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন—ইহা আমরা দেখিয়াছি। পরে ১৯০৬ খৃঃ প্রথমভাগে বরোদার চাকরি ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতা আসিয়াছিলেন, ইহা সর্বজনবিদিত। ১৯০১ হইতে ১৯০৬ খৃঃ—এর মাঝের ৪ বৎসর (১৯০২।৩।৪।৫) তিনি কবে কখন কি উদ্দেশ্যে কতবার বাংলাদেশে আসিয়া কি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা যথার্থরূপে ও পরিষ্কাররূপে জানা দরকার। ১ম দরকার—ইহা না জানিলে অরবিন্দের জীবন-ইতিহাসের স্বরূপ বুঝা যাইবে না। ২য় দরকার—এই সত্য ইতিহাসটি ইচ্ছা করিয়া লুপ্ত করিবার একটা বিশ্রী চেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়াছে!

বারীন্দ্রকুমার স্বয়ং এই উল্লিখিত ৪ বৎসরের উপর (১৯০২।৩।৪।৫) কিছুটা আলোকপাত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে ক্ষীণ আলোকের মাঝে মাঝে এত অন্ধকার যে, পথ চলা কঠিন। কখন কোন্ গর্ত্তে পা পড়ে, সে-ই ভয়। বিপ্লব-কর্ম্মের প্রবর্ত্তক অরবিন্দ সম্পর্কে যদি স্রেফ্ তিনি কিছুই না লিখিতেন, তবে সে একরকম বুঝা যাইত। আর যদি সবটা যথাযথ খুলিয়া পরিষ্কার করিয়া লিখিতেন, তবে ত কথাই ছিল না। কিন্তু তাঁর আলো-আঁধারি লেখার ফাঁকে ফাঁকে অরবিন্দ-চিত্র অতিশয় অস্পষ্ট। জীবন-ইতিহাসের ধারাবাহিকতা নাই—ছিন্নভিন্ন ফুলের মালার মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

বিপ্লবী অরবিন্দকে তাঁর নিজের ভাষায় "Aurobindo of the Revolutionary Cult" তিনি স্বীকার না কারয়া পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—অরবিন্দ শুধু প্রকাশ্য জাতীয় আন্দোলনের নেতাই ছিলেন না, পরন্তু গুপ্ত-সমিতিরও প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা এবং স্রষ্টা ছিলেন। জনসাধারণ ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিলেও ভারত গভর্ণমেণ্ট ইহাতে আশ্চর্য্য হইবে না। কেননা, ইহারই জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট গ্রেপ্তারী পরোয়ানা লইয়া তাঁহার অনুসরণ করাতে তিনি ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ হইতে পালাইয়া গিয়াছেন। ("Aurobindo was not only the leader and prophet of an open National movement, but also the demi-god and creator of an underground movement too. It may be a surprise for India to know this startling fact, but it is no news to the Government of India who pursued him at one time relentlessly until Sri Aurobindo had to escape

out of British India."—*Dawn Of India—15th December, 1933 ; Barindra K. Ghosh)*। আমিও এই সময় এই কাগজের একজন লেখক ছিলাম।

তারপরে এই সংখ্যার Dawnএ তিনি এই প্রসঙ্গে আবার লিখিতেছেন—(ক) অরবিন্দ এই সময় (১৯০২।৩।৪।৫) প্রত্যেকবার পূজার ছুটিতে বাংলাদেশে আসিতেন। (খ) পূজার ছুট ছাড়াও এই সময় দুইবার তিনি বিপ্লব-কর্মের অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজনে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। বিপ্লবের ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব খুব বেশী। এবং ঐ ইতিহাসে ইহার উল্লেখ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। ("Apart from his annual Puja visits, he came twice to Bengal with special mission which ought to be recorded in history as having deep and Revolutionary significance"—*Dawn Of India ; 15th December, 1933—Barindra K. Ghosh).*

হেমচন্দ্রের লেখা শেষ হওয়ার (১৯২৮ খৃঃ) ৬ বৎসর পরে (১৯৩৩ খৃঃ) বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন। এক্ষেত্রে (১৯০২ খৃঃ) হেমচন্দ্রের সমর্থনের জন্য আমরা বারীন্দ্রকুমারকে পাইতেছি। পূজার ছুটি ছাড়াও অরবিন্দ বিপ্লব-কর্ম্মের অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজনে দুই-দুইবার বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। বিপ্লবের ইতিহাসে ইহা 'ought to be recorded' বলিয়া তিনি খুব জোর দিয়াছেন, কেননা অরবিন্দের এই আগমনের গুরুত্ব খুব বেশী।

:

আমরা হেমচন্দ্রের লেখাতে দেখিয়াছি, ১৯০২ খৃঃ প্রথমবার যখন অরবিন্দ মেদিনীপুর যান তখন 'সঙ্গে ছিল স্বনামধন্য—বারীন দা'। বারীন্দ্র কিন্তু সে-কথাটি খুলিয়া লেখেন নাই। অরবিন্দ সম্পর্কেও তাই। এরই নাম আলো-আঁধারি লেখা!

বারীন্দ্র ও হেমচন্দ্র গুরুভাই। কেননা, একই বৎসরে (১৯০২ খৃঃ) একজন বরোদায় আর একজন মেদিনীপুরে অরবিন্দের নিকট গুপ্ত-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া গুপ্ত-সমিতির মেম্বর হইয়াছিলেন। দেখিতেছি, বিবাহের ঠিক পরের বৎসরেই অরবিন্দ বাংলাদেশে গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠাকল্পে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। শুনিয়াছি, তাঁহার কিশোর বয়স্কা স্ত্রীর নিকট এই সময় গুপ্ত-সমিতির সব কথাই তিনি গোপন করিয়াছেন। বিশেষতঃ একজন

লব্ধপ্রতিষ্ঠ গভর্ণমেণ্ট চাকুরিয়ার বালিকা কন্যাকে এই সকল প্রলয় কথা বলা কিছুতেই নিরাপদ নয়। অনেক চিন্তা করিয়াই তিনি স্ত্রীর নিকট গুপ্ত-সমিতির কথা গোপন করিয়াছেন। ইহাতে অরবিন্দের সংযম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্ত-সমিতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (প্রথম পর্ব্ব—১৯০২ হইতে ১৯০৪) ঃ যে-সমস্ত অনুচর লইয়া অরবিন্দ গুপ্ত-সমিতির প্রথম পর্ব্ব আরম্ভ করিলেন তার মধ্যে আমরা প্রথমে যতীন্দ্র, পরে বারীন্দ্র, ক্রমে হেমচন্দ্র, উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রথম পর্ব্বে সত্যেন বসু (অরবিন্দের মামা), দেবব্রত বসু, ভূপেন্দ্র দত্ত, 'হোরে' নামক একজন জাপানী, জ্ঞানবাবু প্রভৃতি কয়েকজনকে দেখিতে পাই। আরো যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের সকলের নাম এখনো ঠিক মতো জানা যায় না। মাত্র কয়েকজন অনুচর লইয়া অরবিন্দ তাঁহার গুপ্ত-সমিতির প্রথম পর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন—অভিজ্ঞ লেখকেরা মাত্র এইরূপ একটা আভাস দিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গভূমির যে সূতিকাগারে অরবিন্দের এই গুপ্ত-সমিতি প্রথম ভূমিষ্ঠ হইল, তাহার যথাযথ বিবরণ কেহই দেন নাই।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে এমন কি তার পূর্ব্বেও কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে সমিতি অনেকগুলি ছিল, ইহা আমরা বলিয়াছি। কিন্তু ঐ সমিতিগুলি গুপ্ত ছিল না—প্রকাশ্য ছিল। কলিকাতার ব্যারিষ্টার পি. মিত্রের যে সমিতি ছিল, তাহাতে গুপ্ত-সমিতির কোন কার্য্য এসময় লক্ষ্য করা যায় না। হয়তো জল্পনা কল্পনা কিছুটা ছিল এবং ইহা অরবিন্দ আসিবার পুর্ব্ব হইতেই ছিল। সুতরাং ইহাকে আধা গুপ্ত-সমিতি বলা যাইতে পারে—পুরা নয়।

পি. মিত্রের আর একজন ভক্ত কলিকাতায় এই সময়েই আর একটি পৃথক্ দল গড়িয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল 'আত্মোন্নতি সমিতি'। আত্মোন্নতি সমিতিতেও গুপ্ত-কার্য্যের কোন সূত্রপাত দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহাকে আধা বা সিকি গুপ্ত-সমিতি বলা যাইতে পারে।

সরলা দেবীর লাঠি খেলার ব্যায়ামাগার অরবিন্দের বহু পূর্ব্বে—অন্ততঃ পাঁচ বৎসর পুর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সরলা দেবী গুপ্ত-সমিতির সম্পূর্ণ বিরোধী। ব্যারিষ্টার পি. মিত্র গুপ্ত-সমিতির বিরোধী তো নহেনই বরং সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। সুতরাং এই শ্রেণীর সমিতির আদর্শ ও কার্য্যাবলী সম্পর্কে সরলা দেবী ও পি. মিত্রের মধ্যে পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। যদিও অরবিন্দ সরলা দেবীর নিকটে

চিঠি দিয়াই যতীন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন—তথাপি গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠায় সরলা দেবী নাই। আছেন ব্যারিষ্টার পি. মিত্র।

কলিকাতা ছাড়া মফঃস্বলেও কতকগুলি সমিতি ছিল। মেদিনীপুরেও ছিল, বাঁকুড়াতেও ছিল, আড়ংবেলেতেও ছিল। কি কলিকাতা, কি মফঃস্বল, কোন সমিতিই পুরাপুরি গুপ্ত হইয়া উঠে নাই। ভূমি কর্ষিত হইতেছিল। বীজ বপন হয় নাই। অরবিন্দ বীজ নিক্ষেপ করিবেন—করিতেছেন। ফলে, প্রথম পর্ব্বের (১৯০২—১৯০৪ খৃ:) অঙ্কুরোদ্গম দেখা দিবে।

অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতির সূতিকাগারের এইরূপ একটি চিত্র আমরা পাইতেছি। এবং এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বরোদা হইতে যতীন্দ্রকে পাঠাইয়া, বারীন্দ্রকে পাঠাইয়া—শুধু তাই নয়, নিজে স্বয়ং আসিয়া মেদিনীপুরের কাঁকরপূর্ণ মাঠে গর্ত্তে ঢুকিয়া বন্দুক ছুড়িয়া পরে হেমচন্দ্র কাননগুকে গীতা ও তলোয়ার একত্রে হাতে দিয়া গুপ্ত-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া গুপ্ত-সমিতির বোধন-কার্য্য উদ্‌যাপন করিলেন। পুরাপুরি গুপ্ত-সমিতি অরবিন্দই সৃষ্টি করিলেন। এক হাতে গীতা, এক হাতে তলোয়ার—শুধু গীতাও নয়, আবার শুধু তলোয়ারও নয়।

হেমচন্দ্র লিখিতেছেন—

"এক বৃদ্ধ ব্যারিষ্টার সাহেবের বহুকালের যদিও একটা গুপ্ত আখড়া কলকাতায় ছিল, তবু পৃথক্ করে কলকাতার প্রধান কেন্দ্র কিন্তু তখনও খোলা হয়নি। তখন কল্‌কাতার নাকি অনেক হুমরো-চুমরো 'ক'-বাবুর (অরবিন্দের) সঙ্গে জুটেছেন, আর কেন্দ্র খুলবার চেষ্টা হচ্ছে"—(পৃঃ ২০)। সুতরাং পি. মিত্রের কেন্দ্র হইতে অরবিন্দের কেন্দ্র ভ্রূণ অবস্থাতেই পৃথক্ হইবার মতলব আঁটিতেছে। পি. মিত্র সম্বন্ধে হেমচন্দ্র লিখিতেছেন—

"পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ ব্যারিষ্টার সাহেব (পি. মিত্র ' বাঙ্গালার বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির প্রধান কেন্দ্রের সভাপতি। ঐ সময়ের বহুকাল পূর্ব্বে যখন বিলেতে পড়তে গিয়েছিলেন, তখন থেকেই সিক্রেট সোসাইটীর খেয়াল তাঁর মাথায় ঢুকেছিল এবং 'ক' বাবুর (অরবিন্দ) অনেক পূর্ব্বে অনুশীলন সমিতি বা এই রকম আর কিছু নাম দিয়ে একটি গুপ্ত-সমিতি চালিয়ে আসছিলেন। তা'ছাড়া দেশের মঙ্গলকামনায় চালিত হয়ে সকল প্রতিষ্ঠানে ও প্রচেষ্টায় ইনি যোগ দিতেন। এঁর সঙ্গে 'অ'-বাবু (জ্ঞান বাবু) আমায় পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন। এঁর সংস্পর্শে আর এক উদ্যমশীল যুবকও নাকি কলকাতায় একটি দল গড়েছিল, তার নামও যেন 'আত্মোন্নতি সমিতি' বা আর কিছু।"—(পৃঃ ৩১-৩২)।

অরবিন্দের দলের অগ্রগতি পি. মিত্রের দল অপেক্ষা অনেক বেশী। গুপ্ত-সমিতির অন্যান্য দলগুলি যেন মডারেট, আর অরবিন্দের দল যেন একষ্ট্রীমিষ্ট। এই সময়ের ৪ বৎসর পর কংগ্রেসের প্রকাশ্য রাজনীতিতে চরম-দলে যোগ দিবার পূর্ব্বে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ বাংলার গুপ্ত-সমিতিগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান চরমপন্থী হইয়াছিলেন। কংগ্রেসে যোগ দিবার ৪ বৎসর পূর্ব্বে অরবিন্দ বাংলাদেশে গুপ্ত-সমিতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অরবিন্দের জীবন-ইতিহাসে রাজনীতিক্ষেত্রে হাতেকলমে প্রবেশের পথে গুপ্ত-সমিতি আগে—কংগ্রেস পরে। অবশ্য রাজনীতি গবেষণায় কংগ্রেসকেই তিনি প্রথম (১৮৯৩ খৃঃ) আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াই তিনি অন্ধকারময় গুপ্তদ্বারপথে প্রবেশ করিতেছেন। সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্ভব নহে বলিয়াই তিনি গুপ্ত-সমিতির প্রবর্ত্তন করিতেছেন। অরবিন্দের জীবন-ইতিহাসে রাজনীতিক্ষেত্রে গুপ্ত-সমিতি আগে, কংগ্রেস পরে—এইটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

"বাকুড়াতে এক খ্যাতনামা ভদ্রলোকের একটা নাকি দল ছিল। তাঁরা নামেমাত্র আমাদের সমিতির সহিত পরে যোগ দিয়েছিলেন। আর আড়বেলের কোন স্কুলমাষ্টার একটু আধটু দেশ-উদ্ধারের ভাব প্রচার করতেন, তার ফলে কয়েকটি ছেলে কলকাতার কেন্দ্রে এসে জুটেছিল।"—(পৃঃ ৩৩)।

দেখিতেছি, অরবিন্দের নূতন দল গঠনে পূর্ব্বতন ও সমসাময়িক যে-সকল দল এবং উপদল ছিল সেইগুলি হইতেই লোক সংগ্রহ হইতেছে। যতীন্দ্র, বারীন্দ্র এবং অরবিন্দ নিজে এই সকল দল এবং উপদল হইতে লোক সংগ্রহ করিতে-ছেন। এই প্রণালীতে দল গঠিত হওয়ায় সরলা দেবীর দল বিশেষরূপে জখম হইয়াছিল। তাঁর লাঠিয়াল ছেলেরা কেহ কেহ অরবিন্দের দলে যোগ দেওয়াতে তিনি অতিশয় বিপন্ন হইয়া নালিশ করিবার জন্য পুণা সহরে তিলকের নিকট ছুটিয়া গিয়াছিলেন (সেপ্টেম্বর, ১৯০২)। অরবিন্দের দলগঠনে সমসাময়িক দলগুলির মধ্যে কোন কোন স্থানে বিক্ষোভের সৃষ্টিও হইয়াছিল। অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতির আদর্শ ও কর্মপন্থা অনুসরণ করিতে কর্ম্মিদের মধ্যেও অনেকেই ভীত হইতেছিল।

এই সময় অরবিন্দের কলকাতার সমিতিতে যোগ দিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দেবব্রত বাবু ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনিও অরবিন্দের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু বিপিন

বাবুর 'নিউ ইণ্ডিয়া' কাগজে তখন তিনি চরমপন্থী রাজনীতি বিপিন-বাবুর চিন্তাধারার সাথে মিলাইয়া লিখিয়া যাইতেছেন।

বিপিন চন্দ্রের নিউ ইণ্ডিয়া (১৯০২ খৃঃ) এই সময়ে দুইটি কথার উপর জোর দিতেছিল। ১ম—ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান যদিও ধর্ম্মে পৃথক, কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে জাতীয়তার বেদীমূলে এক এবং অখণ্ড। ভারত-বর্ষের এই নূতন অখণ্ড জাতীয়তাবোধ বিপিনচন্দ্র পাইলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল হইতে—ব্রজেন্দ্রনাথ পাইলেন রাজা রামমোহন হইতে। ২য়—কংগ্রেসের ভিক্ষানীতি বাতিল। এই ভিক্ষানীতিতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইবে না। বিপিনচন্দ্র খোলসা লিখিলেন—"কংগ্রেস একটি ভিক্ষুকের দল। কাজ মাত্র বক্তৃতা, যাকে বলা হয়—আন্দোলন। কিন্তু ইংরেজ জাতির রাজনৈতিক আন্দোলন আর আমাদের আন্দোলন সম্পূর্ণ পৃথক। ইংরেজ আন্দোলনের দ্বারা শাসন-বিধি বিদ্রোহ না-করিয়াও পরিবর্ত্তন করিতে পারে; আমরা তা পারি না। "The Congress here and its British Committee in London are both begging institutions. We have given a new name to begging—we call it agitation. But agitation in England by the British citizens—who have real political power in their hands, who control election, who control the constitution of the National Legislature, upon whose pleasure ministers of the Crown have to wait for the continuance of their official life—*agitation by such a people is essentially different from our agitation.*"—(*New India*, 1902—Bepin Ch. Pal).

ইহার ৯ বৎসর আগে (১৮৯৩ খৃঃ) অরবিন্দ কংগ্রেসের ভিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম 'ইন্দু প্রকাশে' প্রবন্ধ লিখিয়া মডারেট মোড়লদের অতিশয় বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। দেবব্রত ও বিপিনচন্দ্র উভয়েই ব্রাহ্ম। দেবব্রত বিপিনচন্দ্রের নিউ ইণ্ডিয়ার চিন্তাধারায় সাঁতার কাটিতেছেন, আবার সেই সঙ্গে অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতিতেও ডুব দিতেছেন।

কংগ্রেসের ভিক্ষানীতির ব্যর্থতাই গুপ্ত-সমিতি সৃষ্টির অনেক কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ। কেননা, কংগ্রেসী ভিক্ষা-নীতি আমাদের শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। সুতরাং অন্য উপায় অবলম্বন প্রয়োজন। এই

প্রয়োজনবোধ হইতেই গুপ্ত-সমিতির সৃষ্টি। আরো একটি কথা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলন গুপ্ত-সমিতি সৃষ্টি করে নাই। কেননা, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের ৪ বৎসর পূর্ব্বে অরবিন্দ গুপ্ত-সমিতি সৃষ্টি করিলেন। সুতরাং এর জন্য লর্ড কর্জ্জনকেও অরবিন্দ প্রথমে দায়ী করিতে পারেন না—পরে লর্ড কার্জ্জন প্রজ্বলিত অনলে যতই ঘৃতাহুতি প্রদান করুন।

অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্ত-সমিতির ১ম পর্ব্বে যাঁহারা তাঁহার অনুচর এবং সহকর্ম্মী ছিলেন তাঁহাদের কয়েক জনের মাত্র উল্লেখ করা গেল। ২য় পর্ব্বে (১৯০৬—১৯০৮ খৃঃ) যাঁহারা নূতন আসিবেন—যেমন উল্লাস কর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি, তাঁহাদের কথা ১ম পর্ব্বে বলা নিষ্প্রয়োজন—অপ্রাসঙ্গিক। ব্যারিষ্টার পি. মিত্রের প্রাচীনদলের সহিত অরবিন্দের দলের ১ম-পর্ব্বানুষ্ঠানের সময় যোগাযোগ কিরূপ ছিল খোলসা করিয়া কেহই লেখেন না—বলেনও না। একটা সম্পূর্ণ চিত্র কেহই দিতে পারেন না ; অথচ লিখিয়াছেন একজন দুইজন নয়। অনেকে।

যোগ ছিল। কেননা—(ক) পি. মিত্রের দল অরবিন্দের দলের আগেই ছিল। (খ) ১৯০৪ খৃঃ অবধি পি. মিত্র প্রধান কেন্দ্রের সভাপতি ছিলেন। (গ) "১৯০২ সালে বারীন্দ্র বাংলাদেশে আসিয়া বিপ্লব-কর্ম্ম জাগ্রত করিবার জন্য প্রথম চেষ্টা করেন ও কলিকাতায় শ্রীযুক্ত পি. মিত্রের সহিত যুক্ত হইয়া East Club স্থাপন করেন। কিন্তু বারীন্দ্রের সহিত মতভেদ হওয়ায় মিত্র মহাশয় উহা ত্যাগ করেন"—(ভাঃ জাঃ আঃ ; প্রঃ মুখার্জী—পৃঃ ১৬৩)। (ঘ) হেমচন্দ্রও লিখিয়াছেন—যতীন্দ্রের সঙ্গে বারীন্দ্রের ঝগড়ার ফলে (১৯০৪ খৃঃ) অরবিন্দ কর্ত্তৃক যতীন্দ্রের বিরুদ্ধে "একতরফা রায়ের ফলে ক-বাবুর (অরবিন্দ) সঙ্গ যাঁরা ত্যাগ করতে সুরু করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ব্যারিষ্টার সাহেব পি. মিত্র একজন"—(পৃঃ ৩৮)। সুতরাং পি. মিত্রের দলের সহিত অরবিন্দের দলের যোগ ছিল। সহানুভূতি ত ছিলই।

আবার পুরা যোগ ছিল না—এমন কথাও পাই। কেননা, হেমচন্দ্রই আবার লিখিয়াছেন—"এক বৃদ্ধ ব্যারিষ্টার সাহেবের (পি. মিত্র) বহুকালের যদিও একটা গুপ্ত-আখড়া কলকাতায় ছিল, তবু পৃথক করে কলকাতার প্রধান কেন্দ্র কিন্তু তখনও খোলা হয় নি। ...কেন্দ্র (অরবিন্দের দল) খুলবার চেষ্টা হচ্ছে"—(পৃঃ ১৯-২০)। ইহা ১৯০২ খৃষ্টাব্দের কথা। সুতরাং ১৯০২ হইতে ১৯০৪ খৃঃ পি. মিত্র "বাংলার বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির প্রধান কেন্দ্রের সভাপতি"

থাকা সত্ত্বেও এই দুই বৎসরে অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্ত-সমিতির আর একটি নূতন উদীয়মান পৃথক্ দল তৈরি হইতেছে—তার প্রমাণও পাইতেছি। চাকার ভিতরে চাকা—wheel within wheel বলা যাইতে পারে।

পি. মিত্রের প্রাচীনদল যদি "অনুশীলন সমিতি" হয়, তবে অরবিন্দের নূতন দল ভবিষ্যৎ (১৯০৬ খৃঃ) "যুগান্তর" দলের গোড়াপত্তন বলিলে ঠিক হইবে। "অনুশীলন" ও "যুগান্তরের" উদ্ভব যথাযথ নিরূপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেননা, ১৯০২ খৃঃ হইতে ৪০ বৎসর—১৯৪২ খৃঃ পর্য্যন্ত ইহাদের দলাদলির গুপ্ত এবং প্রকাশ্য ইতিহাস আছে। এবং এই দুই যুদ্ধমানদলের দলাদলির ইতিহাস যথার্থরূপে উদ্ঘাটন না করিলে, না করিতে পারিলে, শুধু শ্রীঅরবিন্দ নয়—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ইঁহাদের, কাহাকেও বিশ্লেষণ করা যাইবে না—ফলে বুঝা যাইবে না। বাংলার বিংশ শতাব্দীর রাজনীতির ইতিহাস 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর', এই দুই দলের ইতিহাস। নেতারা মুখপাত্র মাত্র। অরবিন্দ গুপ্ত-সমিতি সৃষ্টি-ব্যপদেশে (১৯০২ খৃঃ), ভবিষ্যতের (১৯০৬ খৃঃ) 'যুগান্তর' দলেরও স্রষ্টা এবং প্রবর্ত্তক। অরবিন্দের অনুচর এবং সহকর্মীরাই 'যুগান্তরের' দল সৃষ্টি করিয়াছেন—যেমন, ১৯০২ খৃঃ তাঁহারাই অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্ত-সমিতি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইতিহাসের ঘটনাপরম্পরাই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যদি কেহ ইহাকে নূতন আবিষ্কার বলিতে ইচ্ছা করেন, করুন।

অরবিন্দ মারাঠা হইতে গুপ্ত-সমিতির বীজ বাংলায় আনিলেন কি-না? উত্তরে বলা যায়—আনিলেন বই কি! বারীন্দ্রকুমার প্রত্যক্ষদর্শী; তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, যে মহারাষ্ট্রের 'গুপ্ত-সমিতির নেতা ঠাকুর সাহেব তখন জাপানে'। 'গুজরাটের গুপ্তচক্রের সভাপতি (অরবিন্দ) বরোদায়ই আছেন', আর তিনিই যতীন্দ্র ও বারীন্দ্রকে বাংলাদেশে গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯০২ খৃঃ পাঠাইয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি 'অরবিন্দ' নিজেও ১৯০২ খৃঃ গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশে আসিয়াছেন। সুতরাং মহারাষ্ট্রে গুপ্ত-সমিতি ছিল—অরবিন্দ উহার প্রেসিডেণ্ট থাকা অবস্থায় তিনি যখন বাংলদেশে উদ্যোগী হইয়া গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেন তখন বাংলার কর্ষিত ভূমিতে বীজ মারাঠা হইতেই অরবিন্দ আনিলেন বই কি! শুধু আনিলেন না—নিজে হাতে করিয়া বপন করিলেন।

হেমচন্দ্রও বারীন্দ্রকে সমর্থন করিতেছেন। তিনি লিখিতেছেন—

"বাংলাদেশে গুপ্ত-সমিতি গঠনের চেষ্টা বিশেষ করে আরদ্ধ হয়েছিল ১৯০২ খৃঃ। তার কিছু পূর্ব্বে থেকে মহারাষ্ট্রে গুপ্ত-সমিতি গঠিত হয়েছিল বলে শুনেছি। কিন্তু তার আদর্শ নাকি এমন (বাংলার মতন?) উন্নত ছিল না। যাই হোক মহারাষ্ট্র গুপ্ত-সমিতি ধর্ম্ম-সম্পর্কবিহীন ছিল না। বাংলাদেশে গুপ্ত-সমিতি গঠন স্বরু করবার আগে, শুনেছি 'ক'বাবু (অরবিন্দ) নাকি মারাঠার গুপ্ত-সমিতির সংস্পর্শে এসেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে তিনি যে গুপ্ত-সমিতি গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন, তার পত্তন থেকে দু'বছর যাবৎ (১৯০২-১৯০৪ খৃঃ) তিনি নিজে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করতেন না। আর দীক্ষাকালীন গীতা স্পর্শ করা ছাড়া সমিতির কাজে বা ভাবে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ ছিল না।"—(বাং-বি-প্র, পৃঃ ৫৮)।

বারীন্দ্র নিজে আমাদিগকে বলিয়াছেন—"বাংলায় গুপ্ত-সমিতি মারাঠা থেকেই আমরা এনেছিলুম সত্য; কিন্তু মারাঠার চেয়ে বাংলায় এর চাষ ভাল হয়েছিল।" হেমচন্দ্রও অনুরূপ কথাই শুনিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন: মারাঠার গুপ্ত-সমিতির আদর্শ বাংলার আদর্শের মত এতটা উন্নত ছিল না। অবশ্য এ বিষয়ে মারাঠার গুপ্ত-সমিতির কোন সভ্যের মত আমরা জানিতে পারি নাই।

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্ত-সমিতির ১ম পর্ব্বে (১৯০২-১৯০৪ খৃঃ) "গীতা স্পর্শ (?) ছাড়া" আর কোনই ধর্ম্মের বালাই ছিল না। ধর্ম্ম অর্থে যোগ-যাগ, তুক্‌-তাক্‌ মন্ত্র-তন্ত্র, সন্ন্যাসী গুরু ও আধা সন্ন্যাসী চেলা—এসব ১ম পর্ব্বে নাই। এগুলি পুরাদমে আছে ২য় পর্ব্বে (১৯০৬-১৯০৮ খৃঃ)।

শ্রীযুক্তা সরলাদেবী ও বৈপ্লবিক ডাকাতি (১৯০২ খৃঃ): ১৯০২ খৃঃ বাংলাদেশে বৈপ্লবিক ডাকাতি কে করিয়াছিল? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। সরলাদেবী যা লিখিয়াছেন তা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে রকমের। বিশেষ কোন্‌ দলটি যে ডাকাতি করিয়াছিল—তা কিছুই বুঝা যায় না। অরবিন্দের দল করিয়া থাকিলে তার স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

সরলাদেবী লিখিতেছেন—

"১৯০২ খৃঃ সেপ্টেম্বরের আগে তিনি লোকমান্য তিলকের সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে পরিচিত ছিলেন না। ভাবার্থ ঐ ১৯০২ খৃঃ সেপ্টেম্বরেই তিনি পুণা গিয়া তিলকের সহিত প্রথম দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তা বলেন।

—তাঁর লাঠিয়াল ছেলের দল তখন পুরাদমে চলিতেছিল।

—এই সময় (১৯০২ খৃঃ) হঠাৎ তিনি শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন যে, ভদ্রলোকেরা ডাকাতি আরম্ভ করিয়াছে—আর তাঁর লাঠিয়াল ছেলেরা ঐ ডাকাতের দলে যোগ দিবার প্রলোভন কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিতেছে না। তারা বলে, এতে নাকি তিলকের মত আছে।

—দল ভাঙ্গে। কাজেই তিনি তৎক্ষণাৎ পুনায় তিলকের নিকট গমন করিলেন।

—তিলক বলিলেন, এরকম ডাকাতিতে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত বা সফল হবে না। সুতরাং ইহা নিরর্থক।

—তবে প্রকাশ্যে তিনি ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবেন না বা লিখিবেন না। কেননা—ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ। সুতরাং প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন পথে মানুষ চলিবে এবং সার্থকতা খুঁজিবে, অতএব ইহার বিরুদ্ধে বলিয়া কোন ফল নাই। সুতরাং প্রকাশ্যে তিনি ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবেন না।"

"I did not meet Lokamanya Tilak personally till *September, 1902*. My Lathi Cult was in full swing in those days···But to my dismay stories of *banded robberies and murder by Bhadralog* began to be heard of from certain quarters. *Some of my Lathial boys fell tempted* to join those bands···For, against all my reasonings was brought in the personality of Tilak and his approval as the greatest argument in favour of the dacoities. So I at once went to Poona to have a personal talk with Lokamanya Tilak and learn his views on the matter.

"Tilak told me distinctly, he did not approve of the dacoities, *much less authorise them*, if for nothing else simply on the score of their being practically *useless for political purposes*.

"*But* looking to differences in human nature and the varying processes of evolution suited todifferent temperaments, *he did not condemn them openly*."—(*Sarala Devi Chou-*

dhurani, B. A., widow of the late Pandit Rambhuj Dutta Choudhury, Editor of the "*Bharati*"), Lahore).

তিলকের কথা হইতে সরলা দেবী বুঝিলেন যে, বৈপ্লবিক গুপ্তহত্যা বা ডাকাতিতে তিলকের মত নাই। "Tilak's disapprobation of secret murder" আমরা কিন্তু বুঝিয়াও বুঝিলাম না। ডাকাতি বা গুপ্তহত্যার প্রবৃত্তি যাদের আছে তাদের নিবৃত্তি মার্গ তিনি দেখাইলেন না কেন? খোলসা প্রকাশ্যে খুলিয়া বলিলেন না কেন? এবং এই ভদ্রলোক ডাকাতদের নিবৃত্ত করিতে তিলকের অনিচ্ছায় অনেক রকম ভাল-মন্দ অর্থ হইতে পারে। এক্ষেত্রে তিলকের সহিত অরবিন্দের চরিত্র তুলনীয়।

তা যাই হউক ১৯০২ খৃঃ সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে বাংলাদেশে গুপ্তহত্যা ও ডাকাতি যে ভদ্রলোকেরা সম্পাদন করিয়াছেন—ইহার প্রমাণ পাওয়া গেল। সরলা দেবীর তিলকের নিকট পুণা সহরে ছুটিয়া যাওয়া মিথ্যাও নয়, মায়াও নয়। তাঁহার দল ভাঙ্গে। তিনি দলের দায়ে হস্ত দস্ত হইয়া ছুটিয়াছিলেন।

প্রশ্ন এই—বাংলাদেশের কোন্ গুপ্ত দল এই ডাকাতি করিল? অন্য দলগুলির চেয়ে অরবিন্দ-প্রতিষ্ঠিত যতীন্দ্র-বারীন্দ্রের দলই বেশী অগ্রসর। তাদের অগ্রগতির সহিত আর কোন দল আটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতির ২য় পর্ব্বে (১৯০৬-১৯০৮ খৃঃ) আমরা দেখিতে পাইব যে, অরবিন্দ—(ক) বৈপ্লবিক গুপ্তহত্যা এবং গুপ্ত-সমিতির পরিচালনার ব্যায়াদির জন্য টাকার প্রয়োজন হওয়ায়, (খ) বৈপ্লবিক ডাকাতি ও গুপ্তহত্যা এ দুএরি শুধু সমর্থন নয় নিজে হুকুম দিয়া এই দুই কার্য্য করাইয়াছেন—প্রমাণ আছে। তিলক হইতে অরবিন্দ পৃথক্। এই পার্থক্যের জন্যই অরবিন্দ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ১ম পর্ব্বে, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সরলাদেবী কথিত ডাকাতির সহিত অরবিন্দের দলের যদি সংশ্রব থাকিয়া থাকে, তবে এপর্য্যন্ত তাহা কেহ লিখিয়া যান নাই। যাঁহারা ২য় পর্ব্বের গুপ্তহত্যা ও বৈপ্লবিক ডাকাতির কথা অরবিন্দকে উহার সহিত স্পষ্ট জড়াইয়া সবিস্তারে লিখিয়া গিয়াছেন—তাঁহারাও নয়।

আর একটি কথাও বলা দরকার। প্রথম বৈপ্লবিক ডাকাতি ১৯০৬ খৃঃ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া যাঁদের ধারণা, সরলা দেবী তাঁহাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—তা নয়। প্রথম বৈপ্লবিক ডাকাতির সূত্রপাত ১৯০২ খৃঃ দেখা যায়। রাউলাট কমিটি যদি প্রথম ডাকাতি ১৯০৬ খৃঃ বলিয়া থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে—রাউলাট কমিটিও অভ্রান্ত নয়। সরলা দেবী এক্ষেত্রে রাউলাট কমিটিকেও প্রতিবাদ করিতেছেন।

বয়স একত্রিশ বৎসর (১৯০৩।১৫ই আগষ্ট--১৯০৪।১৪ই আগষ্ট) :

বহু বিভিন্ন বিচিত্র ধারার পাশাপাশি অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্ত-সমিতির ধারা প্রবাহিত হইতেছে :

১ম, রমেশ দত্তের ধারা—২য়, কংগ্রেসী মডারেট ধারা—৩য়, কার্জ্জনী ধারা—৪র্থ, বিপিন পালের 'নিউ ইণ্ডিয়ার' ধারা—৫ম, সরলা দেবী ও তাঁহার লাঠি খেলার ধারা—৬ষ্ঠ, ভগিনী নিবেদিতা ও 'ডন সোসাইটির' ধারা—৭ম, পি. মিত্র ও তাঁহার 'অনুশীলন সমিতি'র ধারা—৮ম, রবীন্দ্রনাথের ধারা—৯ম, অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন ধারা—১০ম, সাহিত্যের ধারা—১১শ, বিজ্ঞানের ধারা—১২শ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের ধারা

বুয়র যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০২ খৃঃ)—রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪।৮-ই ফেব্রুয়ারী—১৯০৫।১৪ই অক্টোবর)

শ্রীযুক্তা সরলাদেবী এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রতাপাদিত্য-উদয়াদিত্য উৎসব ★ অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্ত-সমিতির ক্রমবিকাশ ★ কংগ্রেস ও গুপ্ত-সমিতি—উদ্দেশ্য ও উপায় ★ যতীন্দ্র ও বারীন্দ্রের কলহ ★ মিঃ নর্টন এবং মিঃ সি. আর. দাস

বহু বিভিন্ন বিচিত্র ধারার পাশাপাশি অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্ত-সমিতির ধারা প্রবাহিত (১৯০১।২।৩।৪) ঃ বাংলার ইতিহাস বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন বৎসর অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। এই তিন বৎসরে অনেকগুলি বিচিত্র ধারা পাশাপাশি থাকিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই ধারাগুলির মধ্যে যোগাযোগ আছে। যেখানে মিল (affinity) আছে, সেখানে এক ধারা অপর ধারার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। যেখানে মিল নাই, বিরোধ আছে—সেখানে বিরোধী ধারা একে অপর হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। কোথায়ও বা সংঘর্ষ দেখা দিতেছে। ধারাগুলি গতিমুখে কোথায়ও বা ঋজু, আবার কোথায়ও বা বক্র কুটিল, অহিরেব গতি।

যে দুর্লভ লক্ষ্যের দিকে এই ধারাগুলি ছুটিয়াছে, সেই আদর্শ বা লক্ষ্য প্রায় এক। এবং একই বাংলার প্রাণ হইতেই এই ধারাগুলির উদ্ভব। ঘুম হইতে জাগিয়া যেন কোন এলোকেশী উন্মাদিনী বাতাসে মুক্ত কেশরাশি

উড়াইয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ইহা ইতিহাসের শুধু গতি নয়, নিয়তি। যাহা না ঘটিয়া উপায় নাই তাহাই নিয়তি।

এই ধারাগুলিকে একের পর আর সন্নিবেশ করিয়া তার মধ্যে অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত ধারার স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

১ম—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসের সভাপতির আসনে আমরা রমেশচন্দ্র দত্তকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আমাকে বলিয়াছেন যে—লালমোহন ঘোষ নাকি রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "রমেশ বেদ থেকে আরম্ভ করে ধারাপাত, সব লিখে গেচে!" ভারতীয় অর্থনীতি শাস্ত্রে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিলেন (Famines—1900, Economic History of British India—1901)। সবগুলি গ্রন্থেরই মূল কথা এক—ইংরেজের শাসনে আমাদের দেশ দিন দিন অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে; এই শাসনের নাম শোষণ। ইংরেজের এই শোষণ-নীতির ফলেই দেশে এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে ইত্যাদি। লর্ড কার্জ্জনের মত বড় লাটের মুখের উপর এই কথাগুলি তিনি এদেশে বলিয়া, পরে বিলাত পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়া সেখানেও এই কথাগুলি বলিলেন। নিরাশবাদী নির্ভিক সমালোচক Mr. N. N. Ghose বলিলেন যে—এক গরুর গাড়ী বোঝাই কংগ্রেস বক্তৃতা অপেক্ষা রমেশ দত্তের এই অর্থ-নৈতিক গ্রন্থগুলি বেশী মূল্যবান। Mr. N. N. Ghose-এর মত ব্যক্তিও রমেশ দত্তের সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করিলেন। এই গ্রন্থগুলি পাঠ করিবার ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীদের মনে ইংরেজ শাসনের প্রতি প্রসন্নভাব বিদূরিত হইয়া একটা বিদ্বেষভাবই জাগরিত হইল। অরবিন্দ ইহা লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেন যে, রমেশ দত্তের এই গ্রন্থগুলি না হইলে বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলনের 'বয়কট' এত সহজে হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। এক্ষেত্রে তিনি শুধু ইতিহাস লেখেন নাই, পরন্তু ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন। ("He not only wrote history but *created* it"—Arobindo Ghose).

রাজা রামমোহন ও র‍্যাণাডের অব্যবহিত পরে এবং গোখলের কিছুটা আগে রমেশ দত্ত ইংরেজ শাসনের শোষণ-নীতিকে ব্যক্ত ও প্রকট করিয়া ভারতীয় অর্থনীতি শাস্ত্রের যে ধারাটি প্রবর্তন করিলেন—তাহা এই আলোচ্য বৎসরগুলির মধ্যেই প্রবাহিত হইল।

অরবিন্দের গুপ্ত ধারার সহিত রমেশ দত্তের প্রকাশ্য ধারার মিলও আছে, আবার বিরোধও আছে। অরবিন্দ, রমেশ দত্ত প্রদর্শিত ইংরেজের শোষণ-নীতি সম্পর্কে একমত। সুতরাং মিল আছে। আরও মিল আছে—অরবিন্দ ১৮৯৩ খৃঃ হইতেই প্রোলেটেরিয়েটবাদী; রমেশ দত্ত কৃষকদের উন্নতিই আগে চাহিতেছেন। কিন্তু অরবিন্দের গুপ্তধারা চাহিতেছে—ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ; আর রমেশ দত্তের প্রকাশ্য ধারা চাহিতেছে ইংরেজের শোষণ-নীতির পরিবর্তন—সংশোধন—সংস্কার। উচ্ছেদ চাহিতেছে না। সুতরাং বিরোধও আছে। বিশেষতঃ গুপ্ত-সমিতির কার্যাবলীর সঙ্গে ত মারাত্মক বিরোধ। অথচ এই উভয় ধারা একই সময়ে বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই প্রবাহিত হইতেছে।

২য়—কংগ্রেসী মডারেট ধারা। লালমোহন ঘোষ এবার কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি লর্ড কার্জ্জনকে বাংলা ও মাদ্রাজকে খণ্ডবিখণ্ড করিতে নিষেধ করিলেন। কংগ্রেস অধিবেশনের অল্প কিছুদিন আগেই (৩রা ডিসেম্বর) লর্ড কার্জ্জন তাঁহার ইতিহাস-বিখ্যাত বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। তারপর লালমোহন ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে মডারেট নীতি অনুযায়ী 'আবেদন-নিবেদন' করিলেন। ১৮৯৩ খৃঃ হইতেই অরবিন্দ এই মডারেট নীতির বিরোধী। কাজেই মডারেট ধারার সহিত অরবিন্দের ধারার উদ্দেশ্য ও উপায়—দুই সম্পর্কেই বিরোধ।

১৮৯৪ খৃঃ অরবিন্দ, অন্যান্য মডারেট নেতাদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে লালমোহন ঘোষকেও কঠোর সমালোচনা করিয়া স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে—ইঁহাদের দিন চলিয়া গিয়াছে। তরুণের দল ইঁহাদের আর চায় না। ("The Bonnerji's and Bannerji's and *Lalmohan Ghoses* have climbed into the rarefied atmosphere of the Legislative Council and *lost all hold upon the imagination of the young men.*").

আলোচ্য ১৯০৩ খৃ: হইতে ৯ বৎসর অতীতে অরবিন্দ লালমোহন ঘোষ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন। অরবিন্দের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি অতিশয় প্রখর। এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও ইহা কাহারো দৃষ্টি অপেক্ষা ছোট নয়। বরং অনেকের দৃষ্টি অপেক্ষাই বড়। ১৮৯৩-৯৪ খৃঃ তিনি 'ইন্দুপ্রকাশে' যে কথা সকল লিখিয়াছেন, বিংশ শতাব্দীর ১ম দশকে অনেকাংশে তাহাই কার্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

৩য়—কার্জ্জনী ধারা। লর্ড কার্জ্জন অতিশয় দাম্ভিক লোক ছিলেন। তিনি জাঁকজমক ভালবাসিতেন। দিল্লী-দরবারই তার প্রমাণ।

১৯০৩ খৃঃ প্রথমেই দিল্লী-দরবার। রমেশ দত্ত পর্য্যন্ত বলিলেন—দিল্লী-দরবার একটা ফক্কীবাজী, ধাপ্পা ('The Durbar of 1903 is a mockery and a delusion !')। লর্ড কার্জ্জন ১৯০৩ খৃঃ ডিসেম্বরে বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপন করিবামাত্রই মাদ্রাজ-কংগ্রেসের সভাপতি লালমোহন ঘোষ তৎক্ষণাৎ ইহার প্রতিবাদ করিলেন। লর্ড কার্জ্জন প্রতিবাদ শুনিবার মত লোক ছিলেন না। অথচ প্রতিবাদ না শুনিয়া তিনি যাহা করিলেন, তাহা না করিলে বাঙ্গালী স্বদেশী আন্দোলন করিত কিনা সন্দেহ। সমগ্র বাঙ্গালী যদি এক অখণ্ড জাতি হয়, তবে লর্ড কার্জ্জন তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তবে ছাড়িলেন। তারপরেই তুমুল কাণ্ড আরম্ভ হইল। বাঙ্গালী এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিল। অরবিন্দ সেই ইতিহাসের একজন স্রষ্টা! কার্জ্জন বিপরীতে হিত করিলেন—ইহাই অরবিন্দের অভিমত। বাঙ্গালীর নব-উন্মেষিত জাতীয়তাকে ধ্বংস করিতে গিয়া তিনি ইহাকে আরো উসকাইয়া দিলেন। সেই উস্কানীতে জাতীয়তার দীপ আরো বেশী জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু লর্ড কার্জ্জনের উস্কানীর পূর্ব্বেই অরবিন্দ গুপ্ত-সমিতির ধারা প্রবর্তন করিলেন। ১৯০৩ খৃঃ ডিসেম্বরে যদি বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়, তবে তার পুরা দুই বৎসর আগে ১৯০২।জানুয়ারী হইতেই অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতির প্রথম আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। বঙ্গ-ভঙ্গের দ্বারা ক্রুদ্ধ বা ক্ষিপ্ত হইয়া অরবিন্দ গুপ্ত-সমিতি সৃষ্টি করেন নাই। সুস্থ মস্তিষ্কে, ধীরভাবে প্রায় দশ বৎসর (১৮৯২—১৯০২ খৃঃ) চিন্তা করিয়া তবে তিনি ইহা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতির ধারার উদ্ভবের কারণ কার্জ্জনী খড়্গাঘাত নহে। প্রথম আবির্ভাবে ইহা কার্জ্জনী-ধারা-নিরপেক্ষ। পরে (২য় পর্ব্বে) ইহা কার্জ্জনী ধারার খড়্গাঘাতে হুহুঙ্কারে বিস্ফারিত হইয়া সমগ্র দেশকে চমকিত করিয়া দিয়াছিল। কার্জ্জনী ধারা, অরবিন্দের ধারাকে সাহায্য করিয়াছে—উদ্দীপিত করিয়াছে—পুষ্ট করিয়াছে। কেননা, অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতির ধারার ১ম পর্ব্ব (১৯০২—১৯০৪ খৃঃ) সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইলেও ২য় পর্ব্ব (১৯০৬—১৯০৮ খৃঃ) অতটা ব্যর্থ হয় নাই। কার্জ্জনী ধারার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ামুখেই অরবিন্দের ধারার ২য় পর্ব্ব প্রজ্জলিত ও বিস্ফারিত হইয়াছিল। সুতরাং কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এই দুইটি বিরোধী ধারায় যোগাযোগ এবং প্রবল সংঘর্ষ দেখা যায়। তাই আবার বলিতে ইচ্ছা

হয়, গভর্ণমেণ্টের দিক হইতে লর্ড কার্জ্জন কাজটা ভাল করেন নাই। বাঙ্গালীকে তিনি চিনিতে পারেন নাই।

৪র্থ—বিপিন পালের নিউ ইণ্ডিয়ার ধারা। আমরা দেখিয়াছি ব্রাহ্ম দেবব্রত বসু নিউ ইণ্ডিয়াতে চরমপন্থী রাজনীতি লিখিতেছেন, আবার তলে তলে অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতির ১ম পর্ব্বে যোগ দিয়াছেন। শুধু যোগ দেন নাই, মাতব্বরী করিতেছেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, চরমপন্থী রাজনীতির সহিত গুপ্ত-সমিতির সংযোগ আছে। কিন্তু এ অনুমান সবক্ষেত্রে সত্য নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য।

বিপিনচন্দ্রের সহিত অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির যোগ নাই। বরং বিপিনচন্দ্র অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতির বিরোধী। বিপিনচন্দ্রের আপত্তি নৈতিকও নয়, আধ্যাত্মিকও নয়—সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। তিনি বলেন, চরমপন্থী রাজনীতি আরো ব্যাপকভাবে দেশমধ্যে প্রথমে প্রচার হওয়া দরকার। কিন্তু গুপ্ত-সমিতির সহসা বিস্ফোরণে প্রচণ্ড দমননীতি প্রয়োগের ফলে গুপ্তসমিতিও মারা যাইবে, আর সেই সঙ্গে নব-উত্থিত মডারেট-বিরোধী চরমপন্থী রাজনীতির প্রচারও বন্ধ হইবে। সুতরাং বিপিনচন্দ্র অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতির বিরোধী। অথচ প্রকাশ্য রাজনীতিতে উভয়েই মডারেটবিরোধী চরমপন্থী, সম্পূর্ণ একমত।

৫ম—সরলাদেবী ও তাঁহার লাঠিখেলার ধারা। সরলাদেবী বৈপ্লবিক ডাকাতির অতিশয় বিরোধী, সুতরাং বৈপ্লবিক গুপ্তহত্যারও বিরোধী। কাজেই তিনি অরবিন্দের ধারার একান্তই বিরোধী হইবেন। তাঁহার যুক্তি এই—ভীরু বাঙ্গালীকে সাহসী হইতে হইবে। সুতরাং আত্মরক্ষার্থ জন্য লাঠি বা তলোয়ার বা ছোরা তাহারা ব্যবহার করুক। কিন্তু তাই বলিয়া ভদ্রলোকের ছেলেরা ডাকাতি করিবে—উ কি কথা! চিরদিন ডাকাতেরাই ডাকাতি করিয়া আসিতেছে। ভদ্রলোকের ছেলেরা ত কখন ডাকাতি করে নাই। অতিশয় ভদ্র যুক্তি সন্দেহ নাই!

কিন্তু অরবিন্দের ধারায় ভদ্রলোকের ছেলেরাই নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ডাকাতি ও গুপ্তহত্যা—দুইই করিবে। বিপ্লবের আদর্শপ্রসূত, বিপ্লবী মনের অতি ভয়ঙ্কর সৃষ্টি এই গুপ্তসমিতির ধারায় সম্পূর্ণ বিরোধী সরলাদেবীর ভদ্র লাঠি খেলার ধারা। খবরের কাগজ যাকে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী বলে, তা পর্য্যন্ত সরলা দেবীতে দেখা যায় না। এখানে তিনি অরবিন্দ হইতে স্পষ্ট বিরোধী। এই দুই ধারার মধ্যে যা যোগাযোগ, তা সরলা দেবীর পক্ষে অতিশয় মর্ম্মান্তিক।

কেননা, তিনি অভিযোগ ও আক্ষেপ করিতেছেন যে—তাঁহার ভদ্র লাঠিয়াল ছেলেরা তাঁহার সাজানো দল ছাড়িয়া দিয়া অরবিন্দের নূতন বৈপ্লবিক ডাকাতের দলে গিয়া ভর্তি হইতেছে। তাঁহার দলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে।

ইহা তিনি সহ্য করেন কি করিয়া? কাজেই তিনি তিলকের কাছে নালিশ করিতে পুনায় ছুটিয়াছিলেন।

৬ষ্ঠ—ভগিনী নিবেদিতা ও ডন সোসাইটি (Dawn Society)-এর ধারা। ভগিনী নিবেদিতা সরলাদেবী নহেন। সরলা দেবী যদি ১৮৯৭ খৃঃ লাঠি খেলায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তবে তার ৫ বৎসর পরে (১৯০২ খৃঃ) নিবেদিতা আমাদের দেশে বৈপ্লবিক রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গী শুধু বৈপ্লবিক নহে, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বেই অতি মারাত্মক রকমের বিপ্লববাদী, বিপ্লবকর্ম্মী ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি—তিনি "Nihilist of the worst type" ছিলেন। যা ছিলেন আবার স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে তাহাই হইলেন। ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে বিপ্লবী হওয়া নূতন কিছুই নয়। তাঁহার জাপানী বন্ধু ওকাকুরার সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া প্রাচ্যপ্রীতি ও সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য বর্জ্জন, অবনীন্দ্রনাথের সহিত মিলিয়া প্রাচ্য রীতিতে নূতন চিত্রাঙ্কন, বিপিন পালের সহিত মিশিয়া 'নিউ ইণ্ডিয়া'তে নূতন জাতীয়তার উদ্বোধনকল্পে প্রবন্ধ লিখন ও ডন্ সোসাইটির তরুণ দলের মনে ভবিষ্যৎ-বিপ্লবের বীজ বপন—এ সমস্তই প্রমাণ পাইতেছি। আরো শুনিয়াছি, এই সময় ব্যারিষ্টার সুরেন্দ্রনাথ হালদারের চেষ্টায় ব্যারিষ্টার পি. মিত্র ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত তাঁহার নিভৃত কথোপকথন হইয়াছিল। অরবিন্দের সহিত বরোদায় নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাতের পর তিনি ১৯০৩ জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্তসমিতির প্রথমপর্ব্বে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৭ম—পি. মিত্র ও তাঁহার অনুশীলন সমিতির ধারা। অরবিন্দের ধারার সহিত যোগ রাখিয়াই এই ধারাটি প্রবাহিত হইতেছে। বারীন্দ্র আসিয়া পি. মিত্রের সহিত মিলিয়া যে The East Club গড়িয়াছিলেন, বারীন্দ্র তা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। কোন কেহর নেতৃত্বের অধীনে কাজ করা বারীন্দ্রের ধাতে সয় না। তা' ছাড়া গড়া অপেক্ষা ভাঙ্গার দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশী। তথাপি যতীন্দ্র ও বারীন্দ্রের মধ্যে নেতৃত্ব লইয়া যে-বিবাদের ফলে ১৯০৪ খৃঃ অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতির ১ম পর্ব্ব ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল এবং যে-ব্যর্থতার জন্য বারীন্দ্র অপেক্ষা বারীন্দ্রের

উপর অসঙ্গত পক্ষপাতিত্বের জন্য অরবিন্দকেই, অরবিন্দের মন্ত্রশিষ্য হেমচন্দ্র কাননগো প্রভৃতি একদল বৈপ্লবিক কর্ম্মী প্রধানতঃ দায়ী করেন—সেই স্মরণীয় কেলেঙ্কারী ঘটনার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পি. মিত্রই গুপ্ত-সমিতির প্রধান কেন্দ্রের প্রধান সভাপতি ছিলেন। অরবিন্দ বরোদায় থাকিতেন। বাংলার প্রধান কেন্দ্রের সভাপতি তিনি ছিলেন না। ঠাকুর সাহেব যদি তখনও জাপানেই থাকিয়া থাকেন তবে অরবিন্দই তখন "গুজরাটের গুপ্তচক্রের সভাপতি ছিলেন"। তখনও বাংলায় "যুগান্তরের" দল দেখা দেয় নাই। অরবিন্দের ১ম পর্ব্বের ব্যর্থতার পরে, ২য় পর্ব্বের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই "যুগান্তরের" দলের অভ্যুদয় হইবে। আগে "অনুশীলন" পরে "যুগান্তর", তারপরে দুই দলে দলাদলি।

পি. মিত্র বিলাতে থাকাকালীন গুপ্তসমিতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন—অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন।

পি. মিত্র, নিবেদিতা, অরবিন্দ—ইঁহারা প্রত্যেকেই বিলাত হইতে গুপ্ত-সমিতির আদর্শ লইয়া আসেন। বস্তুটি স্বদেশী নয়, বিদেশী—বিলাতী! তাই সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী বক্তৃতায় তারস্বরে বলিয়াছিলেন—"It (Anarchism) is of the West ; not of the East." দেখা গেল পি. মিত্রের ধারার কুক্ষিগত অথচ পৃথক অস্তিত্বে বিরাজমান থাকিয়া অরবিন্দের ধারার ১ম পর্ব্ব প্রবাহিত হইতেছে। বিলক্ষণ যোগাযোগ আছে।

আরো অনেক ধারা আছে। সবগুলি লিখিতে গেলে বেশী ছড়াইয়া পড়িবে, সংকুলান কঠিন হইবে। মোটামুটি দেখা গেল—(ক) কার্জ্জনী রাজশক্তির ধারা, (খ) কংগ্রেসী মডারেট ধারা, (গ) চরমপন্থী ধারা, (ঘ) এবং অপর গুপ্ত-সমিতির ধারার পাশাপাশি অরবিন্দের গুপ্তসমিতির ধারা কিরূপ সঙ্গতি রাখিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের গতি ও গতিমুখে তাহার বিভিন্ন বিচিত্র ধারার একখানি চিত্র যতটা সম্ভব আমরা দেখিতে পাইলাম।

৮ম—রবীন্দ্রনাথ। অতিশয় ব্যাপক বস্তু। ধারা হিসাবে এইকালে তাঁহাকে নিশ্চয়ই ধরাও যায়, দেখাও যায়। তাঁহার নিজস্ব একটি ধারা আছে। সে-ধারা শুধু সাহিত্যেই নিঃশেষিত হয় নাই। রাষ্ট্রক্ষেত্রেও তাঁহার সৃজনীশক্তি প্রচণ্ড এবং প্রচুর। কাব্য-নিকুঞ্জে বসিয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে তিনি এসময় শুধু বংশীবাদনে কালক্ষেপ করেন নাই। পরন্তু জাতীয় জীবনে নূতন জোয়ার তিনি আনিয়াছেন। প্রলয় ও সৃষ্টি কল্পে তাঁহার ভেরী ভীমগর্জ্জনে নিনাদিত হইয়াছে। তিনি যে ভাব, যে আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা অরবিন্দের ধারা হইতে সংস্রবশূন্য নহে। ভাব ও আদর্শের দিক দিয়া যোগ আছে।

১৯০১ খৃঃ হইতে তিনি নব পর্য্যায়ে বঙ্কিম-প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদন আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথের বঙ্গদর্শন একটি নূতন ধারা সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ এই ধারায় বারংবার ধিকৃত হইয়াছে। প্রাচ্যপ্রীতি ও তৎসঙ্গে হিন্দুসমাজ ও সভ্যতাকে যথেষ্ট প্রশংসা করা হইয়াছে। ২২শে ডিসেম্বর তিনি ঋষিদের তপোবনের আদর্শে শান্তিনিকেতন স্কুল স্থাপন করিলেন। ব্রহ্মচর্য্য উহার আদর্শ ছিল।

১৯০২ খৃ: উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন স্কুলে অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। উপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যকে বর্জ্জন করিয়া প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার পুনরুদ্ধারকল্পে উভয়ে একত্রে মনঃসংযোগ করিলেন। সমগ্র এশিয়াবাসীদের মধ্যে (Pan-Asiatic idea) যে একটা ঐক্য আছে ('Asia is One'), বর্ত্তমান যুগে সেই ঐক্যকে ভিত্তি করিয়া একটা মিলন স্থাপনের প্রয়াস করিলেন। ওকাকুরা ও নিবেদিতার সহিত এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ একমত।

১১ই ফেব্রুয়ারী তিনি লর্ড কার্জ্জনের কনভোকেশন-বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন।—তা আমরা বলিয়াছি। ১৯০৩ খৃঃ বঙ্গদর্শনে চরমপন্থী রাজনীতি প্রচার করিলেন। ঘুষির পরিবর্ত্তে ঘুষি দিতে হইবে—ইহাই তাঁহার মত। অত্যাচার সহ্য করাকে তিনি পাপ বলিয়া ঘোষণা করিলেন: "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—তব দণ্ড যেন তারে বজ্রসম দহে।" আবার ব্রাহ্ম-প্রচারকদের বিদেশী ঢংএর ধর্ম্মপ্রচারের বিরুদ্ধেও লেখনী চালনা করিলেন। ত্রুটি করিলেন না কোন দিকেই।

১৯০৪ খৃঃ বিলাতী আদর্শে রাজনীতি চর্চ্চার বিরুদ্ধে লিখিলেন। ২২শে জুলাই স্মরণীয় প্রবন্ধ "স্বদেশী সমাজ" মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম পাঠ করিলেন। রমেশ দত্ত সভাপতি হইলেন। পরে কার্জ্জন থিয়েটারেও ঐ প্রবন্ধ পুনরায় পাঠ করিলেন। রবীন্দ্রনাথে স্বদেশী ভাবের প্রবাহ তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া চলিল।

এর সঙ্গে একদিকে লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গ-ভঙ্গরূপ উদ্যত খড়্গ, আবার অন্যদিকে অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতির বিষধর উদ্যত ফণা গর্জ্জিয়া চলিয়াছে। সবগুলি ধারাই যেন তুফানের পর তুফান তুলিতেছে। এবং এ সমস্তই বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের আগের ইতিহাস।

৯ম—অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন-ধারা। রবীন্দ্রনাথ এই চিত্রাঙ্কন ধারায় একজন প্রবর্ত্তক। শুনুন, তিনি কি বলিতেছেন—

"আর্টস্কুলে ভর্তি হইয়াছি, কিন্তু আমাদের দেশে শিল্পকলার আদর্শ যে কি, তাহা আমরা জানিই না। ...এ আদর্শ দেশের মধ্যেই আছে—একবার যদি আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যায়, তবে ইহাকে আমাদের সমস্ত দেশের মধ্যে থালায়, ঘটিতে, বাটিতে, ঝুড়িতে, চুপ্‌ড়িতে, মন্দিরে, মঠে, বসনে, ভূষণে, পটে, গৃহভিত্তিতে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ একটি সমগ্র মূর্ত্তিরূপে দেখিতে পাইতাম।"

"জাপানের একজন সুবিখ্যাত চিত্ররসজ্ঞ পণ্ডিত (ওকাকুরা?) এদেশের কীটদষ্ট কয়েকটি পটের ছবি দেখিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছেন। তিনি একখানি পট এখান হইতে লইয়া গিয়াছেন। সেখানি কিনিবার জন্য জাপানের অনেক গুণজ্ঞ তাঁহাকে অনেক মূল্য দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি বিক্রয় করেন নাই।"—(দেশীয় রাজ্য—১৩১২)।

অরবিন্দ অবনীন্দ্রনাথের এই চিত্রাঙ্কন-ধারাকে—বিলাতী নকল আদর্শের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া একটা স্বাধীন মুক্ত ধারা বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। এই ধারায় জাপানী প্রভাবের চিহ্ন দেখিয়া তাহারও বিশদ সমালোচনা করিয়াছেন।

"In Bengali again, the National spirit is seeking to satisfy itself in art and, for the first time since the decline of the Moguls, a new School of National art is developing itself the School of which *Abanindra Nath Tagore is the founder and master*. It is still troubled by the foreign, though Asiatic influence from which its master started and has something of an exotic appearance, but the development and self-emancipation of the National self from this temporary domination can already be watched and followed. There again it is the spirit of Bengal that expresses itself. The attempt to express in form and limit something of that which is formless and illimitable is the attempt of Indian art. ...No Indian has so strong an instinct for form as the Bengali."

"Unable to have a perfect model in the scanty relics of old Indian art, it was only natural that it should turn to Japan for help, for delicacy and grace are there triump

hant. *But Japan has not the secret of expressing the deepest soul in the object, it has not the aim.* And the Bengali spirit means more than the union of delicacy, grace and strength ; it has the lyrical mystical impulse ; it has the passion for clarity and correctness and as in our literature, so in our art we see these tendencies emerging—an emotion of beauty, a nameless sweetness and spiituality pervading the clear line and form. Here too it is the free spirit of the nation beginning to emancipate itself, *from the foreign limitations and shackles.*" —*Karmayogin*. 1909 ; by Arabindo Ghose.

আমাদের ছবিগুলি পর্য্যন্ত বিদেশের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া মুক্ত হইতে চলিয়াছে। মানুষগুলো কি হবে না ? ছবি মুক্তি পাবে আর মানুষ বা সেই জাতি মুক্তি পাবে না, তা-ও কি হয় ? —একথা স্বভাবতঃই মনে আসে। অবনীন্দ্রনাথের ধারা ও তার উপরে অরবিন্দের অতি সূক্ষ্ম সমালোচনায় তাৎপর্য্য হইতে বুঝা গেল যে, এ-ধারার সহিত অরবিন্দের অন্তরের যোগ কতখানি এবং কত গভীর।

১০ম—সাহিত্যের ধারা। প্রতাপাদিত্য নাটক ১৫ই আগষ্ট।১৯০৩ খৃঃ, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। প্রসিদ্ধ অভিনেতা অমৃত মিত্র প্রতাপের ভূমিকা নিয়াছিলেন। সরলা দেবী শুধু শিবাজী-উৎসব লইয়া তৃপ্ত হইলেন না, প্রতাপাদিত্য-উদয়াদিত্য প্রভৃতি বাঙ্গালী বীরদের উৎসব আরম্ভ করিলেন। সম্ভবতঃ তার ফলেই ক্ষিরোদ প্রসাদ প্রতাপাদিত্য নাটক লিখিলেন। কম লোক থিয়েটার দেখে না। বাঙ্গালীর বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় বৎসরে এই নাটক—তখনকার বাংলার জাতীয় মনের, জাতীয় ভাব ও আদর্শের এক অতি বড় পরিচয়। ইতিহাস-বিমুখ বাঙ্গালী তার নিজের অতীত ইতিহাসের গৌরবের দিকে ফিরিয়া তাকাইয়াছে। "যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য" (ডি. এল. রায়), "চাঁদ প্রতাপের হুকুমে হটিতে হয়েছে দিল্লীনাথে" (সত্যেন দত্ত)—এসব ক্রমে এই ধারাকে চালিত করিতে লাগিল। বিংশ শতাব্দীর ১ম দশকে বাংলা সাহিত্যে জাতীয় ভাবে পূর্ণ যতগুলি নাটক নাট্যকারগণ (গিরিশ, ডি. এল. রায়, ক্ষিরোদ প্রসাদ) লিখিয়াছেন—তাহা তাহার পরবর্ত্তী ত্রিশ বৎসরে তাঁহারা লেখেন নাই।

১১শ—বিজ্ঞানের ধারা। প্যারী প্রদর্শনীতে জগদীশ বসুর যে বৈদ্যুতিক বিজ্ঞানের ধারাকে এযুগে স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত হইয়া এক

উচ্চ প্রশংসায় প্রশংসিত করিয়া গিয়াছেন—জাতীয় প্রবাহের ধারাগুলির মধ্যে তাহার স্থান কোন ধারার নীচে নয়। বিজ্ঞান আজ মনুষ্য-সমাজে জয়ী। মানুষ তাহাকে হিংস্র পশুর কাজে নিয়োগ করিয়াছে। অন্যরূপ করিতেও পারিত। বিজ্ঞানের দোষ নাই। দোষ মানুষের। মানুষ নির্দোষ না হইলে, মনুষ্যত্ব সাধন ও অর্জ্জন করিতে না পারিলে বিজ্ঞান মানুষকে ধ্বংসের মুখেও ঠেলিয়া দিতে পারে।—এমন সম্ভাবনাও অনেকে আশঙ্কা করেন। মানুষের দেবতা হইবার পথে বাধা এই যে, মানুষ এখনো মানুষ হয় নাই।

ওকাকুরা-নিবেদিতাও জগদীশ বসুর এই ধারাকে সগৌরবে উল্লেখ করিয়াছেন—আমরা অনুল্লেখ করি কি করিয়া? ওকাকুরা বলিতেছেন—ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে তার নিজস্ব একটা বিজ্ঞানের ধারা আবহমানকাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে। বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সে-ধারা অব্যাহত আছে। প্রমান জগদীশ বসু।

ওকাকুরা সাংখ্যদর্শন, পরমাণুবাদ, গণিত, এলজেব্রা, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা—একে একে নাম করিয়া কোন্ শতাব্দীতে কোন্ বৈজ্ঞানিক দ্বারা উহাদের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। ("We catch a glimpse of the great river of Science which never ceases to flow in that country (India). Ever since the pre-Budhistic period when she produced the Sankhya philosophy and the atomic theory ; the fifth century when her Mathematics and Astronomy find their blossom in Aryabhatta ; the seventh, when Brahma Gupta uses his highly developed Algebra and makes astronomical observations ; the twelfth, brilliant with the glory of Bhaskaracharya and his famous daughter, down to the 19th and 20th centuries themselves, with Ramchandra the Mathematician and *Jagadish Chandra Bose* the Physicist."—*Ideals Of The East* ; *p. 109-110*, by *K. Okakura, 1903.*)

ডাঃ পি. সি. রায়ের হিন্দু-রসায়নের ইতিহাস পুস্তকের (Vol. II) ভূমিকা লিখিতে গিয়া ডাঃ ব্রজেন্দ্র নাথ শীল হিন্দুর বিজ্ঞানের এই ধারাকে গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের সহিত আরোও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন। ভগিনী নিবেদিতার

হয় ওকাকুরার এই লেখার মধ্যে দেখিতে পাই। স্বামী বিবেকানন্দও এই ভাষাতেই এই ধারা সম্পর্কে বিলাতে বলিয়াছিলেন। নিবেদিতা সম্ভবতঃ স্বামীজীর নিকট হইতেই ইহা পাইয়া থাকিবেন।

নিবেদিতা বলেন—বিজ্ঞান সার্ব্বভৌমিক। এই যে বিদ্যুৎ—ইহা বহু যুগ ধরিয়া বহু দেশের বৈজ্ঞানিক মিলিয়া ক্রমোন্নতি করিয়াছেন। জগদীশ বসুও সেই সকল বৈজ্ঞানিকের মধ্যে একজন। ("Ancient Greece gives us the first word on Electricity. What a leap from this to Volta and Galvini! Where again had these been without the German Hertz, the French Ampere, *the Hindu Bose*? And then Italy for a second time takes up the thread of inquiry, and produces the apparatus for wireless telegraphy".—*The Web Of Indian Life, p. 260*—by *Sister Nivedita, 1904.*)

১২শ—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের ধারা। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব যে ধারার প্রবর্ত্তক বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, সেই ধারার শেষ পরিণত অবস্থায় আমরা এই কালের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিতে পারিব না। তবে তাঁর চক্রাকারে নিয়ত ঘূর্ণ্যমান ধারার গতিপথ অনুসরণ করিতে পারিব। গতি অনুসরণ না করিলে পরিণতি বুঝা যায় না।

অরবিন্দের ধারার ২য় পর্ব্বে তিনি গুপ্তসমিতি ও প্রকাশ্য 'বন্দে মাতরম্'-এর চরমপন্থী রাজনীতি প্রচার এক সঙ্গে চালাইয়াছিলেন। এই প্রকাশ্য চরমপন্থী রাজনীতি প্রচারে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার নিজের ডেমোক্রেটিক অথবা প্রলেটেরিয়েট ধারার প্রখর স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া অরবিন্দের অতি শ্রদ্ধেয় সহকর্ম্মী হইয়াছিলেন। "বন্দে মাতরম্"-এর সম্পাদক হয়ত অরবিন্দ ছাড়া খুঁজিলে পাওয়া যাইত, যদিও বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দে উভয়েই স্বাতন্ত্র্য আছে—কেহ কম নয়। কিন্তু 'সন্ধ্যা'র সম্পাদক এক উপাধ্যায় ভিন্ন বাংলাদেশে ১৯০৭ খৃঃ আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে খুঁজিলে পাওয়া যাইত না। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নয়। উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর অরবিন্দ বলিয়াছিলেন: "His death is a parable to our nation"—*Baruipur Speech; 12th April, 1908.*

১৯০১ খৃঃ হইতেই তিনি রবীন্দ্রনাথের বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত নিশ্চয়ই তাঁহার মতের মিল হইয়াছিল।

১৯০৪।জুলাই মাসে এলবার্ট হলে মিঃ এন. এন, ঘোষের সভাপতিত্বে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বক্তৃতা দিলেন—'Personality of Srikrishna'। একজন খৃষ্টান J. N. Farguahar, শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। উপাধ্যায়ের বক্তৃতা উক্ত খৃষ্টানকে প্রতিবাদার্থে দেওয়া হইল। এই বক্তৃতা আবার বাংলায় লিখিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মধ্যে পঠিত হইল। হিন্দুসমাজে উপাধ্যায় যেন ফিরিয়া আসিলেন। হিন্দুসমাজও উপাধ্যায়কে টানিতে লাগিল। ঠিক একই সময়ে (২২শে জুলাই) রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধও দুইবার পড়িলেন। আমরা তা দেখিয়াছি। প্রত্যেক ধারার মুখেই ফেনিল তরঙ্গরাশি উচ্ছ্বসিত কলরবে ঘোষণা করিতেছে—একই আদর্শ, একই কথা। আর এই সকল ধারার পাশাপাশি অন্ধকারে প্রবাহিত হইতেছে—অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতির ধারা। ইতিহাস কী বিচিত্র!

বুয়র যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০২)—রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪।৮ই ফেব্রুয়ারী—১৯০৫।১৪ই অক্টোবর)ঃ বুয়র যুদ্ধের সময় স্বামী বিবেকানন্দ জীবিত ছিলেন। বুয়র যুদ্ধে ইংরেজরা যথেষ্ট নাকাল হয়। স্বামীজী লিখিয়া গিয়াছেন—"এ বোয়ার যুদ্ধের শিক্ষা পেয়ে ইংলণ্ডে বোধ হয় কন্‌স্ক্রিপসনই বা হয়" (পরিব্রাজক—পৃঃ ১৫৮)। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে—বুয়র যুদ্ধের পর আমাদের দেশেও যেন ইংরেজের বুট আর ততটা মচ্ মচ্ করিয়া চলে না।

আর রুশ-জাপান যুদ্ধেও সকলে অবাক হইয়া গেল। একরত্তি জাপান যে রুশকে এত সহজে হারাইয়া দিবে, একথা কেহই ভাবে নাই। যা কেউ ভাবে না, ইতিহাসে তা ঘটে। কেনন', অনেকগুলি কারণ একত্রে মিলিবার ফলে একটা ঘটনা ঘটে। সকলগুলি কারণ আমরা সম্যকরূপে জানিতে পারি না। সুতরাং কি যে ঘটিবে, তা আমরা ঠিকমত ভাবিয়া উঠিতে পারি না। না পারিয়া এক কল্পিত ঈশ্বরের খামখেয়ালী ইচ্ছার উপর সমস্তটা ছাড়িয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্তে হাই তুলি।

পর পর এই দুইটি যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশেও দেখা গিয়াছিল। এই সময় অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্তসমিতির গতিমুখে এই প্রতিক্রিয়া কিরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল, তা আমরা দেখিতে পাইব।

গীতা ও তলোয়ার হাতে হেমচন্দ্র কাননগো দণ্ডায়মান। অরবিন্দ স্বয়ং তাঁর কানে মন্ত্র দিয়া গুপ্তসমিতিতে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।—এ দৃশ্য আমরা দেখিয়াছি। সুতরাং শিষ্যত্বের গৌরব তাঁর কারু অপেক্ষা কম নয়। অরবিন্দের

নিকট দীক্ষা লওয়ার পূর্ব্বেই হেমচন্দ্র বুয়র যুদ্ধ দ্বারা অ-বাবুর (জ্ঞান বসু) নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। এবং গুপ্তসমিতির সূতিকাগারে সে প্রেরণা যথেষ্ট কার্য্যকরী হইয়াছিল। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"বুয়র অতবড় শক্তিশালী ইংরেজকে হটিয়ে দিচ্ছে। এটা যে কেবল সিক্রেট সোসাইটি দ্বারা সম্ভব হয়েছিল—অ-বাবু (জ্ঞান বসু) তা নানা দেশের নানা ঘটনা থেকে উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দিতেন।……বুয়রদের পন্থাটি কিন্তু অবশেষে আমাদের পক্ষে নিতান্ত ঠিক বলে, একদিন শুভক্ষণে স্থির করে ফেলা গেল। অর্থাৎ কিনা সিক্রেট সোসাইটি গড়তে হবে, এ মতলবটা আঁটা হয়ে গেল। …সিক্রেট সোসাইটির কাজ সুরু হ'ল।"—(বাং—বি:—প্র:; পৃ: ৩-৫)।

বুয়র যুদ্ধের প্রেরণা প্রত্যক্ষ দেখা গেল। অরবিন্দ কিন্তু দীক্ষা দিবার জন্য বরোদা হইতে তখনো আগমন করেন নাই। তবে আর একটু পরেই তিনি আগমন করিবেন। যে ভূমিতে তিনি বীজ নিক্ষেপ করিবেন, বুয়র যুদ্ধ সে-ভূমি আগেই কর্ষণ করিয়া দিল। যুদ্ধ হয় কোথায়, আর তার ফল ফলে কোথায়! আশ্চর্য্য!

বুয়র যুদ্ধ শেষ হইয়া রুশ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইতে মাঝে দুই বৎসর সময় আমরা পাই (১৯০২—১৯০৪ খৃ:)। ঠিক এই দুই বৎসরকালের মধ্যেই আমরা আবার অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্তসমিতির ১ম পর্ব্বের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও ব্যর্থতায় পরিণতি দেখিতে পাই।

১৯০৩।৩রা ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করা হয়। ১৯০৪।৮ই ফেব্রুয়ারী রুশ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মধ্যে দু'মাসের ব্যবধান। ১৯০৫।২৯শে আগষ্ট রুশ-জাপান দূতের মিলন হয়। ১৪ই অক্টোবর সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হয়। সুতরাং বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আন্দোলন যেমন বাংলাদেশে চলিতে লাগিল, আর সেই সঙ্গে রুশ-জাপান যুদ্ধও চলিতে লাগিল, এবং এই দুইটি সমসাময়িক ঘটনাই অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্ত-সমিতির ২য় পর্ব্বের (১৯০৬—১৯০৮ খৃ:) প্রজ্বলিত হুতাশনে একদিন প্রচুর ঘৃতাহুতি নিক্ষেপ করিয়াছিল।

হেমচন্দ্র লিখিতেছেন—রুশ-জাপান যুদ্ধের "প্রভাবও ঐ সালের (১৯০৪খৃ:) শেষভাগে আমাদের মধ্যে বিশেষ করে অনুভূত হয়েছিল।"—(পৃ: ১০)।

কারণ? "জাপান এশিয়াবাসী, তা ছাড়া ভাত খায়"। দুই বৎসর আগে (১৯০২ খৃ:) স্বামী বিবেকানন্দ, ওডা, ওকাকুরা, নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র-

নাথ—এঁরা সকলেই পাশ্চাত্যকে বর্জ্জন করিয়া সমস্বরে প্রাচ্য-প্রীতির জয়গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এবং এই জয়গানের পালা চলিবার মুখেই জাপান অত বড় রুশকে সম্মুখযুদ্ধে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়া দিল। হেমচন্দ্র লিখিতেছেন—

"জাপানের এই ঘটনা বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলনের সমসাময়িক না হ'লে, এবং যেমনই হোক পূর্ব্ব হ'তে বিপ্লববাদের যৎকিঞ্চিৎ বীজ ছড়ান না থাকলে, চিরন্তন অভ্যাসানুযায়ী বঙ্গ-ভঙ্গ-রদ আন্দোলন অকারণ হ'ত"। —(পৃঃ ৭২)।

এতটা অনুমান বাড়াবাড়ি মনে হয়। সায় দিতে পারি না। রুশ-জাপান যুদ্ধ না হ'লেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অকারণ হ'ত না। কেননা, আরো অনেক কারণ বিদ্যমান ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন—"চীনে আর জাপানে সব মন্দিরের গায়ে ওঁ হ্রীং ক্লীং সব বড় বড় সোনালী অক্ষরে লেখা দেখেছি। সে অক্ষর বাংলার এত কাছাকাছি যে বেশ বোঝা যায়।"—(পরিব্রাজক—পৃঃ ৭২)।

১৮৯৩ খৃঃ চিকাগো যাইবার পথে স্বামীজী জাপানেও গিয়াছিলেন। পুনরায় তিনি ওকাকুরার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া জাপানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু মৃত্যু আসিয়া বাধা দিল। এখন কথা—ঠাকুর সাহেব যখন জাপানে গমন করেন তখন তিনি অরবিন্দকে গুজরাটের গুপ্তচক্রের চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া যান। সেইকালেই অরবিন্দ বাংলাদেশে গুপ্ত-সমিতির ১ম পর্ব্ব প্রবর্ত্তন করেন (১৯০২ খৃঃ)। রুশ-জাপান যুদ্ধ তার দুই বৎসর পরের ঘটনা। এই যুদ্ধের সময় ঠাকুর সাহেব জাপানেই আছেন, না, ফিরিয়া আসিয়া অরবিন্দের নিকট হইতে আবার চার্জ্জ বুঝিয়া নিয়াছেন—সে-সকল কথা অরবিন্দের জীবন-চরিত আলোচনায় প্রয়োজনীয় হইলেও একেবারে একটা গুমট অন্ধকারে রহস্যাবৃত রহিয়া গিয়াছে।

রুশ-জাপান যুদ্ধের প্রভাব অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতির ২য় পর্ব্বে অনুভব করা যায়। ১ম পর্বে নয়। ১ম পর্বে বুয়র যুদ্ধের প্রভাব কিছুটা আছে।

কংগ্রেস ঃ কংগ্রেস এবার মাদ্রাজে হয়। সভাপতি—লালমোহন ঘোষ। তিনি নিজেকে কৃষ্ণনগরের লোক বলিয়া পরিচয় দিলেন। এর আগে ঢাকায় নর্থব্রুক হলে একবার বক্তৃতা দিবার সময় তিনি নিজেকে বিক্রমপুরের লোক বলিয়া পরিচয় দিয়া, বিক্রমপুরের অতীত গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। দুই কথাই সত্য। কেননা, পূর্বনিবাস বিক্রমপুর হইতে

তাঁহারা কৃষ্ণনগরে উঠিয়া আসেন। ভারতের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মীর জন্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম, দুই বঙ্গই গৌরব অনুভব করিবার দাবী রাখে।

এবার কংগ্রেসে বোম্বাইয়ের বুনো ওলের মুখে বাংলার বাঘা তেঁতুল দেখিতে পাই। কংগ্রেসের গৌরচন্দ্রিকার মুখেই মিঃ মেহেতার সঙ্গে লালমোহন ঘোষের খুব একচোট হইয়া গেল। মিঃ মেহেতা কোনদিন এপর্য্যন্ত এরকম চোট খান নাই। পরে নাকি একবার ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের নিকট খাইয়াছিলেন বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায়।

লালমোহনের বক্তৃতা আগেই কলিকাতাতে ছাপা হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং মিঃ মেহেতা উহার এক কপি আগেই পাইয়াছিলেন। পড়িয়া দেখেন কিনা যে, লালমোহন কংগ্রেসে মিঃ মেহেতার একাধিপত্যের উপর তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন। বারুদে অগ্নি সংযোগের মত মিঃ মেহেতা জলিয়া উঠিয়া লালমোহনকে সভাপতিপদে বরণের জন্য বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হইলেন। অবশ্য সভাপতির বরণ ঠিকই হইল। কিন্তু মিঃ মেহেতা কটাক্ষ করিলেন যে—লালমোহন বহুদিন রাজনীতিক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে রাজনৈতিক যোগী (political yogee) বলিয়া উপহাস করিলেন।

যে অপূর্ব্ব বাগ্মিতা ২০ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮৪ খৃঃ কংগ্রেস জন্মিবার এক বৎসর আগে, ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের সদস্যপদপ্রার্থী হইবার সময়, ইংরেজ রাজনীতি-বিশারদদিগকে মুগ্ধ স্তম্ভিত বিস্মিত করিয়াছিল, এ-আঘাত পাইবার পর তা স্তব্ধ থাকিবার কথা নয়। আগ্নেয়গিরির প্রস্রবণের মত লালমোহনের বাগ্মিতা অবাধ গতিতে কংগ্রেস-মণ্ডপ কম্পিত করিয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিতে লাগিল। ঘটনাটা হঠাৎ ঘটিয়া গেল। কাজেই এ-বক্তৃতা লালমোহন বাড়ী হইতে তৈরী করিয়া লইয়া যান নাই। লিখিত অভিভাষণ পরে তিনি পাঠ করিলেন।

লালমোহন রাজনৈতিক যোগের ব্যাখ্যা করিলেন এবং মিঃ মেহেতাকে গিবনের ইতিহাস হইতে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া, তাঁহার নির্লজ্জ দাম্ভিকতাকে ধিকৃত করিলেন। বোম্বাই জানিল, সমগ্র ভারতবর্ষ জানিল যে—বাঙ্গালী বক্তৃতা দিতে জানে। আর জানিল—বাঙ্গালী দাম্ভিকতা সহ্য করে না। কংগ্রেস এবার ১৯শ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে মিঃ মেহেতার দাম্ভিকতা সম্বন্ধে অরবিন্দের মনোভাব খুব স্পষ্ট। ১৮৯৩ খৃঃ ইন্দুপ্রকাশে অরবিন্দের লেখাতে ইহার জলন্ত প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে।

পরে ১৯০৯ খৃঃ কর্ম্মযোগিন্ পত্রিকাতেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাব কংগ্রেসের ইতিহাসে লালমোহন প্রথম উত্থাপন করেন। অনেকের ধারণা মিঃ গোখ্‌লে এই প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন। কিন্তু তা নয়।

কংগ্রেসের বাহিরে ইহার ৪।৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের দেশে কংগ্রেসের প্রস্তাব অপেক্ষাও ব্যাপকভাবে গ্রামে গ্রামে গিয়া ম্যাজিক-লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে জন-শিক্ষা প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজীর পরিকল্পনায় শুধু ছোটদের নয়, বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষেরও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বাঙ্গালী যে কত বিষয়ে অগ্রণী, তা বাঙ্গালীরাই জানে না। নিজের ইতিহাস না-জানার বাহাদুরী বাঙ্গালীর মত আর কারুরই নাই!

লালমোহন বলিলেন যে, ইউরোপে রাশিয়া আর তুরস্ক ছাড়া সব দেশেই ষ্টেট্ প্রাথমিক শিক্ষা নিজ দায়িত্বে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইংলণ্ডে যখন প্রথম ইহা প্রবর্ত্তিত হয় তখন তিনি ইংলণ্ডেই ছিলেন, সুতরাং নিজে ইহা চক্ষের উপরে দেখিয়াছেন। পরে জাপানের কথা বলিলেন। ভারতে বরোদা রাজ্যের দৃষ্টান্ত দিয়া গভর্ণমেণ্টকে ইহা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য মামুলী ধারায় আবেদন-নিবেদন করিলেন। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মীও ইহার অধিক কিছু পারেন না।

অরবিন্দ তখন প্রাথমিক শিক্ষারও বিরোধী নন, বাগ্মিতারও বিরোধী নন। তিনি বিরোধী ছিলেন এই মডারেট রাজনীতির আবেদন-নিবেদন নীতির। কেন? যেহেতু ইহা নিস্ফল। দেশ নিস্ফলতা চায় না, চায় সফলতা। কাজেই এই আবেদন-নিবেদন নীতি তিনি ১৮৯৩ খৃঃ ইন্দুপ্রকাশে খোলসা পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন। ১০ বৎসর পরেও কংগ্রেস অরবিন্দের কথা শুনিল না। কংগ্রেসী রাজনীতিতে অরবিন্দ অনেক আগাম কথা বলিয়াছেন। বিশিষ্ট চিন্তানায়কদের মধ্যে এইখানে তাঁহার চিন্তাধারার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য ও গৌরব আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি।

তারপরে লালমোহন বড় লাট লর্ড কার্জ্জনের উপর খুব একচোট নিলেন। লর্ড কার্জ্জন এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব-বিস্তারে তিনি ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাইয়াছেন। লালমোহন বলিলেন যে, কৈ—না!

কোন ঈশ্বরের হস্ত তিনি দেখিতে পান নাই। বেচারী ঈশ্বর! লালমোহন সম্ভবতঃ এরিষ্টটলের (Aristotle) নিকট হইতে রাজনীতি শিখিয়া থাকিবেন। যদি তিনি গীতা হইতে রাজনীতি শিখিতেন, তবে ঈশ্বরের শুধু হাত কেন, তাঁহার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিশ্বরূপ দেখিতে পাইতেন। অবশ্য সেই সঙ্গে তলোয়ার রিভলবার বোমা নিষ্কাম-গুপ্তহত্যা নিষ্কাম-ডাকাতি—এসমস্তও দেখিতে পাইতেন। এই একই সময়ে দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে কত বিভিন্ন শ্রেণীর চিন্তানায়কের যে অভ্যুদয় তখন হইয়াছিল, তা এখনো ১ম অনুসন্ধান, ২য় বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। যদিও এখন পর্য্যন্ত অরবিন্দের রাজনীতিতে ঈশ্বর আগমন করেন নাই, তথাপি কংগ্রেসের সভাপতি প্রবীণ লালমোহন ঘোষ আর ইন্দুপ্রকাশের লেখক (১৮৯৩ খৃঃ) এবং গুপ্ত-সমিতির প্রবর্ত্তক (১৯০৩ খৃঃ) নবীন যুবা অরবিন্দ ঘোষ এক শ্রেণীর চিন্তানায়ক নহেন। অথচ উভয়েই দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে বাস করিয়া ইংলণ্ডের রাজনীতির সহিত সাক্ষাৎভাবে এবং ঘনিষ্ঠভাবে সুপরিচিত। এবং উভয়েই সে-কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গ-ভঙ্গ ও মাদ্রাজ-ভঙ্গ করিবার যে প্রস্তাব লর্ড কার্জ্জন সন্ত উত্থাপন করিয়াছিলেন, লালমোহনই প্রথম কংগ্রেস হইতে তাহার প্রতিবাদ সূচনা করিলেন। এই প্রতিবাদ পরবর্ত্তী বৎসরগুলিতে বাংলার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিবে। লালমোহন এই প্রতিবাদের প্রথম প্রবর্ত্তক।

তারপর, ইংরেজ-রাজত্বে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা (Pax-Britanica) হইয়াছে — এ কথার জবাবে লালমোহন বলিলেন যে, ইহাতে কোনই লাভ হয় নাই। চুরি-ডাকাতি-লুন্ঠতরাজে যত লোক মরিত তার অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ-মহামারিতে এখন বেশী লোক মরে। ("After all it makes but little difference whether millions of lives are lost on account of war and anarchy or whether the same result is brought about by Famine and Starvation".)

পরিশেষে লর্ড কার্জ্জনের দিল্লী-দরবারকে খুব একচোট নিন্দা করিলেন এই বলিয়া যে, দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের এই প্রলয়কাণ্ডের মধ্যে দিল্লীর মাঠে এই রংবেরং-এর আতসবাজী আর দেশীয় রাজাদের সেখানে ধরিয়া নিয়া গিয়া এই রকম নাকাল করা অতিশয় গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। ("The descendants of the Sovereign Princes before whom English Merchants had presented themselves on bended knees……etc."

রবীন্দ্রনাথও দিল্লী-দরবারকে খুব কঠোর ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু লর্ড কার্জ্জন লোকমতের কোন মূল্যই দেন নাই। তাঁহার চরিত্রে যে একগুঁয়েমী দাম্ভিকতা নগ্নমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে, তখনকার রাজনীতিতে তার বিষাক্ত প্রভাব বিস্তার দেশীয় লোকদের মনে ইংরেজ শাসনের প্রতি বিদ্বেষ ধূমায়িত করিয়াছে।

কিন্তু কি মিঃ মেহেতা কি মিঃ লালমোহন ঘোষ এবং কি লর্ড কার্জ্জন, ইঁহারা কেহই তখন জানিতে পারেন নাই, ভাবিতে পাবেন নাই যে—এই সময়ে বরোদা কলেজে ইংরাজী সাহিত্য পড়াইবার অবকাশে অরবিন্দ গোপনে বাংলাদেশে আসিয়া ইংরেজ তাড়াইবার জন্য পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিপ্লবাত্মক গুপ্ত-সমিতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কত বিচিত্র বিরুদ্ধধারা ইতিহাস-পথে একসঙ্গে প্রবাহিত হয়।

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ও তাঁহার প্রতাপাদিত্য-উদয়াদিত্য উৎসব (১৯০৩ খৃঃ)ঃ ভগিনী নিবেদিতার সহিত যেমন অরবিন্দের মতের ও কাজের মিল হইতে দেখা গেল; গেল বৎসর (১৯০২।সেপ্টেম্বর) তেমনি সরলা দেবীর সহিত অরবিন্দের গরমিল আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। এই গরমিলের মধ্যেও আবার একটা যোগসূত্র আছে—যতীন্দ্র ব্যানার্জ্জী। পরে বলিতেছি।

তিলক-প্রবর্ত্তিত শিবাজী উৎসবের (১৮৯৫ খৃঃ) অনুকরণে সরলা দেবী (১৯০৩।এপ্রিল) বৈশাখী পূর্ণিমাতে প্রতাপাদিত্য-উৎসব আরম্ভ করিলেন। ভবানীপুর বালিগঞ্জ বাগবাজার বালক-সঙ্ঘ কর্ত্তৃক এই অনুষ্ঠান-উৎসব সম্পন্ন হইল। সরলা দেবী 'বাঙ্গালীর পিতৃঋণ' শীর্ষক প্রবন্ধ ঐসকল বালক-সংঘের নিকট তেজের সহিত পাঠ করিলেন। ১৩১০ সনে, জ্যৈষ্ঠে 'ভারতী' কাগজে উহা ছাপা হইল।

এই বৎসরেই (১৯০৩ খৃঃ) শ্রাবণ মাসে তিনি প্রতাপাদিত্যের পর উদয়াদিত্য উৎসব পুনরায় এসকল প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিলেন। এই সময়েই ভারতীতে আর একটি প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করিলেন— 'বিলাতী ঘুষি বনাম দেশী কিল', ইংরেজের নিকট ঘুষি খাইলে দেশী কিল কি করিয়া দিতে হইবে। ঘুষি খাইয়া ভীরুর মত পালাইবে না—স্বামী বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ, ইঁহারাও এই রকমের কথা এর কিছু আগে বলিয়াছেন ও

লিখিয়াছেন। সরলা দেবী ইহা যুবকদের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ—মাসের-পর-মাস এই প্রচার চলিতে লাগিল।

মারাঠী অনুকরণে বীরাষ্টমীতে অস্ত্রপূজা হইতে লাগিল। বিজয়া দশমীতে অস্ত্রপূজা পূর্ব্ববাংলায় খুব চলিতে ছিল, আমরা দেখিয়াছি।

তারিখ মিলাইলেই বুঝা যাইবে (১৯০৩ খৃঃ) যে, অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতির ১ম পর্ব্ব যতীন্দ্র ও বারীন্দ্র এই একই সময়ে পুরা উদ্যমে চালাইতেছেন। এবং অরবিন্দও পুজার ছুটিতে এই সময় প্রত্যেকবার আসিয়া তাঁহার গুপ্তদলের নেতৃত্ব করিতেছেন। লোকসংগ্রহ, অস্ত্রসংগ্রহ, যুদ্ধশিক্ষা, গরিলা, গুপ্তহত্যা, রাজনৈতিক ডাকাতি, শপথগ্রহণপূর্ব্বক দলে ভর্ত্তি, শপথ ভঙ্গ করিলে মৃত্যুদণ্ড (!)—এ সমস্তই উদ্যোগ-আয়োজন অরবিন্দের নেতৃত্বে যতীন্দ্র বারীন্দ্র দেবব্রত বসু ভূপেন্দ্র দত্ত হেমচন্দ্র কানুনগো প্রভৃতি পুরাদমে চালাইতেছেন। গুপ্ত-সমিতির অধিবাস অথবা বোধন চলিতেছে।

সরলা দেবী যে আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছেন, অরবিন্দের দলকে তাহা পরোক্ষে বিলক্ষণ সাহায্য করিতেছে। যতীন্দ্র অরবিন্দের দলের একজন প্রধান উপনেতা। আবার সরলা দেবীর লাঠি-তলোয়ারের দলেও তিনি আছেন, কাজ করিতেছেন। সরলা দেবীর সহিত যতীন্দ্রের মেলামেশা, ঘনিষ্ঠতাও আছে। এইখানেই অরবিন্দ ও সরলা দেবীর দলের একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করা যায়। সরলা দেবী ইহা অস্বীকার করেন না। তিনি বলেন—

"যতীন্দ্র অরবিন্দের নিকট হইতে চিঠি লইয়া প্রথমে তাঁহার কাছেই এসেছিল। তিনি ও যতীন্দ্র একসঙ্গে কাজ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ যতীন্দ্রের রাজনীতি পরিত্যাগ করার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বজায় ছিল। তিনি গুপ্ত-হত্যা ও ডাকাতির বিরুদ্ধে ছিলেন। বারীন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইত না। তবে যতীন্দ্রের কাছ হইতে তিনি বারীন্দ্রের গতিবিধির সমস্ত খবর পাইতেন। যতীন্দ্রের সঙ্গে (১৯০৪ খৃঃ) বারীন্দ্রের যখন কলহ হয় তখন অরবিন্দ বারীন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করেন, আর তিনি যতীন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করেন।"

("Jatindra Banerji comes to Calcutta with a letter from Arabindo Ghose to Sarala Devi, and Jatin Banerji works together. This touch is kept up by Jatin Banerji till he gives up politics. Sarala Devi is against political dacoity

and murder. She never met Barin Ghose, but heard all about his activities through Jatin Banerji. Arabindo Ghose and Sarala Devi again conflict, Sarala Devi takes the side of Jatin Banerji ; Arabindo Ghose of Barin. ") এই সংবাদ আমরা সরলা দেবীর নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রতাপাদিত্য উৎসব লইয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত সরলা দেবীর মতের অনৈক্য হয়। 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যকে দিয়া তাঁহার খুড়া বসন্ত রায়কে খুন করাইয়াছেন। তিনি বলেন—সরলা একজন খুনী লোককে লইয়া মাতামাতি ও দাপাদাপি করিতেছে। সরলা দেবী বলেন যে, তিনি প্রতাপাদিত্যের বীরত্বকে পূজা করিতেছেন। "নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়, ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।"..."যুদ্ধ করিলপ্রতাপাদিত্য"... "চাঁদ প্রতাপের হুকুমে হটিতে হয়েছে দিল্লীনাথে"।—সুতরাং বীরত্বের পূজা চলিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ (১৩১০ সাল—১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ) শিবাজী-উৎসব কবিতা লিখিলেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্য-উৎসব কবিতা লিখিলেন না। শিবাজীও কিন্তু আফজল খাঁকে খুনই করিয়াছিলেন। যা ঘটিয়াছিল তাকে ঠিক যুদ্ধ বলা যায় না।

তারপরে শিবাজীর সঙ্গে প্রতাপাদিত্যকে তুলনা করিয়া সরলা দেবী বলেন যে, প্রতাপাদিত্য মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল কখন—যখন মোগল গৌরবের ক্ষমতার ও দর্পের সর্ব্বোচ্চশিখরে; আর শিবাজী যখন যুদ্ধ করিয়াছিল মোগল ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য তখন পতনোন্মুখ। অতএব বীরত্বের দিক দিয়া প্রতাপাদিত্য শিবাজী অপেক্ষা ছোট ত নয়ই—চাই কি, বড়ও হইতে পারে। ইহা শুনিয়া মারাঠার নেতারা খুশি হইলেন না। বরং একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। মারাঠীর সাথে বাঙ্গালী 'জয়তু শিবাজী' বলিয়া আবার পরক্ষণেই 'জয়তু প্রতাপাদিত্য' বলাতেই গোল বাধিল। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, অরবিন্দের ১ম পর্ব্বের সময় সরলা দেবী নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। সম্পূর্ণ সজাগ ও সক্রিয় ছিলেন। এযুগের বাঙালী মেয়ে হইয়া তিনি রাজনৈতিক শক্তিপূজা প্রথম প্রচার করিয়াছেন। ইতিহাস সে-কথা ভুলিবে না।

১৮৯৭ খৃঃ হইতে সরলা দেবীকে আমরা দেখিতেছি। ১৯০২ খৃঃ হইতে নিবেদিতাকেও আমরা দেখিতেছি। সময় হিসাবে আগে সরলা দেবী, পরে

নিবেদিতা। কিন্তু বিপ্লবী হিসাবে আগে নিবেদিতা, সরলা দেবী আদৌ বিপ্লবী নহেন। সুতরাং বিপ্লবী অরবিন্দের সহিত বিপ্লবী নিবেদিতার যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, তাহা সরলা দেবীর সহিত ঘটে নাই। বরং সরলা দেবী অরবিন্দের বিরোধী। কেননা, তিনি গুপ্ত-হত্যা এবং ভদ্রলোকের ছেলেদের ডাকাতি করার একান্ত বিরোধী।

অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্তসমিতির ক্রমবিকাশ (১ম পর্ব : ১৯০২—১৯০৪ খৃঃ) : কোন কিছুর ক্রমবিকাশে সাধারণতঃ তিনটি অবস্থা বা ক্রম পরিলক্ষিত হয়। স্থিতি, বিচ্যুতি, সংস্থিতি। ইতিহাসের ধারায় কোন কিছুর ক্রমবিকাশেও আমরা বিকাশের এই রূপান্তর দেখিয়া থাকি। সুতরাং গুপ্তসমিতির বিকাশেও এই রূপান্তর সম্পূর্ণ না হউক আংশিকভাবে পরিলক্ষিত হইবে। অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্তসমিতির বিকাশে আমরা স্থিতি দেখিতে পাইব ; বিচ্যুতি খুব বেশী দেখিতে পাইব ; সংস্থিতি প্রথম পর্বে কিছুই দেখিতে পাইব না। আমরা প্রথম পর্বের বিকাশের ধারাই এক্ষণে অনুসরন করিতেছি।

অরবিন্দ বরোদা হইতে প্রথমে যতীন্দ্রকে পাঠাইলেন। যতীন্দ্রকে সাহায্যের জন্য বারীন্দ্রকে পাঠাইলেন। তাতেও হইল না। স্বয়ং নিজে আসিলেন। কলিকাতা হইতে মফঃস্বলের কেন্দ্র মেদিনীপুরে গেলেন। সেখানে হেমচন্দ্র কাননগোর বাড়ীতে যাইয়া দলবলসহ তথাকার এক কাঁকরপূর্ণ মাঠে গর্ত্তে ঢুকিয়া চাঁদমারী শিখাইবার জন্য অরবিন্দ ও বারীন উভয়েই বন্দুক ছুড়িলেন। যাহার বিকাশ ক্রমে হইবে, এইখানে তাহার স্থিতি আমরা দেখিতে পাইতেছি। স্থিতির পরে ক্রমবিকাশের ধারায় বিচ্যুতি আসিবে। অর্থাৎ যতীন ও বারীন এই দুই উপনেতা নেতৃত্ব লইয়া কলহ করিবেন। সেই কলহ বা বিবাদ মিটাইবার জন্য ১৯০৪ খৃঃ বরোদা হইতে অরবিন্দকে আসিতে হইবে। অরবিন্দ আসিবেন এবং যতীন্দ্র ও বারীন্দ্রের মধ্যে বিবাদ মিটাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করিবেন। কিন্তু তিনি বিবাদ মিটাইতে পারিবেন না। ফলে অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্তসমিতির প্রথম পর্ব্ব ভাঙ্গিয়া যাইবে। ক্রমবিকাশের ধারায় ইহারই নাম বিচ্যুতি। এই বিচ্যুতির পরে আর সংস্থিতি প্রথম পর্ব্বে দেখিতে পাইব না। সুতরাং প্রথম পর্ব্বে কেবল দেখিতে পাই স্থিতি আর বিচ্যুতি—সংস্থিতি দেখিতে পাই না। গুপ্ত বা প্রকাশ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে

গঠিত সব সমিতিতেই স্থিতি আর বিচ্যুতি দেখা যায়, সংস্থিতি বড় একটা দেখা যায় না। পরে ইতিহাসেও তাহা দেখিতে পাইব। যে-কারণে এই বিচ্যুতি ঘটে এবং বিচ্যুতির পর যে-কারণে পুনরায় সংস্থিতি ঘটিয়া উঠে না, বিচ্যুতিরই বিকৃতরূপ ক্রমশঃ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়—তাহা বাঙলার রাজনৈতিক উপনেতা-দের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য গৌরবের নয়—কলঙ্কের। উপ-নেতাদের চরিত্রগত ত্রুটি এবং তার ফলে বিচ্যুতি, ইহা তৎকালীন বিপ্লবী উপনেতাগণ আত্মকথা বা আত্মজীবনী লিখিতে গিয়া প্রত্যেকেই স্বীকার করিয়াছেন।

যতীন্দ্রের ও বারীন্দ্রের চরিত্রগত ত্রুটির জন্য দুই বৎসর আয়োজনের পর যে বিচ্যুতি ঘটিল, অরবিন্দ তাহা বরোদা হইতে হন্তদন্ত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া যতীন্দ্র ও বারীন্দ্রকে সাক্ষাতে বুঝাইয়া মিটাইতে পারিলেন না। এই অক্ষমতার জন্য অরবিন্দের নেতৃত্বেও কলঙ্ক স্পর্শ করিল। দলের লোকেরা স্বভাবতঃই সন্দেহ করিতে লাগিল যে, গুপ্তসমিতির নেতা হইবার যোগ্যতা অরবিন্দের নাই। দলের খ্যাত এবং অখ্যাতনামা অনেকেই এই বিচ্যুতির পর অরবিন্দ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। এ সমস্তই ইতিহাস—ক্রমে বলিতেছি।

কংগ্রেস ও গুপ্তসমিতি—উদ্দেশ্য ও উপায়ঃ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য অন্যান্য উপনিবেশগুলির মত ইংলণ্ডের অধীন থাকিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভ করা। উপায়—ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট আবেদন-নিবেদন। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মীও মান্দ্রাজে সেই কথাই বলিলেন।

অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্তসমিতির উদ্দেশ্যও তা নয়, উপায়ও তা নয়। গুপ্ত-সমিতির উদ্দেশ্য—ইংলণ্ডের অধীনতার বন্ধন একেবারে ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। উপায়—প্রধান দুইটি : ১ম বৈপ্লবিক ডাকাতি, ২য় বৈপ্লবিক গুপ্তহত্যা। গরিলাযুদ্ধ কল্পনায় ছিল, কাজে কিছু হয় নাই। আগেই বলিয়াছি ক্রমবিকাশের ধারা বিচ্যুতিতেই পরিসমাপ্তি, সংস্থিতি দেখা যায় না। এই ব্যর্থতার অনেক কারণ বিপ্লবীরাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমগ্র ভারত-বর্ষে অরবিন্দের তুল্য কংগ্রেস-বিরোধীও কেহ নাই, আবার অরবিন্দের তুল্য বিপ্লববাদীও কেহ নাই। কংগ্রেস-বিরোধীদের মধ্যে যেমন তিনি অগ্রণী, আবার বিপ্লবীদের মধ্যেও তিনি সকলের চেয়ে অগ্রণী।

অরবিন্দের কংগ্রেস-বিরোধিতাই কি তাঁহাকে অনন্যোপায় হইয়া গুপ্ত-সমিতির সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিল ? কেননা, প্রকাশ্য বিদ্রোহ সম্ভব ছিল না। ১৮৯৩ খৃঃ তিনি ফরাসী বিদ্রোহের সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, আয়ারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ফরাসী বিদ্রোহের নেতাদের অনুকরণ তিনি ভারতবর্ষে করিতে পারেন নাই। সেইসকল ইতিহাস-বিখ্যাত নেতাদের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে না। আইরিশ সিন্‌-ফিন্‌দের অনুকরণে যদি তিনি বাংলাদেশে গুপ্তসমিতি প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তবে কতকটা তুলনা চলিতে পারে। কিন্তু খুব বেশী দূর নয়। আনন্দমঠের শেষটা বিয়োগান্ত, কাজেই অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

কলিকাতার থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে উজ্জ্বল আলোকের সম্মুখে যেকালে ক্ষীরোদ প্রসাদের প্রতাপাদিত্য দিল্লার বাদশাহের সেনাপতি মানসিংহের সহিত অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিতেছে; এবং সরলাদেবীর প্রতাপাদিত্য বাগবাজার হইতে বালিগঞ্জের বালক সঙ্ঘকে উৎসবে ডাকিয়া আনিয়া লাঠি-তলোয়ার হাতে কম্পান্বিত কলেবর করিয়া তুলিতেছে—ঠিক সেই সময় অমানিশার অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতি ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া সারকুলার রোডের ১ম কেন্দ্র হইতে গ্রে-ষ্ট্রীটের ২য় কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

১৯০৪ খৃঃ অরবিন্দকে আমরা বরোদা হইতে এই গ্রে-ষ্ট্রীটের ২য় কেন্দ্রে আসিয়া উঠিতে দেখিতে পাই। তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য যতীন ও বারীনের মধ্যে উপনেতৃত্ব লইয়া যে কলহের সৃষ্টি হইয়াছে, তা মিটাইয়া দেওয়া। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নতুবা তিনি আসিবেন কেন ?

অরবিন্দ ২১বৎসর বয়সে কংগ্রেসকে আক্রমণ করিলেন অতিশয় ধারালো লেখনীমুখে; আর ত্রিশ বৎসর বয়সে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে রিভলবারের গুলী আর বোমা নিক্ষেপে। কংগ্রেস হইতে গভর্ণমেণ্টের দিকে তিনি মুখ ফিরাইলেন। লেখনী ছাড়িয়া রিভল-বার হাতে তুলিয়া নিলেন। বরোদা প্রবাসের দশ বৎসর পরে ইহাই তাঁহার অতি আশ্চর্য জীবন-ইতিহাস।

এবার লোক-সংগ্রহের পালা। যতীন্দ্র আসিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন, বারীন্দ্র আসিয়া লোক সংগ্রহ করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। কিন্তু

হেমচন্দ্র কাননগো লিখিয়াছেন যে, বারীন্দ্রের আগে যতীন্দ্রই প্রথম লোক-সংগ্রহের কৌশল দেখাইয়া গিয়াছেন।

"উক্ত 'খ' বাবু (যতীন্দ্র ব্যানার্জি) সিক্রেট সোসাইটির নতুন সভ্য জোটাবার যে-সকল কৌশল আমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তা থেকে অনেক নতুন জিনিষ এঁর কাছে পেলাম। যেমন লাঠি ও তলোয়ার ঘুরোন, কুস্তি, বক্‌সিং ইত্যাদি শেখা। আর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হ'তে হলে তলোয়ার সাক্ষ্য করে গীতা ছুঁয়ে দীক্ষা নেওয়া। ...তখনকার ভাব আমার বেশ মনে আছে। চার-পাঁচ বছরের মধ্যে দেশ থেকে ইংরেজ চলে যাবে। দেশ এক-দম স্বাধীন হবে। নিজেদের রাজা হবে।

"তারপর স্বাধীন ভারতে স্বাধীন দেশবাসীর সামনে আমরা একএকটা দেশ-উদ্ধারকারী বলে পূজ্য হব। যুবকদের নিয়ে শিকারে যেতাম ; বাইক চড়তে, বন্দুক ছুড়তে, আর নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করতে শেখাতাম।

"খ-বাবু (যতীন্দ্র) যা আওড়েছিলেন তার সারমর্ম্ম—সমস্ত ভারত ইংরেজ তাড়াবার জন্যে তয়ের। করদ রাজ্যগুলি এবং প্রত্যেক প্রদেশের লক্ষ লক্ষ সৈন্য তলোয়ার সানাচ্ছে। এমন কি নাগা গারো ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতিদেরও হাজার হাজার লোক পায়তাড়া দিচ্ছে। খালি বাংলা প্রদেশ তয়ের নয় বলে আটকে বসে আছে। কামান বন্দুক প্রভৃতি হাতিয়ারের ভাবনা একটুও নেই। জেনারেল কাপ্তেনও তয়ের, কিন্তু বাঙ্গালী কমাণ্ডার ও কাপ্তেন ত চাই ? যে আগে যোগ দেবে তাকেই এইসব পদগুলি দেওয়া হবে।"—(বাং-বি-প্র—পৃ: ১১।১৩।২৬)।

তারপর হেমচন্দ্র লিখিতেছেন—

"এরকম আজগুবি গল্পও সত্য বলে হজম করে ফেলেছিলাম"—(পৃঃ ১১)। শুধু যতীন্দ্র নয়, বারীন্দ্রও এই রকম সব মিথ্যা আজগুবি গল্প বলিয়া তাঁহার "গনগনে আগুনে গড়া তরুণ প্রাণের ছোঁয়াচ লাগিয়ে তরুণ ধরবার ব্যবস্থা" করেছিলেন। হেমচন্দ্র কাননগো ইহাকে "সৎউদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা প্রতারণা অর্থাৎ pious বা honest fraud" বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যঙ্গও তিনি সেদিন সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

লোক-সংগ্রহের এই মিথ্যা প্রতারণার কৌশল—যা যতীন্দ্র ও বারীন্দ্র অবলম্বন করিয়াছিলেন, তা কি অরবিন্দের অবিদিত ছিল, না অরবিন্দের নিকট

গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্ত তাঁহার দুই শিষ্য ভবিষ্যতে এরূপ হতেও ত পারে ('truth in anticipation') ভাবিয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন? অরবিন্দের মত লোক গুপ্তসমিতির নেতা, আর সে অরবিন্দের মহিমান্বিত চরিত্র ও ব্যক্তিত্বই তরুণদের মনে মিথ্যাপ্রচারকে সত্য বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়াছিল—ইহা সম্ভব।

কোন্ শ্রেণীর তরুণেরা যতীন্দ্র ও বারীন্দ্রের এই সত্য-মিথ্যা প্রচারের ফলে দলে আসিয়া ভিড়িয়াছিল? হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"স্বল্পশিক্ষিত যুবকেরা ঝাঁপিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে খাস কল্‌কাতাবাসী কম ছিল। তাদের পনের আনাই কল্‌কাতার বাইরের ছেলে। নতুন ভাব গ্রহণের প্রবৃত্তি (innovation) কলকাতার মত বড় সহরের যুবকদের চাইতে পল্লী যুবকদের বেশী বলে আমার মনে হয়।"

"এ কাজে সরকারী ছোটবড় কর্ম্মচারীদের মধ্যে, এমন কি পুলিশের কাছেও বরং সাড়া পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু জমিদার শ্রেণীর মধ্যে সব চেয়ে কম সাড়া পেয়েছি"।—(পৃঃ ২৬-২৭)।

অরবিন্দের গুপ্তসমিতির ১ম পর্ব্বের লোক-সংগ্রহ ও টাকা-সংগ্রহ ব্যাপার আশানুরূপ কিছুই হয় নাই। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"আসল কেন্দ্র কলকাতাতেই প্রায় দু'বছরে প্রস্তুত হয়েছিল (?) একটিমাত্র ঘোড়া, একখানিমাত্র বাইক, না হয় আরও ঐ রকম কিছু; আর জুটেছিলেন আন্দাজ এক ডজন নেতা ও উপনেতা, খুব বেশী হয়ত জোনা চার-পাঁচ সর্ব্বস্বপণকারী ভাবী সেনাস্থানীয় চেলা এবং জনকয়েক মাত্র আধ-চেলা। গুপ্তসমিতির কাজ যে স্রেফ্ কিছুই হচ্ছিল না, তা বুঝতে একটুও বেগ পেতে হয় নি"।—(পৃঃ ২৯)।

১ম পর্ব্বের এই ব্যর্থতার কথা, ২য় পর্ব্বের অভিযানের মুখে বোম্বাই সহরে সুরাট-কংগ্রেস ভাঙ্গিবার অব্যবহিত পরে (১৯শে জানুয়ারী, ১৯০৮) অরবিন্দ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। গুপ্তসমিতির কথা প্রকাশ্য বক্তৃতায় কেহ ঘোষণা করে না। অরবিন্দ তাহা করেন নাই। তবে ১ম পর্ব্বের সময় যে তিনি বাংলা-দেশে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিজে আসিয়াছিলেন এবং অবস্থা দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করিয়াছেন :

"When I went to Bengal *three or four years before the Swadeshi Movement was born*—to see what was the hope of

revival, what was the political condition of the people, and whether there was the possibility of a real movement—what I found there was that the prevailing mood was apathy and despair."—(*The Present Situation*—a Lecture at Bombay; 19th January, 1908.)

স্বদেশী আন্দোলনের তিন অথবা চার বৎসর পূর্ব্বেই অরবিন্দ তাঁহার গুপ্ত-সমিতির ১ম পর্ব্বের অভিযান সুরু করেন। সেই কথাই আমরাও বলিতেছি।

যতীন্দ্র ও বারীন্দ্রের মধ্যে কলহ: এই কলহ তুচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া অরবিন্দের চরিত্রে পক্ষপাতিত্বের দোষারোপ করা হইয়াছে, এবং নেতা হইবার যোগ্যতা তাঁহার আছে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ করা হইয়াছে। সুতরাং অরবিন্দের জীবন-চরিত আলোচনায় ইহার গুরুত্ব আছে, উপেক্ষা করা যায় না।

—বিপ্লবের কাজে যতীন্দ্রই তাঁদের প্রথম নেতা।

—বারীন ও দেবব্রত বসু যতীন্দ্রের সহিত কলহ করেছিল। কারণ যতীন্দ্রের দাম্ভিক মিলিটারী মেজাজ তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ যতীন বারীনদের কোণঠেসা করিয়া নিজেই একা হাম্‌বড়া হইতে চাহিয়াছিল।

("Jatindra Nath our first revolutionary leader and myself and Devabrata Bose quarrelled simply because we did not want Jatin with his proud abrupt military temperament to boss the show and brush us aside to a secondary position."—(*Barindra K. Ghose—Dawn of India*; *Dec. 22, 1933*)। স্পষ্ট কথা, কোন ঘোরপ্যাঁচ নাই।

হেমচন্দ্র বারীন্দ্রের বিরুদ্ধবাদী। তিনিও বারীনের কয়েক বৎসর আগে (৫ বৎসর ত বটেই, ৭ বৎসরও হইতে পারে) কলহের কারণ সম্পর্কে ঠিক একই কথা লিখিয়াছেন। তবে তিনি আর একটা কথা বেশী লিখিয়াছেন যা বারীন স্পষ্ট লেখেন নাই, কিন্তু কিছুকাল আগে (২৭।১।৪২) মুখে স্বীকার করিয়াছেন। কথাটা যতীন্দ্রের এক বিধবা যুবতী ভগ্নী সম্পর্কে। ভাল কথা নয়। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"এই সময় উপনেতাদের মধ্যে 'খ' বাবুই (যতীন্দ্র) সবচেয়ে কর্ম্মপ্রবণ ছিলেন বলে তখনকার নেতাদের, বিশেষতঃ 'ক'বাবুর (অরবিন্দ) দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। তাই একাল পর্য্যন্ত তাঁর প্রভাব অপ্রতিহত ছিল। তাঁর

স্বভাবের মধ্যেও কর্ত্তৃত্ব-স্পৃহা খুব প্রবল ছিল। তার উপর তিনি ছিলেন মিলিটারীম্যান অর্থাৎ সৈনিক পুরুষ। তাঁর মেজাজ ছিল—'জাঁন্ড্রেলের' মত। চেলাদের ওপর তিনি তাঁর এই 'জাঁন্ড্রেলী' পুরোমাত্রায় চালাতেন" ।—(পৃঃ ৩৭)।

"আমাদের বারীন অন্যের প্রদর্শিত পথে চলতে দুনিয়ায় আসে নি, অন্যকে পথ দেখাতেই এসেছে। —এই প্রকারের কথা বারীনের মুখে অনেকবার আমরা শুনেছি। কাজেও তাই ঘটেছিল। ক-বাবু (অরবিন্দ) ক্রমে ক্রমে বারীনের চোখে দেখতে, বারীনের কান দিয়ে শুনতে এবং বারীনের মুখ দিয়ে বলতে সুরু করে দিলেন।"

"বারীন এযাবৎ 'খ'-বাবুর (যতীন্দ্র) কর্ত্তৃত্ব মেনে চলতে বাধ্য হয়েছিল। এখন যদিও সকল নেতা-উপনেতা, এমন কি হবু-নেতা পর্য্যন্ত তার প্রতিদ্বন্দ্বী—তবু 'খ'-বাবুকে তাড়ান তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল, সুযোগও জুটে গেল।"

"খ-বাবুর এক যুবতী আত্মীয়া সারকিউলার রোডের কেন্দ্রে থাকৃত। তার স্বভাব-চরিত্র শুনেছিলাম ভাল ছিল না। তাই 'খ'-বাবু তাকে সুমতি দিয়ে সংশোধনের চেষ্টায় ছিলেন। তা সত্ত্বেও সেই যুবতী নাকি কারো কারো পরকীয়া সাধনের সুযোগ দিতে চেষ্টা করেছিল। সেকালে রাজনীতির ভেতর এত ধর্ম্মভাব ঢোকেনি। তাকে নিয়ে একটু-আধটু প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাকি চলেছিল। নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী 'খ'-বাবুকে ঘায়েল করবার জন্য তাঁর ও ঐ যুবতীর মধ্যকার সম্বন্ধটা দূষিত বলে 'ক'-বাবুর (অরবিন্দ) কাছে বারীন যথারীতি রিপোর্ট করেছিল।

"একতরফা বিচারে 'ক'-বাবু 'খ'-বাবুকে তাড়িয়ে দিতে হুকুম দিলেন। ফলে সারকিউলার রোডের আড্ডা উঠে গেল। 'খ'-বাবু অন্যত্র পৃথক্‌ভাবে দল গঠন করতে লাগ্‌লেন। আর বারীনের নেতৃত্বে গ্রে-ষ্ট্রীটে নূতন কেন্দ্র স্থাপিত হ'ল" ।—(পৃঃ ৩৮)।

"সত্যেন বারীনের মামা। বারীনের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করে চলা তাঁদের পক্ষে হয়ে উঠ্‌ত না। তাছাড়া এঁদের মধ্যে বারীন হবু-প্রতিদ্বন্দ্বীর বীজ বোধ হয় দেখতে পেয়েছিল। সত্যেন তখন ঐ কেন্দ্রেই থাকত। তাই সত্যেনকেও ঘায়েল করবার জন্য উক্ত যুবতীকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় নি। সত্যেন বিতাড়িত হয়েছিল।"

দেখিতেছি শুধু যতীন্দ্রকে নয়, তাঁর মাতুল সত্যেন বসুকেও বারীন 'ম্যানেল' করিয়া অরবিন্দের দ্বারা বিতাড়িত করিলেন। দল ভাঙ্গিয়া—প্রথমে খণ্ড খণ্ড দলে ছড়াইয়া পড়িল, শেষে একেবারে লণ্ডভণ্ড হইয়া ছত্রছান হইয়া গেল। ইহাকেই আমি বলিয়াছি—বিচ্যুতি। বিচ্যুতিতেই ১ম পর্ব্বের অবসান। এই ব্যর্থতায় পরিণতির জন্য অরবিন্দ পরোক্ষে এবং অপরোক্ষে দায়ী হইতেছেন—বারীন্দ্র। তখনকার ভুক্তভোগী অভিজ্ঞ একদলের ইহাই সুস্পষ্ট অভিমত। সেই অভিমতের মুখপাত্র হইতেছেন হেমচন্দ্র।

এখন প্রশ্ন: বোমারু বারীন একজন বিধবা যুবতীকে অস্ত্ররূপে গ্রহণ করিলেন কেন? তারপর প্রশ্ন, গুরুতর প্রশ্ন: বারীন এতটা নীতিবাগীশ হইলেন কিরূপে? তিনি তাঁহার 'আত্মকথায়' নিজের অতীত জীবনকাহিনী এমন নির্লজ্জ—আচ্ছা না হয় বলিলাম, এমন নির্ভীকভাবে—স্থানে স্থানে দম্ভের সহিত মনস্তত্ত্বের বিজ্ঞান মিশ্রিত করিয়া সমর্থন করিয়াছেন যে, চরিত্রদোষ সমর্থনকারীদের মধ্যে আধুনিক তরুণ সাহিত্যেও তাঁহার স্থান কারু অপেক্ষা নীচে নয়! তবে হঠাৎ যতীন আর সত্যেনের আনুমানিক অথবা কল্পিত চরিত্রদোষের জন্য তিনি সহসা এতটা বিচলিত হইলেন কেন? গুপ্তসমিতির সদরদরজায় চরিত্রদোষের প্রবেশ নিষেধ যদি অনিবার্য্য হয়, তবে তিনি প্রবেশ করিলেন কিরূপে? প্রবেশের পরে যদি বিতাড়িতই হইতে হয়, তবে যতীন আর সত্যেনের আগে বারীনের নিজের বিতাড়িত হওয়াই উচিত ছিল। কাজটা স্ববিরোধী হইয়াছে—সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নাই। সুতরাং সঙ্গত হয় নাই। অরবিন্দ সম্ভবতঃ এতটা বা এতসব কিছুই তখন জানিতেন না। তিনি তখন 'বারীনের চোখে দেখেন, বারীনের কানে শুনেন, বারীনের মুখে হুকুম প্রচার করেন।'

অরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি একতরফা বিচার করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শুধু বারীনের কথার উপর বিশ্বাস করিয়াই যতীনকে এবং সত্যেনকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ইহার কারণ কি? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধেয় হেরম্ব মৈত্র যদি গুপ্তসমিতির নেতা হইতেন, এই বিতাড়ন-কার্য্য অপরিহার্য্য এবং অবশ্যম্ভাবী ছিল—ইহা বুঝিতে পারি। কিন্তু অরবিন্দ ত হেরম্ব মৈত্র ছিলেন না। তবে? কেম্ব্রিজে থাকাকালীন অরবিন্দের তরুণ বয়সের প্রেমের কবিতা আমরা আলোচনা করিয়াছি,

স্বাধীন প্রেমের আবেগময় প্রকাশে (passion painting) তিনি অভিজ্ঞ সমালোচকদের দ্বারা কবি কিট্সের সহিত তুলনীয় হইয়াছেন, বঙ্কিম আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জীবনে স্ফূর্ত্তিকে উচ্চস্থান দিয়াছেন (Life's joy, warmth and sensuousness), নিবৃত্তিমূলক সন্ন্যাসকে (asceticism) কদাপি আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহার আবাল্য বিলাতী শিক্ষাদীক্ষা নারীজাতির সহিত স্বাধীন মেলামেশারই পক্ষপাতী— দুষণীয় কিছু নয়। তবে ?

অথচ এই যতীন্দ্র বরোদা থাকাকালীন অরবিন্দের কত বিশ্বাসভাজন ও প্রিয়পাত্র ছিল! যতীন্দ্র বরোদায় গিয়া সৈন্যবিভাগে ঢুকিবার জন্য নামের 'বন্দ্য'টুকু মুছিয়া বাঙ্গালীত্ব ঘুচাইয়া (কেননা, বাঙ্গালী সৈন্য হইতে পারে না—দেশীয় রাজ্যেও না) শুধু 'উপাধ্যায়'টুকু রাখিয়া যুক্তপ্রদেশের লোক বলিয়া সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিলেন। অরবিন্দই তাঁহার বন্ধু মাধো রাও যাদবকে (লেফ্‌টেন্যাণ্ট) দিয়া নাম ভাড়াইয়া যতীনকে সৈন্য করিয়া দিয়াছিলেন। শুধু কি তাই ? যতীন্দ্র পদোন্নতিপ্রাপ্ত হইয়া মহারাজের শরীররক্ষক সৈন্য পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তা-ও অরবিন্দই করিয়া দিয়াছিলেন। বরোদার ইংরেজ প্রেসিডেণ্ট খবর পাইলেন যে, একজন বাঙ্গালী সৈন্য হইয়াছে। অতি ভয়ঙ্কর কথা! খোঁজতল্লাস হইয়া রিপোর্ট হইল, মিথ্যে খবর। যতীন্দ্র বলিয়া যে একজন আছে, সে 'উপাধ্যায়', অতএব যুক্তপ্রদেশের লোক। বাঙ্গালী নয়। এ ব্যাপারে এবং এ সঙ্কটে অরবিন্দই যতীন্দ্রকে আশ্রয় দিয়াছেন, সাহায্য করিয়াছেন, রক্ষা করিয়াছেন। তখন বারীন কোথায় ? খুজিলে পাটনা সহরে কলেজের সামনে B. Ghose's Tea Stallএ বারীনকে তখন চায়ের পেয়ালা হাতে দেখা যাইবে।

'অরবিন্দের দক্ষিণহস্তস্বরূপ' যতীন্দ্র যেদিন অরবিন্দ কর্ত্তৃক অপ্রত্যাশিতভাবে বরখাস্ত হইলেন, সেদিন তিনি নিশ্চয় মনে মনে ভাবিয়াছিলেন "বড়র পিরীতি, বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ॥" শ্রীঅরবিন্দের আর একজন খ্যাতনামা শিষ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীমতিলাল রায় সম্ভবতঃ যতীন্দ্রের উপর এক্ষেত্রে সহানুভূতিসম্পন্নই হইবেন, এবং অরবিন্দ সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের পয়ারটি প্রাণ খুলিয়া সমর্থন করিবেন। কেননা, পরবর্ত্তীকালে দেখা যাইবে যে, তিনিও একজন ভুক্তভোগী। সত্যেনকেও অরবিন্দ বারীনের কথায় বিতাড়িত করিলেন।

বিপ্লবকর্ম্মে বারীন অপেক্ষা সত্যেনের, ভাগিনেয় অপেক্ষা মামার যোগ্যতা ঢের বেশী। আলিপুর জেলে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সত্যেন নরেন গোঁসাইকে জেলের মধ্যে খুন করিয়া ফাঁসী না গেলে, নরেন গোঁসাইয়ের সাক্ষ্য আদালতে গৃহীত হইত। তখন অরবিন্দের প্রাণে বাঁচা দায় হইত। ইহা মিঃ সি. আর. দাশ আমাদিগকে বলিয়াছেন। বারীন নয়, সত্যেন নিজের প্রাণ দিয়া অরবিন্দের প্রাণ বাঁচাইয়া গিয়াছেন। অরবিন্দ প্রথম পর্ব্বের কর্ম্মীদের ঠিক-মতো চিনিতে পারেন নাই।

বৈপ্লবিক কর্ম্মের যোগ্যতা যতীন্দ্র ও বারীন্দ্রের কতখানি, অরবিন্দ তখন সে বিচার করিলেন না। তিনি বিচার করিলেন দুরভিসন্ধিমূলে কল্পিত, নিতান্ত আনুমানিক একটা স্বাধীন প্রেমের (স্ত্রী লাভ ?) সহজগতি-উচ্ছ্বাস ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে। বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির কর্ম্মের সহিত ইহার কোনই সংস্রব নাই। আরও তলাইয়া দেখিলেন না যে—বারীন নেতৃত্বের অতিলোভে, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, প্রথম ও প্রধান বিপ্লবকর্ম্মী যতীন্দ্রের বিধবা যুবতী ভগিনীকে গৃহকোণ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া, তাঁর নামে সত্য-মিথ্যা একটা কলঙ্ক রটনা করিতেছে। বিলাতী সিভাল্‌রী (chivalry)তেও ইহা দুষণীয় বলিয়াই গণ্য হইবে।

যতীন্দ্রের ভগিনীর কোন কথাই ইতিহাস জানিতে পারিল না। তাঁরও ত কিছু বলিবার থাকিতে পারিত ? অরবিন্দও তাহা শুনেন নাই। প্রয়োজন মনে করেন নাই। বাঙ্গালীর মেয়ে। ইতিহাস মৃত্যুর আঁধার-যবনিকাকে দুই হাতে সরাইয়া দিয়া মৃত ব্যক্তিকে জীবিতদের মধ্যে টানিয়া আনে। যতীন্দ্রের মৃত ভগিনী যদি আজ ফিরিয়া আসে তবে বাংলার এই বোমারু বীরদের শুধু একটি কথা বলিয়াই অন্তর্হিত হইবে—'কাপুরুষ' !

অরবিন্দ এক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। স্নেহাতিশয্যে বারীনের প্রতি পক্ষপাতিত্বই করিয়াছেন। এমন হয়। মানুষ ভুল করে। সে ভুলের জন্য তাকে ভুগিতে হয়। অরবিন্দকেও ভুগিতে হইল।

হেমচন্দ্র লিখিতেছেন—

"এই প্রকারে বারীনের সঙ্গে ঝগড়ায় একতরফা রায়ের ফলে ক-বাবুর (অরবিন্দ) সঙ্গ যাঁরা ত্যাগ করতে সুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত

ব্যারিষ্টার সাহেব (পি. মিত্র) একজন। ...বারীনের উপনেতৃত্বে ক-বাবুর (অরবিন্দ) ওপর যে অনেকের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল—তা একটু বিচলিত হয়েছিল। খ-বাবুকে (যতীন্দ্র) ক-বাবুর (অরবিন্দ) সঙ্গে মেলাবার বৃথা চেষ্টাও অনেকে করেছিলেন।"—(পৃঃ ৩৮-৩৯)।

ব্যারিষ্টার পি. মিত্র তখন কলিকাতার প্রধান কেন্দ্রের প্রধান সভাপতি, তিনি বারীনকে ইষ্ট ক্লাব ভাঙ্গার সময় বিলক্ষণ জানেন। আর যতীন্দ্রকে ত জানেনই।

তিনি মনে করিলেন, অরবিন্দের বিচার ভুল। শুধু মনে করিলেন না, তিনি অরবিন্দকে ত্যাগ করিলেন। আরো অনেকের, যাদের 'প্রগাঢ় ভক্তি' ছিল অরবিন্দের উপরে, তাদের ভক্তির গাঢ়তা কিছু তরল হইল।

সরলা দেবী যতীনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন; অরবিন্দর বিচারে তিনিও ক্ষুব্ধ হইলেন।

ভূপেন দত্ত তখন ঐ দলের একজন প্রধান কর্মী। তিনি ১৯৪১ খৃঃ আমাকে বলিয়াছেন যে, অরবিন্দ বারীনের উপর পক্ষপাতিত্ব করিয়া যতীনের উপর অবিচার করিয়াছিলেন।

অরবিন্দের এই বিচারের ফলে প্রেসিডেণ্ট পি. মিত্র হইতে সাধারণ প্রগাঢ় ভক্তিপূর্ণ কর্ম্মীরা পর্য্যন্ত অরবিন্দের নেতৃত্বে কেহ সম্পূর্ণ আস্থা হারাইল, অপর কেহ কেহর আস্থা অনেকটা টোল্ খাইল। শেষপর্য্যন্ত দুই বৎসরের চেষ্টায় যা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তা ভাঙ্গিয়া গেল।

এখন এর পরেও বারীন কী বলেন শোনা উচিত। এই বৎসর জানুয়ারীর শেষে (২৭।১।৪২) বারীন বলিয়াছেন:

"দেবব্রত, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, সুরেশ সমাজপতির ভাই কিম্বা ছেলে ইহারা যতীনের সহিত যতীনের ভগ্নীর থাকা সম্পর্কে আপত্তি করিয়াছিল। তাহারা সন্দেহ করিয়াছিল যে, ঐ বিধবা যুবতীটি যতীনের ভগিনী নয়। যতীনের স্ত্রীও অবশ্য যতীনের সঙ্গেই থাকিতেন। যতীন তার নিজের পায়ের পাতার গড়নের সহিত তাহার ভগিনীর পায়ের পাতার গড়ন একত্রে মিলাইয়া প্রমাণ করিল যে, তাহারা ভ্রাতা ও ভগিনী। যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ এই ঝগড়া মিটাইয়া দেন।

"এই ঝগড়ার ফলে অরবিন্দ ও বারীন বাঙলা ত্যাগ করিয়া যান নাই। তাঁহারা দেখিয়া নিরাশ হইলেন যে, বাঙলাদেশে তখনকার অবস্থায় সিক্রেট সোসাইটী গঠন করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার (* ক)।

বারীনের কথা হইতে আমরা পাইলাম যে, যতীন সস্ত্রীক সার্কুলার রোডের কেন্দ্রে বাস করিতেন। তাঁহার বিধবা ভগ্নী তাঁহার স্ত্রীর সহিত এক বাড়ীতেই থাকিত এবং ঐ বিধবা যুবতীটি যে যতীনের সহোদরা ভগ্নী, তাহাও তিনি সর্ব্বসমক্ষে প্রমাণ করিলেন। এর পরে আর কি কথা থাকিল? বারীন স্পষ্ট বলিতেছেন, যতীনের ভগ্নী কলহের কারণ নয়। ঠিক কথা। আমাদেরও তাহাই মনে হয়। কলহের কারণ, বারীনের মতে, বাঙলাদেশে সিক্রেট সোসাইটী গড়া কঠিন। কর্ম্মীদের মধ্যে ক্রমাগত ঝগড়াঝাটি চলিতেছিল। আমরাও তাই বলি, হেমচন্দ্রও তাই লিখিয়াছেন। ভূপেন দত্ত প্রভৃতি আর সকলেও তাই বলেন। ঝগড়ার কারণ, বারীন যতীনকে তাড়াইয়া নিজে নেতা হইতে চান। তাঁহার মামা সত্যেনকে সেই জন্য তাড়াইতে চান। সেই জন্যই সত্যেনের সহিত যতীনের ভগ্নীর নামে একটা কল্পিত অপবাদ রটনা হয়। অরবিন্দ এসব কিছুই তলাইয়া দেখিতে পান নাই। আর যদি দেখিয়াও তিনি না-দেখিয়া

(* ক) "The quarrel with Jatin Banerjee was a very minor thing. Jatin's sister was of a romantic type and some boys at the centre fell under her influence. B. G. (Barindra) and Debabrata and specially Suresh Samajpati's son (brother ?) objected to Jatin keeping his sister with him. They suspected, she was not his sister. Jatin proved by the same peculiar type of feet that she was his sister. The quarrel was amicably settled by Jogen Vidyabhusan, who took interest in Jatin Banerjee and who was recruited by him. The cause for Barin and Arabindo leaving Bengal was not the quarrel. They were disappointed and found that it was difficult to establish a secret socity in Bengal.······There were continual quarrels.······You can find out everything about this time from Abinash Bhattacharya."—[বারীন্দ্রের নিকট হইতে এই সংবাদ ২৭।১।৪২ তারিখে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।]

থাকেন, তবে বারীনকে তিনি অযথা প্রশ্রয় দিয়াছেন। এবং তাহার ফল ভাল হয় নাই।

আর সকলকে দাবাইয়া আমি নেতা হইব এবং হবু-প্রতিদ্বন্দীদের একটা বিধবা যুবতীর সহিত কলঙ্ক রটাইয়া ছাঁটিয়া ফেলিব—এই যে প্রবৃত্তি এবং তার নির্লজ্জ প্রকাশ যাহা আমরা দেখিলাম, এ চিত্র অতি কলঙ্কের। এবং এই কলঙ্ক বাঙলাদেশের গুপ্ত বা প্রকাশ্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি অনুশীলন ও যুগান্তরের দলাদলির মধ্য দিয়া—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দেহত্যাগের পরেও যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্রের মধ্য দিয়া আজ চল্লিশ বৎসর সমান প্রবাহিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে।

অরবিন্দের বোম্বাইয়ের বক্তৃতা হইতে দেখাইয়াছি যে, তিনিও এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে—বাঙলাদেশ তখন প্রস্তুত নয়। বারীন্দ্রও সেই কথা বলিলেন, "It was difficult to establish a secret society in Bengal." অরবিন্দ বলিলেন ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে, তার ৩৪ বৎসর পর বারীন বলিলেন ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে, একই কথা। উভয়েই বাঙলাদেশের তৎকালীন কর্ম্মীদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দুই ভ্রাতা বাঙলা ত্যাগ করিয়া দেওঘর হইয়া বরোদায় চলিয়া গেলেন। নেতারা নিজেদের দোষ কিছুই দেখিলেন না। নেতারা নিজের দোষ সম্বন্ধে অন্ধ। কিন্তু কর্ম্মীরা নেতাদের দোষ দেখিতে পাইল। হেমচন্দ্র লিখিতেছেন—

"যদি 'ক' বাবু (অরবিন্দ) নেহাৎ থিওরিটিক্যাল না হ'তেন অথবা তাঁর থিওরি কাজে পরিণত করবার জন্য একজন যোগ্য কর্ম্মী জুটত, তা'হলে এই ধর্ম্মসম্বন্ধবিহীন গুপ্তসমিতির কার্যের ঠিকমত প্রসার আরও হয়ত বাড়ত। কিন্তু তা না হয়ে যখন বারীনের গ্রে-ষ্ট্রীটের আড্ডা ভেঙ্গে গেল, 'ক' বাবু হতাশ হয়ে পড়লেন"।—(পৃঃ ৬৮)।

আমরা যে-যুগে বাস করিতেছি এ বড় কঠিন যুগ। পরব্রহ্ম হইতে পরাণ মল্লিক কেহই সমালোচনার হাত এড়াইতে পারেন না। অরবিন্দও পারেন নাই। যতীন ও বারীনের মধ্যে কলহ মিটাইবার জন্য অরবিন্দ ১৯০৪ খৃঃ বরদা হইতে আসিয়া বারীনের গ্রে-ষ্ট্রীটের কেন্দ্রে উপস্থিত

হন। সুতরাং অরবিন্দ আসিবার পূর্ব্বেই বারীন, যতীনের সার্কুলার রোডের কেন্দ্র ছাড়িয়া গ্রে-ষ্ট্রীটে স্বাধীনভাবে তাঁর নিজের যতীন্দ্র-বিরোধী পৃথক দল ও আড্ডা স্থাপন করিয়াছেন। বারীনের সমর্থনকারী অরবিন্দও এই কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এসকল কথা বারীন স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন (* খ)। অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্তসমিতির প্রথম পর্ব্ব ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া যতীন ও বারীনের ঝগড়া হইয়া সার্কুলার রোডের প্রথম কেন্দ্র ভাঙ্গিয়া গ্রে-ষ্ট্রীটের দ্বিতীয় কেন্দ্রে আসিয়া ধারা শুকাইয়া গেল। আর প্রবাহিত হইল না। প্রথম পর্ব্বের বিধবা যুবতীঘটিত কেলেঙ্কারীর উপর ইতিহাস যবনিকা টানিয়া দিল।

মিঃ নর্টন ও মিঃ সি. আর. দাশ ঃ ১৯০৮ খৃঃ অরবিন্দের বোমার মামলায় মিঃ নর্টন বলিয়াছিলেন যে, ১৯০২ খৃঃ অরবিন্দ বারীন্দ্রের মনে বিপ্লবাত্মক গুপ্তসমিতির বীজ বপন করিয়া বারীনকে দিয়া গুপ্তসমিতির কাজ বাঙলাদেশে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। মিঃ নর্টন ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন। আমরাও এতক্ষণ সেই কথাই বলিয়া আসিতেছি। কিন্তু হইলে কি হয়, মিঃ সি. আর. দাশ তাঁহার অপূর্ব্ব কৌশলপূর্ণ জবাবে এই সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ

(* খ) "The first visit was in about 1904 when there was a serious split among the leaders of the secret movement and Sri Aurobindo stayed in a room near the junction of Grey Street and Raja Nabokissen Street over a stable, and tried to smooth matters over between me and Jatindranath Banerjee (later on Niralamba Swami, who became a co-shadhak with the famous Soham Swami). But the silly squabblings had so much disillusioned us that we two brothers left for Deoghar and from there to Baroda after hastily patching up things··· We left the workers in the lurch and out of disgust and despair Jatindra renounced the world and went away to the Himalayas. In my autobiography *Barindrer Atmakahini*, I have given glimpses of this dark period of our life and some salient events connected with Aurobindo of the underworld"—[*Dawn of India*, 15th Dec. 1933—Barindra K. Ghose]

করিয়াছেন (* গ)। আইনের কূট তর্কজালে এবং চিঠিপত্রের প্রমাণ-প্রয়োগে মিঃ সি. আর. দাশ নর্টনের যুক্তিকে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। মিঃ দাশের সেই অদ্ভুত বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা আমরা বারম্বার পাঠ করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। মিঃ দাশ অরবিন্দকে ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে বাঁচাইবার জন্যই অরবিন্দের গুপ্তসমিতির প্রথম পর্ব্বের সত্য ইতিহাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি ইতিহাস লিখিতে বসেন নাই। মক্কেলের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এবং অরবিন্দের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের এই কার্য্য অরবিন্দ বহু বৎসর পরে সমর্থন করিয়াছেন। অরবিন্দ বলেন—মক্কেলকে দোষী জানিয়াও তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য কৌশুলীর মিথ্যা বলা কর্ত্তব্য। ("... lawyer's to do his best for his client even if he knows him to be guilty and his defence to be a lie."—*Essays On The Gita—Vol. I p. 50 ; 3rd Ed.* 1937. by Sri Arabindo.]

(* গ) *Extracts from Deshbandhu Das's Address in the Alipore Conspiracy Case* :

"I now deal with the evidence referred to by my learned friend (Mr. Norton) to show the inner work of Aurobindo—1902 down to the day of his arrest. You will find, gentlemen, that upto 1902 or 1903 there was no connection with Barin and Aurobindo."

"We find him (Barin) in Baroda in 1902 and 1903. My learned friend's argument is that it was during his stay in Baroda in 1902 and 1903 that the seeds of revolution were sown in the hearts of Barindra by Aurobinda."

"The two brothers first met at Baroda. After a time, Barin left Baroda and engaged himself in preaching the cause of independence of the country. From that my learned friend argued that the poison must have been infused into Barin by Aurobindo. The best way to test that would be from what Aurobindo himself says at that time when they were together at Baroda in 1902 and 1903. There are only three exhibits 292-1, 292-3 and 292-5. I am not aware of any other letters of that period. Exhibits 292-1 is a letter dated the

বয়স বত্রিশ বৎসর (১৯০৪।১৫ই আগষ্ট--১৯০৫।১৪ই আগষ্ট) :

অরবিন্দের বরোদায় প্রত্যাবর্ত্তন ★ ১ম পর্ব্বের ব্যর্থতার কারণ ★ ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া—অলৌকিকত্বের মোহ ★ বরোদায় রমেশ দত্ত ★ অরবিন্দ-পরিত্যক্ত বাংলার বিপ্লবী কর্ম্মীদের দুরবস্থা ★ বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ-আন্দোলন ★ বোম্বাই কংগ্রেস (১৯০৪ ; সভাপতি—স্যার হেনরি কটন) ★ লর্ড কার্জ্জনের 'কনভোকেশন' বক্তৃতা ★ ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' ★ লর্ড কার্জ্জনের পদত্যাগ ★ পাঠান আমলে বঙ্গ-বিভাগ ★ মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ★ লর্ড কার্জ্জনের ভেদনীতি-বনাম-অখণ্ড বাংলার আদর্শ ★ বঙ্গ-ভঙ্গে অরবিন্দের অভিমত ★ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু

বাংলা সাহিত্য—

(ক) রবীন্দ্রনাথ

(খ) নাট্যকার ডি. এল. রায়

(গ) বাংলা সংবাদপত্রসমূহ

অরবিন্দের বগলামূর্তি পূজা ★ বঙ্গ-ভঙ্গের পরবর্ত্তী ইতিহাস ★ অরবিন্দের হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত যোগ-সাধন

2nd of July, 1902. How do you find sedition or waging of war against the Government in this letter ?"

"With regard to the reference to Jyotindra, I shall deal later on. Aurobindo wanted horoscope of his wife to show to Jyotindra who was an astrologer in the Baroda service. I want to deal later on with Jyotindra and see if he was the accused who has since then discharged. It was in 1902. That does not help the case for the prosecution at all. Amongst these letters I have just mentioned there is another letter dated the 20th of August, 1902. This letter refers to his promotion and so on. There is nothing important in that

অরবিন্দের বরোদায় প্রত্যাবর্তন: অরবিন্দ-প্রবর্তিত বিপ্লবাত্মক গুপ্ত-সমিতির ১ম পর্ব ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি কলিকাতা হইতে দেওঘর হইয়া পুনরায় বরোদায় তাঁহার কর্মস্থলে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিবার জন্য ফিরিয়া যাইতেছেন; সঙ্গে আছে বারীন। ("We two brothers left for Deoghar and from there for Baroda."—*Barindra K. Ghose—Dawn Of India; 15th Dec, 1933*).

দুঃসাহসে দুঃখ হয়। অরবিন্দ দুঃসাহস করিয়াছিলেন। তাঁহার দুঃখ হইবারই কথা। তাঁহার ১ম পর্বের ব্যর্থতার কথা মনে করিয়া এই সময়ের তিন বৎসর পরে তিনি নিজেই বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে: বাংলাদেশের লোকেরা হতাশ হইয়া বসিয়া আছে, নিজেরা কিছুই করিবে না, অন্য কোন জাতি আসিয়া যদি তাদের হাতে ধরিয়া উদ্ধার করে, তবেই হয়—নতুবা নয়। ("When I went to Bengal three or four years before the Swadeshi Movement was born and what I found was *apathy* and *despair*. People had believed that regeneration could only come from outside, that *another nation would take us by the hand* and lift us up, and that we have nothing to do for ourselves."—*A Lecture at Bombay; 19th January, 1908*. বারীন্দ্রও লিখিয়াছেন, প্রথম পর্বের ব্যর্থতা আমাদের চক্ষু হইতে মরীচিকা অপসারিত করিয়া দিয়াছিল—disillusioned us। আমরা বলি—দেরি নাই। যেহেতু কি অরবিন্দ কি বারীন্দ্র কেহই তাঁহাদের নেতৃত্ব এবং উপনেতৃত্বের কোনরূপ দোষ বা ত্রুটি তখনো দেখিতে পান নাই। মারীচিকা ছিল, অপসারিত হয় নাই।

প্রথম পর্বের (১৯০২-১৯০৪ খৃ:) গুপ্তসমিতি প্রবর্তনে অরবিন্দ যে দুঃসাহস করিয়াছিলেন ভারতবর্ষে আর কেহ, কোন নেতাই তাহা করেন নাই। মহারাষ্ট্রে

---

letter except that soon before the time Aurobindo considers himself a strict member of the Hindoo society. These are all the letters which we get and which we preserved to give us an idea as to what the trend of his mind was in 1902. After that, as I have told you, Barin came away from Baroda and was engaged in preaching the cause of independence".

তিলক করেন নাই, পাঞ্জাবে লাজপত করেন নাই, বাংলায় বিপিনচন্দ্র এমন কি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় করেন নাই। সরলাদেবী অবৈপ্লবিক—তিনি স্পষ্ট ভয় পাইয়াছেন। অন্য সকলের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। তবে বাংলার নয়, আয়ারল্যাণ্ডের মেয়ে ভগিনী নিবেদিতা বিপ্লবে অগ্রণী, অরবিন্দের সহকর্ম্মিণী—তিনি সমানে অগ্রসর হইয়াছেন, সহানুভূতি তো নিশ্চয়ই দেখাইয়াছেন। বৈপ্লবিক কর্মে ভারতবর্ষে অরবিন্দের স্থান কোথায়, ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়। ইতিহাস এইখানেই তাঁহার অদ্ভুত চরিত্রের এক অতি দেদীপ্যমান বৈশিষ্ট্য অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। মুছিয়া ফেলিলে ইতিহাস বিকৃত হইবে, চরিত্রাঙ্কন নষ্ট হইবে। — মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইয়াছে।

অরবিন্দ সোজা বারোদায় গেলেন না, দেওঘরে থাকিলেন। দেওঘরের প্রতি অরবিন্দের একটা প্রবল আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণ তাঁহার মাতামহের স্মৃতি। দেওঘরের পুরন্দহের বাড়ী, অবারিত মাঠ, দিঘরীয়া পাহাড়, রোহিণীতে তাঁর পাগল-মা, বিশেষতঃ দেওঘর দ্বিতীয় পর্ব্বের গুপ্তসমিতির একটি কেন্দ্রস্থল। রোহিনীর সন্নিকট Seal's Lodgeএ দ্বিতীয় পর্ব্বে বোমা তৈয়ারীর কারখানা হইয়াছিল। অরবিন্দের নেতৃত্ব দ্বিতীয় পর্ব্বেও দেখিতে পাইব। দেওঘরের সহিত অরবিন্দের জীবন এক অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রে গ্রথিত। দেওঘরে বেশী দিন অপেক্ষা করিবার সময় নাই। বরোদায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১ম পর্ব্বের ব্যর্থতার কারণঃ গুপ্তসমিতির প্রথম পর্ব্ব ব্যর্থ হইল কেন? এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। হয়তো প্রত্যেকের মতেই কিছুটা সত্য আছে। কর্ম্মীরা দোষ দিলেন নেতা (অরবিন্দ) এবং উপনেতাদিগকে (যতীন, বারীন)। নেতা দোষ দিলেন উপনেতা ও কর্ম্মীদের। উপনেতার মধ্যে যতীন নিশ্চয়ই দোষ দিলেন নেতা অরবিন্দের এবং সহ-উপনেতা বারীন্দ্রের। আর নিশ্চয়ই বারীন দোষ দিলেন প্রতিদ্বন্দী উপনেতা যতীনকে। অরবিন্দের কোন দোষ দেখা বারীনের অসাধ্য—তা বুঝি। আমরা নিরপেক্ষ সমালোচক। দোষ ভাগাভাগি বণ্টন করিয়া দিলাম একসঙ্গে সকলকে—কাহারও কোন আক্ষেপ না থাকে।

পুলিস এখন যেমন সজাগ, তখন তেমন ছিল না। নাসিকায় সর্ষপ তৈল প্রদানপূর্ব্বক নিদ্রায় অভিভূত ছিল। কিছুই টের পায় নাই। সুতরাং কার

কি দোষ বিচারালয়ে উদ্‌ঘাটন করিতে পারে নাই। প্রথম পর্ব পুলিসকে বেমালুম ফাঁকি দিয়াছে। পুলিসের এত বড় অকর্ম্মণ্যতার উপর কর্ত্তৃপক্ষের কোনও কঠোর মন্তব্য এপর্যন্ত আমরা শুনি নাই। অথচ ১ম পর্ব্বে পুলিসের সহিত বিপ্লবীদের যোগসাজস ছিল, এমন কথাও কোন বিপ্লবী এপর্যন্ত বলেন নাই। আমরা দেখিতেছি—(ক) প্রধান নেতা অরবিন্দ নেহাৎ থিওরেটিক্যাল (theoretical) অর্থাৎ বৈপ্লবিক কর্ম্মে তাঁহার কোনই অভিজ্ঞতা ছিলনা বা নাই। ব্যর্থতার নিশ্চয়ই ইহা একটি কারণ। (খ) কর্ম্মিরা ছেলেমানুষ। বৈপ্লবিক কর্ম বাপের জন্মে করা দূরে থাকুক দেখেওনি—শোনেওনি। তাহাদের কোন শিক্ষা নেতা বা উপনেতারা দেন নাই। (গ) উপনেতাদের মধ্যে যতীনের যদিও বা কিছু প্রকাশ্য সামরিক শিক্ষা আয়ত্ত ছিল, কিন্তু গুপ্তসমিতির কোনও কার্যে তার প্রয়োগের অবসর ঘটে নাই। ভাববিলাসী বারীনের বৈপ্লবিক কর্ম্মে কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না। (ঘ) কর্ম্মিদের যে মিথ্যা ধাপ্পা দিয়া দলে ভিড়ান হইত তাহাতে ফল ভাল না হইয়া মন্দই হইয়াছে। গুপ্তসমিতির উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে কর্ম্মীদের আগাগোড়াই অন্ধকারে রাখা হইয়াছে। কাজটা অত্যন্ত সহজ বলিয়া তাহাদিগকে যে মিথ্যা ধাপ্পা দেওয়া হইয়াছে, এই মিথ্যা ধাপ্পা অচিরেই ধরা পড়ায় কর্ম্মিরা ভাগিয়া গিয়াছে। দলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। (ঙ) জনসাধারণ—যারা মধ্যবিত্ত নয়, কৃষক মজুর শ্রেণী—তাহাদের মধ্যে ইহার কোনই প্রচার হয় নাই। ফলে ইহা তাহারা জানিতেই পারে নাই। অথচ অরবিন্দ ১৮৯৩ খৃঃ ইন্দুপ্রকাশে অতি সাংঘাতিক রকমের প্রোলিটেরিয়েট-বাদী ছিলেন। মধ্যবিত্ত বুর্জ্জোয়াদের উপর—অন্ততঃ যাহারা কংগ্রেস করিয়াছেন, সেই শ্রেণীর উপর বেজায় চটা ছিলেন। কেননা, তাঁহারা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সৃষ্ট এক শ্রেণীর বিশেষ জীব। সুতরাং ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের কৃপাপ্রার্থী। অথচ আশ্চর্য যে, তিনিও এই মধ্যবিত্তশ্রেণী হইতেই অর্দ্ধশিক্ষিত ছোকরাদের লইয়া গুপ্তসমিতি গঠন করিয়াছিলেন। (চ) সর্ব্বশেষ, নামযশের কাঙ্গালী—অন্যকে সাবাইয়া নিজে নেতা হইব এই হামবড়া ভাবসম্পৃক্ত উপনেতাদের সংঘর্ষে যথন গুপ্তসমিতির প্রথম পর্ব্ব ফাঁসিয়া গেল, তখন তিনি চক্ষে সরিষা ফুল দেখিলেন। দাশুরায়ের গানটি মনে পড়ে "দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরি।"

ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া—অলৌকিকত্বের মোহ : অতি স্বাভাবিক নিয়মেই অরবিন্দের মনে এই ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বারীনের যতীন-বিরহিত গ্রে-ষ্ট্রীটের ২য় কেন্দ্রও যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন ব্রাহ্ম দেবব্রত বসু বলিলেন যে—লৌকিক উপায়ে গুপ্ত-সমিতি, এমন কি দেশ-উদ্ধারের কোন কার্য্য চলিবে না। অলৌকিক উপায়ের প্রয়োজন। এ বড় বিষম কথা। সব দেশেই লৌকিক উপায়ে ইহা হয়। অরবিন্দ তাহা জানেন। তিনি ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ। তবে এদেশে লৌকিক উপায়ে হইবে না কেন? কারণ—আমরা অতি ভীষণ আধ্যাত্মিক জাতি। ধর্ম্ম ছাড়া আমাদের দেশ উদ্ধার এবং দেশ উদ্ধারের জন্য গুপ্ত-সমিতিও চলিতে পারিবে না। ধর্ম্ম চাই। গুপ্ত-হত্যা, বৈপ্লবিক ডাকাতি—কিছু আপত্তি নাই; কিন্তু এ সমস্তকেই, আধ্যাত্মিক আমরা—সুতরাং ধর্ম্মের আবরণে ঢাকিতে হইবে। বেচারী ধর্ম্ম! অরবিন্দ কর্ত্তৃক বহু ধিকৃত, নিন্দিত, বিগত শতাব্দীর ব্রাহ্ম সংস্কারকেরাও সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে সনাতন ধর্ম্মের এতটা দুর্গতি করিতে পারেন নাই।

অলৌকিকের প্রতি একটা প্রচণ্ড মোহ অরবিন্দের স্বভাবের মধ্যে আগে হইতেই ছিল। যখন তিনি নিরীশ্বরবাদী (atheist) ছিলেন, তখন ছিল কিনা জানি না। কিন্তু বরোদায় থাকাকালীন এই অলৌকিকত্বের উপর মোহ যে তাঁহার মধ্যে অঙ্কুর উদ্গম করিতেছে, ইহারই পরিচয় পাই। ১৯০৩ খৃঃ অরবিন্দকে আমরা অলৌকিকত্বের প্রতি টানে সাধুসন্ন্যাসী খুঁজিবার উদ্দেশ্যে নর্ম্মদাতীরে দেখিতে পাই। বাংলায় তখন প্রথম পর্ব্ব পুরাদমে চলিতেছে। নর্ম্মদাতীরে চান্দোতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে এক প্রাচীন বিখ্যাত যোগী ছিলেন। দেওঘরের প্রসিদ্ধ হটযোগী বালানন্দ স্বামীর গুরু ছিলেন এই ব্রহ্মানন্দ। অরবিন্দ এই ব্রহ্মানন্দের কাছে গিয়াছিলেন। অরবিন্দের সঙ্গে ছিলেন তাঁহার বন্ধু কে. জি. দেশপাণ্ডে এবং একজন কেরাণী, তাঁহার নাম ছিল ধুরন্ধর। আশ্রমে পৌঁছিয়াই এই ধুরন্ধর বেচারী জ্বরে আক্রান্ত হন। ব্রহ্মানন্দ তাঁর শিষ্য কেশবানন্দকে দিয়া নর্ম্মদা হইতে কিছু জল আনিয়া ধুরন্ধরকে পান করিতে দিলেন। যেই পান করা আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ত্যাগ! অরবিন্দ বারীনকে বলিয়াছেন যে—স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই সময় অরবিন্দের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়াছিলেন, ফলে অরবিন্দের ভিতরকার সুপ্ত দিব্যভার অকস্মাৎ মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। বারীন্দ্র বলেন, এই ব্রহ্মানন্দের দৃষ্টিপাতেই অরবিন্দের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম বিকাশ। ("...this

must have been the first real spiritual touch which was destined in time to open Aurobindo's being to Higher Truths."—*B. K. Ghose*). দেখা যায়, অরবিন্দের গুরু হিসাবে আগে ব্রহ্মানন্দ, পরে লেলে। পুরা নাম বিষ্ণুভাস্কর লেলে। ইহা ছাড়া প্ল্যানচেট্‌ জ্যোতিষশাস্ত্র, এসকলেও অরবিন্দের অগাধ বিশ্বাস ছিল।

প্রথম পর্ব্বের ব্যর্থতার পর দেবব্রত বসু যখন অলৌকিক উপায়ে গুপ্ত-সমিতির কার্য্য চালাইবার পরামর্শ দিলেন, তখন অরবিন্দের মনে সেই কথাটি বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। কেননা, লৌকিক উপায়ে ব্যর্থ হইয়া তিনি তখন যথেষ্ট হতাশ হইয়াছিলেন এবং দেশবাসীর 'এপাথি' (apathy) ও হতাশার (despair) উপর সত্য-মিথ্যা দোষারোপ করিয়া নিজের বিবেককে সান্ত্বনা দিতেছিলেন। হেমচন্দ্র কাননগো লিখিয়াছেন—

"ক-বাবু (অরবিন্দ) এর কিছু পূর্ব্বে বাংলাদেশে সিক্রেট সোসাইটী গঠনের অসুবিধা দেখে অন্যত্র গিয়েছিলেন। তিনিও দেবব্রত বাবুর প্রভাব এড়াতে পারেন নি। কোনো বিষয়ে প্রথমে যে-ধারণা কোনো রকমে তাঁর মনে আসত, তা তিনি বড় সহজে ছাড়তেন না। এখন সিক্রেট সোসাইটীর কাজে ধর্ম্মকে উপায়স্বরূপ নিয়োগ করবার মালমসলা সংগ্রহের চেষ্টায় তিনি লাগলেন। অন্য নেতারা কিন্তু গুপ্ত-সমিতির তথাকথিত কাজ একেবারে ত্যাগ করলেন না। 'ক' বাবুর অবর্ত্তমানে আমরা এঁদের কাছে যেতাম, দেবব্রত বাবুও এঁদের সঙ্গে মিশতেন।"—(বাং বি-প্র, পৃঃ ৪০)।

বরোদায় রমেশ দত্ত ঃ অরবিন্দ বরোদায় ফিরিয়া দেখিলেন, রমেশ দত্ত সেখানে রাজস্ব-বিভাগের প্রধান মন্ত্রী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এই কার্য্য তিনি তিন বৎসর একাদিক্রমে করিবেন (১৯০৪।আগষ্ট হইতে ১৯০৭।জুলাই পর্য্যন্ত)। ১৯০৬ খৃঃ ১৪ই এপ্রিল আমরা অরবিন্দকে বরিশাল কনফারেন্সে উপস্থিত হইয়া যোগ দিতে দেখিতে পাই। সুতরাং রমেশ দত্ত রাজস্ব-বিভাগের মন্ত্রিত্ব দেড় বৎসর করার পর, অরবিন্দ বরোদা কলেজের অধ্যাপনার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। রমেশ দত্ত ও অরবিন্দ একত্রে দেড় বৎসর বরোদায় ছিলেন। অরবিন্দ বরোদায় ১৮৯৩ খৃঃ হইতে ১৪ বৎসর চাকরি করিয়াছেন। তাঁহার চাকরির যখন মাত্র দেড় বৎসর বাকী সেই সময় রমেশ দত্ত সেখানে রাজস্ব-বিভাগে মন্ত্রিত্ব করিতে গেলেন। উভয়েই দেশকে ভালবাসেন। কিন্তু

অরবিন্দ দেশকে ভালবাসেন অতি সাংঘাতিক রকমের ('too well'), আর রমেশ দত্ত দেশকে ভালবাসেন বিজ্ঞজনোচিতভাবে ('wisely')। রমেশ দত্ত এবং ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের বিবেচনায় অরবিন্দ দেশকে বিজ্ঞজনোচিতভাবে ('wisely') ভালবাসেন নাই। রমেশ দত্ত ও অরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীত। রমেশ দত্ত ইংরাজের অধীনে থাকিয়া প্রজার দুঃখদুর্দ্দশা দূর করিয়া ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া—চান ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন। ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য এবং এই মন্ত্রিত্বের মধ্য দিয়া যে সংস্কার তিনি করিয়াছিলেন, তাহাই ছিল তাঁর উপায়। অরবিন্দের উদ্দেশ্য ইংরাজের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। উপায়—সংস্কার নহে, বিপ্লব। তিনি বিপ্লবের উদ্দেশ্যে গত দুই বৎসর বাংলাদেশে গুপ্ত-সমিতি করিয়া সবেমাত্র ফিরিয়া আসিলেন। এই দুই বাঙ্গালী প্রতিভার বরোদারাজ্যে এই বৎসরে যে মিলন, সে মিলন বাংলার প্রাচীন ও অতি-অগ্রসর নবীনের মিলন। ধীরেসুস্থে সংস্কার আর রাতারাতি বিপ্লব, এই দুয়ের মিলন। সংস্কার ও বিপ্লব মিলে না। কাজেই রমেশ দত্ত ও অরবিন্দ বরোদায় দেড় বৎসর একত্রে অবস্থান করিলেও রাজনৈতিক আদর্শ ও উপায়ে মিলিতে পারেন নাই। অরবিন্দ বিপ্লবী, কিন্তু ভগিনী নিবেদিতাও তো বিপ্লবী। অথচ এই বিপ্লবী আইরিশ মহিলার সহিত রমেশ দত্ত যতটা মিলিয়াছিলেন অরবিন্দের সহিত তার কিছুটাও মিলিতে পারেন নাই। অবশ্য ভগিনী নিবেদিতা যে অতি মারাত্মক রকমের বিপ্লবী, এ কথা রমেশ দত্ত তখন জানিতেন কি-না সন্দেহ। জানিলে তিনি এই সময় ভগিনী নিবেদিতার নিকট তাঁহার রাজনৈতিক সংস্কার-কার্য্যের বিস্তৃত তালিকা চিঠিতে এমন করিয়া লিখিতেন না। ভগিনী নিবেদিতার নিকট সহানুভূতি পাইবেন বলিয়াই এইরূপ লিখিয়াছিলেন : "*My dear Nivedita*—I am trying to relieve the agriculturists of excessive taxation on their land. I am endeavouring to get together the Capitalists to start new mills and industries, and if I can build up the Legislative Council I will make the works of the State proceed in the interest of the people and in touch with the people." রমেশ দত্তের নিকট হইতে এই চিঠি পাইয়া ভগিনী নিবেদিতা নিশ্চয়ই খুশি হইয়া উত্তর দিয়াছিলেন। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা যদিও বা খুশি হইয়া থাকেন, অরবিন্দ ইহাতে খুশি হইতে

পারিতেন না। কেননা কৃষকের কর-লাঘব, কাপড়ের মিল, লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিল—এগুলির প্রতিষ্ঠা বা সংস্কার বিপ্লবী অরবিন্দ তখন, তখন কেন ১৮৯৩ খৃঃ হইতেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেন না। রমেশ দত্তের সমস্তটাই 'আবেদন-নিবেদন' নীতির সংস্কার। বিপ্লবী অরবিন্দ, কংগ্রেস-বিরোধী অরবিন্দ, গুপ্ত-সমিতির প্রবর্ত্তক অরবিন্দ লৌকিক উপায়ে ব্যর্থ হইয়াও অলৌকিক উপায়ে সাধু-সন্ন্যাসীর অলৌকিক যোগবলে বিপ্লবকে পূর্ণ স্বাধীনতালাভের জন্য সার্থক করিয়া তোলার কথাই তখন ভাবিতেছিলেন। এই ভাবনার দ্বারা তাঁহার মন তোলপাড় হইতেছিল। বিপ্লবী অরবিন্দ রমেশ দত্তের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারমূলক কার্য্যকে তখন সহানুভূতির চক্ষে নিশ্চয়ই দেখিতে পারেন নাই। সংস্কারক ও বিপ্লবীর মধ্যে যে পার্থক্য, রমেশ দত্ত ও অরবিন্দের মধ্যে সেই পার্থক্য তখন পুরামাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ দুইটি উজ্জ্বল বাঙ্গালী প্রতিভা দুইটি বিভিন্ন দিক হইতে বরোদা রাজ্যে এই সময় একত্রে দেড় বৎসর আলোক বিকীর্ণ করিয়াছেন। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে শ্লাঘার বিষয়।

অরবিন্দ-পরিত্যক্ত বাংলার বিপ্লবী কর্ম্মীদের দুরবস্থা : বরোদা হইতে আবার আমাদের দুইটি কারণে বাংলায় আসিতে হইতেছে। ১ম—অরবিন্দ-পরিত্যক্ত বাংলার বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বিপ্লবীদের জন্য। ২য়—বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ আন্দোলনের জন্য।

নেতা বা উপনেতাদের কথাই সব কথা নয়। এমনকি অনেক সময় ইতিহাসের তাহা বড় কথাও নয়। যেসকল অখ্যাত অজ্ঞাত কর্ম্মীদের ভিত্তি করিয়া একটা আন্দোলনের বিরাট্ সৌধ গড়িয়া উঠে, সেই সৌধের চূড়ায় যে স্বর্ণ-কলস তাহাই পথিকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। অথচ ভিত্তি যদি দৃঢ় না হয়, তবে সামান্য একটু ভূমিকম্পেই সৌধচূড়ার সেই স্বর্ণকলস ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি যায়। অথচ এই সকল পলায়নপর নেতাদের অপেক্ষা পরিত্যক্ত কর্ম্মীরাই "ফাঁসির মঞ্চে" কবির ভাষায় "জীবনের জয়গান গাহিয়া" গিয়াছেন। যে ইতিহাস কর্ম্মীদের উপেক্ষা করিবে, সে ইতিহাস সত্য ইতিহাস নয়। বিশেষতঃ অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত আন্দোলনে নেতা অপেক্ষা কর্ম্মীদের আত্মত্যাগ অনেক বেশী। ২য় পর্ব্বে আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিব। অরবিন্দ চলিয়া গেলে যতীন্দ্র মনের দুঃখে বিরাগী হইয়া হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া শ্যামাকান্ত সোঽহংস্বামীর সহিত জুটিয়া "নিরালম্ব স্বামী" হইলেন। যে মিথ্যা চরিত্র-

দোষের জন্য অরবিন্দ তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন, যতীন্দ্র সন্ন্যাসী হইয়া সেই চরিত্রদোষের অপবাদকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিলেন। আর রাজনীতি ছাড়িয়া যোগী বা সন্ন্যাসী হওয়ায়—বলিতে গেলে, তিনি শ্রীঅরবিন্দের পূর্ব্বগামী হইলেন। কেননা, ইহার পাঁচ কিংবা ছয় বৎসর পরে অরবিন্দও রাজনীতি ছাড়িয়া যোগে নিমগ্ন হইবেন। তাঁহার মধ্যে যে পরম যোগী আছেন, তিনি আত্মপ্রকাশ করিবেন। রাজনীতির খোলস আপনা হইতেই খসিয়া পড়িবে। কাজেই বলিতে হয়, যতীন্দ্র অরবিন্দের পূর্ব্বগামী। আর দেবব্রত শ্রীঅরবিন্দের পশ্চাৎগামী, "স্বামী প্রজ্ঞানন্দ" তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম।

যতীন্দ্র তো হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। হেমচন্দ্র কাননগো স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে: অরবিন্দ তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে অপরাপর নেতারা গুপ্ত-সমিতির কাজ একেবারে ছাড়িয়া দিলেন না। কোনো রকমে জিয়াইয়া রাখিলেন। দেবব্রত বাবু অন্য নেতাদের সঙ্গে মিশিয়া সম্ভবতঃ অলৌকিক উপায় অবলম্বনের জন্য আর সকলকে প্রলুব্ধ করিতে লাগিলেন। ভূপেন দত্ত তখনও প্রচার-কার্য্যে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে মেদিনী-পুরেও যাতায়াত করিতেন।

"ইনি (ভূপেন বাবু) 'ক' বাবুর (অরবিন্দের) বড় ভক্ত ছিলেন। এঁর সেনাপতি বা সম্রাট্ হওয়ার খেয়াল তখন বোধ হয় ছিল না। প্রচারের কাজে এঁকে অত্যন্ত পঁচা পাড়াগাঁয়ে নিয়ে গেছি ও বিশ্রী খাবার খেতে দিয়েছি; দেখেছি, ইনি খাস কলকাতাবাসী হয়েও কোন অভিযোগ করেন নি।"—(বাং বি-প্রঃ, পৃঃ ৪১)।

মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার নিকট শুনিয়াছি যে—বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়কে এইরূপ প্রচারকার্য্যে মফঃস্বলে নিয়া বিশ্রী খাবার খাইতে দিলে তিনি বড়ই বিরক্তি প্রকাশ করিতেন।

বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ-আন্দোলন: ১৯০৩।৩রা ডিসেম্বর বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট প্রথম উত্থাপন করেন। আর ১৯১১।১২ই ডিসেম্বর ভারত-সম্রাট্ ইংলণ্ড হইতে দিল্লীতে আসিয়া বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করিয়া দিয়া যান। সুতরাং ৮ বৎসর ১০ দিন বাঙ্গালী এই বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলন করিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙ্গালী এই আন্দোলন করিয়াছিল। এবং সমগ্র ভারতবর্ষে এই আন্দোলনকে সংক্রামক করিয়া তুলিয়াছিল।

যদিও ৮ বৎসর কাল ব্যাপিয়া এই আন্দোলন চলিয়াছিল, তথাপি এই আন্দোলনের স্বরূপ কোন এক বিশেষ বৎসরে আবদ্ধ নহে। এই আন্দোলনের গতিমুখে আমরা তিনটি স্তর বা অবস্থা দেখিতে পাই। ১ম, ধূমায়িত অবস্থা—১৯০৩।ডিসেম্বর হইতে ১৯০৫।জুলাই পর্য্যন্ত ১ বৎসর ৮ মাস। ২য়, প্রজ্বলিত অবস্থা—১৯০৫।আগষ্ট হইতে ১৯০৮।এপ্রিল পর্য্যন্ত ২ বৎসর ৯ মাস। ৩য়, নির্ব্বাপিত অবস্থা—১৯০৮।মে হইতে ১৯১১।ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৩ বৎসর ৭ মাস। মোটামুটি ৮ বৎসরের হিসাব মিলিয়া গেল।

অরবিন্দের জীবন-চরিত আলোচনা-প্রসঙ্গে আলোচ্য বৎসরে আমরা এই প্রতিবাদ-আন্দোলনের প্রথম স্তর অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় স্তরের সম্মুখে মাত্র আসিয়া পৌঁছিব। আন্দোলনের ধূমায়িত অবস্থা শেষ হইয়া যখন প্রজ্বলিত অবস্থার উপক্রম বা উদ্যোগ দেখা দিবে তখনই বর্ত্তমান আলোচ্য বৎসর শেষ হইবে। সুতরাং ধূমায়িত স্তরের কথাই প্রথমে লক্ষ্য করিতে হয়।

১৯০৩ খৃঃ মাদ্রাজ কংগ্রেসে বঙ্গ-ভঙ্গের প্রথম প্রতিবাদ লালমোহন ঘোষের মুখে আমরা শুনিয়াছি। মাদ্রাজ হইতে এক বৎসর পরে বোম্বাই কংগ্রেসে সভাপতি স্যার হেনরী কটনের মুখে আবার আমরা বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ শুনিতে পাইব। সুতরাং সমগ্র ১৯০৪ খৃষ্টাব্দকে আমরা ধূমায়িত অবস্থার প্রথম পর্ব্ব বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

আট বৎসরব্যাপী বাঙালীর এই ইতিহাস-বিখ্যাত আন্দোলনের প্রথম বৎসর ১৯০৪ খৃঃ। এই প্রথম এক বৎসর প্রতিবাদ-আন্দোলন কোন্ মাসে কোথায় কি কার্য্য করিয়াছে তাহা যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা লেখেন নাই। লেখা বিপজ্জনক, এই মিথ্যা অজুহাতে নিজেদের কর্ত্তব্য-বিমুখতা ঢাকিয়া সমগ্র বাঙালী জাতিকে 'ইতিহাস-বিমুখ' বলিয়া অতিশয় ধৃষ্টতার সহিত গালি দিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। কাজটা তাঁহারা মোটেই ভাল করেন নাই। ফলে ঘটনাগুলি লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। এখন ঠিকমত কেহ কিছু বলিতেই পারেন না। লেখা ত দূরের কথা।

ধূমায়িত অবস্থা ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস অতিক্রম করিয়া ১৯০৫ খৃঃ-এর জুলাই মাস পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিবে। আগষ্ট মাসে এই প্রতিবাদ-আন্দোলন 'বয়কট' নাম গ্রহণ করিবে। বয়কটের কিছুটা আগে আন্দোলনকে 'স্বদেশী' নামেও অভিহিত করা যায়। যদি ধূমায়িত অবস্থার এক বৎসর আট মাসকে

স্বদেশী নামে অভিহিত করা না যায়, তবে স্বদেশী ও বয়কট যমজ সন্তানরূপে এই আন্দোলনের গর্ভে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। অবশ্য ১৯০৫-এর জুলাই মাসেই (২০শে জুলাই) বাঙালী জানিতে পারিল যে, ভারত-সচিব বঙ্গ-বিভাগ মঞ্জুর করিয়াছেন। সংবাদটি আচমকা ঝড়ের মত আসিয়া পড়িল। কেননা, অনেক মডারেট নেতা আশা করিয়াছিলেন যে—যখন পুরা দেড় বৎসর লর্ড কার্জ্জন চুপ করিয়া আছেন তখন হয়ত হাজার হাজার সভা-সমিতির প্রতিবাদ দেখিয়া এবং শুনিয়া বঙ্গ-ভঙ্গের কল্পনা তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু যখন মডারেট নেতাদের দেড় বৎসরব্যাপী আবেদন-নিবেদন নীতির আন্দোলন একেবারেই অগ্রাহ্য হইয়া গেল এবং বাংলার মডারেট নেতারাও স্বদেশী ও বয়কট সমর্থন করিল, তখন আন্দোলন আগষ্ট মাসে ধূমায়িত অবস্থা হইতে প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপনের দুই বৎসর আগে এবং বয়কট আন্দোলনের তিন বৎসর আট মাস আগে অরবিন্দ বাংলাদেশে গুপ্ত-সমিতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—ইহা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা কর্তব্য। কারণ অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, অরবিন্দ বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সুযোগ লইয়া তাঁহার বহু বৎসর পূর্ব্বেকার ইপ্সিত গুপ্ত-সমিতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়—ভুল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের আন্দোলনে বাংলাদেশে প্রথম দেখা দিয়াছে অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতি। তারপরে দেখা দিয়াছে স্বদেশী আন্দোলনের বয়কট। এই বয়কট চরমপন্থী রাজনীতির প্রথম অস্ত্র। দ্বিতীয় অস্ত্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance)। উহা বয়কটের অব্যবহিত পরে দেখা দিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গলার চরমপন্থী রাজনীতির অন্তত: চার বৎসর পূর্ব্বে দেখা দিয়াছে অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতি। অনেকের ধারণা চরমপন্থী রাজনীতি গুপ্ত-সমিতিকে জন্ম দিয়াছে। কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এই ভুল ধারণা বিদূরিত না হইলে বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলাদেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রে অরবিন্দের প্রকৃত স্থান যথাযথ নির্দ্দেশ করা যাইবে না। এবং তাহা নির্দ্দেশ করিতে গিয়াই আমাদিগকে এই আন্দোলনের ইতিহাস এতটা বিস্তৃত করিয়া লিখিতে হইতেছে। বাঙালীর বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় বিপ্লবী অরবিন্দের বিপ্লবের স্থান প্রথম। বাঙালীর চরমপন্থী রাজনীতির স্থান দ্বিতীয়—প্রথম নয়। ইতিহাসপথে ভ্রমণ করিয়া এই সত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

কংগ্রেস : আবার বাংলাদেশ হইতে বোম্বাই যাইতে হইতেছে। এবার ১৯০৪, ডিসেম্বর) কংগ্রেস বোম্বাই সহরে। সভাপতি স্যার হেনরী কটন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার ফিরোজ শা মেহেতা। ওয়াকিবহাল মহলে সকলেই ইহাদের জানেন। দুইজনের কেহই অরবিন্দের অপরিচিত নহেন।

কটন সাহেব রাজনারায়ণ বসুর বন্ধু ছিলেন। সেই সূত্রে শোনা যায়, অরবিন্দের বরোদায় চাকরি পাওয়া সম্পর্কে কটন সাহেব বা তাঁহার পুত্রের কিছু হাত ছিল। কটন ঝুনো সিভিলিয়ান। সেক্রেটারী হিসাবে তিনি সাতটি লেফটেনাণ্ট গভর্ণরকে তাঁহার হাতে পার করিয়াছেন। আসামের তিনি চীফ কমিশনার ছিলেন। সুতরাং শাসনকার্য্য সুপরিচালনের অজুহাতে লর্ড কার্জ্জন বঙ্গ-ভঙ্গ যেরূপ প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন, সেই যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিতে, কটনের মত শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞ এবং উপযুক্ত ব্যক্তি আর দ্বিতীয় কেহ ছিলেন না বা হইতে পারেন না। কটন সাহেব সভাপতির আসন হইতে বঙ্গ-ভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। লর্ড কার্জ্জনের যুক্তি খণ্ডন করিলেন। বাঙালী সন্তুষ্ট হইল। কটন সাহেব বাঙালীর প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন—বাঙালীরা পেশোয়ার হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত লোকমত সৃষ্টি করেন ও পরিচালিত করেন (…"Babus from Bengal, strenuous and able, who rule and control public opinion from Peshwar to Chittagong"…)। এমন কি তিনি রাজা রামমোহনের নাম পর্যান্ত উল্লেখ করিলেন—যাহা এক র‍্যাণাডে ছাড়া আর কোন প্রদেশের নেতাকে বড় একটা উল্লেখ করিতে দেখি না। বঙ্গ-ভঙ্গের দ্বারা বাঙ্গালী জাতির একতা নষ্ট করিবার যে চেষ্টা, ইহাকে তিনি নিন্দা করিলেন এবং দু'হাজার সভায় বাঙালী এই বঙ্গ-ভঙ্গের যে প্রতিবাদ করিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করা অত্যন্ত কড়া কথায় নিন্দা করিলেন ("…a most arbitrary and unsympathetic evidence of irresponsible and autocratic statesmanship"—(*hear hear*). এত বড় কড়া কথার পর লর্ড কার্জ্জন কটন সাহেবের হস্ত হইতে কংগ্রেসের এই প্রতিবাদ-প্রস্তাব হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিতে সোজা অস্বীকার করিবেন—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

গভর্ণমেণ্টের চাকুরিয়াদের মধ্যে উচ্চপদে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা ভারতবাসীর নাই—লর্ড কার্জ্জন এইরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইহার

উত্তরে সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী তারস্বরে বক্তৃতা করিলেন—সে কি কথা? যোগ্যতা আছে। স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবর্ণ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উপদেশ দিলেন—ভারতবাসীরা বিলাতে লোক পাঠাইয়া আবেদন-নিবেদন করুক। মিঃ তিলক এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। তাহার পরে কটন সাহেব বলিলেন—কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, যাহাতে প্রত্যেক প্রদেশ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়া আমেরিকার মত একটা যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়। এবং পরিণত হইয়াও ইংলণ্ডের অধীনে উপনিবেশগুলির মত স্বাধীনতা লাভ করে।

অরবিন্দ নিশ্চয়ই এই সকল বক্তৃতা ও প্রস্তাব পাঠ করিলেন। কিন্তু ইহার কোনো একটাও তাঁহার মনে কোন দাগ বসাইতে পারিল বলিয়া মনে হয় না। কেননা, তিনি চান ইংলণ্ডের সম্পর্ক-বর্জ্জিত পূর্ণ স্বাধীনতা। কংগ্রেস তাহা চায় না। কটন সাহেব তাহা চাহিলেন না। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করিতে অরবিন্দ চাহেন না। কেননা, তিনি মনে করেন যে ইহাতে আমাদের উপকার হইয়াছে ["He (Aurobindo) regarded the partition of Bengal as the *greatest blessing* that had ever happened to India. No other measure could have stirred national feeling so deeply or roused it so suddenly from the lethargy of previous years."—*The New Spirit In India*; Nevinson]। ১৯০৭ খৃ: আন্দোলন যখন প্রজ্জলিত অবস্থার চরমে, অর্থাৎ আর মাত্র কয়েক মাস পরেই আন্দোলন মজঃফরপুরে বিস্ফারিত হইবে, ঠিক সেই সময় অরবিন্দ সাক্ষাৎভাবে নেভিনসন সাহেবের নিকট তাঁহার এই সুস্পষ্ট মত জ্ঞাপন করিলেন। সুতরাং কটনের বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিবাদে অরবিন্দের উল্লসিত হইবার কোনই কারণ দেখি না। ভারতবাসীর উচ্চপদে নিয়োগ, অরবিন্দের নিকট উপহাসের বস্তু। বিলাতে আবেদন-নিবেদন তাঁহার নিকট অগ্রাহ্য—বাতিল—নামঞ্জুর। তিলক সমর্থন করিলেও ইহার অসারতা বুঝিয়া অরবিন্দ ইহার সমর্থন করেন না। তিলক হইতে এখানে অরবিন্দ সুস্পষ্টরূপে পৃথক। অরবিন্দ আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত বিপ্লবী। তিলক বিপ্লবী নহেন। অরবিন্দ নিজে তিলককে বিপ্লবী কহেন নাই। ("It is equally a mistake to think of Mr. Tilak as by nature *a Revolutionary leader*; that is not his character or his political temperament".—*Aurobindo Ghose*, 1918).

অরবিন্দ যখন ১৯১৮ খৃঃ লোকমান্য তিলকের চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলেন, তখন তিলক জীবিত ছিলেন। সুতরাং অরবিন্দের এই সমালোচনা তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। ১৯২০।৩১শে জুলাই শনিবার রাত্রি ১২টা ৪০ মিনিটের সময় তিলকের মৃত্যু হয়।

লর্ড কার্জ্জনের কনভোকেশন বক্তৃতা : ১৯০৫।১১ই ফেব্রুয়ারী লর্ড কার্জ্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার 'কনভোকেশন' বক্তৃতায় (* ক) তাঁহার সুপ্ত প্রাচ্য-বিদ্বেষের মুখের লাগাম খুলিয়া দিলেন। তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে, প্রাচ্য-দেশবাসীদের উক্তি সর্ব্বদাই অতিরঞ্জিত এবং অত্যুক্তিদোষে দুষ্ট। প্রাচ্য-দেশবাসীদের মিথ্যাবাদী বলার আর বাকি রহিল কি!

ঐ কনভোকেশন-সভায় ভগিনী নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন। প্রাচ্য-প্রীতি প্রচারের তিনি একজন অগ্রদূত। তিনি সভা হইতেই উত্তেজিত অবস্থায় গুরুদাস ব্যানার্জিকে টানিয়া লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং তাহাকে লইয়া 'ইম্পিরিয়াল লইব্রেরী'তে গেলেন। লর্ড কার্জ্জনের 'Problems Of The Far East' পুস্তকটি বাহির হইল। পরের দিন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সেই পুস্তক হইতে একাংশ তুলিয়া দিয়া দেখাইলেন যে, লর্ড কার্জন নিজেই মিথ্যা কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

১১ই মার্চ টাউনহলে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে লর্ড কার্জনের ঐ উক্তির প্রতিবাদার্থ সভা হয়। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ লর্ড কার্জনের উত্তরে যে বক্তৃতা দিলেন, তাহাতে লর্ড কার্জনের আর কিছু বাকি রহিল না (* খ)। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ তাঁহার বক্তৃতায় প্রাচ্য

(* ক) *Lord Curzon had said* :

"If I were asked to sum in a single word the most notable characteristic of the East—physical, intellectual and moral—as compared with the West, the word *exaggeration* or *extravagance* is the one that I should employ. It is particularly patent on the surface of the Native Press."

(* খ) "Lord Curzon with brief little authority of 5 years' Viceroyalty in India, robed in Chancellar's gown, had the audacity to challenge the ideal of truth of India—nay, of Asia—which has produced Gautame Buddha, Mohammed

দেশের গুণকীর্তন করিয়া বলিলেন যে—এই প্রাচ্য ভূখণ্ড শুধু বুদ্ধদেব ও মহম্মদকেই জন্ম দেয় নাই, পরন্তু যীশুখৃষ্টকেও জন্ম দিয়াছে। এইসমস্ত এশিয়ার অবতার-পুরুষগণ আমাদিগকে পররাজ্যলোলুপতা শিক্ষা না দিতে পারুক, কিন্তু কি করিয়া মানুষের মত বাঁচিতে এবং মানুষের মত মরিতে হয় তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। প্রাচ্য-প্রীতি ডাঃ রাসবিহারীতে পর্যন্ত গিয়া গর্জিয়া উঠিল।

রবীন্দ্রনাথ তখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। তিনি লর্ড কার্জনের নাকের উপর দেখাইয়া দিলেন যে—বুয়র যুদ্ধে (১৮৯৯-১৯০২) ইংরেজ জাতি যুদ্ধের সময় বুয়রদের বিরুদ্ধে কিরূপে অজস্রভাবে সকল প্রকার মিথ্যা কাহিনী প্রচার করিয়াছে। এমন কি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি পর্য্যন্ত তাঁহার 'আত্মজীবনী'তে (পৃঃ ১৭৫) লর্ড কার্জন নিজে যে মিথ্যাবাদী, তাহা প্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছেন।

লর্ড কার্জন কাজটা ভাল করেন নাই।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা'ঃ বঙ্গভঙ্গ-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলন যখন ধূমায়িত অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছিল, সেই সময় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে 'সন্ধ্যা'র আবির্ভাব আমরা দেখিতে পাই। প্রতিবাদ-আন্দোলন ১৯০৫।৭ই আগষ্টের পূর্বে প্রজ্জলিত হয় নাই। সুতরাং আগষ্টের পূর্ব্বেই 'সন্ধ্যা' দেখা দিয়াছে। সেই হিসাবে ইহা 'বয়কট' বা 'স্বদেশী' আন্দোলনের পূর্বে অগ্রদূতস্বরূপ ধীর মন্থর গতিতে আবির্ভূত হইয়াছে।

প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুর ক্রমবিকাশআছে। 'সন্ধ্যা'রও ক্রমবিকাশ আমরা দেখিতে পাইব। এই ক্রমবিকাশের দুইটি বিভিন্ন স্তর একের পর আর আমরা প্রত্যক্ষ করিব। প্রথম স্তর প্রতিবাদ-আন্দোলনের ধূমায়িত অবস্থায় নিঃশেষিত হইবে। দ্বিতীয় স্তর, আন্দোলন যখন প্রজ্জলিত অবস্থায় আসিয়া পৌছিবে সেই সময় আরম্ভ হইবে। বস্তুতঃ 'সন্ধ্যা'র দ্বিতীয় স্তরই ইতিহাসে ও সংবাদপত্র-সাহিত্যে এক নূতন ভাষা ও ঢং সৃষ্টি করিয়া

---

and even Jesus—men who may not have taught us how to conquer and how to rule, but certainly men who have taught us how to live and how to die."—[*Dr. Rashbehari Ghose; Presidential Speech at Town-Hall, on 11th March, 1905, to protest against Lord Curzon's Convocation Speech.*]

গিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে আমরা প্রথম স্তরেই আবদ্ধ থাকিব, দ্বিতীয় স্তর পরের বৎসরে 'বয়কট' আন্দোলনের পরে আত্মপ্রকাশ করিবে। তখন দ্বিতীয় স্তর বিস্তৃতভাবে নিজের স্বরূপ বিস্তার করিবে। প্রথম স্তর হইতে দ্বিতীয় স্তরের পার্থক্য তখন স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

'সন্ধ্যা'র প্রথম স্তরে অরবিন্দ ব্রহ্মবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন কিনা জানিতে পারি নাই। তবে প্রথম স্তরের সহিত যে অরবিন্দের মানসিক যোগাযোগ ও সহানুভূতি ছিল তাহা সহজেই বোঝা যায়, 'সন্ধ্যা'র দ্বিতীয় স্তরে অরবিন্দ ব্রহ্মবান্ধবের সহিত একসঙ্গে রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত।

এখন সন্ধ্যার প্রথম স্তরের কথাই হোক। ১৯০৪ জুলাই মাসে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বক্তৃতা দিবার কালে আমরা ব্রহ্মবান্ধবকে এলবার্ট-হলে ফেলিয়া আসিয়াছি। সেই সময় তাঁহার মানসিক অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয়ও পাইয়া আসিয়াছি। তারপর এক বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি 'সন্ধ্যা' প্রকাশ করিলেন। সুতরাং ১৯০২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অক্সফোর্ডে এবং ১৯০৩-এর প্রথম ভাগে কেম্ব্রিজে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দিবার কালে এবং বিলাতে থাকাকালীন 'বঙ্গবাসী' পত্রে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সমর্থন করিয়া যে-সকল পত্র তিনি লিখিয়াছিলেন তাহাতে হিন্দুয়ানী সম্পর্কে যেরূপ গোঁড়া রক্ষণশীলতা তাঁহার চিন্তাধারায় প্রকাশ পাইয়াছিল মানসিক বিকাশের গতিপথে তাহাই 'সন্ধ্যা'-পত্রের সূচনায় আমরা দেখিতে পাইলাম। 'সন্ধ্যা'-পত্রের সূচনা এইরূপ—

"...আমরা হিন্দু। আমরা হিন্দু থাকিব। বেশভূষায় অশনে-বসনে সর্ব্ব-প্রকারে হিন্দু থাকিব।...ইউরোপ হইতে আমরা স্বাধীনতা, মৈত্রী, সাম্য গ্রহণ করিব। কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্মকে নষ্ট হইতে দিব না।...যাহা শুন—যাহা শিখ—যাহা কর, হিন্দু থাকিও, বাঙালী থাকিও।...ব্রাহ্মণের শিষ্য হইয়া জাতিমর্যাদা রক্ষা করিলে কোন দোষ স্পর্শ করিবে না।...সমুদয়ের ভিতর ঐ এক সুরের খেলা থাকিবে—বেদ, ব্রাহ্মণ ও বর্ণধর্ম্ম।

"—এই সকল সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া তিনি অবিলম্বে সন্ধ্যা নামে একখানি দৈনিকপত্র প্রকাশ করিলেন। ইহার স্তম্ভে স্তম্ভে একদিকে হিন্দুর জ্ঞানধর্ম্ম ও সভ্যতার গুণগরিমা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অপরদিকে ইংরেজ ভারতবাসীকে নির্জিব বিবেচনায় কিরূপে যাদুমন্ত্রে ভুলাইয়া

রাখিয়া ক্রমশঃ পদদলিত করিতেছে, তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইলেন।”
—(উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব—প্রবোধচন্দ্র সিংহ; পৃ: ৮০-৮২)।

গোঁড়া হিন্দুয়ানী ও তার সঙ্গে কড়া পাকের উগ্র রাজনীতি 'সন্ধ্যা' প্রথম স্তরে বাঙালীকে পরিবেশন করিল। এ যুগে হিন্দুয়ানী প্রচারে স্বামী বিবেকানন্দ অগ্রগামী। ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার পশ্চাৎগামী। কিন্তু বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মবান্ধবের হিন্দুয়ানী এক বস্তু নয়। বর্ণাশ্রমের নামে জাতিভেদ ও জাতিভেদের দোহাই দিয়া ছুঁৎমার্গ বিশেষতঃ বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণের পদমর্য্যাদা যেরূপ অলঙ্ঘনীয় বলিয়া ব্রহ্মবান্ধব প্রচার করিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ সেরূপ প্রচার তো করেনই নাই বরং উল্টা ব্রাহ্মণ-বিরোধী ও ছুঁৎমার্গ-বিরোধী অনেক কথাই বলিয়াছেন। স্বামীজীর লেখাতে তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

এই সময় রবীন্দ্রনাথও যথেষ্ট হিন্দুয়ানী প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে ব্রাহ্মণের পদমর্য্যাদাও আছে এবং স্বদেশী সমাজের মহিমাও আছে। এই সময় ভগিনী নিবেদিতাও হিন্দুয়ানী প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ, খৃষ্টান উপাধ্যায়, বিবেকানন্দ-শিষ্যা বেদান্তবাদী বিদেশিনী আইরিশ নিবেদিতা—সকলেই সমস্বরে রব তুলিয়াছেন: “যাহা শুন—যাহা শিখ—যাহা কর—হিন্দু থাকিও, বাঙ্গালী থাকিও।” এমনকি ব্রাহ্ম বিপিন পালও বাদ যান নাই। আরো অনেকে ছিলেন, সকলের নাম করিতে পারিলাম না।

আলিপুর বোমার মামলায় মিঃ সি. আর. দাশ ১৯০২।২০শে আগষ্ট অরবিন্দের একখানি পত্র হইতে প্রমাণ করিতেছেন যে, এই সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতেই অরবিন্দ নিজেকে হিন্দুসমাজের একজন নিষ্ঠাবান সভ্য বলিয়া নিজেকে বিবেচনা করিতেন [“Soon before that time (1902, 20th Aug.) Aurobindo considered himself a *strict member of the Hindu Society*”—C. R. Das]। ইহারও এক বৎসর পূর্ব্বে অরবিন্দের বিবাহের সময় আমরা তাঁহার হিন্দুয়ানীর পরিচয় দিয়া আসিয়াছি। দেখিতেছি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রথমার্দ্ধে বহু প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম, আধা-ব্রাহ্ম, আধা-খৃষ্টান, পুরা রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান—সকলেই একটা নূতন জাতীয়তাবোধের প্রেরণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া হিন্দুয়ানীর দিকে প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইতেছে। সুতরাং ১৯০৫-এর প্রথমার্দ্ধ 'সন্ধ্যা'-পত্রের সূচনায় আমরা যে হিন্দুয়ানীর প্রচার দেখিতে পাইলাম, তাহা এই কালের যুগধর্ম্মের প্রচার। আরো দেখিলাম, এই উদীয়-

যান নব্য হিন্দুয়ানী অতি উগ্র রকমের স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধে ভরপুর। ধর্ম্মের ভিত্তির উপর এই যে নূতন জাতীয়তাবোধ—ইহা সাম্প্রদায়িক, সার্ব্বজনীন নয়। বাংলাদেশের অর্দ্ধেক মুসলমান। ইহাতে তাঁহাদের স্থান কোথায়? স্থান নাই। হিন্দু-জাতীয়তা প্রতিক্রিয়ামুখে মুসলমান-জাতীয়তাকে সৃষ্টি করিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ যদি হিন্দুয়ানী প্রচারে ব্রহ্মবান্ধবের অগ্রগামী হইয়া থাকেন, তবে পরপর পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া বলিতে হইলে—শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মবান্ধবের পশ্চাৎগামী। ব্রহ্মবান্ধব হিন্দুয়ানী প্রচারে রবীন্দ্রনাথ, বিপিন পাল ও ভগিনী নিবেদিতার সমসাময়িক এবং শ্রীঅরবিন্দের অগ্রগামী। এই শতাব্দীর প্রথম-ভাগেই নব্য হিন্দুয়ানী ও উগ্র রাজনীতি একসঙ্গে যাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পরপর এই তিন জনের নাম স্পষ্টই উল্লেখ করা যায়। যথা —স্বামী বিবেকানন্দ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, শ্রীঅরবিন্দ। ইঁহারা ত্রয়ী।

বিংশ শতাব্দীর ১ম দশকে স্রেফ্ উগ্র চরমপন্থী রাজনীতিতে বাংলা ছাড়িয়া ভারতবর্ষে যদি আর একটা ত্রয়ী খুঁজিতে হয়, তবে মহারাষ্ট্র-বাংলা-পাঞ্জাবকে একত্রে করিয়া বলিতে হয়—বাল-পাল-লাল। অর্থাৎ বাল গঙ্গাধর তিলক, পাল বিপিনচন্দ্র ও লাল লাজপত।

'সন্ধ্যা'র ক্রমবিকাশে দ্বিতীয় স্তরে সন্ধ্যার ভাষা সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইবে। যে উপাধ্যায় বৈদান্তিক পরিভাষা ভিন্ন কথোপকথনের সময়েও বেদান্ত আলোচনা করিতেন না, তিনি এমন একটা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ও মুখরোচক চলতি প্রোলিটেরিয়েট ভাষা প্রবর্ত্তন করিলেন, যাহা দ্বিতীয় স্তরে সন্ধ্যাকে সংবাদপত্র-জগতে এবং বাঙ্গালীর তৎকালীন আন্দোলনের ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

উপাধ্যায় বলেন যে, কলির পঞ্চম সন্ধ্যায় তিনি 'সন্ধ্যা' নামে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার দ্বিতীয় স্তরের ভাষা পরিবর্ত্তন সম্পর্কে এইরূপ লেখা হইয়াছে—

"......সন্ধ্যার সেই আদিম গুরুগম্ভীর ভাষা পরিত্যাগ করিয়া আপামর সাধারণের হৃদয়গ্রাহী গ্রাম্যভাষা, রূপকথা, অপভাষা ও হেঁয়ালি প্রভৃতি দ্বারা এমন এক অদ্ভুত ভাষার সৃষ্টি করিলেন যাহা জনসাধারণের অতীব আদরের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। এই ভাষা পাঠ করিয়া দোকানের দোকানী-পশারী, জমিদারের

সরকার-গোমস্তা, পাঠশালার গুরু-শিষ্য, রাস্তায় মুটে-গাড়োয়ান সকলেই হাসিত কাঁদিত। জমিদার, গৃহস্থ, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, পুরনারী, বালক-বালিকা, যুবক, বৃদ্ধ সকলেই কখন আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িত, কখন বা ক্রোধে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিত। কখন সন্ধ্যা আসিবে, আজ সন্ধ্যায় কি লিখিয়াছে—এই জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া থাকিত।”—(উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব—প্রবোধ চন্দ্র সিংহ; পৃঃ ৮৪-৮৫)।

লর্ড কার্জ্জনের পদত্যাগঃ লর্ড কার্জ্জন এদেশে সাত বৎসর (১৮৯৮।৩০শে ডিসেম্বর—১৯০৫।১৭ই নভেম্বর) রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। আলোচ্য কাল শেষ হইবার মাত্র দুই দিন আগে (১৯০৫।১২ই আগষ্ট) যদিও তিনি পদত্যাগপত্র দাখিল করেন, তথাপি ১৯০৫।নভেম্বর পর্য্যন্ত বড়লাটের গদি তিনি দখল ও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। পদত্যাগপত্র দাখিল করার পরেও তিন মাস এদেশে থাকিয়া যাইবার কারণ বলা হয় যে—১৯০৫।ডিসেম্বর যুবরাজ (পরে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ) এদেশে আসিয়াছিলেন। সেসময় এদেশে থাকা তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটি কারণও ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। তাহা হইতেছে, বঙ্গ-ভঙ্গ আইনে পরিণত করিয়া তদনুযায়ী খণ্ডিত দুই বঙ্গে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া। ১৯০৫।২৯শে সেপ্টেম্বর বঙ্গ-ভঙ্গ আইনে পরিণত হয়। ১৯০৫।১৬ই অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গে ফ্রেজার ও পূর্ব্ববঙ্গে ফুলার সাহেব ছোটলাট নিযুক্ত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। এই ছোটলাটদ্বয় বিভক্ত দুই বঙ্গে দুইমাস কিরূপ শাসন-কার্য্য পরিচালনা করেন, তাহা নিজচক্ষে দেখিয়া যাওয়াই বড়লাট কার্জ্জনের পদত্যাগ করিয়াও তিন মাস এদেশে থাকিয়া যাইবার অন্যতম কারণ। এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। লর্ড কার্জ্জনের জেদ যাঁহারা জানেন, তাঁহারা সকলেই ইহা বিশ্বাস করিবেন।

সিমলায় লর্ড কার্জ্জন তাঁহার বিদায়-ভোজে (১৯০৫।৩০শে সেপ্টেম্বর) বঙ্গ-ভঙ্গ আইনে পরিণত হওয়ার মাত্র এক দিন পরে বলিয়াছিলেন যে—যদি কেহ তাঁহার শাসনকার্য্য মাত্র একটি কথায় বুঝিতে চায় তবে তাহা হইতেছে নিপুণভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা ("If I were asked to sum up my work in a single word, I would say *efficiency*···")। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ লর্ড কার্জ্জনকে সমর্থন করিয়া বলেন যে, বাংলার মতো বিস্তীর্ণ প্রদেশকে

১৯০৪ খৃ: একজন ছোটলাটের পক্ষে শাসন করা অসম্ভব; সুতরাং বঙ্গ-ভঙ্গ অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল ("It was absolutely necessary to break up the unwieldy province.")। তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একই প্রাদেশিক শাসনের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গকে দুই হাজার সভার প্রতিবাদ সত্বেও দুইভাগ না-করিয়া বিহার ও উড়িষ্যাকে পৃথক্ করিয়া দিলেই শাসনকার্যের সুবিধা হইতে পারিত। লর্ড কার্জ্জন বা তাঁহার সমর্থনকারী ঐতিহাসিক এ-কথার জবাব দিতে পারেন নাই। বাঙালীদের ধারণা হইয়াছিল যে, বাঙালী জাতির একতা নষ্ট করিবার জন্যই—বিশেষত: পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুবিরোধী একটি মুসলমান প্রদেশ ('পাকিস্থান'?) সৃষ্টি করিবার জন্যই লর্ড কার্জ্জন অবিমৃষ্যকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া একটি দারুণ জেদ করিয়াছিলেন। সেই জেদের যে কি নিদারুণ ফল দেখা দিল, তাহা আমার বন্ধু আর একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, ডাঃ রমেশ মজুমদার স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গভঙ্গে—

"দেশময় ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। গভর্ণমেণ্ট এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য কঠোর নীতির প্রয়োগ করিলেন। ফলে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণকে হত্যা করিবার জন্য দেশময় গুপ্তসমিতির সৃষ্টি হইল। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডসকল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ সমস্ত ভারতে এই গুপ্তসমিতি ছড়াইয়া পড়িল। দেশময় বৃটিশ-পণ্য বর্জ্জনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়া গেল।"—(ভা: সাঃ ইতিহাস—পৃঃ ৩৫৩)।

ডাঃ মজুমদার গভর্ণমেণ্টের দমন-নীতিকে (ক) গুপ্তসমিতি ও (খ) বয়কট্ আন্দোলনের জন্য দায়ী করিলেন। কিন্তু ইতিহাস তো সে কথা বলে না। অরবিন্দ ১৯০২ খৃঃ গুপ্তসমিতি সৃষ্টি করেন। এ কথা প্রমাণ-প্রয়োগের সহিত আমরা উল্লেখ করিয়াছি। দমননীতি দূরের কথা বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাবের বাষ্পকণাও তখন দেখা দেয় নাই। আর ১৯০৫।৭ই আগষ্ট বাঙ্গালী বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন করিবার জন্য সভা করেন। লর্ড মিণ্টো বা ফুলারের আমলের দমননীতি তখন আরম্ভই হয় নাই। ১৯০৬।১৪ই এপ্রিল বরিশাল-কনফারেন্সে ছোটলাট ফুলারের দমননীতি প্রচণ্ড বিক্রমে প্রথম আরম্ভ হয়। সুতরাং কি গুপ্তসমিতি, কি বৃটিশ পণ্য-বর্জ্জন—ইহার প্রথম কারণ দমননীতি নহে। পরে দমননীতি যতই ইহাদিগকে উস্কাইয়া দিয়া থাকুক না কেন। ডাঃ মজুমদার গুপ্তসমিতির ইতিহাস

ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিবার সুযোগ পান নাই। দমননীতি গুপ্তসমিতি সৃষ্টি করিয়াছে, কিম্বা গুপ্তসমিতি দমননীতি সৃষ্টি করিয়াছে—এ বিষয়ে ইতিহাস আরো কিছুটা দিবালোকে আসিলেই পরিষ্কার হইয়া উঠিবে, কুয়াসা কাটিয়া যাইবে।

পাঠান আমলে বঙ্গ-বিভাগ : বাংলার ইতিহাস-অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট (অবশ্য আমার বন্ধু ডাঃ মজুমদার তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি) বঙ্গ-ভঙ্গ কিছু নূতন বস্তু নয়। বক্তিয়ারের বাঙলা আক্রমণের এক শতাব্দী পরে এবং বাংলার মুসলমান-রাজগণ দিল্লীর পাঠান-বাদশাহদের অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার কিছুটা পূর্ব্বেই শাসনকার্য্য সুপরিচালনের (*efficiency ?*) জন্যই এক বঙ্গদেশকেই তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। বাংলার শাসনকর্ত্তা প্রায়ই দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতেন। সমগ্র বাংলা তাঁহার শাসনাধীন বলিয়া, এই বিদ্রোহ দমন করিতে দিল্লীর বাদশাহের বড়ই অসুবিধা হইত। এবং বাংলার শাসনকর্ত্তারাও প্রায়ই বিদ্রোহ করিতেন। সুতরাং যাহাতে বিদ্রোহ না হইতে পারে অথবা বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তাকে অল্প আয়াসেই দমন করা যাইতে পারে, এজন্য বাংলাদেশকে তিনভাগে ভাগ করিয়া (১) পশ্চিমবঙ্গে মালদহ জেলায় লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) রাজধানী করিয়া নাসিরুদ্দিনকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইল। যেন তিনিই ছোটলাট ফ্রেজার সাহেব হইলেন। (২) পূর্ব্ব বাংলায় সোনারগাঁকে রাজধানী করিয়া বৈরামখাঁকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইল। বৈরাম খাঁ যেন ফুলার সাহেব হইলেন। ঢাকা অধুনিক সহর। ১৩শ-এর শেষ এবং ১৪শ-এর প্রথমে ঢাকা হইতে মাত্র ১৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে সোনারগাঁতে রাজধানী ছিল। সুতরাং পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ ভাগ হইয়া গেল। (৩) ত্রিহুতে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ সৃষ্টি করিয়া আমেদ খাঁনকে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইল। মহম্মদ শা (১৩২৫-৪০) দিল্লীর বাদশা হইলেন। নাসিরুদ্দিনের পর কাদেরখাঁকে তিনি লক্ষ্মণাবতীর (গৌড়) শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া বৈরামখাঁকে সোনারগাঁতেই বহাল রাখিলেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলার এই দুই শাসনকর্ত্তা 'এফিসিয়েন্সি'র সহিত ১৪ বৎসর শাসন করিলেন। এ সমস্তই পুরাতন ইতিহাস। লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ যেমন নূতন কিছু নয়, তেমনি তাঁর 'এফিসিয়েন্সি'র দোহাইও নূতন কিছু নয়। বাঙ্গালীর ছেলে বাংলার ইতিহাস জানে না বলিয়াই এই অপ্রাসঙ্গিক কথা অতি বিস্তারে বলিতে হইল।

কিন্তু মহম্মদ খাঁর সময় হইতে লর্ড কার্জ্জনের সময়ের মধ্যে ব্যবধান দীর্ঘ ছয়টি শতাব্দী। ছয় শতাব্দীর ব্যবধান হইলেও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পরিস্থিতি ও অবস্থার তো কোন গুরুতর পরিবর্ত্তন হয় নাই। পাঠান মোগল বৃটিশ— ইতিহাসের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া এই তিন-তিনটি সাম্রাজ্যের কড়া শাসনে শৃঙ্খলিত হইয়া বাঙ্গালী জাতি সমান পরাধীন রহিয়াছে। বঙ্গ-ভঙ্গের জন্য পরাধীন বাঙ্গালী তো পাঠান আমলে বিদ্রোহ করে নাই—সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত হইবার কোন চেষ্টা করে নাই। ইতিহাসে কোন প্রমাণ নাই।

মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ : মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে অবশ্য বাংলার বারো ভূঁইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু বারো ভুঁইয়া একত্র মিলিত হইয়া যুদ্ধ করেন নাই। প্রতাপাদিত্য ও ঈশাখাঁ প্রভৃতি প্রত্যেকেই পৃথকভাবে নিজ নিজ এলাকার জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন। অখণ্ড বাংলার জন্য কোন ভূঁইয়া বা কোন মিত্রাই মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নাই। এখন লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদে অখণ্ড বাঙ্গালী জাতি প্রতিবাদ-সভা, বয়কট, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, বৈপ্লবিক ডাকাতি, গুপ্ত-হত্যা, বোমা নিক্ষেপাদি কার্য্য করিয়াছিল কিনা তাহাই আলোচনার বিষয়। অন্ততঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে-বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলনে অখণ্ড বাঙ্গালী জাতির একটা সুস্পষ্ট আদর্শ ছিল। এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের জন্য চেষ্টাও হইয়াছিল। ১৬শ শতাব্দীর শেষ এবং ১৭শ-এর প্রথমে মোগলের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর যে বিদ্রোহ অথবা বিদ্রোহমূলক যুদ্ধ, তাহা স্বদেশী আন্দোলনের মতো এতটা এরকম ছিল না। পলাশীর যুদ্ধের দেড়শত বৎসর পরে, ইংরেজ আমলে বাঙ্গালী জাতি অখণ্ড বাংলার জাতীয়তার আদর্শ লইয়া যতটা অগ্রসর হইয়াছে, আমরা ২০শ শতাব্দীর প্রথম দশকে তাহারই কিছুটা পরিচয় পাইতেছি মাত্র। প্রাচীন ইতিহাসে বাংলাদেশ অখণ্ড নয়, খণ্ড খণ্ডই বেশী দেখা যায়।

লর্ড কার্জ্জনের ভেদনীতি-বনাম-অখণ্ড বাংলার আদর্শ : লর্ড কার্জ্জন শুধু ভূগোলের দিক দিয়াই এক অখণ্ড বাংলাকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম, দুই খণ্ডে বিভক্ত করেন নাই। তিনি আরো কিছু করিলেন। অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানকে সম্প্রদায় হিসাবে পরস্পর নিজেরাই ঝগড়া করিয়া দুই ভাগ হইবার পক্ষে নিজে ঢাকা নগরীতে গিয়া নবাব সলিমোল্লার কর্ণে অনেক সদুপদেশ (!)

প্রদান করিলেন। ইহার ফলে, ছয় বৎসর পর ১৯১১৷১২ই ডিসেম্বরে ভূগোলের হিসাবে দুই খণ্ডে খণ্ডিত বাংলা আবার জোড়া লাগিলেও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় হিসাবে রাজনৈতিক ভেদনীতির অবলম্বনে যেরূপ দ্বিধাবিভক্ত হইল—সে ভেদবিদ্বেষ ও বিভাগ অদ্যাপি রহিয়া গিয়াছে বলিলে ঠিক বলা হয় না; বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিলেই ঠিক বলা হইবে। দ্বিখণ্ডিত বাংলা ছয় বৎসর পরে আবার জোড়া লাগিলেও ইহাতে সুরেন্দ্র ব্যানার্জী উল্লসিত হইয়া আত্মজীবনী লিখিলেন বটে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ যে ক্রমেই বাড়িয়া চলিল—ইহাতে আমরা দুঃখিতই হইলাম। ইংরেজের ভেদনীতি জয়লাভ করিল। সিংভূম, মানভূম প্রভৃতি বাঙালী হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিকে বাংলার বাহিরে ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিয়া বাঙালী হিন্দুকে কৌশলে কৃত্রিম উপায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে বঞ্চিত করা হইল। তাই না আজ এই বিপদ। কাজেই বলিতে হয়—বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হইলেও শেষ পর্য্যন্ত কার্জ্জনী ভেদনীতিরই জয় হইল। জাতীয়তাবাদী নেতা মাত্রই ইহা দেখিয়া চমকিত হইলেন। ফলে ১৯৪২ খৃঃ মহাত্মা গান্ধীকে পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইল যে, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের এক হওয়া সম্ভবপর নয়। ইহা বাংলার চরমপন্থী এবং অরবিন্দের মত বিপ্লববাদী নেতার কথা। প্রকাশ্য চরমপন্থী এবং গুপ্ত-বৈপ্লবিক রাজনীতিতে এই কথাই আমরা পাই। এখন এই বাঙ্গালী নেতাদের ছত্রিশ বৎসর পরে মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদিগকে অনুকরণ করিয়া উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়া ১৯৪২।৭ই আগষ্ট জেলে গমন করিলেন। অবশ্য একদিনে মহাত্মা গান্ধী স্বদেশী যুগের বাঙ্গালী নেতাদের অনুকরণ করেন নাই। অনেক সাধাসাধি, ব্ল্যাঙ্ক চেক, আমরণ উপবাস প্রভৃতি নাটকীয় কার্য্যাদি শেষ করিয়া পরে বাঙ্গালী স্বদেশী যুগের নেতাদের অনুকরণ করিয়াছেন।

১৮৯৩ খৃঃ অরবিন্দ হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সমস্যা সম্পর্কে ইংরেজের ভেদ-নীতিকে এবং সেই সঙ্গে মুসলমানদিগের সাম্প্রদায়িকতাকে দায়ী করিয়া নিজের সুস্পষ্ট অভিমত 'ইন্দুপ্রকাশ'এ এবং ১৯০৮ খৃঃ কিশোরগঞ্জ পল্লীসমিতি বক্তৃতায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন (* ক)। লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গ-ভঙ্গের ১০ বৎসর পূর্ব্বে

(* ক) "I do not at all mean to re-echo the Anglo-Indian catchword about the Hindus and Mahomedans. Like most catchwords it is without much force, and has been

অরবিন্দ এই সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার স্বাধীন মতের অনুরূপ একটি সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন। সময় হিসাবে অরবিন্দের সিদ্ধান্ত মহাত্মা গান্ধীর সিদ্ধান্ত হইতে এক হিসাবে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে, অন্য হিসাবে ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে। চিন্তার অগ্রগতিতে অরবিন্দের সমকক্ষ আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। 'ইন্দুপ্রকাশে'র প্রবন্ধগুলিই তার প্রমাণ।

১৯০৪ গ্রীষ্মকালে লর্ড কার্জ্জন একবার বিলাত গিয়াছিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গের আলোচনা অথবা লর্ড কিচ্‌নারের সহিত বিবাদের বিষয় পরামর্শ করিতে গিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। ১৯০৪।২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি ময়মনসিংহ ও ঢাকা গিয়াছিলেন। ময়মনসিংহে তিনি মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্যের অতিথি হইয়াছিলেন। প্রাতে ৮½টায় আসিলেন, বিকাল ৪½ টায় হঠাৎ লর্ড কার্জ্জন ঢাকা চলিয়া গেলেন। তখন বাংলাদেশের জমিদারদের মধ্যে মহারাজ সূর্য্যকান্তের মতো এতটা শক্ত মেরুদণ্ড আর কাহারো ছিল না। তিনি লর্ড কার্জ্জনকে সোজা বলিলেন যে, বঙ্গ-ভঙ্গের তিনি বিরোধী এবং ইহার প্রতিবাদ-আন্দোলনে তিনি নিঃসন্দেহে যোগ দিবেন। বরোদার মহারাজাও লর্ড কার্জ্জনকে ইহার অপেক্ষা জোরালো কথা বলিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। মনে হয় পারিতেন না। ময়মনসিংহ হইতে তিনি ঢাকা গেলেন।

still further stripped of meaning by the policy of the Congress.···It is entirely futile then to take up the Anglo-Indian refrain".—[*Induprakash*—August 28, 1893 ; Arobindo Ghose]

"The foreign organism which has been living on us, lives by division and it perpetuates its existence by making us look to it as the centre of our lives and away from our Mother and Her children.···

"It has set Hindu and Mahomedan at variance by means of this outward look.···The Hindu first fell a prey to this lure and it was the Mahomedan who was then feared and held down. Now that the Hindu is estranged, the same lure is held to the Mahomedan."—[*Speech* by *Arabindo Ghose* at Kishoreganj on Palli Samiti—1908]

নবাব সলিমোল্লা লর্ড কার্জ্জনের কথায় রাজি হইলেন। মহারাজ সূর্য্যকান্ত ও নবাব সলিমোল্লার যে পার্থক্য দেখা দিল এবং যে পার্থক্য লর্ড কার্জ্জন সৃষ্টি করিলেন, তাহার বিষময় ফল জাতীয় জীবনে পরবর্ত্তী বৎসরগুলিতে ফুটিয়া উঠিবে।

৭ই আগষ্ট কলিকাতা টাউনহলে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন (বয়কট) সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই বিরাট সভা লর্ড কার্জ্জনের নাকের উপর হইয়াছিল। ইহার মাত্র ৫ দিন পর লর্ড কার্জ্জন পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেন। পদত্যাগের কারণ—লর্ড কার্জ্জন জঙ্গীলাট লর্ড কিচ্‌নারকে তাঁহার অধীনে থাকিতে বলেন। লর্ড কিচ্‌নার তাহা অস্বীকার করেন। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ লর্ড কিচ্‌নারকে সমর্থন করেন। ফলে লর্ড কার্জ্জন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ এক্ষেত্রে লর্ড কার্জ্জনকে পুরামাত্রায় সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, উভয় পক্ষেই যথেষ্ট বলিবার আছে ("much might be said on both sides of the disputes")। মিঃ ব্রড্রিক, পরে লর্ড মিডল্‌টন্ তখন ভারতসচিব ছিলেন। তিনি বলেন, লর্ড কিচ্‌নারের সহিত ঝগড়ায় লর্ড কার্জ্জনকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাকে যথেষ্ট অপমান ও ক্ষুন্ন করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। নতুবা শাসনকার্য্যের সুপরিচালনের জন্য বঙ্গভঙ্গ মঞ্জুর করা হয় নাই। তাহা হইলে 'এফিসিয়েন্সি' কথাটা দাঁড়ায় কোথায়? আশ্চর্য্য!

লর্ড কার্জ্জন ঝগড়া করিলেন লর্ড কিচ্‌নারের সঙ্গে। তাহার ফলে কর্ত্তৃপক্ষ বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। পরে যাহা ঘটিল তাহা ইংরেজ আমলে ইতিপূর্ব্বে আর কখনো ঘটে নাই। ইতিহাসে কোন্ ঘটনা হইতে যে কোন্ ঘটনা ঘটে, তাহা নিরূপণ করা বড়ই কঠিন।

বঙ্গ-ভঙ্গে অরবিন্দের অভিমত: অরবিন্দ এই বঙ্গ-ভঙ্গকে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে—ইহা 'greatest blessing', ইহা মরীচিকা 'illusion' দূর করিয়াছে (* খ)। ইহা স্বদেশী আন্দোলনকে সৃষ্টি করিয়াছে।

(* খ) "It is only through repression and suffering that *maya* can be dispelled; and the bitter fruit of partition of Bengal administered by Lord Curzon dispelled the *illusion*." —*Baruipur Speech, 12th April, 1908; Arobindo Ghose.* এই বক্তৃতার মাত্র ১৯ দিন পরে ২রা মে অরবিন্দ আলিপুর বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হইয়া প্রায় এক বৎসর কারাগারে থাকেন।

সুতরাং সেদিক দিয়া ধরিতে গেলে অরবিন্দ বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করিলেন। আমরা পরে দেখিব যে, অরবিন্দ যেমন লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন তেমনি লর্ড মিণ্টোর দমনীতিও সমর্থন করেন। কেননা, এই দমননীতিতে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইলে লোকে স্বভাবতঃই বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইবে। অন্যান্য নেতা অপেক্ষা অরবিন্দের দৃষ্টি পৃথক। তিনি একজন সত্যকার বিপ্লবী। তাঁহার বিপ্লবী মন যে-চক্ষে তখনকার ঘটনাগুলি দেখিয়াছে অন্য কোন নেতা সে-চক্ষে দেখেন নাই। কেননা, তাঁহারা অরবিন্দের মতো—এক ভগিনী নিবেদিতা ছাড়া, কেহই বিপ্লববাদী ছিলেন না। বিপ্লবী অরবিন্দ অন্যান্য চরমপন্থী নেতাদের অপেক্ষা পৃথক।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু (জন্ম—১৮১৭; মৃত্যু—১৯০৫।১৯শে জানুয়ারী)ঃ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ-আন্দোলন যখন পুরা ১৯০৪ খৃঃ ধূমায়িত অবস্থায় চলিতেছিল এবং অরবিন্দ গুপ্তসমিতির প্রথমপর্বে ব্যর্থ হইয়া যখন বরোদায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সময় কলিকাতায় মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের মৃত্যু হয়। উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ এবং রাজা রামমোহনের পর সর্ব্বাপেক্ষা বড় একটা ইন্দ্রপাত হইয়া গেল। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী যে সংস্কার-চেষ্টা লইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ জীবনকে আলোড়িত করিয়া গিয়াছে, দেবেন্দ্র-নাথের সহিত কলিকাতার নিমতলা শ্মশান-ঘাটে সে তাহার শেষ চিতাশয্যা রচনা করিল। মহর্ষির মৃত্যু উনবিংশের সহিত বিংশ শতাব্দীর বিচ্ছেদ-রেখা গভীরতর করিয়া দিয়া গেল। অরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসু—দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মবন্ধু, শিষ্য ও সখা। অরবিন্দ তাঁহার মাতামহের সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের সহিত কোনো দিন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। এই দেবেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিয়াছেন। বিজয়কৃষ্ণ একরকম বলিতে গেলে মহর্ষির শিষ্য ছিলেন। বিবেকানন্দও নিবেদিতাকে লইয়া দেবেন্দ্রনাথকে দেখিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু অরবিন্দ কোন দিন দেবেন্দ্রনাথকে দেখিতে গিয়াছিলেন বলিয়া কাহারও নিকট শুনি নাই। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর উগ্র চরমপন্থী রাজনীতি নাই। অরবিন্দের গুপ্তসমিতি, গুপ্তহত্যা, বৈপ্লবিক ডাকাতি—এসব কিছুই নাই। বঙ্কিমের এবং অরবিন্দের 'ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী' বা 'বন্দে-মাতরম্' গান নাই—শিবাজী-উৎসব বা ভবানী-পূজা নাই। বরোদায় অরবিন্দের

বগলামূর্ত্তির পূজা দেবেন্দ্রনাথে নাই। তিনি রামমোহন-উপাসিত নির্গুণব্রহ্ম-বিরোধী উপনিষদের সগুণব্রহ্মবাদী ঋষিব্যক্তি। অরবিন্দের সহিত পরবর্ত্তী জীবনে দেবেন্দ্রনাথের সাদৃশ্য আছে। উভয়েই প্রাচীনতম উপনিষদের (বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য) নির্গুণব্রহ্ম ও মায়াবাদের বিরোধী। এবং উভয়েই পরবর্ত্তী উপনিষদের (ঈশ, কেন, কঠ ইত্যাদি) সগুণব্রহ্ম ও পরিণামবাদের, অরবিন্দের মতে, লীলাবাদের পক্ষপাতী। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ অবতারবাদ বা নরপূজার একান্ত বিরোধী। অরবিন্দ তাঁহার জীবনের পণ্ডিচেরী অধ্যায়ে এক নূতন ধরনের যুগলিত নরপূজার প্রবর্ত্তক এবং নিজেই অবতার। এক্ষেত্রে—অর্থাৎ নরপূজা ও অবতারবাদে অরবিন্দ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ এবং এমন কি তাঁহার পূজ্যপাদ মাতামহ রাজনারায়ণের প্রচণ্ড বাধানিষেধ, আক্ষেপ, শ্লেষ ও পরিহাস—কিছুই মানেন নাই বা শোনেন নাই। এই ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে উনবিংশ শতাব্দীর (১৮৬৮ খৃঃ) মুঙ্গেরে কেশবচন্দ্রের অবতারকে পরাস্ত করিয়াছে। ভক্তিমতী ব্রাহ্মিকারা চুলের খোপা খুলিয়া কেশবচন্দ্রের পা মুছিয়া দিতেন। কেশবচন্দ্র বলিতেন—"আমি ভক্তির স্রোতকে বাধা দিতে চাহি না।" আর বাধা দিলেই বা স্রোত তাহা মানিবে কেন? খোপাও খুলিবে—পা'ও মুছিবে!

বাংলা সাহিত্য: (ক) রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ প্রথমার্দ্ধে 'ভাণ্ডার' নামে এক মাসিক-পত্রিকার সম্পাদক হইলেন। বাংলার চরমপন্থী রাজনীতি তাহাতে আলোচিত হইতে লাগিল। কংগ্রেসী অথবা সভাসমিতির রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত কি করিয়া গণসংযোগ করা যায়—এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য মিঃ এন. এন. ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জে. চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল এবং আরও অনেকে যোগ দিয়াছিলেন। ইহা ১৯০৫ খ্রীঃ প্রথমার্দ্ধের ঘটনা। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ-আন্দোলন ধূমায়িত অবস্থার চরম সীমায় যখন আসিয়াছে তখন রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র এমন কি সুরেন্দ্র ব্যানার্জি পর্যন্ত সবেমাত্র গণসংযোগ (mass contact) আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। ইহার বারো বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯৩।৪ঠা ডিসেম্বর অরবিন্দ লিখিয়া গিয়াছেন—

"আমাদের দেশে প্রোলিটেরিয়েটেরা (সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র যাহারা) অজ্ঞতায় ও দুঃখ-দুর্দ্দশায় নিষ্পেষিত। কিন্তু যখন প্রত্যক্ষ করা গেল যে রাজনৈতিক আন্দোলনে মধ্যবিত্তশ্রেণী কপট ক্ষমতাহীন এবং বিচারবুদ্ধিহীন, তখন আমরা পছন্দ করি বা না-করি এই প্রোলিটেরিয়েটরাই এখন আমাদের শেষ ভরসা। …আমাদের প্রথম এবং পবিত্রতম কর্তব্য হইতেছে—এই প্রোলিটেরিয়েটদের উদ্ধার। ..এই কার্য্য আমাদের অনেক আগে করা উচিৎ ছিল।…সময় থাকিতে এই প্রোলিটেরিয়েটদের সংযত এবং সঙ্গতভাবে উদ্ধার না-করিলে ইহার পরিণামফল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত ঘটনা এবং তাহা সর্বপ্রকারে ধ্বংসকে অনিবার্য্য করিবে।" ("…The proletariat among us is sunk in ignorance and overwhelmed with distress. But with that distressed and ignorant proletariat—now that the middle-class is proved deficient in sincerity, power and judgment —with that proletariat resides, whether we like it or not, our sole assurance of hope, our sole chance in the future.… Our first and holiest duty is the elevation and enlightenment of the proletariat.…If indeed it is not too late…a sequel as awful, as bloody and purely disastrous". —*Induprokash*, Dec. 4, 1893—*New Lamps For Old.*)। অরবিন্দ ফরাসী বিদ্রোহের কথাই স্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেছেন। সবটা পড়িলেই বুঝা যায়।

ঠিক এই সময় ১৮৯৩।১১ই সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার চিকাগো সহরে হিন্দুধর্ম্মের তরফ হইতে অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের বিংশ শতাব্দীর উপযোগী ব্যাখ্যা দর্প ও দম্ভের সহিত প্রচার করিতেছেন।

জাতীয় আন্দোলনে, বিশেষত: কংগ্রেসে গণসংযোগের আবশ্যকতা অরবিন্দ ভারতীয় নেতাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেন। ১৮৯৩ খৃ: কংগ্রেস গণসংযোগের বিরোধী ছিল। মি: মনোমোহন ঘোষ ও মি: মেহেতা অকুতোভয়ে এই গণসংযোগের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের তরফ হইতে প্রতিবাদ ও বক্তৃতা করিয়াছেন। অরবিন্দের লেখনী—মনোমোহন ঘোষ ও মেহেতার বিরুদ্ধে, প্রোলিটেরিয়েটদের স্বপক্ষে অত্যন্ত অগ্নিগর্ভ ভাষা আগ্নেয়-

গিরির প্রস্রবণের মতো ক্রমাগত উদ্গীরণ করিয়াছে। ১৯০৫ খ্রীঃর প্রথমার্দ্ধে বাঙলার চরমপন্থী ও মধ্যপন্থী নেতারা রবীন্দ্রনাথের ভাণ্ডার পত্রিকা অবলম্বনে যে গণসংযোগের প্রস্তাব আলোচনা করিতেছিলেন তাহা গান্ধী-আন্দোলনের গণসংযোগ অপেক্ষা অনেক আগে আর অরবিন্দের প্রোলিটেরিয়েটবাদ প্রচারের অনেক পরে। ১২ বৎসর পরে। ১৮৯৩ হইতে ১৯০৫—বারো বৎসর। জাতীয় সমস্যার পরিকল্পনায় এখানেও অরবিন্দ পূর্ব্বগামী।

(খ) ১৯০৫।২২শে জুলাই নাট্যকার ডি. এল্. রায়ের রাণাপ্রতাপ কলিকাতা ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইল। অমৃত মিত্র সাজিলেন রাণাপ্রতাপ। অমৃত বসু সাজিলেন শক্তিসিংহ। মেহেরুন্নেসা সাজিল নরী (সুশীলা নয়)—পরে সুশীলা সাজিত। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই রাণাপ্রতাপ তাঁর 'কমরেড'দের মা কালীর কাছে গেরুয়া পরাইয়া খোলা তলোয়ার হাতে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, মোগলের হাত হইতে মেবারকে উদ্ধার করিতে হইবে। দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ নিতে হইবে এবং প্রাণ দিতে হইবে। আমরা ঐ প্রথমদিনের অভিনয়ে উপস্থিত ছিলাম। ভয়ে বিস্ময়ে প্রাণ চমকিত হইয়া উঠিল। আগেই বলিয়াছি, থিয়েটার কম লোকে দেখে না। সেদিন ইহাও একটা রাজনৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। অরবিন্দ বরোদায় থাকিয়া তখন ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন কি-না জানি না। কিন্তু ইহার পরের বৎসর (১৯০৬) হইতে ১৯০৮ পর্য্যন্ত অরবিন্দের গুপ্তসমিতির ২য় পর্ব্বে রঙ্গমঞ্চে রাণাপ্রতাপের আবহাওয়ার অনুরূপ বিংশ শতাব্দীর উপযোগী ঐ শ্রেণীর একটা আবহাওয়া দেখা যাইবে। তবে তাহা প্রকাশ্য নয়—গুপ্ত।

(গ) বাংলা সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে এই বৎসর (১৯০৫) উপাধ্যায়ের সন্ধ্যার কথা আগেই বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের ভাণ্ডারের কথা বলা হইল। কিন্তু হিতবাদী ও সঞ্জীবনীর কথা বলা হয় নাই। হিতবাদী ও সঞ্জীবনী এইসময় আন্দোলনের ধূমায়িত অবস্থায় ইহাকে ক্রমাগত ফুৎকারে প্রজ্বলিত অবস্থায় পৌঁছাইয়া দিবার চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। ১৯০৫।১লা আগষ্ট সঞ্জীবনী প্রথম প্রকাশ্যে বয়কট—বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন প্রস্তাব, উত্থাপন ও সমর্থন করেন। ইহার ছয় দিন পর ৭ই আগষ্ট টাউনহলে রয়কট সমর্থন করিয়া বিরাট সভা হয়। ইতিহাসে সে একটা স্মরণীয় সভা। এই শতাব্দীতে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে ইহা একটি প্রধান স্মরণীয় সভা। বাঙালীর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-

আন্দোলন বাঙালীই ধূমায়িত অবস্থা হইতে প্রজ্বলিত অবস্থায় আনিয়াছে। প্রজ্বলিত করিবার জন্য অন্য কেহ ইহাতে ফুৎকার করেন নাই।

অরবিন্দ বরোদায় থাকিয়া বাংলাদেশের এইসকল ঘটনা শ্যেনদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কেননা, এই সমস্ত ঘটনা তাঁহার মনে প্রচণ্ড আঘাত করার দরুন তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তিনি বরোদার চাকরি ছাড়িয়া পরবৎসরে (১৯০৬।এপ্রিল) বরিশালের স্মরণীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে চাকরির সমস্ত মায়া কাটাইয়া সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। ইংলণ্ড-প্রবাসের পর তাঁহার বরোদা-প্রবাসের জীবন শেষ হইবে—বাংলায় চারি বৎসরের জীবনলীলা আরম্ভ হইবে।

অরবিন্দের বগলামূর্ত্তি পূজা ঃ অরবিন্দ বাংলার গুপ্ত-সমিতির প্রথম পর্ব্বে ব্যর্থ হইয়া দেশ-উদ্ধারের জন্য অলৌকিক উপায় অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমসাময়িকেরা এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বারীন্দ্রের কথা হইতে বুঝি যে, গুপ্ত-সমিতির প্রথম পর্ব্ব (১৯০২—১৯০৪) যখন বাংলাদেশে চলিতেছিল সেই সময়েই অরবিন্দ দেশ-উদ্ধারের জন্য অলৌকিক উপায়ে সাহায্য লইতে বিধিমত চেষ্টা করিতেছিলেন। তবে বারীন্দ্রের তারিখ উল্লেখ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়—এই একটা ভয়ের কথা।

বারীন্দ্র বলেন, ১৯০৩ বা তার কাছাকাছি অরবিন্দ নর্ম্মদাতীরে চান্দোতে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজকীয় অমাত্যবর্গের দলবলসহ তাঁহার আশ্রমে যাইতেন। এই সময় বরোদাতে আরো একটি ভস্মমাখা যোগী অরবিন্দের বাড়ীতে আসিতেন। 'এই সময়ে' বলাতে বোঝা যায়, ১৯০৩ খৃঃর কাছাকাছি। তখন গুপ্ত-সমিতির প্রথম পর্ব্ব (১৯০২-১৯০৪) চলিতেছে।

ঐ ভস্মমাখা জটাধারী যোগী অরবিন্দকে সংস্কৃতে অনেকগুলি শিবের স্তোত্র দিয়া যাইতেন। তারপর ঐ যোগী একজন ব্রাহ্মণকে অরবিন্দের নিকট পাঠাইয়া দেন। অরবিন্দ তাঁহার বাড়ীর ঘেরার মধ্যে একটি ছোট কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঐ ব্রাহ্মণ সেই কুটীরে স্বর্ণনির্ম্মিত একটি বগলামূর্ত্তি তৈয়ার করাইয়া প্রতিষ্ঠা ও পূজা করেন। ঐ ব্রাহ্মণ বদ্ধদুয়ারে তান্ত্রিক বিধিমতে বগলামুখীর পূজা যেরূপভাবে করা দরকার তাহা করেন। "Another ash-covered jogi with long and tawny matted locks used to visit Aurobindo at this time and leave long strotras or hymns

to Shiva behind in Sanskrit manuscript. He sent a Brahmin once to do yapa or tapasya for Aurobindo, and a hut was created in our compound and a *golden image of Bagala was prepared*. With closed doors the Brahmin devotee used to perform his secret ceremonies in front of this image of truncated goddess."—*Barindra K. Ghose*.

তান্ত্রিক মাত্রেই অবগত আছেন যে, শত্রু বধ করিবার জন্যই বগলামুখী দেবীর পূজা করা হয়। এ বিষয়ে বাংলার তন্ত্রে আর মহারাষ্ট্রের তন্ত্রে কিছুই পার্থক্য নাই। সম্পূর্ণ এক মত। বগলামুখী দশমহাবিদ্যার একটি মহাবিদ্যা।

দেবীর আকার এইরূপ—সুধাসাগর মধ্যে মণিময় মণ্ডপ, তন্মধ্যে রত্নিনির্মিত বেদীর উপর সিংহাসন আছে, বগলামুখী দেবী সেই সিংহাসনে উপবিষ্টা আছেন। ইনি পীতবর্ণা, পীত আভরণ ও পীতবর্ণ মাল্য দ্বারা বিভূষিতা। ইঁহার এক হস্তে মুদ্গর ও অপর হস্তে বৈরি জিহ্বা। ইনি বাম হস্তে শত্রুর জিহ্বাগ্র ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে গদাঘাতে শত্রুকে প্রপীড়িত করিতেছেন। বগলামুখী দেবী পীতবস্ত্রে আবৃত ও দ্বিভুজা—॥৭১॥ বৃহৎ তন্ত্রসার।

ধ্যানের বিশেষ আছে, যথা—দেবী গম্ভীরাকৃতি, সর্ব্বদা মদোন্মত্তা। ইঁহার দেহ স্বর্ণের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট, চারি হস্ত ও তিন নয়ন। স্তন-যুগল দৃঢ় ও স্থূল, দেবী পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া ও হেমকুণ্ডলে বিভূষিতা হইয়া রত্নসিংহাসনোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্টা আছেন। দেবীর কপালে পীতবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্র, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে মুদ্গর ও পাশ, বাম হস্তদ্বয়ে জিহ্বা ও বজ্র আছে। অঙ্গের ভূষণসকল পীতবর্ণ ও ভীষণাকার—॥৭৫॥ বৃহৎ তন্ত্রসার।

মূর্ত্তিতে দ্বিভুজাও পাইলাম আবার ধ্যান-বিশেষে চতুর্ভুজাও পাইলাম। তন্ত্রে এ রকম হয়। এ রকম আরো আছে। কিন্তু শত্রুর জিহ্বা টানিয়া ধরিয়া গদাঘাতে তাহাকে বধ করিতেছেন—এইটি সবচেয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয়। আর কোনো মহাবিদ্যা সাক্ষাৎভাবে শত্রুবধ করিতে নিযুক্তা নহেন। ছিন্নমস্তা শত্রুবধ করিতেছেন না। নিজের গলা নিজে কাটিয়া নিজেই নিজের রক্ত নিজের কাটামুণ্ডে পান করিতেছেন। প্রকৃতির এই আত্মহত্যা

এ রকম ভীষণভাবে আর কুত্রাপি কল্পিত বা চিত্রিত বা নির্ম্মিত হইয়াছে কি-না জানি না। সুতরাং বগলামুখী ছিন্নমস্তা হইতে ভিন্ন। চণ্ডী প্রথমে শিবের স্ত্রী ছিলেন না। পরে শিবের স্ত্রী হইয়া দশহস্তে দশ প্রহরণ ধারণ করিয়া শত্রুবধ করিতেছেন। এই দুর্গাই বঙ্কিমের দেশমাতৃকারূপে কল্পিত এবং এই কল্পনা দ্বারা অরবিন্দ তাঁহার রাষ্ট্রীয় সাধনায় যথেষ্ট প্রভাবান্বিত। কিন্তু বরোদায় এই সময় তিনি চণ্ডীকে আহ্বান করেন নাই—শত্রুবধের জন্য বগলামুখীকে আহ্বান করিয়াছেন। বগলামুখীর সোনার মূর্ত্তি তিনি গড়িয়া দিয়াছেন। তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ রুদ্ধদ্বারে শত্রুবধের জন্য পূজা করিতেছেন।

এখন প্রশ্ন: অরবিন্দের শত্রু কে? ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার কেহই শত্রু ছিল না এবং এখনও নাই। ১৯০৫।৩০শে আগষ্ট তিনি তাঁহার স্ত্রীকে যে স্মরণীয় চিঠি লেখেন, তাহাতে অরবিন্দের শত্রুর সম্পর্কে এক অতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি লিখিতেছেন—

"প্রিয়তমা মৃণালিনী,…অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কী করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে—না, মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়িয়া যায়?"

এখন বুঝা গেল অরবিন্দের শত্রু কে। এবং কেন তিনি অন্যসব মহাবিদ্যা ছাড়িয়া দিয়া বগলামুখীর পূজা করাইতেছেন। অরবিন্দের বগলামুখী পূজার যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিয়া থাকে, তবে আমরা তাহা অবগত নই। যাহা অবগত নই তাহা লেখা সম্ভব নয়।

বঙ্গ-ভঙ্গের পরবর্ত্তী ইতিহাস (১৯০৫।জুলাই): গবর্ণমেণ্ট ২০শে জুলাই বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া সবিস্তারে প্রকাশ করিলেন। সুরেন্দ্র ব্যানার্জি লিখিয়াছেন যে, হঠাৎ বোমা ফাটিলে লোকে যেমন চমকিত হয় এই সংবাদে বাঙালীরা সেইরূপ চমকিত হইয়া উঠিল (…"The announcement fell like a bomb-shell upon an astonished public.")। এইরূপ হঠাৎ চমকিত হইবার কারণ, প্রতিবাদ-আন্দোলনের ধূমায়িত অবস্থায় গবর্ণ

মেণ্ট দীর্ঘকাল ধরিয়া সেরেফ্ চুপ করিয়া ছিলেন। পাশাটি নড়ে নাই—কথাটি বলেন নাই। আন্দোলনকারীরা ভাবিয়াছিলেন বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাব ফাসিয়া গিয়াছে। মনের এই অবস্থার উপর বঙ্গ-ভঙ্গের মঞ্জুর-প্রস্তাব বোমা-ফাটার মতোই বোধ হওয়া স্বাভাবিক। হইলও তাই। আন্দোলন এই প্রচণ্ড আঘাতের মাত্র ষোল দিন পরে ৭ই আগষ্ট তারিখে প্রজ্বলিত অবস্থায় গিয়া উপনীত হইল। ধূমায়িত ও প্রজ্বলিত অবস্থার মধ্যে আমরা মাত্র ষোলটি দিনের ব্যবধান দেখিতে পাইতেছি। ২০শে জুলাইয়ের পর লর্ড কার্জ্জনের পদত্যাগের মাত্র একুশ দিন বাকী থাকে। তিনি ১২ই আগষ্ট পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেন। প্রজ্বলিত অবস্থার পরে পাঁচ দিন মাত্র লর্ড কার্জ্জন সরকারীভাবে বড়লাটের গদিতে সমাসীন ছিলেন।

২০শে জুলাই হইতে ৭ই আগষ্ট—এই ষোল দিনের মধ্যে সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী প্রভৃতি নেতারা প্রথমে কলিকাতা পাথুরীয়াঘাটায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে পরামর্শ-সভা করিলেন। পরে ভারত-সভা (Indian Association) -গৃহে প্রতিদিন পরামর্শ-সভা বসিতে লাগিল। কলিকাতার মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর প্রাসাদেও পরামর্শসভা জটলা করিতে লাগিল। ৭ই আগষ্ট কলিকাতা টাউন-হলে প্রতিবাদ-সভা করিবার প্রস্তাব স্থির হইল। মফঃস্বল হইতে নেতাদের আসিবার জন্য চিঠি গেল। কোন কোন মফঃস্বলের নেতা সময় কিছুটা পিছাইয়া দিবার জন্য চিঠি লিখিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রাজি হইলেন না। আন্দোলনের যে আবেগ যে প্রেরণা আসিয়াছে, তাহাকে হিসাব-নিকাশ করিয়া পিছাইয়া দেওয়া যাইবে না। ("...I wrote back, after consulting friends, that time was an important element, and that the first great demonstration should be held early, so as to give the movement a lead and a direction which would co-ordinate its future development and progress throughout the province."—*A Nation In Making*, Surendra Nath Banerji, *p 189*.

কি ব্যক্তির জীবনে, কি সমাজ-জীবনে যখন কোন উত্তেজনা বা প্রেরণা আসে, তখন সময়কে তাহা মানিয়া চলিতে হয়। আন্দোলন একটা চৈতন্যময় বস্তু। সেই চৈতন্যময় বস্তু তার নিজের প্রয়োজন মতো সময়কে

বাছিয়া কাটিয়া-ছাটিয়া নয়। কখন যে কি হয়, কেন হয়—তা আমরা সবটা পরিষ্কার বুঝিতে পারি না। এবং তা পারি না বলিয়াই এই আন্দোলন সম্পর্কে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৯১৭ খৃঃএ যে কথাগুলি বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ঠিক বলিয়াই মনে হয়—

"প্রাণের যে বন্যা, সে ত অঙ্কশাস্ত্র মানে না, সে যে সকল মাপকাঠি ভাসাইয়া লইয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মত বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রাণ যখন জাগে তখন ত হিসাব করিয়া জাগে না। মানুষ যখন জন্মায় সে ত হিসাব করিয়া জন্মায় না। না-জন্মাইয়া পারে না বলিয়াই জন্মায়। আর না-জাগিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই প্রাণ একদিন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে। এই যে মহাবন্যার কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া—ডুবিয়া বাঁচিয়া আছি। বাঙলার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙলার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। ... .স্বদেশী আন্দোলন হিসাব না করিয়াই আসিয়াছিল, হিসাব না করিয়াই চলিয়া গেল।"—দেশের কথা। চিত্তরঞ্জন দাশ। পৃঃ ৩৩।

এই আন্দোলন সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অভিমত উদ্ধার করিয়া দিলাম। কেননা, ইহা আন্দোলনকে সমগ্রভাবে বুঝিতে সাহায্য করিবে। ইঁহারা দুইজনে এই আন্দোলনকে কথঞ্চিৎ ভিন্ন দিক হইতে দেখিয়াছেন। রাজার বিরুদ্ধে প্রজার বৈধ এবং আইনসঙ্গত উপায়ে যে আন্দোলন, বাঙলাদেশে সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী তখন তাহার অবিসংবাদিত নেতা। তিনি সুদক্ষ রাষ্ট্রনায়কের দৃষ্টিতে ইহাকে দেখিয়া ৭ই আগষ্টের সময় পিছাইয়া দিতে পারিলেন না ('time is an important element')। দেশবন্ধু দেখিয়াছেন কবির ভাবপ্রবণ উদার দৃষ্টি দিয়া। তিনি আন্দোলনের চৈতন্যময় প্রেরণাকেই সময় অপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছেন। অরবিন্দ এই আন্দোলন দেখিয়াছিলেন। এই আন্দোলনকে দুই চক্ষু ভরিয়া বরোদা হইতে দেখিতেছিলেন শুধু দেখেন নাই, মজিয়াছিলেন। শুধু মজেন নাই, ডুবিয়াছিলেন।—পরে ভাসিয়া উঠিয়াছেন। সে কথা ক্রমে সবিস্তারে বলিতেছি।

১৯০৫।আগষ্ট। ৭ই আগষ্ট কলিকাতা টাউনহলে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের জন্য সবচেয়ে জাঁকালো এবং ধারালো সভা হয়। জাঁকালো এই জন্য যে, সভায় এতো লোক আসিয়াছিল যে তিনটা সভা করিতে হইয়াছিল। ধারালো বলি এই জন্য যে, এই সভায় প্রথম বয়কট—বৃটিশ পণ্য বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। নরেন্দ্রনাথ সেন এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি তুলিয়া দিতেছি—

"That this meeting fully sympathises with the resolution adopted at many meetings held in the mofussil to abstain from the purchase of British manufactures so long as the Partition Resolution is not withdrawn, as a protest against the indifference of the British public in regard to Indian affairs and the consequent disregard of Indian public-opinion by the present Government."

সুতরাং বয়কট্ ভূমিষ্ঠ হইল ৭ই আগষ্ঠ কলিকাতা টাউনহলে। কিন্তু ইহার প্রসব-বেদনা ইতিপূর্ব্বেই মফঃস্বলে বহু সভায়—বিশেষতঃ পাবনায় আরম্ভ হইয়াছিল। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী লিখিতেছেন—

"...boycott of British goods was publicly started—by whom I cannot say—by several, I think, at one and the same time. It first found expression at a public meeting in the district of Pabna, and it was repeated at public meetings held in other mofussil towns; and the successful boycott of American goods by the Chinese was proclaimed throughout Asia and reproduced by the Indian news-papers."—*Nation In Making*—Surendranath Banerji, *pp. 130-91.*

অরবিন্দ তখন বরোদায়। কিন্তু অরবিন্দ ছাড়াও বাংলাদেশে তখন আরো চরমপন্থী নেতা ছিল। যদি তাঁহারা কেহ বয়কটের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করিয়া থাকেন তবে তাঁহার নাম সম্ভবতঃ ইচ্ছা করিয়াই সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী উল্লেখ করেন নাই। ইহা অসম্ভব নয়। বয়কটের জন্ম দেখিলাম। এইবার 'স্বদেশী'র জন্ম দেখিতে হইবে।

সুরেন্দ্র ব্যানার্জী বলেন যে, ঐ ৭ই আগষ্ট তারিখে স্বদেশীরও জন্ম একই কালে হয়—"The Swadeshi movement was inaugurated on August 7, along with the first demonstration against the Partition of Bengal." সুতরাং ৭ই আগষ্ট বয়কট ও স্বদেশী, এই দুই যমজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ৭ই আগষ্ট বাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় তারিখ। কিন্তু কোন কিছু ভূমিষ্ঠ হইতে হইলে তাহাকে কিঞ্চিৎ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ২০শে জুলাইয়ের পরে এবং ৭ই আগষ্টের পূর্ব্বে হয়তো বয়কটের প্রসব-বেদনা ঐ ষোল দিনের মধ্যে আসন্ন ও মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু 'স্বদেশী'র গর্ভযন্ত্রণা বয়কট অপেক্ষা আরো কিছুটা আগে হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। এ বিষয়ে সুরেন্দ্র ব্যানার্জী কিছুটা স্ববিরোধী কথা লিখিয়া গিয়াছেন—"The Swadeshi movement did not come into birth with the agitation for the reversal of the Partition of Bengal. It was synchronous with the national awakening which the political movement in Bengal had created."

ইহার পরেও যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে—বয়কট আগে কি স্বদেশী আগে, তবে তাহার উত্তর উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতেই তাঁহারা যে যার ইচ্ছামত খুঁজিয়া লইবেন। অরবিন্দের জীবন-আলোচনায় এই প্রশ্নের উত্তর আরো বেশী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা এই সংক্ষিপ্ত অবসরে সম্ভব হইবে না।

৭ই আগষ্ট বড় বিষম তারিখ। ১৮৯৩।৭ই আগষ্ট অরবিন্দ সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেসকে আক্রমণ করিয়া প্রথম প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৪২।৭ই আগষ্ট মহাত্মা গান্ধী প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ("open rebellion") জেলে গমন করেন। এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ১৯০৫।৭ই আগষ্ট ছাড়াও আরো অনেক ৭ই আগষ্ট আছে। যাহা ক্রমোন্নতির যৌবনের মতো তরঙ্গের উপর তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছে।

আমরা এই আন্দোলনকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করিয়াছি—ধূমায়িত, প্রজ্জলিত, নির্ব্বাপিত। ৭ই আগষ্ট তারিখে স্বদেশী ও বয়কটের জন্ম লইয়া আমরা ধূমায়িত অবস্থা হইতে প্রজ্জলিত অবস্থায় স্পষ্ট উপনীত হইলাম। জাতির জীবনে যাহা প্রত্যক্ষ করা গেল অরবিন্দের জীবনেও তাহা প্রত্যক্ষ করা যাইবে। তাঁহার 'ইন্দুপ্রকাশে' রাষ্ট্রীয় চিন্তা এবং তৎ-পরিস্থিতির প্রথম

পর্ব্বে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা এই দিন পর্য্যন্ত ধূমায়িত অবস্থাতেই ছিল—প্রজ্বলিত অবস্থায় আসিয়া পৌঁছে নাই। কিন্তু এইবার আসিয়া পৌঁছিবে। এই আন্দোলনের গতির সহিত অরবিন্দের জীবনের গতি সমান তালে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিয়া প্রবাহিত হইতেছে। আন্দোলনের নির্ব্বাপিত অবস্থাতেও ইহা প্রত্যক্ষ করা যাইবে।

অরবিন্দের হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত যোগ-সাধনা। ১৯০৫ সম্পূর্ণ আগষ্ট মাস অরবিন্দ হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত যোগ সাধন করিতেছেন। ইনি ১৯০৫।৩০শে আগষ্ট তাঁহার স্ত্রীকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, উহাতেই ইহা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা—

"প্রিয়তমা মৃণালিনী,—হিন্দুধর্ম্মে বলে, নিজের শরীরের, নিজের মনের মধ্যে সেই (ভগবান সাক্ষাৎ করিবার) পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেইসকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম হিন্দুধর্ম্মের কথা মিথ্যা নয়, যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি" (* ক)।

(* ক) অরবিন্দের স্ত্রীর নিকট এই চিঠি হইতে মনে হইতে পারে যে, তিনি যেন ১৯০৫-এর আগষ্ট মাসেই সর্ব্বপ্রথম যোগ-সাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ১৯০৯-এর মে মাসে প্রসিদ্ধ উত্তরপাড়া বক্তৃতায় অরবিন্দ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় ১৯০৫-এর আগষ্টের কয়েক বৎসর ("some years") আগেই তিনি যোগ-সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে প্রথম যোগ-সাধনা গুপ্ত-সমিতির ১ম পর্ব্বের মধ্যেই গিয়া পড়ে। কিন্তু ১ম পর্ব্বের গুপ্ত-সমিতির কার্য্যাবলীর মধ্যে ধর্ম্মের কোনরূপ প্রলেপ আদৌ দেখা যায় না। তখন ইহা শুধু অরবিন্দের ব্যক্তিগত সাধনামাত্র ছিল।

"I was brought up in England amongst foreign ideas and an atmosphere entirely foreign. Many things in Hinduism I had once been inclined to believe that it was all imagination, that there was much of dream in it, much that was delusion and maya. But *now* day after day *I realised in the mind*, I realised in the heart, *I realised in the body* the truths of the Hindu religion. They became living experiences to me, and things were opened to me, which no material science could explain. When I first approached Him, it was not

চিঠির তারিখ মিঃ সি. আর. দাশ আলিপুর বোমার মামলায় ১৩ই আগষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ ইহা ছাপার ভুল। কেননা, ২৪শে আগষ্ট অরবিন্দের স্ত্রী অরবিন্দকে পত্র লিখিয়াছেন। সুতরাং অরবিন্দ ৩০শে আগষ্টই তাহার উত্তর দিলেন। অরবিন্দ স্পষ্ট একমাস কালের কথা বলিতেছেন। চিঠির তারিখ ৩০শে আগষ্ট। সুতরাং সম্পূর্ণ আগষ্ট মাস তিনি হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত যোগ সাধন করিতেছেন। শুধু সাধন করিতেছেন না, ফলও লাভ করিতেছেন। কেননা, যে সকল আশ্চর্য্য চিহ্নের কথা হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াছে সেই সমস্ত চিহ্ন তিনি নিজের শরীরে ও মনে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছেন। এই চিঠি সাধারণের কাছে প্রকাশের জন্য ছিল না। তাঁহার স্ত্রীর নিকট গোপন চিঠি। এই চিঠিতে তিনি মিথ্যা কথা কিছুই বলেন নাই। ইহা পরবর্ত্তী বোমার মামলার কোন স্বীকার বা অস্বীকার উক্তি নয়। সুতরাং এ সমস্তই সত্য কথা।

অরবিন্দের মানসিক বিকাশের ইতিহাসে ১৯০৫-এর আগষ্ট মাস যে আলোকপাত করিতেছে, সেই দিব্য আলোকের জ্যোতিতে পরবর্ত্তীকালে একদিন তাঁহার সমগ্র জীবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। বিংশ শতাব্দী তাঁহার অদ্ভুত জীবনের এই অনুভূতি বিস্ময়ে ও পুলকে নিরীক্ষণ করিবে। ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে ১৯০৫-এর আগষ্ট মাস সেই দিব্য আলোকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে।

entirely in the spirit of the *Bhakta,* it was not entirely in the spirit of the *Jnani. I came to Him long ago in Baroda some years before the Swadeshi began* ; and I was drawn into the public field.—*Uttarpara Speech, just after his acquittal in the Alipore Bomb Case—Aurobindo Ghose.*

অরবিন্দ যোগ-সাধনার ফলে শরীরে ও মনে যে-সকল চিহ্নের কথা ১৯০৫-এর ৩০শে আগষ্ট তাঁহার স্ত্রীর নিকট চিঠিতে প্রথম লিখিতেছেন—ইহার কিছু কম চারি বৎসর পর (১৯০৯-এর মে মাসে) উত্তরপাড়া বক্তৃতাতেও সেই কথাই পুনরায় বলিতেছেন। সুতরাং এই চারি বৎসর (১৯০৫-১৯০৯) তিনি প্রকাশ্যে চরমপন্থী রাজনীতি প্রচার ও গুপ্তভাবে বিপ্লবীদের নেতৃত্ব করার সঙ্গে সঙ্গে যোগ-সাধনাও করিতেছিলেন। এই চারি বৎসর বিপ্লবী অরবিন্দ ও যোগী অরবিন্দ ভিন্ন নহেন। একই ব্যক্তি। এই ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার চরিত্র অতিশয় জটিলতায় পূর্ণ।

পয়গম্বর মহম্মদ যেমন তাঁহার ঈশ্বরানুভূতির কথা সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার প্রথমা পত্নী খাদিজার নিকটে বলিয়াছিলেন, শ্রীঅরবিন্দও তাঁহার যোগ-সাধনার ফল প্রথমে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী মৃণালিনী দেবীকে বলিয়াছিলেন।

বয়স তেত্রিশ বৎসর (১৯০৫।১৪ই আগষ্ট—১৯০৬।মার্চ) ঃ

অরবিন্দের স্ত্রীর নিকট পত্র—মানসিক বিকাশের এক স্তর ★ বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রজ্জ্বলিত অবস্থা

অরবিন্দ-লিখিত "ভবানী মন্দির"

(ক) বারীন্দ্রকুমার,
(খ) রাউলাট কমিটি (Rowlatt Comittee),
(গ) স্বামী বিবেকানন্দের উপর গভর্ণমেণ্টের মন্তব্য,
(ঘ) "স্ত্রীর পত্র" ও "ভবানী মন্দির",
(ঙ) "ভবানী মন্দির" ও "বাজী প্রভু" কবিতা,
(চ) "ভবানী মন্দির"-এর লেখক সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা।

কংগ্রেস (১৯০৫।কাশীধাম,—সভাপতি : গোখ্‌লে) ★ কাশী-কংগ্রেস হইতে বরিশাল কন্‌ফারেন্স

অরবিন্দের স্ত্রীর নিকট পত্র (১৯০৫।৩০শে আগষ্ট)—মানসিক বিকাশের আর এক স্তরঃ শ্রীঅরবিন্দের জীবনে পরবর্ত্তী প্রত্যেকটি বৎসর একটা না একটা বিস্ময়কর ঘটনা আমাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে। আলোচ্য বৎসরের প্রথমে দেখতে পাই, তিনি ১৯০৫ সনের গোটা আগষ্ট মাসটাই বরোদায় বসিয়া হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত যোগ শিক্ষা করিতেছেন এবং হাতে হাতেই অতি আশ্চর্য্য রকমের ফলও পাইতেছেন। আবার এই বৎসরের শেষে ১৯০৬ সনের আগষ্ট মাসে দেখিতে পাই, তিনি বরোদার চাকরি ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজী 'বন্দেমাতারম্' পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘে মিশিয়া বিপিনচন্দ্র পালের সহিত বাংলার তৎকালীন চরমপন্থী রাজনীতি তাঁহার অনুপম ভাষায় প্রাণ খুলিয়া লিখিতে বসিয়াছেন। কেহই অস্বীকার করিতে

পারিবে না যে, এ একটা বিস্ময়কর ঘটনা। দেখিতেছি, যোগ আর উগ্র রাজনীতি—তাঁহার জীবনে একসঙ্গে দুই-ই সত্য। কোনটাই মিথ্যা নয় এবং কোনটাই ছোটও নয়। বরং একে অপরের সহায়ক।

তরুলতা বা পশুপক্ষীর মত তিনি জীবন ধারণ করেন নাই। নিজের স্বাধীন মননশীলতা দ্বারা জীবন ধরণ করিয়াছেন। নিজের মতে স্বতন্ত্র পথে চলিবার দরুন তাঁহার অদ্ভুত জীবন যে ইতিহাস রচনা করিয়াছে—তা সরল রেখার মত সোজা নয়, অথবা দিনের আলোকেও উজ্জ্বল নয়। প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য তাঁহার জীবন জটিলতায় পূর্ণ, আবার ভয়াবহ অন্ধকার পথে ভ্রমণের জন্য তাঁহার জীবন কুটিলপথগামী। জাতির সম্মুখে তাঁহার জীবন একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়!

এখন চিঠির কথায় আসা যাক। অরবিন্দের স্ত্রীর নিকট এই চিঠি গোপন চিঠি। তিন বৎসর ইহা গোপন ছিল। পরে ১৯০৮-৯ খৃঃ আলিপুর বোমার মামলায় পুলিশ এই চিঠি মিঃ নর্টনের হাত দিয়া প্রথম আদালতে প্রকাশ করেন, এবং তখন হইতে সাধারণে ইহা জানিতে পারে। মিঃ নর্টন ও মিঃ সি. আর. দাশ, এই দুই মহারথী কৌসুলী এই চিঠিখানিকে বৈদ্যুতিক আলোর নীচে রাখিয়া বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন। মিঃ নর্টন প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে—অরবিন্দই যে মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণমূলক কলিকাতার গুপ্ত-সমিতির প্রধান বৈপ্লবিক নেতা, এই চিঠিখানিতেই তা প্রকাশ পাইয়াছে। আবার অন্যপক্ষে মিঃ সি. আর. দাশ এই চিঠিখানির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অরবিন্দ এই গুপ্তহত্যামূলক গুপ্ত-সমিতির সহিত আদৌ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। সুতরাং এই চিঠিখানির গুরুত্ব এবং মূল্য খুব বেশী। ইহা যেমন স্মরণীয়, জীবন-চরিত লেখার পক্ষে তেমনি অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয়। অরবিন্দের কোন জীবনচরিত-লেখক এই চিঠিখানিকে বাদ দিয়া তাঁহার জীবনী লিখিতে পারিবেন না।

অরবিন্দ যখন তাঁহার স্ত্রীকে এই চিঠি লিখিতেছেন তখন তাঁহার বয়স ৩৩ বৎসর পার হইয়া মাত্র দুই সপ্তাহ হয় ৩৪ বৎসরে আসিয়া পৌছিয়াছে। আর তাঁহার স্ত্রীর বয়স ১৮ বৎসর পার হইয়া ১৯ বৎসরের ছয় মাস মাত্র অতিক্রম করিয়াছে। এই সময় তাঁহারা উভয়ে মাত্র চার বৎসর চার মাস বিবাহিত জীবন যাপন করিয়াছেন। চিঠিতে দেখিতে পাই, অরবিন্দের স্ত্রী

অভিযোগ করিয়াছেন যে—অরবিন্দের "কোনো উন্নতি হইল না"। অরবিন্দ এই অভিযোগের উত্তরে উন্নতির পথ বাতলাইয়া দিতেছেন। অরবিন্দের দাম্পত্য জীবনের কথা কেহ কিছুই স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন না। ইহা এখনও পর্য্যন্ত আলো-আঁধারে জড়াইয়া অস্পষ্ট এবং শুধু গল্পগুজবের মধ্য দিয়া লোকমুখে রটিত। সুতরাং তাহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু এই চিঠি অরবিন্দের দাম্পত্য জীবনের উপর অনেকটা আলোকপাত করিয়াছে। সে হিসাবেও এই চিঠিখানি যাঁহারা কৌতূহলী তাঁহাদের পাঠ করা কর্ত্তব্য।

এই চিঠিখানিতে অরবিন্দ তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার (অরবিন্দের) তিনটি পাগলামির কথা একের পর আর নম্বর দিয়া লিখিতেছেন। তিনি লিখিতেছেন—'আমার তিনটি পাগলামি আছে'। ১ম—নিতান্ত সাধারণ লোকের মত খাইয়া পরিয়া থাকিয়া উপার্জ্জনের আর সব টাকা দেশের অভাবগ্রস্ত দুঃখী লোকদিগকে বিলাইয়া দেওয়ার সংকল্প।

"এই দুর্দ্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত। আমার ত্রিশকোটি ভাইবোন এই দেশে আছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে। তাহাদের হিত করিতে হয়।"

ইহা স্বদেশপ্রেম ও পরদুঃখকাতর দয়ার্দ্রচিত্তের লক্ষণ। নিজের সুখভোগ বিসর্জ্জন, ত্যাগের সঙ্কল্প ও পূর্ব্বাভাস। ২য়—

"...সম্প্রতিই ঘাড়ে চেপেছে; পাগলামিটা এই, যে-কোনমতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিতে হইবে। ...ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোন পথ থাকিবে। সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মে বলে—নিজের শরীরে নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেইসকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্ম্মের কথা মিথ্যা নয়। যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই।"

ইহা যোগের পথে প্রথম পদচারণা এবং প্রবেশের পরেই স্ত্রীকেও যোগিনী করিয়া সঙ্গে নিবার আকুল আগ্রহ। বিবাহিত জীবন সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াই

অরবিন্দ যোগী হইতে চাহিতেছেন। কাঞ্চনত্যাগী হইলেও তিনি স্ত্রী-ত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে চাহিতেছেন না। যোগের পথেও স্ত্রীকে সঙ্গিনী চাহিতেছেন। তৃয়—

"পাগলামি এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে। আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কী করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রীপুত্রের সহিত আমোদ করিতে বসে—না, মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি, এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে—শারীরিক বল নয়, তরবারি বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না। জ্ঞানের বল। ক্ষাত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে। সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

এই তৃতীয় পাগলামিটাই একটু বেয়াড়া রকমের,—নইলে অপর দুইটি বিশেষ কিছু মারাত্মক বা সাংঘাতিক নয়। যত গোলযোগ এইটি লইয়া। মিঃ সি. আর. দাশ বলেন—যখন অরবিন্দ তরবারি বা বন্দুক নিয়া যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন না, তখন বোমা রিভলবার সংযুক্ত হিংসামূলক কার্য্যে প্রবৃত্ত গুপ্ত-সমিতির সহিত তাঁহার কোনই যোগাযোগ নাই বা থাকিতে পারে না। আবার অন্য পক্ষে মিঃ নর্টন বলেন—তিনি নিজে হাতে করিয়া তরবারি বা বন্দুক নিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে না-ই বা গেলেন,—পেছনে থাকিয়া যুক্তি-পরামর্শ ও বুদ্ধি ত দিতে পারেন? এই বুদ্ধিই ত জ্ঞান, আর এই বুদ্ধি বা জ্ঞানের উপরেই ত অরবিন্দ-কথিত ব্রহ্মতেজ প্রতিষ্ঠিত। মিঃ নর্টনের সমর্থনে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণ কি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নিজে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, না চাণক্য স্বয়ং তরবারি হাতে যুদ্ধ করিয়া-ছেন? অথচ শ্রীকৃষ্ণ বা চাণক্যের ব্রহ্মতেজ কি প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটায় নাই?

তারপরে কথা—অরবিন্দ স্বদেশকে মা বলিয়া জানিয়াছেন। ভাল কথা। বঙ্কিম স্বদেশকে মা বলিতেই শিখাইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দও অন্যান্য অকেজো দেবতাগুলিকে ভুলিয়া কেবল দেশ-মা'কেই দেবীজ্ঞানে পূজা করিতে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখানে "রাক্ষস" বলিতে অরবিন্দ কাকে নির্দ্দেশ করিতেছেন—এই প্রশ্ন লইয়া আবার একটা গোলযোগের সূত্রপাত দেখা দিল। মিঃ নর্টন বলিতেছেন—রাক্ষস বলিতে অরবিন্দ এখানে স্পষ্ট এদেশের ইংরেজ-

শাসকবর্গকে বুঝাইতেছেন। মিঃ সি. আর. দাশ বলিলেন—ওটা কিছু নয়। সাদৃশ্য বা তুলনা একে বলা চলে না। একে একটা উপমা, রূপক বা অলঙ্কার বলা চলে। অরবিন্দ বহুভাষাবিৎ মস্ত পণ্ডিত লোক, তাঁর বলিবার বা লিখিবার ভঙ্গীই ঐরূপ (* খ)।

এই চিঠি প্রসঙ্গে মিঃ নর্টন ও বিশেষভাবে মি: সি. আর. দাশের পরস্পর-বিরোধী অতি অদ্ভুত যুক্তিতর্কপূর্ণ সওয়াল ও তাহার জবাব সবিস্তারে এখানে উল্লেখ করা সম্ভবপর হইবে না। আলিপুর বোমার মামলার সময় তাহা অবশ্যই সবিস্তারে উল্লেখ করিতে হইবে। আইনের কথা রাখিয়া এখন স্বামী-স্ত্রী'র

(* খ) If a demon sits on the breast of the mother 'what would the sons do?' Mr. C. R. Das said : "what is the meaning of that ? It is only an analogy. He (Aravindo) says that he regards his country, not as merely a collection of fields, hills, rivers and so forth, but he regards her as his Mother. He has used only a metaphor to show that his countrymen are not to sit idle, but to act so as to realise his ideal."

"The letter was not intended for publication, it was not an open letter to his countrymen, it was to his wife."

"Does not it mean that regarding the facts that their country is in a wretched condition, it is far away from freedom, it is in bondage ? So it is the duty of every man in India to stir himself to realise the ideal of freedom. His basis of patriotism is that he regards his country as Mother. It is to him not a physical non-entity, but is a concrete manifestation of Divinity."—*Mr. C. R. Das.*

অরবিন্দের লেখায় যেটুকু বাকী ছিল, মিঃ সি. আর. দাশের বক্তৃতায় ও ব্যাখ্যায় আর কিছুই বাকী রহিল না—সমস্তটাই পরিষ্কার হইয়া গেল। যেমন আসামী তেমনি কৌঁসুলী। এমন দেখা যায় না। তবে "রাক্ষস" কথাটা শুনিতে কানে লাগে, এই যা। নইলে অর্থনৈতিক শোষণ অর্থে ধরিয়া নিলে—কোন গোল-ই থাকে না। মিঃ র‍্যাণাডে, রমেশ দত্ত, গোখ্‌লে প্রভৃতি মহামান্য ব্যক্তিরা "রাক্ষস", "রক্তপান" এই সকল শব্দ ব্যবহার করেন নাই। শুধু বলিয়াছেন "শোষণ"। শাসন দ্বারা শোষণ—ব্যস্‌। তাতেই বুঝা যায়।

কথাই বেশী করিয়া দেখিতে হইবে। এবং তাহা দেখিতে গিয়া দেখিতেছি যে, অরবিন্দ তাঁহার স্ত্রীর নিকট বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির কথা বিলকুল চাপিয়া গেলেন। অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত বাংলাদেশে বিপ্লবের ১ম পর্ব্ব (১৯০২—১৯০৪) মুছিয়া ফেলিবার ইতিহাস নয়। এবং বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির ২য় পর্ব্ব (১৯০৬—১৯০৮) 'নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এবং এ কথাও বলা চলে না যে, গুপ্তসমিতির প্রথম পর্ব্বে ব্যর্থ হইয়া অরবিন্দ গুপ্তসমিতির তৎকালের উপযোগিতা মন হইতে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। যদি তা দিতেন তবে আবার গুপ্তসমিতির ২য় পর্ব্ব তিনি আরম্ভ করিতেন না। ২য় পর্ব্বে ছোটলাট ফুলার বধে অথবা মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর বোমা নিক্ষেপে বা এই রকম আরো অনেক বৈপ্লবিক কর্ম্মে নিশ্চয়ই তিনি তরবারি বা বন্দুক হাতে নিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যান নাই সত্য, কিন্তু এই সকল বৈপ্লবিক কর্ম্ম হইতে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন—এ কথা ইতিহাস বলে না, বলিবে না। সুতরাং গুপ্তসমিতির ব্যাপারাদি সম্পর্কে তিনি তাঁহার ১৮।১৯ বৎসরের বালিকা-স্ত্রীকে সকল কথা ইচ্ছা করিয়াই খুলিয়া বলেন নাই। কেননা, বলা নিরাপদ মনে করেন নাই। তাঁহার স্ত্রী গবর্ণমেণ্টের চাকরিয়া একজন বড়লোকের মেয়ে। ভোগস্পৃহাবতী এই তরুণী বালিকা গুপ্তসমিতির খুনাখুনি ব্যাপার অতশত বুঝিতে না-পারিয়া হয়ত তাঁহার পিতাকে বলিয়া দিতে পারেন। আশ্চর্য্য নয়! আর হৌন না কেন স্ত্রী, যদি তিনি গুপ্তসমিতির সভ্য না হন—তবে সে কথা শুনিবার তিনি অধিকারিণী নহেন। চিঠি হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, অরবিন্দকে তাঁহার স্ত্রী সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অরবিন্দ তাঁহার স্ত্রীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং নিজের মতে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ অবস্থায় স্ত্রীর নিকট প্রথমেই গুপ্তসমিতির কথা বলা সমীচীন নয়। যাহা সমীচীন নয়, অরবিন্দ তাহা করেন নাই।

এই চিঠিতে উল্লিখিত অরবিন্দের তিনটি পাগলামির কথাতেই তাঁহার মানসিক অবস্থা কোন্ দিকে কোন্ স্তরে ধাবিত হইতেছে, তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। বুঝিতে কিছুই কষ্ট হয় না। এই চিঠিখানি যেন অরবিন্দের তৎকালীন মনের সম্মুখে একখানি স্বচ্ছ দর্পণ! এই স্বচ্ছ দর্পণে অরবিন্দের তৎকালীন মনের ছবি অতি উজ্জ্বলরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

অরবিন্দ লিখিতেছেন—

"এইভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এইভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এইভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।"

এই চিঠিতে আমরা অরবিন্দের জীবনের তিনকালের পরিচয় পাইতেছি—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। সুতরাং ইহাকে একখানি সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীও বলা চলে। অরবিন্দের ১৪ বৎসর ও ১৮ বৎসর আমরা আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অরবিন্দ তাঁহার জীবনের ব্রত সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন। তিনি তাঁহার অতীতের ১৪ বৎসর ও ১৮ বৎসর সম্পর্কে দেখিতেছি খুব বেশী সচেতন। এবং ভবিষ্যতে তিনি কী করিবেন, সে সম্বন্ধেও তাঁহার ধারণা অতিশয় স্পষ্ট এবং সঙ্কল্প তদনুযায়ী দৃঢ়।

অরবিন্দ তাঁহার স্ত্রীর নিকট নিজেকে পাগল বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন।

'পাগল ত পাগলামির পথে ছুটিবেই ছুটিবে, তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তোমার চেয়ে ওর স্বভাবই বলবান। তবে তুমি কোণে বসিয়া কাঁদিবে মাত্র, না তার সঙ্গেই ছুটিবে। পাগলের উপযুক্ত পাগলী হইবার চেষ্টা করিবে, যেমন অন্ধরাজমহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন। হাজার ব্রাহ্মস্কুলে পড়িয়া থাক, তবু তুমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে, পূর্ব্ব পুরুষের রক্ত তোমার শরীরে। আমার সন্দেহ নাই—তুমি শেষোক্ত পথই ধরিবে"।

পাগল কখনও নিজে বুঝিতে পারে না যে, সে পাগল। অরবিন্দ সত্যই পাগল নহেন। তবে এই চিঠিতে তিনি নিজের ভবিষ্যৎ-জীবন সম্পর্কে যে অভাস দিয়াছেন, তাহা তাঁহার সরলমতি ভোগস্পৃহাবতী তরুণী স্ত্রীর নিকট পাগলামি বলিয়া যে বোধ হইতে পারে—এ জ্ঞান অরবিন্দের ছিল। এবং ছিল বলিয়াই তিনি নিজেকে পাগল বলিয়া লিখিয়াছেন।

অরবিন্দ তাঁহার স্ত্রীকে অন্ধের মত তাঁহাকে এই পাগলামির পথে অনুসরণ করিতে বলিতেছেন। গান্ধারীর দৃষ্টান্ত দিতেছেন। হিন্দুরক্তের দোহাই দিতেছেন। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মস্কুলের মেয়েদের আদর্শকে নিন্দা করিতেছেন। দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে তাঁহার মনের এই সময়কার একখানি সুস্পষ্ট ছবি আমরা পাইতেছি। হিন্দুয়ানির একটা ঘূর্ণিবায়ু এই সময় অল্প-বিস্তর চরমপন্থী সকল

নেতাকেই আচ্ছন্ন করিয়াছে। অরবিন্দ তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। কিন্তু এই চিঠিতে যেসব কথা তিনি তাঁহার স্ত্রীকে লিখিলেন, তাঁহার স্ত্রী এতসব কথা ঠিকমত বুঝিতে পারিলেন কি-না এবং তাঁহার কথা মানিয়া লইয়া সায় দিলেন কি-না—ইহা আমরা কিছুই জানি না। কেননা, তাঁহার স্ত্রীর কোন চিঠি সাধারণে প্রকাশ হয় নাই।

তবে এই চিঠি লেখার ছ'মাস পরেই যে তিনি বরোদার চাকরি ছাড়িয়া দিয়া বাঙলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের প্রজ্জলিত অবস্থার মধ্যে আসিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িবেন, ইহাতে তাঁহার মনের গতি ও পরিণতি অনুসরণ করিয়া, তাঁহার স্ত্রীর কথা যা-ই হোক—আমরা আশ্চর্য্য হইব না। অরবিন্দের স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়া—বাহির হইতে অজ্ঞ লোকের নিকট একটা আকস্মিক ঘটনা যদিও বা মনে হইতে পারে, কিন্তু এই সময়ে ইহা তাঁহার মানসিক অবস্থার এক অতি স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র। অকস্মাৎও কিছু নয়, আশ্চর্য্য হইবারও কিছু নয়।

বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রজ্জলিত অবস্থা (১৯০৫)ঃ অরবিন্দকে বরোদায় যোগনিমগ্ন অবস্থায় রাখিয়া আমাদিগকে এখন একবার বাঙলাদেশে আসিতে হইবে। কেননা, বাঙলাদেশে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আর ছ'মাস পরেই বাঙলাদেশে আসিয়া অরবিন্দ এই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে নিজের জীবনকে আহুতি দিবেন। ফলে আগুন আরও জ্বলিয়া উঠিবে। এবং এই অগ্নি যে-সকল শিখা বিস্তার করিবে, তার মধ্যে অরবিন্দের শিখাই সব চেয়ে বেশী ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক। আন্দোলনের এই জ্বলন্ত অবস্থাই অরবিন্দকে আকর্ষণ করিবে। তিনি আকৃষ্ট হইবেন এবং এই আন্দোলনে আসিয়া প্রকাশ্যে যোগ দিবেন। তাঁহার জীবনের আর এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে। তাঁহার উত্তরপাড়া বক্তৃতায় একথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে—স্বদেশী আরম্ভ হইল, আমি প্রকাশ্যে রাজনীতিক্ষেত্রে আসিয়া যোগ দিলাম ("Swadeshi began and I was drawn into the public field.")। এখন কাজেই এই স্বদেশীর রূপ এবং স্বরূপটা ইতিহাসে কী ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে একটু দেখিতে হইবে। কেননা, যাহা অরবিন্দকে আকর্ষণ করিয়া ১৪ বৎসরের শিকড় ছিঁড়িয়া বরোদা হইতে বাংলাদেশে টানিয়া আনিয়াছিল, তার শক্তি

কম নয়। আমাদের দেখিতে হইবে সেই শক্তির উৎস কোথায়, তার গতি কোন্ পথে ?

সেপ্টেম্বর—১লা। সিমলা হইতে বঙ্গবিভাগ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন। ইহার ফলে ২রা বাংলাদেশের সকল প্রধান প্রধান সহরে শোক প্রকাশ করা হইল। ২২শে কলিকাতা টাউনহলে আবার প্রতিবাদ-সভা হইল। মিঃ লালমোহন ঘোষ সভাপতি হইলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ১৯০৩।ডিসেম্বরের শেষে মাদ্রাস-কংগ্রেসের সভাপতির আসন হইতে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এক বৎসর আট মাস একুশ দিন পরে আবার সেই ভারতের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বাঙালী লালমোহন বাংলার পক্ষ হইতে প্রতিবাদ করিতে দাঁড়াইলেন। প্রকাশ্য সভায় জীবনে এই তাঁহার শেষ বক্তৃতা। আমরা এই দিন ঐ সভায় উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার গলার স্বর ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তথাপি বার্দ্ধক্যেও সিংহ তার গর্জ্জন ভুলে নাই।

২৫শে কলিকাতার ময়দানে জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে গিয়াছিল। পুলিশ লাঠির গুঁতায় ঐ জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। ইহাকেই পরে দমন-নীতি ব্যাখ্যা দেওয়া হইবে।

২৯শে সিমলায় বঙ্গভঙ্গ আইনে পরিণত হইল বলিয়া সংবাদপত্রে ঘোষণা করা হইল। বৈধ আন্দোলনকারী বাক্‌বিভূতিসম্পন্ন প্রবীণ নেতাদের মুখ শুকাইল।

অক্টোবর—৮ই। ৭ই আগষ্টের বয়কট্‌-প্রস্তাব অনুযায়ী কলিকাতার মাড়োয়ারী বণিকেরা ম্যানচেষ্টারের সহিত বিলাতী বস্ত্র খরিদের চুক্তি বন্ধ করিয়া দিল। মাড়োয়ারী ব্যবসা বন্ধ করে,—কম কথা নয়! ইহা শরৎচন্দ্রের কাবুলীওয়ালার গান করার চেয়েও বিস্ময়কর।

১০ই প্রসিদ্ধ কার্লাইল সার্কুলার জারী করা হইল। ইহাতে ছাত্রদের সভায় যোগদান, মিছিল বাহির করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং বন্দেমাতরম্ গান নিষেধ করা হইল।

১২ই গবর্ণমেণ্ট দ্বিখণ্ডিত বঙ্গের কোন্ ভাগে কোন্ কোন্ জেলা পড়িল তাহা সবিস্তারে সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলেন। এবং সকলে বিস্ফারিত নেত্রে তা পড়িয়া দেখিল।

১৬ই বড় বিষম তারিখ। এই দিন যুগপৎ অনেকগুলি ঘটনা ঘটে। (ক) পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট ফুলার সাহেব শিলং সহরে তাঁহার নির্দিষ্ট নূতন গদীতে আরোহণ করিলেন। একেবারে পূর্ণাভিষেক। লর্ড কার্জ্জনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। (খ) ফেডারেশন-হল—অর্থাৎ দ্বিখণ্ডিত বাঙলার অখণ্ড মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে কলিকাতায় বিরাট্ সভা হইল। মিঃ এ. এম বোসকে তাঁহার অন্তিমশয্যা হইতে তুলিয়া আনিয়া সভাপতি করা হইল। বেলা ৩২টায় সভা বসিবার কথা। কিন্তু নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতে এত লোক সমাগম হইল যে, সভায় এত লোকের জায়গা হইয়া ওঠে নাই। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী লিখিয়াছেন যে—এই দিন আনন্দমোহন যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার তুলনা হয় না ("I regard it as the greatest of his oratorical performances and one of the noblest orations to which it has been one's privilege to listen".—*A Nation In Making, p. 215.* সুরেন্দ্রনাথ আরও বলেন—স্যার তারকনাথ পালিত ও ভগিনী নিবেদিতা এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনাকালে তাঁহাদের পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। যদিও সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে পরবর্ত্তী ইতিহাসে ভ্রমেও একবার অরবিন্দের নাম উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই, তথাপি অরবিন্দের সহকর্ম্মী বিপ্লববাদী ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন ("...it was warmly supported by the late Sir Taraknath Palit and Sister Nivedita of the Ramkrishna Mission, that beneficient lady who had consecrated her life to, and died in, the service of India.".—*Ibid, p. 213.*)। সুরেন্দ্রনাথ এখানে একটি ভুল করিয়াছেন। ভগিনী নিবেদিতা যখন স্বদেশী আন্দোলনে প্রকাশ্যে যোগ দিয়াছিলেন এবং সেই বিপ্লবের ভাব প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, সেই সময় এমন কি তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্য-তালিকা হইতে তিনি নিজের নাম খারিজ করিয়া নিয়াছিলেন। ইহা ১৯০২।জুলাইয়ের ঘটনা।

স্যার তারকনাথ পালিত ও ভগিনী নিবেদিতা, উভয়েই এই দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন না। ভগিনী নিবেদিতা ও মিঃ সি. আর. দাশ উভয়েই ঐ তারিখে দার্জিলিংয়ে এক সঙ্গে বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ-সভায় বক্তৃতা

করিয়াছিলেন। এইবার রবীন্দ্রনাথকে পাইব। (গ) রাখীবন্ধন। এই দিন বাঙলাদেশের সমস্ত বাজারে প্রথম 'হরতাল' হইল। ইহা গান্ধীযুগের হরতালের অন্ততঃ ১৫ বৎসর আগের কথা। হরতালের পরিকল্পনা প্রথমে বাঙলাদেশ হইতেই উদ্ভব হয়। এবং বাঙালীরাই উহা করে। কোনও বাঙালী গৃহস্থের বাড়ীতে এই দিন রন্ধন হয় নাই। অধিকাংশ বাঙালী এই দিন উপবাস করিয়াছিল। স্নান করিয়া এ উহার হাতে রাখী বাঁধিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রসিদ্ধ রাখীর গান রচনা করিয়াছিলেন :

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান্।

* * * *

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান্।

২২শে আবার ছাত্রদের সভায় যোগদান, পিকেটিং ও বন্দেমাতরম্ গানের বিরুদ্ধে ২য় দফা কার্লাইল সার্কুলার জারী হয়। ছাত্রেরাও "এন্টি-সার্কুলার সোসাইটি" করিয়া ইহার জবাব দিল। আইন-অমান্য আন্দোলনের ইহাই প্রথম সূচনা। সার্কুলার অর্থ আইন। আর "এন্টি" অর্থ বিরোধী। কাজেই ইহা প্রকাশ্য আইন-বিরোধী।

২৭শে কলিকাতার চোরবাগানে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে সভা হইয়া 'জাতীয় ভাণ্ডারে' চাঁদা তোলা হইল। জাতীয় ভাণ্ডারে কত টাকাই যে চাঁদা তোলা হইয়াছিল! যাক সে কথা।

নভেম্বর—১লা। সুরেন্দ্রনাথ মিলন-মন্দিরের (ফেডারেশন-হলের) ভূমিতে দাঁড়াইয়া বাঙালী জাতির পক্ষ হইতে এই বলিয়া এক ইস্তাহার পাঠ করেন যে : গবর্ণমেন্ট যখন আমাদের এত প্রতিবাদ সত্বেও বাঙলাকে দুই ভাগ করিয়া দিলেন, তখন আমাদের যতদূর ক্ষমতা আছে তাহা প্রয়োগ করিয়া এই বঙ্গভঙ্গের বিষময় ফল হইতে আত্মরক্ষা এবং সেই সঙ্গে সমস্ত বাঙালী জাতির একতা

রক্ষা করিব ("...as a people we *shall do everything in our power* to counteract the evil effect of dismemberment of our Province and to maintain the integrity of our race.")। সাবাস্ বলিয়া সেই বিপুল জনতা জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল।

৪ঠা কলিকাতা গোলদিঘিতে ছাত্রেরা সভা করিল। এই সভায় প্রথম কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদ করা হইল। দ্বিতীয়—রংপুরের ছাত্রদিগকে যে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে তাহারও প্রতিবাদ করা হইল। আজ যে ভারতব্যাপী ছাত্র-আন্দোলন দেখা যায়, এই তারিখে বাঙলাদেশে তাহার প্রথম সূচনা আমরা দেখিতে পাইতেছি। বিংশ শতাব্দীতে বাঙালী ছাত্রেরাই প্রথম ছাত্র-আন্দোলন আরম্ভ করে।

৫ই শ্যামপুকুর ময়দানে আবার এক জাঁকালো সভা হইল। এই সভার বিশেষত্ব এই যে, বগুড়ার নবাব আব্দুল শোভান চৌধুরী ইহার সভাপতি হইলেন। তিনি সভাপতি হওয়াতে ঢাকার নবাবের বঙ্গভঙ্গ সমর্থনকে প্রতিবাদ করা হইল। এবং ঢাকার নবাব সলিমুল্লা যে বাঙলার সমগ্র মুসলমান সমাজের একচ্ছত্র নেতা নহেন, ইহাও প্রমাণ হইল। এই সভায় আর একটি ইতিহাসের সূত্রপাত হইল। তাহা ভবিষ্যতের নরমপন্থী ও চরমপন্থিগণের ঘরোয়া বিবাদ। এই বিবাদের সূত্রপাত এই সভায় প্রথম দেখা গেল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় উঠিয়া বলিলেন যে—সুরেন্দ্রনাথ, এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত পুরাপুরি এই আন্দোলনে যোগ দিতেছেন না। অর্থাৎ তাঁহাদিগকে ঠিক চরমপন্থী বলা যায় না। বস্তুতঃ স্বদেশী আন্দোলন নরমপন্থীদের নহে। ইহার প্রাণ ও প্রেরণা —ইহার অসংযত গতিবেগ ও উদ্দাম উন্মাদনা, প্রকৃতপক্ষে আসিয়াছে চরমপন্থীদের নিকট হইতে। কিন্তু তথাপি এই সভার লোকেরা পাঁচকড়িবাবুকে সমর্থন না-করিয়া বসাইয়া দিলেন। কাজেই নির্ব্বাক অবস্থায় পাঁচকড়িবাবু বসিয়া পড়িতে বাধ্য হইলেন।

৯ই। এই তারিখে দুইটি সভা হয়। একটি গোলদীঘিতে ছাত্রেরা করে, অন্যটি "ফিল্ড এণ্ড একাডেমী ক্লাবের" মাঠে। ইহাকে পান্তীর মাঠও বলে। এই পান্তীর মাঠের সভায় স্বনামধন্য সুবোধ মল্লিক সভাপতি হইলেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে এক লক্ষ টাকা দিবেন ঘোষণা করিলেন। ছাত্রেরা জয় জয়কার করিয়া হর্ষধ্বনি করিল এবং তাঁহাকে রাজা সুবোধ মল্লিক বলিয়া

সম্মানিত করিল। দেশের লোকের প্রদত্ত 'রাজা' উপাধি এই প্রথম আমরা দেখিলাম। এবং ইহা চিরদিন কায়েম হইয়া থাকিল। এই পান্তীর মাঠে আমরা ভগিনী নিবেদিতাকে রুদ্রাক্ষের মালা গলায় একাধিকবার বক্তৃতা দিতে দেখিয়াছি ও তাঁহার অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়াছি। এই রাজা সুবোধ মল্লিকই ছ'মাস পরে অরবিন্দের বাঙলাদেশে আসিবার পর, অরবিন্দের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইবেন। রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতেই কিছুকালের জন্য অরবিন্দের বাসস্থান নির্দ্ধারিত হইবে। এবং সেই সঙ্গে এ স্থানটি চরমপন্থী রাজনীতি চর্চ্চার একটি প্রধান কেন্দ্র হইবে। অরবিন্দ যে-ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইবেন, এইরূপে ক্রমে তাহা প্রস্তুত হইতেছিল। গবর্ণমেণ্ট-পরিচালিত বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বাতিল করিয়া যে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন পরবর্ত্তী কংগ্রেসগুলির সম্মুখে এক বাক্‌বিতণ্ডাপূর্ণ সমস্যারূপে দেখা দিবে, এই তারিখেই বাঙলাদেশে তাহার সূত্রপাত হয়। ইহার মাত্র দুই দিন পর—

১১ই গোলদীঘিতে আবার এক সভা হয়। ব্যারিষ্টার এ. চৌধুরী সভাপতি হন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী বিপিন পাল, বৈদান্তিক এটর্ণী হীরেন দত্ত প্রভৃতি চরমপন্থী নেতাগণ ছাত্রদিগকে গবর্ণমেণ্টের স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া আসিবার জন্য উপদেশ দেন। এইবার সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী অতিশয় মুশকিলে পড়িলেন। কেননা, তিনি রিপন কলেজে অধ্যাপকের পদে চাকরি করেন। এবং ঐ কলেজের সহিত তিনি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি অরবিন্দ নহেন। তিনি ঐ কলেজের চাকরি ছাড়িতে পারেন না। এইবার মডারেট ও একস্‌ট্রিমিষ্টের দলাদলি ও বিবাদ ঘনাইয়া আসিল। 'সন্ধ্যা'র উপাধ্যায় ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া খোলাখুলি লিখিলেন—"তোমরা গোলদীঘির গোলামখানায় প্রস্রাব করিয়া দিয়া চলিয়া আইস।"

১৭ই পান্তীর মাঠে ছাত্রদের আবার এক সভা হইল। স্বয়ং সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী সভাপতি হইলেন। তিনি রাজা সুবোধ মল্লিক ও এ. চৌধুরীর সভাদ্বয়ের প্রতিবাদ করিয়া ছাত্রদিগকে বলিলেন: "তোমরা গবর্ণমেণ্টের স্কুল-কলেজ ছাড়িও না—ছাড়িও না।" ছাত্রেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর কথায় কর্ণপাত করিল না। এইরূপ হট্টগোলের মধ্যে সভা ভাঙ্গিয়া গেল। ১২ দিন আগে সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর নিন্দা করায় যাহারা পাঁচকড়িবাবুকে 'থামুন মশায়' বলিয়া বসাইয়া দিয়াছিল আবার ১৫ দিন পরে তাহারাই সুরেন্দ্র

ব্যানার্জ্জীকে 'থামুন মশায়' বলিয়া বসাইয়া দিল। এইদিন লোকমত ও নেতৃত্বের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ আমরা দেখিতে পাইলাম। এইদিন হইতেই মডারেট্ ও এক্‌স্ট্রিমিষ্ট, দুইটি পরস্পর বিরোধী পৃথক্ পৃথক্ দল সৃষ্টি হইতে চলিল। অরবিন্দ ছ'মাস পরে বরোদা হইতে আসিয়া এই মডারেট-বিরোধী একস্ট্রিমিষ্ট দলেই প্রবেশ করিবেন—তাঁহার পথ প্রস্তুত হইল।

আবার এই তারিখেই বঙ্গভঙ্গ-প্রবর্ত্তনকারী লর্ড কার্জ্জন বোম্বাই হইতে চিরদিনের জন্য ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার কীর্ত্তি তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। শুধু পড়িয়া রহিল না—জ্বলিয়া উঠিল।

২৪শে পান্থীর মাঠে আবার সভা হইল। এই সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব পুরাপুরি সমর্থিত ও গৃহীত হইল। কিন্তু এই সভায় আর একটি ঘটনা ঘটিল। বরিশালে গবর্ণমেণ্ট গুর্খাসৈন্য নিয়াছে এবং তাহারা অত্যাচার করিতেছে—এ সংবাদে সভা চঞ্চল হইয়া উঠিল। দু'দিন পরে—

২৬শে আবার পান্থীর মাঠেই ছাত্রেরা সভা করিল। তাহারা দুইটি প্রস্তাব করিল। ১ম—যতদিন বরিশালে গুর্খাসৈন্য থাকিবে ততদিন তাহারা স্কুল বা কলেজে যাইবে না। ২য়—নেতারা অবিলম্বে বরিশালে গমন করুন।

২৭শে ছাত্রেরা দল বাঁধিয়া সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর নিকটে গিয়া এই সভার কথা তেজের সহিত জানাইল। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন—"যাহারা তোমাদিগকে স্কুল-কলেজ ছাড়িতে বলিতেছে, তাহারা দেশের শত্রু (traitors)।" ছাত্রেরা রুদ্ধ নিঃশ্বাস চাপিয়া রোষকষায়িত লোচনে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী বলে কি-না—'traitors'!

২৮শে রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতেই আবার এক সভা হইল। সভাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য করিবার ব্যবস্থা একেবারে চূড়ান্তরূপে পাকাপাকি হইয়া গেল। ভগিনী নিবেদিতা ও অরবিন্দ ইহার পরের বৎসরগুলিতে জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে কত প্রবন্ধই না লিখিয়া গিয়াছেন।

ডিসেম্বর—৩রা। পান্থীর মাটে সভা হইল। ব্যারিষ্টার জে. এন. রায় সভাপতি হইলেন। বিপিন পাল প্রভৃতি চরমপন্থী নেতাগণ গরম গরম বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—"আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মরক্ষা"। ইহা স্পষ্টতঃই নরমপন্থীদের আবেদন-নিবেদন নীতির বিরোধী নীতি। ১৯০৪।জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ"-এ ইহার পরিপূর্ণ স্বরূপ কবির অতুলনীয় ভাষায়

প্রকাশিত হইয়াছিল। বিদেশী শাসন-নিরপেক্ষ স্বদেশী স্বাধীন সমাজ—এক অতি উজ্জ্বল চিত্তাকর্ষক পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ ইহা প্রথম দিয়াছেন। আর এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার নীতি বারো বৎসর আগে (১৮৯৩খ্রীঃ) অরবিন্দ ইন্দুপ্রকাশে প্রথম প্রচার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট-মুখাপেক্ষী না হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মরক্ষাই চরমপন্থী রাজনীতির নূতন আদর্শ হইল। কাজেই এই সভায় প্রাচীন নরমপন্থী নেতাদের দুর্ব্বলতার উপর তীব্র কশাঘাত করা হইল। কশাঘাত ক্রমে তীব্র হইতে তীব্রতর হইবে। ফলে তিন বৎসর পরে দুই দল বিচ্ছিন্ন হইয়া দুই দিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িবে।

৯ই গোলদীঘিতে ছাত্রেরা এক সভা করিল। রবীন্দ্রনাথের সখা ও শিষ্য অধ্যাপক মোহিত সেন সভাপতি হইয়া ছাত্রদের মনস্তুষ্টি করিয়া বক্তৃতা দিলেন।

১৭ই পান্তীর মাঠে সভা হইল। সভার আলোচ্য-বিষয় ছিল "স্বদেশী আন্দোলন ও ভবিষ্যৎ"। স্বদেশী আন্দোলন যেরূপ ঘোরাল হইয়া ক্ষিপ্রগতিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহাতে চরমপন্থী নেতারা এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে—অর্থাৎ কী হইতে পারে, কী হইবে, কী করা উচিত, ইহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করিলেন। এবং ঐ পান্তীর মাঠের ক্লাবে পর পর চার দিন—১৮ই, ২১শে, ২২শে, ২৩শে তারিখে—পরামর্শ-সভা করিয়া স্থির হইল যে, চরমপন্থী নেতাদের দলের একটি কার্যকরী সমিতি এখনই গঠন করা দরকার। না করিলে এই আন্দোলন বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইবে অথবা শক্তির অপচয় ঘটাইবে এবং ঈপ্সিত ফল লাভ করা যাইবে না। সুতরাং চরমপন্থী নেতারা আর একদিনও বিলম্ব না করিয়া ঠিক তার পরের দিন—

২৪শে তারিখে মিঃ সি. আর. দাশের বাড়ীতে (১৪৮ রসা রোড, কলিকাতা, যেখানে বসিয়া তিনি অরবিন্দের বোমার মামলায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন এবং এখন যেখানে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর 'চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন' হইয়াছে) বাংলার চরমপন্থী দলের কার্য্যকরী সমিতি প্রতিষ্ঠা হইল। সমিতির নাম হইল 'স্বদেশী মণ্ডলী'। এবং এই মণ্ডলীর নিয়মাবলী পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হইয়া গেল। দেখা যাইতেছে যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতেই বাঙলার স্বদেশী যুগের চরমপন্থী দল, একরকম বলিতে গেলে প্রথম ভূমিষ্ঠ হইল। এই "স্বদেশী মণ্ডলী" গঠিত হইবার মাত্র দুই দিন পর—২৭শে তারিখে, কাশীধামে কংগ্রেসের সভা বসিল। একদিক হইতে সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী, ভূপেন বসু প্রভৃতি

এবং অপর দিক হইতে মিঃ সি. আর. দাশের বাড়ীতে সদ্য গঠিত "স্বদেশী মণ্ডলীর" চরমপন্থী নেতারা কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য দ্রুত কাশী যাত্রা করিলেন। দেখিতেছি, যেন একটা ঝড় বহিয়া যাইতেছে।

অরবিন্দ-লিখিত "ভবানী মন্দির" : অরবিন্দ বরোদা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা আগমনের পূর্বে, ১৯০৫ খৃঃ শেষভাগে, "ভবানী মন্দির"—১৫।১৬ পাতার ইংরেজিতে লেখা একখানি চটিগ্রন্থ—লিখিয়া বারীন্দ্রকে দিয়া উহা কলিকাতা পাঠান। বারীন্দ্র রাতারাতি ঐ গ্রন্থখানি ছাপাইয়া কলিকাতায় বিলি করান। প্রথমেই শক্তিমূর্তি ভবানীর উদ্দেশ্যে একটি স্তব দিয়া ইহা আরম্ভ হয়। গুপ্ত-সমিতির এই নূতন সন্ন্যাসবাদের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইলে মা ভবানীর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া দীক্ষা নিতে হইবে। তাহা হইলে বিপ্লববাদীদের মৃত্যুভয় থাকিবে না। মৃত্যুভয় অতিক্রম করাই "ভবানী মন্দির"-এর কল্পনায় প্রধান উদ্দেশ্য। কেননা, প্রথম পর্ব্বের গুপ্ত-সমিতি (১৯০২-১৯০৪) বিপ্লববাদীদের মৃত্যুভয়ের দরুন ব্যর্থ হইয়া যায়। দ্বিতীয় পর্ব্বের গুপ্ত-সমিতি এই মৃত্যুভয়জনিত প্রথম পর্ব্বের ব্যর্থতাকে দূর করিবার জন্য "ভবানী মন্দির"-এর কল্পনা করিয়া উহার উপর আধ্যাত্মিকতার আবরণ দিলেন। প্রথম পর্ব্ব হইতে দ্বিতীয় পর্ব্বের পার্থক্য এইখানে দেখা দিল।

অরবিন্দ এই সময় নিয়মিতভাবে প্রত্যূষে স্নান করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতেন।

(ক) **বারীন্দ্র কুমার**। বারীন্দ্র কুমার ১২।৬।৪৩ তারিখে নিম্নলিখিতরূপ আমাদিগকে বলিয়াছেন, আমরা তাঁহার সম্মুখে বসিয়া লিখিয়া নিয়াছি। কোন ভুলভ্রান্তি হয় নাই।

"I came to Calcutta from Baroda probably in February or March, 1906 with the MSS. of ভবানী মন্দির, written by Sri Aravindo in English. It was printed secretly at night in D. Gupta's Press at Kalitola under the supervision of Sudhir Sorkar of Khulna, Joshi (a Marhatti) and myself in pamphlet form. The pamphlet was 15 to 16 pages, and in it there was a scheme for the establishment of a temple to ভবানী, to be erected in some inaccessible hilly region of

India. Though the region was not mentioned, the site had been selected near the Sone River in the Kimur Range.

"In this temple devotees were to receive initiation both spiritually and politically for the deliverance of India from foreign rule. The scheme undoubtedly owed its origin to আনন্দমঠ of Bankim Chandra Chatterjee.

"The pamphlet opened an invocation of ভবানী, and in most stirring and appealing language called for initiates to this cult in the new spirit of Nationalism. But the appeal was more in the nature of a spiritual than a political one, as the failure of the first attempt (1902—1904) at the formation of a secret society clearly proved that without sipritual background, the movement was not likely to have the moral stamina required for the facing of death ungrudgingly, nor giving moral tone to terrorist activities".—*Barindra K. Ghose; 12-6-43.*

বারীন্দ্র বলেন, 'ভবানী মন্দিরে'র কোন বাংলা অনুবাদ হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের সহকর্মী শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২০।৬।৪৩ তারিখে আমাকে বলিলেন যে, তাঁহার মনে পড়ে তিনি ইহার বাংলা অনুবাদ তখন দেখেছিলেন। অরবিন্দই ইহার লেখক। গুপ্ত-সমিতির কার্য্যাবলীর কোন কথা ইহাতে বিশেষ ছিল না।

ভারতবর্ষের কোন এক দুর্ভেদ্য মনোরম স্থানে এইরূপ মন্দির স্থাপনের পরিকল্পনা অরবিন্দ ১৯০৬ খৃঃ প্রথমে বরোদা থাকিতেই করিয়াছিলেন।

(খ) **রাওলাট্ কমিটি** (Rowlatt Committee)। ১৯১৮ খৃঃ রাউলাট কমিটি ভবানী মন্দির সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অরবিন্দ যে ইহার লেখক, তাহা উল্লেখ করেন নাই—কেননা, তাঁহারা ইহা জানিতেন না। না জানিয়াও, শুধু রচনা-ভঙ্গী হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহা যে-সে লোকের লেখা নয়। তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহার প্রশংসা করিয়া ফেলিয়াছেন—"It was remarkable in more ways than one"।

তাঁহারা বলিয়াছেন—

(১) বঙ্কিমের 'আনন্দ মঠ'-এর অনুকরণে ইহা লেখা হইয়াছে।

(২) মা ভবানীর স্তবস্তুতি দিয়া ইহা আরম্ভ হইয়াছে। জগতের সকল প্রকার শক্তির উৎস হইতেছেন মা ভবানী। ভারতবাসী মা ভবানীর পূজা না-করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।

(৩) মা ভবানীর পূজারী একদল তরুণ সন্ন্যাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) এই তরুণ সন্ন্যাসীর দল ভারতবর্ষকে বিদেশীর শাসন হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন করিবে।

(৫) কিন্তু কোন হিংসামূলক কার্য্যের নির্দ্দেশ ইহাতে ছিল না।

"The central idea as to a given religious order is taken from the well-known novel Ananda Math of Bankim Chandra. We find the glorification of Kali, under the names of Sakti and Bhawani (two of her numerous names) and the preaching of the gospel of Force and Strength as the necessary condition for political freedom. The necessity for Indians to worship Sakti (or Bhawani manifested as the Mother of Strength) is insisted upon if success is desired. A new order of political devotee was to be instituted.

"A new organization of political Sannaysis was to be started, who were to prepare the way for revolutionary work. It was the liberation of India from foreign yoke.

"At this stage there is no reference to violence or crime."
—*Report of Rowlatt Committee, p. 67.*

রাউলাট কমিটি ভবানী মন্দিরের এই বিপ্লবাত্মক চটিগ্রন্থের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে—

(১) বাংলাদেশের বৈপ্লবিক সমিতিগুলি এই ভবানী মন্দিরের আদর্শকে এবং ইহার নিয়মাবলীকে পরবর্ত্তীকালে অবিকল গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে রাশিয়ার হিংসামূলক বৈপ্লবিক কর্ম্মপদ্ধতিও গ্রহণ করিয়াছে।

(২) ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের পরে যেসকল বৈপ্লবিক সমিতি জন্মলাভ করিয়াছে তাহা ভবানী মন্দিরের ধর্মের দিকটা ছাড়িয়া দিয়া গুপ্তহত্যা ও ডাকাতিকে উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে।

(৩) এই গ্রন্থে ধর্মের আদর্শকে কী করিয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য প্রয়োগ করা যায়, তাহাই দেখান হইয়াছে

"The Revolutionary Societies in Bengal infected the principles and rules, advocated in the Bhawani Mandir, with the Russian ideas of revolutionary violence. While a great deal is said in the Bhawani Mandir about the religious aspect, the Russian rules are matter of fact.

"The samities and associations formed later than 1908, gradually dropped the religious ideas underlying the Bhawani Mandir pamphlet and developed the terroristic side with its necessary accompaniments of dacoity and murder."—*Ibid, p. 37.*

"The book is a remarkable instance of perversion of religious ideals to political purposes"—*Ibid, p. 17.*

(গ) **স্বামী বিবেকানন্দের উপর গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য।** এই সম্পর্কে রাউলাট কমিটির ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের এই রকম আর একটি মন্তব্যের উল্লেখ করা প্রসঙ্গত প্রয়োজন।

"স্বামী বিবেকানন্দ এদেশে জাতীয় ভাব প্রচারে যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয়। এমন কি কোন কোন য়ুরোপীয় তাঁহার রচনায় ও বক্তৃতায় বর্ত্তমান রাজনীতিক আন্দোলনের উৎস সন্ধান করিয়াছেন। সরকার ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে যে বঙ্গীয় জিলা-শাসন সমিতি গঠন করেন, তাহার রিপোর্টে লিখিত হইয়াছিল—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও তাহার সহকর্ম্মীরা স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবের সুযোগ লাভ করিয়াছিল। বিবেকানন্দের অপরাধ "His preachings gave rise to Nationalism with a religious tendency." (অর্থাৎ "বিবেকানন্দ ধর্ম্মমিশ্রিত জাতীয়তাবাদ প্রচার করিয়াছিলেন"।—কংগ্রেস। পৃঃ ১৮০—১৮২। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সুতরাং গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যে, আগে স্বামী বিবেকানন্দ পরে শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তার মধ্যে ধর্ম্মের অনুপ্রবেশ করাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের এই মন্তব্য এখনও ঐতিহাসিকদিগের বিচারাধীন রহিয়াছে। তবে এইটুকু বলিতে হয় যে, বিবেকানন্দ যদি জাতীয়তার মধ্যে ধর্ম্মকে প্রবেশ করাইয়া থাকেন, তবে অরবিন্দ আর এক ধাপ উপরে গিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন : জাতীয়তাই ধর্ম্ম—"Nationalism is a religion that comes from God"। ভারতবর্ষে অন্যান্য নেতাদের মধ্যে অরবিন্দ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাজনীতিকে ধর্ম্মভারাক্রান্ত করিয়াছেন।

(ঘ) **"স্ত্রীর নিকট পত্র" (১৯০৫।৩০শে আগষ্ট)**। অরবিন্দ ১৯০৫।৩০শে আগষ্ট তাঁহার স্ত্রীকে যে স্মরণীয় পত্র লিখিয়াছিলেন, ঐ পত্রের ছত্রে ছত্রে আমরা শুধু একটি কথারই প্রমাণ পাই যে—তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন। অরবিন্দের যখন এইরূপ মনোভাব তখন ১৯০৫ খৃঃ শেষ হইতে মাত্র চারি মাস বাকী। এই চারি মাসের যে-কোন মাসে অরবিন্দ "ভবানী মন্দির" লিখিয়াছিলেন, নতুবা ১৯০৫ খৃঃ রাউলাট কমিটির সিদ্ধান্তে ইহা প্রকাশ হওয়া সম্ভবপর হয় কিরূপে (* ক)?

আমাদের বলিবার কথা এই যে, অরবিন্দ মনের যে অবস্থায় "ভবানী মন্দির" লিখিয়াছিলেন আর তাঁহার স্ত্রীর নিকট পত্র লিখিবার সময় তাঁহার যে মনের অবস্থা ছিল—ইহার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ২।৩ মাসের অধিক হইবে না। "ভবানী মন্দির" যদি স্ত্রীর নিকট পত্র লিখিবার কিছু আগেও খসড়া হইয়া থাকে তবে ১৯০৫।৩০শে আগষ্ট হইতে তাহার ব্যবধানও

(* ক) *Bhawani Mandir :* "It will be remembered that in 1905 was published the pamphlet Bhawani Mandir, which set out the aims and objects of the Revolutionaries. It was remarkable in more ways than one."—(*p. 67*)

ভবানী মন্দির প্রকাশের তারিখ সম্বন্ধে রাউলাট কমিটি বলেন যে, ইহা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বারীন্দ্রকুমার ইহার দু'চার মাস পরে প্রকাশের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সন-তারিখ সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিশক্তি অতি ক্ষীণ বলিয়া নিজেই স্বীকার করেন। সুতরাং প্রকাশের তারিখ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ ধরিয়া রাউলাট কমিটীর উপর নির্ভর করাই যুক্তিসঙ্গত।

২।৩ মাসের অধিক হইবে না। "ভবানী মন্দির" চটিগ্রন্থ স্ত্রীর নিকট পত্র-এর সহিত এক সঙ্গেই মিলাইয়া পড়িতে হইবে। কেননা, ইহাদের মধ্যে যোগাযোগ আছে। স্ত্রীর নিকট পত্র পড়িলে "ভবানী মন্দির"কে ভাল বুঝা যাইবে এবং "ভবানী মন্দির" পড়িলেও স্ত্রীর নিকট পত্র-এর গূঢ় মর্ম্ম বুঝা অত্যন্ত সহজ হইবে।

(চ) "ভবানী মন্দির" ও "বাজীপ্রভু" কবিতা। যেমন স্ত্রীর নিকট পত্র-এর সহিত, তেমনি "বাজীপ্রভু" (Baji Prabhou) কবিতার সহিত "ভবানী মন্দির"-এর যোগাযোগ আছে। অরবিন্দ আগে "বাজীপ্রভু"র কথা লিখিয়াছেন, পরে "ভবানী মন্দির" লিখিয়াছেন। বাজীপ্রভু কবিতাতেই আমরা সর্ব্বপ্রথম মা ভবানীকে পাই। বরোদা থাকিতেই মারাঠার আবহাওয়ার মধ্যে অরবিন্দের কবিকল্পনায় শিবাজীর যুদ্ধের দেবী মা ভবানী উদিত হইয়াছিলেন। মারাঠার এক দুর্গম গিরিপথের প্রবেশমুখে বিপুল মোগল সৈন্যের আক্রমণের বিরুদ্ধে মাত্র ৫০ জন সৈন্য লইয়া বাজীপ্রভু শুধু এক মা ভবানীর কৃপায় বাধা দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহাতে অবশ্য বাজীপ্রভুকে তাঁহার সঙ্গীদের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। মা ভবানীর কৃপায় যুদ্ধে জয় হইতে পারে বটে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া সেই বিজয়গৌরব কিনিতে হইবে এবং জাতির স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হইবে। "বাজীপ্রভু" কবিতার ইহাই গল্পের অংশ ও তাহার মর্ম্মকথা। এই কবিতায় মা ভবানীর আবির্ভাব বহুস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে মা ভবানীর আকৃতির বর্ণনা দিতেছি :

> And passing out of him a mighty form
> Stood visible, Titanic, Scarlet-clad,
> Dark as a thunder cloud, with streaming hair
> * * * *
> Obscuring heaven, and in her sovereign grasp
> The sword, the flower, the boon, the bleeding head,—
> *Bhawani :* then she vanished ;—

যুদ্ধক্ষেত্রে ভবানীর আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখা গেল। বাজী এই ভবানীকে আগেই জানিতেন। আরো জানিতেন যে, এই মা ভবানী সমস্ত ভারতবর্ষের উপর সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়া শেষ পর্য্যন্ত এই দেশকে রক্ষা করিতেছেন।

And Baji knew the goddess formidible
Who watches over India till the end.

প্রচণ্ড ঝটিকা ও বজ্রের মধ্যে যেইরূপ, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের বাহুতেও সেইরূপ ভবানীর শক্তিই কার্য্য করিয়া থাকে।

We but employ
Bhawani's strength, who in an arm of flesh
Is mighty as in the thunder and the storm.

দেশরক্ষার্থ স্বাধীনতার যুদ্ধে মা ভবানী তরবারি দেন। মৃত্যু ত হবেই, কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

Chosen of Shivaji, *Bhawani's* swords
For you the Gods prepare. We die indeed,
But let us die with the high voiced assent
Of heaven to our country's claim enforced
To freedom.

মা ভবানীর ইচ্ছা হইলেই, মোগল সাম্রাজ্যের শক্তির বিরুদ্ধেও, জাতি পরাজয় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে।

Make iron of your souls,
Yet if *Bhawani* wills, strength and the sword
Can stay our nation's future from overthrow
Till victory with Shivaji return.

এই মা ভবানীর মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্যই অরবিন্দের নির্দ্দেশে বারীন্দ্র শোণ নদের তীরে কাইনুর পাহাড়ের উপর জমি দেখিতে গিয়া সেখানে মাসাবধিকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা গেল বাজীপ্রভু কবিতার সহিত ভবানী মন্দির চটিগ্রন্থের সুস্পষ্ট যোগাযোগ আছে। ভবানী মন্দিরের লেখক যে অরবিন্দ, তাহারও আভ্যন্তর প্রমাণ পাওয়া গেল, যদিও বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তির পর ইহার আর প্রয়োজন ছিলনা।

বাজীপ্রভু কবিতায় মা ভবানী যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুভয় উপেক্ষাকারী বীর সৈনিকের আরাধ্যা দেবী, কিন্তু ভবানী মন্দিরে তিনি "আনন্দ মঠের" সন্ন্যাসীদের

মত একদল গুপ্ত-সমিতির ডাকাত সন্ন্যাসীদের দেবী।

এই সময়ে অরবিন্দের মন প্রকাশ্য বিদ্রোহ বা যুদ্ধ ছাড়িয়া গুপ্ত-সমিতির দিকে আকৃষ্ট হয়। যখন গুপ্ত-সমিতির ১ম পর্ব্ব ব্যর্থ হয়, তখন এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া অরবিন্দ এবারে আবার মা ভবানীকে সোজা আহ্বান করিয়া বসিলেন; ২য় পর্ব্বের গুপ্ত-সমিতির (১৯০৬-৮) উদ্বোধনকল্পে ভবানী মন্দির লিখিয়া দিয়া উহা ১৯০৫ খৃ: শেষভাগে বাংলাদেশে পাঠাইয়া দিলেন। মা ভবানী বারীন্দ্রকে সদাসর্ব্বক্ষণ সকল রকম বিপদ-আপদে অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত ২য় পর্ব্বের গুপ্ত-সমিতির ছোকরা সন্ন্যাসীর দলকে রক্ষা করিবেন। তাদের গুপ্তহত্যা ও ডাকাতিকাজে সাহায্য করিবেন, ইহাই ছিল অরবিন্দের বৈপ্লবিক কর্ম্মে ধর্ম্মের প্রেরণা—ইহা অতিপ্রাকৃত এবং অলৌকিক, সন্দেহ নাই। কিন্তু অরবিন্দ এই অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক-এ বিশ্বাস নিজে না করিলে, অনুচরদের করাইলেন কিরূপে? ১ম পর্ব্বের গুপ্ত-সমিতিতে মা ভবানী ছিলেন না, ২য় পর্ব্বে তিনি আসিলেন। এইখানেই "ভবানী মন্দির" চটি গ্রন্থের গুরুত্ব। আর এইখানেই এই গ্রন্থের উপর রাউলাট কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা যে, "The book is a remarkable instance of perversion of religious ideals to political purposes."—*p. 17.*

বাজীপ্রভু কবিতাটিতেও আমরা গ্রীক মহাকাব্যের প্রেরণা দেখিতে পাই। ইহাতে হোমার এবং ট্রোজান যুদ্ধের প্রভাব প্রত্যক্ষ, থার্ম্মোপোলির কথা মনে আনিয়া দেয়। মা ভবানী অনেকটা গ্রীকদের দেবদেবীর মত, যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে স্বয়ং আসিয়া হস্তক্ষেপ করেন। বাজীপ্রভুতে আমরা গ্রীক স্বদেশপ্রেমের ছায়া মারাঠার ইতিহাসে আসিয়া পড়িতেছে, ইহা লক্ষ্য করি। কিন্তু ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, মারাঠার স্বদেশ-প্রেম গ্রীকদের নিকট হইতে একটা ধার করা বস্তু।

আরো একটি লক্ষ্য করিবার কথা। অরবিন্দের মানসিক বিকাশের ইতিহাসে এই শক্তি-তত্ত্ব—মারাঠার "ভবানী" হইতে বাংলার "কালীতে' আসিয়া রূপান্তরিত হয়। কেননা, ১৯০৬ খৃ: হইতেই অরবিন্দ বরোদা ছাড়িয়া বাংলাকেই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। অরবিন্দের মানসিক বিকাশে এই শক্তি-তত্ত্বের প্রথম স্তরেই দেশকেও তিনি 'মা' বলিয়া জানিলেন। 'ভক্তি ও পূজা' করিলেন। এই 'মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি

একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কী করে? এই সোজা প্রশ্ন ১৯০৫।৩০শে আগষ্ট তিনি তাঁহার স্ত্রীকে পরে জিজ্ঞাসা করিলেন। বাংলাদেশে গুপ্ত-সমিতির ২য় পর্ব্বে (১৯০৬-১৯০৮) নেতৃত্ব করিবার সময় তিনি নিজেকে 'Kali' (কালী) বলিয়া স্বাক্ষর করিতেন। এই গেল প্রথম স্তর।

দ্বিতীয় স্তরে অরবিন্দের Mother (মা) গ্রন্থে এই শক্তি-তত্ত্ব, জাতীয় আদর্শ ক্রমে অতিক্রম করিয়া জগন্মাতা মহাশক্তি হইয়া উঠেন। এবং ঐ মহাশক্তির চারিটি রূপ মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী—তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। মন আর একটা উপরের স্তরে না উঠিলে দিব্যদৃষ্টি খুলে না,—এগুলি এত সব বিভিন্ন বিচিত্র রূপ দেখিতে পায় না। অরবিন্দ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মন স্বাদেশিকতার প্রথম স্তর হইতে, সাধনার দ্বিতীয় স্তরে উঠিয়া গেল।

তৃতীয় স্তরে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এই শক্তিতত্ত্ব আরও মিষ্টিক্ (mystic) হইয়া উঠিল। Ahana বিশেষতঃ গ্রীক ছন্দের অনুকারী কবিতাগুলির মধ্যে (On quantitative metre) ইহার আভাস আমরা পাই।

প্রশ্ন থাকিয়া যায়: গ্রীক আদর্শের জাতীয়তার দেবী, হিন্দু আদর্শের 'ভবানী' ও 'কালীতে' রূপান্তরিত হইয়া, ক্রমে আরো হিন্দু আধ্যাত্মিকতার নিষ্পেষণে বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িল কি-না? বাজীপ্রভু কবিতার ভবানী,—ভবানী মন্দিরের মধ্য দিয়া ক্রমে 'মা'র মহেশ্বরী ইত্যাদির মধ্য দিয়া অহনা ও শেষের গ্রীক ছন্দের কবিতায় মিষ্টিক্ হইয়া উঠিল কি-না? মা ভবানীর মধ্যে যে বৈপ্লবিক আদর্শ গোড়াতে ছিল তাহা ক্রমে উপিয়া গেল কি-না? অরবিন্দের যোগ-সাধনার গতিমুখে এই প্রশ্ন তার উত্তর যা-ই হউক, অপ্রাসঙ্গিক নয়।

এদিকে আবার এই প্রসঙ্গে রাউলাট কমিটি এক অতি মারাত্মক কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ১৯০৮ খৃঃ পরে যে-সকল গুপ্ত-সমিতির আবির্ভাব হইয়াছিল—সেগুলি ক্রমে ভবানী মন্দিরের ধর্ম্মের আদর্শটি পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুপ্তহত্যা আর ডাকাতিতে মনোনিবেশ করিয়াছিল। আশ্চর্য্য!

ভবানী মন্দিরের কথা একটু বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ইহার প্রয়োজন ছিল। কেননা—

১ম, ইহা এক লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার। রাউলাট কমিটির রিপোর্ট না থাকিলে আজ আর ইহার কোনই হদিস পাওয়া যাইত না।

২য়, অরবিন্দ যে ইহার লেখক ইহা কেহ জানিত না। না জানিয়া কেহ বা দেবব্রতের উপর আবার কেহ বা বারীন্দ্রের উপর ইহার রচনার দায়িত্ব ভ্রমক্রমে আরোপ করিয়া গিয়াছেন। এই ভ্রম সংশোধনের প্রয়োজন ছিল।

৩য়, অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্তসমিতির ২য় পর্ব্ব (১৯০৬-১৯০৮) কিরূপ ধর্ম্মের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল—তাহা ভবানী মন্দির ব্যতিরেকে বুঝা যাইত না।

ভবানী মন্দিরের ভৌগোলিক স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া অরবিন্দ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের ভাষায় অবিকল তুলিয়া দিতেছি—"...far from the contamination of modern cities, and as yet little trodden by man, in a high and pure air steeped in calm and energy".

(ঙ) **"ভবানী মন্দির"-এর লেখক সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাঃ** হেমচন্দ্র কাননগু লিখিয়াছেন, ইহা দেবব্রত বসুর রচিত। আবার প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, ইহা স্বয়ং বারীন্দ্র লিখিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা দুইজনেই ভুল কথা লিখিয়াছেন। ইহার সংশোধন প্রয়োজন (* ক)। রাউলাট কমিটি "ভবানী মন্দির"-এর তারিখ দিতেছেন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ। বারীন্দ্রকুমার বলিতেছেন, ১৯০৬।ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ। আমাদিগের ধারণা—অরবিন্দ ইহা কাশী কংগ্রেসের (১৯০৫,২৭শে ডিসেম্বর) পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলেন এবং বারীন্দ্রকুমার উহা কলিকাতা আনিয়া, কোহিনুর পাহাড়ে এক মাস ঘুরিয়া, পরে ছাপাইয়া ১৯০৬।ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চে গোপনে বিলি করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকেও ইহার এক কপি দেওয়া হইয়াছিল।—ইহা অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমাকে বলিয়াছিলেন।

কংগ্রেসঃ ২৭শে ডিসেম্বর (১৯০৫) কাশীধামে কংগ্রেস বসিল। সভাপতি হইলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে (জন্ম ১৮৬৬—মৃত্যু ১৯১৫, ফেব্রুয়ারী)। তাঁহার বয়স তখন মাত্র ৩৯ বৎসর। ঠিক এই বয়সে তিন বৎসর পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করিয়াছেন। গোখলের মত অল্প বয়সে ইতিপূর্ব্বে

(* ক) "ঐ 'যুগান্তর' অফিসেই তখনকার গুপ্ত-সমিতির আড্ডা ছিল। এইটেই বঙ্কিমবাবুর আনন্দ মঠের বা দেবব্রতবাবুর ভবানী মন্দিরের স্থানীয় ছিল।"—[হেমচন্দ্র কাননগু, বাঃ-বিঃ-প্রঃ, পৃ ১০৭]

"এই সব সাহিত্যের মধ্যে বারীন্দ্র লিখিত...ভবানী মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"—[প্রভাত মুখার্জি—ভাঃ-জাঃ-আঃ, পৃঃ ১৩৭)।

আর কেহ কংগ্রেসের সভাপতি হন নাই। কংগ্রেসের সভাপতি হইবার পরেও দশ বৎসর তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের কাজ করিয়া পুণা সহরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গোখলে অপেক্ষা অরবিন্দ বয়সে ছয় বৎসরের ছোট। সমসাময়িক নেতাদের মধ্যে অরবিন্দ সর্ব্বকনিষ্ঠ।

কংগ্রেসের যখন ১১ বৎসর বয়স, তখন ১৮৯৫ খৃঃ পুণা সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্র ব্যনার্জ্জী সভাপতি হ'ন—আর গোখলে ২৯ বৎসর বয়সে সেই কংগ্রেসের সম্পাদক হইয়াছিলেন। কংগ্রেসের ৯ বৎসর বয়সে অরবিন্দ কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। ১৮৯৭ খৃঃ গোখলে "ওয়েলবি কমিশনে" সাক্ষ্য দিতে বিলাত যান। এদেশে গভর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়ের যে হিসাব তিনি কমিশনের নিকট দেন, তাহা খুব মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। গোখলে বিলাতে থাকাকালীন বম্বে-গভর্ণমেণ্টের প্লেগ-দমনে অত্যাচারের কথা মিঃ রাণাডে (তখন বম্বে হাইকোর্টের জজ্) গোখলেকে লিখে পাঠান। গোখলে সরল মনে সেই কথা বিলাতের খবরের কাগজে প্রকাশ করিয়া দেন। ফলে দেশে ফিরিয়া আসিলে বম্বে বন্দরে জাহাজ ভিড়িবামাত্র পুলিস-কমিশনার গোখলের নিকট বম্বে-গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিলাতে অপবাদ-রটাইবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন ; গোখলে মিঃ রাণাডের চিঠি প্রকাশ করিতে না পারায় অগত্যা ক্ষমা চাহিতে বাধ্য হন। ফলে ১৮৯৭ খৃঃ অমরাবতী কংগ্রেসে গোখলে বক্তৃতা দিতে উঠিলে শ্রোতারা তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য হিস্ হিস্ শব্দ করিয়া বসাইয়া দেন। গোখলে বসিয়া পড়িতে বাধ্য হন। তারপর ছয় বৎসর তিনি নিয়মিতভাবে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিলেও, কখনও বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হ'ন নাই। তাঁহার আত্মসম্মানবোধ ছিল। দেশের লোকের দ্বারা প্রকাশ্যে অপমাণিত হইয়াও তিনি দেশের সেবা পরিত্যাগ করেন নাই। ১৯০২ খৃঃ স্যার ফিরোজ শা মেহেতা বড়লাটের ব্যবস্থাপক-সভা হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, গোখলে সেই সভ্যপদে মনোনীত হন। ১৯০৩ খৃঃ মাদ্রাজে লালমোহন ঘোষের সভাপতিত্বে যে কংগ্রেস হয়, সেই কংগ্রেসর সেক্রেটারী হইয়া গোখলে মাদ্রাজ গমন করেন। মদ্রবাসীরা গোখলেকে বিরাট্ আয়োজনে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃঃ-এর হিস্ হিস্ শব্দ নীরব হইয়া গিয়াছিল। পরে ১৯০৫ খৃঃ কাশী কংগ্রেসের ত তিনি সভাপতিই হইয়া বসিলেন। ধৈর্য্যের সহিত দেশের সেবা করার পুরস্কার তিনি পাইলেন।

অরবিন্দের জীবন-চরিত আলোচনায় গোখলে-সম্পর্কে আরো কিছুটা বলা দরকার।

মিঃ রাণাডে এবং স্যার ফিরোজ শা মেহেতা—এই উভয়ের সংযোগে গোখলের উৎপত্তি। মহাত্মা গান্ধী বলেন, গোখলে তাঁহার রাজনৈতিক গুরু। ১২ বৎসর আগে ইন্দুপ্রকাশে অরবিন্দ কংগ্রেসের 'আবেদন-নিবেদন' নীতির বিরুদ্ধে যে-সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে খোলাখুলিভাবে দুর্দ্দান্ত মেহেতার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ ছিল। আর ঐসব প্রবন্ধ পড়িয়া মিঃ রাণাডে বিচলিত হইয়া অরবিন্দকে সাক্ষাতে ডাকিয়া ঐরূপ কংগ্রেস-বিরোধী প্রবন্ধ লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সুতরাং অরবিন্দ কাশী-কংগ্রেসের ১২ বৎসর পূর্ব্বে, গোখলের দীক্ষাগুরু মিঃ রাণাডে এবং শিক্ষাগুরু স্যার ফিরোজ শা মেহেতার রাজনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া উভয়ের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। নিশ্চয়ই কাশী-কংগ্রেসের তরুণ সভাপতির ইহা অবিদিত ছিল না। অরবিন্দ কাশী-কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন না নিশ্চয়। ইহার পরবর্ত্তী দুই কংগ্রেসে, কলিকাতা ও সুরাট, অরবিন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গোখলে অধ্যাপক, শিক্ষাব্রতী, ত্যাগী পুরুষ। যে বেতনে গোখলে ফার্গুসন কলেজে অধ্যাপনা করিতেন এবং ১৯০২ খৃঃ মাসিক মাত্র ৩০৲ পেন্‌সন্ লইয়া দেশের কাজে আত্মসমর্পণ করেন, তার সঙ্গে অরবিন্দের বরোদার অধ্যাপকের চাকরি ছাড়িয়া বাংলার জাতীয় বিদ্যালয়ে কয়েক মাসের জন্য মাসিক ৫০৲ বেতনের চাকরির তুলনা করা যাইতে পারে। তুলনায় 'দুনো পাল্লা ভারি'—ত্যাগে কেউ কারু চাইতে কম নয়। ঔপনিষদিক ত্যাগ, অথবা মধ্যযুগের পারলৌকিক মুক্তি কামনার জন্য যে ত্যাগ—গোখলের অর্থোপার্জ্জনের স্পৃহা-বর্জ্জনরূপ ত্যাগ সে শ্রেণীর নহে। ইহা দেশের মঙ্গল-কামনায় সমস্ত শক্তি ও সময় ব্যয় করিবার জন্য নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সুখসুবিধা ত্যাগ। ইহা দেশপ্রেমের প্রেরণায়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ত্যাগ। গোখলে এই শ্রেণীর ত্যাগীদের মধ্যে একজন অগ্রণী ব্যক্তি। গোখলের মৃত্যুর পর ভারত-সচিবের আণ্ডার-সেক্রেটারী এস. পি. সিংহ (তখনো লর্ড হননি) গোখলের দুই কন্যার জন্য গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ২৫ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কন্যাদ্বয় সে দান গ্রহণ করেন নাই, ধন্যবাদ-সহকারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। —বাপের মেয়ে! কেননা, গোখলে তাঁর কন্যাদিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে,

তাঁর মৃত্যুর পর তাহারা যেন অপর কাহারও সাহায্য গ্রহণ না করে। গোখলের উপদেশে তাঁর কন্যাদ্বয়ের এই অযাচিত দান উপেক্ষা যেমন বলশালী, চরিত্রের পরিচয় তেমনি প্রশংসনীয়। অথচ গোখলে ফার্গুসন কলেজের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া দুই লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

বাংলাদেশের ব্রাহ্ম সমাজের অনুকরণে বোম্বাই প্রদেশে প্রার্থনা সমাজ গড়িয়া উঠে। মিঃ রাণাডে এই প্রার্থনা-সমাজের প্রধানব্যক্তি ছিলেন। গোখলে গুরু-অনুগামী হইয়া এই প্রার্থনা-সমাজভুক্ত ছিলেন। তিনি একেশ্বরবাদী, জাতিভেদবিরোধী, বাল্যবিবাহবিরোধী, স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী, জন-সাধারণের মধ্যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক না-হইলেও ইহার প্রচলনকল্পে বড়লাটের ব্যবস্থাপকা সভায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াও দূর-ভবিষ্যতে ইহার সাফল্য কামনা করিয়া গিয়াছেন। অরবিন্দ বাংলার ব্রাহ্মদের উপর ১৮৯৪ খৃঃ হইতেই যে-সকল কারণে চটা, সেই সকল কারণ মারাঠী ব্রাহ্ম গোখলের মধ্যে পুরা মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। অতএব সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে গোখলে আর অরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিপরীত। যিনি বাঙ্গালী ব্রাহ্মের উপর চটা তিনি মারাঠি ব্রাহ্মের উপর উদারভাব পোষণ করিবেন—আশা করা যায় না। দেখা যায়, যাঁহারা ধর্ম্ম ও সমাজে সংস্কারের দলভুক্ত তাঁহারা রাজনীতিতে নরমপন্থী। আবার যাঁহারা ধর্ম্মে ও সমাজে রক্ষণশীল তাঁহারাই রাজনীতিতে চরমপন্থী। কেহ কেহ বা তার মধ্যে আবার বিপ্লববাদী। অরবিন্দ ১৮৯৩ খৃঃ হইতেই রাজনীতিতে বিপ্লববাদী। কেম্ব্রিজে থাকাকালীন এই বিপ্লববাদ দ্বারা অতিমাত্রায় আক্রান্ত হইয়াই তিনি দেশে ফিরিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া তিনি ব্রাহ্ম-বিরোধী হিন্দু রক্ষণশীল সমাজভুক্ত হইবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। ইহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। অথচ মূলত: জন্মস্বত্বে তিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন যুবক। তা-ও এক পুরুষে ব্রাহ্ম নহেন। তিনপুরুষে অরবিন্দ ব্রাহ্ম। ইউরোপের ইতিহাসে জার্মানীর লুথার-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সংস্কারের সহিত যদি ফরাসী বিদ্রোহের যোগাযোগ থাকিয়া থাকে, তবে বাংলাদেশে রাজা রামমোহন হইতে উনবিংশ শতাব্দীতে যে ব্রাহ্ম আন্দোলন দেখা দিয়াছিল, তাহার সহিত বাঙ্গালীর বিংশ শতাব্দীর চরমপন্থী রাজনীতি বা তথাকথিত বিপ্লববাদের যোগাযোগ আছে। ব্রাহ্মগণ বাংলাদেশে বিগত শতাব্দীতে ধর্ম্ম ও সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যক্তির স্বাধীনতার কথা প্রথম উত্থাপন করেন।

ব্রাহ্মগণ প্রথম বিদ্রোহী। তাঁহারাই প্রথম ধর্ম্ম ও সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। বিংশ শতাব্দীর ১ম দশকের রাজনৈতিক বিপ্লববাদের সহিত উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্ম-বিদ্রোহের যোগাযোগ খুব স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। কেশবচন্দ্র বিদ্রোহ করিয়াছিলেন হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে। আর বিবেকানন্দ বিদ্রোহ করিয়াছিলেন কেশবচন্দ্র ও কৈশবদের বিরুদ্ধে। কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ উভয়েই বিদ্রোহী। গোখলে বিদ্রোহী—ধর্ম্ম ও সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। আর অরবিন্দ বিদ্রোহী—রাজশক্তির বিরুদ্ধে। বিদ্রোহী নহেন কে? তবে এক এক বিষয়ের বিরুদ্ধে এক এক জন বিদ্রোহী, আর বিদ্রোহের দৌড় সকলের সমান নয়—এই যা। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, রাজার বিরুদ্ধে, সব দেশেই যুগে যুগে যেসকল বড় বড় বিদ্রোহ দেখা যায় তাহা লইয়াই ত ইতিহাস রচিত হয়—জীবনচরিত লেখা হয়। বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কথা উড়াইয়া দিয়া ত অরবিন্দের জীবন-চরিত লেখা যায় না। আর যা যায়, তা জীবন-চরিত নয়।

গোখলের বাঙ্গালীপ্রীতি সুবিদিত। আধুনিক শিক্ষিতা বাঙ্গালী মেয়েদের গোখলে খুব পছন্দ করিতেন, তাঁদের সঙ্গে মিশিতেন, তাঁদের ভালবাসিতেন। তাঁহারাও গোখলেকে ভালবাসিতেন। অরবিন্দ ১৮৯৪ খৃ: হইতেই ড্রয়িংরুম অথবা পিয়ানো বিলাসিনী আধুনিকা ফিরিঙ্গিভাবাপন্না বাঙ্গালী মেয়েদের পছন্দ করিতেন না। বঙ্কিমের উপন্যাসের অশিক্ষিতা নায়িকাদের ভাল বলিয়াছেন, লিখিয়াছেন। দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক্ বলিতেই হইবে। কাশী-কংগ্রেসের দুই বৎসর পর গোখলের বাঙ্গালী-প্রীতি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় যেন উথলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি রাজা রামমোহন হইতে কেশবচন্দ্র, আবার ডা: রাসবিহারী ঘোষ, জগদীশ বসু, রবীন্দ্রনাথ এ সকলের নাম বাঙ্গালীর গর্ব্বের বস্তু বলিয়া গৌরব করিয়াছিলেন। অরবিন্দের বাঙ্গালীপ্রীতি আমরা কতকটা দেখিয়া আসিয়াছি। অরবিন্দ, গোখলে-নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গালীদের নাম একটিরও উল্লেখ করেন নাই। কেশবচন্দ্র ও কৃষ্ণদাস পাল, এ দুইজনকে তিনি দু'চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তিনি ১৮৯৪ খৃ: হইতে ১৯১৮ খৃ: পর্য্যন্ত যে বাঙ্গালীপ্রীতির কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কারণ এই বলিয়াছেন যে: (ক) ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিপ্লবের ভাব বা বীজ আদৌ নাই, একমাত্র বাংলাদেশে কিছুটা আছে ("The Indian people generally, *with the possible exception of*

emotional and idealistic Bengal, have nothing or very little of the revolutionary temper."—*Introduction to Speeches and Writings of Tilak—by Aurovindo Ghose, 1918*)। (খ) আর বাংলাই ভারতবর্ষের ত্রাণকর্ত্তা। ("*Bengal* came forward as *the Saviour of India.*···We—'Bengalees'—were chosen as the people who were to save India, the people who were to stand foremost".—*Speech at Bombay; 19th January, 1908—by Aravindo Ghose.*)। এক্ষেত্রেও গোখলে আর অরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক্। কেননা, গোখলে বাংলার বিপ্লববাদকে প্রশংসা করেন নাই। (গ) রাজনীতিতে বাংলাই ভারতবর্ষে চিরদিন নেতৃত্ব করিয়াছে—এখনো করিতেছে ("In politics he 'the Bengalee' has always led and still leads."—*Indu-prakash; 27th August, 1894—by Aravindo Ghose*)। (ঘ) বাঙ্গালী কাল যাহা ভাবিবে—সমস্ত ভারতবর্ষের লোক সাতদিন পরে তা-ই ভাবিবে ("What Bengal thinks to-day, India will be thinking to-morrow week."—*Gokhale*)। এক্ষেত্রে অরবিন্দ ও গোখলে সম্পূর্ণ একমত। কাশী-কংগ্রেসে গোখলে বলিলেন—"All India owes a deep debt of gratitude to Bengal."

গোখলে আইন অমান্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। বিদ্রোহ, বিপ্লব, গুপ্তহত্যা, বৈপ্লবিক ডাকাতি (?) রাম বল (!)—এ সকলের ধার-পাশ দিয়াও গোখলে যান নাই। তিনি ইংরেজের অধীনে উপনিবেশগুলির মত তখনকার দিনের স্বায়ত্ত-শাসন চাহিয়াছিলেন। সুতরাং উহা লাভের জন্য আবেদন-নিবেদন নীতিই যথেষ্ট এবং প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল। অরবিন্দ বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়াই হঠাৎ চাহিয়া বসিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। আবেদন-নিবেদনে ইংরেজ ইহা দিবে না। সুতরাং তিনি বাছিয়া নিয়াছেন বিপ্লবের পথ। কিন্তু এই বিপ্লবের পথে অরবিন্দ যেসকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে বৈপ্লবিক কর্ম্মে তাঁহার আদৌ কোন অভিজ্ঞতা বা ক্ষমতা ছিল, এমন পরিচয় পাওয়া যায় না। মিঃ সি. আর. দাশ অরবিন্দের আলিপুর বোমার মামলায় এই বিপ্লবকে পুতুলখেলা ("toy revolution") বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। তথাপি অরবিন্দ বিপ্লববাদী,

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর গোখলে বিপ্লববাদী নহেন, ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

গোখলে ধর্মের মধ্য দিয়া দেশ উদ্ধারের চেষ্টা অথবা তান্ত্রিক বগলামূর্ত্তি পূজা করিয়া, মায়ের কৃপায়, দেশের শত্রু নিধন—এরূপ কোন অলৌকিক উপায় অবলম্বন করেন নাই। অরবিন্দ করিয়াছেন। 'বন্দেমাতরম্'-যুগে, গুপ্ত-সমিতির ২য় পর্বে (১৯০৬-১৯০৮) অরবিন্দ স্রেফ্ কালীমার্কা বিপ্লববাদ প্রচলন করিয়াছিলেন এবং গুপ্তসমিতির কাজে চিঠি-পত্রে নিজেকে "Kali" নামে স্বাক্ষর করিতেন। অরবিন্দ নিজেকে কালীরূপে ভাবনা করিতেন। কালী সংহারের মূর্ত্তি, নিজের শিবকে নিজে পদতলে দলিত করিয়াছেন। সহজ দেবী নন। গোখলের উপর মায়ের এতটা কৃপা কোন দিন হয় নাই। গোখলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিয়া, তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার জাগ্রত করিতে চাহিয়াছিলেন। আর অরবিন্দ ধর্মের কুসংস্কারের সুযোগ লইয়া কতকগুলি ভাবপ্রবণ ("emotional and idealist?") ছেলের দল জুটাইয়া রাতারাতি একটা-কিছু করিতে চাহিয়াছিলেন। গোখলে ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর তার্কিক (Debater)। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় তর্কে কেহই তাঁহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। তিনি বাজে কথা বলিতেন না। মি: রাণাডের প্রেরণায় ভারতীয় অর্থনীতি তিনি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মিঃ রাণাডে জার্মান অর্থনীতিবিদ্ লিষ্ট (List) সাহেবের মতাবলম্বী ছিলেন। গোখলেও তাই। অর্থনীতিতে ইঁহারা জাতীয়তাবাদের পোষকতা করিতেন। গোখলে ভারতীয় অর্থনীতিকে নথাগ্রে রাখিয়া তর্ক করিতে উঠিতেন, অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার বক্তৃতাকে সারগর্ভ করিয়া তুলিতেন। ফলে বড়লাট কার্জ্জন পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইতেন। অরবিন্দ এ-ধাতের লোক নহেন। তিনি কবিতা ও দেশকে, তাঁহার নিজের কথায়, সমান ভালবাসিতে গিয়া দেশের সাধারণ লোকের অথবা রাজ্যের অর্থনীতিবহুল আয়ব্যয়াদি সম্বন্ধীয় তথ্যাবলীর উপর সমধিক আকৃষ্ট ছিলেন না। মি: রাণাডে ও তাঁর শিষ্য গোখলে ভারতীয় অর্থনীতি শাস্ত্রে বিশেষ ওয়াকিবহাল পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন। অরবিন্দ মি: রাণাডে সম্পর্কে যা লিখিয়াছেন, গোখলে সম্পর্কেও তা খাটে। অরবিন্দ লিখিয়াছেন—"Mr. Ranade's hobby is a Conservative Radicalism and the spirit

moves him to churn the ocean of statistics in a sense more agreeable to his own turn of mind; a third authority prejudiced against Western Culture, traces all premature deaths to pleasure and wine bubbling".—*Induprakash*; *23rd July, 1894*. অরবিন্দ হয়ত মনে করেন, মানুষের অকালমৃত্যুর আরো অনেক সঙ্গত এবং পবিত্র কারণ আছে বা থাকিতে পারে।

১৮৯৭ খৃ: গোখলের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। গোখলের বয়স তখন ৩১ বৎসর। ছেলেবয়সে যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় (Western Culture) দীপ্তিমান, তাঁহারা অনেকে এ বয়সে বিবাহই করেন না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর যৌবনে ১৮ বৎসর বিপত্নীক অবস্থায় গোখলে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। তিনি মদ্যপান করিতেন না। বোমার মামলায় অরবিন্দের স্ত্রীর নিকট পত্রে ব্র্যাণ্ডির (brandy) উল্লেখ থাকায় Statesman ইহা লইয়া অরবিন্দের উপর অযথা অনেক ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিল।

বন্দেমাতরম্ এবং কর্ম্মযোগিন্ যুগে অরবিন্দ গোখলেকে যেরূপ ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছেন এমন কেহ করেন নাই। তা করুন। কিন্তু ১৯০৯ খৃ: কর্ম্মযোগিনে অরবিন্দ গোখলেকে—"Exit Bibishon" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন কেন? গোখলে কি সত্যই দেশদ্রোহী? লঙ্কার পক্ষে বিভীষণ যা, ভারতের পক্ষে গোখলে কি তা-ই?

গোখলে ও অরবিন্দ তুলনা করিতে গিয়া অনেক পরের কথা আগে আসিয়া গেল—নইলে তুলনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। পরের কথা যা আসিল তা পরে আবার যথাস্থানে প্রয়োজনমত বলিতে হইবে। কিন্তু দ্বিরুক্তি হইবে। উপায় নাই। কাশী-কংগ্রেসের সভাপতির কথা শেষ করিয়া এইবার কাশী-কংগ্রেসের কথাতে আসা যাক্।

কাশী-কংগ্রেস—বাংলার স্বদেশী এবং বয়কট: বাংলার চরমপন্থীরা মি: সি. আর. দাশের গৃহে "স্বদেশী মণ্ডলী" গঠন করিয়া দলবদ্ধ হইয়াই কাশী কংগ্রেসে আসিলেন। তাঁহাদের হাতে ছিল স্বদেশী ও বয়কটের মশাল কংগ্রেসের আলো-আঁধারের মধ্যে এই মশাল বেশ জ্বলিয়া উঠিল। গোখলে বলিলেন, স্বদেশী নিষ্পাপ পবিত্র জিনিস, ইহাতে ইংরেজের বিরুদ্ধে আক্রোশ নাই; সুতরাং শুধু বাংলা কেন সমগ্র ভারতে ইহা চলিতে পারে—সমগ্র ভারত

ইহা গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু, বয়কট অর্থাৎ ব্রিটিশপণ্য বর্জন, এ বড় বিষম কথা! এতে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং আক্রোশ আছে। ইংলণ্ডের সহিত আমাদের যে সম্পর্ক, তাতে এই ইংরেজ-বিদ্বেষ ত কোন মতেই চলিতে পারে না। সুতরাং সমস্ত ভারতবর্ষ, অর্থাৎ কংগ্রেস, এই বয়কট-প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে না! তবে হ্যাঁ, বাংলাদেশ ইহা সাময়িকভাবে গ্রহণ করিতে পারে; কেননা, বঙ্গভঙ্গ যেভাবে লোকমত অগ্রাহ্য করিয়া করা হইয়াছে, তাতে বাংলার পক্ষে বয়কট সমর্থনীয় ("They—the Bengalees—had every justification for the step they took.")। বিশেষতঃ বাংলার বয়কট, ১ম বাঙ্গালীদের বঙ্গ-ভঙ্গজনিত ক্রুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করে: ২য়, ইহা বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করিবার জন্য ইংলণ্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে বয়কট সমস্ত ভারত গ্রহণ না করিলেও ভারতের সকল প্রদেশই বাঙ্গালীদের পশ্চাতে আছে ("All India is at their back.")। তার পরে কথা, শুধু ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করিয়া যদি আমরা জাপান বা জার্ম্মাণীর দ্রব্য কিনিতে থাকি, তবে ত স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে কিছুই সাহায্য হয় না। উত্তরে বলা যায়—"ছেঁদো কথা, মাথার জটা। খুলতে গেলেই বিষম লেঠা।"

অরবিন্দ এখনো বাংলায় আসিয়া পৌঁছেন নাই। আর মাত্র তিনমাস পরেই তিনি আসিবেন। তাঁহাকে আমরা বরিশাল কনফারেন্সে সশরীরে উপস্থিত থাকিতে দেখিব। তিনি বাংলায় আসিবার জন্য এবার প্রকাশ্যে প্রস্তুত হইতেছেন। গোখলের এই বক্তৃতা তিনি মনোযোগের সহিত নিশ্চয় পাঠ করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা তাঁহার মনে যে প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিয়াছিল তা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাংলাদেশে গুপ্তসমিতির ১ম পর্ব্ব (১৯০২—১৯০৪) শেষ করিয়া, ২য় পর্ব্ব (১৯০৬—১৯০৮) আরম্ভ করিবার জন্য আসিতেছেন। সুতরাং গোখলের এই সারগর্ভ বক্তৃতা যে তাঁহার নিকট নিতান্তই অসার বলিয়া মনে হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? [তিনি গোখলের গুরুদিগকে (মিঃ রাণাডে, স্যার ফি-শা মেহেতা) ১২ বৎসর আগে ইন্দুপ্রকাশে যে ঠেঙ্গানী, যে কারণের জন্য দিয়াছেন, সেই সব কারণ গোখেলের বক্তৃতায় অতিশয় পরিপুষ্ট হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।] সুতরাং গোখলে ত অরবিন্দের লেখনীর মুখে অতি তুচ্ছ। দুই তিন আঁচরেই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবেন। এই গোখলে অরবিন্দের লেখনীমুখে চারি বৎসর পরে "বিভীষণে" পরিণত হইবেন।

অরবিন্দ কাশী-কংগ্রেসে উপস্থিত নাই। সুতরাং তাঁর কথা ছাড়িয়া দিয়া যাঁহারা মশাল হাতে উপস্থিত আছেন—বাংলার 'স্বদেশী মণ্ডলীর' সেই চরমপন্থী নেতাদের কথায় আসা যাক। গোখলের বক্তৃতা শুনিয়া বাংলার চরমপন্থী নেতারা বলিলেন—তা হবে না। বাংলার বয়কট কংগ্রেসকে গ্রহণ করিতেই হইবে। না-করিলে তাঁহারা সস্ত্রীক-যুবরাজের অভিনন্দন-প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবেন। সর্ব্বনাশ! বাংলার স্বদেশী মণ্ডলীর হাতের মশাল এতটা জ্বলিয়া উঠিবে, ইহা কংগ্রেস ভাবিতে পারেন নাই। গোখলেও ভাবেন নাই। বিপর্যয় কাণ্ড!

বিষম মুশকিলের কথা। কি করা যায়? শেষে একটা রফা হইল; যুবরাজের অভিনন্দন প্রস্তাবের সময় বাংলার চরমপন্থীরা তাঁদের অসম্মতি প্রকাশ করিবার জন্য কংগ্রেস হইতে উঠিয়া বাহিরে গেলেন ('walk out as a protest ?')। আর বয়কটের প্রস্তাব বাংলার পক্ষে শেষ অস্ত্র বলিয়া ন্যায়-সঙ্গত এবং বৈধ, দুই-ই স্বীকার করা হইল ('perhaps the only consttiutional and effective means left')। বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বাংলার যে 'স্বদেশী মণ্ডলী' কংগ্রেসে এই কার্যটি করিলেন, অরবিন্দ আর মাত্র তিন মাস পরেই সেই মণ্ডলীতে আসিয়া যোগ দিবেন। অরবিন্দ আসিয়া যোগ দিলে পর চরমপন্থী রাজনীতির মধ্যে গুপ্তসমিতি এবং বিপ্লব আবার আসিয়া প্রবেশ করিবে—অরবিন্দের নেতৃত্বে গুপ্তসমিতির ২য় পর্ব প্রবাহিত হইবে।

কাশী-কংগ্রেসেই বাংলা এ-যুগে সমস্ত ভারতবর্ষকে নূতন আলোক দেখাইয়াছে। সেদিন ভারতের অন্যান্য প্রদেশ বাংলার এই নূতন আলোক প্রসন্নমনে ঠিক গ্রহণ করিতে পারে নাই। বাংলা নেতৃত্ব করিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশ পিছু হটিয়াছে। বাঙ্গালীর সাথে সেদিন মারাঠী গোখলে একসঙ্গে চলিতে পারেন নাই। জয়তু শিবাজীও বলিতে পারেন নাই। চলিয়াছে এবং বলিয়াছে মারাঠী তিলক—'মারাঠা যার পাদপীঠ আর কেশরী যার বাহন'।

সুরেন্দ্র ব্যানার্জি তাঁহার আত্ম-জীবনীতে কাশী-কংগ্রেসের কথা কিছুই লেখেন নাই। কেননা, কাশী-কংগ্রেসে বাংলার স্বদেশী মণ্ডলী বিপিনচন্দ্র পালকেই সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত কার্য্য করিয়াছে; সুতরাং সে-কথা তিনি

লিখিতে ইচ্ছুক নহেন। তবে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ ১৯০৮ খৃঃ মাদ্রাজ-কংগ্রেসে এই কাশী-কংগ্রেসের গুরুত্বের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন এই বলিয়া যে, কাশী-কংগ্রেসেই বাংলার চরমপন্থী আন্দোলনের প্রথম প্রকাশ আর এই কংগ্রেসেই কিছু আপত্তি সত্ত্বেও বাংলার বয়কট বৈধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে ["The first ominous sign of a movement which has since unmasked itself appeared in the Benares Congress in December, 1905. It was at Benares that the boycott of English goods was declared to be *legitimate* ··with some opposition—etc. (* ক)] ।

লালা লজপৎ রায় ও বাংলার স্বদেশী মণ্ডলী ঃ কাশী-কংগ্রেসে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—পাঞ্জাব কেশরী লালা লজপৎ রায়ের বাংলার স্বদেশী মণ্ডলীকে অভিনন্দন। লজপৎ বলিলেন, এই চরমপন্থী স্বদেশী মণ্ডলী বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষে ভারতবর্ষে একটা নূতন রাজনৈতিক যুগ প্রবর্তন করিয়াছে। সেদিক দিয়া লর্ড কার্জন বাংলার উপকারই করিয়াছেন। বাঙ্গালীকে লোকে ভীরু বলিত, এখন বাঙ্গালী যে-সাহস দেখাইতেছে, অন্য প্রদেশের তা অনুকরণীয়। বাঙ্গালী আবেদন-নিবেদন নীতিকে ভিক্ষাবৃত্তি মনে করিয়া ধিক্কারের সহিত উহা পরিত্যাগ করিয়াছে—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance) অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিলাতের লোকেও তাই করিয়া থাকে। বিলাতের লোক যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করিয়া থাকে, অরবিন্দের বোমার মামলায় মিঃ সি. আর. দাশ সেকথা আদালতে স্পষ্ট বলিয়াছেন।

দেখা যাইতেছে, গোখলের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পাঞ্জাব কেশরীর দৃষ্টিভঙ্গী বহুৎ পৃথক। মহারাষ্ট্রে তিলক, পাঞ্জাবে লজপৎ, বাংলায় বিপিনচন্দ্র—এই

(* ক) এই কাশী কংগ্রেসের সময় ভগিনী নিবেদিতা তিলভাণ্ডেশ্বরের এক সংকীর্ণ গলিতে এক অতি জীর্ণ পুরানো বাড়ী ভাড়া করিয়া মহা সমারোহে কংগ্রেস নেতাদের সহিত সলাপরামর্শ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে বরোদার মহারাজা, রমেশ দত্ত, গোখলে আসিতেন। নিবেদিতা, কংগ্রেস-সভাপতি গোখলের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আবার তিনি সন্ত্রাসবাদের কার্যে অরবিন্দের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ। এক হাতে গোখলে আর এক হাতে অরবিন্দকে তিনি পরিচালিত করিয়াছেন। ইহা সত্যই আশ্চর্য্য!

ত্রিমূর্ত্তি ভারতের চরমপন্থী রাজনীতিক্ষেত্রে তখন আলো ও উত্তাপ সমান ছড়াইতেছিলেন। অরবিন্দ এই ত্রিমূর্ত্তির সহযোগী সহকর্মী। কিন্তু এই ত্রিমূর্ত্তির এক মূর্ত্তিও বিপ্লবী নহেন। নেতাদের মধ্যে বিপ্লবী শুধু অরবিন্দ একা। বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ইতিহাস—এই বিশেষত্বের মধ্যেই অরবিন্দের স্থান নির্দ্দেশ করিবে। নতুবা আর পাঁচজন চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে অরবিন্দও একজন, একথা বলিলে অরবিন্দের চরিত্রের যথার্থ বিশ্লেষণ হইবে না —ঠিক কথা বলা হইবে না।

১৯০৭।৯ই মে লজপৎ রায়ের নির্ব্বাসন হয়। গভর্ণমেণ্ট জানিতেন যে, ইহার দরুন প্রতিবাদ-সভা হইবে। সুতরাং ৪ দিনের জন্য প্রতিবাদ-সভাও নিষিদ্ধ হইল। অরবিন্দ তখন বন্দেমাতরম্-এর একমাত্র কর্ণধার। গভীর রাত্রে তাঁহাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া এই সংবাদ দেওয়া মাত্রই তিনি পরের দিন বন্দেমাতরম্-এর জন্য তখনি একটুকরা কাগজে লিখিয়া দিলেন: একটা লজপতের জায়গায় একশটা লজপৎ উঠে দাঁড়াবে। "Men of the Panjub! Race of the lion! Show these men who would stamp you into the dust that for one Lajpot they have taken away, a hundred Lajpot will arise in his place."—অরবিন্দ অবশ্য খুব তেজের সঙ্গেই লিখিলেন। কিন্তু পাঞ্জাবের পক্ষে তাঁহার লেখা অনুযায়ী একশটা লজপৎ তখনি তৈরী করা সম্ভব ছিল না,—হয় না। যেমন বাংলাদেশেও একশটা অরবিন্দ ফরমাশ দিলেই হয় না। একটাই হয়।

কাশী-কংগ্রেস হইতে বরিশাল-কনফারেন্স (১৯০৬।১৪ই এপ্রিল): অরবিন্দ বরিশাল-কনফারেন্সে আসিবেন, শুনিয়াছি। কিন্তু কাশী হইতে বরিশাল পৌছিতে পথে বাঙ্গালী আরো ইতিহাস রচনা করিবে। বাংলায় যেন ঈশানের হাতে প্রলয়ের বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে। বাংলার শিব যেন তাণ্ডবে মাতিয়াছেন—তাথৈ তাথৈ, তা তা থৈ থৈ—নৃত্য চলিয়াছে।

প্রসিদ্ধ এটর্ণী ভূপেন বসু—সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর দক্ষিণ-হস্ত, মডারেট ব্যক্তি। তিনি কাশী-কংগ্রেস হইতে ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯০৫ কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়াই ধূলিপায়ে যুবরাজ অভ্যর্থনার জন্য গঙ্গাতীরে ছুটিয়া গেলেন। অভ্যর্থনা যথারীতি সম্পাদন করিয়াই আবার ষ্টীমারঘাট হইতে ছুটিয়া গোলদীঘিতে

ছাত্রদের সভায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। যুবরাজের অভ্যর্থনায় যাওয়ার খবরটা দুষ্ট লোকেরা আগেই সভাতে রটাইয়া দিয়াছিল। সুতরাং ভূপেনবাবুকে দেখিয়াই ছাত্রেরা উত্তেজিত অবস্থায় তাঁহাকে মুখের উপর চড়া গলায় ধিকার দিয়া উঠিল। যুবরাজের অভ্যর্থনা-বয়কট বাংলার "স্বদেশী মণ্ডলী" ১৯০৫ সনের ডিসেম্বরেই করিয়াছিল। গান্ধীযুগে ইহার অনুকরণ দেখা গিয়াছে। স্বদেশী যুগে বাঙ্গালী যা যা করিয়াছে, গান্ধীযুগে তার প্রত্যেকটির অনুকরণ করা হইয়াছে। বিপিনচন্দ্র পাল বরিশাল কনফারেন্সে (১৯২১) সভাপতির ভাষণে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

১৯০৬।১লা জানুয়ারী যুবরাজ-পত্নীর অভ্যর্থনার জন্য ছোটলাটের বাড়ীতে একটা "পর্দ্দা-পার্টি" হইল। মহিলারা গেলেন। তাঁহারা চরমপন্থী নহেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা'র তখন ভর-সন্ধ্যা। সন্ধ্যা তীব্র তীক্ষ্ণ কশাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল। বিদ্রূপ—করিতে জানিলে, এমনি অস্ত্রই বটে। উপাধ্যায়ের সন্ধ্যা বিদ্রূপ করিতে জানিত। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর খবরের কাগজে এরকম তীক্ষ্ণকশাঘাত-পূর্ণ বিদ্রূপ বাংলাদেশ দেখে নাই।

১৯০৬।৬ই ও ১৩ই জানুয়ারী, দুই দিন বিডন উদ্যানে সভা হইল। বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতা করিলেন। সেদিন বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা আজো সে বক্তৃতা এবং সে বিপিনচন্দ্রকে ভুলেন নাই। ভুলা সম্ভব নয়। বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বিপিনচন্দ্রের দান এপর্য্যন্ত কেহই পরখ করিয়া, ওজন করিয়া, দেখেন নাই। আমরাও বিপিনচন্দ্রকে এতাবৎ তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দেই নাই। স্বদেশী মণ্ডলীর নেতা তখন বিপিনচন্দ্র। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর মডারেট দল হইতে স্বদেশী মণ্ডলী পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে।

১৯০৬।১৪ই জানুয়ারী আবার বিডন উদ্যানে সভা হইল। ১৪ই জানুয়ারী মিলন মন্দিরের মাটে সভা হইল—মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন সভাপতি হইলেন। মৌলভী সাহেবের মত এরূপ একনিষ্ঠ, নির্ভীক, ত্যাগী, স্বদেশী নেতা হিন্দুদের মধ্যেও বিরল। বৈষ্ণবধর্ম্মের যেমন যবন হরিদাস, স্বদেশী আন্দোলনে তেমনি মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন। মতিলাল রায় ব্রহ্মবান্ধবকে বলিয়াছেন, "স্বদেশীর বাউল।"—(শতবর্ষের বাংলা)।

১৯০৬।২৯শে জানুয়ারী টাউনহলে একটা সভা করিবার প্রস্তাব হইল। কেননা, মর্লি সাহেব তখন ভারত-সচিব। তিনি উদারনৈতিক, মিলের শিষ্য বার্ক ও গ্লাডষ্টোনের জীবনচরিতকার। অতএব আবেদন-নিবেদন শুনিবেন। আসল কথা স্বদেশী মণ্ডলী আত্মশক্তির উপর এত জোর দিয়া দিনের পর দিন সভা, আর 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি কাগজে এত উন্মাদনাপূর্ণ চাবুকের মত লেখা বাহির করিতেছেন যে—মডারেটগণ আর আবেদন-নিবেদন করার ফুরসৎ-ই পাইতেছেন না। অভ্যাস বড় দোষ। সভা করার পক্ষে হইল মডারেট দল, আর বিপক্ষে হইল চরমপন্থী দল। তবে শুনা যায় বিপিনচন্দ্র এই ব্যাপার উপলক্ষে পুরাপুরি বিপক্ষে ছিলেন না। তাঁর মধ্যে কিছুটা রাজনীতি-জ্ঞান ছিল। সভা হইল। সভায় খুব লোক হইল, এক টাউনহলে ধরিল না, তিনটে সভা হইল। বিপক্ষের দল রাস্তায় প্ল্যাকার্ড মারিল, তাতে লিখিয়া দিল—"স্বদেশী প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া আজ আবার ফিরিঙ্গীর দরবারে ভিক্ষার জন্য টাউনহলে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে"।

১৯০৬—ফেব্রুয়ারী : এইরূপ মাতামাতির মধ্য দিয়া কাটিল। বাংলার নরম আর চরমপন্থী দলে জাতীয় শিক্ষা ব্যাপারে মনকষাকষি আগে হইতেই চলিতেছিল। কেননা, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রিপন কলেজ ছাড়িতে পারেন না। এদিকে—

১৯০৬।১১ই মার্চ বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন-গৃহে এক সভা হইয়া—এখন যেখানে বসুমতী অফিস—১৬৬নং বৌবাজার ষ্ট্রীট জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইল। রবীন্দ্রনাথ দেওঘর হইতে ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীকে নিয়া আসিলেন। তিনি পাঁচ লক্ষ টাকা দিলেন। মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য নগদ আড়াই লক্ষ ও একখানা জমিদারী দিলেন। মিঃ টি. পালিত পার্শিবাগানের মাঠ বিজ্ঞান-কলেজের জন্য দিলেন। এমন কি গুরুদাস ব্যানার্জি পর্যন্ত আসিয়া যোগ দিলেন। স্বদেশী বাংলা, বিদেশী গভর্ণমেণ্টের নিকট আর ভিক্ষা করিয়া বিদ্যা উপার্জন করিবে না। সুরেন্দ্র ব্যানার্জী প্রমাদ গনিলেন। ইহার পরের মাসে অরবিন্দ বরোদার ৭৫০৲ মাসিক বেতনের চাকরি ছাড়িয়া দিয়া মাত্র ৫০৲ মাসিক বেতনে এই সদ্য-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইবেন।

পাঁচ

কলিকাতায় চারি বৎসর

"*We preach the gospel of unqualified Swaraj.*"

শ্রীঅরবিন্দের কলিকাতা আগমন (১৯০৬।এপ্রিল—১৯০৬।১৪ই আগষ্ট) :

অরবিন্দের জীবনের গতিমুখ ★ বরিশাল কন্‌ফারেন্স ★ মিঃ এ. রসুল ও অরবিন্দ ★ কলিকাতায় বরিশাল কনফারেন্সের প্রতিক্রিয়া ★ অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্ত-সমিতির ২য় পর্ব্ব (১৯০৬।এপ্রিল—১৯০৮।এপ্রিল) ★ 'যুগান্তর' ★ প্রথম বৈপ্লবিক হত্যা ও ডাকাতির বৃথা চেষ্টা ★ বিপ্লবী অরবিন্দের স্বরূপ ★ লোকমান্য তিলকের কলিকাতায় আগমন (১৯০৬।৪ঠা জুন) ও শিবাজী-উৎসব (১৯০৬।৪ঠা-১২ই জুন) ★ ১৯০৬।জুলাই ★ গিরিশ ঘোষের 'সিরাজ-উদ্-দৌল্লা' (১৯০৫, ৭ই সেপ্টেম্বর) ও 'মিরকাশিম' (১৯০৬।১০ই জুন) ★ ১৯০৬।৭ই আগষ্ট—'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা

অরবিন্দের জীবনের গতিমুখ : অরবিন্দ ১৪ বৎসর বিলাতে কাটাইয়া বরোদাতে প্রথম আসিয়াই বলিলেন—কংগ্রেসী প্রথায় দেশকে স্বাধীন করা যাইবে না। ফরাসী বিদ্রোহের মত একটা সশস্ত্র বিদ্রোহ করিতে হইবে। জাতিকে "অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্র" হইতে হইবে। তবেই ভারতবর্ষ ইংরেজকে তাড়াইয়া স্বাধীন হইতে পারিবে।

এইভাবে বরোদায় ১৪ বৎসর কাটিয়া গেল। সশস্ত্র বিদ্রোহ কিছুই হইল না। আবার বরোদায় ১৪ বৎসর কাটাইয়া যখন তিনি কলিকাতায় আসিলেন, তখন তাঁহার হস্তে দেখিতে পাই—"ভবানী মন্দির" চটিগ্রন্থ। এই "ভবানী মন্দির" গুপ্ত সমিতির বেদ। এই বেদের রচয়িতা বিপ্লবী অরবিন্দ।

কি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এবং কি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে, আমরা একই অরবিন্দকে পাই। এই দীর্ঘ বৎসরগুলির মধ্যে তাঁহার জীবনের চারিদিকে যেসকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাঁহার মানসিক বিকাশের ইতিহাসে যখন যে-পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, তাহা সমস্তই তাঁহার জীবন-ইতিহাস সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জীবন-ইতিহাসের মধ্যে গতিমুখে একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র আমরা দেখিতে পাই; এবং বুঝিতে পারি যে স্বরূপত অরবিন্দ একজন বিপ্লববাদী দেশপ্রেমিক। এবং সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাই যে, ইংরেজি সাহিত্যে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। রাজনীতিতে বিপ্লবী, এবং সাহিত্যে কবি—এই দুইটি তাঁহার জীবনের প্রধান পরিচয়।

বরিশাল কনফারেন্স (১৯০৬।১৪ই এপ্রিল): অরবিন্দ যে বরিশাল কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন, তার প্রমাণ কি? তিনি নিজেই সে কথা বক্তৃতায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, এই প্রমাণ। ১৯০৯ খৃঃ বরিশাল জেলার ঝালকাটিতে যে কনফারেন্স হয়, সেই সভায় অরবিন্দ দীর্ঘ এক বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, ১৯০৬ খৃঃ বরিশাল কনফারেন্সে তিনি প্রথম এই জেলাতে আগমন করিয়াছিলেন—"It is now the *fourth* year I came to Barisal first on the occasion of the Provincial Conference. ···When I come to Barisal, I come to the chosen temple of the Mother—I come to the Sacred *Pithasthan* of the national spirit—I come to the birth-place and field of work of Aswini Kumar Dutt."—*Speech at Jhalakati in 1909 by Aravindo Ghose.* ১৯০৯।১৪ই এপ্রিলের পরে ঝালকাটিতে কনফারেন্স হয়। সুতরাং অরবিন্দের "fourth year" বলা ঠিকই হইয়াছে। বরিশাল কনফারেন্সে উপস্থিত থাকিয়া অরবিন্দ কি দেখিলেন? গুপ্ত-সমিতির ১ম পর্ব্বে (১৯০২-১৯০৪) ব্যর্থ হইয়া প্রকাশ্য রাজনীতিতে এই তাঁর প্রথম প্রবেশ, প্রথম পদক্ষেপ। বাংলাদেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, পাশ্চাত্য দেশের বিপ্লববাদদ্বারা অতিমাত্রায় আক্রান্ত, এই কবি ও স্বদেশপ্রেমিক অথচ অতিশয় শান্ত ও নীরব মানুষটি বরিশালে উপস্থিত হইয়া যা দেখিলেন—তাই সংক্ষেপে বলিতেছি।

নেতারা কলিকাতা হইতে ষ্টিমারে করিয়া বরিশাল আসিয়াছেন। সেই

সঙ্গে অরবিন্দও আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই মাটিতে নামিতেছেন না, ষ্টিমারেই আছেন। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি ঢাকা হইতে ষ্টিমারে আসিয়াছেন। বরিশালের নেতারা সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জির নিকট ষ্টীমারে গিয়া বলিলেন, গোল বাঁধিয়াছে। কলিকাতার নেতারা কেহই নামিতে চাহেন না। ব্যাপার কি? ব্যাপার গুরুতর। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে, নেতাদিগকে অভ্যর্থনার সময় মিছিল করিয়া তাঁহারা অভ্যর্থনা করিতে পারিবেন না। এবং তার চেয়েও গুরুতর বন্দেমাতরম্ শব্দ মুখে উচ্চারণ করিতে পারিবেন না। এদিকে কলিকাতার নেতারা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি কানে না শুনিলে মাটিতে পা দিবেন না। অতিশয় মুশকিলের কথা। সুরেন্দ্র ব্যানার্জী বলিলেন—এক কাজ করা যাক, অভ্যর্থনার সময় বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিয়া কাজ নাই, পরে করিলেই হইবে। এই আপোষে কলিকাতার নেতারা মাটিতে নামিলেন, অরবিন্দও নামিলেন। নেতাদের মধ্যে নরমপন্থী দলের সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী, ভূপেন বসু, মতিলাল ঘোষ, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু প্রভৃতি আর চরমপন্থী দলের বিপিনচন্দ্র পাল, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। অরবিন্দ চরমপন্থী দলভুক্ত। এ. রসুল সভাপতি হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী বিলাতী মেম, সঙ্গে আছেন। সভাপতির গাড়ী আগে চলিল, পরে আর সকলের গাড়ী চলিল। হঠাৎ শুনা গেল, পেছনের ডেলিগেটদের উপর পুলিশের লাঠি দমাদম চলিয়াছে। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি ফিরিলেন। সুপারিন্টেডেণ্ট মিঃ কেম্পকে জিজ্ঞাসা করিলেন—. ডেলিগেটদের মারিতেছ কেন? উত্তরে মিঃ কেম্প বলিলেন—মহাশয়, আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করিলাম। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জিকে গ্রেপ্তার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এমার্সনের নিকট আনা হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট কিছু অশিষ্ট ব্যবহার করার পর সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীকে চারি শত টাকা জরিমানা করিলেন। টাকা তখনি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইল। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি সভামণ্ডপে আবার ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতাকে পুলিশ লাঠির আঘাতে রক্তাক্ত করিয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দিল। চিত্তরঞ্জন পুলিশের লাঠির আঘাত খায়, আর চীৎকার করে—বন্দেমাতরম্। ১৬শ শতাব্দীর শ্রীচৈতন্যের আন্দোলনে যবন হরিদাসের কথা মনে পড়ে। 'খণ্ড খণ্ড হয় দেহ, যদি যায় প্রাণ।

তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরি নাম।” সুরেন্দ্র ব্যানার্জি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—"The assault was continued, notwithstanding the helpless condition of the boy (চিত্তরঞ্জন), who offered no resistance of any kind, but shouted *Bande-mataram* with every stroke of the *lathi*. It was a supreme effort of resignation and submission to brutal force without resistance and without questioning."—*A Nation In Making, p. 225.*

সভামণ্ডপে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা পুত্রকে লইয়া মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা দাঁড়াইয়া সমস্ত ঘটনাগুলি বলিতে লাগিলেন। আর সভাস্থ সভ্যগণ উত্তেজনায় জ্বলিয়া উঠিল। অরবিন্দ এ দৃশ্য চক্ষে দেখিলেন। এই তাঁহার প্রথম প্রত্যক্ষ দর্শন। এই দর্শন, কারাগারে 'বাসুদেব' দর্শন অপেক্ষা সেদিন তাঁহার মনে অধিকতর প্রতিক্রিয়া আনিয়াছিল। একে তিনি বিপ্লবী, বিপ্লবের ১ম পর্ব্বে ব্যর্থ হইয়া এই সবে তিনি প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগ দিয়াছেন, আর চক্ষের উপর এ কী কাণ্ড! তাঁহার বিপ্লবী মন যে আরো অধিকতর বিপ্লবী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তিনি ফুলারী শাসনকেই এজন্য মনে মনে প্রত্যক্ষ দায়ী করিলেন।

বালক চিত্তরঞ্জন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (passive resistance) যে জীবন্ত দৃষ্টান্ত দিলেন, যে অহিংস মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেন—গান্ধীযুগে তাহার অনুরূপ চেষ্টা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু এই দৃশ্য দেখিয়া অরবিন্দের মন সেদিন অহিংস ভাব অবলম্বন করে নাই। অরবিন্দ বিপ্লবী। তাঁহার মন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (passive resistance) অনুকূল নহে—যদিও চরমপন্থীদের সহিত সুর মিলাইয়া পরের দুই বৎসর (১৯০৬।এপ্রিল—১৯০৮।এপ্রিল) প্রকাশ্য রাজনীতিতে, বক্তৃতায় এবং বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance) তিনি প্রচার করিয়াছেন প্রচুর।

কন্‌ফারেন্সের সভামণ্ডপে সেদিন আর কোনই কাজ হইল না। আর কোন কাজের বেশী প্রয়োজনও ছিল না। কাজ যা হইবার তা হইয়া গেল। পরের দিন আবার সভা বসিল। হঠাৎ মিঃ কেম্প আসিয়া সভায় দর্শন দিলেন। তিনি গট্‌গট্ করিয়া সভাপতি মিঃ এ. রসুলের কাছে গিয়া বলিলেন যে—সভাভঙ্গের পর রাস্তায় তাঁহারা বন্দেমাতরম্ চীৎকার করিবেন না, এই

কড়ার দিতে হইবে। মিঃ এ. রসুল অস্বীকার করিলেন। মিঃ কেম্প সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইতিহাস-বিখ্যাত বরিশাল কনফারেন্সের উপর এইখানেই যবনিকা পতন হইল।

কিন্তু যবনিকা পতনের পরেও দুইটি দৃশ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ১ম—কৃষ্ণকুমার মিত্র একা বসিয়া রহিলেন। তিনি এন্টি-ছার্কুলারের স্বয়ং সভাপতি—উঠিবেন না। তিনি আদেশ অমান্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী অনেক বুঝাইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া টানিয়া বাহিরে আনিলেন। কৃষ্ণকুমারবাবু ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার বাঙ্গাল, তাতে ব্রাহ্ম। তিনি অরবিন্দের ন'মেসো হন। ২য়—রাস্তায় আসিয়া দেখা গেল ডেলিগেট ও স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রাণপণে বন্দেমাতরম্ হাঁকিয়া চলিয়াছেন। 'মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী'—মুশকিলের কথা!

বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করা নিষিদ্ধ। ইহাই পূর্ব্ববঙ্গে ফুলারী শাসনের ছার্কুলার, রাজাদেশ। বাঙ্গালী সেদিন রক্তদান করিয়া এই রাজাদেশ অমান্য করিয়া চলিয়া গেল। এই ত ঘটনা! এই ত ইতিহাস! অরবিন্দ দুই চক্ষু ভরিয়া এই ঘটনা দেখিলেন—এই প্রত্যক্ষ ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করিলেন। ১৮৯৩ খৃঃ ইন্দুপ্রকাশে যে ফরাসী দেশের বিপ্লবের কথা, যে আয়রল্যাণ্ডের বিদ্রোহের কথা লিখিয়াছিলেন—তাহা একে একে তাঁর সদ্য উত্তেজিত মনের উপর দিয়া বায়স্কোপের ছবির মত ছায়াপাত করিয়া গেল। আর তাঁর বিপ্লবী মন যে শুদ্ধ হইয়া কি সংকল্প করিল—তা দু'সপ্তাহ পরেই প্রকাশ পাইবে।

কলিকাতার নেতারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-শাখার সভাপতি হইয়া গিয়াছিলেন। বক্তৃতা পকেটে করিয়াই ফিরাইয়া আনিতে হইল—পাঠ করা আর হইয়া উঠিল না। লাঞ্ছনার একশেষ হইল। মনে কেবল এক শান্তি এই যে, বিষম উত্তেজনার মধ্যেও সকলেই বৈষ্ণবের মত পরম অহিংস ভাব অবলম্বন করিয়া ছিল—এই যা। কেবল একটি অতি নিরীহ নীরব মানুষ সেদিন অহিংস ভাব অবলম্বন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তিনি অরবিন্দ। অপর সকল নেতা হইতে একমাত্র তিনি স্বতন্ত্র, পৃথক্। পরবর্ত্তী মাসের ইতিহাস ইহার প্রমাণ দিবে।

এই শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসে বরিশাল-কনফারেন্সের গুরুত্ব খুব

বেশী। কেননা, এইখানেই গভর্ণমেণ্টের অতর্কিত দমননীতির বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রথম সংঘর্ষ ও পরীক্ষা হয়। সে পরীক্ষায় বালক চিত্তরঞ্জনের রক্তপাত ও তৎসঙ্গে তাঁহার মুহুর্মুহুঃ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি যে ইতিহাস সেদিন রচনা করিয়াছে, তাহা ত বাঙ্গালী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারীদের পরাজয়ের ইতিহাস নয়। ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশ ত সেদিন এমন আর একটি ঘটনা দেখাইতে পারে নাই! নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রয়োগে বাংলা ১৯০৬, ১৪ই এপ্রিল সমগ্র ভারতবর্ষের গুরু। সেদিন অরবিন্দ সবে প্রথম আসিয়াছেন, সুতরাং তিনি ইহার পরিচালক বা প্রবর্ত্তক হইতে পারেন না। বাংলার চরমপন্থী "স্বদেশী মণ্ডলী"ই ইহার উদ্ভাবক ও প্রবর্ত্তক। সাড়ে তিন মাস আগে কাশী কংগ্রেসে লালা লাজপৎ রায় বিলাতের দৃষ্টান্ত দিয়া বাংলায় সদ্য-প্রচারিত এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা উত্থাপন করিয়া বাঙ্গালীর সাহসকে প্রশংসা করেন। সে প্রশংসা বরিশাল-কনফারেন্সে অপপ্রয়োগ হয় নাই।

১৯০২ খৃঃ-এ নাকি বিলাতের কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইবেল পড়ার বিরুদ্ধে ছাত্রেরা প্রথম নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance) অবলম্বন করেন। পরে রাজনীতিক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ট্যাক্স ইত্যাদি দেওয়া বন্ধ করাও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং ইহাও এক প্রকার আবেদন। ইহা গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদকল্পে গুপ্ত বা প্রকাশ্য বিদ্রোহ নয়। জিনিসটা যা-ই হউক—খাঁটি বিলাতী, সন্দেহ নাই। কেহ বলেন মহাত্মা টলষ্টয় ইহার প্রথম উদ্ভাবক। তা যাই হউক, ১৯০৬ খৃঃ বাংলার চরমপন্থীরা এই বিলাতী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বরিশালে হাতেকলমে বুকের রক্তদান করিয়া দেখাইয়া দিলেন। সুরাট-কংগ্রেসের (১৯০৭) দক্ষযজ্ঞ, নরম ও চরম পন্থীদের ঘরোয়া ঝগড়া। বরিশালে একেবারে যাকে বলে গভর্ণমেণ্টের সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। সুতরাং সুরাট কংগ্রেস অপেক্ষা বরিশাল-কনফারেন্সের গুরুত্ব অনেক বেশী।

বিশেষতঃ বরিশাল কনফারেন্সের অভাবনীয় দমননীতি হইতেই বিপ্লববাদের ২য় পর্ব্ব (১৯০৬—১৯০৮) আরম্ভ হয়। সেদিক দিয়া বরিশালে গভর্ণমেণ্টের দমননীতির গুরুত্ব, শুধু গুরুত্ব নয়—দায়িত্ব খুব বেশী। দমননীতিই বিপ্লববাদকে জন্ম দিয়াছে—এই মতের যাঁহারা পরিপোষক, তাঁহারা বরিশালের দৃষ্টান্তই উল্লেখ করিয়া থাকেন।

"শ্রীউল্লাসকর দত্ত বলেন যে, ১৯০৬ সালে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতিতে ইংরাজ রাজকর্মচারী ও পুলিশের অকথ্য অত্যাচার তাঁহার মনকে ক্ষুব্ধ করিয়া দেয়। সেই হইতে তিনি বিপ্লবী হইবার সাধনা আরম্ভ করেন।"—[ভাঃ জাঃ আ:—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখার্জ্জী, পৃ ১৩৫-১৩৬]

"বিপ্লবী হইবার সাধনা?"

"১৯০৬ এপ্রিল 'পুণ্যে বিশাল' বরিশালের ঠিক পরেই কিন্তু বিপ্লববাদের মন্ত্রগুলো লোকের কাণে সহজে ঢুকত। এমন কি অনেক হোমরা চোমরা মডারেটও বিপ্লবের খেয়ালে সই দিতেন।—[বাং-বি-প্র—হেমচন্দ্র কাননগো, পৃ: ১১৭]

মডারেট বিপ্লবী হয়, সহজ কথা নয়।' বরিশালের দমননীতি এই কঠিন কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়াছিল। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী লিখিয়াছেন যে, বরিশাল-কনফারেন্সের পরেই "The anarchical movement followed immediately."—*Ibid, p. 233*

বাংলায় রাজনীতিক্ষেত্রে ত্রিধারা: বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ব্ববঙ্গে ছোট লাট ফুলার সাহেব সাড়ে নয় মাস (১৯০৫।১৬ই অক্টোবর হইতে ১৯০৬।৪ঠা আগষ্ট) রাজত্ব করেন। ১৯০৫।৫ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জে ছাত্রেরা কিঞ্চিৎ গোলযোগ করায় তিনি সেখানকার দুইটি স্কুলকে বরবাদ্ করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখিয়া পাঠান। ছাত্রদের শাস্তি দেন—পিটুনী পুলিশ মোতায়েন করেন। ছোট ছোট সহরে ও গ্রামদেশে পিটুনী পুলিশ ও গুর্খাসৈন্য মোতায়েন করেন। বরিশাল-কনফারেন্সের কথা ত বলাই হইয়াছে। সভাসমিতি করা, মিছিল বাহির করা, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করা—একদম নিষেধ। ১৯০৬।২৫শে মে, তিনি সরকারী চাকরীতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক মুসলমান ভর্ত্তি করিবেন, ঘোষণা করিলেন। হিন্দুরা যোগ্য হইলেও ঐ চাকরি পাইবে না। মুসলমানদিগকে প্রিয়তমা পত্নী (সুয়োরাণী) বলিয়া প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার কথামত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিরাজগঞ্জের স্কুল বরবাদ্ করিলেন না দেখিয়া, লর্ড কার্জ্জনের মত তিনিও ১৯০৬।৪ঠা আগষ্ট রাগ করিয়া লাটপদে ইস্তফা দিয়া এদেশ হইতে বিলাত চলিয়া গেলেন। কি করিবেন? স্বয়ং লাটের কথা অমান্য—ইহা কোন লাট সহ্য করিতে পারে!

ফুলারী শাসন নির্জ্জলা দমন-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কাশী-কংগ্রেসে মিঃ গোখলে ফুলারী শাসনকে অজস্র নিন্দা করিয়াছেন—"There is no surer method of goading a docile people into a state of dangerous despair than the kind of hectoring and repression he (Sir B. Fuller) has been attempting."—*G. K. Gokhale.*

ফুলারী দমননীতির অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বাংলাদেশে রাজনীতিক্ষেত্রে তিনটি ধারার উদ্ভব হইল। আগে অনেকগুলি বিচিত্র ধারার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সেগুলি একে অন্যের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া স্পষ্ট তিনটি ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলিল। ইতিহাসে প্রায়ই এরকম দেখা যায়। বহু ধারা মিশিয়া একটি ধারা হয়, আবার একটি ধারা হইতে অনেকগুলি ধারা বাহির হয়। সঙ্কোচ ও সম্প্রসারণ ইতিহাস-পথে একের পর আর দেখা যায়।

১ম, নরমপন্থী ধারা। নেতা—সুরেন্দ্র ব্যানার্জি। উদ্দেশ্য—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ। উপায়—সভাসমিতি, বক্তৃতা, আবেদন-নিবেদন।

২য়, চরমপন্থী ধারা। নেতা—বিপিনচন্দ্র পাল। উদ্দেশ্য—স্বাধীনতা লাভ। উপায়—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance).

৩য়, বিপ্লববাদের ধারা। নেতা—অরবিন্দ ঘোষ ও ভগিনি নিবেদিতা। উদ্দেশ্য—ইংরেজ-বর্জিত নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ('autonomy free from British control')। উপায়—বোমা-রিভলভারসংযুক্ত বৈপ্লবিক গুপ্তহত্যা, বৈপ্লবিক ডাকাতি।

আমরা বলিয়াছি, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ-আন্দোলনের প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত বিপ্লবের শিখাই সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক। আমরা মিথ্যা বলি নাই।

মিঃ এ. রসুল ও অরবিন্দ ঃ বরিশাল-কনফারেন্সের সভাপতি ব্যারিষ্টার মিঃ এ. রসুল অরবিন্দের পরিচিত ব্যক্তি। বিলাতে থাকাকালীন ছাত্রাবস্থায় ইঁহাদের উভয়ের পরিচয় ঘটে। বরিশাল-কনফারেন্সে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা অনেকেই ইহা জানিতেন না। কেননা, অরবিন্দ নিজের সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতেন না। মিঃ এ. রসুল শুধুই যে অরবিন্দেরই পরিচিত ছিলেন, তাহা নয়। তিনি অরবিন্দের মধ্যম ভ্রাতা অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ ও দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জনের সাহিত বিলাতে ছাত্রাবস্থায় বন্ধুত্বসূত্রে পরিচিত ছিলেন। এবং ইঁহাদের মধ্যে এই বন্ধুত্ব মিঃ এ. রসুলের মৃত্যুদিন (১৯১৭।১লা আগষ্ট) পর্য্যন্ত বজায় ছিল। অরবিন্দ যে-বৎসর জন্মগ্রহণ করেন, মিঃ এ. রসুলও সেই বৎসরই জন্মগ্রহণ করেন—মিঃ এ. রসুল ১৮৭২ খৃঃ এপ্রিল মাসে আর অরবিন্দ আগষ্ট মাসে জন্মগ্রহণ করেন। এ. রসুল অরবিন্দ অপেক্ষা বয়সে চার কিংবা পাঁচ মাসের বড়। এ. রসুলের পিতা ত্রিপুরা জেলার জমিদার ছিলেন। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া মাতার সহিত এ. রসুল ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জে চলিয়া আসেন। এবং সেইখানেই গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। তাঁহার বয়স যখন ১৭ বৎসর মাত্র সেই সময় তিনি বিদ্যা-শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। লিভারপুল, লণ্ডনে কিংস্ কলেজ ও অক্সফোর্ডে তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন। এবং পরে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া মায়ের অনুমতি লইয়া একটী ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।—সম্ভবতঃ এ সমস্তই অরবিন্দ জানিতেন। অরবিন্দ চিরদিন নীরব মানুষ। বরিশালে মিঃ এ. রসুলের সহিত বহু বৎসর পরে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং নিশ্চয়ই কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। কিন্তু কী কথা হইয়াছিল, তাহা আমরা জানি না।

এ. রসুল মুসলমান ছিলেন, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া তিনি জাতীয়তার সৌধ নির্ম্মাণ করেন নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান দুইটী পৃথক জাতি হইবে এবং এই দুইটী পৃথক জাতির জন্য ভারতবর্ষে পৃথক পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে (পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান)—ইহা তিনি আদৌ কল্পনা করিতে পারেন নাই। হিন্দু ও মুসলমান এযুগে এক-জাতীয়তার বেদীতে আসিয়া মিলিত হইবে এবং এক জাতিতে (Nation) পরিণত হইবে—ইহাই তাঁহার আদর্শ ছিল। তিনি বলিয়াছেন—

"হিন্দুদের সহিত আমরা বিচ্ছিন্ন হইতে পারি না। সুখেদুঃখে আমরা অটুট বন্ধনে দৃঢ় আবদ্ধ। এক মায়ের সন্তান আমরা। রাষ্ট্রীয় স্বার্থ আমাদের অভিন্ন।"

বাংলার মুসলমান সমাজে এই শতাব্দীতে ধর্ম্মনিরপেক্ষ এক-জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে মিঃ এ. রসুল একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু এই

সময় অরবিন্দ যে জাতীয়তাবাদের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ধর্ম্মনিরপেক্ষ নয়। বঙ্কিম-অনুপ্রাণিত অরবিন্দ কি প্রকাশ্য চরমপন্থী রাজনীতিতে এবং কি বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির প্রবর্ত্তনে—হিন্দুধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়াই অগ্রসর হইতেছিলেন। অরবিন্দের জাতীয়তাবাদ ধর্ম্মনিরপেক্ষ বলা যায় না। সুতরাং জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে এ. রসুলের সহিত অরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক। এবং মিঃ এ. রসুল অরবিন্দের মত বিপ্লববাদীও ছিলেন না।

কলিকাতায় বরিশাল কন্‌ফারেন্সের প্রতিক্রিয়াঃ ১৪ই এপ্রিল বরিশালে পুলিশের লাঠির গুঁতায় কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গিয়া গেল। সভাপতি বা নেতাদের মধ্যে যিনি যে বক্তৃতা করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন, তাহা আর করা হইল না। বিফলমনোরথ হইয়া সকলেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। ১৫ই এপ্রিল উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়া বরিশালে পুলিশ-অত্যাচারের সমস্ত খবর প্রকাশ করিয়া দিলেন। ঐদিন গোলদিঘীতে বরিশালের পুলিশ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভা হইল। ১৬ই এপ্রিল বিডন উদ্যানে বিরাট প্রতিবাদ-সভা হইল। ১৮ই এপ্রিল বরিশাল-প্রত্যাগত নেতাদের সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য গোলদিঘীতে আবার সভা হইল। পুলিশের লাঞ্ছনাই নেতাদের সম্মানার্হ করিল। ২০শে এপ্রিল কল্পিত মিলন-মন্দিরের মাঠে ছাত্রেরা এক সভা করিল। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। ছাত্রেরা উত্তেজিত হইল। ২৮শে এপ্রিল বাগবাজারে পশুপতি বসুর প্রাসাদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ মাঠে আবার এক বিরাট প্রতিবাদ-সভা হইল। এইরূপে বাংলার তখনকার নরমপন্থী ও চরমপন্থীরা একত্রে মিলিয়া প্রতিবাদ-আন্দোলনের প্রজ্জ্বলিত শিখাকে আরও উস্কাইয়া দিলেন। আন্দোলন জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু ইহারই মধ্যে আবার নরমপন্থী দলের মুখপত্র 'হিতবাদী' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ চরমপন্থী দলের উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও বিপিনচন্দ্রের ব্যঙ্গচিত্র 'হিতবাদী'তে প্রকাশ করিলেন। ঐ ব্যঙ্গচিত্রে এই দুইজন চরমপন্থী নেতা বরিশালে কনেষ্টবলের ভয়ে দৌড়াইয়া পালাইতেছেন—চিত্রে এইরূপ অঙ্কিত করা হইল।

কাব্যবিশারদ ছড়া লিখিলেন—

"আত্মশক্তির পরিণাম।

আপনি বাঁচলে বাপের নাম—
চম্পটে চটপটে হয়
পগার পারে চল্লে
ঐগো ডি ডি, ধল্লে !”

অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্ত-সমিতির ২য় পর্ব্ব (১৯০৬।এপ্রিল—১৯০৮, **এপ্রিল**)ঃ ১৯০৬।মে মাস আসিল। অরবিন্দ “ভবানী-মন্দির” নামক ইংরেজী চটি-গ্রন্থের খসড়া লিখিয়া বারীন্দ্রকুমারকে বরিশাল কন্‌ফারেন্সের পূর্ব্বেই বাংলাদেশে পাঠাইয়াছিলেন। “ভবানী মন্দির”-এর কল্পনা লইয়াই অরবিন্দ গুপ্ত-সমিতির দ্বিতীয় পর্ব্ব বরিশাল কন্‌ফারেন্সের পূর্ব্বেই আরম্ভ করেন। বরিশাল কন্‌-ফারেন্সের উত্তেজনা এই গুপ্ত-সমিতির কার্য্যকে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দেয়। একথা সত্য নয় যে, বরিশাল কনফারেন্সে পুলিশের অত্যাচার হইতেই অরবিন্দ গুপ্ত-সমিতির দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন। বরিশালের দমননীতি অরবিন্দের গুপ্তসমিতির দ্বিতীয় পর্ব্বকে জন্ম দেয় নাই। ইহা জন্মিবার পর আঁতুর ঘর হইতে এই শিশুকে বরিশালের দমননীতি বাহিরে টানিয়া আনিয়া নৃশংস হত্যা-কার্য্যের জন্য প্রেরণা দিয়াছে মাত্র। কেননা, বরোদা হইতে কলিকাতা আসিবার পথে, বরিশাল কন্‌ফারেন্সের পূর্ব্বেই বোম্বাই সহরে তাজমহল হোটেলে ২য় পর্ব্বের গুপ্ত-সমিতি প্রবর্ত্তন করিবার জন্য অরবিন্দ একটি গোপন সভা করিয়াছিলেন। খাপার্দে ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।—বারীন্দ্রকুমার ইহা আমাদিগকে স্পষ্ট বলিয়াছেন। এবং অরবিন্দ-লিখিত “ভবানী মন্দির”-এর খসড়া লইয়াও যে বারীন্দ্রকুমার বরিশাল কন্‌ফারেন্সের পূর্ব্বেই কলিকাতা আসিয়াছিলেন, ইহাও পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং বরিশালের দমননীতি ২য় পর্ব্বের গুপ্ত-সমিতিকে উত্তেজিত করিয়াছে—জন্ম দেয় নাই।

‘যুগান্তর’ ঃ হেমচন্দ্র কাননগু লিখিয়াছেন, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসের প্রথমে যুগান্তর বেরিয়েছিল—(বাং-বি প্র, পৃঃ ১০৭)। প্রভাতকুমার মুখার্জি লিখিয়াছেন, “১৯০৫ সাল হইতে যুগান্তর বিপ্লবের কথা বলিতেছিল।” প্রভাত মুখার্জি ঠিক তারিখ লেখেন নাই। কেননা, “১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বারীন বাংলাদেশে বা কলিকাতায় আসেনই নাই। হেমচন্দ্রের কথাই ঠিক, কিন্তু এপ্রিল নয়—মার্চ। অবিনাশ চক্রবর্ত্তী নামে একজন উকীলের নিকট হইতে মাত্র ৫০৲ টাকা পাইয়া বারীন্দ্র ‘যুগান্তর’ প্রকাশে প্রবৃত্ত হন। ১৯০৬ সনের

৭ই আগষ্ট যদি 'বন্দেমাতরম্' প্রকাশিত হইয়া থাকে তবে 'বন্দেমাতরমের' ৪ মাস পূর্ব্বে 'যুগান্তর' বাহির হয়। ১৯০৫ সনের প্রথমার্দ্ধে আমরা উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা'র আবির্ভাব দেখিয়াছি। পুরা এক বৎসর না যাইতেই ১৯০৬-এর তৃতীয় মাসেই 'যুগান্তরের' আবির্ভাব দেখিলাম। 'সন্ধ্যার' পরে 'যুগান্তর' আসিল। 'যুগান্তরের' ৪ মাস পরেই 'বন্দেমাতরম্'।

সন্ধ্যা, যুগান্তর, বন্দেমাতরম্ পর পর আবির্ভূত হইল। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের নূতন জাতীয়তাবাদ এই তিনটি খবরের কাগজের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহাই আন্দোলনের প্রজ্জ্বলিত অবস্থা। কিন্তু 'সন্ধ্যা' বা 'বন্দেমাতরম্' বিপ্লববাদ প্রচার করে নাই। 'যুগান্তর' স্পষ্ট খোলাখুলিভাবে বিপ্লবের কথা প্রথম হইতেই প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। 'সন্ধ্যা' বা 'বন্দেমাতরম্' হইতে এইখানে 'যুগান্তরের' পার্থক্য। বাংলাদেশে বিপ্লববাদীদের প্রথম খবরের কাগজ 'যুগান্তর'। আমরা বন্দেমাতরমের মধ্যে অরবিন্দকে পাই। সেখানে তিনি আগষ্ট মাস হইতেই চরমপন্থী দলভুক্ত হইয়া চরমপন্থী রাজনীতির পরিপোষক-রূপে তাঁহার নিজের উগ্র রাজনৈতিক মতবাদ তাঁহার অনুপম ভাষায় প্রতি সপ্তাহে লিখিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার 'বন্দেমাতরমের' লেখার মধ্যে 'যুগান্তরের' মতবাদ কিছুই পাওয়া যায় না। 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরমের' ভাব-আদর্শ প্রকাশভঙ্গী এক নয়। কেহ বলিতে পারেন যে, 'বন্দেমাতরম্' বিপ্লবের কথা 'যুগান্তরের' মত খুলিয়া না লিখিলেও গুপ্ত-হত্যামূলক বিপ্লববাদের বিরোধী নয়। বন্দেমাতরম্ ভাবে বিপ্লববাদের সমর্থক, কিন্তু শুধু পলিসির জন্যই সে উহা খুলিয়া বলে না, গোপন করে। কেননা, গুপ্ত সমিতির কথা গোপন থাকাই ভাল, প্রকাশ করিলে আর তাহা গুপ্ত থাকে না। কিন্তু একথা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কেননা, 'বন্দেমাতরমের' সম্পাদক-সঙ্ঘে গোড়ার দিকে বিপিনচন্দ্র এবং শেষের দিকে অরবিন্দই প্রধান। কিন্তু বিপিনচন্দ্র গুপ্ত-সমিতির হত্যামূলক কার্য্যের বিরোধী। সুতরাং অরবিন্দের বৈপ্লবিক মতবাদের বিরোধী। এমতাবস্থায় 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরমের' আদর্শ এক হইতে পারে না। 'বন্দেমাতরমের' প্রথম অবস্থায় বিপিনচন্দ্রকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া দেওয়া যায় না।

'যুগান্তরের' সহিত অরবিন্দের সম্পর্ক একটু ঘোরালো রকমের। তিনি তখনও ভাল বাংলা লিখিতে জানেন না বলিয়াই হউক, অথবা 'যুগান্তর'

সত্যে প্রকাশ্যে নিজের নাম দিতে অনিচ্ছুক বলিয়াই হউক, বাহ্যতঃ 'যুগান্তরের' সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক দেখা যায় না সত্য, কিন্তু আভ্যন্তর প্রমাণে 'যুগান্তরের' সহিত অরবিন্দ অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত (* ক)। বারীন্দ্র 'যুগান্তর' প্রকাশ করিলেন। অরবিন্দ গুপ্ত-সমিতির দ্বিতীয় পর্বে বারীন্দ্রকেই প্রধান নেতা করিয়া বরোদা হইতে কলিকাতায় পাঠাইলেন। প্রথম পর্বে যতীন্দ্রকেই প্রথম ও প্রধান নেতা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অরবিন্দ লিখিত 'ভবানী মন্দির' বারীন্দ্র ডি. গুপ্ত প্রেসে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গোপনে ছাপিয়া গোপনে বিলাইতে লাগিলেন। এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গেই যখন বারীন্দ্র 'যুগান্তর' প্রকাশ করিলেন তখন বুঝিতে হইবে যে, 'যুগান্তরের' মতবাদ প্রকাশ অরবিন্দের স্পষ্ট অনভিপ্রেত হইলে বারীন্দ্র 'যুগান্তর' প্রকাশ করিতেন না। বিশেষতঃ এই 'যুগান্তর' কাগজ ও তৎসংশ্লিষ্ট লেখকের যে ক্ষুদ্র দলটী চাঁপাতলায় 'যুগান্তর' অফিসে সঙ্ঘবদ্ধ হইল, সেই ক্ষুদ্র বিপ্লবী দলটির প্রকাশ্য নেতা ছিলেন বারীন্দ্রকুমার, আর অপ্রকাশ্য ও অব্যক্ত নেতা ছিলেন অরবিন্দ নিজে। ইহার বহু প্রমাণ বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রভৃতি অরবিন্দের দলভুক্ত বিপ্লবী নেতারা স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন ও বহু বৎসর পূর্বে তাহা ছাপা হইয়াছে। সুতরাং অরবিন্দের সহিত 'যুগান্তরে'র গোপন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শুধু কি তাই? এই 'যুগান্তরের' ক্ষুদ্র বিপ্লবী দল ছোট-লাট ফুলার বধের যে ব্যর্থ চেষ্টা ১৯০৬ 'মে-জুন-জুলাই, এই তিন মাসে করিয়াছিল তাহার অবিসংবাদিত নেতৃত্ব যে অরবিন্দ স্বয়ং করিয়াছিলেন সেকথা হেমচন্দ্র কানুনগো স্পষ্ট লিখিয়া পুস্তক আকারে ছাপাইয়াছেন এবং এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রতিবাদ হয় নাই। এবং বারীন্দ্রও ইহা স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং প্রমাণের কোনই অভাব নাই। ইতিহাস

(* ক) অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ২০।৬।৪৩ তারিখে আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, অরবিন্দ মধ্যে মধ্যে যুগান্তরে প্রবন্ধ দিতেন কিন্তু তাঁহার নাম দিতেন না। তাঁহার বাংলা প্রবন্ধে সংস্কৃত ও মারাঠি শব্দ ও অক্ষর পর্য্যন্ত থাকিত। অবিনাশবাবু ঐগুলির ভাব বজায় রাখিয়া ভাষা সংশোধন করিয়া দিতেন। তাতে বারীন্দ্র অবিনাশবাবুকে ধমক দিয়া বলিত—'কী, তুমি সেজদার লেখার উপর কলম চালাও!' অরবিন্দ ইহা শুনিয়া অবিনাশবাবুকেই সমর্থন করিতেন।

বা জীবনচরিত সত্য ঘটনার উপরেই প্রতিষ্ঠা পায়। মিথ্যা ভিত্তির উপর তাহার প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত নয়।

প্রথম পর্ব্বের গুপ্তসমিতির কথা যতীন্দ্র ও বারীন্দ্র গোপন রাখিয়াছিলেন। যুগান্তরের দ্বিতীয় পর্বে এই গোপন নীতি পরিত্যক্ত হইল। দ্বিতীয় পর্ব্বের গুপ্ত সমিতির কথা দেশের লোককে জানাইবার জন্য বারীন্দ্র প্রভৃতি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইহার মূলে নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল। গুপ্ত সমিতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দেশের লোককে সজাগ করিয়া দেওয়াই সম্ভবত: দ্বিতীয় পর্ব্বে ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। গুপ্তসমিতির এইরূপ প্রচার অরবিন্দের ইচ্ছা বা আদেশ না থাকিলে তাঁহার সুস্পষ্ট মতের বিরুদ্ধে বারীন্দ্র ইহা কখনই করিতে পারিতেন না। সুতরাং দ্বিতীয় পর্ব্বের গুপ্তসমিতির লোকসমাজে প্রচার অরবিন্দের অভিপ্রায় অনুসারেই হইয়া থাকিবে। অথচ অরবিন্দ প্রকাশ্যে যুগান্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। সুতরাং প্রকাশ্যে 'যুগান্তরের' মধ্য দিয়া গুপ্ত সমিতির প্রচার ব্যাপারে অরবিন্দের নামগন্ধ না থাকার তাঁহাকে অব্যক্ত নেতা বলিয়া কেহই তাঁর স্বরূপ বুঝিতে পারিল না—বারীন্দ্রকেই নেতা বলিয়া বুঝিল। গুপ্তসমিতির নেতৃত্বের ব্যাপারে অরবিন্দ এইরূপে আত্মগোপন করিলেন। অন্য দিকে 'বন্দেমাতরমের' লেখাতে বিপ্লবের কোন কথা না থাকায় এবং অরবিন্দ 'বন্দেমাতরমের' সহিত সংযুক্ত হওয়ায় প্রথম প্রথম কেহই অরবিন্দকে বিপ্লবী বলিয়া ধরিতেই পারিল না—যদিও তিনি আধ্যাত্মিকতার আবরণ দিয়া গুপ্তসমিতির কল্পনা লইয়াই বরোদার চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া বারীন্দ্রকে 'ভবানী মন্দিরের' খসড়া দিয়া আগে পাঠাইয়া, কিছু পরেই নিজে কলিকাতায় আসিলেন।

প্রথম বৈপ্লবিক হত্যা ও ডাকাতির বৃথা চেষ্টা ঃ অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্তসমিতির দ্বিতীয় পর্ব্বে যে গুপ্তহত্যা ও ডাকাতির বৃথা চেষ্টা অরবিন্দের আদেশে ও বারীন্দ্রের নেতৃত্বে হইয়াছিল, হেমচন্দ্র কাননগু সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপে লিখিয়া ১৯২২ হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাসিক 'বসুমতী'তে ছাপাইয়া পরে ১৯২৮ সালের ১লা জুন "বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা" নামক গ্রন্থে ছাপাইয়াছেন। এই দীর্ঘ বৎসরগুলিতে বিনা প্রতিবাদে ইহা ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"পুণ্যে বিশাল বরিশাল" কনফারেন্সে পুলিশের অত্যাচারের—

"ঠিক পরেই কিন্তু বিপ্লববাদের মন্ত্রগুলো লোকের কানে সহজে ঢুকত; এমন কি, অনেক হোমরা চোমরা মডারেটও বিপ্লবের খেয়ালে সই দিতেন। এই সকল কারণে দেশের অনেক লোকের জাতক্রোধটা ফুলার সাহেবের ওপর ঘনিয়ে উঠেছিল। ফুলার সাহেবকে কেউ বধ করেছে—ঘরের দরজা ভেজিয়ে আরাম খুরশিতে বসে এই খোস খবরটা শোন্‌বার জন্য তখন অনেক গণ্যমান্য লোক কায়মনোবাক্যে প্রত্যাশা করছিলেন। এমন কি, ঘাতককে দু'পাঁচ হাজার বকশিশ দেয়ার অঙ্গীকারও দু'চার জনে করে ফেলে ছিলেন। আমাদের বারীন এ সুযোগ ছাড়বার পাত্রই ছিল না। কে একজন সুরেন ঠাকুর বারীনের হাতে নগদ ১ হাজার টাকা বায়নাস্বরূপ অগ্রিম দিয়ে ফেলেছিলেন। টাকা বের করবার নেতৃসুলভ শক্তি লাভের সাধনা সে তখন সবে সুরু করেছে।"—(পৃঃ ১১৮)

"এই হাজার টাকা পেয়ে দুটো তথাকথিত বোমা আর দুটো রিভলবার নিয়ে, বারীন Reconnoitre (অর্থাৎ বধ্যকে আক্রমণের স্থান ও সুযোগাদি অনুসন্ধান) করবার জন্য ফুলার লাটের গ্রীষ্মবাস শিলং-এ যাত্রা করল। বন্দোবস্ত করে গেল, সেখান থেকে টেলিগ্রাম করলে কলকাতা থেকে একজন হত্যাকারী পাঠান হবে।"—(পৃঃ ১১৯)

বারীন্দ্র একথা স্বীকার করেন। সুতরাং এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কোথায় খুঁজিলে পাওয়া যাইবে? তারপর ছোটলাট ফুলার বধের চেষ্টায় একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমনের ইতিহাস :

"মেদিনীপুরের একজন ফুলার বধের ভার পেল। সেই দিন সন্ধ্যার ট্রেণে সে গোয়ালন্দ যাত্রা করল্। সেটা বোধ হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসের প্রথম সপ্তাহ। সন্ধেবেলা তাকে শিয়ালদা ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে গেছলেন পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।"—(পৃঃ ১২১)

স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্র দত্ত ইহা অস্বীকার করিবার মত লোক নিশ্চয়ই নহেন। দেখিতেছি এই সময় তিনিও বৈপ্লবিক কর্ম্মে অরবিন্দের দলভুক্ত একজন প্রধান কর্ম্মী। সুতরাং 'যুগান্তরের 'সম্পাদক'-রূপে জেলে যাওয়াই তাঁহার একমাত্র পরিচয় নয়। আরও পরিচয় আছে।

বারীন হত্যাকারীকে বলিল—"শিলং-এ হবে না, গৌহাটি ফিরে আসতে হবে।" "সে (হত্যাকারী) গৌহাটীতে ফিরে এল।"—(পৃঃ ১৪৫)

হত্যাকারী বুঝিল—"ফুলার বধটাই বারীনের কাছে সব চেয়ে বড় কাজ ছিল না। বিপ্লববাদ প্রচার আর সেই সঙ্গে আত্মপ্রচারটাই ছিল মুখ্য কাজ।... বারীনের মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে গেলে তার সঙ্গে বনিবনা ত হবেই না; অধিকন্তু ক-বাবুর (অরবিন্দ) বিরাগভাজন হতে হয়।"—পৃঃ ১৪৭—১৪৮)

আমরা ক-বাবু অর্থাৎ অরবিন্দকে পেলাম। বারীনের মতের বিরুদ্ধে গেলে অরবিন্দের বিরাগভাজন হতে হয়। অরবিন্দের বিরাগভাজন হলে এই বিপ্লবী দলে থাকা চলে না। সুতরাং ফুলার বধরূপ বৈপ্লবিক কর্ম্মে অরবিন্দ লিপ্ত ছিলেন না, শুধু বারীন্দ্রই ইহার নেতৃত্ব করিয়াছে—একথা বলা চলে না। ব্যক্ত নেতা বারীন্দ্রই, আর অব্যক্ত নেতা অরবিন্দ। ইহাই প্রকৃত ইতিহাস (* খ)।"

ফুলার সাহেব হঠাৎ বরিশালে গেলেন। কনফারেন্সের পর বরিশালে এই তাঁহার প্রথম আগমন। এখানে তাঁহার অভ্যর্থনা হইয়া গেল। আশ্চর্য্য কিছুই নয়। 'ব্রহ্মকুণ্ড' স্পেশ্যাল ষ্টীমার খরস্রোতা নদীর উপর দিয়া ছোটলাটকে নিরাপদে নিয়া আসিল এবং অভ্যর্থনার পরে ফিরাইয়া নিয়া গেল। বারীনেরা অবশ্য লাটের পশ্চাদনুসরণ করিয়া বরিশাল আসিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু—

"সামনে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বাঘ দূরে চলে গেলে নূতন কাচা শিকারীর যে সোয়াস্তি মিশ্রিত আফশোষ হয়, ফুলার-শীকারীদেরও প্রায় তাই হয়েছিল।"—(পৃঃ ১৪৯)।

বরিশাল হ'তে আবার গৌহাটি, গৌহাটী হতে রংপুর। কেননা, গৌহাটী এসে জানা গেল লাট সাহেব রংপুর দিয়ে যাবেন। রংপুর থেকে কলিকাতা হঠাৎ আসিতে হইল। কেননা, আবশ্যকীয় জিনিস কিনিবার জন্য টাকা চাই, অথচ টাকা নাই। ভাবী হত্যাকারী সোজা অরবিন্দের নিকটেই গেলেন, কেননা, তিনিই ত সর্বপ্রধান নেতা। হত্যাকারী—

"সেখানে 'ক'-বাবুর (অরবিন্দ) কাছে, সে যাবৎ ফুলার-বধ চেষ্টার সমস্ত বিবরণ বলে টাকার অভাব বলে জানাল। তিনি তৎক্ষণাৎ পেটরা হাতড়ে, সব সমেত পাঁচিশটী টাকা মাত্র তার সম্বল আছে, দেখালেন।

(* খ) বারীন্দ্র আমাদিগকে ২০।৬।৪৩ তারিখে বলিয়াছেন, "ফুলার বধের পরামর্শ নিশ্চয়ই সেজদা (অরবিন্দ) দিয়াছিলেন। নইলে অত বড় কাজ হাতে নিই?" ইহার উপর আর কথা কি?

তাই হাতে তুলে দিলেন। দরকারী দ' একটা কিছু কিনে সে সেই দিনই রংপুরে যাত্রা করল। আশানুরূপ টাকা না পেয়ে ক-বাবুকে (অরবিন্দ) টাকা পাঠাবার জন্য আবার তাগাদা দিয়েছিল। টাকার কোন উপায় না দেখে ক-বাবু (অরবিন্দ) নরেন গোঁসাইকে রংপুরে পাঠিয়ে আদেশ দিলেন, ডাকাতি করে টাকা সংগ্রহ করা চাই।"—(পৃঃ ১৫৬)

"এই বন্দোবস্ত পাকা করবার পর ডাকাতির চেষ্টা সুরু হল। কারণ, ফুলার সাহেবের রংপুর দিয়া যাবার দেরী ছিল।"—(পৃঃ ১৫৭)

"এ যাবৎ চাঁদা, দান আদির দ্বারাই গুপ্ত সমিতির ব্যয়নির্ব্বাহ চলছিল। এখন তাতে আর চলে না দেখে, বিশেষতঃ হঠাৎ টাকার খুব দরকার হয়ে পড়ায়, অন্য উপায় অভাবে 'ক' বাবু (অরবিন্দ) ডাকাতির হুকুম দিলেন। ডাকাতি যে তথাকথিত action-এর একটা অঙ্গ, তা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু কাদের টাকা ডাকাতি করতে হবে, তার কোন বিধি-ব্যবস্থা 'ক' বাবু (অরবিন্দ) দেন নি"—(পৃঃ ১৫৯)। "প্রথম স্বদেশী ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল রংপুরে"—(পৃঃ ১৫৮)।

হেমচন্দ্র মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন বলিয়া এই দীর্ঘ বৎসরগুলিতে কোন প্রতিবাদ হয় নাই। বারীন্দ্রও মিথ্যা কথা বলিতেছেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ২য় পর্ব্বের প্রারম্ভেই, ১৯০৬মে-জুন-জুলাই, অরবিন্দকে আমরা বৈপ্লবিক গুপ্ত-হত্যা ও ডাকাতির নেতৃত্ব করিতে জাজ্জল্যমান দেখিতে পাইতেছি। আলিপুর বোমার মামলায় নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হইয়া যে মিথ্যা কথা বলেন নাই, তাহার তো প্রমাণ আমরা হাতে হাতে পাইলাম। কেননা, অরবিন্দের আদেশে রংপুরে যে প্রথম ডাকাতির ব্যর্থ চেষ্টা হয় তার "এক দলের নরেন হয়েছিল সর্দ্দার"—(পৃঃ ১৬৫)।

খবর এল, লাটসাহেব রংপুর না গিয়ে "ব্রহ্মকুণ্ডে" চড়ে গোয়ালন্দ রওনা হইয়াছেন। বিপ্লবীরাও গোয়ালন্দ আসিল। সেখান হইতে লাটের শিয়ালদহ ষ্টেশন হইয়া কলিকাতা আসিবার কথা। বিপ্লবীরা শুনিল, লাটের গাড়ী নৈহাটী দাঁড়াইবে। তাঁহারাও নৈহাটিতে নামিল। নামিয়া যেই শুনিল—

"লাট হুগলী পুল পেরিয়ে ই. আই. রেলওয়ে ধরে সোজা বম্বে রওনা হয়েছেন, প্রফুল্ল অমনি ব'সে পড়ল"—(পৃঃ ১৭১)।

এই প্রফুল্লই—মজঃফরপুরের বোমারু প্রফুল্ল চাকি!

বিপ্লবীরাও "সেই গাড়ীতে কলকাতা পৌঁছেই ক-বাবুর (অরবিন্দের) কাছে গেল। তিনি নির্ব্বিকারভাবে সমস্ত শুনে তাদের শুধু বাড়ী যেতে বললেন।"—(পৃঃ ১১১)

পৃথিবীর ইতিহাসে অপর কোন বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা "নির্ব্বিকারভাবে সমস্ত শুনে তাদের শুধু বাড়ী যেতে বলিতে" পারিতেন কি-না সন্দেহ। অরবিন্দ যখন বৈপ্লবিক কর্ম্মে লিপ্ত, তখনো তিনি শান্ত নীরব, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত যোগী পুরুষ! ইহাই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব।

ছোটলাট ফুলার ১৯০৬।৪ঠা আগষ্ট পদত্যাগ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন।

বিপ্লবী অরবিন্দের স্বরূপ: ১৯০৬।মে-জুন জুলাই আমরা অরবিন্দকে দেখিলাম তিনি তাঁহার বিপ্লবকর্ম্মের কল্পনা অনুযায়ী ছোটলাট ফুলারকে গোপনে হত্যা করার কার্য্যে এবং রংপুরে বৈপ্লবিক ডাকাতি করিতে আদেশ দিয়াছেন, পরামর্শ দিয়াছেন এবং নেতৃত্ব করিয়াছেন। তিনি যে প্রধানতঃ এবং মূলত: একজন বিপ্লবী তাহার স্বরূপ দেখা গেল। "স্বরূপ বিহনে রূপের জনম, কথন নাহিক হয়"। এই "স্বরূপ" হইতেই তাহার অপরাপর বিচিত্র রূপের বিকাশ ও প্রকাশ আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব। আগষ্ট মাসের প্রথম হইতে তিনি "বন্দেমাতরমে" প্রকাশ্যে চরমপন্থী রাজনীতি লিখিতে আরম্ভ করিবেন। চরমপন্থী রাজনীতি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (passive resistance) কথা বলে। গুপ্তহত্যা বা বৈপ্লবিক ডাকাতির কথা বলে না। এমন কি প্রধান চরমপন্থী নেতা এবং "বন্দেমাতরম্"-এর প্রথম ও প্রধান সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল গুপ্তহত্যা ও বৈপ্লবিক ডাকাতির স্পষ্ট বিরোধী। অরবিন্দ বিরোধী ত নহেনই—বাংলাদেশে ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীতে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির ইতিহাস বৈপ্লবিক কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হিসাবে অরবিন্দকেই প্রথম ও প্রধান স্থান দিবে—মি: পি. মিত্রকে দিবে না। কেননা মি: পি. মিত্র যদিও অরবিন্দের আগে বিপ্লবের কল্পনা লইয়া লাঠি ও তলোয়ার খেলার "অনুশীলন" আখড়া খুলিয়াছিলেন, তথাপি তিনি অরবিন্দের ফুলার-বধ-রূপ গুপ্তহত্যা এবং রংপুরের ডাকাতি করার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন নাই বরং ১৯০৬ মার্চ্চ যুগান্তর প্রকাশ্যে বিপ্লবের কথা লেখার দরুন পি. মিত্রের সহিত মতান্তর হইয়া বারীন্দ্র ও পি. মিত্রের ইষ্ট ক্লাব (East Club) ভাঙ্গিয়া যায়। পি. মিত্র অরবিন্দ-কল্পিত, বারীন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত "যুগান্তর" দলের অগ্রগতি

ও বৈপ্লবিক কর্ম্ম এত তাড়াতাড়ি অনুমোদন করেন নাই। ১৬।৭।৪৩ তারিখে বারীন্দ্রকুমার আমাদিগকে বলিয়াছেন—

"যুগান্তর ষ্টার্ট হওয়াতে ইষ্ট ক্লাব ভাঙ্গিয়া যায়। পি. মিত্র বলেন—'বারীন দিস্তা দিস্তা কাগজ লিখিয়া দেশ উদ্ধার করিবে।' তখন আমি (বারীন্দ্র) বলিয়াছিলাম—'পি. মিত্তির বাঁশের লাঠি ঘুরিযে দেশ উদ্ধার করিবেন'।"

আসল কথা পি. মিত্র আমাদের (যুগান্তর দলের) Publicityর propaganda দেখে ভড়কে গেল। ভাবলো এ কী রে বাবা! আমরা বল্লুম—মশায়, publicity না হ'লে লোকে জানবে কি করে? আর লোকে না জানলে তারা আসবে কি করে? তারা না এলে এ দু'চার জন লাঠি ঘুরিয়ে কী করবে?"

গুপ্ত-হত্যা এবং ডাকাতিও "Publicityর propaganda" -স্বরূপ। পি. মিত্র ইহা আরম্ভ করেন নাই। তিনি ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন। বিপিনচন্দ্র ইহা অনুমোদন করেন নাই। সুতরাং গুপ্তহত্যা ও ডাকাতির প্রবর্ত্তক পি. মিত্র অথবা বিপিন পাল নহেন। ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক অরবিন্দ। ইতিহাস-নির্দ্দিষ্ট এই স্থান তাহাকে সত্যের অনুরোধে গ্রহণ করিতেই হইবে। উপায় নাই।

"বন্দেমাতরমের" অরবিন্দ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (Psssive Resistance) অরবিন্দ। ১৯০৬ সনের আগষ্ট মাসে ফুলার সাহেব নিরাপদে গঙ্গাপার হইয়া বিলাত রওনা হইবার পরে, আমরা "বন্দেমাতরম্"-এর অরবিন্দকে পাই। তার পূর্ব্বে নয়। আর ১৯০৬।মে-জুন-জুলাই—আমরা ফুলার বধের ও রংপুর প্রথম ডাকাতির সর্ব্বময় নেতারূপে অরবিন্দকে পাই। অরবিন্দ এই ২য় পর্ব্বেও প্রথমে গোপন-বিপ্লবী, বৈপ্লবিক কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, পরে প্রকাশ্য বন্দেমাতরম্-এর চরমপন্থী রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদী। অরবিন্দ একাধারে একই সময়ে গোপনে বৈপ্লবিক কর্ম্মে (গুপ্ত-হত্যা ও ডাকাতি) নেতৃত্ব করিতেছেন, আবার প্রকাশ্যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের চরমপন্থী রাজনীতি লিখিতেছেন। সুতরাং অরবিন্দ-চরিত্রে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সহিত সক্রিয় গুপ্ত-হত্যা ও ডাকাতির একত্রে সমাবেশ আমরা জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছি। তখনকার এবং এখনকার অপর কোন নেতার চরিত্রে এমনটি দেখা যায় না। এ দুয়ের সমাবেশে যে চরিত্র অতিশয় জটিল, তাহাই অরবিন্দের চরিত-চিত্র; এবং তাহাই প্রথম হইতে বিপ্লবী অরবিন্দের "স্বরূপ"।

লোকমান্য তিলকের কলিকাতা আগমন (১৯০৬৪ঠা জুন) ও শিবাজী-উৎসব (৪ঠা—১২ই জুন): বাংলার চরমপন্থী "স্বদেশী মণ্ডলী" শিবাজী উৎসব ও তৎসঙ্গে মা ভবানী পূজার আয়োজন করিয়া তিলক মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ৪ঠা জুন তিলক মহারাজ কলিকাতা আসিলেন। ফিল্ড এণ্ড একাডেমি, পান্থীর মাঠে ৫ই জুন সভা হইল। অশ্বিনী দত্ত সভাপতি হইলেন। ৬ই জুন তিলক বক্তৃতা করিলেন। 'বেঙ্গলী' কাগজ তিলকের বক্তৃতা পর্য্যন্ত ছাপাইলেন না। তিলককে লইয়া বাংলার গরম ও নরম দলে মনকষাকষি চলিতে লাগিল। বাংলার গরম দলই তিলককে কলিকাতায় আনিয়াছেন। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী কলিকাতা হইতে একেবারে শিমুলতলা চলিয়া গিয়াছিলেন। তাহাকে সাধ্যসাধনা করিয়া কলিকাতায় আনা হইল। ৭ই জুন আবার সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীকেই সভাপতি করা হইল। নরমে গরমে আবার তেলেজলের মত একত্রে মিশাইয়া দিবার চেষ্টা হইল। ৮ই জুন উৎসবের মেলা শেষ হইল। বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলনের প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় তিলকের কলিকাতা আগমন, অগ্নিতে ঘৃতাহুত দিল। আগুন জ্বলিয়া উঠিল, শিখা বিস্তার করিতে লাগিল, আবর্জ্জনা কিছুটা পুড়িয়া ভস্ম হইল। "স্বদেশী মেলা" চরমপন্থীদের নুতন পরিকল্পনা। মেলা বেশ জমিয়াছিল। মেয়েদের জন্য বিশেষ দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমরা ঐ মেলা দেখিয়াছি।

কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, ব্রাহ্ম কৃষ্ণকুমার মিত্র এই শিবাজী উৎসবে যোগ দিলেন না। কেননা মূর্ত্তি গড়িয়া ভবানী পূজা হইয়াছে। ইহা নিছক্ পৌত্তলিকতা। ব্রাহ্ম হইয়া তাঁহারা এই পৌত্তলিকতাপূর্ণ উৎসবে কি করিয়া আসেন? বটেই ত! দেশ আগে, না নিরাকার আগে? ব্রাহ্মদের পক্ষে যদি ভবানী মূর্ত্তিতে এতটা গোল বাধে, তবে মুসলমানদের পক্ষে ত কথাই নাই। বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্ম হইলেও এক্ষেত্রে ভবানী মূর্ত্তি তাঁহাকে আটকায় নাই। অরবিন্দ বরোদা থাকিতে নিজে বগলা মূর্ত্তির পূজা করিয়াছেন। এক পায়ে দাঁড়াইয়া বগলা-মন্ত্র তিনি জপ করিয়াছেন। 'ভবানী মন্দির' বই ছাপাইয়া বিপ্লবের প্রচার-কার্য্য করিয়াছেন। সুতরাং ভবানী মূর্ত্তি তাঁহাকে ত আটকাইতে পারে না। কিন্তু মুসলমান-বর্জ্জিত, মুসলমান ধর্ম্ম-বিরোধী এইপ্রকার উৎসবকে তিলক অরবিন্দ বিপিনচন্দ্র উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি চরমপন্থী নেতারা সেদিন প্রাণপণে যেরূপ জাতীয়তার বেদীতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা ত ধর্ম্ম

নিরপেক্ষ জাতীয়তা নয়, কংগ্রেসী জাতীয়তা নয়; পাঁচ মাস পরে কলিকাতা কংগ্রেসে নৌরজী যে জাতীয়তার উপর "স্বরাজ" ঘোষণা করিবেন, এ ত সে জাতীয়তা নয়। ইহা নির্জ্জলা পৌত্তলিক হিন্দুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-জাতীয়তা। ইহা বঙ্কিম-প্রদর্শিত এবং বঙ্কিম-অনুপ্রাণিত জাতীয়তা। আমরা দেখিয়াছি, দেখিতেছি অরবিন্দ এই বঙ্কিম-প্রদর্শিত জাতীয়তাকেই স্বজ্ঞানে ১৮৯৪ খৃ: হইতেই অনুসরণ করিতেছেন। ব্রাহ্ম অথবা মুসলমানের তিনি ধার ধারেন না, তিনি এক পায়ে দাঁড়াইয়া বগলা-মন্ত্র জপ ও বগলা মূর্ত্তি পূজা শেষ করিয়া আসিয়াছেন। অতি প্রত্যুষে স্নান করিয়া চণ্ডীপাঠ সমাপন করিয়া তিনি এখন গীতাপাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। এক হাতে গীতা আর এক হাতে তলোয়ার দিয়া তিনি অন্ধকারের গুপ্ত-সমিতিতে হেমচন্দ্র কাননগুকে ইতিপূর্ব্বে বরোদা হইতে বাংলাদেশে আসিয়া নিজে দীক্ষা পর্য্যন্ত দিয়াছেন। এই সকল ব্যাপার ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহাকে বুঝিবার অনেকটা সুযোগ আমরা পাইতেছি। অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতিতে মা কালীও আছেন—এবং শ্রী-গীতাও আছেন। এতে মুসলমান ভ্রাতাগণ যদি বলেন যে, "এ ব্যবস্থায় দেশ-উদ্ধারের জন্য আমরা যাই ই বা কী করিয়া, আর থাকিই বা কোন্ মুখে? আমাদেরও ত একটা পৃথক ধর্ম্ম ও তার অনুশাসন আছে?" এ কথার জবাব ত চরমপন্থীদের ও গুপ্ত-সমিতির দেওয়াই কর্ত্তব্য।

চরমপন্থী রাজনীতি ও বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি উভয়েই হিন্দু-জাতীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দুই সম্প্রদায়ই ধর্ম্মনিরপেক্ষ জাতীয়তা প্রচার করেন নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক মতবাদ ও অনুষ্ঠানকে ইহারা যেন প্রাণপণে টানিয়া আনিয়াছেন। ভাবিয়াছিলেন যে, ইহার দ্বারাই তাড়াতাড়ি কার্য্য উদ্ধার হইয়া যাইবে। আমার বলিবার কথা, ১৯০৬ খৃঃ অরবিন্দ গুপ্ত অথবা প্রকাশ্য, এই দুই প্রকার রাজনীতিতে প্রবেশ করিবার মুখেই কংগ্রেসী জাতীয়তাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। হিন্দুয়ানী ও হিন্দু সাধনা-বর্জ্জিত কংগ্রেসী বস্তুতন্ত্রহীন জাতীয়তা—অরবিন্দ রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশমুখেই বর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাকে লইয়া রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাই অরবিন্দের জাতীয়তা—কংগ্রেসী জাতীয়তা তাঁহার জাতীয়তা নহে। বরং জাতীয়তার বিপরীত বস্তু। কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতিকেই শুধু তিনি বর্জ্জন করেন নাই, কংগ্রেসের জাতীয়তা-

বাদকেও তিনি বর্জ্জন করিয়াছেন। এইটি বিশেষরূপে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এইটির উপর লক্ষ্য না রাখিলে অরবিন্দ-চরিত্র বুঝা যাইবে না।

তিলক মহারাজ বলিলেন—মা ভবানীকে চাই, তাঁর পূজাও চাই ; নইলে দেশের আপামর সাধারণ, যারা পূজানুষ্ঠানে বিশ্বাস করে, তারা আসিবে না। অথচ তাদের আসা চাই-ই—তাতে দু'চারজন নৈরাকারী ব্রাহ্ম নেতা না আসে ত না আসুক! তিলক কংগ্রেসের সহিত গণসংযোগের কথাই সেদিন ভাবিতেছিলেন। অরবিন্দও এই গণসংযোগের কথা ১৮৯৩ খৃঃ হইতেই ভাবিয়া আসিতেছেন। অথচ এই উভয় নেতাই হিন্দু-গণসংযোগের উপর দৃষ্টি দিতে গিয়া, মুসলমান-গণবিচ্ছেদকে অনিচ্ছাবশতঃ প্রশ্রয় দিয়াছেন। ১৯০৬ খৃঃ—মোস্লেম লীগ প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়। সেদিন কে জানিত যে, কালে এই মোস্লেম লীগ হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে খোলাখুলি পাকিস্থান দাবী করিয়া একেবারে সোজা পথ আটকাইয়া বসিবে? ১৯০৬ খৃঃ বড় ভয়ঙ্কর বৎসর।

১০ই জুন তিলক গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। ৩০ হাজার লোক সঙ্গে গেল। আমরাও গিয়াছিলাম। অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত ভারতমাতার ছবি মিছিলের আগে চলিতে লাগিল, কামানের শব্দের মত অনেকগুলি বোমার ফাঁকা আওয়াজ করা হইল। নরমপন্থীরা যেন অনেকটা কোনঠাসা হইয়া পড়িলেন। এমন কি য়্যান্টি-সারকুলার সোসাইটি উৎসবের সমান তালে পা ফেলিতে না পারিয়া মমমরা অবস্থায় ভেজা বেড়ালের মত বসিয়া রহিলেন। ১১ই জুন রাজা সুবোধ মল্লিক উৎসবের স্বেচ্ছাসেবকদের বাড়ীতে ডাকিয়া ভোজ দিলেন। স্যার গুরুদাস ব্যানার্জ্জী পর্য্যন্ত যুবকদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। মারাঠি নেতাগণ বাঙ্গালী যুবকদের অজস্র প্রশংসা করিলেন। অরবিন্দের সহিত মারাঠী নেতাদের নিশ্চয়ই কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। খাপার্দ্দে অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির কথা ইতিপূর্ব্বে বোম্বে তাজমহল হোটেলে অবগত হইয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং তিলক মহারাজ অবগত হইয়াছেন কি-না তাহা একমাত্র অরবিন্দই ইচ্ছা করিলে বলিতে পারিতেন। ২৯শে জুন "বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়" কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিলেন। চরমপন্থী নেতারা ইহাতে যোগ দিলেন। জুনমাস—শিবাজী উৎসবে আরম্ভ হইয়া বঙ্কিম উৎসবে শেষ হইল।

মাহেশের রথ—শিবাজী উৎসবও নয়, বঙ্কিম উৎসবও নয়। ইহা অনের

প্রাচীন অনুষ্ঠান। বাবুরা সঙ্গিনীসহ এই রথের মেলায় নৌকাযোগে আমোদ প্রমোদ করিতে যাইতেন। স্বদেশী আন্দোলন আমোদ-প্রমোদ নহে। সুতরাং স্বদেশী মণ্ডলী ২৪শে জুন ও ১লা জুলাই মাহেশের রথে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সুরেশ সমাজপতি ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি নেতাদের পাঠাইয়া বক্তৃতা দেওয়াইলেন এবং দুর্ভিক্ষের জন্য চাঁদা তুলিলেন। অরবিন্দ ইঁহাদের সহিত মিশিয়া এই সকল প্রকাশ্য স্থানে যাতায়াত করিতেছেন কি-না বুঝিতে পারিতেছি না। কেননা, কেহই অরবিন্দের কথা উল্লেখ করিতেছেন না। অথচ এই সময় তিনি বারীন্দ্রকে দিয়া ফুলার-বধরূপ গুপ্তহত্যা ও নরেন গোঁসাইকে দিয়া রংপুরে বৈপ্লবিক ডাকাতির নেতৃত্ব করিতেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রজ্বলিত অবস্থায় অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত বিপ্লবের ধারা সবেগে অন্ধকারের মধ্য দিয়া এই সময় প্রবাহিত হইতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রজ্বলিত অবস্থার ইতিহাস অরবিন্দের এই বিপ্লবের ধারাটি কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারে না। কেননা, ইতিহাসে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ধারা।

১৯০৬—জুলাই। আমরা বলিয়াছি বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে এই সময় তিনটি ধারা প্রবাহিত হইতেছে। প্রথম—অরবিন্দের বিপ্লবের ধারা কোন্ পথে কি ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয়—গরম ও নরম পন্থীর ধারায় মধ্যে এই মাসে প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। আগামী কংগ্রেস কলিকাতায় হইবে। স্বদেশী মণ্ডলীর গরমপন্থীরা মিঃ তিলককে সভাপতি করিতে চান, কিন্তু নরমপন্থীরা ইহা কিছুতেই হইতে দিবেন না। এটর্ণী ভূপেন বসু এই সময় সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর কর্ণধার। ভূপেন বসু কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতি হইতে গরমপন্থীদের একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিতে চান। এই গরমপন্থী দলে সেদিন মিষ্টার সি. আর. দাশও ছিলেন।

"ব্যারিষ্টার শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় সহকারী সম্পাদক নিয়োগের সমর্থন করিলেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী তাহার প্রতিবাদ করিলেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুত রজতনাথ রায় প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিলেন।"—(কংগ্রেস। পৃঃ ১৫৩। হেঃ প্রঃ ঘোষ)

সুতরাং অরবিন্দের বোমার মামলার দুই বৎসর পূর্ব্বে আমরা মিঃ সি. আর.

দাশকে গরমপন্থী দলে সক্রিয়ভাবে দেখিতে পাইতেছি। 'সন্ধ্যা' কাগজে উপাধ্যায় সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীকে খোলাখুলিভাবে আক্রমণ করিয়া বসিলেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ স্তুতিয়াজী করিতে গিয়া সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন যে—সন্ধ্যার আক্রমণ, ও কিছু নয়; প্রকৃতপক্ষে উপাধ্যায় সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীকে মনে মনে শ্রদ্ধা করেন। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী বলিলেন, তবে উপাধ্যায়ের সহিত তিনি দুই দলের মিটমাটের জন্য আলোচনা করিবেন। কিন্তু মি: সি. আর. দাশের সহিত আলোচনা করিবেন না। কেননা "He (Mr. C. R. Das) is so queer"। পরিশেষে নরম দল দাদাভাই নৌরজীকে ষড়যন্ত্র করিয়া গোপনে চিঠি লিখিয়া কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিলেন। গরম দল তিলক মহারাজকে সভাপতি করিতে পারিলেন না। গরম দলের পরাজয় হইল।

এইরূপে জুলাই মাসে (* ক) বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রের তিনটি প্রবাহ আমরা দেখিতে পাইলাম। প্রথম—অরবিন্দের বৈপ্লবিক কর্ম্মের ধারা। দ্বিতীয়—বিপিনচন্দ্র, উপাধ্যায় প্রভৃতির চরমপন্থী ধারা। তৃতীয়—সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী, ভূপেন বসু প্রভৃতির নরমপন্থী ধারা। অরবিন্দের বৈপ্লবিক ধারায় ফুলারবধ-চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

(* ক) স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী অভেদানন্দকে ১৮৯৬ খৃ: বেদান্ত প্রচারের জন্য পাশ্চাত্যদেশে আহ্বান করেন। ১৯০২।৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়মঠে দেহরক্ষা করেন। একাদিক্রমে দশ বৎসর ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের পর স্বামী অভেদানন্দ ১৯০৬ জুন মাসে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন এবং ৬ মাস ভারতবর্ষের নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়া নভেম্বরে পুনরায় আমেরিকায় ফিরিয়া যান। তাঁহার রচিত "India And Her People„ গ্রন্থ এই বৎসর আমেরিকায় প্রকাশিত হয়। ইহাতে রাজনীতি ও অর্থনীতির আলোচনায় ভারতে ইংরেজ-শাসনকে 'শোষণমূলক অত্যাচার' বলিয়া স্পষ্টরূপে প্রমাণ করা হয়। ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে এই তীব্র কশাঘাতপূর্ণ পুস্তকখানি গবর্ণমেণ্ট ভারতে আসা নিষিদ্ধ করিয়া দেন। ১৯০৬,জুন-নভেম্বর স্বামী অভেদানন্দ ভারতবর্ষে যে-সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা যেমন উদ্দীপনাপূর্ণ তেমনি জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বামী অভেদানন্দ এই সময় স্বদেশী যুগের প্রজ্জলিত অবস্থায় ৬ মাসকাল মধ্যেই প্রচুর ঘৃতাহুতি দিয়া গিয়াছিলেন—যাহা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য বেলুড়মঠের কোন সন্ন্যাসী দিবার সাহস করেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষভাবে কোথাও রাজনৈতিক বক্তৃতা দেন নাই। স্বামী অভেদানন্দ দিয়াছেন!

চরমপন্থীদের তিলক মহারাজকে কংগ্রেসের সভাপতি করার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। নরমপন্থীদের দাদাভাই নৌরজীকে কংগ্রেসের সভাপতি করার চেষ্টা সফল হইল। স্যার গুরুদাস ব্যানার্জী সত্যই বলিয়াছেন—"রাজনীতি অতি গহন বিষয়!"

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: (জন্ম ২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৪ — মৃত্যু ২১শে জুন, ১৯০৬) কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি (বম্বে, ১৮৮৫ খৃ:) এবং অষ্টম কংগ্রেসেরও (এলাহাবাদ, ১৮৯২ খৃ:) সভাপতি W. C. Banerji ২১শে জুন বিলাতে দেহরক্ষা করিলেন। তিনি ১ম কংগ্রেস এই বলিয়া উদ্বোধন করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস ইংরেজের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রকারী রাজদ্রোহীদের আড্ডা নয়। সম্পূর্ণভাবে রাজভক্তদের প্রকাশ্য সভা ("Not a nest of conspirators and disloyalists. ···They are thoroughly loyal and consistent well-wishers of British Government.") ১৮৯২ খৃ: বোনার্জী সাহেব তাঁহার সুর কিছু চড়া করিলেন। তিনি বলিলেন, ভারতের জাতীয় জীবনে আমরা ইংলণ্ডের মতই সুযোগ ও সুবিধা পাইতে ইচ্ছা করি ("We may hereafter have the same facilities of national life that exist in Great Britain herself.")। তিনি আরও বলিলেন যে—সমাজ-সংস্কার আগে না হইলে রাজনৈতিক সংস্কার হইতে পারে না, একথা তিনি স্বীকার করেন না। এবং ভারতবাসীর নিকট দায়িত্বপূর্ণ ইংরেজ-শাসন যাহাতে হয়—তিনি তা-ই ইচ্ছা করেন। ["I, for one, have no patience with those who say : we shall not be fit for political reform until we reform our social system. ···It is necessary that they (the British Raj) should be responsible to those over whom they have been placed by Providence to rule.']

বোনার্জী সাহেব যখন বিলাতে দেহরক্ষা করিলেন তখন বাংলাদেশে রাজনীতিক্ষেত্রে ত্রিধারায় যে বিচিত্র প্রবাহ তরঙ্গায়িত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাতে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ভারতের ও কংগ্রেসের রাজনীতিক্ষেত্রে যে নূতন আদর্শ প্রথম যুগের কংগ্রেসের আদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া-মুখে প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছে—তাহা বোনার্জী সাহেব তাঁহার

সময়ে কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তথাপি তিনি কংগ্রেসের একজন স্রষ্টা —বাঙ্গালীর গৌরব। তাঁহার মৃত্যুতে একটা ইন্দ্রপাত হইয়া গেল, সন্দেহ কি!

রবীন্দ্রনাথ : ১৯০৪ খৃঃ রবীন্দ্রনাথ টাউনহলে তাঁহার বিখ্যাত শিবাজী'-কবিতা নিজে পাঠ করিয়াছিলেন। বরিশাল কনফারেন্স হইতে ফিরিয়া তিনি বাংলার নরম ও চরম পন্থী দলের ঘরোয়া বিবাদ মিটাইবার জন্য সুরেন্দ্র ব্যানার্জীকে দেশনায়ক করিয়া দুই দলকে মিলিত হইবার জন্য 'দেশনায়ক' নাম দিয়া এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ইহা অনেকটা আধুনিক যুগের ডিক্টেটারসিপের (Dictatorship) পূর্বাভাস। অনেকের ইহা মনঃপূত হইল না। পৃথ্বীশ রায় প্রকাশ্যে ইহার প্রতিবাদ করিলেন। ১৯০৬।জুন মাসে ওভারটুন-হলে তিনি তাঁহার জাতীয় শিক্ষা-সমস্যা সম্পর্কে সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তারপর 'ততঃকিম্' প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সভামণ্ডপে দাঁড়াইয়া বিপিনচন্দ্র পাল ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিলেন। চরমপন্থী দলেরও সকল নেতা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিতে-ছেন না। ১৯০৬।জুলাই মাসে তিনি আচার্য্য স্যার জগদীশ বসুকে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার 'খেয়া' কাব্য প্রকাশ করিলেন। এবং পরে ১৪ই আগষ্ট জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠার দিনে তাহাতে যোগ দিয়া পরম উৎসাহে জোর বক্তৃতা করিলেন। স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস রচনার অনেক মহামূল্য উপকরণ দিয়া গিয়াছেন। শুধু এবারের জুন মাসের শিবাজী উৎসবে নিরাকারী ব্রাহ্ম বলিয়া ভবানী পূজার জন্য চরমপন্থী দলে যোগ দিতে পারেন নাই—যদিও মাতৃভূমির মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াই তিনি আবেগ সামলাইতে না পারিয়া গান লিখিয়া ফেলিয়াছেন "ডান হাতে তোর খড়গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ। তোর দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট নেত্র অগ্নি-বরণ।" শুধু বেচারী মা ভবানী দোষের ভাগী হইলেন!

গিরিশ ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা' (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫) ও 'মিরকাশিম' (১০ই জুন, ১৯০৬) : স্বদেশী আন্দোলনের প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় কলিকাতায় রঙ্গমঞ্চগুলি জাতীয় ভাবের উদ্দীপনাপূর্ণ অনেকগুলি নাটক অভিনয় করিয়াছে। গিরিশবাবুর 'সিরাজদ্দৌলা' বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবকে স্বদেশ-ভক্ত ও জাতীয়তার সমর্থকরূপেই অঙ্কিত করিয়াছেন। মিরকাশিমকেও

তাই করিয়াছেন। তিলক মহারাজ যে-দিন প্রাতে ত্রিশ হাজার লোক লইয়া অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতার ছবি মিছিলের সম্মুখে রাখিয়া পটকা বোমা ফাটাইয়া শিবাজী উৎসব সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন, ঠিক সেইদিন রাত্রে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে মিরকাশিম প্রথম অভিনীত হইল। দানিবাবু মিরকাশিম সাজিলেন। আর গিরিশবাবু নিজে মিরজাফর সাজিলেন। বাঙ্গালীর অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। তাই করিমচাচা মিরকাশিমকে বলিলেন, "বাংলা ফিরে গড়তে হবে। পুরান বাংলায় চলবে না।" সিরাজদ্দৌলা ও মিরকাশিম নাটকে গিরিশবাবু দেখাইলেন যে, শুধু একজন রাজার স্বদেশপ্রেম ও বীরত্বে যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না। সেনানায়ক ও কর্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় সমস্ত যুদ্ধেই পরাজয় ঘটে, আর ঘটিয়াওছিল তা-ই। রঙ্গমঞ্চে যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর সিরাজদ্দৌলা ও মিরকাশিম ইংরেজ তাড়াইবার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন, সেই সময় অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতি ইংরেজ তাড়াইবার জন্য বারীন্দ্রকে দিয়া গোপনে ছোটলাট ফুলার বধের নিষ্ফল চেষ্টায় হন্তদন্ত হইতেছেন।

১৯০৬।আগষ্ট—'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা : ফুলার বধের চেষ্টা কিরূপে ফাঁসিয়া গেল—তা আমরা দেখিয়াছি। যদি না ফাঁসিয়া যাইত তবে আলিপুরে বোমার মামলা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে না হইয়া ১৯০৬ মে-জুন-জুলাই মাসেই হইয়া যাইত—অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির দ্বিতীয় পর্ব্ব দুই বৎসর চলিতে পারিত না। ফুলার বধের চেষ্টার কথা আলিপুর বোমার মামলায় উঠে নাই। বারীন্দ্রকুমার ১৯০৮।২২শে মে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকার-উক্তিতে ফুলার বধের চেষ্টা চাপিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের গুপ্ত সমিতির কার্য্যে অরবিন্দের নেতৃত্ব আগাগোড়াই চাপিয়া গিয়াছেন। পুলিশ ইহার কোন সন্ধান সেদিন পায় নাই। ব্যারিষ্টার মিঃ নর্টন আলিপুর বোমার মামলায় ফুলার বধের চেষ্টার কথা উত্থাপন করেন নাই। সেদিনের পুলিশের অকর্ম্মণ্যতাই এ-জন্য দায়ী। এমন কি ১৯১৮ খৃঃ রাউলাট কমিটীর রিপোর্টেও ফুলার বধ চেষ্টার উল্লেখ দেখিতেছি না। অরবিন্দের বৈপ্লবিক ধারায় প্রথম বৈপ্লবিক কর্ম্মের চেষ্টা এইরূপে ইতিহাস হইতে স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অরবিন্দের জীবন-চরিত আলোচনায় সকলের আদি গোড়ার বৈপ্লবিক কর্ম্মটী

মুছিয়া ফেলিয়া দিলে সত্য ইতিহাস বা সত্য জীবন-চরিত লেখা হইবে না। ফুলার বধের নিষ্ফল চেষ্টা লিখিতে হইবে। নতুবা অরবিন্দকে বুঝা যাইবে না।

আগষ্ট মাস আসিল। ৭ই আগষ্ট আগের বৎসরের বয়কট-সভার বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইল। ১৪ই আগষ্টের মধ্যে দুইটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটিল এবং এই দুইটীর সহিতই অরবিন্দ প্রথম হইতেই জড়িত হইয়া পড়িলেন। একটী বন্দেমাতরম্ পত্রিকার প্রকাশ, আর একটী জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা। অরবিন্দ বন্দেমাতরমের সম্পাদক-সঙ্ঘে যোগ দিলেন আর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষ হইলেন।

"উপাধ্যায় ১লা আগষ্ট হইতেই জাতীয় দলের ইংরাজী দৈনিক-পত্র প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলেন। ১লা বন্দেমাতরম্ প্রকাশিত হইল না বটে, কিন্তু ৭ই আগষ্টের পুর্ব্বেই তাহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। হরিদাস হালদার এক বন্ধুর সহিত সহসা এক পত্র প্রকাশ করিল। উদার-হৃদয় সুবোধচন্দ্র মল্লিক তাহার কার্য্যে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই ৪ জন লইয়া সম্পাদক-সঙ্ঘ গঠিত হইল এবং বিপিনচন্দ্রের নামই প্রধান সম্পাদক বলিয়া লিখিত হইল। কিছুদিন পরে মনান্তরহেতু বিপিনচন্দ্র বন্দেমাতরম্ ত্যাগ করেন এবং অরবিন্দ অসুস্থ হইয়া পড়িলে অবশিষ্ট ২ জনই বহুদিন সংবাদপত্রখানির পরিচালনা করেন। বোমার মামলায় অরবিন্দ গ্রেপ্তার হইলে বিপিনচন্দ্র আবার সাগ্রহে বন্দেমাতরমের সেবায় যোগ দিয়াছিলেন এবং ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই।" —(কংগ্রেস, পৃঃ ১৭৩—হেঃ প্রঃ ঘোষ)।

বন্দেমাতরম্ পত্রিকার তিনটি স্তর আমরা লক্ষ্য করিলাম। ১ম—১৯০৬।৭ই আগষ্ট হইতে ১৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত, আন্দাজ আড়াই মাস বিপিনচন্দ্র পাল প্রধান সম্পাদক। ১৮ই অক্টোবর বন্দেমাতরম্ অফিস ২।১ 'ক্রীক রো'-এ উঠিয়া যায়। ২য়—১৯০৬।অক্টোবরের মধ্যভাগ হইতে ১৯০৮।৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত অরবিন্দ প্রধান সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছেন। ১৯০৬।ডিসেম্বরের শেষভাগে কংগ্রেসের সময় মাত্র একদিনের জন্য অরবিন্দের নাম প্রধান সম্পাদকরূপে প্রকাশ হইয়াছিল। পরে তিনি নিষেধ করায় তাঁহার নাম আর কখনও প্রধান বা অ-প্রধান সম্পাদকরূপে প্রকাশিত হয় নাই। তথাপি

প্রায় ১ বৎসর ৫ মাস অরবিন্দ বন্দেমাতরম্-এর সম্পাদকীয়কার্য্যে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

৩য়—১৯০৮।মে মাস হইতে (যখন অরবিন্দ বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হইলেন) ১৯০৮।২৮শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৬ মাস আবার বিপিনচন্দ্র পাল ইহার প্রধান সম্পাদক হইলেন।

বন্দেমাতরম্-এর জীবনকাল—১৯০৬।আগষ্ট হইতে ১৯০৮।অক্টোবর পর্য্যন্ত, প্রায় ২ বৎসর ২ মাস ৩ সপ্তাহ হইবে।

বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর (১৯০৬।১৫ই আগষ্ট—১৯০৭।১৪ই আগষ্ট):

অরবিন্দ বরোদা হইতে কবে কলিকাতায় আসিলেন ★ অরবিন্দের কলিকাতা আগমনের প্রাক্কালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা ★ বিপিনচন্দ্র ★ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ★ ভগিনী নিবেদিতা ★ "ডন সোসাইটি" (Dawn Society) ★ "ফীল্ড এ্যাণ্ড্ একেডেমি ক্লাব" (Field & Academy Club) ★ "যুগান্তর" পত্রিকা ও যুগান্তরের আখড়া ★ অরবিন্দের মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর ★ "যুগান্তর" পত্রিকা ★ "যুগান্তর" ও "বন্দেমাতরম্" (১৯০৬।৭ই আগষ্ট)—মিঃ সি. আর. দাশ ★ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ★ কলিকাতা কংগ্রেস (১৯০৬) ও লাহোর কংগ্রেস (১৯২৯) ★ ভগিনী নিবেদিতা ও গুপ্ত-সমিতির ২য় পর্ব্ব ★ কুমিল্লা (১৯০৭।মার্চ্চ) ও জামালপুর (১৯০৭।এপ্রিল)

অরবিন্দ বরোদা হইতে কবে কলিকাতা আসিলেনঃ মিঃ সি. আর. দাশ আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিতে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন যে, অরবিন্দের কলিকাতা আগমনের তারিখটি স্থির করা অতি-শয় প্রয়োজন ('It is very important to fix the date')। কিন্তু মিঃ সি. আর. দাশ যে-সকল তারিখের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সবগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা মিঃ সি. আর. দাশ বলিতেছেন যে—অরবিন্দ ১৯০৬ মে মাসে কলিকাতা আসেন

(He—Aravindo—came sometime in May, 1906)। কিন্তু আমরা অরবিন্দকে ১৪ই এপ্রিল ১৯০৬খৃ: বরিশাল কনফারেন্সে দেখিয়াছি। সুতরাং ১৪ই এপ্রিল ১৯০৬-এর পূর্ব্বেই তিনি কলিকাতা আসিয়াছিলেন। নতুবা বরিশাল কনফারেন্সে তাঁহার উপস্থিতি সম্ভব হইত না। মে মাসে আসিলে এপ্রিলে উপস্থিত হওয়া যায় না।

মি: সি. আর. দাশ বলেন—৮ই জুন অরবিন্দ কলিকাতায় ছিলেন, কেননা ঐ তারিখে অরবিন্দ তাঁহার স্ত্রী ও বারীন্দ্র সম্পর্কে তাঁহার শ্বশুর ভূপাল বসুকে এক পত্র লেখেন। ভূপাল বসু তখন শিলং-এ ছিলেন। অরবিন্দের শ্বশুর অরবিন্দের স্ত্রীকে অরবিন্দের নিকট পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার উত্তরে অরবিন্দ শ্বশুরকে লিখিতেছেন যে—আপনি যদি মৃণালিনীকে (অরবিন্দের স্ত্রী) কলিকাতা পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন তবে পাঠান, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। এখানে বারীন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। ("If you are anxious to send Mrinalini down to Calcutta, I have no objection. Barin has fallen ill"···etc.)

কিন্তু আবার মিঃ সি. আর. দাশ বলেন যে, ৭ই জুলাই অরবিন্দ বরোদায় ছিলেন ('On the 7th July, observed Counsel, Aravindo was at Baroda'.)। এবং ১লা আগষ্ট তারিখের একটা দলিলে প্রমাণ হইতেছে যে, ঐ তারিখেও অরবিন্দ বরোদার চাকরি ছাড়েন নাই। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবার পর তিনি বরোদার চাকরি ছাড়িয়াছেন ('He does not give it up until he is appointed principal of the National College')। মিঃ সি. আর. দাশ বলেন, অরবিন্দ জুলাই মাসে একবার বরোদা গিয়াছিলেন, পরে আগষ্ট মাসে কলিকাতা আসিয়া বরোদার চাকরিতে ইস্তাফা দেন এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কিন্তু অরবিন্দ কলিকাতায় যে মাসে প্রথম আসেন, একথা ঠিক নয়। ফেব্রুয়ারী বা মার্চ্চে আসাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নয়। প্রথমবারে আসার ঠিক তারিখটি মি: সি. আর. দাশ তাঁহার নিজ প্রয়োজন অনুসারে হয়ত ইচ্ছা করিয়াই গোপন করিয়াছেন। কেননা, ঠিক তারিখ জানা তাহার পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না, জিজ্ঞাসা করিলেই হইত।

আমরা দেখিতেছি, রাউলাট কমিটি বলেন—'ভবানী মন্দির' ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। মাসের উল্লেখ নাই। যদি ডিসেম্বরেও প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা হইলে বারীন্দ্রকে অরবিন্দ-লিখিত ভবানী মন্দিরের খসড়া লইয়া ১৯০৫ খৃঃ অন্ততঃ নবেম্বর মাসে কলিকাতা আসিতে হয়। বারীন্দ্র আমাদিগকে ঠিক তারিখ দেন নাই। বারীন্দ্রের কিছু পরেই অরবিন্দ কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাহা হইলে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম তিন মাসের যে-কোন মাসে অরবিন্দের পক্ষে কলিকাতা আগমন সম্ভব। কেননা, ১৪ই এপ্রিল, ১৯০৬ তাঁহাকে বরিশাল কনফারেন্সে উপস্থিত হইতেই হইবে।

অরবিন্দ ও বারীন্দ্র : ১৯০৬।৮ই জুন অরবিন্দ তাঁহার শ্বশুর ভূপাল বসুকে শিলং-এ এই বলিয়া চিঠি লিখিলেন যে, বারীন অসুস্থ। আমি তাকে শিলং-এ চেঞ্জে যাইতে বলিতেছি। যদি সে শিলং যায় তবে আমি জানি যে, আপনি বারীনের ভার নিবেন এবং তাকে যত্ন করিবেন।

"Barin has fallen ill. *I suggest that he may go to Shillong for a change. If he goes, I am sure, you will take care of him.* Barin is somewhat erratic. He is specially fond of knocking about in a spasmodic fashion when he should stay at home and nurse his health. I have learnt not to interfere with him in this respect. If I interfere and try to check him, he is likely to go off at a tangent and become worse."

বারীন্দ্র শিলং-এ অরবিন্দের শ্বশুড়ের বাড়ীতে গিয়াই উঠিয়াছিলেন।

মিঃ সি. আর. দাশ বলেন যে, মিঃ নর্টন তাঁহার নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এই চিঠিখানির উপর নির্ভর করিয়া ইহার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। কেননা, এই চিঠিখানি হইতে মিঃ নর্টন প্রমাণ করিতে চান যে, বারীন্দ্রের প্রতি অরবিন্দ অতিশয় স্নেহপরায়ণ ('Commenting on this letter Counsel (Mr. C. R. Das) observed, my learned friend (Mr. Norton) has made use of this letter and observed that *Aravindo is a very affectionate brother.'*)।

হইলেনই বা অরবিন্দ বারীন্দ্রের প্রতি খুব স্নেহপরায়ণ ভ্রাতা, তাহাতে মিঃ নর্টনের কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল? মিঃ নর্টন দেখাইতে চান যে—যেহেতু অরবিন্দ

বারীন্দ্রের প্রতি এতটা স্নেহপরায়ণ, আর বারীনের স্বীকারোক্তিতেই যখন পাওয়া গিয়াছে যে বারীন্দ্রের দল বৈপ্লবিক গুপ্তহত্যা ও ডাকাতি করিয়াছে, তখন এই ব্যাপার কোনমতেই অরবিন্দের অবিদিত ছিল না। অরবিন্দ নিশ্চয় বারীন্দ্রের সহিত বৈপ্লবিক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে জড়িত ছিলেন।

মিঃ সি. আর. দাশ এবং মিঃ নর্টন উভয়েই খুব জাঁদরেল কৌঁসুলী, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই চিঠি সম্পর্কে আমাদের কিছু বলিবার আছে।

১ম, অরবিন্দ যেদিন কলিকাতা হইতে এই চিঠি লেখেন সেদিন কলিকাতায় শিবাজী উৎসবের তুমুল কাণ্ড চলিতেছে। তিলক মহারাজ তখন কলিকাতায়। বারীনও কলিকাতায়। কিন্তু অসুস্থ নহেন।

২য়, মে মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতেই বারীন্দ্রের দল অরবিন্দের আদেশ-মত ছোটলাট ফুলার বধের জন্য তাঁহাকে পশ্চাদনুসরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

৩য়, জুনের মাঝামাঝি বারীন্দ্রকে আমরা স্পষ্ট শিলং-এ দেখিতে পাই, তিনি টোঙ্গায় চড়িয়া বেড়াইতেছেন। তিনি চেঞ্জেও আসেন নাই, হাওয়া খাইয়াও বেড়াইতেছেন না। তিনি ফুলার বধের জন্যই কলিকাতা হইতে শিলং আসিয়াছেন। কলিকাতাতেই ফুলার বধের মন্ত্রণা পাকা হইয়াছিল। অরবিন্দ এই ফুলার বধের ব্যর্থ প্রয়াসে নেতৃত্ব করিতেছেন, করিয়াছেন—ইহা হেমচন্দ্র ও বারীন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন। হেমচন্দ্র বারীনের এই সময় শিলং গমন সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ লিখিয়াছেন :

"কে একজন (আমরা শুনিয়াছি ঠাকুর বাড়ীর সুরেন ঠাকুর) বারীনের হাতে নগদ ১ হাজার টাকা বায়নাস্বরূপ অগ্রিম দিয়ে ফেলেছিলেন। ...এই হাজার টাকা পেয়ে দুটো তথাকথিত বোমা আর দুটো রিভলভার নিয়ে, বারীন Reconnoitre (অর্থাৎ বধ্যকে আক্রমণের স্থান ও সুযোগাদি অনুসন্ধান) করবার জন্য ফুলার লাটের গ্রীষ্মবাস শিলং-এ যাত্রা করল। বন্দোবস্ত করে গেল, সেখান থেকে টেলিগ্রাম করলে কলকাতা থেকে একজন হত্যাকারী পাঠান হবে।"—[বাং-বি-প্রঃ পৃঃ ১১৮—১১৯]

"...শিলং থেকে 'তার' এল। ...তখন ক্ষুদিরামের নাম করা হ'ল। ছেলেমানুষ বলেই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক, তাকে তখন পাঠান কারও মত হল না।"—[পৃঃ ১২০]

অপর একজন হত্যাকারীকে ভূপেন দত্ত শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছে দিলেন। তারপর সেই হত্যাকারী শিলং যেতে পথে বারীনের সাক্ষাৎ পেল। বারীন তখন শিলং থেকে ফিরিবার পথে। এই হত্যাকারী কে? হেমচন্দ্র নিজে! অরবিন্দ ও বারীন্দ্র সম্পর্কে হেমচন্দ্র আগাগোড়াই অতি কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তা করুন। কিন্তু নিজের নামটি তিনি গোপন করিলেন কেন? অপর বিপ্লবীরা ত আত্মচরিতে তা করেন নাই! ভাল কথা নয়।

"শিলং-এর দিক থেকে একখানা টোঙ্গা আসতে দেখা গেল। সেটা পাশ কাটিয়ে যাবার সময় সে (হত্যাকারী অর্থাৎ হেমচন্দ্র) দেখল টোঙ্গাতে একটি চেনা মুখ বসে। সে বারীন। তড়াক করে নেমে গিয়ে বারীনকে জিজ্ঞাসা করল, শিলং থেকে তার ফিরে আসবার কারণ কি? উত্তরে বারীন এই রকম বলেছিল—'শিলং-এ হবে না, গৌহাটি ফিরে আসতে হবে'।" —[পৃঃ ১৩৮]

"ফুলার সাহেবও সেই সময় গৌহাটি যাত্রা করেছিলেন।"—[পৃঃ ১৪২]

অতএব বারীন্দ্রের শিলং যাওয়ার উদ্দেশ্য স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখা গেল। এ বিষয়ে আর কারুরই কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। অরবিন্দের এ সমস্তই জানা ছিল। অরবিন্দের চিঠির অর্থও বুঝা গেল। বেচারী ভূপাল বসু গভর্ণমেণ্টের চাকুরিয়া, জানিতে পারিলে কি কাণ্ডই না হইত!

সেদিন পুলিশের অকর্ম্মণ্যতা ফুলারবধের ব্যর্থ প্রয়াসটি জানিতে পারে নাই। ইনস্পেক্টার পূর্ণ লাহিড়ী সব-জান্তা নয়। রাউলাট কমিটিও ইহার কোনই উল্লেখ করেন নাই। পুলিশ যদি এ খবর জানিত, তবে মিঃ নর্টনও ইহা জানিতেন। এবং অরবিন্দের ৮ই জুনের পত্রের যেরূপ অর্থ তিনি করিয়াছিলেন, তদতিরিক্ত আরো বলিতে পারিতেন যে—

(ক) অরবিন্দ তাঁহার শ্বশুরের নিকট বারীন্দ্রকে অসুস্থতার অছিলায় শিলং পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। উদ্দেশ্য চেঞ্জে যাওয়া নয়, ফুলার বধ। কি সর্ব্বনাশ!

(খ) আর অসুস্থ বারীন্দ্র যে শিলং গিয়া বেকার ঘরে বসিয়া দিন কাটাইবে না—তাহারও আভাস এবং কৈফিয়ৎ তিনি এই পত্রেই খোলাখুলি দিতেছেন, যাহাতে বারীনের ঘুরিয়া বেড়াইবার দরুন অরবিন্দের শ্বশুরের মনে কোনরূপ সন্দেহ না হয়। বেচারী শ্বশুর! এমন সাংঘাতিক জামাতাও কি মানুষের হয়?

বারীন্দ্র বলিয়াছেন (১৭।১০।৪৩)—ভূপাল বসু ইহার কিছুই টের পান নাই।

মি: নর্টনের কথা সত্য যে, অরবিন্দ বারীন্দ্র সম্পর্কে অতিশয় স্নেহপরায়ণ ভ্রাতা। আবার একথাও সত্য যে, অরবিন্দ এই স্নেহের ভ্রাতা বারীন্দ্রকে বিপ্লবের কাজে মৃত্যুর মুখেও পাঠাইতে কোনই দ্বিধা সঙ্কোচ করেন নাই। অরবিন্দের মধ্যে বিপ্লবের প্রেরণা কত বেশী, ইহা হইতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অপর কোন ভারতীয় নেতার মধ্যে বিপ্লবের এইরূপ প্রেরণা দেখা যায় না।

অন্যপক্ষে বারীন্দ্রের সেজ্‌দা-প্রীতির কথাও ভাবিতে হয়। বারীন্দ্র তাঁহার অপরাধ স্বীকারে (confession) অরবিন্দের নাম আগাগোড়াই অতি সন্তর্পণে চাপিয়া গিয়া নিজে খুনখরাপির সকল দায়িত্ব, দলের অপর সকলের সহিত একত্রে অম্লানবদনে গ্রহণ করিয়াছেন। নতুবা অরবিন্দের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত ছিল। অরবিন্দের প্রাণ, বারীন্দ্রের এবং অপর সকল বিপ্লবীদের দান। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি অরবিন্দের কৃতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ দেখিতে পাইতেছি। কি অদ্ভুত, কি বিচিত্র এই জীবন-ইতিহাস !

অরবিন্দের কলিকাতা আগমনের প্রাক্কালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা ঃ ১৯০৫ নভেম্বর কিংবা ডিসেম্বর 'ভবানী মন্দির' প্রকাশ হয়। ১৯০৬ মার্চ্চ "যুগান্তর" কাগজ প্রকাশ হয়। ১৪ই এপ্রিল বরিশাল কনফারেন্স। মে মাসের ১ম সপ্তাহ হইতে ফুলার বধের আয়োজন চলে। ৪ঠা জুন শিবাজী উৎসবে কলিকাতায় তিলকের আগমন হয়। সেই উৎসবের মধ্যেই অরবিন্দ ৮ই জুন তাঁহার শ্বশুরকে বারীন্দ্রের শিলং গমনের বিষয় চিঠি লেখেন। জুলাই মাসে অরবিন্দ আবার বরোদায় যান। ৭ই জুলাই তাঁহাকে বরোদায় দেখা যায়। ১৯০৬ আগষ্টের মাঝামাঝি তিনি কলিকাতায় সম্ভবতঃ রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে বরোদার চাকরি ছাড়িয়া কায়েম হইয়া বসেন। তখন তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ। আর বন্দেমাতরম্ কাগজের সম্পাদক-সঙ্ঘভুক্ত। বন্দেমাতরম্-এর প্রধান সম্পাদক তখন বিপিনচন্দ্র পাল।

গুপ্ত-সমিতির ১ম পর্ব্বে (১৯০২-১৯০৪) অরবিন্দ কলিকাতা আসিয়াছিলেন। ১৯০২ খৃঃ মেদিনীপুরে গিয়া হেমচন্দ্রকে এক হাতে গীতা আর এক হাতে তলোয়ার দিয়া গুপ্ত-সমিতির কার্য্যে দীক্ষা দিয়াছিলেন। পরে যতীন্দ্র ও বারীন্দ্রের মধ্যে নেতৃত্ব লইয়া যে কলহ হয়, তাহা মিটাইয়া দিবার জন্য ১৯০৪ খৃঃ কলিকাতা গ্রে ষ্ট্রীটে আসিয়াছিলেন; এবং ব্যর্থ হইয়া

দেওঘরে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় বরোদায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তখন স্বদেশী, স্বরাজ, বয়কট, জাতীয় শিক্ষার অন্দোলন ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বেই অ.বিন্দ বাংলাদেশে বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তিন বৎসর যাবৎ করিয়া—ফল না পাইয়া, ফিরিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং স্বদেশী, স্বরাজ, বয়কট, জাতীয়-শিক্ষা—ইহার কোন একটাও লইয়া তিনি বাংলায় আসেন নাই। তিনি আসিয়াছিলেন বিপ্লবের পতাকা লইয়া—গুপ্ত-সমিতির বোমা-রিভলভার লইয়া। সরলা দেবী বা মি: পি. মিত্রের বাঁশের লাঠি লইয়াও তিনি আসেন নাই। কি চরমপন্থী নেতার দল, কি বাঁশের লাঠি ঘুরান কুস্তি বা ব্যায়ামের আখড়ার সেনাপতি দল, ইহাদের হইতে অরবিন্দ প্রথম পর্ব্বের প্রবেশমুখেই অত্যন্ত পৃথক্। কিন্তু ১ম পর্ব্বের ব্যর্থতা অরবিন্দের প্রাণে খুব লাগিয়াছিল। তিনি পরবর্ত্তীকালে এই সম্পর্কে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন —

"When I went to Bengal three or four years before the Swadeshi movement was born, and what I found was *apathy and despair.*" —*19th January, 1908—Bombay Lecture.*

তখন স্বদেশী আন্দোলন জন্মে নাই। কিন্তু ১৯০৬ খৃ:র প্রথম তিন মাসের মধ্যে যখন তিনি আসিলেন, এবং জুলাই মাসে বরোদায় ফিরিয়া গিয়া আবার যখন আগষ্টের মাঝামাঝি কলিকাতায় কায়েম হইয়া বসিলেন —তখন? তখন স্বদেশী আন্দোলনের ভরা জোয়ার—"এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? হরে মুরারে, হরে মুরারে"। বাঙ্গালীর বিংশ শতাব্দীর স্বদেশী আন্দোলনের তখন প্রজ্জ্বলিত অবস্থা। অরবিন্দ এই প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় আসিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। তিনি উত্তরপাড়া বক্তৃতায় পরবর্ত্তীকালে (May, 1909) বলিয়াছেন—"Swadeshi began and I was drawn into the public field." সুতরাং স্বদেশীর প্রজ্জ্বলিত অবস্থাই তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল, বরোদা হইতে টানিয়া আনিয়াছিল—ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়বারে তিনি কোন apathy বা despair দেখেন নাই, বা আক্ষেপও করেন নাই। বরং বাংলার পক্ষ হইয়া অন্য প্রদেশের নিকট গর্ব্বই প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু অরবিন্দের আগমনের সময় অথবা তার কিছু পূর্ব্বে স্বদেশীর এই প্রজ্জ্বলিত অবস্থা কোন্ কোন্ শিখা বিস্তার করিয়াছিল ?

অনেক নূতন রকমের কথা, নূতন রকমের মতবাদ—যা আগে কখনও শুনা যায় নাই, তাহা এই প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় শিখা বিস্তার করিল।

রবীন্দ্রনাথ ঃ রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ আগমনের পুরা দুই বৎসর আগে ১৯০৪।২২শে জুলাই যে "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধ দুই দুইবার পাঠ করিয়াছিলেন, তাতে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে প্রকারান্তরে 'বয়কট' করার কথাই ছিল। গ্রীকজাতি ষ্টেটের (State) উপর সর্ব্ববিষয়ে নির্ভর করিত ; আমরা ষ্টেট্ নয়, সমাজের উপর নির্ভর করি। আমরা সমাজে আত্মনির্ভরশীল হইব, স্বাধীন হইব। ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের অধিকাংশ কাজ আমরা গভর্ণমেণ্ট-নিরপেক্ষ হইয়া নিজেরাই করিব। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট একঘরে হইয়া যাইবে, একেবারে কোণঠাসা হইয়া পড়িবে। যারা স্বদেশী সমাজের অবাধ্য হইয়া গভর্ণমেণ্টের দিকে যাইবে, আমরা সেইসকল দেশদ্রোহীদের হুঁকা-নাপিত-ধোপা বন্ধ করিয়া সামাজিক বয়কট দ্বারা শাস্তি দিব। এই গভর্ণমেণ্টের আবরণের অন্তরালে আমরা স্বদেশী সমাজরূপে নিজেদের আর একটা স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট তৈয়ার করিয়া লইব। ইহা ১৯০৫।৭ই আগষ্ট, 'বয়কট' ঘোষণার পুরা এক বৎসর আগের কথা। রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ" যদি বাস্তব-ক্ষেত্রে সত্যি কার্য্যে পরিণত হইত, তবে তার দুই বৎসর পর ১৯০৬ খৃঃর প্রথম ভাগে অরবিন্দ কলিকাতা আসিয়া দেখিতে পাইতেন যে, বাংলাদেশে সমান্তরাল রেখায় একই সময়ে দুইটি গভর্ণমেণ্ট চলিতেছে—একটি ইংরেজের আর একটি "স্বদেশী সমাজের"। এই রকম নূতন ধরণের কথা তখন বা তারপরেও কোনদিন ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে শুনা যায় নাই। বাঙ্গালী ভিন্ন অপর প্রদেশের লোকেরা ইহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলনের শিখাগুলি দ্বারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মশালগুলি জ্বলিয়া ত উঠেই নাই, বরং কাশী (১৯০৫), কলিকাতা (১৯০৬), সুরাট (১৯০৭), মাদ্রাজ (১৯০৮) কংগ্রেসের ইতিহাস পড়িলে স্পষ্ট দেখা যায় যে—এক মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলক ছাড়া অপর সকল প্রদেশের মাতব্বর মহরত নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করিয়া মিঃ মেহেতা গোখলে, মালব্য প্রভৃতি একসঙ্গে ফুৎকার দিয়া বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলনের শিখাগুলিকে একে

একে নির্ব্বাপিত করিবার চরম ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। অবশ্য বাংলাদেশেও তখন মাতব্বর "বিভীষণ" যে দু'চারজন ছিল না—এমন নয়। বিভীষণ সব দেশেই থাকে, বাংলাদেশেও ছিল এবং আছে। থাকিবেও।

পরবর্ত্তীকালে বিপিনচন্দ্র এবং অরবিন্দ উভয়েই ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে বৈদান্তিক ''মায়া" (Illusion) বলিয়া উড়াইয়া দিবার কথা বহুক্ষেত্রে বলিয়াছেন। খুব সহজ উপায় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরেজের গভর্ণমেণ্ট থাকা সত্বেও আমরা যে স্বত ন্ত্র নিজেদের একটা "সমাজ"—গভর্ণমেণ্ট তৈয়ার করিয়া স্বাধীনভাবে কাজ চালাইতে পারি, একথা সর্ব্বপ্রথম বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় 'ঘুষির পরিবর্ত্তে ঘুষি' দিয়া ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে এদেশ হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা ছিল না। ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে কোণঠাসা করিবার ব্যবস্থাই ছিল। 'ঘুষাঘুষি'তে এর চেয়ে বেশী আর কী হইতে পারে? কিন্তু অরবিন্দ ১৯০৬ খৃঃ কলিকাতা আসিয়াই গুপ্তহত্যা ও রাজনৈতিক ডাকাতির বৈপ্লবিক কার্য্য, বারীন্দ্র ও হেমচন্দ্রকে দিয়া মে-জুন-জুলাই মাসে স্পষ্ট আরম্ভ করিয়া দিলেন। অরবিন্দ সোজা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ চান—ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট থাকে থাকুক, এ ভাব নয়। রবীন্দ্রনাথ হইতে অরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক। রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী নহেন, অরবিন্দ পুরাদস্তুর বিপ্লবী। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় বোমা রিভলভার গুপ্তহত্যা ডাকাতি—এসব কিছুই নাই, দেখা যায় না। অথচ অরবিন্দ ইহার প্রবর্ত্তক। স্বদেশী আন্দোলনের প্রজ্বলিত অবস্থায় ইহাই অরবিন্দের নিজস্ব নুতন শিখা এবং ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক।

বিপিনচন্দ্র ঃ ১৯০১ খৃঃর শেষভাগে বিপিনচন্দ্র আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিলেন। কিন্তু আমেরিকাবাসী এক বন্ধুর কথায় তিনি ধর্ম্মপ্রচার ছাড়িয়া দিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কেননা, তিনি বুঝিলেন যে—সকল সাধনার আগের সাধনা, পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা। দেশ স্বাধীন না হইলে, পরাধীন দেশের ধর্ম্মকথা স্বাধীন দেশের লোকেরা শুনিবে না। বটেই ত!

১৯০১ খৃঃ কলিকাতা কংগ্রেস হয়। ওয়াচা সভাপতি হন। বিপিন-চন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। ১৯০৬ খৃঃ-এও কলিকাতায় কংগ্রেস হয়। সে কংগ্রেসেও বিপিনচন্দ্র শুধু উপস্থিত ছিলেন না, 'বয়কটের' যে মারাত্মক

ব্যাখ্যা তিনি করেন, তাতে বংলার স্বদেশী আন্দোলনের চরমপন্থী রাজনীতি বিপিনচন্দ্রের মুখ দিয়া একেবারে চরম কথা বলিয়া ফেলে। অর্থাৎ বয়কট শুধু বিলেতী কাপড় বা নুনের বিরুদ্ধে নয়। তবে? বয়কট অর্থ—ইংরেজ শাসনকে বর্জন। সর্ব্বনাশ। ১৯২৯ খৃঃ লাহোরে গান্ধীজীর পরিচালনায় কংগ্রেস কত ভয়ে ভয়ে স্বাধীনতার কথা বলিয়াছিল। ১৯০৬ হইতে ১৯২৯, একেবারে ২৩ বৎসর পরের দূরাগত প্রতিধ্বনি।

বিপিনচন্দ্র নিউ ইণ্ডিয়া ছয় বৎসর (১৯০২-১৯০৭) চালান। সুতরাং ১৯০৬ আগষ্ট মাসে নিউ ইণ্ডিয়া ৫ম বর্ষে পদার্পন করিয়া সদর্পে চলিতেছে। অরবিন্দের আগমনের পুরা ৫ বৎসর আগে হইতেই বিপিনচন্দ্র বাংলার চরমপন্থী রাজনীতির দার্শনিক ব্যাখ্যা করিতেছেন। মিঃ সি. আর. দাশের বাড়ীতে যে চরমপন্থী 'স্বদেশী মণ্ডলী' ১৯০৫ খৃঃ ২৪শে ডিসেম্বর জন্মলাভ করিয়াই কাশী কংগ্রেস অভিমুখে ধাবিত হয়—সেই মণ্ডলীটির নেতা বিপিনচন্দ্র। অবশ্য ১৯০৬ খৃঃ কলিকাতা কংগ্রেসে অরবিন্দও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন বক্তৃতা করেন নাই, শুধু চুপ করিয়া বসিয়া-ছিলেন। বাংলার চরমপন্থী রাজনীতিতে বিপিনচন্দ্রই অগ্রগামী, অরবিন্দ বিপিনচন্দ্রের পশ্চাৎগামী! নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance) প্রথম প্রচার করেন বিপিনচন্দ্র। অরবিন্দ বিপিনচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া পরে চরম-পন্থীদের আদর্শ ও উপায় হিসাবে ইহার সমর্থন করেন। অরবিন্দ নিজেই একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, বিপিনচন্দ্রই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (passive resistance) সর্ব্বপ্রথম প্রচারক। কিন্তু ভারতবর্ষের বিপ্লবপন্থীরা তাঁহাকে আদৌ পছন্দ করেন না ("The man most detested and denounced by the Indian Revolutionary organisation now active at Paris, Geneva and Berlin is *Srijut Bepin Chandra Pal, the prophet and first preacher of passive resistance.*"—The New Policy—Karmayogin; 22nd January, 1910)। বিপ্লবীরা বিপিনচন্দ্রকে দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না—ইহা অরবিন্দের নিজের লেখা হইতেই আমরা পাইতেছি।

অরবিন্দের আগমনের পূর্বে ১৯০৫।৭ই আগষ্ট বাঙালী বয়কট ঘোষণা করিয়াছে। কাশী কংগ্রেসে (১৯০৫) ইহা ঢোক গিলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

কলিকাতা কংগ্রেসে (১৯০৬) বয়কট—ইংরেজ শাসন বর্জ্জন পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ইহা বিপিনচন্দ্রই করিয়াছেন। বাংলার এবং অন্য প্রদেশের প্রবীণ মডারেট নেতাগণ সামাল সামাল রব তুলিয়াছেন। কলিকাতায় নৌরজী কংগ্রেসের (১৯০৬) মাত্র ৪ মাস বাকী, এমন সময় অরবিন্দ বিপিনচন্দ্রকে সম্মুখে রাখিয়া বন্দেমাতরম্-এর সম্পাদক-সঙ্ঘে প্রবেশ করিলেন।—প্রকাশ্য চরমপন্থী রাজনীতিতে অরবিন্দের প্রবেশের তারিখ—১৯০৬ খৃঃ, আগষ্ট। তার পূর্ব্বে নয়।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ঃ ১৯০৫।৭ই আগষ্টের আগেই উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' বাহির করেন। সুতরাং বয়কটের আগেই 'সন্ধ্যা'র আগমন হয়। ১৯০৫।৭ই আগষ্ট হইতে ১৯০৬।৭ই আগষ্ট, পুরা এক বৎসর ধরিয়া সন্ধ্যা চলতি কথায় ইংরেজকে ফিরিঙ্গী বলিয়া অজস্র গালাগালি দিয়া রীতিমত ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার করেন। সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা অরবিন্দের আগমনের পুরা এক বৎসর আগে হইতেই উপাধ্যায়ের প্রচারিত ইংরেজ-বিদ্বেষের বাষ্প দ্বারা বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা রবীন্দ্রনাথ বিপিনচন্দ্র করেন নাই। ইহা করিয়াছেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।

উপাধ্যায় সর্ব্বপ্রকারে ইংরেজের অর্থাৎ ফিরিঙ্গীর সংস্রব বর্জ্জন করিতে বলেন। এমন নির্জলা নিরঙ্কুশ অসহযোগ গান্ধীযুগেও বাংলাদেশে প্রচার করা হয় নাই। এবং এমন ইংরেজ-বিদ্বেষও আর কেহ প্রচার করেন নাই। অরবিন্দ আসিবার পূর্ব্বেই "গোলদীঘির গোলামখানাতে প্রস্রাব করিয়া দিয়া আসিবার জন্য" উপাধ্যায় অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ লেখা সন্ধ্যায় বাহির করেন। ১৯০৫ খৃঃ উপাধ্যায় 'A National College' নাম দিয়া জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা করিয়া এক চটিগ্রন্থ বাহির করেন। অরবিন্দ যে-কালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন, ইহা তাহার এক বৎসর আগেকার ঘটনা। তখনকার ছাত্র-আন্দোলনে উত্তেজনা যোগাইত 'সন্ধ্যা'। এমনটি আর কেহ পারিত না।

"উপাধ্যায় ১লা আগষ্ট হইতেই জাতীয় দলের ইংরেজী দৈনিকপত্র প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলেন। ১লা 'বন্দেমাতরম্' প্রকাশিত হইল না বটে, কিন্তু ৭ই আগষ্টের পূর্ব্বেই তাহার ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হইল।"—[কংগ্রেস, পৃঃ ১৭০ —হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ]

যে 'বন্দেমাতরম্' পরবর্তীকালে (১৮ই অক্টোবর ১৯০৬ খৃঃ হইতে ৩০শে এপ্রিল ১৯০৮ খৃঃ) ১ বৎসর ৫ মাসকাল যাবৎ অরবিন্দের বাহন হইয়াছিল, যে বন্দেমাতরম্-এর লেখার মধ্যে অরবিন্দের তৎকালীন রাজনৈতিক মতবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সেই বন্দেমাতরম্-এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অগ্রণী উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।

বিপিনচন্দ্র বরিশাল কনফারেন্সে (১৯২১) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এক হিসাবে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব এই আন্দোলনের স্রষ্টা। বিপিনচন্দ্র বহুবচন ব্যবহার করেন নাই ("Upadhyaya Brahmabandhav was, in some sense, the founder of that movement.")। শ্রীমতিলাল রায় উপাধ্যায়কে স্বদেশীর 'বাউল' বলিয়াছেন।

উপাধ্যায়, অরবিন্দ আসিবার আগে হইতেই 'A National College' আর 'বন্দেমাতরম্' প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ব্যক্তি। ২৭ অক্টোবর ১৯০৭ খৃঃ হাসপাতালে উপাধ্যায়ের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। অরবিন্দ মাত্র এক বৎসরকাল উপাধ্যায়ের সহিত রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করিয়াছেন।

কিন্তু উপাধ্যায় কি অরবিন্দের মত বিপ্লববাদী এবং বিপ্লবী ছিলেন? এর জবাব এককথায় দেওয়া সম্ভব নয়। ছেলেবয়সে যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার জন্য তিনি দুই দুইবার গোয়ালিয়রে পলাইয়া গিয়াছিলেন। যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার জন্য অরবিন্দ যতীন্দ্র ব্যানার্জ্জীকে গায়কবাড়ের সৈন্যশ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। প্রকাশ্য যুদ্ধ বা বিদ্রোহের জন্যই লুকাইয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু 'যুগান্তরের আড্ডায়' যে বোমা তৈরী হয়, একথা উপাধ্যায় পরে শুনিতে পান। এবং সেখানে গিয়া অবিনাশ ভট্টাচার্য্যকে বলেন—"আমাকে একটা বোমা দাও, আমি উহা প্রথম ছুড়িব" ("I shall be the first bomb-thrower.")। সুতরাং গুপ্ত-সমিতির বৈপ্লবিক কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি ছিল। কিন্তু হাতেকলমে তিনি কোন দিন বোমা-রিভলভার ছুড়েনও নাই, গুপ্তসমিতির গোপনপরামর্শেও তিনি কোন দিন যোগ দেন নাই।

তবে? বিপিনচন্দ্র যেরকম স্পষ্ট গুপ্ত-সমিতির হত্যাকার্য্য ও ডাকাতির বিরোধী ছিলেন, উপাধ্যায় ততটা ছিলেন না। আবার অরবিন্দ যেমন সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ না-করিয়া নিঃসংশয়ে আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ মুকুল চন্দ্র দে'কে

বলিতে পারিয়াছেন, "আমি বিপ্লবী ছিলাম, বিপ্লবীদের সঙ্গে কাজ কর্ত্তুম"—উপাধ্যায় তাহা বলিতে পারিতেন না। অরবিন্দের মত বিপ্লবী উপাধ্যায় ছিলেন না। আবার তিনি বিপিনচন্দ্রের মত বিপ্লব-বিরোধীও ছিলেন না।

ভগিনী নিবেদিতা: ১৯০২।আগষ্ট হইতে ১৯০৬।আগষ্ট পর্য্যন্ত, পুরা চার বৎসর ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দ আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্বদেশী আন্দোলনের চরমপন্থী রাজনীতিতে শুধু যোগ দেন নাই, নেতৃত্ব করিয়াছেন এবং তরুণদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিয়াছেন। নিবেদিতা 'নিউ ইণ্ডিয়া'তে লিখিতে গিয়া বিপিনচন্দ্রের সহিত ১৯০৪ খৃ:র পূর্ব্বেই পরিচিত হন। এই বৎসর হইতেই তিনি "ডন সোসাইটিতে" জাতীয়তা, জাতীয় শিক্ষা ও বিপ্লববাদ সম্বন্ধে উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দিতে থাকেন, এবং ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশ মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন। ১৯০২ খৃঃ-এর পূর্ব্বেই তিনি ব্যারিষ্টার স্বরেন্দ্রনাথ হালদারের মারফৎ মিঃ পি. মিত্র (তখন তিনি বাংলার গুপ্ত সমিতির প্রধান সভাপতি) ও মিঃ সি. আর. দাশের সহিত পরিচিত হন। এই সময় ওকাকুরাও কলিকাতায় প্রাচ্যপ্রীতির সঙ্গে বিপ্লবের বীজ ছড়াইয়াছিলেন। নিবেদিতা মিঃ ওকাকুরার সহিত একসঙ্গে কাজ করিয়াছেন। ঠাকুরবাড়ীর বিপ্লববাদী স্বরেন ঠাকুরের সহিতও নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। স্বতরাং অরবিন্দের আগমনের চারি বৎসর আগে হইতেই নিবেদিতা বাংলাদেশে চরমপন্থী ও বিপ্লববাদী নেতাদের সংস্পর্শে আসিয়া পুরাদমে কাজ করিতেছেন।

১৯০৫।১১ই ফেব্রুয়ারী লর্ড কার্জ্জনের কনভোকেশন সভায়, ১৯০৫।৭ই আগষ্টের বয়কট সভায়, ১৯০৫।১৬ই অক্টোবরের মিলন মন্দিরের ভূমিতে রাখী-বন্ধনের সভায় চিঠিতে সহানুভূতি জানাইয়া এবং পান্তির মাঠে বহু সভায় ভগিনী নিবেদিতাকে আমরা সশরীরে উপস্থিত দেখিতে পাই। পান্তির মাঠে বক্তৃতা দিতেও দেখিতে পাই। এই সমস্তই অরবিন্দ আগমনের আগেকার কথা। অরবিন্দ আসিয়া ভগিনী নিবেদিতাকে গলদঘর্ম্ম অবস্থায় সম্পূর্ণ সক্রিয় দেখিতে পাইলেন। তিনি শুধু বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে এক সংকীর্ণ গলির মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া একটি ক্ষুদ্র পাঠশালায় কয়েকটি অতি দরিদ্র মেয়েকে পড়াইতেছেন না। ১৯০২ খৃঃ অক্টোবরে যখন নিবেদিতা বরোদা গমন করিয়াছিলেন,

তখনই অরবিন্দের সহিত নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এবং বারীন্দ্রকুমার বলেন—'Nivedita···connected with us since her Baroda visit.' বরোদা গমনের পর হইতেই নিবেদিতা যতীন্দ্র এবং বারীন্দ্র পরিচালিত অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত ১ম পর্ব্বের গুপ্তসমিতির উপর সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া তাঁহার নিজের রচিত এবং অন্যান্য আরো অনেক গ্রন্থ বারীন্দ্রদের সমিতিকে উপহার দেন। যোগাযোগ ও সহানুভূতি স্পষ্ট বুঝা গেল। সুতরাং ১৯০৬ মে-জুন-জুলাই অরবিন্দ যখন ২য় পর্ব্বের বৈপ্লবিক কার্য্য কলিকাতায় আসিয়া আরম্ভ করিলেন, তখন ইহা নিবেদিতার অবিদিত ছিল মনে হয় না (* ক)। ১৯০৬-এর প্রথমভাগে কলিকাতা আসিয়া অরবিন্দ ২য় পর্ব্বে ভগিনী নিবেদিতার নিকট বৈপ্লবিক কর্ম্মে সহানুভূতিই পাইয়াছেন। বিপ্লবের ব্যাপারে নিবেদিতা বিপিনচন্দ্র হইতে পৃথক্। রবীন্দ্রনাথ বা বিপিনচন্দ্রের নিকট এরূপ সহানুভূতি অরবিন্দ আশা করেনও নাই এবং পানও নাই।

অরবিন্দ ২য় পর্ব্বে কলিকাতা আসিয়া, বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এমন কি উপাধ্যায় অপেক্ষাও নিবেদিতার নিকট যে বেশী সহানুভূতি পাইয়াছিলেন, ইহা নিশ্চিত। কেননা, ভগিনী নিবেদিতাও অরবিন্দের মতই বিপ্লবী ছিলেন। এই সাক্ষাৎচণ্ডী, তেজস্বিনী আইরিশ কুমারী শুধু আয়রল্যাণ্ডের সিন্‌ফিন্ নয়, রাশিয়ার বৈপ্লবিক পদ্ধতিতেও ওয়াকিবহাল এবং পরিপক্ক ছিলেন। এতটা পরিপক্ক অরবিন্দও ছিলেন কি-না সন্দেহ। কেননা, বিলাতে থাকাকালে অরবিন্দ কোন বিপ্লবের কাজে হাত দেন নাই, নিবেদিতা দিয়াছিলেন। এইখানে পার্থক্য।

(* ক) অরবিন্দ ১ম পর্ব্বে গুপ্তসমিতির কাজে দীক্ষা দিয়া বারীন্দ্রকে কলিকাতা পাঠাইয়াছিলেন ১৯০২ খৃঃর "মাঝামাঝি বা শেষাশেষি"। তার ছয় মাস আগে পাঠাইয়াছিলেন যতীন্দ্র ব্যানার্জ্জীকে। বারীন্দ্র লিখিয়াছেন—

"বরোদা থেকে বিপ্লবের দীক্ষা নিয়ে আমি (বারীন্দ্র) এসেছিলুম কলকাতায়, সে হচ্ছে ১৯০২ সালের বোধ হয় মাঝামাঝি বা শেষাশেষি। তার ছয় মাস আগে ঠিক ঐ গায়কবাড়ের বরোদা থেকেই সেই একই গুপ্ত সমিতির কাজে দীক্ষা নিয়ে যতীনদা এসে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন।"
—[বোমার কাহিনী—স্বদেশ, কার্ত্তিক, ১৩৩৮]

বারীন্দ্র অরবিন্দের নাম চাপিয়া গেলেন, কিন্তু পরে আমাদের নিকট স্বীকার করিয়াছেন।

১৯০৬।মার্চ্চ হইতে ১৯২০।ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত, চারি বৎসর অরবিন্দ বাংলাদেশে রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াছেন। তার মধ্যে ১৯০৮।২রা মে হইতে ১৯০৯।৬ই মে পর্য্যন্ত, পুরা এক বৎসর তিনি বোমার মামলায় জেলে আবদ্ধ ছিলেন। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে অরবিন্দ তিন বৎসর বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করিয়াছেন। ১৯১০।ফেব্রুয়ারীর শেষপ্রস্থানের দিন পর্য্যন্ত ভগিনী নিবেদিতার সহিত অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। নিবেদিতার পরামর্শেই অরবিন্দ ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ১৯১০।ফেব্রুয়ারীশেষে অর্থাৎ ফাল্গুনের মাঝামাঝি প্রথমে চন্দননগর শ্রীমতিলালের গৃহে—পরে লুকাইয়া পণ্ডিচেরী গিয়া পৌছেন ৪ঠা এপ্রিল, ১৯১০। শ্রীমতিলাল রায় লিখিয়াছেন, "সিষ্টার নিবেদিতার পরামর্শে, পরিশেষে অজ্ঞাত বাস"—(শতবর্ষের বাংলা, পৃ: ৯২)। সিষ্টার নিবেদিতা ও অরবিন্দ—এক লুপ্ত ইতিহাস। খুঁজিলে অনেক কিছু পাওয়া যাইবে।

সুতরাং ১৯০৬।আগষ্ট মাসে অরবিন্দ যখন কলিকাতায় কায়েম হইয়া বসিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ বিপিনচন্দ্র উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ভগিনী নিবেদিতা কে কী কার্য্য করিতেছেন—সংক্ষেপে দেখা গেল। কেননা, অরবিন্দ ইঁহাদের মধ্যেই পরবর্ত্তী চারি বৎসর কাজ করিবেন এবং সেই কাজের মধ্য হইতেই চিরদিনের জন্য বিদায় লইবেন।

ডন্ সোসাইটি (Dawn Society) ঃ ১৯০২-১৯০৬। ডন্ সোসাইটির সহিত অরবিন্দের কোন সম্পর্ক নাই সত্য, কিন্তু যে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে তিনি ১৯০৬।১৫ই আগষ্ট অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন—ডন্ সোসাইটি আত্মদান করিয়া সেই জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে জন্ম দিয়াছিল, গড়িয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং ডন্ সোসাইটি করিল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, সেই ভিত্তির উপর মন্দির উঠিল জাতীয় শিক্ষার, সেই মন্দিরের প্রথম ও প্রধান পূজারী হইলেন অরবিন্দ। এই হিসাবে ডন্ সোসাইটির সহিত অরবিন্দের যে যোগাযোগ, তারই উপর নির্ভর করিয়া ডন্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশ মুখোপাধ্যায়কে অরবিন্দের বোমার মামলায় সাক্ষী পর্যন্ত দিতে হইয়াছিল। মিঃ সি. আর. দাশের বক্তৃতায় বহুবার সতীশ মুখোপাধ্যায়ের নামের উল্লেখ রহিয়াছে।

১৮৯৩ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোতে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়ভেরী নিনাদিত করেন। অরবিন্দ বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া 'ইন্দু-প্রকাশে' New Lamps

For Old ধারাবাহিক প্রবন্ধে ভারতবাসীকে কংগ্রেসের 'আবেদন-নিবেদন' নীতি পরিত্যাগ করিয়া প্রোলিটেরিয়েটদের কংগ্রেসে আহ্বান করিয়া জাতিকে অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্র হইয়া ('purification by blood and fire') স্বাধীনতা লাভ করিতে বলেন। আর সতীশ মুখোপাধ্যায় ইংরেজীতে মাসিক 'ডন্' পত্রিকা প্রকাশ করিয়া বলেন যে—আমরা হিন্দুরা প্রাচ্য এবং আধ্যাত্মিক, আর য়ুরোপ-আমেরিকা জড়বাদী। জড়বাদ অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আমরা শ্রেষ্ঠ। সতীশবাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। বিপিন পাল এবং অশ্বিনী দত্ত তাঁহার গুরুভাই। ১৮৯৩ খৃঃ একই বৎসরে এই তিনটি ঘটনা ঘটে। গত শতাব্দীর শেষ দশকে যাহার আরম্ভ, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে আমরা তাহার পরিণতি দেখিতে পাই। দুই শতাব্দীর মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন যোগ-সূত্র আছে, তাহাও লক্ষ্য করিতে পারি। সুতরাং অরবিন্দের জীবন-ইতিহাস ১৮৯৩ খৃঃ হইতেই ধরিতে হইবে।

ডন্ পত্রিকা দশ বৎসর চলিবার পর ১৯০২ খৃঃর মাঝামাঝি সতীশবাবু ডন্ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটি ১৯০৬।আগষ্ট মাসে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কুক্ষিগত হইয়া আত্মবিসর্জন করে। সুতরাং ডন্ সোসাইটির পরমায়ু ৪ বৎসর মাত্র। কিন্তু ডন্ পত্রিকা ১৯১৩ খৃঃ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। সুতরাং ১৮৯৩ হইতে ১৯১৩, বিশ বৎসর ইহার পরমায়ু। ডন্ পত্রিকার ৮ কিংবা ৯ বৎসর পরে ১৯০১।ডিসেম্বরের কিছু আগে বিপিনচন্দ্র সাপ্তাহিক 'নিউ ইণ্ডিয়া' প্রকাশ করেন। ডন্ পত্রিকা মাসিক পত্র।

১৯০২ খৃঃএ—ডন্ সোসাইটী ভূমিষ্ঠ হয়, বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব অক্সফোর্ডে বেদান্তের বক্তৃতা দিতে গমন করেন, ভগিনী নিবেদিতা বিপিনচন্দ্রের নিউ ইণ্ডিয়াতে লেখনী ধারণ করেন, আর অরবিন্দ বরোদা হইতে বাংলায় আসিয়া মেদিনীপুরে গিয়া কাঁকড়পূর্ণ গর্ত্তে ঢুকিয়া বন্দুক ছোড়া শিখাইয়া গুপ্ত সমিতির ১ম পর্ব্ব উদ্বোধন করেন। ডন্ সোসাইটি বিপ্লববাদ প্রচার করে, গুপ্তসমিতি সৃষ্টি করে না। গীতার বক্তৃতা হয় বটে, কিন্তু শুধু গীতা। আর এক হাতে তলোয়ার নাই। যে গীতার সহিত তলোয়ার নাই, ১৯০২ খৃঃ অরবিন্দ সে গীতা প্রচার করেন নাই। কাজেই ডন্ সোসাইটির সহিত বিপ্লবী অরবিন্দের সম্পর্ক ১৯০২ খৃঃএ নাই। আর ১৯০৬ খৃঃএ-ও তাই।—অর্থাৎ, নাই। কেননা, সতীশবাবুর নৈষ্ঠিক ভক্তবৃন্দ রাধাকুমুদ

মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ বা বিনয় সরকার—ইঁহারা কেহই ১৯০৬।মে-জুন-জুলাই অরবিন্দের গুপ্তসমিতিতে ভর্ত্তি হইয়া ফুলারবধের জন্য নিজেদের পৈতৃক প্রাণটা বেঘোরে অপঘাত-মৃত্যুতে বিসর্জ্জন দিবার জন্য শিক্ষা সতীশবাবুর নিকট পান নাই বা সেজন্য তাঁহারাও প্রস্তুত ছিলেন না। অরবিন্দ সতীশ মুখোপাধ্যায় হইতে পৃথক্।

তবে ভগিনী নিবেদিতা ডন্ সোসাইটিতে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে কিছুই কসুর করেন নাই, ইহা সত্য। কিন্তু নিবেদিতার বক্তৃতায় ডন্ সোসাইটিতে বিপ্লববাদ প্রচার হইলেও, ডন্ সোসাইটি গুপ্তসমিতি গঠন করে নাই। অরবিন্দ তাহা করিয়াছেন—প্রকাশ্যে না হইলেও, বারীন্দ্রের মারফৎ 'যুগান্তর' পত্রিকার সাহায্যে। অরবিন্দ যুগান্তরে নিজে প্রবন্ধও দিতেন—নাম লুকাইয়া। ১৯০৬।মার্চ্চ মাসে যুগান্তর প্রথম প্রকাশ হয়। ডন্ সোসাইটির জাতীয় শিক্ষা পরিষদে আত্মবিসর্জ্জন করিতে তখনো চারি মাস বাকী। অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা পরিষদে অধ্যক্ষ হইবার পর, ডন্ সোসাইটির আর কোনই অস্তিত্ব থাকিল না।

ডন্ সোসাইটির প্রসঙ্গে, বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ডিরোজিও'র কথা মনে পড়ে। হিন্দু কলেজের সহিত ডন্ সোসাইটি বা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের তুলনা হইতে পারে। ডিরোজিও'র সহিত সতীশবাবু এবং অরবিন্দেরও তুলনা হইতে পারে। উনবিংশের সহিত বিংশ শতাব্দীর আদর্শ, পরিস্থিতি এবং কালপুরুষের (Zeit-guiest) তফাৎ কোথায়, তাহাও বুঝা যাইতে পারে। ডিরোজিও'র সময়ের হিন্দুয়ানী—সতীদাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ, বিধবার ভ্রূণহত্যা প্রভৃতিতে গুলজার। কাজেই তাহা বর্জ্জনের ভেরী নিনাদিত হইয়াছিল। আর সতীশবাবু বা অরবিন্দের সময়ের হিন্দুয়ানী—ব্রাহ্ম-সংস্কারের পর স্বামী-বিবেকানন্দের দ্বারা সংশোধিত হিন্দুয়ানী। এই দুই হিন্দুয়ানী এক বস্তু নয়। ইহা লক্ষ্য রাখিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যদের হিন্দুয়ানীকে বিচার করিতে হইবে। নতুবা সত্যনিষ্ঠায়, চরিত্রের দৃঢ়তায়, স্বদেশনিষ্ঠায়, ডিরোজিও শিষ্যদের যুক্তিবাদ, নাস্তিকতা—সতীশবাবু বা অরবিন্দের যুগের ভক্তিবাদ, অবতারবাদ, লীলাবাদ, অলৌকিকে বিশ্বাস, এমন কি রাজনৈতিক বিপ্লববাদের কাছেও মাথা নীচু করিবে বলিয়া মনে হয় না। ডিরোজিও শিষ্যেরাও খ্যাতনামা কীর্ত্তিমান পুরুষ। ধর্ম্মে ও সমাজে—তাঁহারাও

বিপ্লববাদী। বাঙ্গালী উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম্ম ও সমাজে বিপ্লবের কথা শুনিয়াছে। পরে বিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রে বিপ্লবের কথা শুনিয়াছে।

ডন্-সোসাইটির আস্তানা ছিল কোথায়? পান্তির মাঠ সংলগ্ন মেট্রোপলিটন কলেজের কাছে, একটি ছাত্রাবাসে। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ওপারে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শিবনারায়ণ দাসের গলির ভিতরে। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব আর সতীশবাবুর তত্ত্বাবধানে সোসাইটির মেসটি চলিত। একই বাড়ীর একতলায় 'ফীল্ড এণ্ড একেডেমী ক্লাব' আর দোতলায় 'ডন্ সোসাইটি'—এই দুইটি ছিল নেপথ্য। আর প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ ছিল সম্মুখেই ইতিহাস-বিশ্রুত 'পান্তির মাঠ'। অরবিন্দ আসিয়া যোগদানের পূর্ব্বে এই স্থান ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করিয়া স্বদেশী আন্দোলন প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। অরবিন্দ আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির ২য় পর্ব্ব চাঁপাতলায় যুগান্তরের আড্ডায় ১৯০৬। মার্চ্চ মাসে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। গুপ্তসমিতি স্বদেশী আন্দোলনের প্রজ্জ্বলিত অবস্থার সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক শিখা।

ফীল্ড এণ্ড একেডেমী ক্লাবঃ ১৯০৫।৯ই নভেম্বর এই ক্লাবের উদ্যোগে পান্তির মাঠে যে সভা হয়, সেই সভায় সুবোধ মল্লিক সভাপতি হইয়া জাতীয় শিক্ষার জন্য একলক্ষ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। বিপিন পাল ছাত্রদের সহিত যুক্তি করিয়া সুবোধ মল্লিককে এই দানের জন্য 'রাজা' উপাধি দেন। ইহা আমরা যথাস্থানে বলিয়াছি। সুতরাং অরবিন্দ আসিবার পূর্ব্বেই এই ক্লাবকেও আমরা পাই এবং রাজা-সুবোধ মল্লিককেও পাই। অরবিন্দ এই রাজা সুবোধ মল্লিকের ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ীতে আসিয়াই উঠেন এবং প্রথমদিকে বেশ কিছুদিন বসবাসও করেন।

অরবিন্দের সহিত এই ক্লাবের রাজা সুবোধ মল্লিকের পরবর্ত্তীকালে যে নিগূঢ় যোগাযোগ হইয়াছিল, তাহা ডন্ সোসাইটির সতীশবাবুর সহিত হয় নাই। অরবিন্দ নীরব বিপ্লবী। তিনি আড্ডার মানুষ নহেন। বক্তৃতা করেন না। ক্লাব তাঁহার পোষায় না। রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতেই অনেক গোপন রাজনীতির সলাপরামর্শ হইত, অরবিন্দ তাহাতে থাকিতেন। চুপ করিয়া শুনিতেন, কখনো বা কিছু বলিতেন—এই পর্য্যন্ত। বক্তৃতাবাগীশ তিনি কোনকালেই ছিলেন না। এই ক্লাবে বিপিন পাল ছিলেন আর ছিলেন তরুণ ব্যারিষ্টার বিজয় চ্যাটার্জ্জী, রজত রায়, জে. এন. রায় প্রভৃতি। মিঃ সি. আর. দাশের

বাড়ীতে ২৪শে ডিসেম্বর ১৯০৫ যে "স্বদেশী মণ্ডলী"র 'প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা এই ক্লাবের চরমপন্থী রাজনীতির কার্য্যকরী সমিতি। এই ক্লাব হইতেই পান্থির মাঠে স্বদেশী আন্দোলনের সুরু হইতে বহু সভা হয়। ভগিনী নিবেদিতাকেও ঐসকল সভায় বক্তৃতা দিতে দেখিয়াছি। তাঁহার ত বক্তৃতা নয়, যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইত। আমরা স্তব্ধ বিস্ময়ে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিতাম, আর ভাবিতাম—বলে কী? ইনি কে? কোথা হইতে আসিলেন?—যেন একটি জ্বলন্ত বিদ্যুৎ-শিখা!

প্রথম কথা, ডন্-সোসাইটি হইতে এই ক্লাবের তফাৎ কোথায়? ডন্-সোসাইটিতে বিলিয়ার্ড খেলা হইত না, এই ক্লাবে তাহা হইত। এতগুলি ছোকরা ব্যারিষ্টার ছিল, তাছাড়া অরবিন্দ সুবোধ মল্লিক চারু দত্ত ইঁহারাও ত বিলাত-ফেরৎ!

ডন্-সোসাইটিতে জাতীয় শিক্ষা, নব্য-হিন্দুয়ানী, জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যত বক্তৃতা উপাধ্যায় ও নিবেদিতা করিতেন, এই ক্লাবে তার পরিবর্ত্তে 'মডারেট-বিমর্দ্দন চরমপন্থা-নির্দ্ধারণরূপ' রাজনৈতিক বক্তৃতা বেশী হইত। "সোসাইটি" আর "ক্লাবে" তফাৎ এই: সোসাইটি ছিল হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির নবযুগের উপযোগী স্বাদেশিকতার ভিত্তির উপর একটা নুতন সংস্করণ বাহির করিবার চেষ্টা। ভারতের অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণের সহিত স্বদেশী দ্রব্যের বেচাকিনার মুদিখানা দোকান পর্য্যন্ত ইঁহারা করিয়াছিলেন। এর সঙ্গে ব্রহ্মচর্যের কোন খেয়াল ইঁহাদের ছিল কি-না, জানা যায় না। আর ক্লাব ছিল সন্ধ্যাকালীন বিলাতী ধরণের মজলিশ। এবং সেই সঙ্গে স্পষ্ট সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী, ভূপেন বসু প্রচারিত মডারেট নীতি-বিরোধী উগ্র চরমপন্থী রাজনীতির উত্তেজনাপূর্ণ তপ্ত আলোচনা। তফাৎ সহজেই চোখে পড়ে। ইহাই অরবিন্দ আসিবার আগে পর্য্যন্ত ইতিহাস। বিপিন পাল ইঁহাদের নেতা। কিন্তু অরবিন্দ আসিবার পরেই সুবোধ মল্লিক প্রভৃতি কতিপয় সভ্য বিপিন পাল অপেক্ষা অরবিন্দের বেশী গোঁড়া হইয়া উঠেন। অরবিন্দ বিপ্লবী। তিনি "ভবানী মন্দিরের" পূজারী হইয়া, "যুগান্তরের" বিপ্লব-বার্ত্তার অগ্রদূত হইয়া আসিয়াছেন। সুতরাং এই ক্লাবের একটা অগ্রগামী অংশ অরবিন্দের প্রভাবে গোপন-বিপ্লবের দিকে ঝুঁকিয়াছিল। কাজে না হউক মতে। ডন্ সোসাইটি তখন বিলুপ্ত, সুতরাং তাহার অভিব্যক্তিতে নিবেদিতার প্রভাবে বিপ্লবের কোন অনুষ্ঠান আর সম্ভব

হইয়া উঠে নাই। না উঠিবার আর একটা কারণ, সতীশবাবু নিজে বিপ্লবী ছিলেন না কোন কালেই।

"সোসাইটী" অথবা "ক্লাবে", গান্ধীযুগে যেমন নারী কর্ম্মীর অভ্যুদয় দেখা যায়, তখন তা মোটেই কিছু ছিল না। নিবেদিতা? তিনি বিদেশিনী বিপ্লব-বাদিনী, তার উপর মেম্। তাঁর কথা স্বতন্ত্র। নারী বলিতে স্বদেশী যুগে, আমরা যাঁহাদের নিয়া ঘর করিতাম, তাঁহাদের তো তখনো বাহির করি নাই। সময় আসে নাই। বাহির করিলে, জনতার পুরুষ-ভীতি তাঁহাদের হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিত। সরলাদেবী? তিনি একা, তিনিও তো নারী-কর্ম্মী বা নারী-সঙ্ঘ সৃষ্টি করেন নাই। তাঁর ব্যায়াম সমিতিতে তরুণ ছোকরারাই লাঠি খেলিত, তলোয়ার ভাজিত, বীরাষ্টমী করিত। স্বদেশী যুগে নারী-কর্ম্মী ছিল না। যা ছিল ছিঁটেফোঁটা, ধর্ত্তব্য নয়। ব্রাহ্ম-মহিলারা সম্ভবতঃ বেজায় হিন্দুয়ানীর চোটে, আর ব্রাহ্ম-নেতাদের বিনা অনুমতিতে কাছে আসিয়া ভিড়িতে ভরসা পান নাই। সরলাদেবীর প্রভাব এই ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম মহিলাদের উপর বিস্তার লাভ করে নাই। তাঁহারা "সোসাইটিতে"ও নাই, "ক্লাবে"ও নাই। যা আছেন ঐ শুধু রবিবারের "সমাজে", ব্রাহ্ম মন্দিরে। তাছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের নব্য-হিন্দুয়ানী অধিকাংশে ব্রাহ্ম আদর্শের বিরোধী। স্বদেশী যুগে যে যত বেশী চরমপন্থী, সে তত বেশী গোঁড়া হিন্দু।—অরবিন্দ আসিয়া যোগ দিবার পূর্ব্বক্ষণে এই ত অবস্থা।

যুগান্তর পত্রিকা ও যুগান্তরের আড্ডা: অরবিন্দ আসিলেন। আনন্দ-মঠের অনুকরণে অরবিন্দের ভবানী মন্দিরের কল্পনা, বারীন্দ্রের স্কন্ধে চড়িয়া মাসাবধি কাইমুর পাহাড় ঘুরিয়া শেষ পর্য্যন্ত চাঁপাতলা, ২৭ নং কানাইলাল ধর. লেনের বাড়ীতে আসিয়া ঠেকিল। ১৯০৬ মার্চ্চ মাসে এই বাড়ী হইতেই "যুগান্তর" কাগজ প্রথম প্রকাশিত হইল। বারীন্দ্র লিখিয়াছেন—

"আমি ও অবিনাশ ২৭নং কানাইলাল ধর লেনের বাড়ীখানি ভাড়া নিয়ে যুগান্তর অফিস খুলে বসলাম। দেবব্রতের এবং আমার লেখা সম্বল করে প্রথম সংখ্যা যুগান্তর প্রেসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পত্রাকারে একটি উত্তেজনাপূর্ণ আবেদন কয়েকটি জেলা-কেন্দ্রে চলে গেল। বাংলার প্রথম বৈপ্লবিক মুখপত্র প্রকাশের সহায়তার জন্য যথাসময়ে প্রথম সংখ্যা যুগান্তর বের হ'লো এবং আমাদের জানিত বন্ধুবান্ধবের কাছে কাগজ পাঠানো হ'ল। ...হঠাৎ

অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতুর মত যুগান্তরের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তেমন অভূতপূর্ব্ব। ...প্রথম সংখ্যা আদৌ বিক্রী হচ্ছে না শুনে, কিছু পয়সা পকেটে নিয়ে আমি ও অবিনাশ ট্রামে বের হলাম এবং মোড়ে মোড়ে 'ওরে যুগান্তর আছে' হেঁকে হেঁকে নিজের কাগজ নিজেই কিনতে লাগলাম। উদ্দেশ্য, এই ভাবে ট্রামযাত্রী বাবুভায়াদের দৃষ্টি নূতন কাগজের দিকে আকর্ষণ করা। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে বেগতিক দেখে আমরা নিজেই রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে যুগান্তর বিক্রী করা আরম্ভ করলাম। ভদ্রলোকের ছেলের সাধারণ রাজপথে সেই প্রথম হকারী করা।" —(বোমার কাহিনী—স্বদেশ, মাঘ, ১৩৩৮)

যুগান্তর কাগজ "বাংলার প্রথম বৈপ্লবিক মুখপত্র"। ইহার পাঁচ মাস পরে ৭ই আগষ্ট, ১৯০৬ খৃঃ বাংলার প্রথম নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (passive resistance) কাগজ ইংরেজী "বন্দেমাতরম্" প্রকাশ হয়। আগে বিপ্লবের মুখপত্র "যুগান্তর", পরে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মুখপত্র "বন্দেমাতরম্"। অরবিন্দের জীবন-ইতিহাসেও ঠিক তাই। আগে বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতি, পরে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে তিনি বিপিনচন্দ্রের অনুগামী, আর বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির প্রবর্ত্তনে, গুপ্তহত্যা ও ডাকাতি ব্যাপারে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগামী। কেননা, তিনিই প্রবর্ত্তক। এখন প্রশ্ন, তিনি আইরিশ ও রাশিয়ান সন্ত্রাসবাদ বাংলাদেশে প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়া সেই সঙ্গে তাহার পরক্ষণেই বিপিন-চন্দ্রের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দলে বন্দেমাতরম্-এর সম্পাদক-সঙ্ঘে মিশিলেন কিরূপে?

সন্ত্রাসবাদ আর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ত এক বস্তু নয়। ইহা দুই পৃথক বিপরীত বস্তু। এই দুই বিপরীত বস্তুর সমন্বয় অরবিন্দের জীবনে কী করিয়া সম্ভব হইল? অরবিন্দের মানসিক বিকাশ ও তাঁহার অদ্ভুত জীবন-ইতিহাসের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা আদৌ হয় নাই—কুত্রাপি দেখা যায় না। সুতরাং এক কথায় এই অতীব জটিল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। উত্তর অবশ্যই আছে। জীবনের বিকাশপথে তাহা আপনি আসিয়া দেখা দিবে।

স্বদেশীর প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় প্রখর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে ভরপুর পৃথক্ পৃথক্ অনেক নেতা বাংলাদেশে দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ছিল, "সোসাইটি" বল, "ক্লাব" বল, "মণ্ডল" বল, "আড্ডা" বল—কিছু আসে যায় না। তাঁহাদের বিভিন্ন খবরের কাগজ ছিল—যথা ডন্ ম্যাগাজিন (১৮৯৭),

নিউ ইণ্ডিয়া (১৯০২), সন্ধ্যা (১৯০৫), যুগান্তর (১৯০৬), বন্দেমাতরম্ (১৯০৬), 'নবশক্তি'। অথচ ইহাদের বিভিন্নতার মধ্যেও একটা অচ্ছেদ্য যোগসূত্র ছিল ইত্যাদি। আর তাই ছিল বলিয়াই স্বদেশী আন্দোলন একটি অখণ্ড প্রাণময় শক্তিশালী জীবন্ত বস্তু হইয়াছিল। এক এক জন নেতা, এক এক দিক হইতে তাঁহার নিজস্ব প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এই স্বদেশী যজ্ঞে আহুতি দিয়া ইহাকে দ্বাদশ সূর্য্যের কিরণে সমুজ্জ্বল ও দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। কোন একজন নেতা স্বদেশী আন্দোলন সৃষ্টি করেন নাই। বরং এই স্বদেশী আন্দোলনই অনেক নেতাকে সৃষ্টি করিয়াছে।

এই আন্দোলনে অরবিন্দের কী বিশেষ দান, তাহাই আমাদের মুখ্য বিবেচ্য। আর সেই সঙ্গে অপরাপর নেতাদের যে দান, তাহাও অরবিন্দের দানের সহিত তুলনা করিতে গিয়া গৌণভাবে আলোচ্য। আরও আলোচ্য, বাঙ্গালীর বিংশ শতাব্দীর ১ম দশকের ইতিহাস—যে স্মরণীয় সময়ের মধ্যে এই আন্দোলনটি জ্বলিয়া উঠিয়া আবার নিভিয়া গেল।

যুগান্তর কাগজ সম্বন্ধে আলিপুরের সেসন জজ হইতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং রাউলাট কমিটি স্বয়ং বিশদ আলোচনা করিয়া তাঁহাদের তীব্র মন্তব্য ইতিহাসকে উপঢৌকন দিয়া গিয়াছেন। মি: সি. আর. দাশ, "বন্দেমাতরম্"-এর সহিত "যুগান্তরের" তুলনা করিয়া এই উভয় পত্রিকার মতের ঘোরতর পার্থক্য অতিশয় স্পষ্ট করিয়া আদালতে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। অথচ এই দুই পরস্পর বিরোধী পৃথক্ মতবাদের পত্রিকার সহিত একই সময়ে অরবিন্দের যোগাযোগ যে কিরূপ জটিল ব্যাপার—তাহা কি মিঃ নর্টন আর কি মিঃ সি. আর. দাশ মহাশয়ের অদ্ভুত বক্তৃতা বারংবার পাঠ করিবার পরেও আমাদের নিকট এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলিয়াই বোধ হইতেছে।

বারীন্দ্রকুমার সত্যই বলিয়াছেন যে, "অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতুর" মতই "যুগান্তরের আবির্ভাব" স্বদেশীর প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় বাঙ্গালীকে চমকিত, বিস্মিত, স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। অরবিন্দ মাঝে মাঝে যুগান্তরে যে-সকল প্রবন্ধ দিতেন, তাতে সংস্কৃত ও মারাঠী শব্দ এমন কি অক্ষর পর্য্যন্ত থাকিত। অবিনাশ ভট্টাচার্য্য সেগুলি বাংলা অক্ষরে রূপান্তরিত করিয়া দিতেন। সুতরাং "বন্দেমাতরম্" আর "যুগান্তরের" অতি মারাত্মক রকমের বিরোধী দুই মতবাদের মধ্যেই ঘড়ির প্যাণ্ডুলামের মত অরবিন্দকে আমরা দোলায়মান অবস্থায় দেখিতে পাই।

যুগান্তরের সহিত অরবিন্দের কোনই সম্পর্ক ছিল না—মিঃ সি. আর. দাশের এ বক্তৃতা ত ইতিহাস বিশ্বাস করিবে না। আদালতের বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস লইয়া ত ইতিহাস রচনা চলিতে পারে না। মুস্কিলের কথা, সন্দেহ নাই। 'যুগান্তর,' এক বিষম পত্রিকা।

যুগান্তর পত্রিকার কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা এখন যুগান্তরের "আড্ডায়', সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকার গুহায় একবার কিছুক্ষণের জন্য প্রবেশ করিব। প্রকাশ্য দিনের আলোকে জাতির যে ইতিহাস রচিত হয়, লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্ধকার গহ্বরেই তাহার উদ্ভব।

বঙ্কিমের আনন্দমঠ হইতেই অরবিন্দের ভবানী মন্দির, আর অরবিন্দের ভবানী মন্দির হইতেই বারীন্দ্রের যুগান্তরের 'আড্ডা'। অরবিন্দের প্রেরণায় বাংলাদেশে গুপ্ত-সমিতির ২য় পর্ব্বের উদ্বোধন হয় এই যুগান্তরের আড্ডাতেই। সুতরাং এই আড্ডাই বিপ্লবের প্রধান কেন্দ্র। মফঃস্বলের শাখাকেন্দ্রগুলির সহিত ইহার যোগাযোগ ছিল। শাখাকেন্দ্র হইতে এই প্রধান কেন্দ্রে টাকা আসিত। প্রথমেই রংপুর হইতে পাঁচ শত টাকা অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া বারীন্দ্র ও অবিনাশকে চমকিত করিয়া দিল। তারপর মেদিনীপুর হইতে প্রতি বৎসর পার্বণীর মত নিয়মিত এক হাজার টাকা আসিতে লাগিল। এই প্রধান আড্ড'-কেন্দ্র রিভলভার সরবরাহ করিত। যুগান্তরের ৪ মাস পরে বন্দেমাতরম্ ভূমিষ্ঠ হয়। এই ৪ মাস মধ্যে ফুলার বধের ব্যর্থ চেষ্টা হয়। ১৯০৬।৮ই জুন ফুলারবধের জন্য অরবিন্দ শিলং তাঁহার শ্বশুরকে চিঠি লিখিয়া বারীনকে শিলং পাঠান।—এ সমস্তই বন্দেমাতরম্ ভূমিষ্ঠ হইবার প্রাক্কালে অরবিন্দ করিয়াছিলেন। ইহা প্রাক্-বন্দেমাতরম্ ইতিহাস।

বন্দেমাতরম্-এর সম্পাদক-সঙ্ঘে যোগ দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই অরবিন্দ বৈপ্লবিক গুপ্তহত্যার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। সম্ভবত: বিপিনচন্দ্র হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, অরবিন্দের এই ফুলারবধের চেষ্টার কথা কিছুই অবগত ছিলেন না। হেমেন্দ্রবাবু জীবিত আছেন, তিনি বলিতে পারেন।

ফুলার বধের চেষ্টা যে নিছক বৈদান্তিক 'মায়া' (Illusion) নয়, তাহা আমরা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছি। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি এই ফুলারবধ সম্পর্কে তাঁহার আত্মজীবনীতে (পৃঃ ২৩৩-২৩৪) লিখিয়াছেন—

"One evening a few months after the Barisal affair, two youngmen called at my residence at Barrackpore. One of them said—'We have formed a plan to shoot Sir B. Fuller and we are going to night for this purpose. What do you say about it ?' Not being prepared for it, and the proposal being so unusual, I was a little staggered. I said—'Why do you want to shoot Sir B. Fuller ? What has he done ?' The youngman replied with evident emotion—'His Gurkhas, stationed at Banaripara, have been outraging some of our women, and we want to take revenge upon him.'···I said to them—'Do you know that Sir B. Fuller has resigned ? What is the good of shooting a dead man ?' etc. ···The youngmen atonce agreed to drop the idea, and abandoned the proposal."

সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীও তখন জানিতেন না যে. অরবিন্দই ইহার প্রবর্ত্তক। সুতরাং মডারেট সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী ও চরমপন্থী বিপিন পাল উভয়ের অজ্ঞাতসারে এবং মতের বিরুদ্ধে, যুগান্তরের আড্ডার তরুণ বিপ্লবীরা অরবিন্দের নেতৃত্বে এমন একটা ভয়ঙ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অরবিন্দ বন্দেমাতরম্-এর সম্পাদক-সঙ্ঘে প্রবেশের পুর্ব্বেই বিপ্লবের কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী ও বিপিন পাল, এ উভয় হইতেই তিনি পৃথক্। আর যুগান্তরের আড্ডা, ডন্ সোসাইটি ও ফিল্ড এণ্ড একেডেমি ক্লাব হইতেও পৃথক্।

হেমচন্দ্র কাননগোঃ ১৯০৬।১৬ই আগষ্ট ইউরোপ যাত্রা করেন। তিনিই ফুলার বধের জন্য নিযুক্ত হইয়া শিলং প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া গলদঘর্ম্ম হইয়াছিলেন। "যুগান্তর" তখন সবেমাত্র পাঁচ মাস অতিক্রম করিয়াছে, আর "বন্দেমাতরম্" মাত্র এক সপ্তাহ (৭ই আগষ্ট, ১৯০৬) হয় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। "যুগান্তর" মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই ভারতের বাহিরে প্রচার হইয়া গিয়াছে। "জষ্টিস", "ইণ্ডিয়ান সোসিওলজী", "গেলিক আমেরিকা"র সহিত "যুগান্তরের" আদান-প্রদান চলিতেছে। যুগান্তরের পক্ষ হইতে হেমচন্দ্র এই তিনটি পত্রিকার তিনজন সম্পাদকের নামে "তিনখানি পরিচয়-পত্র পেয়ে বড়ই ধন্য হয়ে" ইউরোপ

যাত্রা করিলেন। যাত্রা করিবার পুর্ব্বে তিনি যুগান্তরের আড্ডার নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়া গেলেন—

"ঐ যুগান্তর আফিসেই তখনকার গুপ্ত সমিতির আড্ডা ছিল। এইটেই বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠের বা দেবব্রতবাবুর (?) ভবানী মন্দিরের স্থানীয় ছিল বল্‌লেও হয়। (হেমচন্দ্র জানিতেন না যে, ভবানী মন্দির দেবব্রত বাবুর নয়, উহা অরবিন্দের রচনা) কিন্তু ভবানী মূর্ত্তি এতে ছিল না। নীচের তলায় ছিল প্রেস। ওপরের তলায় আফিস। শোবার ঘর আর একটি ছোট্ট কুঠরীতে একটি কাঠের সিন্দুক ছিল। তাতে থাকতো নাকি অস্ত্রশস্ত্র।...একদিন গোটাকতক রিভলভার কিনতে গেছ্‌লাম। দেবব্রতবাবু সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ...এই চাঁপাতলার আড্ডাতেই প্রথম নরেন গোসাঁইর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।" —(পৃ: ১০৭-১০৯)

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার কয়েক মাস (৪ মাস হইবে) পরে, ১৯০৬-এর ডিসেম্বর এই আড্ডায় আসিয়া যুগান্তর কাগজ ও বিপ্লবের কাজে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। আড্ডা ও কাগজ সম্পর্কে তিনিও একটা বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"১৯০৬ খৃ:-এর তখন শীতকাল।...কলিকাতায় যুগান্তর অফিসে আসিয়া দেখিলাম ৩।৪টি যুবকে মিলিয়া একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া ভারত উদ্ধার করিতে লাগিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের আসবাবের অভাব দেখিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল বটে, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। গুলিগোলার অভাব তাঁহারা বাক্যের দ্বারাই পুরণ করিয়া দিলেন। দেখিলাম, লড়াই করিয়া ইংরেজকে দেশ হইতে হটাইয়া দেওয়া যে একটা বেশী কিছু বড় কথা নয়, এ বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত।...দেবব্রত যুগান্তরের সম্পাদকতায় লাগিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেনও সম্পাদকদের মধ্যে একজন। অবিনাশ এই পাগলদের সংসারের গৃহিনীবিশেষ। বারীন্দ্র তখন দেওঘরে পলাতক। ...পরে বারীনের সহিত দেখা হইবার পর তিনকথায় সে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই হইবে।...যুগান্তর সম্পাদনার ভার বারীন্দ্র ও আমার উপরেই আসিয়া পড়িল। নিজেদের লেখা দেখিয়া নিজেরাই চমকিয়া উঠিতাম। মনে হইত যেন, দেশের প্রাণ-পুরুষ আমাদের হাত দিয়া তাহার অন্তরের কথা বাহির করিতেছেন। হুহু

করিয়া দিন দিন যুগান্তরের গ্রাহকসংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এক হাজার হইতে পাঁচ হাজার, পাঁচ হইতে দশ, দশ হইতে এক বৎসরের মধ্যে বিশ হাজারে ঠেকিল।

"ঘরের কোনে একটা ভাঙ্গা বাক্সে যুগান্তর বিক্রয়ের টাকা থাকিত। তাহাতে চাবি লাগাইতে কখন কাহাকেও দেখি নাই। কত টাকা আসিত আর কত টাকা খরচ হইত. তাহার হিসাবও কেহ লইত না।

"একদিন সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে একখানা চিঠি আসিয়া হাজির হইল যে, যুগান্তরে যেরূপ লেখা বাহির হইতেছে তাহা রাজদ্রোহসূচক; ভবিষ্যতে ওরূপ করিলে আইনের কবলে পড়িতে হইবে। আমরা ত হাসিয়াই অস্থির। আইন কিরে বাবা! আমরা ভারতের ভাবী সম্রাট, গভর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তরাধিকারী, আমাদের আইন দেখায় কেটা?"—(নির্ব্বাসিতের আত্মকথা, পৃ: ৩-৬)

উপেন্দ্রনাথ যেদিন প্রথম যুগান্তরের আড্ডায় আসিলেন, সেদিন তাঁহার মুণ্ডিত মস্তকে শিখা ছিল, মুক্তকচ্ছ গেরুয়া ছিল পরিধানে, গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবী জামা, পাদুকাবিহীন শ্রীচরণ। উপেন্দ্রনাথ ঠিক লিখিয়াছেন—'নিজেদের লেখা দেখিয়া নিজেরাই চমকিয়া উঠিতাম'। কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিয়াছেন—'রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হ'লো চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।' এই তরুণ বিপ্লবীরা নিজেদের লেখা পড়িয়াই নিজেরা বিপ্লবী হইবার আরো বেশী প্রেরণ পাইতেন। এমনি হয়।

দেবব্রত কিছুদিন পরে 'নবশক্তি' আফিসে চলিয়া গেলেন। যুগান্তরের আড্ডায় থাকাকালীন তিনি নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি রচনা করিয়া একটি সভায় উহা গান করিয়াছিলেন—

"কোটী কোটী সুত হুঙ্কারি দাঁড়াল, উঠিয়া দাঁড়াল, জননী!
বঙ্গ বেহার উৎকল মাদ্রাজ গুর্জ্জর রাজপুতানা
দাক্ষিণাত্য পাঞ্জাব সিন্ধু উত্তর-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ।
রক্তে আঁধারিল রক্তিম সবিতা, রক্তিম চন্দ্রমা তারা,
রক্তবর্ণ ডালি রক্তিম অঞ্জলি, লক্ষ মুণ্ডমালা চণ্ডী সাজাল।
কাঁপে সিন্ধুজল কাঁপিল হিমাদ্রি, কাঁপে নদী কানন ধরিত্রী,
অম্বর রক্তময়ী ধরা কিবা শোভিল।'

'কাঁপে সিন্ধুজল, কাঁপিল হিমাদ্রি' বিরাট কল্পনা। কিন্তু রক্ত আর রক্তিমে —একেবারে লালে লাল। অথচ এই ছিল যুগান্তরের প্রাণের কবিতা।

অরবিন্দ বর্তমান শতাব্দীর ১ম দশকে বাংলাদেশে দুইদুইবার গুপ্ত সমিতির যে আয়োজন অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—তা আর অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই; করিলে একটা সত্য ইতিহাসকেই বিকৃত করা হইবে। অরবিন্দকেও অন্য রকম করা হইবে। তাঁহার ইতিহাস নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বহিষ্কৃত করা হইবে।

এই প্রসঙ্গে একটা অতীত ইতিহাসের কথা রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"জ্যোতি দাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়োবাড়ীতে তার অধিবেশন। ঋগ্‌বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি, আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান। রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত। সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।"—(আত্মপরিচয়—পৃঃ ৮৭)

রবীন্দ্রনাথ অতিশয় সাবধানী ব্যক্তি, ইহা সর্বজনবিদিত। কাজেই তিনি এই প্রাচীন গুপ্ত-সভার বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, অরবিন্দের মাতামহ বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসুই ঠাকুর বাড়ীর তরুণদের লইয়া গত শতাব্দীতে এই রকম একটি গুপ্ত-সভা স্থাপন করিয়াছিলেন—যাহার উদ্দেশ্য অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ অনুরূপ।

দুই ভ্রাতা—অরবিন্দ ও মনোমোহনঃ অরবিন্দ বলিয়াছেন যে, 'আমি কবিতা ও দেশকে সমান ভালবাসি'। তারপরে বলিয়াছেন যে, কবি ও স্বদেশপ্রেমিক হওয়ার পরে তিনি যোগে মনোনিবেশ করিয়া যোগী হইয়াছেন। এ-কথাকেও সংশোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে, স্বদেশপ্রেমিক হওয়ার আগেই তিনি কবি। তিনি জন্মকবি ("Even before he (Aravindo) became a politician, he had been a poet.…He is a born poet."—*Nalini Kanto Gupta—Publisher's Note; P. IV—Collected Poems and Plays Vol I.)*। উত্তম কথা। আমরা একবার কবি অরবিন্দকে আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয়বার আলোচনা করিবার সুযোগ আসিয়াছে। তাঁহার ৭০ বৎসরের জন্মোৎসবে তাঁহার কবিতার আধুনিক পরিণতি সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২রা

ডিসেম্বর খুলনা হইতে ডাক্তার কে. ডি. ঘোষের এক দীর্ঘ পত্রে দেখিতেছি যে, তিনি পুত্রদের মধ্যে মনোমোহন কবি হইবেন এবং অরবিন্দ একজন ভাল ম্যাজিষ্ট্রেট হইবেন—এই আশাই পোষণ করিতেছেন। অরবিন্দ কবি হইবেন, তাঁহার পিতা একথা ভাবেন নাই। পুত্র সম্বন্ধে পিতার অনুমান বা কল্পনা—এক্ষেত্রে সফল হয় নাই, ব্যর্থ হইয়াছে। ডাঃ কে. ডি. ঘোষ তাঁহার শ্যালক যোগেন বসুকে লিখিতেছেন—"Mono (মনোমোহন) will combine the feelings of his father, the grand ambitions of a cosmopolitan spirit ··with the *poetry* of his grand-father Raj Naran Bose. Aro (অরবিন্দ), I hope, will yet glorify his country by brilliant *administration*."—*Khulna, 1890, Dec. 2.* কিন্তু ২য় পুত্র 'মনো' যে কবি হইবেন, ডাঃ কে. ডি. ঘোষের এ কল্পনা ও অনুমান সফল হইয়াছে, সার্থক হইয়াছে। কেননা, অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখিয়া ইংরেজ কবিদের মধ্যে উচ্চস্থান পাইয়াছেন। ইংরেজ সমালোচকেরাই তাঁহাকে কবিযশ:প্রার্থীদের মধ্যে এই উচ্চস্থান দিয়াছেন। সুতরাং মনোমোহন ও অরবিন্দ দুই ভ্রাতাই কবি এবং দুই ভ্রাতাই ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

একজন কবির কবিতা নানাদিক হইতে আলোচনা করা যায়। কিন্তু অরবিন্দের কবিতা একাধিক কারণে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা মনোমোহনের কবিতার সহিত মিলাইয়া আলোচনা করার একটা বিশেষ দিক আছে। সুতরাং অত্যন্ত কঠিন কার্য্য হইলেও আমরা এই দুই ভ্রাতার কবিতা এখানে সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিব। এই চেষ্টা দুঃসাহস, হয়ত ইহাতে দুঃখ হইতে পারে। কেননা, দুঃসাহসে দুঃখ হয়। তাহা জানিয়াও আমরা ইহা করিব। কারণ ১৪ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ৭২ বৎসর পর্য্যন্ত লিখিত কবিতাসকল অরবিন্দের জীবনের এক বড় প্রকাশ, আর আমরা তাঁহার জীবন লইয়াই ত আলোচনা করিতেছি।

আমরা ১৯০৬।১৫ই আগষ্ট—অরবিন্দকে লইয়া তাঁহার জীবনের ৩৩ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৩৪ বৎসরের প্রবেশদ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ৫।৬ মাস পূর্ব্বেই তিনি বরোদার চাকরি ছাড়িয়া দেশকে ভালবাসার দরুন কলিকাতা আসিয়া স্বদেশীর প্রজ্জলিত অবস্থায় দেশসেবায় মনোনিবেশ করিয়াছেন—

আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এখন তিনি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষ এবং বন্দেমাতরম্‌ কাগজের সম্পাদক-সজ্যভুক্ত ব্যক্তি। কিন্তু অধ্যক্ষ ও সম্পাদক হইবার পূর্ব্বেই তিনি কলিকাতা আসিয়া প্রথমেই একটা গুরুতর বৈপ্লবিক কর্ম্মের নেতৃত্ব করিয়াছেন। কলিকাতায় আমরা বিপ্লবী অরবিন্দকেই প্রথমে পাই।

এই সময় মনোমোহনের জীবনের গতি বা পরিণতি কোথায়—তাহা একবার সংক্ষেপে দেখিয়া না নিলে, দুই কবি-ভ্রাতার কাব্যালোচনায় অসুবিধা হইবে। লোকে বলে কবিতায় জীবনের ছাপ পড়ে। সুতরাং কবিকে জানিতে হইলে তাঁহার জীবনকে জানা দরকার।

কবি ও অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ: জন্ম ১৮৬৯।১৯শে জানুয়ারী—মৃত্যু ১৯২৪।৪ঠা জানুয়ারী, ৫৪ বৎসর ১১½ মাস। মনোমোহন অরবিন্দ হইতে ৩ বৎসর ৭½ মাস বয়সে বড়। তাঁহার জীবন চার ভাগে ভাগ করা যায়। ১ম—(১৮৬৯-১৮৭৯) দার্জ্জিলিং স্কুলে, ১০ বৎসর পর্য্যন্ত। ২য়—(১৮৭৯-১৮৯৪) ১৫ বৎসর ম্যাঞ্চেষ্টার-লণ্ডন অক্সফোর্ডে। ৩য়—(১৮৯৪-১৯২১) ২৭ বৎসর অধ্যাপক, পাটনা-ঢাকা-পুরুলিয়া-কলিকাতা। ৪র্থ—(১৯২১-১৯২৪) ৩ বৎসর কর্ম্ম হইতে অবসর। এই হিসাবে ৫৪ বৎসর ১১½ মাস তাঁহার জীবন।

মনোমোহন ও অরবিন্দ উভয়েই বাল্য হইতে বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন—মনোমোহন অক্সফোর্ডে আর অরবিন্দ কেম্ব্রিজে। উভয়েই বাংলা সাহিত্য দূরের কথা, কথিত বাংলাই ভুলিয়া গিয়াছেন। অরবিন্দ দেশে ফিরিয়া বাংলা কিছুটা শিখিয়াছিলেন, মনোমোহন সে চেষ্টাও করেন নাই। কিন্তু উভয় ভ্রাতাই যেমন ইংরেজী ভাষায় বড় কবি, তেমনি গ্রীক ও ইউরোপের ক্লাসিকে অসাধারণ পণ্ডিত।

অরবিন্দ ১৮৯৩।মার্চ্চে দেশে ফিরিলেন, আর মনোমোহন ১৮৯৪।২৫শে অক্টোবর দেশে ফিরিলেন। ১৮৯৫ মনোমোহন পাটনা কলেজে অধ্যাপক। দেশে ফিরিয়াই (১৮৯৩) অরবিন্দ কংগ্রেসকে আক্রমণ করিলেন। এবং পরের বৎসর (১৮৯৪) বঙ্কিমের সাহিত্য ও জাতীয়তাবাদকে নির্জ্জলা প্রশংসা করিলেন। বিলাতী শিক্ষার মোহ কাটাইয়া স্বদেশী ভাবের দিকে তাঁহার মন প্রথম হইতেই আকৃষ্ট হইল। কিন্তু মনোমোহনের তাহা হইল না। ১৮৯৫খৃঃ পাটনা হইতে মনোমোহন তাঁহার বন্ধু Laurence Binyonকে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে লিখিলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম কুসংস্কারে ভরা ("Hinduism…mor-

bid and corroding superstitions.")। সুতরাং দেখা গেল গোড়া হইতেই দুই ভ্রাতার দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক্। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আমরা মনোমোহনকে ঢাকা-কলেজের অধ্যাপক দেখিতে পাই এবং এই বৎসর তিনি ঢাকাতে ব্রাহ্মমতে ৩ আইন অনুসারে বিবাহ করেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম মালতী দেবী। মালতী দেবী ব্রাহ্ম মেয়ে হইলেও ব্রাহ্মণকন্যা। তিনি অতিশয় সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি দেশবন্ধুর পত্নী বাসন্তী দেবী পর্য্যন্ত আমাকে বলিয়াছেন। এই ঢাকাতেই ১৯০০।২২শে অক্টোবর তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনী 'দত্ত' জন্মগ্রহণ করে। পরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আমরা তাঁহাকে পুরুলিয়াতে দেখিতে পাই। কেননা, ১৯০২.১২ই সেপ্টেম্বর তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লতিকা ঘোষ পুরুলিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ১৯০৫ আমরা তাঁহাকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকরূপে দেখিতে পাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৭ বৎসর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন। সুতরাং ১৯০৬।১৫ই আগষ্ট অরবিন্দ যখন কলিকাতা জাতীয় পরিষদের অধ্যক্ষ তখন মনোমোহন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক। দুই ভ্রাতাই ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। বহু স্থান ঘুরিয়া দুই ভ্রাতাই এখন কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। এবং কায়স্থ সমাজে, মনোমোহনের বিবাহের তিন বৎসর পর, অরবিন্দ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দুমতে বিবাহ করেন। মনোমোহনের বিবাহে জাতিভঙ্গ হয়, কিন্তু অরবিন্দের বিবাহে জাতি রক্ষা হয়। বিবাহ ব্যাপারেও উভয় ভ্রাতার দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক্। ডাঃ কে. ডি. ঘোষের cosmopolitan আদর্শ মনোমোহন রক্ষা করিলেন, আর পিতামহী কৈলাসকামিনী (১৯০১।এপ্রিল জীবিত ছিলেন) জাতি রক্ষার দরুন অরবিন্দের বিবাহে খুশি হইলেন।

মনোমোহনের কবিতা ঃ ১৮৯০ খৃঃ বিলাতে থাকাকালীন মনোমোহনের কবিতা প্রথম বিলাতেই প্রকাশিত হয়। কাব্যের নাম Primavera. আরো তিন জন ইংরেজ কবি-ভ্রাতার কবিতা একত্রে প্রকাশিত হয়। ইংরেজ সমালোচকগণ মনোমোহনের কবিতার খুব প্রশংসা করেন। বাঙ্গালী ইংরেজীতে এমন কবিতা লিখিতে পারেন, ইহা ইংরেজ সমালোচকদের কাছে আশ্চর্য্য বোধ হয়। এক বৎসরকাল মধ্যেই কাব্যগ্রন্থখানির ২য় সংস্করণ বাহির হয়। এই বৎসরেই ২রা ডিসেম্বরে মনোমোহনের পিতা লিখিয়াছিলেন যে—মোনো কবি হবে। ডাঃ কে. ডি. ঘোষ কি Primavera দেখিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃঃ (যে

বৎসরে তিনি বিবাহ করেন) Love Songs And Elegies কাব্য প্রকাশিত হয়।

১৯১৮ খৃঃ ৭ই অক্টোবর মনোমোহনের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি মৃত স্ত্রীকে স্মরণ করিয়া কতকগুলি কবিতা লিখেন। উহার এক খণ্ডের নাম Immortal Eve এবং আর এক খণ্ডের নাম Orphic Mysteries. তাঁহার বন্ধু ও কবি Laurence Binyon বলেন যে, এই কবিতাগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ('Finest and most original of his lyrics')।

অপ্রকাশিত আরো অনেক কবিতা আছে—এখনো প্রকাশ হয় নাই। দুঃখের কথা। Perseus—১৯০০ হইতে ১৯১৮ ইহার রচনাকাল। মহাকাব্য ধরনের, এই গ্রীকবীর সম্বন্ধে অরবিন্দও ১৯০৭।জুন হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক বন্দেমাতরম্-এ কাব্য লিখিয়াছেন। অরবিন্দের ৭ বৎসর আগে Perseus সম্বন্ধে মনোমোহন লেখা আরম্ভ করিয়াছেন। আশ্চর্য্য যে, উভয় ভ্রাতাই একই সময়ে একে অপরের অজানিতে, একই বিষয়ে কবিতা লিখিতেছেন। ইহার কারণ, উভয় ভ্রাতার উপরেই গ্রীক ও ইউরোপের ক্লাসিক শিকড় গাড়িয়া বসিয়া গিয়াছে। উভয় ভ্রাতার মধ্যে একই ধরনের ফুল ফুটিতেছে। অথচ কবি হিসাবে উভয়েরই স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য খুব স্পষ্ট।

অপ্রকাশিতের মধ্যে—১৯১৬-১৭ খৃঃ Nala And Damayanti সম্বন্ধে নাটকের ধরনে কাব্য আছে। লরেন্স বিনিয়নের পরামর্শে মনোমোহন গ্রীক ও বাইবেল ছাড়িয়া সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে কাব্যের বস্তু ও বিষয় নির্ব্বাচন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা খণ্ডিত, অসমাপ্ত কাব্য—দুই তিন অঙ্কের বেশী অগ্রসর হয় নাই। কেন হয় নাই, তার এক কারণ হইতে পারে যে—তিনি সংস্কৃত-সাহিত্য ও হিন্দু সভ্যতা আলোচনা করেন নাই। এবং সংস্কৃত-সাহিত্যের রস না পাওয়ায় এই কাব্য পরিসমাপ্ত করিতে তেমন প্রেরণা পান নাই। ইহা অবশ্য একটা অনুমান মাত্র। কিন্তু অরবিন্দ সংস্কৃত-সাহিত্য ও হিন্দু সভ্যতা উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন। শুধু অধ্যয়ন নয়, তাঁহার জীবনে সাধনা দ্বারা তাহা জীবন্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। কাজেই এই বিশেষ ক্ষেত্রে মনোমোহন অপেক্ষা অরবিন্দ অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ১৯১৬ খৃঃ গত মহাযুদ্ধের সময় মনোমোহনের Song Of Britannia কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার রাজনৈতিক মত ও বিশ্বাস আমরা

জানিতে পারি। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বিশ্বাস করেন। এবং সর্ব্বতোভাবে ইংরেজের জয় কামনা করেন। তখন অরবিন্দ রাজনীতি ছাড়িয়া পণ্ডিচেরীতে "আর্য্য" লইয়া আর্য্যের তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। বাহে আর কোন রাজনৈতিক স্পৃহা নাই, দেখা যায় না। কিন্তু ১৯০৬ খৃ. অরবিন্দ পুরা বিপ্লবী। মনে হয় ১৯০৬ খৃঃ মনোমোহন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বিশ্বাস করেন—ইহার উচ্ছেদ তিনি চান না। কিন্তু অরবিন্দ ১৯০৬ খৃঃ তাহা খুব চাহিতেন। বিপ্লবী অরবিন্দই তাহার প্রমাণ। দুই ভ্রাতায় এখানেও কত পৃথক্।

১৯২৪ খৃ: মনোমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা লতিকা ঘোষ অক্সফোর্ডে গিয়া তাঁহার পিতৃবন্ধু Laurence Binyon'কে দিয়া Songs Of Love And Death কাব্য অক্সফোর্ড হইতেই প্রকাশ করেন। Laurence Binyon এই কাব্যের ভূমিকায় মনোমোহনের শিক্ষাদীক্ষা, তাহার উপর গ্রীক ও ক্লাসিকের প্রভাব, তাঁহার অনুপম কবি-প্রতিভার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ—সমস্তই করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও মনোমোহনের কাব্য-পরিচয়ঃ মনোমোহনের মৃত্যুর পর যে শোকসভা হয়, রবীন্দ্রনাথ সেই সভার সভাপতি হইয়া যা বলিয়াছিলেন, তা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"মনোমোহন যে ভাষায় তাঁর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সেই ইংরাজী ভাষায় তাঁর এত সূক্ষ্ম অধিকার ছিল যে, আমাদের দেশে আমরা, যারা ইংরেজী ঘনিষ্ঠভাবে জানিনে, ইংরেজী সাহিত্যের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় নেই, আমাদের পক্ষে তাঁর কাব্যের সূক্ষ্ম উৎকর্ষ উপভোগ করা দুরূহ। তিনি জানিতেন যে, এদেশে তাঁর সঙ্গ সম্পূর্ণভাবে জুটতে পারে না। ...অসামান্য অধিকার নিয়ে যে ভাষায় তিনি তাঁর বাঁশী বাজিয়েছিলেন, সে ভাষার দেশ এদেশ নয়।...তিনি যদি চিরদিন ইংলণ্ডে থাকিতেন, তবে যে-সব কবির সঙ্গে বাল্যে সঙ্গ পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে তিনি এত একলা হয়ে পড়তেন না।...এই কবি মনোমোহন নিগূঢ় নিকেতন থেকে যা বের করেছেন, তা আজো ঢাকা রয়েছে। এ যখন প্রকাশ পাবে তখন বাংলাদেশের একটা মহিমা সর্ব্বত্র প্রকাশিত হবে। আর কবি ত কেবল ইংরেজও নয়, কেবল বাঙ্গালীও নয়—কবি সকল দেশেরই কবি।...তাঁর কাব্যের সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় ছিল। তিনি প্রায়ই তাঁর কাব্য আমাকে শুনাতেন। আমি শুনে মুগ্ধ হতেম। তাঁর প্রত্যেক শব্দ-

চয়নের মধ্যে একটা বিশেষ সৌন্দর্য্য ছিল। আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সহিত তিনি তাঁর কাব্যের রূপ দিয়েছিলেন। আমার আশা আছে, এ সকল কাব্য হতে সকল দেশের লোক আনন্দ পাবে—কেবল 'গৌড়জন' নহে, সমস্ত বিশ্বজন "তাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"—(*The Presidency College Magazine—March, 1924 ; p. 307-308*)

অরবিন্দের ইংরাজী কবিতা সম্বন্ধে যদি রবীন্দ্রনাথ এরূপ উচ্চ প্রশংসা করিতেন, তবে তাহা যে অরবিন্দের কবি-প্রতিভার পক্ষেও অতিশয় শ্লাঘার বিষয় হইত তাহাতে আর সন্দেহ কি! কবি হিসাবে মনোমোহন অরবিন্দ অপেক্ষা ছোট কবি নন, বরং কোন কোন দিকে বড়ই হইবেন।

লরেন্স বিনিয়ন (L.Binyon) **এবং অস্কার ওয়াইল্ড** (Oscar Wilde)**:** আবার লরেন্স বিনিয়ন—রবীন্দ্রনাথের সহিত মনোমোহনের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের নিকট ভারতীয় চিন্তাধারাকে যেরূপ কাব্যের মধ্য দিয়া প্রচার করিয়াছেন, মনোমোহন অন্যদিকে ভারতের নিকট ইউরোপের সর্বোচ্চ জ্ঞান ও চিন্তাধারাকে তাঁহার ইংরেজী কবিতার মধ্য দিয়া প্রচার করিয়াছেন। ("Circumstances had prevented him from being like Rabindranath Tagore an interpreter to the West of Indian thought and life. But at least *he (Monmohan) was an eloquent interpreter of the West to India.*") কবিতার যদি কোন মিসন্ থাকিয়া থাকে, তবে মনোমোহনের কবিতার একটা সার্থকতার পরিচয় আমরা পাইলাম। প্রশ্ন উঠিবে যে, অরবিন্দের কবিতায় এই রকম কোন মিসন্ মিঃ বিনিয়ন আবিষ্কার করিতে পারিবেন কি না? অরবিন্দের ইংরেজী কবিতাও প্রধানতঃ ইংরেজী জানা, তাও যে-সে জানা নয়, রবীন্দ্রনাথের কথায় ঘনিষ্ঠভাবে, অন্তরঙ্গভাবে জানা লোকদের পক্ষেই বুঝা সম্ভব। ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইউরোপ ইহা বেশী বুঝিবে। কিন্তু সেই ইউরোপের লোকেরাই অরবিন্দের কবিতায় কি বুঝিবে? কাহাকে বুঝিবে? ভারতীয় চিন্তাধারাকে—না, ইউরোপের গ্রীক্ ও ক্লাসিকের চরম উৎকর্ষকে? মিঃ বিনিয়ন অরবিন্দকে পাণ্ডিত্যে মনোমোহন অপেক্ষা বড় বলিয়াছেন, কিন্তু অরবিন্দের কবিপ্রতিভার কোনই আলোচনা করিবার সুযোগ তিনি পান নাই। ("...Monmohan, though not such a brilliant

scholar as his younger brother, Arovindo, who has become famous in other fields than the classics.") । 'Other fields' দ্বারা মি: বিনিয়ন অরবিন্দের বৈপ্লবিক রাজনীতি অথবা তাঁহার যোগসাধনার প্রতি হয়ত ইঙ্গিত করিয়া থাকিবেন।

মি: বিনিয়ন মনোমোহনের কবিতা সম্বন্ধে শেষ কথা এই বলিয়াছেন যে, ইতিপূর্বে আর কোন ভারতবাসী মনোমোহনের মত ইংরেজী কবিতা লেখেন নাই। শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবিদের মধ্যে মনোমোহনের উচ্চ আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ["No Indian has ever before used our tongue with so poetic a touch. ···To us he (Monomohan) is a voice among the great company of English Singers."] বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা একদিকে কত বড় শ্লাঘার কথা! অরবিন্দ যদি এ সম্মান পান, তবে উভয় ভ্রাতাই যে ইংরেজ কবিদের মধ্যে গৌরবে সমতুল্য হইবেন—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

অস্কার ওয়াইল্ড মনোমোহনের শেষের কবিতাগুলি দেখেন নাই। ১৮৯০খৃ: Primaveraতে মনোমোহনের ছেলেবয়সের কবিতাগুলি দেখিয়াই যে-প্রশংসা করিয়াছেন, পরেরগুলি দেখিলে না জানি আরো কত প্রশংসা করিতেন। তিনি বলিয়াছেন—"His (Monmohon's) verses show how quick and subtle are the intellectual sympathies of the Oriental mind, and suggest how close is the bond of union that may some day bind India to us by other methods than those of commerce and military strength. Mr. Ghose ought some day to make a name in our literature."—*Pall Mall Gazette, 1890*) । মনোমোহনের কাব্য-পরিচয়ে অনেকটা সময় অতিবাহিত হইল। এইবার অরবিন্দে আসা যাক্।

অরবিন্দের কাব্য-গ্রন্থ : ১৯৪২।১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের ৭০ বৎসর জন্মতিথিতে পণ্ডিচারী হইতে তাঁহার সমগ্র কাব্য-গ্রন্থ প্রকাণ্ড দুই ভল্যুমে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ১৮৯০ খৃঃ কেমব্রিজ হইতে আরম্ভ করিয়া এ-পর্য্যন্ত প্রকাশিত সকল কবিতাই আছে। অবশ্য অপ্রকাশিত আরো অনেক কবিতা এই দুই ভল্যুমে সংগৃহীত হয় নাই। প্রকাশক এই কবিতাগুলিকে

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের গতির সহিত মিলাইয়া কেমব্রিজ, বরোদা, কলিকাতা (সহ আলিপুর জেল), পণ্ডিচারী পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'সাগর সঙ্গীতের' ইংরেজী অনুবাদ পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই।

১৮৯০ খৃঃ মনোমোহনের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫ খৃঃ অরবিন্দের মার্তিলা কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়। অবশ্য মার্তিলার অনেক কবিতা ১৮৯০ খৃঃ রচিত।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, এই সংস্করণে 'রাজনারায়ণ বসুর প্রতি' কবিতাটি মার্তিলায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৯২৩ খৃঃর সংস্করণে ইহা বাদ পড়িয়াছিল, সে কথা আমরা বলিয়াছিলাম।

মনোমোহন ও অরবিন্দের কবিতার তুলনাঃ মনোমোহনের অধিকাংশ কবিতা এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত। আর শ্রীঅরবিন্দের অধিকাংশ কবিতা এখন প্রকাশিত। সুতরাং তুলনায় অসুবিধা হইবে। সমানে সমানে তুলনা হইবে না। সমানে আর অ-সমানে তুলনা হইবে। মনোমোহনের উপর কিছুটা অবিচার হইবে।

১ম—উভয় কবির উপর গ্রীক ও ইউরোপের ক্লাসিকের প্রভাব প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। স্থান সংক্ষেপে দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। এই প্রভাবের ফলও প্রায় একরূপ দেখা যায়। কেননা উভয়েই গ্রীক বীর, গ্রীক কাহিনী লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন। এযুগে প্রাচীন গ্রীক বীর বা গ্রীক কাহিনী লইয়া অতি অল্প ইংরেজ কবিই কাব্য লিখিয়াছেন।

তাছাড়া এই গ্রীক ক্লাসিকের প্রভাব উভয় কবির কবিতার ছন্দে (metre) ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া মনোমোহন ও অরবিন্দের কবিতার ছন্দ একই ধরনের নয়। পড়িলেই বুঝা যায়। মনোমোহনের কবিতার ছন্দ—ঠিক গ্রীক কবিতার ছন্দের অনুকরণ নয়; বস্তুতঃ ইহা খাঁটি ইংরেজী কবিতারই ছন্দ। মনোমোহন গ্রীক কবিতার বহিরঙ্গ অর্থাৎ আবরণ গ্রহণ করেন নাই। ভাব (spirit) গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে তাঁহার সমগ্র কাব্য রচনার মধ্যে এমন একটা সুসংযত সুগঠিত সৌষ্ঠব লক্ষ্য করা যায়, যাহা গ্রীক আদর্শকে আত্মস্থ করার ফলেই হইয়াছে। মনোমোহনের কবিতার এই সংযত-প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া L. Binyon আশ্চর্য্য হইয়া লিখিয়াছেন—"I had imagined an Oriental's taste must of necessity be luxuriant and

ornate, and was surprised that he (Monomohan) should feel such a strong attraction to the limpid and severe."

অরবিন্দ গ্রীকের নিকট শুধু ভাব নয়, ছন্দের প্রকরণও হুবহু গ্রহণ করিয়াছেন। ছন্দ সম্বন্ধে মনোমোহন এরূপ করেন নাই—তা বলিয়াছি। সুতরাং একই গ্রীক প্রভাব দ্বারা একই সময়ে একই বয়সে একই স্থানে বিলাতে থাকিয়া উভয় কবি-ভ্রাতাই সমান প্রচুর প্রভাবান্বিত হইলেও, উভয়ের কবিতার ছন্দে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য খুব স্পষ্ট।

অরবিন্দের প্রথম বয়সের রচনাতেই গ্রীক আদর্শের অনুকরণে দীর্ঘ ছন্দের (longer metres) উপর পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। গ্রীক মহাকাব্যের অনুকরণে এই প্রকার গুরুগম্ভীর দীর্ঘ ছন্দ তাঁহার রচনার গ্রীক প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

২য়—গ্রীক ও ক্লাসিকের প্রভাব ছাড়াও মনোমোহনের কাব্যে বাইবেল ও খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রভাব আছে। শেষ বয়সের আধ্যাত্মিক অনুভূতির কবিতাগুলির মধ্যে ঈশ্বরের কথা আছে। জগদীশ্বর এই সৃষ্টিকে পরিচালিত করিতেছেন, এমন কথা পাওয়া যায়। কিন্তু অরবিন্দের আধ্যাত্মিক অনুভূতির কবিতায় ঈশ্বর অপেক্ষা এক ভাগবত শক্তির অস্তিত্ব—এই সৃষ্টির মধ্যে কখনো বা স্থিতি, আবার কখনো বা গতির আকারে প্রকাশ পায়। মনোমোহনে যে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব, তাহা খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রেরণা হইতে আসিয়াছে। আর অরবিন্দের যে ভাগবত শক্তি, তাহা উপনিষদ হইতে ও তাঁহার সাধনালব্ধ অনুভূতি হইতে আসিয়াছে।

৩য়—প্রকৃতির বর্ণনায় উভয় কবির বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। এক্ষেত্রে মনোমোহন প্রথম শ্রেণীর ইংরেজ কবিদের সমকক্ষ। এলিজাবেথ-যুগের স্বভাব-বর্ণনার কবিদের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে। প্রকৃতির মধ্যে ডুবিয়া তিনি আনন্দের আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন। অরবিন্দ প্রকৃতির বর্ণনায় বেশীর ভাগ ধ্যানপরায়ণ, গম্ভীর। তাঁহার স্বভাব-বর্ণনার কবিতাগুলি চিন্তাভারাক্রান্ত—উচ্ছ্বসিত নয়। মনোমোহন প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করেন। অরবিন্দের নিকট প্রকৃতি যেন কোন এক বিশেষ বার্ত্তা বহন করিয়া আনে। অরবিন্দ সমুদ্র দেখিয়া তন্ময় হইয়া বলিলেন—

"O grey Wild Sea,
Thou hast a message, thunderer, for me."

মনোমোহনের অনুভূতি ও প্রকাশ অন্যরূপ। সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতি তাঁহার মনে এক অপার বিস্ময় আনিয়া দেয়—

"In the deep west the heavens grow heavenlier
Eve after eve, and still
The glorious stars remember to appear."

৪র্থ—প্রেমের কবিতায় অরবিন্দ হইতে মনোমোহন অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ। অরবিন্দের শেষ বয়সের রচনায় প্রেমের কবিতা নাই বলিলেই হয়। প্রথম বয়সের প্রেমের কবিতা আমরা একবার আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, Keats-এর যেমন তেমনি অরবিন্দের প্রেমের কবিতায় সুন্দরী তরুণীর প্রতি একটা মোহ বা আকর্ষণ আছে। এবং এই সহজাত মোহ বা আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া তিনি প্রেমের রাজ্যে আর বেশী উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। এক হিসাবে অরবিন্দ প্রেমের কবি নহেন।

পক্ষান্তরে মনোমোহন প্রেমের কবিতায় ইন্দ্রিয়ের রাজ্য ছাড়িয়া এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যের শেষসোপানে গিয়া উপনীত হন। প্রেমের সহজাত আকর্ষণ মনোমোহনে একেবারে রূপান্তরিত হইয়া আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইলে ভাল হইত। প্রেমের কবিতায় মনোমোহনের সমতুল্য অরবিন্দ নহেন।

৫ম—তবে অরবিন্দের কবিতায় শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? শ্রেষ্ঠত্বের দুইটি দিক আপাততঃ আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে—

(ক) গ্রীক ছন্দের quantitative metre লইয়া তিনি (Vol. II Appendix A.) শেষের দিকে যে পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, কেন এই ক্লাসিক ছন্দ ইংরেজ কবিগণ (Spencer, Sidney, Tennyson) ইংরেজী কবিতায় অনুসরণ করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। এবং এই ক্লাসিক ছন্দ ইংরেজী কবিতায় অনুসরণ করিয়া তিনি সত্যই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই ক্লাসিক ছন্দ গ্রহণ করিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি কতকগুলি ইংরেজী কবিতাও লিখিয়াছেন—যাহা মিষ্টিক্ কবিতা হিসাবে অতিশয় উৎকৃষ্ট হইয়াছে। যেখানে ইংরেজ কবিরা পরাজিত, অরবিন্দ সেখানে জয়লাভ করিয়াছেন। ইহা কি কম কথা!

(খ) ইংরেজী ভাষায় মিষ্টিক্ (mystic) কবিদের মধ্যে Blake সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু অরবিন্দ তাঁহার শেষের দিকে রচিত মিষ্টিক্ কবিতায় (Six Poems, Poems

এবং Poems In Quantitative Metre) Blakeকে পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া গিয়াছেন। এইখানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী—অনুপম এবং অতুলনীয়। ইংরেজী কবিতা রচনায় এই ক্ষেত্রে অরবিন্দের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেই হইবে (* ক)।

(* ক) কবি ও অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লতিকা ঘোষ বি. এ. (কলিকাতা), বি. লিট্. (অক্সন) এই সম্পর্কে নিম্নলিখিতরূপ লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা অবিকল তুলিয়া দিলাম :

"In what then lies the superiority of Aravindo's poems which makes him figure as one of the great English poets ? It is not his mastery of the classics, his Epic verse, his interpretation of the East to the West, not even his supreme handling of English verse in classic metres which would daunt even the best English poets. It is in the mystic realisation which we glimpse even in his early poems, and which in his recent poems have reached a height of realisation singing of regions mystic and unknown, which to the ordinary reader carries but a vague significance. And when these realisations are voiced in a rhythmic stream of subtle and sublime music till now thought impossible for the English tongue to hold, one is stilled with wonder. As a mystic poet Aravindo leaves even Blake the greatest of English mystic far behind, for Blake's poetry full of a confused mythology of his own creation, only sometimes sounds the depths of profoundity reached by Aravindo. Shelley rising on aerial wings to ethereal regions hovers uncertain between the earth and the sky. Wordsworth's intuition has to pass through an ethical and commonplace mind and is stinged with a meditativeness which takes away from spiritual vision. Aravindo's mystic realisation is concluded in deep Rhythmic music and language of symbolic sublimity which are a new contribution to English poetry—the rainbow-coloured off-spring of Aravindo's great "Trance of Waiting" from whence open to him magic casements into the Vast"—*Lotika Ghosh—15th August, 1943.*

অরবিন্দের কাব্য আলোচনায় আমরা ১৯০৬ খৃ: অতিক্রম করিয়া যাইতে বাধ্য হইলাম। তাহা না করিলে তাঁহার কবি-প্রতিভার স্বরূপ বুঝা যাইত না; রাজনীতিক্ষেত্রে অরবিন্দ বিপ্লবী, ইহা আমরা দেখিয়াছি। ইংরেজী কবিতার ক্ষেত্রে মিষ্টিক্ কবিদের মধ্যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী—তাহা আমরা দেখিলাম। তিনি যে বলিয়াছেন—"আমি কবিতা ও দেশকে সমান ভালবাসি" তাহারও পরিচয় এবং প্রমাণ আমরা পাইলাম।

অরবিন্দের মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর : ১৯০৬।মার্চ্চ অরবিন্দ বরোদা হইতে কলিকাতা আসিয়াছেন। ১৯১০।মার্চ্চ মাসে তিনি পণ্ডিচারী যাইবার প্রাক্কালে চন্দননগর শ্রীমতিলাল রায়ের গৃহে পলাতক অবস্থায় লুকাইয়া অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং বাংলাদেশে মোট ৪ বৎসর তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াছেন। ইহার মধ্যে পুরা এক বৎসর (১৯০৮।২রা মে হইতে ১৯০৯।৬ই মে) তিনি আলিপুর বোমার মামলায় হাজতে বাস করিয়াছেন। সুতরাং জেলের বাহিরে রাজনীতিক্ষেত্রে মাত্র তিন বৎসর তিনি কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। প্রকাশ্য রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার কর্ম্ম-জীবন পুরা তিন বৎসর ধরা যাইতে পারে। ১৯০৬।জুন-জুলাই ছোটলাট ফুলার বধকার্য্যে পরামর্শাদি দেওয়ার পর, ৭ই আগষ্ট তিনি বিপিনচন্দ্রের সম্পাদকতার অধীন 'বন্দে-মাতরম্' সম্পাদক-সঙ্ঘে এবং ১৫ই আগষ্ট জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। ১৮৯৩ আগষ্ট হইতে ১৯০৬।আগষ্ট পর্য্যন্ত ১৪ বৎসরের বরোদার চাকুরি একেবারে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া আসিলেম।

এখন ১৯০৬।আগষ্টের পূর্ব্বে তাঁহার মানসিক বিকাশের একের পর আর বিভিন্ন স্তরগুলি একবার সংক্ষেপে দেখিয়া লইলে, তাঁহার জীবনের পরবর্ত্তী গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে সুবিধা হইবে।

১৮৯১ খ্রী: কেম্ব্রিজে অবস্থানকালে তিনি কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু ১৮৯২ খৃ: ঐ কেম্বিজে অবস্থানকালেই তাঁহার মনে একটা ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। এই বৎসরেই তিনি কংগ্রেসী নিবেদন-নীতির উপর বিশ্বাস হারাইয়া বিপ্লবের পথে চলিতে আকৃষ্ট হন। ১৮৯৩ খৃঃ বরোদা আসিয়াই আগষ্ট মাস হইতে 'ইন্দুপ্রকাশে' কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতিব বিরুদ্ধে খুব জোর লিখিতে আরম্ভ করেন।

তাঁহার বিপ্লবী মনের প্রথম প্রকাশ তাঁহার লেখার মধ্য দিয়া ১৮৯৩ খৃঃতেই প্রথম আমরা দেখিতে পাই। বুর্জোয়া-নিধন এবং সেই সঙ্গে প্রোরিটেরিয়েটদের উত্থানের কথাও এই বৎসরেই তিনি বলেন। ১৮৯৪ খৃঃ বঙ্কিম-প্রসঙ্গে তাঁহার ব্রাহ্ম-সংস্কারকদের বিরোধী রক্ষণশীল হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ আমরা স্পষ্ট লক্ষ্য করি। এই অবস্থায় ৫ বৎসর অতিবাহিত হইবার পর ভারতবর্ষে ফরাসী বিপ্লবের মত একটা প্রকাশ্য বিদ্রোহের কল্পনা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে। কেননা ১৮৯৯ খৃঃ যতীন্দ্র ব্যানার্জ্জীকে তিনি সৈন্য শ্রেণীতে গোপনে ভর্ত্তি করিয়া দেন। সৈন্য হওয়া প্রয়োজন প্রকাশ্য যুদ্ধের জন্য। ইহা গুপ্ত সমিতির লক্ষ্য নয়। পরে ১৯০২ খৃঃ প্রকাশ্য বিদ্রোহ বা যুদ্ধ হইতে তাঁহার মন গুপ্তসমিতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। কেননা ১৯০২ খৃঃ-এর প্রথম ভাগে তিনি যতীন্দ্র ব্যানার্জ্জীকে বরোদা হইতে বাংলাদেশে গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করেন। যতীন্দ্রকে পাঠাইবার ছয় মাস পরে ঐ গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি বরোদা হইতে যতীন্দ্রকে সাহায্যের জন্য নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকেও প্রেরণ করেন। ১৯০২ হইতে ১৯০৪—অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত বাংলার প্রথম গুপ্তসমিতি উপ-নেতাদের নেতৃত্ব লইয়া দলাদলির ফলে ভাঙ্গিয়া যায়। পরে ১৯০৬ হইতে ১৯০৮—অরবিন্দ দ্বিতীয়বার বাংলাদেশে গুপ্তসমিতি প্রবর্ত্তন করিয়া ফুলারবধে ১৯০৬ জুন-জুলাই নিজে নেতৃত্ব করেন এবং ১৯০৬ আগষ্ট মাসে সেই সঙ্গে প্রকাশ্য রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়া—বাংলার চরম-পন্থী দলে যোগ দিয়া 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদক-সঙ্ঘে যোগ দেন ও জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সুতরাং 'বন্দেমাতরম্' সম্পাদক-সঙ্ঘে ও জাতীয় শিক্ষাপরিষদে যোগ দিবার পূর্ব্বেই আমরা অরবিন্দকে গুপ্তসমিতির বৈপ্লবিক কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই।

যুগান্তর পত্রিকা (১৯০৬।মার্চ্চ—১৯০৭ জুলাই) : যুগান্তর পত্রিকা ১৯০৬ মার্চ্চ মাসে বারীন্দ্রকুমার প্রথম প্রকাশ করেন। ১৯০৭।২৪শে জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্র দত্ত যুগান্তরের সম্পাদক হিসাবে রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লেখার দরুন এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহার এক ফল এই হইল যে, তিনি আলিপুর বোমার মামলায় ধৃত হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইলেন। অথচ যে দুইটী প্রবন্ধের জন্য তাঁহার শাস্তি হইল, শুনিয়াছি সে দুইটী প্রবন্ধ তাঁহার লেখা নয়—উহা উপেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন। অরবিন্দের পরামর্শ অনুসারেই ভূপেন্দ্রনাথ নিজের স্কন্ধে দায়িত্ব লইয়া স্বচ্ছন্দে কারাবরণ করিলেন। বারীন্দ্রকুমার ইহা আমাদের নিকট বলিয়াছেন যে, সেজ্‌দার (অরবিন্দের) নির্ব্বন্ধাতিশয্যেই ভূপেন্দ্র আত্মপক্ষ সমর্থন না করিয়া হাসিমুখে জেলে গমন করিলেন। যুগান্তর পত্রিকার সহিত প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অরবিন্দের নিগূঢ় যোগাযোগ ছিল—ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

যুগান্তর প্রথম প্রকাশ হওয়ার পর হইতে ভূপেন্দ্রনাথের জেলে যাওয়া পর্য্যন্ত এক বৎসর পাঁচ মাস, এবং ইহার পরে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে কলিকাতা হইতে সমগ্র বাংলাদেশে প্রকাশ্য বিপ্লববাদ প্রচার করিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কেন যে এত দীর্ঘকাল প্রকাশ্য বিপ্লববাদ প্রচার করিতে দিয়াছেন, তাহা তখনকার গভর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন। আমরা গভর্ণমেণ্টের মনের কথা জানি না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ইহা সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই, কেননা ইহাতে বাঙ্গলা দেশের সহর ও পল্লীগ্রামে বিপ্লববাদের বিষ রোগের বীজাণুর মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তির মত সমাজেরও একটা মন আছে। সমাজের মনে এই বিপ্লবের বিষ প্রবেশ করিয়াছে। ফলে সমাজের শরীরে সেই বিষের ক্রিয়াও দেখা দিয়াছে। অরবিন্দ ইহার জন্য কতটা দায়ী ইতিহাস অবশ্যই তাহা বিচার করিবে। অরবিন্দের জীবন-চরিত লিখিতে বসিয়া আমরাও এই বিষয়টিকে একবারে চক্ষু মুদিত করিয়া এড়াইয়া যাইতে পারি না। যুগান্তর পত্রিকার প্রথম ১ বৎসর ছয় মাসের যে জীবন, তাহা একটি পৃথক্ সম্পূর্ণ অধ্যায়। কেননা ১৯০৭।২৪শে জুলাই যুগান্তর-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ জেলে যাওয়ার পর হইতেই যুগান্তরের দল বারীন্দ্রের নেতৃত্বে যুগান্তর পত্রিকার ভার অপর এক হস্তে সমর্পণ করিয়া চাঁপাতলা ছাড়িয়া বারীন্দ্রের পৈতৃক বাগান মানিকতলায় বোমার আড্ডা ফাঁদিয়া বসিলেন। এখনও মানিকতলার সেই বাগানটিকে চারিপার্শ্বের জনসাধারণ বোমার বাগান বলিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয়। যুগান্তরের দল চাঁপাতলায় ১ বৎসর ছয় মাস থাকিয়া ১৯০৭ সেপ্টেম্বর মাসে তাহার এক অতি উগ্র বৈপ্লবিক অংশকে মানিকতলার বাগানে সরাইয়া আনিল। চাঁপাতলা হইতে আমরা মানিকতলায় আসিলাম।

আলোচ্য বৎসরে আমরা যুগান্তরের প্রথম এক বৎসর ছয় মাসের কথাই আলোচনা করিব। অর্থাৎ ১৯০৭।২৪শে জুলাই যুগান্তর-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথকে

জেলে প্রেরণ করিয়া পরবর্ত্তী ১৯০৭ আগষ্ট মাসের ১২ই ও ২৬শে তারিখের দুই সংখ্যার কথা উল্লেখ করিয়া যুগান্তর পত্রিকার ১ম পর্ব্ব শেষ করিব।

যুগান্তর (১৯০৬ মার্চ্চ) ও বন্দেমাতরম্ (১৯০৬।৭ই আগষ্ট)—মিঃ সি. আর. দাশ ঃ যুগান্তর এখন পাওয়া যায় না। সকলেই বলে নাই, পুড়াইয়া ফেলিয়াছি। সেকালে যা দেখিয়াছিলাম, কিছু মনে আছে। আর রাউলাট কমিটিতে কিছু যা মন্তব্য আছে, এই পর্য্যন্ত। যুগান্তরের প্রচ্ছদপটে খড়্গাসহ মা কালীর শুধু হাত ছিল। এই কালী-মার্কা খড়্গা সমেত একখানি হাতকে যুগান্তরের ট্রেড মার্ক বলা চলে। মা কালী যুগান্তরের বৈপ্লবিক দলের আরাধ্যা দেবী ছিলেন। অরবিন্দ এই সময় নিজেকে কালী বলিয়া ভাবিতেন এবং বিপ্লবের কালে চিঠিপত্র লিখিতে হইলে শুধু "কালী" বলিয়া স্বাক্ষর করিতেন। যুগান্তরের প্রচ্ছদপটে দু'খানা আড়াআড়িভাবে তলোয়ারের উপর একখানা ঢালও ছিল।

মিঃ নর্টন জাতীয়তাবাদী ইংরেজী ও বাংলা সবগুলি সংবাদপত্রের মধ্যেই একটা গোপন ষড়যন্ত্র বা যোগাযোগ ছিল—ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং মিঃ নর্টনের যুক্তিমতে যুগান্তর ও বন্দেমাতরম্-এর মধ্যেও একটা ষড়যন্ত্র বা যোগাযোগ ছিল—এই কথাই প্রমাণ হয়। কিন্তু মিঃ সি. আর. দাশ তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি প্রত্যেক সংবাদপত্রের মতের ও লিখিবার ভঙ্গীর যে বিশেষত্ব, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেক সংবাদপত্রের স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য দেখাইয়া দেন। "যুগান্তরের" সহিত "সন্ধ্যা" ও "নব-শক্তির" পার্থক্য তিনি ঐ সকল পত্রিকার বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ আদালতে পাঠ করিয়া মিঃ নর্টনের যুক্তি খণ্ডন করেন। বিশেষ করিয়া খণ্ডন করেন, যুগান্তরের সহিত বন্দেমাতরম্-এর যোগাযোগের কথা।

মিঃ সি. আর. দাশ বলেন—যুগান্তরের মত, বন্দেমাতরমের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। কেননা বন্দেমাতরম্ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance) দ্বারা স্বাধীনতালাভের উপায় নির্দেশ করিয়া থাকে। যুগান্তর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে উপহাস করে। ইহা দ্বারা স্বাধীনতালাভ তাহারা উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া মনে করে। সুতরাং যুগান্তরের মতবাদ বন্দেমাতরমের মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। আর যেহেতু অরবিন্দ বন্দেমাতরমের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মতবাদের পরিপোষক, সুতরাং তিনি যুগান্তরের প্রকাশ্য বৈপ্লবিক মতবাদের বিরোধী।

যুক্তির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মিঃ দাশের যুক্তি ঠিক। কিন্তু যুক্তি অপেক্ষা জীবন জটিল। অরবিন্দের জীবন-ইতিহাসে যুগান্তর ও বন্দেমাতরম্ একসঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া স্থান পাইয়াছে এবং অরবিন্দের রাজনৈতিক মতবাদকে জটিল হইতে আরো জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

মিঃ দাশ বলেন, বন্দেমাতরম্ শুধু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দ্বারা স্বাধীনতা লাভের কথা বলে না; তার সঙ্গে স্বদেশী—বয়কট—জাতীয় শিক্ষা—সালিশী বিচার প্রভৃতির দ্বারাও স্বাধীনতা লাভের কথা বলে। যুগান্তর বন্দেমাতরমের এই মতবাদকে উপহাস করে। যুগান্তর বলে, আগে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে এবং স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্ব্বে সালিশী বিচার, জাতীয় শিক্ষা, বয়কট, স্বদেশী—এ সমস্ত হাঙ্গামা করিয়া কোনই লাভ নাই, যেহেতু স্বাধীনতা লাভ না করিলে পরাধীন অবস্থায় ইহার কোনটাই চলিতে পারে না বা পারিবে না। যুগান্তর পত্রিকার মতবাদ সম্পর্কে এবং বন্দেমাতরমের মতবাদের সহিত তুলনা করিয়া যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ মিঃ দাশ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার নিজের কথাই তুলিয়া দিতেছি। মিঃ দাশ বলেন—

"So far as the Bande Mataram and the Jugantar are concerned, I shall show by reference to one article that according to Bande Mataram, the ideal of freedom must be attained by *passive resistance*—Swadeshi, Boycott, National Education, Courts of Arbitration etc. ···Aurobindo has advocated National Education, Swadeshi, Boycott and Court of Arbitration, whereas the Jugantar in its articles headed 'Suchona' holds that no progress of the cuntry is possible without independence. *Talk of Swadeshi—the Jugantar laughs at it.* Talk of National Education, Arbitration Court—the Jugantar says all that is a pastime. No progress of the country can ever take place unless you have absolute independence. *This is the essential differnce between the principles of the Bande Mataram and the Jugantar.*" Mr. Das here reads articles from the Sandhya,

Nabasakti and other Papers to show the difference in the tone of their writings.

যুগান্তরের সহিত বন্দেমাতরম্-এর মতবাদের যে পার্থক্য মিঃ সি. আর. দাশ দেখাইলেন—তাহা আমরাও দেখিয়াছি এবং স্বীকার করি। কিন্তু আসামী অরবিন্দকে ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যুগান্তরের সহিত অরবিন্দের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া যে মিঃ দাশ বলিয়াছেন, তাহা আমরা বলিও না, স্বীকারও করি না। কেননা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি যে, যুগান্তরের বৈপ্লবিক দল ও যুগান্তর পত্রিকার সহিত গোড়া হইতেই অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে।

যুগান্তর ও রাউলাট কমিটি ঃ বারীন্দ্রকুমার রাউলাট কমিটির নিকট বলিয়াছেন যে, যুগান্তর পত্রিকা দেড় বৎসর চালাইবার পর তাঁহারা অন্য হস্তে উহার পরিচালনের ভার সমর্পণ করেন। আমরাও এক বৎসর ছয় মাসের কথাই বলিয়াছি।

"With my friend Abinash Bhattacharya and Bhupendra Nath Dutt I started the *Jugantar* newspaper. We managed it for nearly *one and half years* and then gave it over to the present managers."—Barindra said before a Magistrate on the 22nd of May, 1908 : Rowlatt Committe Report, p. 14-15.

রাউলাট কমিটি বলেন, ১৯০৬ মার্চ মাসেই যুগান্তর প্রথম প্রকাশ হয় এবং ১৯০৭ খৃঃ ইহার সাত হাজার গ্রাহক হয়, পরে গ্রাহকসংখ্যা আরো অনেক বাড়িয়া যায়। ১৯০৮ খৃঃ নূতন প্রেস আইনের কবলে পড়িয়া ইহা বন্ধ হয়।

"This journal (Jugantar) began to pour forth racial hatred in March 1906, attained a circulation of 7,000 in 1907 and rapidly reached a still wider range before it ceased to appear in 1908 in consequence of the newly passed Newspapers (Incitement to offences) Act."—Ibid, p. 16.

যুগান্তরের সহিত অরবিন্দের যোগাযোগের কথাও রাউলাট কমিটি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"Arabindo had joined Barindra from Baroda, and the brothers with their immediate followers started various

newspapers, the most popular of which, published in fluent vernacular Bengali, was the Jugantar (New Era)."
—Ibid, p. 16.

১৯০৯ খৃ: মি: সি. আর. দাশ আলিপুর বোমার মামলায় আদালতে বলিয়াছেন যে, অরবিন্দের সহিত যুগান্তরের কোনই সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু মি: সি. আর. দাশের বলার ৯ বৎসর পরে, ১৯১৮ খৃ: রাউলাট কমিটি বলিতেছেন যে, যুগান্তরের সহিত ও বারীন্দ্রের সহিত অরবিন্দের যোগাযোগ ছিল। আমরাও উপস্থিত প্রত্যেক প্রমাণে দেখিতেছি যে, বিলক্ষণ যোগাযোগ ছিল। এক্ষেত্রে রাউলাট কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভরযোগ্য।

রাউলাট কমিটি যুগান্তরের তিনটি সংখ্যার উপর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—

(১) যুগান্তর, ১১ই এপ্রিল ১৯০৭। এই সংখ্যার আলোচ্য প্রবন্ধের বাংলা নামের ইংরাজী তর্জ্জমা হইয়াছে "Welcome Unrest". "Unrest" কথাটীর অর্থ করা হইয়াছে "Revolt" অর্থাৎ বিপ্লব। "Unrest" must be created. Welcome therefore unrest, "whose historical name is Revolt."—*Jugantar, 11th April, 1907.* "Welcome Unrest"—quoted in the High Court Judgment, Alipore Conspiracy Case.

(২) যুগান্তর, ১২ই আগষ্ট ১৯০৭। এই সংখ্যায় বিপ্লবীদের দ্বারা দেশীয় সৈন্য ভাগাইবার কথা আছে। রাউলাট কমিটি এই প্রবন্ধের ইংরেজী তর্জ্জমা এইরূপ দিয়াছেন—

"Much work can be done by the revolutionists very cautiously spreading the gospel of independence among the native troops. When the time arrives for a practical collision with the ruling power, the revolutionists not only get these troops among their ranks, but also the arms with which the ruling power supplied them."—Ibid, p. 16.

(৩) যুগান্তর, ২৬শে আগষ্ট ১৯০৭। এই সংখ্যায় ছদ্মনামে একটী

পাগলের চিঠি ছাপা হইয়াছে। রাউলাট কমিটি তাহার ইংরেজী তর্জমা দিয়াছে—

"*Dear Editor*—I am mad and crack-brained. ··· If at least fifteen thousand copies (Jugantar) are distributed in the country, nearly 60,000 people read them. I cannot withhold the temptation of telling a certain thing to these 60,000 people. News of loot is reaching me from all quarters, and I am *dreaming* as if the *future guerilla bands* were looting money and as if the future war had commenced in the shape of petty dacoities (gang robberies). ··· O Plunder ! I worship you to-day".—Ibid, p. 16.

১৯০৭।১২ই এবং ২৬শে আগষ্টের দুই সংখ্যা যুগান্তর—১৯০৭।২৭শে জুলাই ভূপেন্দ্র দত্ত জেলে যাইবার ঠিক পরের মাসেই প্রকাশিত হয়। রাউলাট কমিটির উদ্ধৃত প্রবন্ধ তিনটি হইতে দেখিতে পাইতেছি যে, যুগান্তরের বৈপ্লবিক দলের পরিকল্পনায় তিনটি স্তর—একের পর আর, ইঁহারা স্বপ্ন (dreaming) দেখিতেছেন। ১ম, গুপ্তহত্যা ও ডাকাতি ; ২য়, গরিলা যুদ্ধ ; ৩য়, প্রকাশ্য বিদ্রোহমূলক যুদ্ধ। এ সমস্তই আইরিশ ও রাশিয়ান বিপ্লব-পদ্ধতির অনুকরণ বলিয়া রাউলাট কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমাদেরও তাহাই মনে হয়।

কিন্তু আইরিশ ও রাশিয়ান পদ্ধতিতে "ভবানী মন্দির" ছিল না, মা কালী ছিলেন না। গীতাও ছিল না। অরবিন্দের পরিকল্পিত "ভবানী মন্দিরে"র চেলা-চামুণ্ডারাই বারীন্দ্রের নেতৃত্বে যুগান্তরের বৈপ্লবিক দল। আর গীতা, মা ভবানী ও মা কালী—এই ধর্ম্মের আবরণও অরবিন্দের নিজস্ব পরিকল্পনা। রাউলাট কমিটি, বিপ্লবীদের এই ধর্ম্মের আবরণকে—"perversion of religious ideals to political purposes"—(p. 17) বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

রাউলাট কমিটি যুগান্তরের উপর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেন্‌কিন্‌সের মন্তব্য উদ্ধার করিয়া তাহা পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন।

"Its (Jugantar's) character and teaching entirely justify the comments of the Chief Justice, Sir Lawrence Jenkins,

quoting and adopting the following words of the Session Judge of Alipore : They exhibit a burning hatred of the British race, they breathe revolution in every line, they point out how revolution is to be effected. No calumny and no artifice is left out which is likely to instil the people of the country with the same idea or to catch the impressionable mind of youth."—Ibid, p. 16.

অরবিন্দ "ভবানী মন্দিরের" পরিকল্পনা হইতেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৈপ্লবিক দলের উপর যে ধর্ম্মের আবরণ নিক্ষেপ করিয়া তরুণ বিপ্লবীদের মনের স্বাধীন চিন্তার পথ অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন—সে সম্পর্কে রাউলাট কমিটি স্যার আশুতোষ মুখার্জীর অপর একটি মোকদ্দমার রায় হইতে—(King Emperor *vs.* Amritalal Hazra C. W. N. Vol XXIX p. 698) নিম্নলিখিতরূপ উদ্ধার করিয়াছেন—

"Such principles as the religious principles of absolute surrender tc the Divine Will were employed by designing and unscrupulous men as potent means to influence and unbalance well-minded persons and thus ultimately bend them to become instruments in the commission of nefarious crimes from which they might otherwise recoil with terror." —Ibid, p. 17.

রাউলাট কমিটি যুগান্তর সম্পর্কে "মুক্তি কোন পথে" এই গ্রন্থখানি সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছেন, কেননা যুগান্তরের প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থখানিতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা পরবর্ত্তী বৎসরের আলোচনায় ইহার উল্লেখ করিব।

অনুশীলন সমিতি : আমরা এখন ঢাকার পুলিন দাসের অনুশীলন সমিতির কথাই আলোচনা করিব। ১৯০৬-১৯০৮, এই দুই বৎসরে পুলিন দাসের ঢাকা অনুশীলন সমিতির অধীনে মফঃস্বলে পাঁচশত শাখা-সমিতি ও ত্রিশ হাজার সভ্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল। যুগান্তরের গুপ্তসমিতি এবং পত্রিকাও এই দুই বৎসর সমানে চলিতেছিল। সুতরাং একই

সময় (১৯০৬-১৯০৮) প্রবাহিত "যুগান্তর" ও "অনুশীলন" সমিতি ঐতিহাসিকের নিকট তুলনায় আলোচিত হইবার দাবী রাখে। অরবিন্দের জীবন-ধারাও এই সময়ের মধ্যেই ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইতেছিল।

কিন্তু ১৯০৬ খৃঃ পুলিন দাসের ঢাকার অনুশীলন সমিতি আচম্‌কা ধূমকেতুর মত উদিত হয় নাই। ইহার পূর্ব্বতন ইতিহাস আছে। সংক্ষেপে সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

১৮৯৭ খৃঃ মি: পি. মিত্র সরলা দেবীকে সম্মুখে রাখিয়া কলিকাতায় লাঠি খেলার যে আখড়া খোলেন বীজাকারে অনুশীলন সমিতির তাহাই প্রথম সূচনা। অনুশীলন কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র হইতে লওয়া হইয়াছে। যেমন বঙ্কিমের আনন্দমঠের অনুকরণে অরবিন্দ তাঁহার বৈপ্লবিক দলের জন্য ভবানী মন্দিরের ছক্ কাটিয়াছিলেন, তেম্‌নি মি: পি. মিত্র. বঙ্কিম-কথিত মানুষের সকল বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনের আদর্শ হইতেই তাঁহার সমিতির নাম—অনুশীলন রাখিয়াছিলেন। এক হিসাবে ধরিতে গেলে অনুশীলন ও যুগান্তর উভয় দলই বঙ্কিমের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত।

অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্তসমিতির প্রথম পর্ব্বের (১৯০২-১৯০৪) নাম যুগান্তর ছিল না। ২য় পর্ব্বের (১৯০৬-১৯০৮) যুগান্তর নাম পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয়। প্রথম পর্ব্বের নাম যুগান্তর না হইলেও ২য় পর্ব্ব ১ম পর্ব্বেরই ক্রমবিকাশ। ১ম পর্ব্বে (১৯০২-১৯০৪) অরবিন্দ ও বারীন্দ্রের সহিত পি. মিত্রের যোগাযোগ ছিল। সুতরাং প্রথম অঙ্কুর অবস্থায় অনুশীলন ও যুগান্তরে যোগাযোগ ছিল। অরবিন্দের গুপ্ত সমিতি ২য় পর্ব্বে যখন পত্রিকা ছাপাইয়া যুগান্তর নাম গ্রহণ করিল এবং বারীন্দ্র ও পি. মিত্রের East Club ভাঙ্গিয়া গেল, তখন পি. মিত্র অনুশীলন সমিতিকে বঙ্গভঙ্গের মত পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে ভাগ করিয়া দিলেন। পশ্চিম বঙ্গের নেতা হইলেন সতীশ দাশ ও পূর্ব বঙ্গে ঢাকায় নেতা হইলেন পুলিন দাস। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দেই অনুশীলন সমিতি পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে ভাগ হইয়া গেল। উত্তরবঙ্গে—কখনও বা পূর্ব্ববঙ্গ কখনও বা পশ্চিমবঙ্গ শাখা-সমিতি স্থাপন করিলেন।

যুগান্তর পত্রিকা ও তৎসংশ্লিষ্ট অরবিন্দ ও বারীন্দ্রের বৈপ্লবিক দল অনুশীলনের পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের দল হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিশেষরূপে রক্ষা করিয়া চলিল। যুগান্তর ও অনুশীলনের আদর্শে মূলতঃ সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যাইতেছে।

এই আদর্শগত পার্থক্যের জন্যই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলাদেশে যুগান্তর ও অনুশীলন এক হইয়া মিলিয়া যাইতে পারে নাই। যে যার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

এই সময়ে বাংলাদেশের সহরে ও মফঃস্বলে আরো অনেকগুলি আধাবৈপ্লবিক সমিতির উদ্ভব হইয়াছিল, যাহা ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে গভর্ণমেণ্ট বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন ও বন্ধ করিয়া দেন। যেমন আত্মোন্নতি সমিতি, বরিশালের বান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, মৈমনসিংহের সুহৃদ্ সমিতি ও সাধন সমিতি। অরবিন্দ তাঁহার বন্দেমাতরম্ ও বারীন্দ্র তাঁহার যুগান্তর লইয়া এবং সেই সঙ্গে যুগান্তরের বৈপ্লবিক দল লইয়া এই সমস্ত সমিতির মধ্য দিয়া তাঁহাদের নিজেদের পথ কাটিয়া রাস্তা তৈয়ার করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতেছিলেন।

বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন—"তখন আত্মোন্নতি সমিতি ও অনুশীলন সমিতির আখড়া খোলা হচ্ছে অলিতে গলিতে, বাংলা দেশের জেলায় জেলায়। কে কোথায় কতখানি জমকে আখড়া খুলবে তাই নিয়ে কি বিষম প্রতিযোগিতা। পুলিন দাসে ও সতীশ দাসে তো মাথা ফাটাফাটি হবার জোগাড়, শেষটা চেলা-চামুণ্ডার মাঝে ভ্রাতৃদ্রোহের আগুন জ্বলে দেখে পি. মিত্র গোটা বাংলা দেশটা দুজনের মাঝে দিলেন ভাগ করে। এ থাকবে পূর্ব্ববঙ্গ নিয়ে, আর ও থাকবে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে, কেউ কারো জুরিস্‌ডিক্‌সনের মধ্যে গিয়ে আখড়াও খুলবে না আর নতুন recruit বা রংরুটও ধরবে না। এই রকম একটা মোটামুটি কাজচলনসই রূপ করে দুই লাঠিয়ালে বাঙ্গলার সহর, উপনগর ও পল্লী জুড়ে পাঁয়তাড়া কশতে লাগলেন।"—কোমার কাহিনী—স্বদেশ—মাঘ, ১৩৩৮।

রাউলাট কমিটি পুলিন দাসের কথাই সবিস্তারে বলিয়াছেন। সুতরাং আমরাও তাহার কিছুটা উল্লেখ করিব। ঢাকায় লর্ড কার্জ্জনের আপ্যায়নের জন্য নবাব সাহেব মার্ত্তাজা নামক একজন প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল ও বাজীকরকে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় আনয়ন করিয়াছিলেন। মার্ত্তাজা ঠগীদিগের নিকট লাঠি-খেলা ও নানারূপ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পুলিন দাস এই মার্ত্তাজার সাগরেদী করিয়া তাঁহার অতি অদ্ভুত দেশবিশ্রুত লাঠিখেলা শিক্ষা করেন। এবং মফঃস্বলে স্বদেশী প্লাবনে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হইবার পর হইতে তিনি অনুশীলন সমিতি নাম দিয়া আত্মরক্ষার্থ লাঠিখেলার আখড়া স্থাপন করেন। ১৯০৬

হইতে ১৯০৮, এই সমিতি মফঃস্বলে গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পরে। পরে ইহা বৈপ্লবিক ডাকাতিতেও প্রবৃত্ত হয়।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরে পুলিন দাস ১৪ মাসের জন্য নির্ব্বাসিত হইলে মাখনলাল সেন এই সমিতির নেতা হন এবং ঢাকা হইতে তিনি এই সমিতির প্রধান কেন্দ্র কলিকাতায় উঠাইয়া আনেন। তখন বারীন্দ্রের যুগান্তরের দল অরবিন্দসহ ধৃত হইয়া বিচার অপেক্ষায় আলিপুর হাজতে বাস করিতেছেন। ঢাকা অনুশীলন সমিতি সম্বন্ধে রাউলাট কমিটি বলেন, "The existence of this body alone even if there had been no other, would have constituted a public danger···while its organization was most compact in Mymensingh and Dacca, it was active from Dinajpur in the north-west to Chittagong in the south-east and from Cooch-Behar on the north-east to Midnapore on the south-west. Outside Bengal we find its members working in Assam, Behar, the Punjab, the United Provinces, the Central Provinces and at Poona."—Ibid, p. 71.

এখন প্রশ্ন, যুগান্তর ও অনুশীলনে পার্থক্য কোথায়? আমরা দেখিতেছি পার্থক্য আছে।

পুলিন দাসের মত লাঠিখেলোয়াড় এবং গ্রামে গ্রামে এত অধিক তরুণ ছোক্‌রাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার অপূর্ব্ব কৌশল ও ক্ষমতা যুগান্তরের দলে কাহারো ছিল না।

আবার অরবিন্দের মত মেধাবী, ভাবুক, মনস্বী নেতা এবং অরবিন্দ-অনুপ্রাণিত বারীন্দ্র প্রমুখ এত দুঃসাহসিক বেপরোয়া (dynamic personality) পুলিন দাসের দলে কেহই ছিল না।

যুগান্তরের দলে ছিল মস্তিষ্ক, ভাবুকতা এবং একটা আকাশ-কুসুম আদর্শ, যাহা কার্যে পরিণত করিবার শক্তি হয়তো তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা ভাবের উন্মাদনায় আগুনের ফুল্‌কী যুগান্তর পত্রিকার মধ্য দিয়া দেশময় ছড়াইয়া গিয়াছেন। আর পুলিন দাস বাস্তব ক্ষেত্রে সমগ্র দেশময় একটা বিরাট বাহিনী সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি যাহার কোনও তুলনা হয় না।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ : ১৯০৬ জুন-জুলাই ছোটলাট ফুলার বধের পরামর্শদাতারূপে বিপ্লবী-অরবিন্দই, ১৯০৬।১৫ই আগষ্ট জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন—ইহা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে।

মিঃ সি. আর. দাশ আলিপুর বোমার মামলায় বলিয়াছেন যে, সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জীর জবানবন্দী হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠা হইবার কিছু আগে হইতেই অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের যে আন্দোলন, তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। ["He (Aravindo) took part in it (National Education) before it was started, as we find in the evidence of Satish Chandra Mukherjee."—*C. R. Das*] মিঃ সি. আর. দাশ আরো বলেন যে, জাতীয় শিক্ষা-প্রচলনের জন্যই তিনি বরোদার চাকুরী ছাড়িয়া বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। ["He (Aravindo) came to Bengal expressly for the purpose of carrying on the National Council of Education."—*C. R. Das*]

মিঃ সি. আর. দাশের এতটা এরূপ বলিবার কারণ কি? কারণ অতিশয় সুস্পষ্ট। মিঃ সি. আর. দাশ বলেন যে, অরবিন্দ আদৌ বিপ্লবী নহেন। বিপ্লব বা গুপ্তসমিতির ধারপাশ দিয়াও তিনি যান না। যদি তিনি বিপ্লবী হইতেন তাহা হইলে তিনি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতেন না, বা ইচ্ছা করিলেও হইতে পারিতেন না। কেননা জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের মুরুব্বীদের মধ্যে আছেন ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, স্যার গুরুদাস ব্যানার্জ্জী, মিঃ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। এমন কেহ বাতুল নাই যে, এই তিনটী গণ্যমান্য ব্যক্তির নামের সহিত বিপ্লববাদের কোনরূপ যোগাযোগ কল্পনা করিতে পারে! সুতরাং অরবিন্দ বিপ্লবী হইলে এই তিনটী মুরুব্বীদের নাকের উপর দিয়া তিনি কখনই জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। অতএব যেহেতু তিনি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষ, সুতরাং তিনি আদৌ বিপ্লবী নহেন। মিঃ সি. আর. দাশের যুক্তির সারবত্তা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু কথাটা হইতেছে এই যে, জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের মুরুব্বীরা তখন কেহই জানিতেন না যে, অরবিন্দ বিপ্লবী। যদি তাঁহারা অরবিন্দকে বিপ্লবী বলিয়া জানিতেন তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই অরবিন্দকে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতেন না। মডারেট-নেতা সুরেন্দ্র

ব্যানার্জ্জী দূরের কথা, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদী (Passive-resister) বিপিন পালও যদি অরবিন্দকে ছোটলাট ফুলার বধের পরামর্শদাতারূপে জানিতে পারিতেন, তবে তিনিও নিঃসন্দেহে অরবিন্দের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতেন। কেননা বিপিনচন্দ্র অতিশয় সুস্পষ্টরূপে গুপ্তসমিতি, গুপ্তহত্যা ও রাজনৈতিক ডাকাতির বিরোধী ছিলেন। বিপিনচন্দ্র তাঁহার এই মতবাদ বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় ("Golden Bengal Scare"—3rd October, 1906) লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বিপিন বাবু এতদূর পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন যে, পাগলাগারদের বাহিরে কোনও লোক দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় গুপ্তসমিতি, গুপ্তহত্যা ও রাজনৈতিক ডাকাতির কথা ভাবিতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না ("No one outside a lunatic asylum will ever think of or counsel any violent or unlawful methods in India, in her present helplessness, for the attainment of her civil freedom." —*Bipin Chandra Paul*)। অথচ দেখিতেছি অরবিন্দ তখন শুধু পাগলাগারদের বাহিরে নন, জুন ও জুলাই মাসে ফুলার বধের পরামর্শদানাদি কার্য্য শেষ করিয়া অতিশয় নিরীহ এবং শান্তভাবে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষের আসনে বসিয়া ছাত্রদিগকে অতি উত্তমরূপে ইংরেজী-সাহিত্য শিক্ষা দিতেছেন। বিপিন বাবু যাহাই বলুন না কেন, কেহ অরবিন্দকে তখন ভ্রমেও পাগল বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন না। সুতরাং পাগলাগারদের বাহিরেই অতিশয় সুস্থ দেহে ও মনে আমরা অরবিন্দকে এই সময় পুরাদস্তুর বিপ্লবী, বৈপ্লবিক কর্ম্মে নিযুক্ত দেখিতে পাইতেছি। মিঃ সি. আর. দাশের কথা ইতিহাসের কষ্টিপাথরে ঘষিলে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণ হয়।

মিঃ সি. আর. দাশ আরো বলেন যে—বাংলা দেশের লোকেরা তখন জাতীয় শিক্ষা-পরিষদকে সর্ব্বপ্রকার রাজনীতির সংশ্রব হইতে দূরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন এবং অরবিন্দের এ বিষয়ে কোন প্রকার হাতই ছিল না ("The people of Bengal wanted to keep the National Council of Education free from political activities—free from all political bias of either party. *Aurobindo had no control over it.*"—C. R. Das)। ঠিক কথা। Mr. C. R. Das-এর একথা

এতদূর সত্য যে, এই কারণের জন্যই অরবিন্দ মাত্র এক বৎসর কাল পরেই জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সহিত সকল প্রকার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া অধ্যক্ষের পদ ইস্তাফা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৯০৭।২২শে আগষ্ট ছাত্রদের বিদায়-অভিভাষণের উত্তরে অরবিন্দ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, তিনি জাতীয় পরিষদের ছাত্রদিগকে রাজনীতির সংশ্রব হইতে দূরে না থাকিয়া অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া দেশকে মাতৃভূমিকে সাক্ষাৎ জীবন্ত মা বলিয়া জানিয়া সেবা করিতে বলিয়াছিলেন। জীবন বিসর্জ্জন দিয়া দেশকে মা বলিয়া সেবা করা রাজনীতি ভিন্ন আর কি? মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিয়া দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করাই তখন অরবিন্দের রাজনীতি ছিল। অরবিন্দের এই ভয়ঙ্কর রাজনীতির সহিত জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কর্তৃপক্ষের মতের মিল হয় নাই। মিল ত হয়ই নাই বরং সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। ফলে অরবিন্দ ইস্তাফা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মিঃ সি. আর. দাশের কথাই সত্য। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের উপর অরবিন্দের কোনই হাত ছিল না। থাকিলে তিনি ইস্তাফা দিতেন না।

বিনয়কুমার সরকার তাঁহার "বৈঠকে" অরবিন্দের বিদায়-অভিভাষণের উত্তরে বক্তৃতাটির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, অরবিন্দ ছাত্রদিগকে বলিয়াছিলেন—"ওয়ার্ক দ্যাট সি মে প্রস্পার। সাফার দ্যাট সি মে রিজয়স্" "Work that she (Motherland) may prosper; suffer that she may rejoice." ইহা নিছক রাজনীতি ভিন্ন আর কি? ছাত্রদিগকে অরবিন্দ ঘোরতর রাজনীতিতে যোগদান করিতেই উপদেশ দিলেন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক। এই উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হইতেই আমরা অরবিন্দের স্বাধীন, স্বতন্ত্র, বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। এক্ষেত্রে মিঃ সি. আর. দাশের কথা প্রথমে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াও, পরিশেষে অরবিন্দ বিপ্লবী নহেন—এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হয়—জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ 'বয়কট'-আন্দোলনেরই একটি অঙ্গ। কেননা এবার কংগ্রেসে বিপিনচন্দ্র বয়কটের যে নূতন ব্যাখ্যা করিবেন তাহা আর শুধু বিলাতি নুন, চিনি বা কাপড় বয়কটে সীমাবদ্ধ থাকিবে

না। এদেশে ইংরেজের শাসন-পদ্ধতি বয়কট অর্থাৎ বর্জ্জনের কথা পর্য্যন্তও উঠিবে। সুতরাং উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের কথায় 'গোলদীঘির গোলামখানা' বর্জ্জন যে বাঙ্গালীর বয়কট-আন্দোলনেরই অঙ্গীভূত, ইহাতে আর সন্দেহ কি? গভর্ণমেণ্টের স্কুল-কলেজ বর্জ্জন অর্থাৎ বয়কট না করিলে, জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্ভব হয় কিরূপে?

জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার দান সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য; তিনি রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় নাম দিয়া ১৮৯৮।১২ই নভেম্বর যে বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা সম্পূর্ণ জাতীয় ভাব দ্বারা প্রণোদিত এবং বিংশ শতাব্দীর জাতীয় ভাবের পরিপোষক। পূর্ব্বগামী বেথুন কলেজের আদর্শ হইতে নিবেদিতার স্কুলের আদর্শ পৃথক। ভগিনী নিবেদিতা জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে এই কালের মধ্যে ডন সোসাইটিতে যতগুলি বক্তৃতা দিয়াছেন এবং সংবাদপত্রে যতগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, শিক্ষাব্রতীরা এতাবৎ তাহা মনযোগ সহকারে পাঠও করেন নাই।

নিবেদিতা ও অরবিন্দ, জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে ইঁহাদের উভয়ের লিখিত প্রবন্ধগুলিই এইকালে বাঙ্গালীর জাতীয় শিক্ষার আদর্শ ও ইতিহাস রচনা করিয়াছে। কংগ্রেসে পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর এই জাতীয় শিক্ষার তরঙ্গ, তুফান তুলিয়াছে। অন্য প্রদেশের মুরুব্বীরা ভয় পাইয়াছেন—পিছু হটিয়াছেন। জাতীয় শিক্ষারও ইতিহাস আছে।

বাংলার চরমপন্থীদের স্বরূপ নির্ণয়ঃ প্রথমে বাংলার চরমপন্থীদের স্বরূপ নির্ণয় করা প্রয়োজন। পরে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের চরমপন্থীদের সহিত তুলনা করিয়া দেখাও প্রয়োজন। এই বিশ্লেষণ ও তুলনার উপরেই বাঙ্গালী বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে ইতিহাস রচনা করিয়াছে, সেই ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। ভিত্তি ঠিকমত স্থাপন না করিতে পারিলে তাহার উপর ইতিহাসের মন্দির গড়িয়া তোলা যাইবে না। বাঙ্গালীর বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই, হইতে চলিয়াছে মাত্র।

বাংলার চরমপন্থী নেতাগণ রাজনীতিক্ষেত্রে সকলেই ইংরেজবর্জ্জিত স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। আদর্শপ্রচারে তাঁহারা সকলেই প্রায় একমত। মডারেটপন্থী নেতাগণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন চাহিয়াছেন—ইংরেজবর্জ্জিত

স্বাধীনতা চাহিতে ভরসা পান নাই বা সঙ্গত মনে করেন নাই। চরমপন্থী নেতাদের আদর্শ হইতে মডারেটপন্থী নেতাদের আদর্শ এইখানে পৃথক্।

কিন্তু বাংলার চরমপন্থী নেতাগণ আদর্শ সম্বন্ধে একমত হইলেও, উপায়-নির্দ্ধারণ সম্পর্কে একমত হইতে পারেন নাই। এমন কি একে অন্য হইতে বিরোধী, বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিপিনচন্দ্র শুধু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (Passive Resistance) কথাই বলেন নাই, পরন্তু বৈপ্লবিক গুপ্তহত্যা ও বৈপ্লবিক ডাকাতির বিরুদ্ধে ১৯০৬ বন্দেমাতরম্ পত্রিকায়, ১৯২০ ডিমক্রাট পত্রিকায়, ১৯২১ বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণে নিজের মত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। বিপিনচন্দ্র বলেন যে, আমাদের বর্ত্তমান নিঃসহায় অবস্থায় গুপ্তহত্যারূপ বৈপ্লবিক পন্থা অনুসরণ করিলে প্রতিক্রিয়ামুখে প্রচণ্ডবেগে গভর্ণমেণ্টের দমননীতি আরম্ভ হইবে এবং তাহার ফলে আমাদের নূতন জাতীয় আন্দোলন নিষ্পেষিত হইয়া তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে।

আমরা এপর্য্যন্ত যতদূর দেখিয়া আসিয়াছি তাহাতে বিপ্লবী অরবিন্দ নিশ্চয়ই বিপিনচন্দ্রের সহিত এবিষয়ে একমত নহেন। সুতরাং উপায় নির্দ্ধারণ-সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ, এই দুই চরমপন্থী নেতা পরস্পরবিরোধী উপায় অবলম্বন করিতে বাঙ্গালীকে এবং সেই সঙ্গে সমগ্র ভারতবাসীকে উৎসাহিত করিয়াছেন। ১৯১০।২২শে জানুয়ারী 'কর্ম্মযোগিন্' পত্রিকায় The New Policy নাম দিয়া অরবিন্দ বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে—(ক) বিপিন বাবুই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ভবিষ্যৎ বক্তার মত প্রথম প্রচার করিয়াছেন; (খ) ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক দল তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে।

বাংলার চরমন্থী নেতাদের মধ্য হইতে অরবিন্দকে মুছিয়া ফেলা যায় না। তিনি বাঙ্গালীকে এবং ভারতবাসীকে প্রথম কার্য্যকরীভাবে বিপ্লবের পথে চলিতে উপদেশ দিয়াছেন। অরবিন্দের জীবনচরিতকার এবং তৎকালীন ইতিহাস, ইহা অস্বীকার করিতে পারে না।

বাংলার চরমপন্থী রাজনীতি শুধু বিপিনচন্দ্রের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়, আবার শুধু অরবিন্দের গুপ্তহত্যা ও ডাকাতির বিপ্লবের পথও নয়। এই পরস্পরবিরোধী দুইটী মতের ও পথের একই সময়ে একত্র সমাবেশ আমরা বাংলার চরমপন্থী-রাজনীতির মধ্যে দেখিতে পাই।

অরবিন্দের বিপ্লববাদে শুধু গুপ্তহত্যা ও ডাকাতিই নাই; সেই সঙ্গে একটা ধর্ম্মভাব এবং উচ্চ অঙ্গের আধ্যাত্মিকতাও আছে। এবং তাহা আছে বলিয়াই মারাঠার লোকমান্য তিলকের চরমপন্থী রাজনীতি হইতে বাংলার চরমপন্থী রাজনীতিকে Mr. Nevinson বিশ্লেষণ দ্বারা পৃথক্ করিয়া দেখিয়াছেন।

"There is a religious tone, a spiritual elevation, in such words very characteristic of Arabindo Ghose himself, and of all Bengali Nationalists, contrasted with the shrewd political judgement of Poona Extremists. In an age of super-natural religion, Arabindo would have become what the irreligious mean by a fanatic."—*The New Spirit In India p. 226, by Mr. Nevinson.* এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, কোন নিন্দার ছলে মিঃ নেভিনসন অরবিন্দকে ফ্যানাটিক্ ("fanatic") বলেন নাই। অরবিন্দকে তিনি উচ্চ প্রশংসাই করিয়াছেন।

আনন্দমোহন বসু ঃ জন্ম ১৮৪৭ খৃঃ—মৃত্যু ১৯০৬।১৯শে আগষ্ট। ১৯০৬।২০শে আগষ্ট বন্দেমাতরম্ পত্রিকা আনন্দমোহন বসুর মৃত্যু সংবাদ দিল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলায় জয়সিদ্ধি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। আনন্দ-মোহনের পিতার নাম ছিল পদ্মলোচন বসু। ১৯শে আগষ্ট সন্ধ্যা ৬টার সময় আনন্দমোহনের শ্যালক ডাঃ জে. সি. বসুর কলিকাতায় আপার সারকুলার রোডের বাড়ীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। আনন্দমোহন ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে প্রথম Wrangler হন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি হন। তিনি তাঁহার সভাপতির বক্তৃতায় মিঃ গ্লাডষ্টোনকে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে মিঃ গ্লাডষ্টোনকে অতিশয় মারাত্মক রকমের নিন্দা করিয়াছেন—

"It was true that we went out of our way to flatter Mr. Gladstone, a statesman, who is not only quite unprincipled and is in no way to be relied upon, but whose intervention in an Indian debate has always been of that worst omen to our cause."—[New Lamps For Old—Indu Prakash; August 7, 1893]

মিঃ গ্লাডষ্টোনকে আনন্দমোহন বেশী জানিতেন কি অরবিন্দ বেশী জানিতেন বলা কঠিন। কিন্তু দেখিতেছি উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক্। পরবর্ত্তীকালেও দেখিতে পাইব, মর্লি বা মণ্টেগুকে বিপিনচন্দ্রের চরমপন্থী ও অরবিন্দের বিপ্লবপন্থী দল আদৌ পছন্দ করেন নাই। অরবিন্দ সংস্কার চাহেন না, চাহেন এদেশে ইংরেজ-শাসনের উচ্ছেদ। তাঁহার বৈপ্লবিক চিন্তাধারা একই খাত দিয়া সরল রেখায় সমান প্রবাহিত হইতেছে। সুতরাং গ্লাডষ্টোন-মর্লি সংস্কার তিনি চাহেন নাই।

আনন্দমোহন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একটী চূড়া ছিলেন। কিন্তু অরবিন্দ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কারকদের উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম-প্রসঙ্গে অরবিন্দ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, এই বিজাতীয় কংগ্রেস ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, এই দুই প্রতিষ্ঠানের একটিরও ভবিষ্যতে কোনও আশা নাই।

"With that generation (created by Bankim) the future lies and *not with the Indian un-National Congress or the Sadharan Brahmo Samaj.*"—Bankim Chandra Chatterjee, VII ; Indu Prakash—27th Aug, 1894.]

ব্রাহ্ম সমাজের ব্যাপারেও আনন্দমোহন হইতে অরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক্। মূল কথা, বিপ্লবী অরবিন্দের সহিত ভারতবর্ষের কোন নেতারই, এমন কি লোকমান্য তিলকেরও সম্পূর্ণ মিল হইতে পারে না। অরবিন্দ একক, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বাধীন। তাঁহার সহিত অপর সকল ভারতীয় নেতার সমালোচনায় তুলনা চলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার মতে ও পথে চলিতে অপর কোনও নেতার সহিতই মিল হইতে পারে না।

১৯০৫।১৬ই অক্টোবর আনন্দমোহন মিলনমন্দিরের মাঠে উহার প্রতিষ্ঠাকল্পে যে অপূর্ব্ব বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার জীবনের শেষ বক্তৃতা। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, এমন বক্তৃতা তিনি আর কখনও শুনেন নাই। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর মত জগৎবিখ্যাত বক্তার পক্ষে একথা বলা যে কত বড় কথা তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আনন্দ মোহনের শেষ বক্তৃতা দেশাত্মবোধের যে বেদী রচনা করিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালী জাতি সেই বেদীমূলে চিরদিন ভক্তির অঞ্জলি অবনত-শিরে প্রদান করিবে।

কংগ্রেস : এবার কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, কিন্তু বিষম গোলযোগ উপস্থিত, সভাপতি হইবেন কে ? গত জুন মাসে তিলক মহারাজ কলিকাতা আসিয়া খুব জাঁকাল রকমের শিবাজী উৎসব করিয়া গিয়াছেন। বাংলার চরমপন্থী নেতারাই মি: তিলকের শিবাজী উৎসবের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। সুতরাং তাঁহারাই তিলক মহারাজকে এবার কংগ্রেসের সভাপতি করিবার জন্য বায়না ধরিলেন। কিন্তু মডারেট-নেতা সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী ভুপেন বসু, ইহাতে রাজী হইলেন না। ২৮শে আগষ্ট বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় মি: তিলকের নির্ব্বাচন সমর্থন করিয়া খুব জোর লেখা হইল। Indian Mirror তিলকের নির্ব্বাচনের প্রতিবাদ করায় এই সংখ্যার বন্দেমাতরম্ Mirrorকে এবং সেই সঙ্গে মডারেট দলকে খুব করিয়া গালি দিলেন। মডারেট দল প্রমাদ গনিল। ভুপেন বসু গোপনে বিলাতে দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি হইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া চিঠি লিখিলেন, কেননা চরমপন্থীরা দাদাভাই-এর বিরুদ্ধে হয়ত কোনও আপত্তি করিবে না। নৌরজী সভাপতি হইতে স্বীকার করিলেন। ১২ই সেপ্টেম্বর বন্দেমাতরম্ লিখিলেন যে, মি: তিলকের পরিবর্ত্তে মিঃ নৌরজী সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় ইংরাজরা খুব খুশী হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট ও এতদ্দেশীয় ইংরেজদিগের পক্ষে তিলকভীতি যে কতটা, ইহা হইতেই তাহা বোঝা যায়।

৫ই সেপ্টেম্বর সুরেন্দ্র ব্যানার্জী রাজমুকুট ধারণ করিলেন। চরমপন্থীরা ইহাকে একটা ফার্স বা প্রহসন মনে করিয়া ঠাট্টা করিল। ১৪ই সেপ্টেম্বর সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গীত-সমাজে ও ১৮ই সেপ্টেম্বর ভুপেন বসু পার্শীবাগানের মাঠে ঘন ঘন সভা করিয়া আসর জমাইবার চেষ্টা করিলেন। উদ্দেশ্য চরমপন্থীদের কোণঠাসা করিয়া দেওয়া। ১৪ই সেপ্টেম্বর বন্দেমাতরম্ পত্রিকা আবার লিখিলেন যে, মডারেট-দল ষড়যন্ত্র করিয়া মি: তিলকের নির্ব্বাচন নাকচ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে ("……the conspirators at work to thwart Mr. Tilak's Presidentship)।" ১৮ই সেপ্টেম্বর বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় বিপিন পাল "That Sinful Desire" প্রবন্ধে স্পষ্ট লিখিলেন যে, ইংরেজবর্জ্জিত পূর্ণ স্বাধীনতাই জাতীয় দলের কাম্য। ইহা ডিসেম্বর শেষে নৌরজী কংগ্রেসের প্রায় আড়াই মাস আগের কথা। ২০শে সেপ্টেম্বর Indian Mirror মডারেটদলের পক্ষ হইতে বলিলেন, বন্দেমাতরম্-এ লিখিত

ইংরেজবর্জ্জিত স্বাধীনতা "ইডিয়ট্" ("idiot") ভিন্ন কেহ কল্পনা করিতে পারে না। ইডিয়ট কথাটা ভাল নয়। বন্দেমাতরম্ রাগিয়া জলিয়া উঠিলেন। উত্তরে বলিল—ইডিয়ট্ হওয়া আমাদের একচেটিয়া নয়—মডারেটরাই ইডিয়ট্। বিষম কথা! দলাদলি, গালাগালিতে পরিণত হইল। ভগিনী নিবেদিতা এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এইরূপ দলাদলি ও গালাগালি ভারতীয়দের পক্ষে অযথা শক্তিক্ষয় ও শক্তির অপব্যয় মাত্র। কিন্তু হইলে কি হয়, চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।

১৯০৬।৯ই অক্টোবর বন্দেমাতরম্ মিঃ গোখলের বক্তৃতা তুলিয়া দিলেন। মিঃ গোখলে বক্তৃতা করিয়াছেন যে, বিপিন পালের অনুচরদিগের সংখ্যা অতি নগন্য এবং দেশবাসীদিগের উপর তাঁহাদের প্রভাব কিছুমাত্র নাই। ১২ই অক্টোবর বন্দেমাতরম্ গোখলের এই বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ করিল। গোখলের বক্তৃতা হইতে দুইটী কথা প্রমাণ হইতেছে। ১ম, বাংলার মডারেট-নেতারা বাংলার চরমপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বোম্বাই-এর তথা ভারতের অন্য প্রদেশের মডারেট-নেতাদের সহিত হাত মিলাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন। ২য়, মিঃ গোখলেও মিঃ তিলককে কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে চাহেন না। ইঙ্গিত খুব সুস্পষ্ট।

কংগ্রেসের সঙ্গে এবার স্বদেশী মেলাও আরম্ভ হইল। রয়টার ঐ মেলার বিজ্ঞাপন দিবার ভার লইয়া মেলার জন্য "সুন্দরী যুবতী" চাহিয়া বিজ্ঞাপন দিলেন। এবং স্বদেশী দ্রব্যের সহিত বিলাতী দ্রব্যেরও বিজ্ঞাপন দিলেন। এই কুকাণ্ডটী করিবার ফলে ৪ঠা ডিসেম্বর কৃষ্ণকুমার মিত্র ও ৬ই ডিসেম্বর বিপিন পাল সভা করিয়া এই স্বদেশী মেলা বয়কট করিবার জন্য জোর বক্তৃতা দিলেন। "সুন্দরী যুবতী" যাহাই হউক বিলাতী দ্রব্য কিছুতেই চলিতে পারে না। অতএব স্বদেশী মেলাও বয়কট অর্থাৎ বর্জ্জন করা একান্ত কর্ত্তব্য। বাংলার চরমপন্থীদের মাথায় তখন বয়কটের খুন চাপিয়া বসিয়াছে, আর রক্ষা নাই। বড়লাট মিণ্টো মডারেট-নেতাদের চক্রান্তে স্বদেশী মেলার দ্বার উদ্ঘাটন করিতে আসিয়া সদুপদেশ দিলেন যে—তোমরা স্বদেশী কর, মেলা কর, আমি খুশী আছি; কিন্তু রাজনীতির সহিত ইহার কোন সংশ্রব রাখিও না। রাজনীতিবর্জ্জিত নিরামিষ স্বদেশীকে আমি ("honest") স্বদেশী

বলিয়া আখ্যা দিলাম। অর্থ এই—তোমরা বয়কটমূলক dishonest (অসাধু?) স্বদেশী করিও না।

২৩শে ডিসেম্বর প্রভাতে তিলক, খাপার্দে, লাজপত রায় কলিকাতা আসিলেন। আসিয়াই ঐদিন বৈকালে বিডন উদ্যানে লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে এক সভা করিয়া বড়লাট মিণ্টোর honest স্বদেশীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। বড়লাট মিণ্টোর পশ্চাতে যেমন বাংলার মডারেট দলের হাত দেখিতে পাইতেছি তেমনি তিলক, খাপার্দে, লাজপত রায়ের সভার পশ্চাতে বাংলার চরমপন্থী দলের হাতও দেখিতে পাইতেছি। নরম গরম দুই দলে খুব জোর দলাদলি চলিতেছে। ঠিক এই সময় ঢাকা সহরে নবাব সলিমুল্লার প্রাসাদে মোসলেম লিগ ভূমিষ্ঠ হইবে বলিয়া সূতিকাগারের আয়োজন চলিতেছে। সম্ভবত: কংগ্রেসী নরমপন্থী ও চরমপন্থীরা দলাদলির মোহে ইহা সেদিন কল্পনাও করিতে পারেন নাই। এবং আরও কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, এই নবজাত শিশু মোসলেম লিগ ভবিষ্যতে কি ভয়ঙ্কর ইতিহাস রচনা করিবে।

মিঃ সি. আর. দাশের বাড়ীর অনতিদূরে বিস্তৃত মাঠে রসা রোডের উপর কলিকাতা নৌরজী কংগ্রেসের বস্ত্রনির্ম্মিত উচ্চ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করা হইল (* ক)।

(* ক) এই কংগ্রেসে (১৯০৬) Mr. C. R. Das উপস্থিত ছিলেন না। অথচ তাঁহার রসা রোডের বাড়ীতে লোকমান্য তিলক, খাপার্দে, ডা: মুঞ্জে প্রভৃতি অতিথি ছিলেন।

দেশবন্ধুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রদ্ধেয়া অপর্ণা দেবী লিখিয়াছেন (মানুষ চিত্তরঞ্জন, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৫) যে, "বাবা এ কংগ্রেস এড়াবার জন্যই মা'র উপর অতিথি সৎকারের ভার দিয়ে পুরুলিয়া ঠাকুরমা-দাদামণির সঙ্গে চলে গেলেন। ...কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে গেলেই পিতৃদেব কলিকাতা ফিরে এলেন। লোকমান্য তিলক তার পরেও কিছুদিন ছিলেন।" পরিষ্কার কথা।

কিন্তু—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের জীবন-চরিত লেখক বি. অনিমানন্দ লিখিয়াছেন যে, Mr. C. R. Das এই কংগ্রেসে ডেলিগেট হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

"He (Mr. C. R. Das) attended this Congress (1906) as a delegate"—Blade—Life and Work of Brahmobandhab Upadhya—p. 147 by Animanando. অনিমানন্দ ঠিক কথা লেখেন নাই। তাঁহার অনুসন্ধানে ত্রুটি আছে।

২৪শে ডিসেম্বর প্রভাতে সভাপতি দাদাভাই নৌরজী আসিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ রাসবিহারী ঘোষকে সম্মুখে লইয়া বাঙ্গালী বিপুল সমারোহে হাওড়া ষ্টেশন হইতে দাদাভাইকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিল। রাস্তায় আসিতে প্রাচীরের গায়ে বাঙ্গালী লিখিয়া দিল: বয়কট সমর্থন কর—ইংরেজবর্জ্জিত স্বাধীনতা সমর্থন কর, "Support Boycott—Support Autonomy." বৃদ্ধ দাদাভাই চশমার ভিতর হইতে ইহা পাঠ করিলেন এবং বাঙ্গালার জাতীয় দলের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি বৃদ্ধ হইলেও নেতাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিচক্ষণ ব্যক্তি। ২৬শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের সভা বসিল। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ তাঁহার অভ্যর্থনা-বক্তৃতা পাঠ করিলেন। তিনি বরিশালের দমননীতির কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, বাঙ্গালী যে সেদিন বরিশালে পুলিশের এই দমন-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয় নাই, তাহার কারণ ইহা নয় যে বাঙ্গালী ভীরু এবং কাপুরুষ; তাহার কারণ ইহাই যে বাঙ্গালী সেদিন নেতাদের পরামর্শে আইন ভঙ্গ করে নাই, রক্তদান করিয়া আইন মান্য করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। এ বক্তৃতার পরেও কিন্তু বন্দেমাতরম্ ডাঃ ঘোষকে উপহাস করিয়া লিখিলেন যে, বাঘ বেড়ালের মত ম্যাও ম্যাও করিতেছে—"The tiger muses." বৃদ্ধ দাদাভাই তাঁহার বক্তৃতার প্রথম অংশমাত্র পাঠ করিয়া বিগত কাশী-কংগ্রেসের তরুণ সভাপতি মিঃ গোখলেকে সমগ্র অভিভাষণটী পড়িতে দিলেন। মিঃ গোখলে দাদাভাই-এর অভিভাষণটী সুন্দররূপে পাঠ করিলেন। দাদাভাই আবেদন-নিবেদন নীতির কথাই বলিলেন, বয়কটের কথা বলিলেন না। এবং উপনিবেশগুলির মত স্বায়ত্তশাসন চাহিলেন। কিন্তু ইংরেজবর্জ্জিত পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলিলেন না। বাংলার চরমপন্থী জাতীয় দল যে আদর্শ ও উপায় লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, দাদাভাই-এর অভিভাষণে তাহার প্রতিধ্বনি শুনা গেল না। না গেলেও বিষয়-নির্দ্ধারণ সমিতির আলোচনার ফলে যাহা ঘটিল এবং দাদাভাই উপসংহারে যে বক্তৃতা করিলেন, তাহা শুনিয়া ৩০শে ডিসেম্বর বন্দেমাতরম্ লিখিলেন যে—যদিও আমরা দাদাভাই-এর প্রথম বক্তৃতা শুনিয়া নিরাশ হইয়াছি, কিন্তু তাঁহার উপসংহারের বক্তৃতা শুনিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ("We were disappointed at the President's address, but his concluding speech has made it up.")

এখন দেখা যাক বিষয়-নির্দ্ধারণ সমিতিতে কি সব কাণ্ড ঘটিল। স্বয়ং

সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি—আর কেহ নহেন—বয়কট-প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। করা মাত্রই পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া সোজা আপত্তি করিলেন। কোনই ঘোরপ্যাঁচ নাই। পাঞ্জাবীরা বয়কট চাহেন না জানিয়া এমন যে লাজপত তিনিও একটু ঘোরপ্যাঁচ দিয়া বয়কট-প্রস্তাবকে চালু করিবার চেষ্টা করিলেন। লালমোহন ঘোষও আগুনে কিছু জল ঢালিলেন। সুরেন্দ্র নাথ অতি আশ্চর্য্য রকমে সকলের সংশোধন প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। নৌকা ভরাডুবি হয় দেখিয়া বিপিনচন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া বয়কট সম্পর্কে এক জবর সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। ফলে সকল প্রদেশের নেতারাই হতভম্ব হইয়া গেল। বৃদ্ধ দাদাভাই বিপিন বাবুর সংশোধক প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন, ভোট গণনা করিতে দিলেন না। ফলে, তিলক বিপিনচন্দ্র অরবিন্দ মতিলাল ঘোষ খাপার্দ্দে অশ্বিনীকুমার দত্ত বিষয়-নির্দ্ধারণ সমিতি ছাড়িয়া রাগ করিয়া সম্মুখে মিঃ সি. আর. দাশের বাড়ীতে আসিয়া জটলা করিতে লাগিলেন এবং সলা-পরামর্শ চলিতে লাগিল। আগামী বৎসর সুরাটের দক্ষযজ্ঞের ইহাকেই দ্যোতনা—সূচনা বা পূর্ব্বাভাস বলা যাইতে পারে। কলিকাতায় যে কারণের জন্য যাহা ধূমায়িত, ঠিক সেই কারণের জন্যই পরবর্ত্তী বৎসরে সুরাটে তাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল।

এই ঘটনা লইয়া স্যার ফিরোজ শা মেহেতার সহিত মিঃ তিলকের কিছুটা বচসা হইয়া গেল। ফলে মিঃ মেহেতা গোঁসা করিয়া টিফিনের পর আর সভায় আসিলেন না। পরের দিন বাংলার চরমপন্থী দলের জয় হইল যে, বয়কট বাংলার পক্ষে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। গত কাশী-কংগ্রেসেও বাংলার পক্ষে বয়কট ন্যায়সঙ্গত, কংগ্রেস স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা বিশেষ নূতন কথা নয়।

কিন্তু বিপিন পাল বলিলেন, বয়কট বাংলা ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও গ্রহণযোগ্য আর বয়কট শুধু বিলাতী নুন চিনি কাপড় বয়কট নহে, পূর্ব্ববঙ্গে গভর্ণমেণ্ট যেরূপ চণ্ডনীতি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে ইংরেজ-শাসনের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব বর্জ্জন করাই বাংলার নূতন জাতীয় দলের উদ্দেশ্য। ভিমরুলের চাকে ঢিল পড়ার মত সকলে চমকিত হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা গান্ধীর যুগে বিপিনচন্দ্রের ১৫ বৎসর পর আমরা এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনিয়াছি মাত্র। এই ঘটনার ১৩ বৎসর পূর্ব্বে অরবিন্দ সত্যই লিখিয়াছিলেন: বাঙ্গালী কাল

যাহা ভাবিবে তার ১ সপ্তাহ পরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলি তাহাই ভাবিবে ("What Bengal thinks tomorrow, India will be thinking tomorrow week.")। যাহা হউক মি: মালব্য এবং মাদ্রাজের গোবিন্দ রাঘব আবার বিপিনচন্দ্রের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, বাংলার পক্ষে বয়কট ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে কিন্তু অন্য প্রদেশের পক্ষে তাহা গ্রহণযোগ্য নয়। মিঃ গোখলেও সেই মত প্রকাশ করিলেন। মিঃ আশুতোষ চৌধুরী বলিলেন— আহা আপনারা রাগ করেন কেন, আমরা ত শুধু বাংলার কথাই বলিতেছি। ইহারই নাম কংগ্রেস-মণ্ডপে ভারতের সকল প্রদেশ মিলিয়া একতা! অরবিন্দ কংগ্রেসের এই মেকী একতার প্রহসনের উপর এবং বাংলার প্রতি বিরুদ্ধাচরণের উপর বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় তীব্র কষাঘাত করিতে কোন দিন পিছপা হন নাই।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত জাতীয় শিক্ষার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ('even at some sacrifice') স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার-প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

বয়কট, স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষার প্রস্তাব মঞ্জুর হওয়ার পর সর্ব্বশেষে সভাপতি দাদাভাই নৌরজী কংগ্রেসের আদর্শ 'স্বরাজ' বলিয়া ঘোষনা করিলেন। সুতরাং কলিকাতা কংগ্রেসে আমরা স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা— এই চারিটী প্রস্তাবের সমর্থন পাইলাম। বাংলার জাতীয় দল এবং এমন কি মিঃ তিলক কলিকাতা-কংগ্রেসের ফল দেখিয়া ভাবিলেন যে, মডারেট দল কোণঠাসা হইয়া গিয়াছে এবং জাতীয় দলের জয়জয়কার হইয়াছে।

মিঃ লালমোহন ঘোষ সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া চরমপন্থী দলের কর্ম্ম-পদ্ধতিকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করিলেন। কিঞ্চিৎ ভৎর্সনাও করিলেন। তিনি বলিলেন, আবেদন-নিবেদন নীতি পাপ নহে—Mendicancy was no sin. ৩০শে ডিসেম্বর বন্দেমাতরম্ পত্রিকা A sitter on the fence বলিয়া লালমোহনকে খুব একচোট নিল। এই লেখাটী অরবিন্দের লেখা বলিয়াই মনে হইতেছে। অরবিন্দ লিখিলেন, লালমোহন তাঁহার অনশনক্লিষ্ট মুমূর্ষু মায়ের জন্য একজন সুস্থকায় ব্যক্তিকে শুধু ভিক্ষা করিয়া খাদ্য সংগ্রহের উপদেশ দিলেন এবং তারপর লিখিলেন:

"The coming prophet must not shrink from proclaiming the only truth as to how nations are made and regenerated,

which according to Robespierre strike terrors into the heart and conjures up horrors of chaos." অরবিন্দ লালমোহনকে উপহাস করিয়া আরো বলিলেন যে, লালমোহন গত বার বৎসর যাবৎ কংগ্রেসের সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার কার্য্যমাত্র করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। অথচ সেই সঙ্গে লালমোহনকে ইহাও স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, কংগ্রেস জন্মিবার দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮৩ খৃঃ বিলাতে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধবাদী মিঃ ব্রামসনকে কি তীব্র ভাষায় গালাগালি দিয়াছিলেন : "He called Mr. Bramson a pitiful cur that covers his recreant limbs with the borrowed hide of the lion." অরবিন্দ লালমোহনকে ছাড়িয়া কথা কহেন নাই। তাঁহার মতন নির্ভীক সমালোচক অতি অল্পই দেখা যায়। ৩০শে ডিসেম্বর তিনি বন্দেমাতরম্-এ কংগ্রেসের ফলাফল সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ লিখিলেন :

"The results of the Calcutta Congress :

The forward party hoped to lend the impress of the new thought and life on the Congress of 1906 to get entire self-government recognised as the ideal of the Congress and Swadeshi and Boycott as the means to obtain it······*The Congress has recognised the legitimacy of boycott movement without limitation or reservation* ; recognised Swadeshi movement in its entirety and national educatioan. We were disappointed at the President's addrese, but his concluding speech has made it up."

১৯০৭।৩রা জানুয়ারী বন্দেমাতরম্ পত্রিকা মিঃ তিলকের এলগিন রোডের বক্তৃতা উদ্ধার করিয়া দিল। মিঃ তিলক বলেন, দাদাভাই আমাদিগকে স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ দিয়া গেলেন। স্বদেশীতে যাহার আরম্ভ, স্বরাজে তাহার পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাইব। বয়কট-প্রস্তাব মঞ্জুর হওয়ায় আর একটী লাভ হইল। যদিও অন্য প্রদেশগুলিকে বয়কট অবলম্বন করিতে বাধ্য করা হইল না, তথাপি অন্য প্রদেশগুলি ইচ্ছা করিলেই ইহা গ্রহণ করিতে পারে।

"D. Nooroji gives us absolute self-government as our ideal. Swadeshi is the beginning of self-government and in Swaraj it will culminate. The boycott resolution has been another gain. We have succeeded in getting the resolution passed. Different interpretations have been put on this resolution. But it should be observed that the resolution does not compel other provinces to have recourse to boycott. It only recommends that the boycott may be accepted by the provinces, as it is a legitimate weapon."

অরবিন্দ মিঃ তিলক ও বিপিনচন্দ্রের অনুগামী হইয়া এই কংগ্রেসে শুধু নীরবে বসিয়া থাকিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, কোনওরূপ বাঙ্ নিষ্পত্তি করেন নাই। তাঁহার যাহা বলিবার কথা তাহা শুধু এই সময়কার বন্দেমাতরম্ পত্রিকার মারফতে প্রকাশ করিয়াছেন।

ভগিনী নিবেদিতা পীড়িত : ভগিনী নিবেদিতা উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে সেবাকার্য্য চালাইয়া অসুস্থ শরীরে কলিকাতা ফিরিয়াছেন। কলিকাতায় তখন নৌরজী-কংগ্রেস আসন্ন, কিন্তু তিনি দমদমে আনন্দমোহন বসুর বাগানবাড়ীতে শয্যাশায়ী অবস্থায় পড়িয়া আছেন। জ্বরে তাঁহার মস্তিষ্ক আক্রান্ত (cerebral fever) হইয়াছে। তিনি কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারেন নাই। মিঃ গোখলে রাত জাগিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন, মাথায় বরফ দিতেছেন। "On the eve of the Calcutta Congress she (Nivedita) had been suffering from cerebral fever. She went to Dum Dum, 8 kilometres from Calcutta, in the house of A. M. Bose, a magnificent retreat in a garden of mangoes···Gokhale attended her by turns and passed several nights at her bedside, crushing and applying ice on her head—[pp. 301-309]

ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দের সহিত বৈপ্লবিক কর্ম্মে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, ইহা আমরা দেখিয়াছি—দেখিতেছি। মিঃ গোখলে অতিমাত্রায় মডারেট, এবং সম্পূর্ণ বিপ্লববিরোধী। অরবিন্দ মিঃ গোখলেকে আদৌ সহ্য করিতে

পারেন না—"দেশদ্রোহী বিভীষণ" বলিয়া খবরের কাগজে স্পষ্ট লিখিতে দ্বিধা করেন না। অথচ ভগিনী নিবেদিতাই বা গোখলের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন কিরূপে? এবং মি: গোখলেই বা কংগ্রেসের কর্ম্মব্যস্ততার মধ্য হইতে ছুটিয়া আসিয়া রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া দমদমের বাগানে গিয়া ভগিনী নিবেদিতার মাথায় বরফের প্রলেপ দিতেছেন কেন? মি: গোখলে কি প্রিন্স্ ক্রোপাট্কিন্-শিষ্যা, বৈপ্লবিক কর্ম্মে অরবিন্দের বিশ্বস্ত সহযোগী, ভগিনী নিবেদিতার প্রকৃত পরিচয় জানিতেন না? অথবা, জানিয়াও ভগিনী নিবেদিতার গুণমুগ্ধ হইয়াছিলেন?

ভগিনী নিবেদিতা রমেশ দত্তকেও বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। বিলাতে বহুদিন তিনি রমেশ দত্তের সঙ্গলাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই রমেশ দত্তই বরোদার মহারাজার সহিত ভগিনী নিবেদিতার ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রথম পরিচয় করাইয়া দেন। রমেশ দত্তও ভয়ঙ্কর রকমের "মডারেট্" ছিলেন। দেখিতেছি, ভগিনী নিবেদিতা, রমেশ দত্ত গোখ্লে প্রভৃতি মডারেটদের যেরূপ গুণগ্রাহী ও অনুরাগী ছিলেন—অরবিন্দ তাহা ছিলেন না। অরবিন্দ মডারেটদের সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ অসহিষ্ণু ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে এইখানে অরবিন্দের একটু পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

কলিকাতা কংগ্রেস (১৯০৬) ও লাহোর কংগ্রেস (১৯২৯):

কলিকাতা নৌরজী কংগ্রেসে অরবিন্দ কোন ভূমিকাই গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু এই নীরব বিপ্লবী সেদিন কংগ্রেস-মণ্ডপে বোবা হইয়া বসিয়া থাকিয়া যুগান্তকারী সমস্ত ঘটনাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। এই কংগ্রেসের ঘটনাবলী তাঁহার মনের উপর কিরূপ ক্রিয়া করিয়াছিল, তাহা প্রতিক্রিয়ামুখে এই সময়কার বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় তিনি অকুণ্ঠ ভাষায় নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এই সময়কার বন্দেমাতরম্ না পড়িলে অরবিন্দের এই সময়কার জীবন-ইতিহাস জানা যাইবে না।

এখন দেখা যাক্ বাংলার স্বদেশী আন্দোলন কলিকাতা কংগ্রেসকে কি দিল? এবং কলিকাতা কংগ্রেস ভারতবাসীকে কি দিল? প্রধানত: দুইটী জিনিষ কলিকাতা কংগ্রেসের নিকট আমরা পাইলাম—১ম, স্বরাজ; ২য়, বয়কট। কিন্তু কংগ্রেসের মুরুব্বীরা স্বরাজ ও বয়কটের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সকলে একমত হইতে পারিলেন না। সভাপতি দাদাভাই তাঁহার

বক্তৃতায় উপনিবেশের মত স্বায়ত্তশাসন চাহিলেন। যদি এই অর্থে তিনি স্বরাজ কথা ব্যবহার করিয়া থাকেন তবে স্বরাজ অর্থ ইংরেজবর্জ্জিত পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, সাম্রাজ্যের অধীন উপনিবেশগুলির মত স্বায়ত্তশাসন মাত্র। কিন্তু বিপিনচন্দ্র প্রমুখ বাংলার চরমপন্থী নেতাগণ উপনিবেশগুলির মত স্বায়ত্তশাসন চাহেন না। তাঁহারা স্বরাজের অর্থ করিলেন, ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া সাম্রাজ্যের বাহিরে পূর্ণ স্বাধীনতা। কলিকাতা কংগ্রেসের আট মাস পূর্ব্বে বাংলাদেশের মফঃস্বলে বহু সভাতে ইংরেজ-বর্জ্জিত এই পূর্ণ স্বাধীনতা বাঙ্গালী দাবী করিয়াছিল। ফলে ১৯০৬।১৮ই সেপ্টেম্বর অর্থাৎ নৌরজী কংগ্রেসের সাড়ে তিন মাস পূর্ব্বে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র That Sinful Desire নাম দিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে খোলাখুলি ইংরেজ-বর্জ্জিত পূর্ণ স্বাধীনতাই দাবী করা হইয়াছিল। সুতরাং স্বরাজের ব্যাখ্যা লইয়াও গোলযোগ থাকিয়া গেল।

তারপরে বয়কট। অন্য প্রদেশের মুরুব্বীরা তো স্পষ্ট দাঁড়াইয়া বলিলেন যে, তাঁহারা বিলাতী দ্রব্যের বয়কট গ্রহণ করিবেন না। আবার এদিকে বিপিনচন্দ্র বয়কটের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিলেন যে, ইহাতে শুধু বিলাতী নুন চিনি কাপড় বর্জ্জন নহে, পরন্তু ভারতবর্ষে ইংরেজের শাসন-পদ্ধতি বর্জ্জন করাও এই বয়কটের অন্তর্ভুক্ত। বড় বিষম কথা! মহাত্মা গান্ধী সেদিন কলিকাতা কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন না। থাকিলে বিপিনচন্দ্রের বয়কট-ব্যাখ্যা তিনি সমর্থন করিতেন কি প্রতিবাদ করিতেন, তাহা দেখিবার ও শুনিবার বিষয় ছিল।

এই কলিকাতা কংগ্রেসের চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ ইন্দু-প্রকাশ পত্রিকার প্রবন্ধে স্বরাজ অর্থে ইংরেজবর্জ্জিত স্বাধীনতার কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু তখন তিনি বয়কট বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance)-এর কথা বলেন নাই। পরন্তু ফরাসী বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া ভারতীয় প্রলিটেরিয়েটদের দ্বারা প্রকাশ্য বিদ্রোহ বা বিপ্লবের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বিপ্লবী অরবিন্দ বয়কটবাদী বা নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধবাদী ছিলেন না। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর খবরের কাগজের লেখায় ও কয়েকটী বক্তৃতায় তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সমর্থন করিয়াছেন।

তাঁহার বন্দেমাতরম্ ও কর্ম্মযোগিন্-এর লেখায় এবং বক্তৃতায় এই প্রমাণ আমরা পাই। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময় অরবিন্দ যখন প্রকাশ্যে নিষ্ক্রিয়

প্রতিরোধ এবং বয়কট প্রচার করিতেছিলেন তখন সেই সঙ্গে আবার তিনি গোপনে গুপ্তসমিতির বৈপ্লবিক দলেও নেতৃত্ব করিতেছিলেন। বিপিনচন্দ্রকে বুঝা সহজ, কিন্তু অরবিন্দকে বুঝা কঠিন। বিপিনচন্দ্র অপেক্ষা অরবিন্দের রাজনীতি অধিকতর জটিলতায় পূর্ণ। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসের ৩৭ বৎসর পূর্বে অরবিন্দ ইন্দুপ্রকাশের প্রবন্ধে ভারতবাসীকে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ দিয়াছেন। সুতরাং অরবিন্দের ৩৭ বৎসর পর মহাত্মা গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ভারতবাসীকে বলিয়াছে। আদর্শ ও কল্পনার ক্ষেত্রে অরবিন্দ সকল নেতা অপেক্ষা অগ্রগামী।

এই কলিকাতা কংগ্রেসের চব্বিশ বৎসর পর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে গান্ধীযুগে লাহোর কংগ্রেস নৌরজী কংগ্রেসের স্বরাজের অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিল ও গ্রহণ করিল। স্বদেশীযুগে বাংলার চরমপন্থীরা যে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ দিয়াছিল, তাহার পঁচিশ বৎসর পর গান্ধীযুগের কংগ্রেস উহা গ্রহণ করিল। কংগ্রেসী রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙ্গালী পঁচিশ বৎসর আগে যাহা বলিয়াছে, যে আদর্শ দিয়াছে, তাহার পঁচিশ বৎসর পর অন্য প্রদেশের অধিবাসীরা কংগ্রেস মণ্ডপে সেই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আসিয়া ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যোগ দিয়াছেন এবং যোগ দিবার ১৫ বৎসর পরে তিনি অতি সন্তর্পণে কংগ্রেসকে দিয়া পূর্ণ স্বাধীনতার কথা উত্থাপন করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী মি: গোখলের শিষ্য। মিঃ গোখ্‌লে স্যার ফিরোজ শা মেহেতার শিষ্য। গুরুপরম্পরায় ইঁহারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকতর পক্ষপাতী। কিন্তু সময়ের স্রোত প্রবল, কাজেই মহাত্মা গান্ধী ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যোগ দিয়া বাংলার স্বদেশীযুগের বিপিনচন্দ্রের ও অরবিন্দের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করিতে দীর্ঘ ১৫ বৎসরকাল অতিবাহিত করিলেন।

কলিকাতা শিল্প-প্রদর্শনী (১৯০৬) : কংগ্রেসের সঙ্গে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় শিল্প-প্রদর্শনী হয়। ঐ প্রদর্শনীতে শ্রীযুক্তা হিরণ্ময়ী দেবী বাঙ্গালীকে তথা ভারতবাসীকে চরকায় সুতা কাটিতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, আমাদের মেয়েরা আলস্যে বহু সময় বৃথা অপব্যয় করিয়া থাকেন। তাহা না করিয়া যদি চরকায় সুতা কাটেন তবে পরিধেয় বস্ত্রের অভাব অনেকটা দূর হয় এবং ম্যানচেষ্টারের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশীয় মিলগুলি যেরূপ আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না তাহাতে চরকায় সুতা কাটা

বস্ত্রে ম্যাঞ্চেষ্টারকেও কিছুটা বাধা দেওয়া যায় এবং সেই সঙ্গে দেশীয় মিলগুলিকেও যথেষ্ট সাহায্য করা হয়। আর ইহা কিছু এমন নূতন কথা বা নূতন কাজ নয়। কিছুদিন পূর্ব্বেও (অর্থাৎ মুসলমান আমলে) আমাদের মেয়েরা যথেষ্ট পরিমাণে চরকায় সুতা কাটিত।

"*The Charka* : Hironmoyee Devi advocated Charka in the Industrial Conference. She said : if we could not utilize the leisure of our women, which is now uselessly frittered away in some small industries, assuming that the 'Charka' cannot compete with machinery, it will yet give food to millions of starving women and find some useful work for those who have, for want thereof, to fritter away their leisure hours by working the 'Charka', and they can easily do so now. Then again bear in mind that Manchester is trying to kill our mill industry, and of this we are daily getting more and more tangible proof."—[অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় উদ্ধৃত। ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯০৬।]

অনেকের ধারণা, মহাত্মা গান্ধী চরকার প্রথম প্রবর্ত্তক। অবশ্য ব্যাপক-ভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে তিনি চরকা ও খাদি প্রবর্ত্তন করিবার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয়—এমন কি অনেকের মতে অপব্যয় করিয়াছেন। তা করুন, কিন্তু স্বদেশী যুগে মহাত্মা গান্ধীর ১৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীই চরকার প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, একথা বাংলার মেয়ে হিরণ্ময়ী দেবীর বক্তৃতা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন।

কুমিল্লা (মার্চ্চ। ১৯০৭) ও জামালপুর (এপ্রিল। ১৯০৭) : কুমিল্লা ও জামালপুর পূর্ব্ববঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসকে চিরদিনের জন্য মসী-লিপ্ত করিয়া দিয়াছে। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে : ঢাকার নবাব সলিমুল্লা মার্চ্চের প্রথম সপ্তাহে তাঁহার জমিদারী কুমিল্লাতে গমন করেন। এবং সেখানে গিয়া মুসলমানদের দ্বারা স্বদেশী ও বয়কট সভার প্রতিবাদ করান। শুধু মৌখিক প্রতিবাদ নয়, মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে আক্রমণ করে। দাঙ্গার ফলে খুন পর্য্যন্ত হয়। হিন্দুর দোকান মুসলমানেরা লুঠ করে, হিন্দুর বিধবাদিগকে

মুসলমানেরা বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায়। গুজব রটে যে, এই সকল দুষ্কার্য্যে গভর্ণমেণ্ট মুসলমানদিগকে শাস্তি তো দিবেনই না বরং উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। মিঃ নেভিনসন লিখিয়াছেন—

"In the first week of March, the Nawab Salimullah of Dacca visited the small town of Comilla. ··· ··· By one means or another, the report was circulated throughout the country that the Indian Government was favouring the Mahommedan population and would inflict no punishment for the looting of Hindu shops or the abduction of Hindu women, especially widows. Accordingly, shops were looted, Hindu widows abducted, and the cases of outrage upon women by gangs increased in number."—The New Spirit In India ; Introduction p. 16—*by Mr. Nevinson.*

ভগিনী নিবেদিতা ও গুপ্ত-সমিতির ২য় পর্ব : ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্তসমিতির ১ম পর্ব্বের সহিত জড়িত ছিলেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। গুপ্তসমিতির ২য় পর্ব্ব, ১৯০৬।মার্চ্চ মাসে, "যুগান্তর"-এর প্রকাশ হইতেই আরম্ভ হয়। ভগিনী নিবেদিতা "যুগান্তর"-এর প্রথম প্রকাশের সঙ্গেই ইহার সহিত জড়িত ছিলেন ; এবং পরে "বন্দেমাতরম্" (১৯০৬।৭ই আগষ্ট)-এর সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার ফরাসী জীবনচরিতে ইহার উল্লেখ আছে।

ঐ ফরাসী জীবনচরিতেই আরও উল্লেখ আছে যে, কলিকাতা নৌরজী-কংগ্রেস (১৯০৬।২৬শে ডিসেম্বর) হইতেই, ভগিনী নিবেদিতা বারীন্দ্রের গুপ্ত-সমিতিকে আইরিশ্ (আয়র্ল্যাণ্ড-দেশীয়) গুপ্ত সমিতির কর্ম্মকৌশল (technique, 'টেকনিক্') শিক্ষা দিতেছেন এবং এই গুপ্তসমিতির কার্য্যে নিজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছেন।

"Her activities commenced in the beginning of 1907, when the nationalists were knocking at her gate······. She taught them at once the mechanism of the secret society, such as Ireland knew. There already existed *Samitis* in

many Indian villages, but the effort remained fragmentary. A step yet remained to form what constitued the 'active cell' where every man would represent the entire group and become responsible for the honour of all.......

"Then she long insisted on the absolute security of the immense network of secret communications spread over the whole country like the web of protecting spider.......

"It was necessary that the orders should be transmitted as rapidly as by post, from man to man by the signs, by the messages learnt by heart The appeal was listened to. The messengers would be massacred sooner than corrupted, the goals assigned were persued with a devotion almost superhuman. From one village to another, the cry would run : We are prepared ! .. ... When the English soldiers came upon a region, the population burnt their provisions and deserted the villages for the jungles. ... To save the prescribed persons who are helpless, they would give all that they possess. They would give also their own sons as guide across the dangerous jungles, the pestilential marshes, the mountain defiles......the women remained employed, trusting their children, in the community of the village. ...

"This co-operation from man to man, from village to village, created two necessities. The first was the immediate organisation of a system of successors. 'Money is necessary, more money'—said Nivedita. All the money which fell into their hands was distributed in the villages by *Barindra*. The women carried their jewels to her (Nivedita). The princes gave a part of their revenue, the zaminders their income, the employees their salaries, the

merchants grains. The work of *mutual aid* would be born spontaneously, for the moral body of India now had nerves, muscles, blood. When one member suffered, the country as a whole came to his aid.

"The second necessity was the creation of rapid information which would satisfy even the illiterate peasants, those who were grouped round their institutor, the collector of imposts. It was for them that Nivedita revealed to her friends······seditious journals······'

অরবিন্দ তাঁহার গুপ্ত সমিতির দলকে এইরূপ সংগঠন এবং কর্ম্মের কৌশল কোন দিন শিক্ষা দেন নাই, কেননা উহা তিনি জানিতেন না। ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দের গুপ্তসমিতিকে এই শিক্ষা দিয়াছেন। কেননা, প্রিন্স ক্রোপাট্‌কিনের শিষ্যা এবং আয়র্ল্যাণ্ডের গুপ্তসমিতির অভিজ্ঞ পরিচালিকা, ইহা জানিতেন। অরবিন্দ গুপ্ত-সমিতির কর্ম্মকৌশল (technique) না জানার দরুণ হেমচন্দ্র কাননগু তাঁহাকে "theoretical" বলিয়াছেন। তাঁহার অর্থ, অরবিন্দ "practical" নহেন।

ভগিনী নিবেদিতা এই সম্পর্কে আরও অধিকতর বিপজ্জনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। যথা,

"She was closely connected with the starting of *Yugantar*, which appeared in a definite form in March, 1906. She collaborated directly and indirectly with the *Yugantar*, and certainly also with the *Bande Mataram* started by Bepin Chandra Pal. Then followed the sudden deportation of Lajpat Rai, Krishnakumar Mitra and Ajit Singh. The first bomb burst in May, 1907. Prisons became full. Her house became a veriable depot of provisions for the fugitives. *She was not a stranger to the fabrication of cxplosives issuing from Muraripukur Road, for she directly associated with the friends of Barindra Ghose. She procured admission of some*

students to the classes of Jagadish Bose and P. C. Roy of the Presidency College, Calcutta with the purpose of making them secretly learn the necessary process of reaching the formulae for preparation of bombs. The police suspected her and in disguise watched her movements."—[অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক ফরাসী জীবন-চরিতের অনুবাদ, p. 296—310]

অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির দলকে ভগিনী নিবেদিতার গুপ্ত সমিতির দল বলিলে কিছু মিথ্যা হয় না।

কুমিল্লায় ঘটনার দেড়মাস পরে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে জামালপুরেও বাসন্তী-পূজার সময় ঐরূপ হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয়। বাসন্তী-প্রতিমাকে মুসলমানেরা ভগ্ন করিয়া দেয়। গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর কাছারি লুট হয়। হিন্দু স্ত্রীলোকদের উপর মুসলমান গুণ্ডারা অত্যাচার করে, পুলিশ মুসলমান গুণ্ডাদিগকে না ধরিয়া উণ্টা নির্য্যাতিত হিন্দুদিগকে গ্রেপ্তার করে। মিঃ নেভিনসন লিখিয়াছেন—

"In the third week of April further disturbances broke out at Jamalpur, another small town in Eastern Bengal, where the Hindus, during a festival, were set upon by Mahommedan of rowdies, desecrated a temple and maintained panic in the district for the next few weeks."—The New Spirit in India ; Introduction P. 16—*by Mr. Nevinson.*

বঙ্গভঙ্গের সময় হইতে বড়লাট কার্জ্জন ও ছোটলাট ফুলার সাহেব বাংলার মুসলমানদিগকে বুঝাইতেছিলেন যে, হিন্দুর সঙ্গে যোগ দিলে মুসলমানদের কোনই সার্থসিদ্ধি হইবে না বরং গভর্ণমেণ্টের পক্ষে থাকিলে তাহাদের সম্প্রদায়-গত স্বার্থ ষোল আনা সিদ্ধ হইবে এবং তাহারা যদি স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুর বিরুদ্ধে যায় তবে গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে বিশেষ অনুগ্রহই করিবেন। কলিকাতায় যখন নৌরজী কংগ্রেস হইতেছিল ঢাকায় নবাব সলিমুল্লার প্রাসাদে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গভর্ণমেণ্টের উৎসাহে মোসলেম লিগ ভূমিষ্ঠ হইল। মোসলেম লিগ ভূমিষ্ঠ হইবার দুই মাস পরেই নবাব সলিমুল্লার কর্ত্তৃত্বাধীনে কুমিল্লার দাঙ্গা।—কুমিল্লার দেড়মাস পরেই জামালপুরের ঘটনা। বাতাস কোনদিক দিয়া

প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল তাহা আমরা বিলক্ষণ দেখিতে পাইলাম। বাংলার নরমপন্থী বা চরমপন্থী দল কেহই স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার মুসলমানদিগকে সম্প্রদায় হিসাবে হাতে রাখিতে পারিলেন না, পরন্তু গভর্ণমেণ্ট মুসলমানদিগকে হাত করিলেন।

কলিকাতা কংগ্রেস যদি বয়কট সমর্থন করে তবে কংগ্রেসকে বয়কট করা হইবে—ইংরেজ-সমাজের মুখপত্র 'ইংলিশম্যান' এই ভয় দেখাইয়াছিলেন। এই ধমকানিতে ভারতের অন্য প্রদেশের নেতারা ঘাবড়াইলেও বাংলার চরমপন্থী নেতারা কিছুমাত্র ঘাবড়ান নাই। কিন্তু সেই চরমপন্থী নেতারা অর্থাৎ বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ, বিশেষতঃ অরবিন্দ, কুমিল্লা ও জামালপুরে মুসলমানেরা বেহাত হইয়া যাওয়ায় কি কথা বলিলেন এবং কি কার্য্য করিলেন আমাদের এক্ষণে তাহাই দেখিতে হইবে। এই বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দ কুমিল্লা ও জামালপুর দাঙ্গা উপলক্ষ করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বন্দেমাতরম্ পত্রিকা ১৯০৭।৬ই মার্চ্চ হইতে ১৯০৭।২রা এপ্রিল পর্য্যন্ত হিন্দু-সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিয়া জোর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বন্দেমাতরম্ ৬ই মার্চ্চ ১৯০৭ লিখিতেছে যে—

"কুমিল্লা মেঘে ঢাকিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট বলে স্বরাজ-দম্ভকারী বাঙ্গালীরা নিজেরাই নিজেদিগকে রক্ষা করুক। হে বাংলার পদলেহনকারী ক্রীতদাসেরা, যদি তোমাদের দক্ষিণ বাহুতে শক্তি না থাকে তবে তোমরা তোমাদের সন্তান-দের জীবন ও স্ত্রীলোকদের ইজ্জৎ রক্ষা করিতে পারিবে না।" গভর্ণমেণ্টের এই কল্পিত উক্তির উপর বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিতেছেন, "গভর্ণমেণ্ট অথবা অপর কোন সম্প্রদায় (এখানে মুসলমান সম্প্রদায়) যে আমাদের (হিন্দুদের) উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করে তাহার কারণ তাহারা জানে যে, আমরা (হিন্দুরা) শক্তিহীন, দুর্ব্বল এবং কুমিল্লার দাঙ্গা হইতে আমরা এই শিক্ষা পাইতেছি যে হিন্দুদিগকে দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া শক্তিমান হইতে হইবে।"

"*The Cloud At Comilla* :

The government says, let Swaraj-ridden Bengalee protect himself. Oh ! ye caraven crowding slaves of Bengal, unless you possess strenght in your right arm you cannot preserve the life of your children and honour of your

women." ...... It is on the knowledge of our weakness that this despotism. be it of a Government or of a community, thrives and the necessity of replacing it by strength is the one moral of these repeated happenings in the domain of God."—Bandemataram, 6th March, 1907.

অরবিন্দের অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝা গেল। ইহাতে কিছু নূতনত্ব আছে। তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকটেও কোন আবেদন-নিবেদন করিলেন না অথবা মুসলমান সম্প্রদায়ের উপরেও অযথা কোন আক্রোশ প্রকাশ করিলেন না। কিম্বা মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত কোনরূপ চুক্তি বা pact করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। তিনি বাঙ্গালী হিন্দুকে শুধু ভীরুতা এবং দুর্বলতা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ বাহুতে শক্তি অর্জ্জন করিতে বলিলেন। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথাও বলিলেন না।

৯ই মার্চ্চের বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র বলিলেন যে, কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট এই দাঙ্গার জন্য তাঁহার (বিপিনচন্দ্রের) উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতাকেই দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু এই দাঙ্গার জন্য তিনি কিছুমাত্র দায়ী নহেন।

"Bepinchandra makes a statement on the Comilla riots: The Magistrate of Comilla lays blame on what he calls my inflamatory speeches for the recent riots there I am in no way responsible for the riots."—Bandemataram, 9th March, 1907.

বন্দেমাতরম্ পত্রিকা ১৫ই মার্চ্চ The Comilla Incident বলিয়া আবার এক জোর প্রবন্ধ লিখিলেন। সম্ভবতঃ ইহা অরবিন্দই লিখিয়াছেন। কেননা বাঙ্গালী হিন্দুকে শক্তিমান হইবার ঐ একই কথা ইহাতে দেখিতে পাই। ১৮ই মার্চ্চ ঐ পত্রিকায় অরবিন্দ খোলাখুলি লিখিলেন যে, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য না লইয়া নিজেরাই নিজেদের আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। অরবিন্দ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লইতে স্পষ্ট নিষেধ করিলেন। প্রবন্ধটির নাম—British Protection or Self-protection? ২০শে মার্চ্চ বন্দেমাতরম্ লিখিলেন যে—মডারেট কাগজগুলি কুমিল্লা দাঙ্গার জন্য স্পষ্ট চরমপন্থী নেতাদের

উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতাকেই দায়ী করিতেছেন। দেখা গেল মডারেট দল কুমিল্লার দাঙ্গা উপলক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেট বা গভর্ণমেণ্টের সহিত একত্রে সুর মিলাইয়া চরমপন্থী দলকেই দায়ী করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট ও মডারেটদল এখানে একপর্য্যায়ভুক্ত। ২রা এপ্রিল বন্দেমাতরম্ More Lessons From Comilla নাম দিয়া আর এক প্রবন্ধ লিখিলেন। তাহাতেও ঐ একই কথা অরবিন্দ লিখিলেন। সুতরাং কুমিল্লার দাঙ্গা-হাঙ্গামার উপলক্ষে অরবিন্দের মত ও অভিপ্রায় বুঝিতে কাহারও কোনই অসুবিধা হইবার কথা নয়। মত খুব প্রাঞ্জল, পথও খুব প্রশস্ত।

এইবার জামালপুরের ঘটনা সম্পর্কে বন্দেমাতরম্ কি লিখিতেছে দেখা যাক। ২৪শে এপ্রিল, ১৯০৭ বন্দেমাতরম্ সংবাদ দিতেছে যে—

"জামালপুরের দাঙ্গায় একজন হিন্দু নিহত হইয়াছে এবং তের জন হিন্দু আহত হইয়াছে, পুলিশ নির্য্যাতিত হিন্দুদের গ্রেপ্তার করিয়াছে।"

"Jamalpur Outrange : One Hindu Killed, 13 Wounded, Aggrieved Hindus Arrested."—Bandemataram, 24th April, 1907.

তারপর ২৯শে এপ্রিল বন্দেমাতরম্ লিখিতেছে—"আজ প্রাতে জামালপুর হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, গৌরীপুর কাছারি লুঠ হইয়াছে। 'দয়াময়ী'র মন্দিরও আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। হিন্দুরা মেয়েছেলে নিয়ে সহর পরিত্যাগ করিতেছে। কিন্তু পথে মুসলমানেরা অবরোধ করিয়া গাড়ী থামাইবার চেষ্টা করিতেছে।"

"News reaches from Jamalpur this morning that Gouripur Kachari is attacked and looted. Temple of Dayamoyee is threatened. The District Superintendent of Police was himself present. The Hindus were leaving the town with families. Mahommedans were attempting to stop carriage.—Bandemataram, 29th April, 1907.

পরে সংবাদ প্রকাশ, জামালপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সহরে নাই—"Jamalpur Magistrate not in town". জামালপুরকে সাহায্য কর "Help for Jamalpur".

যখন লুটতরাজ হইল তখন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং উপস্থিত আছেন। আর যখন নির্য্যাতিত হিন্দুরা ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্য প্রার্থনা করিতে গেল, তখন দেখিল তিনি টাউনে নাই। মন্তব্য অনাবশ্যক।

এই ত গেল এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ। কি ভয়ঙ্কর সপ্তাহ! কি ভয়ঙ্কর ইতিহাস রচনা করিয়া গেল!

তারপর ১লা মে বন্দেমাতরম্ পত্রিকা ভগ্ন দুর্গা-প্রতিমার ছবি প্রচ্ছদপটে দিয়া নীচে লিখিয়া দিলেন—"The wreck of the image of Durga at Jamalpur." বাংলা কাগজগুলিও ঐ ছবি ছাপাইয়া তার নীচে লিখিয়া দিল—"ঐ দেখ মা যা হইয়াছেন"! বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় ঐ ভগ্ন প্রতিমার ছবি আমরা ২৪।১২।৪৪ তারিখে দেখিয়াছি—আর এই সময় অরবিন্দের ভবানী, কালী, দুর্গা বগলামুখী প্রভৃতি দেশাত্মবোধের জন্য শক্তিপূজার কথাও ভাবিয়াছি।

১লা মে হইতে ১০ই মে পর্য্যন্ত প্রতিদিন অরবিন্দ এই দাঙ্গা সম্পর্কে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় লেখনীমুখে যে বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের লিখিত ভাষায় পাঠ না করিলে অরবিন্দ-চরিত্রের এই তেজোদৃপ্তভাব, আগ্নেয়-গিরির প্রস্রবণকারী এই নীরব মানুষটিকে কিছুতেই বুঝা যাইতে পারে না। ১৮৯৩ খৃঃ যিনি ইন্দু প্রকাশে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, ১৯০৭ খৃঃ-এ সেই অরবিন্দই বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় লিখিতেছেন। ১৪ বৎসরের ব্যবধানে তাঁহার মনের ও লিখিবার ভঙ্গীর অতি সামান্যই পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

৭ই মে অরবিন্দ বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় লিখিতেছেন—

"হয় সংশোধন কর, না হয় শেষ কর। পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত কেন্দ্র হইতে অতি ভয়ঙ্কর সংবাদ আসিতেছে যে, বদমায়েসেরা স্ত্রীলোকদিগকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করিতেছে, অথবা ধর্ষণ করিবে বলিয়া শাসাইতেছে। বাংলাদেশ মরিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকের ইজ্জৎ ভারতবর্ষে যেমন সম্মানিত হয় এমন পৃথিবীর আর কোথাও হয় না। কিন্তু সেই স্ত্রীলোকের ইজ্জৎ চক্ষের উপর নষ্ট হইতে দেখিয়া যেখানে দেশবাসী আঙ্গুলটি পর্য্যন্ত উত্তোলন করে না, স্ত্রীলোকের ইজ্জৎ রক্ষার জন্য মৃত্যুমুখে ঝাঁপাইয়া পড়ে না, তখন বুঝিতে হইবে যে সে-দেশে আর মানুষ নাই, মরিয়া গিয়াছে। বহু শতাব্দীর পরাধীনতা এই দেশ-বাসীর জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়াছে, কেবলমাত্র মনুষ্যত্বহীন দেহ,

শবের মত জড়বৎ পড়িয়া আছে। যদি বাঙ্গালী জাতি সত্যই এমনি পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হইয়া থাকে যে দুর্বৃত্তদের দ্বারা তাহাদের স্ত্রীলোকদের সতীত্ব নষ্ট হইতে দেখিয়াও প্রতীকারার্থে আঘাত না করে, তবে যত শীঘ্র এই বাঙ্গালী জাতি পৃথিবী ভারাক্রান্ত না করিয়া, পৃথিবী হইতে মুছিয়া, লুপ্ত হইয়া যায়, ততই ভাল।"

"*Mending or Ending*: From all parts of East Bengal comes the terrible news of violation or threatened violation of women by Badmashes. Bengal is then dead to all intents and purposes. Nowhere is the honour of women valued as in India. And if our people do not lift their finger or court death when seeing women violated before their eyes, they have morally ceased to exist. *Long subjection has crushed southel and left the mere corpse.* If Bengal has been seized with such a severe palsy as not to strike a blow even for the honour of our women, it is better for her people to be blotted from the earth than cumber it longer with their disgrace"—*Bandemataram, 7th May, 1907.*

এই লেখা না পড়িলে ১৯০৭ খৃঃ-এর অরবিন্দকে বুঝা যাইবে না। একটা জাতি যখন বহু শতাব্দী ধরিয়া পরাধীন থাকে তখন তাহার যে কতদূর অধোগতি হয়—অরবিন্দ এই ঘটনায় তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন যে, এই যদি বাঙ্গালী জাতির অবস্থা হইয়া থাকে, তবে সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত পরাধীন ভীরু জাতি পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাক। স্বাধীনতার কত বড় পূজারী হইলে একজন মানুষ তাঁহার নিজের জাতি সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিতে পারেন! অরবিন্দ দেশকে ক্রমে চিনিতেছেন।

৮ই মে বন্দেমাতরম্ পত্রিকা সংবাদ দিতেছে—

"স্ত্রীলোকের উপর বলাৎকার করিয়া অত্যাচার: পূর্ব্ববঙ্গে অশান্তি সমানে চলিতেছে। কেবল যে বাজারে লুঠ হইতেছে, পুনঃপুনঃ হিন্দু-দেবদেবীর প্রতিমা ভগ্ন করিতেছে তাহাই নহে, সর্ব্বাপেক্ষা অসহনীয় হিন্দু স্ত্রীলোকদের উপর অকথ্য অত্যাচার দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে।"

"*Repression by Rape* : The unrest in East Bengal continues, not only is the looting of bazars in full progress, not only have Hindu images been repeatedly broken and desecrated, but the worst, most intolerable feature of all, the outrages on Hindu women, seem to be on the increase."—*Bande-mataram, 8th May, 1907.*

৯ই মে বন্দেমাতরম্ পত্রিকা লিখিতেছে—

"আর দেরী করা নয় : "কেশরী" (লোকমান্য তিলকের বাহন) পত্রিকা যথার্থই লিখিয়াছে যে, এই উপযুক্ত সময় ; যখন বাঙ্গালী জাতি স্বদেশী আন্দোলন করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের নেতা হইয়াছে, তখন এই ঘটনার উপযোগী ব্যবহার সে করিবে।"

"*Before it is too Late* : The 'Keshari' has rightly observed that now is the time for Bengal to be equal to the occasion and keep the position it has already made for itself by the Swadeshi movement as the leader of all India."—*Bande-mataram, 9th May, 1907.*

বাঙ্গালীর সঙ্গে কেবলমাত্র মারাঠীই একসঙ্গে চলিতেছে। অন্য সকল প্রদেশ প্রায় নীরব।

১০ই মে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দ, মিঃ তিলকের অভিমত মারাঠা কাগজ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া লিখিতেছেন—

"আমরা পশুদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি। আমরা প্রতিদিন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হৃদয়বিদারক সংবাদ পাইতেছি যে, হিন্দুদের উপর মুসলমান ভারাটে গুণ্ডা লেলাইয়া দেওয়া হইতেছে ; তাহার উদ্দেশ্য যাহাতে নূতন জাতীয়ভাবকে নিষ্পেষিত করিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। মিঃ তিলকের মারাঠা পত্রিকা লিখিতেছে যে : আমাদিগকে কি সত্যই বিশ্বাস করিতে হইবে যে, অন্ততঃ কুড়িটি মস্তক বাধা প্রদানার্থে ভগ্ন হইবার পূর্ব্বে সত্যই কালাপাহাড় দুর্গাপ্রতিমা ভগ্ন করিয়াছে ? ঐ দুর্গাপ্রতিমার দেহের ভগ্ন অংশগুলি লইয়া দুর্বৃত্তেরা যখন প্রকাশ্য রাজপথে জয়োল্লাস করিয়া যাইতেছিল তখন কি বাধা প্রদানার্থে কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই ? স্ত্রীলোকদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া

পাশবিক অত্যাচার করিবার পূর্ব্বে কি বাধাপ্রদান করিতে গিয়া রাজপথে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয় নাই? হে মা দুর্গা, তুমি সত্যই অপমানিত হইয়াছ এবং তোমার সমতুল্যা নারীজাতিকে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছি। মারাঠার এই ধিক্কারের সম্মুখে আমাদের মাথা লজ্জায় অবনত হইয়া পড়িয়াছে।"

"The beast is upon us. Every day we are receiving harrowing account of sacrilege and outrage from East Bengal where Moslem mercenaries have been let lose upon the Hindu population to crush the new spirit. The Marahatta (Tilak) says : 'Are we to believe that the image of Durga broken by iconoclasts before twenty heads have been broken in defence ? Were the severed parts of the holy image really borne through the streets in triumph without a clash being made for them ? Were women too carried away and subjected to indignities without blood flowing freely in expiation ? Verily Durga ! Thou art dishonoured and thy sex betrayed'.—We must hang down our heads in shame at this reproach from Maharastra."—*Bandemataram, 10th May, 1907.*

অরবিন্দের কথাও বুঝা গেল, তিলকের কথাও বুঝা গেল। অরবিন্দ তিলককে সমর্থন করিলেন, তিলক অরবিন্দকে সমর্থন করিলেন। উভয়েই বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতা-বাদী। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা কেহই বলিলেন না, পরন্তু নিষ্কামভাবে মৃত্যুমুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সক্রিয় প্রতিরোধের কথাই বলিলেন। কিন্তু ইহা করিতে হইলে প্রাণরক্ষা হয় না। প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়। পরাধীন জাতির তাহা অভ্যাস নাই। বাঙ্গালী বহু শতাব্দীর পরাধীন জাতি। এই পরাধীনতার নিষ্পেষণে পড়িয়া বাঙ্গালী হিন্দু ধর্ম্ম দিয়াছে, মাতা ভগ্নী ও কন্যার ইজ্জৎ দিয়াছে, দেশের স্বাধীনতা দিয়াছে—কিন্তু প্রাণ দেয় নাই। অভ্যাস নাই। বহু শতাব্দীর অভ্যাস একদিনে দূর করা যায় না। অরবিন্দ ও তিলক বাঙ্গালীকে সত্যই বড় মুস্কিলের কথা বলিলেন।

৫ই মে, ১৯০৭ যুগান্তর পত্রিকায়ও বন্দেমাতরমের অনুরূপ কথা লেখা হইয়াছিল। আমরা যুগান্তর পাই নাই। সুতরাং রাউলাট কমিটি হইতে ইংরেজী অনুবাদ দিতেছি :

"You Englishmen have demoralised educated Indians as lambs, and in East Bengal you have set Musalmans against the Hindus."

বন্দেমাতরম্ ও যুগান্তরের ভাব এক হইলেও প্রকাশভঙ্গী এক নয়। অরবিন্দ গভর্ণমেণ্টের নিকট যেমন কোন আবেদন-নিবেদন করেন নাই, তেমনি গভর্ণমেণ্টকে বৃথা আক্রোশে, রাজদ্রোহমূলক কোন আক্রমণও করেন নাই। কিন্তু যুগান্তর তাহা করিয়াছে। এবং যে দুইটি প্রবন্ধের জন্য যুগান্তর-সম্পাদক জেলে গিয়াছিলেন, ৫ই মে-র প্রবন্ধটি তাহার অন্যতম। গান্ধী মহারাজ Satanic গভর্ণমেণ্ট বলিবার ১৪ বৎসর পূর্ব্বে যুগান্তরের দল গভর্ণমেণ্টকে এই প্রবন্ধে 'অসুর' বলিয়াছে।

কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও তো কিছু বলিবার আছে। মহাত্মা গান্ধীর 'Quit India'র ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯৩ খৃঃ অরবিন্দের মনে Quit Indiaর কল্পনা আসে। মহাত্মা গান্ধীর Quit Indiaর ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ ১৯০৬ খৃ: বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় ইংরেজবর্জ্জিত পূর্ণ স্বাধীনতার কথা জোর কলমে লিখিয়া গিয়াছেন। তারপর ঐ বৎসরেই বয়কট আসিয়াছে। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আসিয়াছে। এদেশে ইংরেজের শাসন উচ্ছেদ করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করাই যদি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদী বিপিনচন্দ্রের এবং বিপ্লববাদী অরবিন্দের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে লর্ড মর্লি এবং লর্ড মিণ্টো—মিঃ চার্চ্চিলের মতই এতবড় বৃটিশ সাম্রাজ্যকে নির্ব্বিবাদে ধ্বংস হইতে দিতে পারেন না। ইতিহাসে কোন সাম্রাজ্যবাদীরাই তাহা পারেন নাই। তা তাঁহাদিগকে রাক্ষস বল, অসুর বল, শয়তান বল, কিছুই আসে যায় না। সুতরাং রোম-সাম্রাজ্যের অনুকরণে *divide et empera* এবং সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির অনুকরণে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ যদি বরিশালে দণ্ডনীতি এবং কুমিল্লা ও জামালপুরে ভেদনীতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তবে তাহা চিরাচরিত প্রথা অনুসারে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যই করিয়াছেন। যতদিন না ইংরেজ, সাম্রাজ্যবাদ

পরিহার করিতেছে ততদিন ইংরেজবর্জ্জিত পূর্ণ স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের সহিত এদেশের রাজশক্তির সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য্য।

বিপিনচন্দ্র পাল ও তাঁহার মাদ্রাজ বক্তৃতা (১৯০৭।এপ্রিল ও মে): বিংশ শতাব্দীর ১ম দশকে বাঙ্গালী রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতবর্ষে নেতৃত্ব করিয়াছে—একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। ১৯০৭।৯ই মে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দ কেশরী পত্রিকা হইতে মিঃ তিলকের এই অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী স্বদেশী আন্দোলন দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষে নেতার আসন গ্রহণ করিয়াছে। ("Bengal has already made for itself by the Swadeshi movement as *the Leader of all India.*") ১৯০৮।১৯শে জানুয়ারী, সুরাট-কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই, অরবিন্দ নিজেও বোম্বাই মহাজন-ওয়াদিতে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে—হে বোম্বাইবাসিগণ, ভারতবর্ষে আজ জাতীয়তাবাদ অথবা জাতীয়তাবোধরূপ যে একটি বস্তু বা আদর্শ দেখিতে পাইতেছ, উহা বাংলা দেশ হইতে তোমাদের নিকট আসিয়াছে। বাংলাই ভারতবর্ষের ত্রাণকর্ত্তারূপে অগ্রগামী হইয়াছে।

"There is a creed in India to-day which calls itself Nationalism, a creed which has come to you *from Bengal*, ……*Bengal has come forward as the Saviour of India.*"—Speech at Mahajan Wadi, Bombay, by Srijut Aravindo Ghose ; the 19th January, 1908.

দেখিতেছি ভারতবর্ষে এই কালে বাংলা দেশের একটা কথা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বরিশালে গভর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষ দমননীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কুমিল্লা ও জামালপুরে ভেদনীতি প্রয়োগ করিলেন। অল্পদিন পরেই নির্ব্বাসন-নীতি প্রয়োগ করিবেন। স্বদেশী আন্দোলনকে বাধা দিতে গিয়া গভর্ণমেণ্টকেও বিভিন্ন রকম নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষে বাঙ্গালীর বিংশশতাব্দীর ইতিহাস রচিত হইয়াছে এবং এই ইতিহাসে অরবিন্দের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

নেতৃত্ব সম্বন্ধে তিলক এবং অরবিন্দ সম্পূর্ণ একমত। এখন এই নেতৃত্বের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে, একটি দৃষ্টান্ত আমরা উল্লেখ করিব। বিপিনচন্দ্রের মাদ্রাজ-বক্তৃতাই ইহার একটি দৃষ্টান্ত।

কলিকাতা-কংগ্রেসের পর, মিঃ তিলক স্থির করিলেন যে—যেহেতু মদ্রবাসীরা জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আশানুরূপ অগ্রগামী নহেন, অতএব তিনি নিজেই একবার মাদ্রাজে গিয়া নূতন জাতীয়তাবাদ প্রচার করিয়া মদ্রবাসীদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করিবেন। কলিকাতা কংগ্রেসে মাদ্রাজ হইতে কৃষ্ণস্বামী আয়ার ও আনন্দচার্লু কতকগুলি লোক আনিয়া বাংলাদেশের বয়কট প্রস্তাবের প্রতিবাদ-কল্পে মিঃ মেহেতার পুচ্ছ ধরিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সুতরাং মিঃ তিলকের পরিবর্তে বাগ্মী বিপিনচন্দ্র মাদ্রাজ রওনা হইলেন। সেদিন মারাঠীর সাথে বাঙ্গালী একত্রে গলা মিলাইয়া সত্যি 'জয়তু শিবাজী' বলিয়াছিল।

১৯০২ খৃঃ নিউ ইণ্ডিয়া পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র লিখিয়াছিলেন যে—কংগ্রেস শুধু একটা ভিক্ষুকের দলের জটলা মাত্র। এই ভিক্ষুকদলের জটলার নূতন নামকরণ হইয়াছে আন্দোলন। এইরূপ ভিক্ষাবৃত্তির আন্দোলনে প্রকৃত দেশপ্রেমের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পাওয়া যায়—আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীলতায় —আর আত্মত্যাগে।

"The Congress here and its British committee in London are both begging institutions. We have given a new name to begging ; we call it agitation. …Agitation is not, in any sense, a test of true patriotism. That test is self-help and self-sacrifice."

ইহার ৪ বৎসর পর ১৯০৬ খৃঃ বন্দেমাতরম্ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক থাকা অবস্থায় বিপিনচন্দ্র স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন যে—বিদেশীয়দের কর্তৃত্ববিহীন পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবাসীদের আদর্শ। আর তা লাভের উপায়—নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ। যেমন নির্জলা প্রাঞ্জল আদর্শ, তেমনি নিরঙ্কুশ সহজ উপায়।

"Our ideal is freedom, which means absence of all foreign control. Our method is passive resistance, which means organised determination to refuse, to render any voluntary or honorary service to the Government."

বিপিনচন্দ্র এই প্রসঙ্গে ইহাও বলেন যে, যে-দেশেই সভ্য মানুষ বাস করেন, সেই দেশে এই আদর্শ ও উপায় সম্পূর্ণ বৈধ ("absolutely legitimate") বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। কাজেই অসভ্য দেশে অসভ্য মানুষদের কথা বিপিনচন্দ্র এক্ষেত্রে বিবেচনা করেন নাই।

ইহার সঙ্গে আরো একটি কথাও বিপিনচন্দ্র খুব জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, আমাদের বর্ত্তমান নিঃসহায় অবস্থায় গুপ্ত-হত্যা বা বৈপ্লবিক ডাকাতির কথা উন্মাদ ব্যতীত ("No one outside lunatic asylum") কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। এইখানেই অরবিন্দের বৈপ্লবিক মতবাদের সহিত বিপিনচন্দ্রের বিরোধ। এবং এ বিরোধ সামান্য বিরোধ নয়। তা যাহাই হউক, এইরূপ রাজনৈতিক মতপোষণকারী যে বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দের কথায় তিনিই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের এদেশে প্রথম প্রচারক "The prophet and first preacher of passive resistance"—(*by Aravindo Ghose ; Karmayogin, the 22nd January, 1910*)। রাউলাট কমিটি লিখিয়াছেন (পৃ: ১১৫) যে—

"সমুদ্রের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী নগরগুলির মধ্য দিয়া এপ্রিল মাসে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়া ১লা মে মাদ্রাজ পৌঁছিলেন। তিনি স্বরাজ, স্বদেশী ও বয়কটের উপর বক্তৃতা করিলেন। রাজমন্দ্রী সহরে তাঁহার বক্তৃতার ফলে গভর্ণমেণ্ট কলেজের ছাত্রেরা ২৪শে এপ্রিল ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল। ২রা মে মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় তিনি বলিলেন যে—(ক) ইংরেজ ভারতবর্ষকে তাঁহাদের অধীনে রাখিয়া সুশাসন প্রবর্ত্তন করিতে চান, কিন্তু ভারতবাসী ইংরেজের কর্তৃত্ববিহীন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে চায় ("*The Indians desired to make it autonomous, absolutely free of the British Parliament.*")। (খ) এদেশে ইংরেজ রাজত্ব শুধু মায়া বা মরীচিকার ("*Maya or Illusion*") উপর স্থাপিত। নূতন আন্দোলন এই মায়া বা ভ্রমকে স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াই শক্তিমান হইতে চলিয়াছে' (* খ)।

(* খ) "In 1907 people in the Madras Presidency were excited by a series of lectures delivered by Bepinchandr Pal, a Bengali journalist and lecturer. He commenced a tour through the East Coast cities in April and arrived at Madras on the 1st of May. The subjects on which he spoke were 'Swaraj', 'Swadeshi' and 'Boycott'. His visit to Rajmundry had been followed on the 24th of April by a strike of students at the Government College there. On the 2nd of May in a speech at Madras he is reported to have

বিপিনচন্দ্রের এ কথায় শুধু মাদ্রাজের কৃষ্ণস্বামী আয়ার আর আনন্দ চার্লু কেন, এক মহারাষ্ট্র ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নেতৃবৃন্দ যে চমকিত হইবেন—তাহা অতি সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। চমকিবার মত কথাই বিপিনচন্দ্র বলিলেন। কিন্তু কথাটা রাজভক্ত—তা সে ভক্তির কারণ যা-ই হউক—মডারেট নেতৃবৃন্দ এবং বড়লাট লর্ড মিণ্টো হইতে ভারতসচিব লর্ড মর্লি ইঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ হইল। কথাটা মারাত্মক এবং বিপজ্জনক। বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলন এই কথাগুলির জন্ম দিয়াছিল ১৯২৯ খ্রীঃ লাহোর-কংগ্রেসের পূরা ২৩ বৎসর পূর্ব্বে।

সকল দেশেই জাতির অগ্রগামী চিন্তা বিপদের ঝড়কে সঙ্গে করিয়াই প্রবাহিত হয়। বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলনের যে সকল অগ্রগামী চিন্তা ভারত-বর্ষে দেখা দিয়াছিল—তাহাও মৃদু মলয় সমীরণ আনয়ন করে নাই। বিপিনচন্দ্র, বিশেষতঃ অরবিন্দ এইরূপ অগ্রগামী চিন্তার জন্য তৎকালে দেশের মধ্যে বিপদের ঝড়কেই প্রবাহিত করিয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্রের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অপেক্ষা অরবিন্দের গুপ্তহত্যা, বৈপ্লবিক ডাকাতি, যুগান্তর পত্রিকা এবং তৎপরে ক্রমে গরিলা ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ—এসকল আরো অধিকতর ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনক চিন্তা। বাংলার চরমপন্থী স্বদেশী যুগের চিন্তানায়ক বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ—বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীকে এইরূপ একটা ভয়ঙ্কর বিপদের মুখেই টানিয়া আনিয়াছিলেন। এজন্য যাঁহারা তাঁহাদিগকে দোষ দিতে চান, তাঁহারা তা অনায়াসেই দিতে পারেন।

অরবিন্দ এই দোষারোপ বা অভিযোগ আনন্দের সঙ্গেই স্বীকার করিবেন। কেননা কলিকাতা-কংগ্রেসে চরমপন্থীদের উপর বাগ্মী লালমোহন ঘোষের কটাক্ষের প্রতি-উত্তর দিতে গিয়া বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় (৩০শে ডিসেম্বর, ১৯০৬)

---

said that, while the British desired to make the Government in India popular without ceasing in any sense to be essentially British, the Indians desired to make it autonomous, absolutely free of the British Parliament. The British administration was based upon Maya or illusion and in the recognition of the magic character of the British power lies the strength of the new movement."—*Rowlatt Committee Report*, *p. 115*.

অরবিন্দ "A sitter on the fence" বলিয়া লালমোহন ঘোষকে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"The coming prophet must not shrink on proclaiming the only truth as to how nations are made and regenerated which, according to Robespierre, strikes terror into the heart and conjures up horrors of a chaos."—*Bandemataram, 30th December, 1906.*

সুতরাং বিপিনচন্দ্রের মাদ্রাজ-বক্তৃতায় যে-কথা বলা হইয়াছিল এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া তাহার যে-ফল হইয়াছিল, তাহা অরবিন্দের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত এবং সমর্থনীয়। নতুবা মাত্র তিন মাস পূর্ব্বে Robespierreর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তিনি ইংরাজী ভাষায় জগদ্বিখ্যাত বাগ্মী লালমোহন ঘোষকে এই বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন না যে—

"The days when politics consisted in dangling before the college youngmen fine phrase of Parliamentary parlance have gone by."

লালমোহন ও বিপিনচন্দ্র উভয়েই শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। কিন্তু দুইটি ভিন্ন যুগে তাঁহাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল। অরবিন্দের মতে লালমোহনের বাগ্মিতার দিন চলিয়া গিয়াছে, আর নাই। লালমোহনের বাগ্মিতার আর বিপিনচন্দ্রের বাগ্মিতার ফল এক নহে। কেননা রাউলাট কমিটি স্পষ্ট লিখিতেছেন (পৃঃ ১১৫) বিপিনচন্দ্রের মাদ্রাজ বক্তৃতার ফলে রাজদ্রোহমূলক ঘটনা অনেক ঘটিয়াছিল এবং ১৯০৮ খৃঃ আদালতে ঐসব রাজদ্রোহের বিচার পর্যন্ত হইয়াছিল—

"An outburst of seditious activity followed upon the visit of Bipin Chandra Pal and resulted in various trials in 1908."—*Rowlatt Committee Report, p. 115.*

কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট কুমিল্লার দাঙ্গার জন্য বিপিন পালের বক্তৃতাকেই দায়ী করিয়াছিলেন, মডারেট কাগজগুলি এই কথার সমর্থনও করিয়াছিল। রাউলাট কমিটিও রাজমন্ত্রীর ছাত্রদের ধর্ম্মঘট এবং আরো কতকগুলি রাজদ্রোহ-মূলক ঘটনার জন্য বিপিন পালের বক্তৃতাকেই দায়ী করিলেন। বক্তৃতাগুলি

একেবারেই দায়ী নয়, একথা বলা চলে না। বলিলে বক্তৃতাগুলির যে যথেষ্ট মর্য্যাদাহানি হয়—ইহা অনেকেই চিন্তা করেন না।

বিপিনচন্দ্র কুমিল্লা-দাঙ্গার সময় বাংলাদেশে ছিলেন। জামালপুর-দাঙ্গার সময় তিনি মাদ্রাজে বক্তৃতা দিতেছিলেন। অরবিন্দ সেইকালে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় তাঁহার সহযোগীদের লইয়া খুব জোর লেখা লিখিতেছিলেন। ১৯০৭।২৫শে এপ্রিল বন্দেমাতরম্ বিপিনচন্দ্রের মাদ্রাজ-বক্তৃতার কথা লিখিতেছেন—

"Bepin Chandra Pal lecturing on National Education at Madras. Bepin Pal—lecturing at Bejwada."—*Bandemataram, 25th April, 1907.*

অরবিন্দ বিপিনচন্দ্রকেই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রথম প্রচারক বলিলেন, লোকমান্য তিলককে বলিলেন না, বা নিজেও উহা দাবী করিলেন না। মিঃ তিলক মাদ্রাজে যাইবার সংকল্প করিয়াও কেন গেলেন না, এবং বিপিনচন্দ্রই বা কেন গেলেন এবং অরবিন্দই বা কেন গেলেন না? অরবিন্দ লিখিতে পারেন, তেমন লেখা ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাষায় আর কেহ তখন লিখিতে পারেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু তিনি বক্তৃতা করিতে পারেন না। ইংরেজীতেও না। বাংলা ভাষার কথা ছাড়িয়াই দিলাম; কেননা বাংলায় বক্তৃতা ত অনেক দূর, ঠিক মত কথা-ই বলিতে পারেন না। তিলক বক্তৃতা করেন কিন্তু বাগ্মী নহেন। বিপিনচন্দ্র বাগ্মী। তিলক এবং অরবিন্দ অপেক্ষা মাদ্রাজে নব ভাব উদ্দীপিত করার পক্ষে বিপিনচন্দ্রই অধিকতর যোগ্য, বাগ্মিতার দিক হইতে যোগ্যতম। কাজেই চরমপন্থী দল হইতে বিপিনচন্দ্রই মাদ্রাজে যাইবার জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন।

বিপিনচন্দ্রের মাদ্রাজ-বক্তৃতার ১২ বৎসর পর রাউলাট কমিটি সবিস্তারে ইহার উল্লেখ করিয়া ইতিহাসে ইহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

মাদ্রাজে দুইজন বাঙ্গালীর বক্তৃতা স্মরণীয়। ১৯০৭ খৃঃ বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতা আর ১৯২৩ খৃঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা। বিপিনচন্দ্র নৌরজী-কংগ্রেস অপেক্ষাও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রচার দ্বারা অধিকতর অগ্রগামী চিন্তার ধারা জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বয়কটের অতি জোরালো রকমের মারাত্মক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আবার ১৬ বৎসর

পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে বাধা দিবার প্রস্তাব করিয়া, এবং এই উদ্দেশ্যে কাউন্সিল-প্রবেশ মহাত্মা গান্ধীপ্রদর্শিত অসহযোগ অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকরী—এই মত প্রকাশ করিয়া, মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতা করিয়া, ভারতবর্ষের তৎকালীন অগ্রগামী চিন্তানায়কদের স্বরাজ্যদলভুক্ত করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের বাহিরে বাঙ্গালীই কংগ্রেস অপেক্ষা অধিক অগ্রগামী চিন্তার প্রচার চিরদিন করিয়া আসিয়াছে। এক্ষেত্রে ১৮৯৩ খৃ: অরবিন্দের কংগ্রেসবিরোধী চিন্তা, যাহা ইন্দুপ্রকাশে বাহির হইয়াছিল, তাহার স্থান আজিও সকলের অপেক্ষা অধিক অগ্রগামী। এই অর্দ্ধশতাব্দীকালমধ্যে অরবিন্দের ঐ স্মরণীয় প্রবন্ধগুলি কেহ পুস্তক আকারে প্রকাশ করিলেন না—এই যা দুঃখ।

লাজপত রায় ও অজিৎ সিং-এর হঠাৎ নির্ব্বাসনের খবর পাইয়া বিপিনচন্দ্র ১১ই মে তাড়াতাড়ি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

লাজপত রায় ও অজিৎ সিং-এর নির্ব্বাসন (১৯০৭। ৯ই মে): ১৯০৭। ১০ই মে সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) পর ৫০ বৎসরের বার্ষিকী উপলক্ষে আবার একটা তদ্রূপ বিদ্রোহের আশঙ্কা, সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, গভর্ণমেণ্ট করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবেই গুজবটা বেশী রটিয়াছিল। ইহার সহিত লাজপত ও অজিৎ সিং-এর নির্ব্বাসনের কোন যোগাযোগ থাকিলেও তার কোন উল্লেখ নাই (*খ)।

কিছুদিন হইতেই পাঞ্জাবে নানা কারণে অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইতেছিল। কৃষকদের হঠাৎ করবৃদ্ধি একটা কারণ। বারী-দোয়াব খালে, চেনাব-বস্তির প্রজারা হঠাৎ কর-বৃদ্ধিতে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। এই সকল ক্ষুব্ধ কৃষকদের বহু আত্মীয়-স্বজন গভর্ণমেণ্টের শিখ-রেজিমেণ্টে সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত

(* খ) "The Fiftieth Anniversary on the outbreak of the Mutiny (May 10th) had been fixed by some Anglo-Indian journalists as the date for a probable rising against the British and, owing to their warnings, preparation were made for withdrawing the British resident, especially in the Panjab towns, into the fort. But in spite of all that prophecy could do, no outbreak occurred."—*The New Spirit In India, Introduction, p. 20, by Nevinson.*

ছিল। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট কিছুটা আশঙ্কা না করিয়া পারেন না। ২য় কারণ, সিভিল ও মিলিটারী গেজেট—নেটিভদের (ভারতবাসী) বিশ্রী সব গালাগালি দিতেছিল। যথা—"Baseborn B. A.'s" "Servile Classes," "Serfs," "Beggars On Horseback", ইত্যাদি। স্যার ডেনজিল ইবেটসন তখন পাঞ্জাবের ছোটলাট। তিনি নেটিভদের অভিযোগের উত্তরে দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ঐ কাগজের সম্পাদককে ডাকিয়া বিচার করিলেন না ("... ... regretted the tone of the articles but refused to prosecute")।

এদিকে আবার দেশীয় কাগজ 'India' আমেরিকা হইতে ভারতীয় সৈন্যদিগকে রাজদ্রোহে উত্তেজিত করিয়া এক আবেদন-পত্র পুনর্মুদ্রিত করিয়া বসিল। ফলে সম্পাদক মহাশয়ের পাঁচটি বৎসর কারাবাসের দণ্ড হইল। একযাত্রায় পৃথক ফল দেখা গেল। তবে যাত্রা এক হইলেও গুরুত্ব এক নয়। নেটিভদের গালি দেওয়া আর সৈন্য উত্তেজিত করা, তফাৎ আছে।

৩য় কারণ—২রা মে রাউলপিণ্ডিতে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হইয়া গেল। জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া সাহেবদের বাড়ীঘর বাগান লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। লাজপত রায় ২২শে মার্চ্চ এবং অজিত সিং ৭ই এবং ২১শে এপ্রিল কৃষকদের সভা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বৰ্দ্ধিত কর হ্রাস না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা যেন চাষ-বাস না করে। অনেকটা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (passive resistance) ব্যবস্থার মতই মনে হয়। এই সকল ঘটনার কার্য্যকারণসম্পর্ক একত্র করিয়া ১৯০৭।৯ই মে প্রভাতে সূর্য্যকিরণ উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই লাহোর হইতে লাজপত এবং অমৃতসর হইতে অজিত সিং একেবারে সমুদ্রপারে বর্ম্মা মান্দালয় দুর্গে কারাবদ্ধ হইলেন। কোন খবর বা অভিযোগ বা বিচারাভিনয় পর্য্যন্ত করিবার অবকাশ গভর্ণমেণ্ট পাইলেন না। মিঃ নেভিন্‌সন লিখিয়াছেন—

"On May 9th Lajpat Rai was suddenly deported from Lahore without notice, charge or trial, and conveyed to the fort at Mandalay. Ajit Sing was similarly deported from Amritsar"—*The New Spirit In India—Introduction, p. 20, by Mr. Nevinson.*

এই দুই পাঞ্জাবী নেতার অকস্মাৎ নির্ব্বাসনের প্রতিক্রিয়া ১ম বিপিনচন্দ্র, ২য় অরবিন্দের উপর কী আকারে প্রকাশ পাইল, অরবিন্দের জীবনচরিত আলোচনায় তাহাই আমাদের প্রধান এবং প্রথম বিবেচ্য। জীবনচরিতকে আলোকিত করিবার জন্যই ইতিহাসের প্রয়োজন। ইতিহাস না হইলে জীবনচরিত অন্ধকারে থাকিয়া যায়। বস্তুনিষ্ঠ হয় না।

রাউলাট কমিটি (পৃ: ১১৫) লিখিয়াছেন যে, এই নির্ব্বাসনের খবর পাওয়া মাত্রই বিপিনচন্দ্র ১০ই মে মাদ্রাজে তাঁহার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বক্তৃতা না করিয়াই দ্রুত কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন। বিপিনচন্দ্রের এই ত্বরিৎ গতির কারণ কি? তিনি কি নিজের নির্ব্বাসনও এই সঙ্গে আশঙ্কা করিয়াছিলেন? আশ্চর্য্য নয় কিছুই, অসম্ভবও নয় (* গ)।

অরবিন্দ এই রকমের একটা আশঙ্কা স্পষ্ট মনে মনে করিয়াছিলেন। কেননা তাঁহার লেখনীমুখেই ইহার প্রমাণ আমরা পাইতেছি। ১১ই মে, ১৯০৭ বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দ এই কল্পিত আশঙ্কার প্রতি-উত্তরে তেজের সঙ্গে লিখিলেন যে—

"যদি শ্রীযুত (তখন "মিষ্টার" বয়কট করিয়া, "শ্রীযুত" লেখার রেওয়াজ স্বদেশী জাতীয়তাবাদীরা আরম্ভ করিয়াছিলেন) বিপিনচন্দ্র পাল নির্ব্বাসিত হন, যদি বন্দেমাতরম, সন্ধ্যা, এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিকেও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়—তার ফলে আগুন কেবল চাপা পড়িবে মাত্র, কিন্তু সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে এবং সেই আগুন নির্ব্বাপিত করা আর সম্ভব হইবে না।"

(* গ) "The news of Lajpat Rai's deportation from the Punjab brought Bepinchandra's tour to a close. A crowd had assembled to hear him speak on the 10th of May, but he did not appear. Leaflets were distributed which stated that 'as a mark of sorrow at Lajpat Rai's arrest and deportation Mr. Pal's lecture announced for this evening is abandoned.' Bepinchandra left next day for Calcutta and the arrangements made to receive him in districts South of Madras were cancelled."—*Rowlatt Committee Report, p. 115.*

"*If Srijut Bepin Chandra Pal were deported* and the Bandemataram, Sandhya and other nationalist journals suppressed, the fire will only become silent, pervading, irresistible."—*Bandemataram, the 11th May, 1907.*

অরবিন্দ, লাজপত এবং অজিৎ সিং-এর নির্ব্বাসনের উত্তরে স্পষ্ট লিখিলেন—"fire" অর্থাৎ আগুন নিভিবে না, দমিয়া যাইবার কথাই গভর্ণমেণ্ট আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু অরবিন্দের লেখার ভঙ্গী ভাল নয়। গভর্ণমেণ্টকে নিরাশ হইতে হইল। বিপিনচন্দ্র ১২ই মে কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার কলিকাতায় পৌঁছিবার একদিন পূর্ব্বেই অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্রের ভবিষ্যৎ নির্ব্বাসন আশঙ্কা করিয়াও, মাভৈঃ অর্থাৎ তথাপি আগুন নিভিবে না—বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় এই তূর্য্যধ্বনি করিলেন। অরবিন্দের উপর লাজপত-নির্ব্বাসনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

১১ই মে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দের লেখনীমুখে অগ্নি উদ্গীরণ দেখা গেল। তারও একদিন আগে ১০ই মে, বন্দেমাতরম্ লাজপত রায়ের নির্ব্বাসনের সংবাদ প্রথম প্রকাশ করিলেন। ৯ই মে রাত্রেই টেলিগ্রামে নির্ব্বাসনের খবর অরবিন্দ পাইয়া কি করিলেন, তাহা একজন অরবিন্দের সহকর্ম্মীর কথা হইতেই তুলিয়া দিতেছি—

"৯ই মে রাত্রিতে সংবাদ পাওয়া গেল, লালা লাজপত রায় ও সর্দ্দার অজিৎ সিং দুইজনকে বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। ... ... নিশীথে এই টেলিগ্রাম পাইয়া একজন সহকারী সম্পাদক (হেমেন্দ্রবাবু নিজেও হইতে পারেন) তাহা নিদ্রিত অরবিন্দের কাছে লইয়া গিয়াছিলেন। সুপ্তোত্থিত অরবিন্দ টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া শয্যায় বসিয়াই এই প্যারাগ্রাফটি লিখিয়া দিয়াছিলেন।"—কংগ্রেস পৃঃ ২০১-২০২; শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।

প্যারাগ্রাফটি এইরূপ—

"Lala Lajpat Rai has been deported out of British India. The fact is its own comment. The telegram goes on to say that indignation meetings have been forbidden for four days. Indignation meetings? *The hour for speeches and fine writings is past.* The bureaucracy has thrown

down the gauntlet. We take it up. Men of the Punjab! Race of the Lion! Show these men who would stamp you into the dust for one Lajpat they have taken away, a hundred Lajpats will arise in his place. Let them hear a hundred times louder your war-cry 'Jai Hindusthan'!"—*Bandemataram, 10th May, 1907.*

যোগ্যতম ব্যক্তিই ইহার বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন। এখানে তুলিয়া দিলাম: "লালা লাজপত রায় বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। টেলিগ্রামে প্রকাশ ৪ দিনের জন্য এই ঘটনায় ক্রোধব্যঞ্জক সভা হইতে পারিবে না। ক্রোধব্যঞ্জক সভা? বক্তৃতার ও ভাল করিয়া লিখিবার কাল অতীত হইয়াছে। আমলাতন্ত্রের সমরাহ্বান ঘোষিত হইয়াছে। আমরা সেই আহ্বানে অগ্রসর হইব। পাঞ্জাববাসী সিংহের জাতি, এই যে সব লোক তোমাদিগকে ধুলিসাৎ করিতে চাহে, তাহাদিগকে দেখাইয়া দাও যে—তাহারা যে একজন লাজপত রায়কে লইয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে শত লাজপত রায়ের আবির্ভাব হইবে। শতগুণ উচ্চ তোমাদের সমরাহ্বান তাহাদের কর্ণে ধ্বনিত হউক—'জয় হিন্দুস্থান।'—কংগ্রেস। পৃঃ ২০১-২০২। শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।

কুমিল্লা ও জামালপুরের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় অরবিন্দের মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল—বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় তাঁহার লেখনীমুখে তিনি তাহা খোলাখুলি প্রকাশ করিয়াছেন। লাজপত নির্ব্বাসনেও তাঁহার মনের কথা তিনি খুলিয়াই বলিলেন। সুতরাং বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় এই কালের মধ্যে তাঁহার যেসকল লেখা বাহির হইয়াছিল, সেই সকল লেখা না পড়িলে অরবিন্দের এই সময়কার জীবনচরিত জানা যাইবে না। জানা না গেলে, লেখাও যাইবে না। না জানিয়া লেখালেখি সাহিত্যে আবর্জ্জনার সৃষ্টি করে। শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে এই আবর্জ্জনা-সাহিত্য ক্রমে স্তূপীকৃত হইতেছে।

একটি কথা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বরিশালে গভর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষ দমননীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কুমিল্লা ও জামালপুরে ভেদনীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আবার লাজপত নির্ব্বাসনে পুনরায় দমননীতিরই একটি ১৮১৮ খৃ:-এর অতি পুরাতন সংস্করণ প্রয়োগ করিলেন। ভারতসচিব লর্ড মর্লি এই এক শতাব্দীর জীর্ণ মরচেপড়া আইন সুন্দর সমর্থন করিলেন।

আরো একটি কথা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অরবিন্দ স্পষ্ট লিখিলেন—"The hour for speeches and fine writings is past." এই সময় টাউন হলে Dynamic Religion নামে ভগিনী নিবেদিতা যে অপূর্ব্ব বক্তৃতা করিয়া, শ্রীমতিলাল রায়ের ভাষায় "উত্তেজনার বিদ্যুত্তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিলেন"। সেই বিদ্যুত্তরঙ্গের মধ্য দিয়াই ভগিনী নিবেদিতাও বলিয়াছিলেন—"No more words—words—words. Let us have deeds—deeds--deeds." বিপিনচন্দ্র এই বক্তৃতাটিকে বলিয়াছিলেন—ইহা Dynamic Religion নয়, ইহা একটি Dynamite.

অরবিন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা উভয়ে একই সময়ে, ঠিক একই কথা বলিতেছেন। এই সময়ে এই দুই অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন বিপ্লবী—কী যে ইঙ্গিৎ করিতেছেন, তা এক্ষণে অনুমান করাও নিরাপদ নয়, বিপজ্জনক।

বিপিনচন্দ্র পালের রক্ষাকালীর পূজা ও শ্বেত ছাগলবলি: মাদ্রাজের বক্তৃতা অসমাপ্ত রাখিয়াই বিপিনচন্দ্র—১৯০৭।১২ই মে কলিকাতা ছুটিয়া আসিলেন। মাদ্রাজের সভায় বক্তৃতা বন্ধের জন্য কৈফিয়ৎ দিয়া যে ইস্তাহার জারী হইল তাহাতে লেখা ছিল যে—লাজপত রায়ের নির্ব্বাসনের জন্য গভীর দুঃখে বিপিনচন্দ্র বক্তৃতা বন্ধ করিলেন ("... as a mark of sorrow at Lajpat Rai's arrest and deportation")। দুঃখ হইবার কথাই। কিন্তু শুধু দুঃখ নয়, বিপিনচন্দ্র তাঁহার নিজের নির্ব্বাসনের কথাও হয় তো আশঙ্কা করিয়া থাকিবেন। কেননা অরবিন্দ ১৯০৭।১১ই মে অর্থাৎ বিপিনচন্দ্র কলিকাতা পৌঁছিবার একদিন পূর্ব্বে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় স্পষ্ট এই আশঙ্কার কথা লিখিলেন যে—যদি বিপিনচন্দ্র নির্ব্বাসিত হন তথাপি এই আগুন নিভিবে না বরং ধূমায়িত হইয়া আরও ব্যাপকভাবে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে ("If Sj. Bipinchandra Paul were deported and the Bandemataram, Sandhya and other nationalist journals suppressed, the fire will only become silent, pervading, irresistible.)। সুতরাং দুঃখের সঙ্গে ভয়ের কারণও জড়িত ছিল। শুধু দুঃখ নয় এবং শুধু ভয়ও নয়, দুঃখ এবং ভয় দুই-ই বিদ্যমান।

অবশ্য মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা আসিলে ভারত-গভর্ণমেণ্ট বিপিনচন্দ্রকে আর নির্ব্বাসনে পাঠাইতে পারিবেন না, এমন কথা কিছু নয়। তথাপি মাদ্রাজে

গ্রেপ্তার না হইয়া যদি গ্রেপ্তার হইতেই হয় তবে কলিকাতায় গ্রেপ্তার হওয়াই ভাল—এই রকম একটা কিছু মনে করিয়াই বিপিনচন্দ্র মাদ্রাজের বক্তৃতা অসমাপ্ত রাখিয়া কলিকাতা ছুটিয়া আসিলেন।

কিন্তু কলিকাতা আসিয়া দুই সপ্তাহ মধ্যেই তিনি আবার একটী কাণ্ড করিয়া বসিলেন। এ কাণ্ডটীও আর একটী বক্তৃতা। তবে বক্তৃতার বিষয়টী তিনি সম্পূর্ণ বদলাইয়া দিলেন। মাদ্রাজে তিনি স্বদেশী—স্বরাজ—বয়কট—জাতীয় শিক্ষা—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance), এই সব বিষয়ে জোর বক্তৃতা করিতেছিলেন। এরকম বক্তৃতা মাদ্রাজবাসী কম শুনিয়াছে। কিন্তু কলিকাতায় ১৯০৭।২৫শে মে শক্তি-উৎসব উপলক্ষে বিপিনচন্দ্র অপ্রত্যাশিত রকমে এক নূতন বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রতি অমাবস্যা রাত্রিতে রক্ষাকালীপূজা করিতে হইবে এবং ঐ রক্ষা-কালীর নিকট ১০৮টী শ্বেত ছাগল বলি দিতে হইবে। রক্ষাকালীপূজার অর্থ—হে মা কালী, রক্ষে কর। ইহা তো ভয়ার্ত্ত লোকের প্রার্থনা। তবে কি বিপিনচন্দ্র লাজপত রায়ের নির্ব্বাসনে সত্যি অতি মারাত্মক রকমের ভয় পাইয়াছিলেন? নতুবা স্বদেশী—স্বরাজ—জাতীয় শিক্ষা—বয়কট—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-কণ্টকিত রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি মা-রক্ষাকালীকে আহ্বান করিলেন কেন? এই গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা—ছাগলবলি দেওয়ার প্রথা থাকিলেও ছাগলের রং সম্বন্ধে তিনি শ্বেতবর্ণের ছাগলের উপর জোর দিলেন কেন? তিনি বলিলেন—রক্ষাকালীর রং কাল নয় সাদা, এই শ্বেতবর্ণের কালীর কাছে শ্বেতবর্ণের ছাগলবলি দেওয়াই বিধি। আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন—এ বিধি তিনি কোন্ শাস্ত্রে পাইলেন? অবশ্য গঙ্গাপূজায় পূর্ব্ববঙ্গে কাল নয়, শ্বেতছাগল বলি দেওয়ার বিধি ছিল এবং আছে। মোটের উপর বিপিনচন্দ্রের এই বক্তৃতাটি আমাদের নিকট এক অপূর্ব্ব হেঁয়ালি বলিয়া মনে হয়। বিপিনচন্দ্র একটী কথা এই বক্তৃতায় খুলিয়া বলিলেন যে, গভর্ণমেণ্টের দণ্ডভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত দেশবাসীর মনে এই রক্ষাকালীপূজা ও শ্বেত ছাগলবলি, ভয় দূর করিয়া সাহস আনিয়া দিবে। অরবিন্দ-লিখিত "ভবানী মন্দির" চটি গ্রন্থের সমালোচনা করিতে গিয়া Rowlatt Committee মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, ধর্ম্মের সংস্কারকে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ করা হইয়াছে "The book is a remarkable instance of perversion of religious

ideals to political purposes".—(*p. 17*)। বিপিনচন্দ্র পালের রক্ষাকালী পূজা সম্পর্কেও হয়তো ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা চলে। দেখিতেছি অরবিন্দ বলিতেছেন ভবানী পূজার কথা, আর বিপিনচন্দ্র বলিলেন রক্ষাকালী পূজার কথা। বাংলার এই দুই চরমপন্থী নেতা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বেজায় শাক্ত। অথচ অরবিন্দ লীলাবাদী বৈদান্তিক, এবং বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্ম হইলেও গৌড়ীয় রসতত্ত্ববাদী বৈষ্ণব।

আমার মনে হয়—পাল মহাশয় শ্রীহট্ট জেলার পূজাপদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন। পাল মহাশয়ের জন্মভূমি শ্রীহট্টে। শ্রীহট্টে সাদা রং-এর ষড়ভূজা রক্ষাকালীর পূজাই সমধিক প্রচলিত : ঐ রক্ষাকালীর অপর নাম—মৃত্যুনাশিনী। জ্বর, ওলাওঠা প্রভৃতি ব্যাপকভাবে দেখা দিলে মারীভয়ে শ্রীহট্ট জিলায় এই রক্ষাকালীর পূজা এখনও খুব বেশীই হইয়া থাকে।

"এই সকল বিপদের দিনে রক্ষাকালীপূজার ব্যবস্থা নিরুত্তর-তন্ত্রে ও ভৈরব-তন্ত্রে পাওয়া যায়। শ্বেতবর্ণা রক্ষাকালীর রুদ্র যামলোক্ত ধ্যান। যথা—

শরদিন্দুনিভাং শুভ্রাং বদন-ত্রিতয়াম্বিতাম্।
নবলোচনসংযুক্তাং জটামুকুটমণ্ডিতাম্॥ ... ইত্যাদি।

শক্তি যামল ও ষট্‌কর্ম্মদীপিকাতে শ্বেতবর্ণা ষড়ভূজার অন্যপ্রকার ধ্যান লক্ষিত হয়। যথা—

গোক্ষীরশশিমিশ্রাভামর্দ্ধেন্দু কৃতশেখরাম্।
ত্রিমুখীং ষড়ভূজাং ত্র্যক্ষীং নৃত্যন্তীং যমপৃষ্ঠকে॥
জটাজুটসমাযুক্তাং রক্তবস্ত্রপরিচ্ছদাম্। ... ইত্যাদি।

রুদ্র যামলে শ্বেতবর্ণা চতুর্ভুজা রক্ষাকালীর ধ্যানও পাওয়া যায়। যথা—

ধ্যাত্বা কালীং মহামায়াং ত্রিনেত্রাং বহুরূপিনীম্।
চতুর্ভুজাং শ্বেতবর্ণাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্॥ ... ইত্যাদি।

শ্বেতবর্ণা রক্ষাকালীর এই তিন প্রকার ধ্যানের অনুসন্ধান পাইয়াছি, আরও আছে কিনা জানি না। প্রথম ধ্যানের মূর্ত্তি অনেক দেখিয়াছি, বিস্তৃত পূজা-পদ্ধতিও শ্রীহট্টে প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-পরিবারেই পাওয়া যাইবে।"—(শ্রীসুখময় ভটাচার্য্য, 'উদ্বোধন', মাঘ, ১৩৫১, পৃ: ১৮)

পরম পূজনীয়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্বপ্নে এক কালী মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন—আলুলায়িত মুক্তকেশা এবং

গায়ের রং ধব্‌ধবে সাদা। আমি তখন জানিতাম না যে, কালী শ্বেতবর্ণা হইতে পারে।

বিপিনচন্দ্রের রক্ষাকালীপূজার বক্তৃতা তাঁহার নিজের কাগজ New Indiaতে ১৯০৭।৬ই জুন প্রকাশিত হইয়াছিল। Rowlatt Committee, New Indiaতে প্রকাশিত খবরের উপর নির্ভর করিয়াই এ সম্পর্কে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা তুলিয়া দিতেছি—

"On the 25th May, Bipinchandra addressed a meeting at a Sakti Celebration in a house in Calcutta, at which, according to a report which appeared in his own paper, New India, on June 6th, 1907, he recommended the organisation of Kali Puja (worship) in every important village every new moon-day. Not worship of the ordinary Kali, but of Rakshakali that is worshipped in times of trouble. Rakshakali was not black but white symbol, not of darkness but of light. The sacrifices acceptable to Rakshakali were white goats and not black ones. It would not be a bad thing if they oould organise public Rakshakali Pujas at the present juncture where large crowds could be collected and 108 goats sacrificed. It would put courage into drooping hearts.

"According to a report of the meeting in the Bandemataram newspaper of May 27th,. 1907, Bipinchandra had been followed by a Madrasi gentleman who declared that they ought to go abroad and learn the manufacturing of bombs and other destructive weapons, how to wield them (even the Czar of all the Russia's trembled at bombs), and return to their country to sacrifice every Amavasya (new moon) night 108 whites—(not white lambs but those who were their enemies) and there the bright prospect of whole nation lay in the future."—*Rowlatt Committee Report, p. 115.*

যে মদ্রবাসী ভদ্রলোকটির কথা ১৯০৭।২৭শে মে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় উল্লেখিত হইয়াছে সম্ভবতঃ তিনি মাদ্রাজ হইতেই বিপিনচন্দ্রের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি গুপ্তচরের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া একটা বড় ভুল করিয়াছেন। তিনি জানিতেন না যে, বিপিনচন্দ্র গুপ্তসমিতি বা বোমার বিরোধী। তাঁহার উচিত ছিল বিপিনচন্দ্রের নিকট না গিয়া অরবিন্দের নিকট যাওয়া এবং অরবিন্দের নিকট গিয়া বলা যে, ইউরোপে লোক পাঠাইয়া বোমা তৈরী শিক্ষা করিয়া আসা প্রয়োজন। এবং যদি ঐ মদ্রবাসী গুপ্তচর অরবিন্দের নিকট ঐরূপ প্রস্তাব করিতেন, যাহা তিনি বন্দেমাতরমের রিপোর্ট অনুযায়ী বিপিনচন্দ্রের নিকট করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তিনি জানিতে পারিতেন যে—অরবিন্দের দলের হেমচন্দ্র কাননগু ১৯০৬।১৩ই আগষ্ট বোমা তৈরী শিক্ষার জন্য ইউরোপে চলিয়া গিয়াছেন এবং ১৯০৭।মে মাসে তিনি প্যারিসের অলিগলিতে যে-সকল গুপ্ত-সমিতি আছে তাহাতে যোগদান করিয়া বোমা তৈরী শিক্ষা করিতেছেন এবং শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯০৭।ডিসেম্বরে তিনি দেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য রওনা হইবেন। মদ্রবাসী ভদ্রলোক লোক চিনিতে পারেন নাই, ভুল করিয়াছিলেন।

আমরা দেখিতেছি ১৯০৭।মে-জুন মাসে বিপিনচন্দ্রের New India এবং অরবিন্দের Bandemataram পত্রিকা সমানে চলিতেছে। এই দুই পত্রিকাই বাংলার স্বদেশী যুগের চরমপন্থী রাজনীতি ভারতবর্ষে প্রচার করিতেছে। বন্দে-মাতরম্ পত্রিকার লেখার মধ্যে অরবিন্দ "The Doctrine Of Passive Resistance"—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের উপর ১৯০৭।এপ্রিল মাস ভরিয়া ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতেছেন। কিন্তু New Indiaতে অরবিন্দের লেখা পাই না, অথচ ভগিনী নিবেদিতার লেখা পাই। ভগিনী নিবেদিতা এই সময় নিজেই জীবন্ত ও জাগ্রত রক্ষাকালী; তিনি শ্বেতবর্ণা। অরবিন্দ ও বিপিন-চন্দ্রকে তুলনা করিয়া দেখিতে হইলে এই সময়কার New India ও Bandemataram পত্রিকায় প্রকাশিত ইঁহাদের দুইজনের লেখা তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে। এরকমের তুলনা অদ্যাপি কেহ করেন নাই।

বিপিনচন্দ্রের রক্ষাকালীপূজা ও শ্বেত ছাগলবলি সম্পর্কে আমাদের মনে কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হইয়াছে—সংক্ষেপে তাহা বলিয়া রাখা ভাল।

আমাদের ১ম প্রশ্ন : ১৯০৭।এপ্রিলের শেষসপ্তাহে জামালপুরে মুসলমানদের কর্ত্তৃক বাসন্তীপ্রতিমা অকথ্যভাবে খণ্ডবিখণ্ড হওয়ার মাত্র একমাস পর মে মাসের শেষসপ্তাহে বিপিনচন্দ্র সাদা রং-এর রক্ষাকালীপূজা এবং শ্বেত ছাগলবলির পরামর্শ দিলেন কেন? তিনি কি ৭ই মে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় বাংলার পল্লীতে মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কোনরূপ প্রতিকার করিতে অসমর্থ অক্ষম দুর্ব্বল জাতিভেদসমাচ্ছন্ন কাপুরুষ ভীরু হিন্দুসম্প্রদায়ের উপর অরবিন্দের বিদ্যুৎবর্ষী তিরষ্কারপূর্ণ লেখা পাঠ করেন নাই? অরবিন্দ লিখিয়াছেন যে—যদি বাংলার পল্লী-হিন্দুসম্প্রদায় মুসলমানদের হাত হইতে তাহাদের পূজার দেবী এবং ঘরের স্ত্রী-কন্যা ও মা'র সম্মান রক্ষা করিতে অসমর্থ হয় তবে বাংলার এই হিন্দুসম্প্রদায় পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাক্; তাহাতে আক্ষেপ করিবার কিছু নাই, কেননা তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না ("If Bengal has been seized with such a severe palsy as not to strike a blow even for honour of our women, it is better for her people to be blotted from the earth than cumber it longer with their disgrace."—*Aravinda Ghose*)। আমাদের বিবেচনায় জামালপুরের ঘটনার পর বিপিনচন্দ্রের রক্ষাকালীপূজা করিয়া শ্বেত ছাগল বলি দেওয়ার পরামর্শ বাংলার পল্লীতে পল্লীতে হিন্দু-মুসলমানবিরোধরূপ যে প্রলয়কে ডাকিয়া আনিবে তাহার সম্মুখে বিপিনচন্দ্রের বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও অরবিন্দের গুপ্তসমিতি, বোমা ও রিভল্‌বার কয়েকখণ্ড শুষ্ক তৃণের মত উড়িয়া যাইবে। ইহা কঠোর সমালোচনা। তথাপি ইহাই আমাদের সুচিন্তিত অভিমত।

২য়—বাংলার চরমপন্থী রাজনীতি গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন-নিবেদন নীতি পরিত্যাগ করিয়া আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে বলে। কিন্তু অরবিন্দ-কথিত মা-ভবানীর কাছে প্রত্যেকে যে যার স্বাধীন ইচ্ছা বলি দিয়া আত্মসমর্পণ (self-surrender) এবং বিপিনচন্দ্র-কথিত মা-রক্ষাকালীর নিকট শ্বেত ছাগল বলি দিয়া দেবদেবীর অলৌকিক শক্তি ও কৃপার উপর জাতির মজ্জাগত অন্ধবিশ্বাসকে পুনরায় নবসংস্করণে উদ্দীপিত করিয়া জাতির আত্মশক্তিকে উদ্বোধন করা হইবে, না সেই আত্মশক্তির অপঘাতমৃত্যুকে ডাকিয়া আনা হইবে? পরাধীন জাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা সম্পূর্ণ

লৌকিক ব্যাপার; সুতরাং আমাদের বিবেচনায় ঐ কার্য্য লৌকিক উপায়েই সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। দেবদেবীর অনুগ্রহ ও অলৌকিকে বিশ্বাস বিংশশতাব্দীর রাজনীতির অনুকূল বস্তু নহে।

৩য়—রাজা রামমোহনের ভাষায় "আমাদের মত দুর্ব্বল, ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর রাজ-অত্যাচার" যে প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিবে তাহা জাতির আত্ম-শক্তির উদ্বোধন করিবার পক্ষে অনুকূল, না প্রতিকূল? বিপিনচন্দ্র বলেন, রাজ-অত্যাচারে ১৯০৭ সনের রাজনৈতিক অবস্থায় জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু অরবিন্দ উল্টা কথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ-অত্যাচারে সমগ্র জাতি ক্ষিপ্ত হইয়া জাগিয়া উঠিবে। এই দুই চরমপন্থী নেতার দৃষ্টিভঙ্গী এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পৃথক্। কার দৃষ্টি ভাল এবং কার দৃষ্টি মন্দ, তার প্রমাণ ইতিহাস দিতেছে। এই সম্পর্কে অরবিন্দের "আরো অত্যাচার চাই" "Wanted more repression" (বান্দমাতরম্, ১৯০৭।১৮ই জুলাই-এর প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য)।

এই প্রসঙ্গে মাত্র আর একটী কথা উল্লেখযোগ্য—

"এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহ শ্বেত ছাগের অর্থ য়ুরোপীয় ধরিয়া বিপিনচন্দ্রের দণ্ড প্রার্থনা করেন। বক্তৃতাটি "বন্দেমাতরমে" প্রকাশিত হওয়ায় "সন্ধ্যা" (উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব) 'বন্দেমাতরমে'র (অরবিন্দ) নিন্দা করেন।"—(কংগ্রেস। পৃ: ২০৩, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।)

যুগান্তরের মামলা (১৯০৭।২৪শে জুলাই)—রাজ-অত্যাচার বলিতে বলিতেই রাজ-অত্যাচার আসিয়া পড়িল। ১৯০৬।মার্চ্চ হইতেই যুগান্তর পত্রিকা অর্থাৎ বারীন্দ্রের দল খোলাখুলি বিপ্লববাদ প্রচার করিতেছিল। বারীন্দ্রের ভিতর দিয়া যুগান্তরের সহিত বিপ্লববাদী অরবিন্দের যোগাযোগ ছিল। যুগান্তরের মামলাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

৩রা জুলাই পুলিশ সদলবলে আসিয়া যুগান্তর আফিসে হানা দিল, খানা-তল্লাস করিল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জামালপুরের হাঙ্গামার তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন। জামালপুরে স্বেচ্ছাসেবকেরা নাকি অবশেষে পিস্তল ছুড়িয়াছিল। ভূপেন্দ্রনাথ সবেমাত্র জামালপুর হইতে ফিরিয়া যুগান্তর আফিসে আসিয়া উপবেশন করিয়াছেন। তাঁহাকেই যুগান্তরের দল এই বিপদের মুখে সম্পাদক মনোনীত করিল। দেখা গেল, বারীন্দ্র নেতা হইলেও অগ্রসর হইল না,

পিছাইয়া রহিল। হয়তো ভবিষ্যৎ বিপ্লবের কাজের জন্যই গাঢাকা দিল। ৫ই জুলাই ভূপেন্দ্রনাথ সম্পাদক হিসাবে গ্রেপ্তার হইলেন। ২২শে জুলাই বিচার আরম্ভ হইল।

পুলিশের অভিযোগ—যুগান্তরে প্রকাশিত দুইটি প্রবন্ধ : ২৬শে জুলাই বন্দেমাতরম্ পত্রিকা যুগান্তরের এই দুইটি রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাপাইয়া দিল।

প্রথম প্রবন্ধ : ১৯০৭।৭ই এপ্রিল। এই প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে যে, বিপ্লবের পূর্ব্বে প্রত্যেক দেশেই তিনটি দল দেখা যায়, যথা—(১) দেশদ্রোহী বিভীষণ, (২) নরমপন্থী রাজভক্ত মডারেট, (৩) বেপরোয়া বিপ্লববাদী ("The articles of Jugantar on which action were taken (7th April, 1907). Before revolution three parties in every country—(1) Traitors, (2) Moderates, (3) Revolutionists."—*Bandemataram, 1907, 26th July*)।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ : ১৯০৭।৫ই মে। অরবিন্দের বন্দেমাতরম্ পত্রিকা এই প্রবন্ধের যে ইংরেজী অনুবাদ ছাপাইয়াছিল তাহা তুলিয়া দিতেছি—"What more do you want ? You Englishmen are not a man, you are a demon. You are an *asura*, otherwise our Surendranath would not have talked all those nonsense to your representative near the battlefield of Jamalpur. You have demoralised educated Indians as lambs, and in East Bengal you have set Musalmans against the Hindus."—*Bandemataram, 1907, 26th July.* অহিংসবাদী মহাত্মা গান্ধী গভর্ণমেণ্টকে শয়তান ("Satanic") যে তারিখে বলিয়াছেন—সেই তারিখের কত বৎসর পূর্ব্বে বিপ্লববাদী যুগান্তরের দল গভর্ণমেণ্টকে "অসুর" "রাক্ষস" বলিয়াছে তাহা গণনায় হিসাব করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ উল্লিখিত প্রবন্ধ দুইটির সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। ফলে তাঁহার এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। শোনা যায়, ঐ প্রবন্ধ দুইটি ভূপেন্দ্রনাথ লেখেন নাই, তথাপি তিনি হাসিমুখে কারবরণ করিলেন। ২৫শে জুলাই অরবিন্দের বন্দেমাতরম্ পত্রিকা এই মোকদ্দমার

বিবরণ প্রকাশ করিল। সেই সঙ্গে অরবিন্দ তাঁহার মন্তব্যও প্রকাশ করিলেন। তুলিয়া দিতেছি—

"The Jugantar Case : Editor sentenced to one year's R. I. Editor calm and composed with a smiling face. Courtroom crowded mostly with youngmen. One more for the altar ...Bhupendranath Dutta imprisoned for telling the truth with too much emphasis. To meet prosecution with indifference—to take punishment quietly as a matter of course with erect head and undimmed eyes—this is the spirit with which we must conquer".—*Bandemataram ; 1907, 25th July.*

২৬শে জুলাই বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দ নিজে এই সৎসাহস ও হাসিমুখে কারাবরণের জন্য ভূপেন্দ্রনাথকে অজস্র প্রশংসা করিয়া সম্পাদকীয় এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেন। আমরা ঐ প্রবন্ধ ২৪।১২।৪৩ তারিখে পাঠ করিয়াছি।

সুতরাং অরবিন্দের লেখা হইতেই ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, ভূপেন্দ্রনাথের পক্ষে অপরাধী না হইয়াও অর্থাৎ ঐ প্রবন্ধ দুইটি না লিখিয়া এবং সত্যি সম্পাদক না হইয়াও আদালতে মিথ্যা-অপরাধ স্বীকার করিয়া হাসিমুখে কারাবরণ করা অরবিন্দের সুচিন্তিত অভিমত। নিশ্চয়ই তিনি মনে করিয়াছিলেন যে—এইরূপ করাতে দেশের উপকার হইবে, বিপ্লববাদ আরও বেশী প্রচার হইবে এবং কারাবরণ করাতে লোকের মনে সাহস বাড়িবে, তাহাতে নির্দোষী বেচারী ভূপেন্দ্রনাথের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন।

কিন্তু ইহাতে ভূপেন্দ্রনাথের পক্ষে একটা উপকার এই হইল যে, যদি তিনি এই এক বৎসর কারাগারে না থাকিয়া বাহিরে থাকিতেন তবে আলিপুর বোমার মামলায় ধৃত হইয়া তাঁহার দ্বাদশ বৎসর আন্দামান-বাসের নিশ্চয়ই সম্ভাবনা ছিল। তুলনায় এক বৎসর অপেক্ষা দ্বাদশ বৎসর অনেক দীর্ঘকাল।

বারীন্দ্রকুমার নিজে আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, "সেজদার পরামর্শেই ভূপেন্দ্রনাথকে দিয়া অপরাধ স্বীকার করাইয়া তাঁহাকে জেলে পাঠান হইয়াছিল"। বারীন্দ্রকুমার মিথ্যা বলেন নাই। বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দের

নিজের লেখা হইতেই তাহার প্রমাণ পাইতেছি, কেননা অরবিন্দ স্পষ্ট লিখিয়াছেন—"To meet prosecution with indifference—to take punishment quietly as a matter of course with erect head and undimmed eyes—this is the spirit with which we must conquer."—*Arabindo Ghose.*

অবশ্য আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ তাঁহার এই মতে আঁটিয়া অর্থাৎ টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই। জেলের মধ্যে থাকা অবস্থাতেই হেমচন্দ্রকে দিয়া অরবিন্দ বারীন্দ্রের নিকট ইহার উল্টা মত অর্থাৎ অপরাধ স্বীকার করিতে (confession) নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহাতে বারীন্দ্রের সহিত অরবিন্দের মতবিরোধ হইয়াছিল। এবং বারীন্দ্র অরবিন্দের মত অগ্রাহ্য করিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বারীন্দ্রকুমার সবিস্তারে অরবিন্দের এই মতপরিবর্ত্তনের কথা একাধিকবার আমাদিগকে বলিয়াছেন। মনে হয়, বারীন্দ্রকুমার মিথ্যা কথা বলেন নাই।

যুগান্তর পত্রিকা এবং যুগান্তরের বৈপ্লবিক দলের সহিত অরবিন্দের কোনই সম্পর্ক ছিল না বলিয়া যে Mr. C. R. Das যুগান্তর এবং বন্দেমাতরম্ পত্রিকার আদর্শগত পার্থক্য দেখাইয়া আলিপুর বোমার মামলায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা উত্তম বক্তৃতা, কিন্তু সত্য ইতিহাস নহে। আসামীকে ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা এক কথা, আর সত্য ইতিহাস বা জীবনচরিত অন্য কথা।

ভারতসচিব লর্ড মর্লির বাজেট-বক্তৃতা (১৯০৬-৭) ঃ ইতিহাসপথে আমরা অরবিন্দের জীবন-চরিতকে অনুসরণ করিতেছি। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের এই ইতিহাস শুধু বাংলাদেশ বা মহারাষ্ট্র বা পাঞ্জাবে রচিত হয় নাই। ইহার খানিকটা অংশ ইংলণ্ডের মিষ্টার মর্লি (পরে লর্ড হইয়াছিলেন) ভারতসচিব থাকা অবস্থায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নেতৃবর্গ লর্ড মর্লির উপর অতিমাত্রায় দুরাশা পোষণ করিতেন। কেননা মিষ্টার মর্লি গ্ল্যাডষ্টোনের এবং অন্যান্য মহাপুরুষদের জীবন-চরিত লিখিয়াছেন।

লর্ড মর্লির উপর অরবিন্দের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন দিন কোনরূপ আস্থা ছিল না। যে অরবিন্দ গ্ল্যাডষ্টোনকে ভারতের উন্নতির বিঘ্নস্বরূপ মনে

করিয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইন্দুপ্রকাশে সুতীব্র ভাষায় গালাগালি দিয়াছেন, সেই গ্ল্যাডষ্টোনের জীবন-চরিত লিখিয়াছেন বলিয়াই যে-সকল ভারতীয় নেতা লর্ড মর্লির উপর ভ্রান্তবিশ্বাসে মিথ্যা আশা পোষণ করিয়াছিলেন, অরবিন্দ তাঁহাদের দলে ছিলেন না। এবং যে শাসন-সংস্কার মর্লি-মিণ্টো মার্কা লইয়া এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল উহাকে অরবিন্দ আমাদের রাজনৈতিক উন্নতির সম্পূর্ণ বিঘ্নস্বরূপ বিবেচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অরবিন্দ মর্লির শাসন-সংস্কার বিচক্ষণতার সহিত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ শাসন-সংস্কার আমাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের আগুন জ্বালাইয়া দিয়া আমাদের ঘর পুড়াইয়া দিবে মাত্র।

মিষ্টার মর্লি ১৯০৬।আগষ্ট মাসে তাঁহার বাজেট-বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি খোলাখুলি বলিয়াছিলেন যে, Canadaর মত উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনও ভারতবর্ষ পাইতে পারে না ("I do not insist that India should be on the same footing as our self-governing Colonies like Canada."—*1906, August—Mr. Morley*)। ইহা কোন হেঁয়ালিপূর্ণ কথা নয়। এ একেবারে খাঁটী সাচ্চা কথা—ইহার মার নাই।

আবার এদিকে ঠিক এই সময়েই, এমন কি এই মাসেই বাংলার চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র লিখিতেছেন ও বক্তৃতা করিতেছেন এই বলিয়া যে--তাঁহারাও উপনিবেশের মত স্বায়ত্তশাসন চাহেন না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত লিখিয়া বা বলিয়া যদি তাঁহারা ক্ষান্ত থাকিতেন তবে তো গোল মিটিয়াই যাইত। মিষ্টার মর্লির সহিত তাঁহারা সম্পূর্ণ এক মত হইয়া যাইতেন। কিন্তু অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র ইংরেজের কর্ত্তৃত্ব-বর্জ্জিত পূর্ণ স্বাধীনতা চান। এ অতি মারাত্মক রকম মুশকিলের কথা। মিষ্টার মর্লি যে-কালে উপনিবেশের মত স্বায়ত্তশাসন ভারতবর্ষকে দিতে অনিচ্ছুক, সেই কালে অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পাইতে ইচ্ছা করেন ইংরেজ-বর্জ্জিত পূর্ণ স্বাধীনতা।

মিষ্টার মর্লির ২য় বাজেট-বক্তৃতার তারিখ ১৯০৭।জুলাই—যে জুলাই মাসের ২৪শে তারিখে যুগান্তর-সাম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ এক বৎসরের জন্য জেলে প্রেরিত হইয়াছেন এবং যাহার দুই মাস পূর্ব্বে ১৯০৭।৯ই মে লাজপত রায় ও অজিত সিং বিনাবিচারে নির্ব্বাসনে প্রেরিত হইয়াছেন। পাঞ্জাব ও বাংলার এই অশান্তির ঝড় সম্মুখে রাখিয়াই মিষ্টার মর্লি হাউস অব কমন্স-এ তাঁহার দ্বিতীয়

বাজেট-বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হইলেন। সুতরাং তিনি কি বলেন তাহা শুনিবার বিষয়। আগেই বলিয়া রাখা ভাল Mr. Balfour (Opposition leader) মিষ্টার মর্লির এই বক্তৃতা শুনিয়া ব্যঙ্গসূচক হাস্য (ironical laughter) করিয়াছিলেন।

মিষ্টার মর্লি লালা লাজপত রায়ের নির্ব্বাসনও সমর্থন করিলেন এবং তাহা যে বিনাবিচারে ইহাও সমর্থন করিলেন। মিঃ মর্লি বলিলেন যে, লাজপত রায় ও অজিত সিং পেন্‌সনপ্রাপ্ত শিখসৈন্যদের মধ্যে, এমন কি ঐ পেন্সনপ্রাপ্ত শিখ-সৈন্যদিগকে সভা করিয়া এবং বিশেষভাবে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া রাজদ্রোহমূলক বিদ্রোহাত্মক বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। যদি ঐ সব সৈন্যরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত এবং যদি একদল দেশীসৈন্য, ভাবুন, আন্দোলনকারীদের সহিত যোগ দিত, তাহার ফলে কি না হইতে পারিত! ("...suppose a single native Regiment had by chance sided with the rioters.")

অতঃপর পূর্ব্ববঙ্গের অশান্তির কথা উল্লেখ করিয়া ঐ অশান্তির ছয়টী কারণ পর পর উল্লেখ করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের অশান্তি—অর্থাৎ কুমিল্লা ও জামালপুরের সদ্য ঘটনাই তাঁহার মনের সম্মুখে উপস্থিত ছিল। কেননা পূর্ব্ববঙ্গের অশান্তির যে ছয়টী কারণ তিনি দিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটী কারণ দ্বারাই তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে অশান্তি বা কুমিল্লা ও জামালপুরের ঘটনার জন্য নিষ্পাপ গভর্ণমেণ্ট কোনরকমেই দায়ী নহেন! মিষ্টার মর্লি যে ভূমিকার অভিনয় করিতে দাঁড়াইয়াছেন, তাহাতে গভর্ণমেণ্টকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিয়া এইরকম সাফাই গাওয়া ছাড়া আর অন্য রকম কোন কিছু বলা বা করা তাঁহার পক্ষে কী করিয়া সম্ভব ছিল, আমরা তো বুঝি না। যাত্রার দলে ভীমের পাঠ করিতে উঠিয়া যেমন কেহ কীচকের পাঠ করিতে পারে না, তেমনই আবার কীচকের পাঠ করিতে উঠিয়াও ভীমের পাঠ করা যায় না। যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম!

মিঃ মর্লি বলিলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে অশান্তির কারণ ছয়টী; যথা—

১ম—মুসলমানদিগকে বলপূর্ব্বক বয়কট গ্রহণ করাইবার চেষ্টা ("First, attempts to impose the boycott on Mahommedans by force.")।

২য়—হিন্দুরা নালিশ করে যে, Magistrate Police তাহাদিগকে

বয়কট প্রচার করিতে দেয় না। আবার সেই সঙ্গে মুসলমানেরা উল্টা নালিশ করে যে, রাজকর্ম্মচারীরা বয়কট প্রচার করিতে হিন্দুদিগকে বাধা দেয় না কেন ("Secondly. complaints by Hindus that the local officials stop them ; and by Mahommedans that they do not try to stop them.")।

৩য়—মুসলমানেরা রাগান্ধ হইয়া প্রতিশোধ নেয় ("Thirdly, retaliation by Mahommedans".)।

৪র্থ—হিন্দুরা নালিশ করে যে, মুসলমানের অত্যাচার হইতে পুলিশ বা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের রক্ষা করে না। ("Fourthly, complaints by Hindus that the local officials do not protect them from this retaliation.")।

৫ম—উচ্চশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দলাদলি হওয়ার দরুণ নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় ("Fifthly, general lawlessness of the lower classes on both sides, encouraged by the spectacle of fighting among the higher classes.")।

৬ষ্ঠ—নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এইরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামার দরুণ পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আরও অধিক নালিশ আসে। ("Sixthly, mere complaints against the officials as the result of that disorder in certain districts having been complained of.")।

এই ছয়টী কারণ শুধু একটী সাদা কথায় প্রকাশ করা যাইতে পারে যে—তোমরা হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া করিবে তার আমরা (Government) কী করিব? আমরা আছি বলিয়া তো বাঁচিয়া আছ, নতুবা অরাজকতায় তো গোটা ভারতবর্ষটাই উচ্ছন্নে যাইত! একথার উত্তরে শুধু বলা যাইতে পারে—বটেই তো!

সেদিন স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ আসিয়া এই কথাই বলিয়া গিয়াছিলেন। লর্ড হ্যালিফাক্স আমেরিকাতে এই কথাই বলিয়াছিলেন। মিষ্টার আমেরী, এই কথাই বলিয়াছেন। অতএব প্রধানমন্ত্রী মহাশয় মিষ্টার চার্চ্চিলও সেই কথাই বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—হিন্দুসভা ও মোসলেম লীগ এক হইয়া যাক, অথবা মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্না এক হইয়া যাক্, আমরা

তোমাদের সব বুঝাইয়া দিয়া ভারত-শাসনরূপ এই বিষম দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাই এবং ঘরের ছেলে মানে মানে ঘরে ফিরিয়া যাই—সাফ্ কথা।

১৯০৭ খৃঃ মিষ্টার মর্লি যে নীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দেও তাহাই বহাল ছিল। ৩৮ বৎসরের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের কথার কোন নড়চড় হয় নাই। তাঁহারা এক কথাই বলিতেছেন।

মর্লির কথার জবাবে অরবিন্দ গভর্ণমেণ্টের নিকট কোনই আবেদন-নিবেদন করিতেছেন না, বরং নিপীড়িত কুমিল্লা ও জামালপুরের হিন্দুদিগকে গভর্ণমেণ্টের নিকট যাইতে নিষেধ করিতেছেন। নিজেদের হাতে প্রতিকারের ভার লইতে বলিতেছেন। যদি ইহা পারা যায় এবং সম্ভব হয় তবে তো মিঃ মর্লির ৬ দফা কারণের এক দফাও টিকে না। ১৯০৭।২৫শে জুন বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দ মর্লির পলিসি বিশ্লেষণ করিয়া মডারেটদের দেখাইলেন যে—দেখ, মিঃ মর্লি তোমাদিগকে উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনও দিতে চাহেন না। তবে এখন তোমরা, হে মডারেটগণ, কী করিবে?

মিষ্টার মর্লি পার্লিয়ামেণ্টকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে, বাংলার স্বদেশী হাঙ্গামায় এবং পাঞ্জাবের অশান্তিতে আপনারা কোন চিন্তা করিবেন না, আন্দোলনের নেতাদিগকে গভর্ণমেণ্টের দিকে টানিয়া আনিতে হইবে ("Let us try to draw to our side those men who now influence the people".)। এবং এই সকল নেতারা যদিও আমাদিগকে পছন্দ করেন না জানি, কিন্তু তাহাতে কিছুই আসে-যায় না, কেননা আমাদের রাজত্বের সহিত তাঁহাদের স্বার্থ ষোল আনা বিজড়িত এবং আমরা যদি আজ চলিয়া আসি তবে তাঁহাদের অর্থ ও স্বার্থ সমূলে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে ("I do not say for a moment that they like us ; but no matter, they know that their whole interest is bound up with the law and order we preserve, and which they know would be shattered to pieces if we disappeared".)। অর্থাৎ যাঁহারা আমাদের তাড়াইতে চান, যদি আমরা তাঁহাদের কথায় চলিয়া আসিবার ভান করি, তবে দেখা যাইবে যে—তাঁহারাই আবার আমাদের কাছা অর্থাৎ পেণ্টলুন ধরিয়া টানিয়া রাখিবে। মিঃ মর্লি এক্ষেত্রে কংগ্রেসী রাজনীতির নিপুণ বিশ্লেষণ করিয়া একেবারে চরম কথা বলিয়া দিয়াছেন এবং প্রলেটেরিয়েটবাদী, বুর্জ্জোয়া কংগ্রেস

বিরোধী অরবিন্দ বিলাত হইতে প্রথম এদেশে আসিয়া ইন্দুপ্রকাশের প্রবন্ধে মিষ্টার মলির পনর বৎসর আগে এই তত্ত্বকথাই উদ্ঘাটন করিয়া বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন—

"Journalists, barristers, doctors, officials, graduates and traders who have grown up and are increasing with prurient rapidity under the ægis of the British rule and this class I call the middle class."—*(1893, 4th Dec)*

"In us the Indian bourgeois or the middleclass emerges from obscurity perhaps from nothingness, and strives between a strong and unfeeling bureaucracy and inert and imbecile proletariat to possess itself of rank, consideration and power".—*(1894, 5th Feb.)*

"Theorist and trifler though I may be called, I again assert as our first and holiest duty, the elevation and enlightenment of the proletariat-"—*(1893, 4th Dec.)*

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ যদিও বুর্জোয়া রাজনীতির মধ্যেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন তথাপি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রলেটেরিয়েটবাদ তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন এমন কোন প্রমাণ আমরা পাই না। তিনি বুর্জোয়া রাজনীতির আবরণে গা-ঢাকা দিয়া বিপ্লবের প্রাথমিক কার্য্যে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন, দেখিতে পাই।

বয়কট সভার তৃতীয় বার্ষিকী—১৯০৭।৭ই আগষ্ট : বয়কটের তৃতীয় বার্ষিকী সভা এবার পার্শীবাগান স্কোয়ারে হইল। মডারেট অম্বিকাচরণ মজুমদার সভাপতি হইলেন। ৫ই আগষ্ট বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় জাতীয় জীবনে বয়কটের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সম্ভবতঃ অরবিন্দই প্রবন্ধ লিখিলেন। পরের দিন, ৬ই আগষ্ট, অরবিন্দ বয়কটের আবার এক নূতন ব্যাখ্যা করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেন। তিনি লিখিলেন যে, বয়কট কেবল অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, ইহা জাতির স্বাধীনতালাভের একটি উপায় মাত্র। এবং স্বাধীনতা লাভের জন্যই আমরা ইহা গ্রহণ করিয়াছি ও প্রয়োগ করিতেছি। বিপিনচন্দ্রের ব্যাখ্যা হইতে বয়কট-ব্যাখ্যায় অরবিন্দ কিছুটা নূতনত্ব দেখাইলেন।

"On the 7th of August Bengal discovered for India the

idea of Indian Independence as a living reality and not a distant utopia. On the 7th of Aug. she consecrated herself to the realisation of the supreme ideal by the declaration of the boycott. Boycott is the practice of Independence. When, therefore, we declared the boycott on the 7th of August, it was no mere economical revolt we were instituting, but the practice of National Independence. It is the day when the Indian Nationalism was born."—*Bandemataram, 1907, 6th Aug.*

৭ই আগষ্ট বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দ পুনরায় লিখিলেন যে, বয়কট দ্বারা আমরা কাহাকেও (ইংরেজ জাতিকে) ঘৃণা করিতেছি না, আমরা শুধু আমাদের স্বাধীনতা ও পৃথক্ জাতিয়ত্ব ঘোষণা করিতেছি মাত্র। আয়র্লণ্ডের পক্ষে মিঃ ডি ভ্যালেরা ৭ দিন পূর্ব্বে এই রকম ঘোষণাই করিয়াছিলেন বটে। অর্থাৎ আইরিশ জাতি ইংরেজ জাতি নয়, একটা পৃথক জাতি। অরবিন্দও সেইরূপ বলিলেন, ভারতবাসী একটা পৃথক্ জাতি। সুতরাং পৃথক্ জাতি হইলে সেই জাতির একটা পৃথক্ স্বাধীনতা থাকা দরকার। বয়কট দ্বারা সেই পৃথক্ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইতেছে। ইহা ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের লাহোর-কংগ্রেসের পুরা ২৩ বৎসর আগের কথা।

"Our Rulers and Boycott : we have repeatedly said that boycott is not a gospel of hatred, it is simply our assertion of independence, our national separateness."—*Bandemataram, 1907, 7th Aug.*

বন্দেমাতরম্ অফিসে (১৯০৭।৩০শে জুলাই) সন্ধ্যা অফিসে (১৯০৭।৭ই আগষ্ট) খানাতল্লাসী : গভর্ণমেণ্ট জোর সংবাদপত্র দলন-নীতি আরম্ভ করিলেন। নির্ব্বাসন-নীতির পরে সংবাদপত্র দলননীতি আসিল। ফলে ৩০শে জুলাই বন্দেমাতরম্ অফিসে খানাতল্লাসী হইল। অফিসে তখন শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী উপস্থিত ছিলেন, অরবিন্দ ছিলেন না। পুলিশ কতকগুলি বাজে কাগজ-পত্র হাতড়াইয়া লইয়া গেল। সেদিন ঐ পর্য্যন্ত। বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য দেখা গেল না। ৩০শে জুলাই অরবিন্দ বন্দেমাতরম্ পত্রিকায়

সমানে লিখিয়া যাইতেছেন "Why the boycott succeeded", "Wel-done Comilla"—ইত্যাদি।

পরে ৭ই আগষ্ট বয়কটের ৩য় বার্ষিকী সভার দিন সন্ধ্যা-অফিসে খানাতল্লাসী হইল। কারণ—

" 'সন্ধ্যার' ছাপাখানায় তখন 'যুগান্তর' ছাপা হইতেছিল। ৭ই আগষ্ট পুলিশ সন্ধ্যা অফিসে খানাতল্লাস করেন ও কয়েকটি ফর্ম্মা লইয়া যান। তাহার পর তাঁহারা যুগান্তর কার্য্যালয়ে গেলে একটা হাঙ্গামা হয়। হাঙ্গামায় ২জন যুবক ও ২জন গোয়েন্দা পুলিশ-কর্ম্মচারী আহত হন।"—(কংগ্রেস ; পৃঃ ২০৮, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ)।

১৯০৭।২রা আগষ্ট বন্দেমাতরম্ পত্রিকা সংবাদ দিল যে, যুগান্তর আবার বাহির হইয়াছে। যুগান্তর-সম্পাদককে জেলে দিয়াও কোন ফল হইল না। সর্ব্বনাশ!

"Reappearance of Jugantar : the prosecution of Jugantar has failed to procure the desired effect."—(*Bandemataram* ; *1907, 2nd Aug.*)

ইহার পরেও দেশ-বিদেশে যুগান্তর রক্তবীজের মত আরও কয়েকবার মাথা তুলিবে। ইতিহাস-পথে আমরা তাহা দেখিতে পাইব।

"সোনার বাংলা"—বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ : "ভবানী-মন্দিরের" লেখক যে অরবিন্দ, রাউলাট কমিটি তা জানিতে পারেন নাই। না জানিয়াও গুপ্তসমিতি প্রচারের এই আদি গ্রন্থের অতি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন—

"*Bhawani Mandir* : It will be remembered that in 1905 was published the pamphlet Bhawani Mandir, which set out the aims and objects of the Revolutionaries. It was remarkable in more ways than one.—(*p. 67.*)·········The book is a remarkable instance of perversion of religious ideals to political purposes."—(*p. 17*)

ভবানী-মন্দিরের মাত্র দুই-তিন মাস পরেই ১৯০৬।ফেব্রুয়ারী মাসে "সোনার বাংলা" প্যাম্ফলেটের আবির্ভাব হয়। অরবিন্দের দলের সত্যেন বসু ও বালক ক্ষুদিরাম বসুকে সোনার বাংলার সহিত জড়িত দেখিতে পাই। রাউলাট

কমিটি সোনার বাংলার উল্লেখ পর্য্যন্ত করে নাই। জানিতে পারে নাই—জানিলে উল্লেখ করিত। অথচ ভবানী মন্দির অপেক্ষা সোনার বাংলা বড় ইতিহাস রচনা করিয়াছে।

হেমচন্দ্র দাস লিখিয়াছেন—

"**ক্ষুদিরাম**—এ বছর (১৯০৬) ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুরে কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল। এই সময় ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ ও গালাগালিপূর্ণ 'সোনার বাংলা' নামক বে-নামী বাংলা 'প্যাম্ফলেট্' একটা নাকি প্রচারিত হয়েছিল। তা'র ইংরেজী অনুবাদ 'পাইওনিয়ার' পত্রে প্রকাশিত হ'লে ইংরেজ মহলে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। সত্যেন তা'র আবার বাংলা অনুবাদ ক'রে হাজারখানেক ছাপিয়েছিল। উক্ত প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বারের কাছে ক্ষুদিরাম নির্ব্বিচারে সকলকে ঐ প্যাম্ফলেটগুলি বিলি করছিল; এমন সময় একজন হেড কনেষ্টবল এসে তা'কে গ্রেপ্তার করাতে সে নাকি বক্সিং-এর খুব কেরামতি দেখিয়েছিল। ইত্যবসরে সত্যেন সেখানে এসে প'ড়ে ব'লে উঠল, "উও ডিপটিকা লেড়কা হ্যায়, উসকো কেঁও পাক্ড়ায়া"। সত্যেন ছিল প্রদর্শনীর সহকারী সম্পাদক। ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে কিন্তু রাজদ্রোহের মামলা রুজু করা হ'ল। বাংলাদেশে বিপ্লববাদীর বিরুদ্ধে, বোধ হয়, এই প্রথম রাজদ্রোহের অভিযোগ। ফেরারী অবস্থায় কিছুকাল থাকবার পর ক্ষুদিরাম মেদিনীপুর এসে ধরা দিল। মোকদ্দমা দায়রায় গেল। অনেক উকীল-ব্যারিষ্টার দয়া করে আদালতে ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু সরকার বাহাদুর কি জানি কি মনে ক'রে মোকদ্দমা তুলে নিয়েছিলেন। ধরা দেবার পর পুলিশের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সে (ক্ষুদিরাম) কোন কথা প্রকাশ করে নি।"—(বাং—বি—প্র, পৃঃ ১০৯-১১০)

অরবিন্দ ভবানী মন্দির ইংরাজীতে লিখিয়াছিলেন। অবিনাশ ভট্টাচার্য্য বলেন যে, উহার একখানা বাংলা তর্জ্জমা হইয়াছিল। এদিকে 'সোনার বাংলা' বাংলাতেই লেখা, অথচ 'Pioneer' পত্র ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া ইংরাজ মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ভবানী মন্দির ও সোনার বাংলা, এই দুইখানি বিপ্লব প্রচারের প্যাম্ফলেট্ ১৯০৬।মার্চ্চ যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশের ২।১ মাস পূর্ব্বে অগ্রদূতস্বরূপ বাজারে বাহির হইয়াছিল। যুগান্তর পত্রিকার সহিত এই দুইখানি প্যাম্ফলেটের যোগাযোগ ছিল। অরবিন্দ সত্যেন বসু ক্ষুদিরাম,

ইহারা সকলেই যুগান্তরের দলভুক্ত। অরবিন্দ-নির্দ্দিষ্ট বৈপ্লবিক কার্য্যে ক্ষুদিরাম ও সত্যেন বসু স্বেচ্ছায় নিজেদের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিল। ১৯০৬।৩রা অক্টোবর বন্দেমাতরম পত্রিকায় ঐ সোনার বাংলা প্যাম্ফ্‌লেট সম্পর্কেই বিপিনচন্দ্র পাল নিম্নলিখিতরূপ লিখিলেন—

"The Golden Bengal Scare : Secret societies are justified in countries where there is neither freedom of speech nor freedom of thought. We have both in British India. And there is, therefore, absolutely no need or justification for secret organizations in this country. Indeed, in the face of this freedom, there cannot grow that grim determination and reticence in the people without which secret societies cannot live or grow or do any effective work. And the formation of any secret societies now will only give a premium to cowardice and increase by their very secrecy that demoralization which already exists as a cancer in the very heart of our present public life. We do not know that we have any secret societies in this country…"

বিপিনচন্দ্র যে গুপ্ত সমিতির বিরোধী এবং যে যে কারণে বিরোধী তাহা তিনি স্পষ্ট খুলিয়াই বন্দেমাতরম পত্রিকায় লিখিলেন। মি: সি. আর. দাশ আমাকে বলিয়াছেন যে—তিনি 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার বিপিন বাবুর প্রবন্ধ দিয়া আলীপুর বোমার মামলায় অরবিন্দকে সমর্থন করিয়াছেন। কথা খুব ঠিক। কেননা বিপিন বাবুর সোনার বাংলা সম্পর্কে ৩রা অক্টোবরের প্রবন্ধটী যদি আদালতে অরবিন্দের লেখা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়—যাহা মি: সি. আর. দাশ দিয়াছিলেন—তাহা হইলে অরবিন্দকে এই প্রবন্ধ লেখার দরুণ নিশ্চয়ই গুপ্ত সমিতির বিরোধী বলিরা প্রমাণ করা যায়। অথচ অরবিন্দ বিপিন বাবুর গুপ্ত সমিতির বিরোধী এই লেখাটীর জন্য 'বন্দেমাতরম্' সম্পাদক-সঙ্ঘে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য কারণের মধ্যে এই প্রবন্ধ একটি কারণ, যার জন্য বিপিন বাবু এই প্রবন্ধ লেখার দুই সপ্তাহ পরেই 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব (editor-in-chief) পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আমরা

এই সম্পর্কে ১৯২০ খৃ: জুলাই মাসে এলাহাবাদে 'Democrat' পত্রে বিপিন বাবু 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সহিত তাঁহার সম্পাদকীয় দায়িত্ব ছাড়িয়া দিবার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা তুলিয়া দিতেছি—

"আমি ১৯০৬ খৃঃ 'বন্দেমাতরম্' পত্রের প্রধান সম্পাদক ছিলাম। 'পাইওনীয়ার' তখন 'সোনার বাঙ্গালা' নামক একখানি গোপনে প্রচারিত পুস্তিকার সন্ধান পায়েন, পুস্তিকায় কি ছিল, সে কথা আজ আর আমার মনে নাই, তবে মনে আছে, তাহাতে রাজনীতিক উদ্দেশ্যে কোনরূপ গুপ্তহত্যা সমর্থিত হইয়াছিল। আমি এই গুপ্ত অনুষ্ঠানের বিশেষ নিন্দা করি এবং বলি, ইহা কাপুরুষোচিত। ইহাতে জাতীয়দলের অনুষ্ঠানের মেরুদণ্ড ভগ্ন হইতে পারে, আমাদের 'বন্দেমাতরমের' লোকদের মধ্যে (some members of our staff) ইহাতে অসন্তোষের উদ্ভব হয়, পরিচালকদিগের মধ্যে আমাকে সরাইবার জন্য ষড়যন্ত্রও হয়। একজন লোক আমাকে বলেন, আমাদের দলের কেহ কেহ যখন এইরূপ মতের সমর্থন করেন, তখন গুপ্ত অনুষ্ঠান সম্বন্ধে 'বন্দেমাতরমে' ঐরূপ মত প্রকাশ করা আমার কর্ত্তব্য হয় নাই। উত্তরে আমি বলি, যতদিন সম্পাদকের দায়িত্ব আমার থাকিবে, ততদিন আমি যাহা ভাল ও ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিব, তাহা ব্যতীত আর কোন কাজের জন্য আমি কাহাকেও 'বন্দেমাতরম্" ব্যবহার করিতে দিব না। আমি আমার মতেই অবিচলিত ছিলাম ; কিন্তু আজ এ কথা বলিলে দোষ হইবে না যে, 'বন্দেমাতরমের' সহিত আমার সম্বন্ধচ্ছেদের তাহাই কারণ। কয়মাস পরে ঘটনার চক্র আবর্ত্তিত হয়—সম্পাদকের নামে রাজদ্রোহের মামলায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিয়া আমি জেলে যাই, আমি খালাস পাইলে পরিচালকরা আমাকে কাগজের সম্পূর্ণ ভার দিতে চাহেন। আমি কাগজে লিখিতে সম্মত হইলেও সম্পাদকীয় দায়িত্ব লইতে সম্মত হই নাই। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 'বন্দেমাতরমের' সহিত আমার সম্বন্ধ বিচ্ছেদের এই গুপ্ত ইতিহাস কলিকাতায় আমার কতিপয় বন্ধু জানিতেন।" —কংগ্রেস, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, পৃ: ১১৪-১১৫।

এখন এই 'সোনার বাঙ্গালা' প্যাম্ফলেট কী কাণ্ড করিয়া বসিল তাহা আর অনুমানের বিষয় নয়, কেননা তাহা চক্ষের উপর প্রত্যক্ষ দেখা গেল। 'সোনার বাঙ্গালা' প্যাম্ফলেট উপলক্ষে আমরা দেখিলাম, বিপিনচন্দ্র গুপ্তসমিতির উপর খড়্গাহস্ত দেখাইলেন আর অরবিন্দ বিপিনচন্দ্রের হস্ত হইতে গুপ্তসমিতির বিরুদ্ধে

সেই উদ্যত খড়্গ কাড়িয়া লইয়া বিপিন বাবুকে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিলেন। এক কথায় অরবিন্দ বিপিনচন্দ্রকে গুপ্ত সমিতির বিরুদ্ধে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় আর লিখিতে দিলেন না, বাধা দিলেন, নিরস্ত্র করিলেন। বিপিনচন্দ্র অরবিন্দের নিকট হইতে বাধা পাইলেন। 'সোনার বাঙ্গালা' প্যাম্ফলেট এই ইতিহাস রচনা করিল এবং বাঙ্গলার স্বদেশী যুগের দুইটী চরমপন্থী নেতা গুপ্তসমিতি সম্পর্কে যে পরস্পরবিরোধী মত পোষণ করেন, তাহা প্রকাশ করিয়া ইতিহাসকে উপঢৌকন দিয়া গেলেন। এই জন্যই বলিতে হয়, অরবিন্দের -'ভবানী মন্দির' অপেক্ষা বেনামী 'সোনার বাঙ্গালা' বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ চরিত্রের এবং তাঁহাদের উভয়ের রাজনৈতিক মতবাদের পার্থক্য এবং বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া দিল। ঘটনার আঘাত ভিন্ন মতের বা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফোটে না। বিপিনচন্দ্র শুধু নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধবাদী। গুপ্ত সমিতি, গুপ্তহত্যা, বৈপ্লবিক ডাকাতি—এ সকলের সম্পূর্ণ বিরোধী। অরবিন্দ ১৯০৬।৮ই জুন তাঁহার শ্বশুর ভূপাল বসুকে শিলং চিঠি লিখিয়া কনিষ্ঠ বারীন্দ্র কুমারকে শিলং পাঠাইয়া ছোটলাট ফুলার বধের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। সুতরাং অরবিন্দ প্রথমে গুপ্তহত্যা, বৈপ্লবিক ডাকাতি প্রভৃতির প্রবর্ত্তক। পরে বিপিনচন্দ্রের অনুগামী হইয়া নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সমর্থন করিয়াছেন। বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য ইতিহাসে গভীর রেখাপাত করিয়া গিয়াছে। ইতিহাস-পথে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে আমরা আগে পাই (১৯০২-১৯০৪) অরবিন্দের বিপ্লববাদ; পরে পাই (১৯০৬-১৯০৭) অরবিন্দের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।

বিপিনচন্দ্র, গুপ্তসমিতি গুপ্তহত্যা ও বৈপ্লবিক ডাকাতির বিরোধী কেন : যে-সকল কারণের জন্য বিপিনচন্দ্র গুপ্তসমিতি ও তাহার কার্য্যপ্রণালীর বিরোধী, সে-সকল কারণ তিনি নিজেই খোলাখুলি লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রথম কারণ—গুপ্তসমিতি ভীরুতা ও কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দেয়। দীর্ঘ শতাব্দীর পরাধীনতার দরুণ একেই আমরা কাপুরুষ এবং ভীরু জাতি, (কথাটা মিথ্যে নয়, কেননা, নতুবা আমরা এত দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিব কেন ?) তার উপর অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া এবং পেছন হইতে লুকাইয়া মাতব্বরি করিয়া যাঁহারা গুপ্তসমিতি চালাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারাও নিজেরা ভীরু এবং কাপুরুষ ; এবং

বিপিনচন্দ্র আশঙ্কা করেন, তাঁহাদের কাপুরুষোচিত কার্য্যের দ্বারা দেশ ও জাতিকে আরও কাপুরুষতার গভীরতর পঙ্কে ডুবাইয়া দেওয়া হইবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতে একবার যখন মহাত্মা গান্ধী আগমন করেন তখন তদানীন্তন গুপ্তসমিতির পাণ্ডারা মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি মৃদু হাস্যে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "I do not appreciate cowardice" —আমি কাপুরুষতাকে পছন্দ করি না। মহাত্মা গান্ধী এক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্রের অনুগামী, তাহা সে জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক। দেখা গেল বিপিনচন্দ্র এবং বিপিনচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া মহাত্মা গান্ধী, গুপ্ত-সমিতির কার্য্যপ্রণালীকে ভীরুতা এবং কাপুরুষতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। সুতরাং বিপিনচন্দ্র ও মহাত্মা গান্ধীর মতে অরবিন্দ ও তাঁহার গুপ্ত-সমিতির দল সকলেই ভীরু এবং কাপুরুষ। বৈপ্লবিক দলকে, বিশেষত: গুপ্ত-বৈপ্লবিক দলকে ভীরু বলা নিরাপদ নয়—সমূহ বিপজ্জনক। তাহা জানিয়াও বিপিনচন্দ্র ও মহাত্মা গান্ধী ক্ষান্ত হন নাই। দ্বিতীয় কারণ—বিপিন বাবু বলেন, গুপ্ত-সমিতির কার্য-প্রণালী দ্বারা এমন প্রচণ্ড রাজ-অত্যাচার ডাকিয়া আনা হইবে যে, সেই অত্যাচারের নিষ্পেষণে আমাদের এই ভীরু জাতির মেরুদণ্ড খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে। মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেলে মানুষও বাঁচে না, জাতিও বাঁচে না। অবশ্য অরবিন্দ ইহার উল্টা কথা লিখিলেন—"আরো অত্যাচার চাই" ("Wanted more repression"—*18th July, 1907; Bandemataram*)। কেন চাই তা অরবিন্দই বলিতে পারেন। তৃতীয় কারণ—যে-দেশে স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের সুযোগ নাই, সেই দেশেই গুপ্ত-সমিতির জন্ম হয়; কিন্তু আমাদের দেশে (১৯০৬।৩রা অক্টোবর) স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের সুযোগ আছে, কাজেই আমাদের দেশে গুপ্ত-সমিতি জন্মিবার ন্যায়সঙ্গত হেতু নাই; আর 'জন্মিলেও উহা টেক্‌সহি হইবে না। পরিশেষে বিপিন বাবু বলেন যে—আমাদের দেশে (১৯০৬, ৩রা অক্টোবর) কোন গুপ্ত-সমিতি নাই। ইহা জানিয়া বলিলেন, কি, না-জানিয়া বলিলেন—বুঝা গেল না। গুপ্তসমিতি সম্বন্ধে এবম্বিধ মতপোষণকারী যে বিপিনচন্দ্র, তাঁহার সম্বন্ধে ইহার তিন বৎসর তিন মাস পর অর্থাৎ ১৯১০, ২২শে জানুয়ারী অরবিন্দ 'কর্ম্ম-যোগিন্' পত্রিকায় লিখিলেন—

"The man most detested and denounced by the Indian

Revolutionary organisations now active at Paris, Geneva and Berlin is Sj. Bepin Ch. Pal—the prophet and first preacher of passive resistance."

বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে অরবিন্দের অভিমত স্পষ্ট বুঝা গেল। অরবিন্দ বিনা কার্পণ্যে লিখিলেন যে, বিপিনচন্দ্রই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রথম প্রবর্তক। কিন্তু ভারতীয় বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির দল বিপিনচন্দ্রকে অতিশয় ঘৃণা করে। করিবার কথাই এবং কেন করে তার কারণ, গুপ্তসমিতি সম্বন্ধে বিপিন বাবু খোলসা বলিলেন যে—উহা নিছক ভীরুতা এবং কাপুরুষতা। তাহাতে বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির দল বিপিনচন্দ্রকে ফুলচন্দনে পূজা করিতে পারে না। এমন কি ১৯০৬, ৩রা অক্টোবর 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় (Golden Bengal Scare) প্রবন্ধ লেখার দরুণ অরবিন্দও বিপিনচন্দ্রকে ফুলচন্দনে পূজা করিতে পারেন নাই। অবশ্য অরবিন্দ বিপিনচন্দ্রকে ঘৃণা করেন নাই, প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। অরবিন্দ এই সময় (১৯০৬।আগষ্ট হইতে ১৯০৭।আগষ্ট) জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ ছিলেন। অরবিন্দের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, বিপিনচন্দ্র পাল ও মহাত্মা গান্ধীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ হইতে পৃথক।

অরবিন্দের নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ, বিপিন পাল ও মহাত্মা গান্ধীর নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ হইতে পৃথক : ১৯০৭।এপ্রিল মাসে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দ ধারাবাহিকরূপে "The Doctrine Of Passive Resistance"এর উপর ১১ই, ১২ই, ১৩ই, ১৭ই, ১৮ই, ২০শে এবং ২৩শে এপ্রিল তারিখে সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ মূল্যবান প্রবন্ধগুলি বাংলা দেশে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস রচনা করিয়াছে। ঐ প্রবন্ধগুলির মর্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

THE DOCTRINE OF PASSIVE RESISTANCE

Introduction :

১। কলিকাতা নৌরজী কংগ্রেসের (১৯০৬ খৃঃ) পর আমরা নূতন দল, আমাদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি দেশবাসীকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছি। তিনটী উপায়ের কথা আমরা ভাবিতে পারি—১ম, কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতি (এই উপায়ের দ্বারা পৃথিবীর কোন জাতি স্বাধীনতা পায় নাই, আমরাও পাইব না)। ২য়, আত্মশক্তির উপর নির্ভর

করিয়া আমাদের জাতির আত্মবিকাশ সাধন। ৩য়, জাতির সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা বর্ত্তমান বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ।

২। আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া জাতির আত্মবিকাশ, আমাদের নূতন দল, তাহাদের আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু স্বাধীন জাপান যেভাবে আত্মবিকাশ করিতে পারিয়াছে, পরাধীন ভারত তাহা পারিবে না; বিদেশী শাসক প্রতিপদে বাধা দিবে। ৩০ বৎসরে জাপান যে উন্নতি করিয়াছে, অতীতের ৭০ বৎসরে আমরা তাহা পারি নাই। আমাদের ৭০ বৎসরের চেষ্টা জাপানের এক বৎসরের চেষ্টা অপেক্ষা কম ফল প্রসব করিয়াছে। ইহার কারণ কি? কারণ, আমরা পরাধীন, জাপান স্বাধীন। পরাধীন ও স্বাধীন দেশের আত্মবিকাশে অনেক পার্থক্য আছে। স্বাধীন দেশের আত্মবিকাশে রাজশক্তি সাহায্য করে, পরাধীন দেশের আত্মবিকাশে রাজশক্তি বাধা দেয়। আমাদিগকে এই বাধা অতিক্রম করিয়া জাতির আত্মবিকাশ (Self-development) করিতে হইবে।

৩। আমাদের বহুমুখী চেষ্টাগুলিকে একটি কেন্দ্রীয় শাসনের (Central Authority) অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ইহা আমরা করিতে পারি নাই। এবং না করার দরুণ National Education, Arbitration, এমন কি, Boycott আন্দোলন, ব্যর্থ না হইলেও সার্থক হয় নাই।

৪। স্বাধীনতাই জাতির প্রাণ (Political freedom is the life-breath of a nation)। এই স্বাধীনতা লাভ না করিয়া জাতির অন্য বিভাগের সংস্কারের জন্য চেষ্টা করা অতিশয় মূর্খতা এবং পণ্ডশ্রম মাত্র (… "to attempt social reform, educational reform, industrial expansion, the moral improvement of the race without aiming first and foremost at political freedom, is the very height of ignorance and futility.")।

৫। আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া জাতির আত্মবিকাশ করিতে গেলে বিদেশী শাসক নিশ্চয়ই আমাদিগকে বাধা দিবে। কিন্তু কি প্রকারের বাধা দিবে এবং কতটা বাধা দিবে, তাহা এক্ষণে অনিশ্চিত। তবে 'ফুলারি' অত্যাচার অপেক্ষা (Fullerism) আরও ভীষণ Russian (জারের) অত্যাচার প্রবর্ত্তন করিতে পারে।

৬। অত্যাচারের চাপে জাতীয় শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হইবে, ইহাও যেমন সত্য, আবার উপর হইতে অত্যাচারের চাপ খুব বেশী হইলে নিম্নভাগে আমাদের সমস্ত শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে ("There is nothing like a strong pressure from above to harden and concentrate what lies below—always provided that the superior pressure is not such as to crush the substance on which it is acting.")।

৭। বিদেশী শাসকের বাধা আমাদিগকে প্রতিরোধ করিতে হইবে; এই প্রতিরোধ আত্মরক্ষামূলক (Self-defensive) ও নিষ্ক্রিয় (passive) হইবে। বাংলাদেশ ইতিপূর্বেই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (Passive Resistance এর) Programme জাতির সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে ("We must organize defensive resistance. ··the New Party had long ago formulated and all Bengal has in theory accepted the doctrine of passive or defensive resistance.")।

মন্তব্য—(ক) নূতন দলের (The New Party) অভিপ্রায় বুঝা গেল। বাংলাদেশ ইতিপূর্বেই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (Passive Resistance) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেসের Moderate নেতাদের পিলে চমকাইয়া গিয়াছে। অন্য প্রদেশ Passive Resistance এখনও গ্রহণ করে নাই। শুধু বাংলাদেশ অগ্রগামী হইয়াছে।*

(খ) ১৯০৬ জুন-জুলাই অরবিন্দ 'ফুলার' বধের পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি গুপ্তসমিতির প্রবর্ত্তক ও সন্ত্রাসবাদী। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে তিনি বিপিনচন্দ্রের Passive Resistance সমর্থন করিতেছেন। বিপিনচন্দ্রই Passive Resistanceএর প্রথম প্রবর্ত্তক। অরবিন্দ নিজে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। বিপিনচন্দ্র, গুপ্তসমিতি গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসবাদের বিরোধী। এইখানে অরবিন্দ হইতে বিপিনচন্দ্র পৃথক।

(গ) অরবিন্দ Central Authority অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে বলিয়াছেন। তাহা না হইলে Passive Resistanceএর আন্দোলনকে সংযত, কেন্দ্রীভূত ও সার্থকতার সহিত পরিচালিত করা যাইবে না। ইহা Parallel Governmentএর অনুরূপ। অরবিন্দ এই Parallel Governmentএর কথাই বলিতেছেন। 'স্বদেশী সমাজ' বক্তৃতায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই Parallel Governmentএর কথাই বলিয়াছেন।

(ঘ) অরবিন্দ একই সময়ে সন্ত্রাসবাদী ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদী। সন্ত্রাসবাদে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বাধাপ্রাপ্ত হইবে, বিপিনচন্দ্রের এইকথা অরবিন্দ মানেন নাই। তিনি একহাতে সন্ত্রাসবাদ (Terrorism) আর এক হাতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance), দুই হাত সমানে চালাইয়াছেন। এইখানে বিপিনচন্দ্র হইতে অরবিন্দ পৃথক। Passive Resistance আইনসঙ্গত উপায়। গুপ্তহত্যা বে-আইনী। অরবিন্দ আইন ও বে-আইন, দুই-ই গ্রহণ করিয়াছেন। Mrs. Annie Besant যে বলিয়াছিলেন, অরবিন্দ দেশের মুক্তির জন্য যেকোন উপায় ("any means") অবলম্বন করিতে পারেন—তাহা যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হইল।

Its Object :

১। বর্তমান বিদেশী শাসনকে আমরা প্রতিরোধ অর্থাৎ বাধা দিতে চাই কেন? ইহার তিনটি কারণ সম্ভব। ১ম—এই শাসনের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ও জাতির পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা। ২য়—এই শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তে আর একটা উদার-নৈতিক শাসনপদ্ধতির প্রবর্তন। ৩য়—এই শাসনপদ্ধতির কোন কোন দোষ ত্রুটির সংশোধন ও পরিবর্তন মাত্র ("Organized resistance to an existing form of government may be undertaken either for the vindication of national liberty, or in order to substitute one form of government for another, or to remove particular objectionable features in the existing system without any entire or radical alteration of the whole, or simply for the redress of particular grievances.")।

২। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ (৫০ বৎসর) আমাদের ব্যর্থ চেষ্টা রাজনীতিক্ষেত্রে অপব্যয়িত হইয়াছে। Permanent Settlement, Executive-Judiciary Separation, Home Charge, Simultaneous Examination, প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলনের কোন অর্থই হয় না। অধঃপতিত এই বিশাল জাতির পুনরুত্থানের পথে এই সব বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কার কোনই কাজে আসিবে না। আমাদের নেতাদের কোন বৃহৎ কল্পনা নাই, আদর্শ নাই, রাজনীতিতে তাহাদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই।

৩। আমাদিগকে দেশীয় শাসন প্রবর্তন করিতে হইবে। দেশীয় মূলধন ও দেশীয় শ্রম দ্বারা শিল্পোৎপাদন করিয়া বিদেশী শোষণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইবে।

৪। বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সম্মুখে আমরা বিদেশী শাসনের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়া বিদেশী শাসনমুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের আদর্শ উপস্থিত করিতেছি।

৫। কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ইংলণ্ডের, শুধু ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে শিক্ষা পাইয়াছেন, পৃথিবীর অন্য দেশের ইতিহাসের কোনই খবর তাঁহারা রাখেন না। সুতরাং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাঁহারা ধীরে ধীরে উন্নতির আশা করেন। একটা স্বাধীন দেশ এবং আর একটি পরাধীন দেশ, উভয়ে একই নিয়মে উন্নতির পথে চলিতে পারে না। পরাধীন দেশের প্রথম কর্তব্য, পরাধীনতা হইতে যে-কোন প্রকারেই হোক মুক্ত হওয়া।

৬। গত দুই বৎসর নূতন দল যে স্বদেশী আন্দোলন প্রবর্তন করিয়াছে, যদিও ঐ আন্দোলন শৃঙ্খলার সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হয় নাই এবং উহার কোন একচ্ছত্র নেতা নাই, তথাপি উহা অদ্ভুত সুফল প্রসব করিয়াছে। জাতির উপর নূতন দলের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। প্রাচীন Moderate দলের তাহা নাই।

৭। Moderate দল শুধু বঙ্গভঙ্গ রহিত করিবার জন্যই আন্দোলন করিতেছেন। কিন্তু নূতন দল শুধু বঙ্গভঙ্গ রহিত চান না, তাঁহারা বিদেশী শাসন ও শোষণমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠা করিতে চান। এবং সেজন্য প্রতিরোধ, তাহা নিষ্ক্রিয়ই (passive) হউক অথবা সক্রিয়ই (active) হউক, অবলম্বন করিতে বদ্ধপরিকর ("... one true object of all resistance, passive or active, aggressive or defensive.") ।

মন্তব্য—(ক) এই সময়ে আমরা দেখিয়াছি যে, লর্ড কার্জন বলিতেন—জনমত তাঁহার দিকে ; সুরেন্দ্র ব্যানার্জি বলিতেন, জনমত তাঁহার দিকে ; আর অরবিন্দও বলিতেন, জনমত তাঁহার দিকে। অর্থাৎ জনমতের নিয়ামক কোন কেন্দ্রীয় শাসন (Central Authority) ছিল না। জনমত বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করিত। এইজন্যই অরবিন্দ জনমতের নিয়ামক একটি Central Authority পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

(খ) এই প্রবন্ধে অরবিন্দ শুধু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে তাঁহার Programmeকে আবদ্ধ করিতেছেন না। সক্রিয় প্রতিরোধের পরিকল্পনাও উপস্থিত করিতে-ছেন। ইহা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ; সুতরাং লক্ষ্য করিবার বিষয়। সন্ত্রাসবাদী অরবিন্দ এইখানে বিপিনচন্দ্র হইতে পৃথক।

(গ) লালা লাজপৎ রায়কে আমেরিকাতে এক সভায় বক্তৃতা করিবার সময় প্রশ্ন করা হইয়াছিল—ভারত স্বাধীন হইলে বিদেশী মূলধনের শোষণ চলিয়া যাইবে সত্য, কিন্তু দেশীয় মূলধনের শোষণ হইতে ভারতের শ্রমিকেরা কী প্রকারে রক্ষা পাইবে? লালাজী এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। অরবিন্দ এই প্রশ্ন উত্থাপন মাত্রও করিলেন না। শুধু বলিলেন, দেশীয় মূলধন ও শ্রমিকদের দ্বারা শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে ("... to be conducted by Indian Capital and Indian Labour")। কিন্তু দেশীয় মূলধনের শোষণ হইতেও যে দেশকে রক্ষা করিতে হইবে, ইহার নির্দ্দেশ অরবিন্দের নিকট হইতে পাইলাম না। অথচ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অতিমাত্রায় বুর্জোয়া-বিরোধী, প্রলেটেরিয়েটবাদী ছিলেন।

(ঘ) এই প্রবন্ধে অরবিন্দ যেখানে ইংলণ্ডের ইতিহাস উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে তিনি তাঁহার New Lamps For Oldএর প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তাঁহার একই চিন্তাধারা যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

Its Necessity :

১। প্রকাশ্য বিদ্রোহ (armed revolt) ছাড়া প্রতিরোধের যে উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারাই আমরা ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত করিতে পারিব। কোনো প্রকার প্রতিরোধ ব্যতিরেকে আমরা জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা জাতির আত্মবিকাশ করিতে পারিব না। কেননা, আমাদের সকল চেষ্টাতেই বাধা আসিবে। এবং বাধা আসিলেই, বাধ্য হইয়া সই বাধাকে প্রতিরোধ করিতে হইবে।

২। বয়কট ছাড়া স্বদেশী চলিতে পারে না। লর্ড মিণ্টোর honest স্বদেশীর কোন অর্থ হয় না।

৩। প্রতিরোধের তিনটি উপায় আছে। ১ম—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance); ২য়—সক্রিয় প্রতিরোধ (Active or Aggressive Resistance); ৩য়—প্রকাশ্য সশস্ত্র বিদ্রোহ (open armed revolt)। Parnell,

আয়ার্ল্যাণ্ডের পক্ষে passive resistance অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি Irish জমিদারদিগকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। এবং পার্লামেণ্টে আয়ার্ল্যাণ্ড সম্পর্কে তর্ক-আলোচনা ছাড়া অন্য সমস্ত কাজে বাধা দিয়াছিলেন ("This was the policy initiated by the genius of Parnell, when by the plan of campaign he prevented the payment of rents in Ireland and by persistent obstruction hampered the transaction of any but Irish business in Westminster.")। রাশিয়া সক্রিয় প্রতিরোধ (aggressive resistance) অবলম্বন করিয়াছিল ("... by an organised aggressive resistance in the shape of an untiring and implacable campaign of assassination and a confused welter of riots, strikes and agrarian risings all over the country.")। ৩য়—সশস্ত্র বিদ্রোহ (armed revolt)—ইহা শুধু বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতিকে অচল করে না, পরন্তু সেই শাসনপদ্ধতিকে শিকড় হইতে ডালপালা সমেত সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়া ফেলে (sweeps them bodily out of existence)।

৪। ভারতবাসীর পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বন করাই যুক্তিসঙ্গত ("The present circumstances in India seems to point to passive resistance as our most and natural suitable weapon.")।

৫। শাসকবর্গের অত্যাচারের স্বরূপ ও চাপ অনুযায়ী প্রতিরোধের স্বরূপ (নিষ্ক্রিয়—সক্রিয়—সশস্ত্র বিদ্রোহ) পরিবর্ত্তিত হইবে। একটা জাতিকে গলা টিপিয়া শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলে, সেই জাতি আত্মরক্ষার জন্য যেকোন প্রতিরোধ অবলম্বন করিতে পারে। এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, সক্রিয় প্রতিরোধ অথবা প্রকাশ্য বিদ্রোহ—আত্মরক্ষার্থে মুমূর্ষু জাতি অবলম্বন করিতে পারে ("It is the nature of the pressure which determines the nature of the resistance; when the life of a nation is attacked, when it is sought to suppress all chance of breathing by violent pressure, any and every means of self-preservation becomes right and justifiable.")।

মন্তব্য—(ক) দেখিতেছি, Parnellএর প্রভাব ১৮৯১ খৃঃ হইতে ১৯০৭ খৃঃ পর্য্যন্ত অরবিন্দের উপর সমান কাজ করিতেছে। Parnellএর সহিত ফিনিক্স পার্ক মার্ডার (১৮৮২ খৃঃ), সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, জড়িত ছিল। আয়ার্ল্যাণ্ড ও পুণা সহরে, এই দুইটি গুপ্তহত্যা অরবিন্দের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এবং অনুমান হয়, সেই জন্যই তিনি একহাতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও অন্যহাতে গীতা-তলোয়ার সমন্বিত গুপ্তহত্যায় সন্ত্রাসবাদ চালাইয়াছিলেন। অরবিন্দের কথা হইতে বুঝি—বিপিনচন্দ্র যেমন ভারতবর্ষে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তার বহু পূর্ব্বে আয়ার্ল্যাণ্ডে Parnell নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চালাইয়াছিলেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত ও তৎসঙ্গে গুপ্তহত্যা বিলাত প্রবাসের শেষ দুই বৎসরে (১৮৯১-১৮৯৩) অরবিন্দ Parnellএর দৃষ্টান্ত হইতে লাভ করিয়াছিলেন।

(খ) অরবিন্দ বলিতেছেন, শাসকবর্গের অত্যাচারের স্বরূপই উহার প্রতিরোধের স্বরূপ নির্ণয় করিবে। সুতরাং প্রতিরোধ সকল অবস্থাতেই নিষ্ক্রিয় থাকিবে—এমন কথা অরবিন্দ বলেন না। প্রতিরোধ অবস্থাভেদে অবশ্যই সক্রিয় (active or aggressive) হইতে বাধ্য। এবং ইহা হিংসামূলকও নয়, দোষেরও নয়। এইখানে পরবর্ত্তীযুগে মহাত্মা গান্ধী-নির্দ্দিষ্ট অহিংসা-অসহযোগ অপেক্ষা (non-violent, non-cooperation) শ্রীঅরবিন্দ-কথিত নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় প্রতিরোধ অধিকতর বিশ্লেষণমূলক, রাজনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক। অরবিন্দ জৈনধর্ম্মের অহিংসা মতবাদকে রাজনীতির স্কন্ধে চাপান নাই। ইহা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এবং লক্ষ্য করিবার বিষয়। মহাত্মা গান্ধী জৈনধর্ম্মের অহিংসা মতবাদ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নিষ্ক্রিয়তার উপর গাঢ় প্রলেপ দিয়া প্রতিরোধকে একাধিকবার পঙ্গু করিয়া, ইহাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়াছেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কোন ধর্ম্মও নয়, কোন নীতিবাদও নয়; ইহা মুক্তিকামী পরাধীন জাতির একটা রণকৌশল মাত্র।

Its Method :

১। আমরা বিলাতি বস্ত্র বয়কট করিতে চাই স্বদেশী বস্ত্র উৎপাদনের জন্য; জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে চাই বিদেশী শাসকদের শিক্ষায়তনগুলি ধ্বংস করিবার জন্য; আমরা নিজেদের সালিশী বিচার প্রবর্ত্তন করিতে চাই

বিদেশীদের বিচার-বিভাগ ধ্বংস করিবার জন্য; আমাদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণভাবে এদেশে ইংরেজ শাসন অচল করিয়া দেওয়া।

২। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে গভর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করাই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের খুব সোজা ও কার্য্যকরী দৃষ্টান্ত। ইংলণ্ডে, আয়র্ল্যাণ্ডে, আমেরিকায় এই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

৩। ভারতবর্ষে গভর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করা আমাদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অন্তর্ভূক্ত এখনও পর্য্যন্ত করা হয নাই; কারণ, ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিতে হইলে যেসমস্ত আয়োজন ও প্রস্তুতির দরকার, আমাদের তা এখনও করা হয় নি। আমরা ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিলে গভর্ণমেণ্ট পুলিশ ও সৈন্য দিয়া চূড়ান্ত জুলুম আরম্ভ করিবে। এটা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণার মতই হইয়া উঠিবে। অথচ আমেরিকা ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিয়া পরে যেরূপ স্বাধীনতা যুদ্ধ চালাইয়াছিল, এই বিশাল দেশে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আমাদের এখনও সে প্রস্তুতি হয় নাই।

৪। সুতরাং বর্তমানে আমরা বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চালাইয়া যাইব এবং গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের স্বরূপ আমাদের পরবর্ত্তী পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

মন্তব্য—(ক) বিপিনচন্দ্র পাল বরিশাল কনফারেন্সে (১৯২১ খৃঃ) সভাপতিরূপে বলিয়াছিলেন যে, স্বদেশী যুগের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এইজন্য সার্থক হইতে পারে নাই যে, ইহা সমগ্র দেশে একসঙ্গে কার্যকরীরূপে গভর্ণমেণ্টকে বাধা দিতে পারে নাই ("It did not develop into a great national strike ...")। অরবিন্দ এই প্রবন্ধে সেইরূপ একটি আশঙ্কার আভাস দিয়াছেন। আন্দোলনের জোয়ারে, ভাটার দিনের কথা মনে খুব কমই আসে। অরবিন্দের সন্ত্রাসবাদকে দমন করিতে যাইয়া যে রাজ-অত্যাচার দেখা দিবে, তাহা বৈধ ও শান্তিপূর্ণ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকেও সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিবে—বিপিনচন্দ্র বরাবর এই আশঙ্কাই করিয়াছিলেন। কিন্তু অরবিন্দ তাহা শোনেন নাই। এমন কি মিঃ গোখলে, এইরূপ আশঙ্কাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট প্রতিরোধকে নিষ্ক্রিয় থাকিতে দিবে না, পীড়ন করিয়া সক্রিয় করিবে, সক্রিয় করিয়া পুনরায় উহাকে 'বেয়নেট' ও গুলির সাহায্যে নির্ম্মূল করিবে।

Its Obligation :

১। Moderateরা গভর্ণমেণ্টকে মৌখিক বাধা দেয় মাত্র (বক্তৃতার দ্বারা)। কখনও কখনও দরখাস্ত লিখিয়াও বাধা দেয় ("The moderate method of resistance is verbal only—prayer, petition and protest.")। নূতন দল (The New Party) বলেন, আমাদের বাধা দেওয়ার পদ্ধতি বয়কট; ইহা আবেদন-নিবেদন অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। এই বয়কটই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance)। আমরা যদি গভর্ণমেণ্টের স্কুলে ছেলে-মেয়েদের না পাঠাইয়া নিজেদের জাতীয় বিদ্যালয়ে পাঠাই, বিলাতী কাপড় না কিনিয়া দেশী কাপড় কিনি, আমরা যদি ইংরেজের আদালতে না গিয়া নিজেরাই সালিশীর দ্বারা মামলা মিটাইয়া লই, আমরা যদি পুলিশের কাছে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে না গিয়া নিজেরাই কলহ মিটাইয়া লই—তবে উহা সম্পূর্ণ বৈধ, আইনসঙ্গত হইবে। অতএব, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে বে-আইনী বলা চলে না, ইহা সম্পূর্ণ আইন রক্ষা করিয়া চলে।

২। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। তখন আমাদের আইন অমান্যই করিতে হইবে এবং আইন অমান্য করার দরুণ স্বেচ্ছায় শাস্তিবরণ করিতে হইবে ("If it is unjust and oppressive, it may become a duty to disobey it and quietly endure the punishment which the law has provided for its violation.")। অসঙ্গত ও অত্যাচারমূলক আইনকে অমান্য করা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারীর অবশ্য কর্ত্তব্য ("To break an unjust coercive law is not only justifiable, but, under given circumstances, a duty.")।

৩। বরিশাল কনফারেন্সে (১৯০৬।১৪ই এপ্রিল) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রভৃতি Modreate নেতারাও ম্যাজিষ্ট্রেটের খামখেয়ালী আইন মানিয়া চলেন নাই। সেজন্য জরিমানা ও কায়িক শাস্তিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ Moderateরাও কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪। মাদ্রাজের সুব্রহ্মণ্য আয়ার বলিয়াছিলেন—বিলাতী কাপড়, নুন, চিনি, শুধু 'বয়কট' করিলে হইবে না; যাহারা উহা ব্যবহার করে, তাহারা দেশদ্রোহী স্বজাতিদ্রোহী, সুতরাং তাহাদিগকেও 'বয়কট' করিতে হইবে, অর্থাৎ সমাজে

একঘরে করিতে হইবে। ইহা খুবই সমীচীন কথা, ইহা না করিলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চালান হইবে না ("Social Boycott is legitimate and indispensable as against persons guilty of treason to the nation.")।

মন্তব্য—(ক) দেখা যাইতেছে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পরের ধাপে আইন অমান্য করিবার পালা আসিতেছে এবং এই আইন অমান্য করিয়া নিঃশব্দে শাস্তিভোগ করিবার সদুপদেশও পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালাদেশ কথাও কাজে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করিয়া আইন ভঙ্গ করিয়াছে এবং নির্বিকারচিত্তে আইনমত শাস্তিও গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ আইন ভঙ্গও করিয়াছে আবার শাস্তি-গ্রহণের সময় আইন মানিয়া ও চলিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে, মহাত্মা গান্ধীর যুগে, আমরা ইহারই অবিকল অনুকরণ দেখিতে পাইয়াছি।

(খ) বাঙ্গালাদেশে একমাত্র সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সহিত আন্দোলনের স্রোতে ভাসিয়া যতটা নূতন দলের সহিত সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন, ভারতের অন্য প্রদেশের কোন প্রসিদ্ধ Moderate নেতা তাহা করেন নাই। Moderateদের মধ্যেও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীর একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল। তিনি স্যার ফিরোজ শা' মেহ্‌তা ও মিঃ গোখ্‌লে হইতে কিছুটা পৃথক ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ করিতে গিয়াই হয়ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী কিছুটা নূতন দল ঘেঁসা হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাঙ্গালায় স্বদেশী যুগে যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়, যে দেশাত্মবোধের প্রেরণায় উন্মেষ হয়—ভারতের অন্য কোন প্রদেশে, এক মহারাষ্ট্র ব্যতীত, সেরূপ দেখা যায় নাই।

(গ) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী বরিশাল কনফারেন্সে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পালন করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার আত্মজীবনীতে (A Nation In Making) গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর স্বদেশীয় স্রোত হইতে তিনি দূরে থাকিতে পারেন নাই। মিঃ গোখলে তাহা পারিয়া-ছিলেন। অতএব মিঃ গোখলে ও সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী, উভয়েই Moderate হইলেও কিছুটা তফাৎ আছে।

Its Limit :

১। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারী একাই হোক বা দলগত ভাবেই হোক,

আইন ভঙ্গ করিয়া শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকিবে। যদি তাহা না থাকে, তবে গভর্ণমেণ্ট অতি দ্রুত এবং অতি সহজেই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে। সুতরাং আইন ভঙ্গ করা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অন্তর্ভুক্ত। যেসমস্ত লোকেরা জাতির নির্দেশ অমান্য করিয়া 'বয়কট' করিবে না; যেমন—যদি বিলাতী বস্ত্র কেনে, সেই সমস্ত লোককে একঘরে করিয়া সামাজিক শাস্তি দিতে হইবে। ইহা না কবিতে পারিলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চলিবে না। ইহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ। সামাজিক শাস্তি দেওয়ার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চলিয়াছে। আর, সামাজিক শাস্তি না দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গে উহা চলে নাই ("Why the boycott which has maintained itself in East Bengal, is in the West becoming more and more of a failure.")।

২। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের একটা সীমা আছে ("There is a limit, however, to Passive Resistance.")। গভর্ণমেণ্ট সভা করা নিষেধ করিয়াছে। নিষেধ অমান্য করিয়া সভা করিলে এবং শান্তভাবে গ্রেপ্তার হইয়া শাস্তি গ্রহণ করিলে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ হইবে। কিন্তু সভা ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়া পুলিশ বা সৈন্যেরা যদি মাথা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, তবে প্রতিরোধ নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না, সক্রিয় (active) হইতে বাধ্য হইবে। অর্থাৎ মাথাভাঙ্গা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্রতিরোধকারীরা আততায়ীর মাথা ভাঙ্গিতে পারে। এখানে প্রতিরোধ নিষ্ক্রিয় ছাড়িয়া সক্রিয় (active) হইলেও ইহা আক্রমণাত্মক (aggressive) নহে। কেননা, ইহা মূলতঃ আত্মরক্ষামূলক (defensive)।

৩। ময়মনসিংহের ছাত্রেরা এবং কুমিল্লার ভদ্রলোকেরা প্রতিরোধ করিতে গিয়া আততায়ীকে আক্রমণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু যেহেতু উহা আত্মরক্ষামূলক (defensive), সেই হেতু উহা আক্রমণাত্মক (aggressive) নহে। আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আততায়ীকে আক্রমণ করা যাইতে পারে। তাহার বেশী হইলেই উহা active প্রতিরোধের সীমা অতিক্রম করিয়া আক্রমণাত্মক (aggressive) প্রতিরোধের মধ্যে গিয়া পৌঁছিবে।

৪। জীবনরক্ষা বা স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষার জন্য যে গুলী ছোড়া হয়, তাহা সক্রিয় প্রতিরোধ। তথাপি পুণা সহরে মিঃ র‍্যাণ্ডকে গুলী করিয়া হত্যা

(১৮৯৭, ২২শে জুন) ঠিক আত্মরক্ষামূলক নহে বলিয়া ইহাকে আক্রমণাত্মক (aggressive) প্রতিরোধ বলা যাইতে পারে। সুতরাং active আর aggressive প্রতিরোধের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে ("…with the doubtful exception of the shot which killed Mr. Rand, there has been no instance of aggressive resistance in modern Indian politics.")।

৫। সুতরাং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ মাথা নত করিয়া সকল অত্যাচার সহ্য করিতে বলে না। ইহা শুধু নিষ্ক্রিয়তার উপরে জোর দেয় না, জোর দেয় প্রতিরোধের উপর ("The new politics, therefore, while it favours passive resistance, does not include weak submission to illegal outrage under that term ; it has no intention of over-stressing the possibility at the expense of the resistance.")।

৬। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কখনই একটা জাতিকে গড়িয়া তুলিতে পারে না, যদি না প্রয়োজনমত সক্রিয় প্রতিরোধ আসিয়া ইহার সহিত যোগ দেয় ("Passive Resistance cannot build up a strong and great nation unless it is ready at any moment and at the slightest notice to supplement itself with active resistance.") । আমরা শুধু একটা সহনশীল স্ত্রীলোকের জাতি গড়িয়া তুলিতে চাই না ("We do not want to develop a nation of women who know only how to suffer and not how to strike.")। সুতরাং প্রতিঘাত করাও অর্থাৎ strike করাও passive resistance-এর অন্তর্ভুক্ত।

৭। অত্যাচার যদি খুব বেশী হয় এবং উহা সহের সীমা অতিক্রম করে, তবে আক্রমণাত্মক প্রতিরোধ না করিলে বাঁচিবার কোন উপায় থাকে না। Spartanদের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। ("Where an outrage is too great or the stress of tyranny too unendurable for anyone to stand purely on the defensive ; to hit back, to assail and crush the assailant, to vindicate one's manhood becomes an imperious necessity to outraged humanity. … … It then becomes the sole choice either to break

under the strain or go under or to throw it off with violence.")।

৮। যদি Passive Resistanceএর দ্বারা আমরা অভীষ্ট লাভ করিতে না পারি, তবে দেশের মুক্তির জন্য যেকোন উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। সেই নূতন উপায়ের উদ্ভাবনকারী নূতন মানুষ পরে আসিবে ("... if passive resistance should turn out either not feasible or necessarily ineffectual, we should be the first to recognise that everything must be reconsidered and that the time for new men and new methods had arrived.")।

মন্তব্য—(ক) র‍্যাণ্ড এ্যাণ্ড আয়ার্ষ্ট মার্ডার যে অরবিন্দের মনের উপর ক্রিয়া করিতেছে—ইহার প্রমাণ র‍্যাণ্ড হত্যার উল্লেখ হইতেই আমরা পাইলাম।

(খ) পরবর্ত্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর যুগে প্রতিরোধের নিষ্ক্রিয়তার উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। অরবিন্দ এই প্রবন্ধে ঠিক তাহার উল্টা কথা বলিতেছেন। অরবিন্দ বলিতেছেন—আমরা প্রতিরোধ করিব, ইহাই আসল কথা। সেই প্রতিরোধ অবস্থা বুঝিয়া নিষ্ক্রিয় হইবে, অবস্থা বুঝিয়া সক্রিয় হইবে এবং অবস্থা বুঝিয়া আক্রমণাত্মকও হইবে। ইহা সম্পূর্ণ মহাত্মা গান্ধীর মতবিরুদ্ধ কথা। এইখানেই অরবিন্দের Passive Resistanceএর ব্যাখ্যার মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

(গ) অরবিন্দ Passive Resistanceকে নিষ্ক্রয়তা হইতে ধাপে ধাপে যেরূপ সক্রিয় ও আক্রমণাত্মক করিয়া তুলিয়াছেন—ইহা বিপিনচন্দ্রেরও অভিপ্রেত কি-না সন্দেহ। বিপিনচন্দ্র বলিয়াছেন—Armed Revolt অর্থাৎ প্রকাশ্য সশস্ত্র বিদ্রোহ আমাদের পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই আমরা Passive Resistance অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি। বিপিনচন্দ্র Active অথবা Aggressive প্রতিরোধের কথা কিছুই বলেন নাই। এইখানে অরবিন্দের সহিত তাঁহার মতের কিছুটা গরমিল আছে।

(ঘ) বস্তুতঃ মহাত্মা গান্ধী বিপিনচন্দ্রকেই হুবহু অনুকরণ করিয়াছেন, অরবিন্দকে অনুকরণ করেন নাই। অবশ্য প্রতিরোধ করিতে গিয়া অহিংসার উপর মহাত্মা গান্ধী যেরূপ বেপরোয়াভাবে জোর দিয়াছেন, বিপিনচন্দ্র তাহা

দেন নাই। আর অরবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথা উল্লেখ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অহিংসাকে অশাস্ত্রীয় ভ্রান্ত মত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। এই সম্পর্কে গোখলের মতবাদ উল্লেখযোগ্য। তিনি Passive Resistanceএর পক্ষপাতী নহেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী যতটা পক্ষপাতী, তিনি ততটাও নহেন। বরিশাল কনফারেন্সে (১৯০৬, ১৪ই এপ্রিল) তাঁহার পরিচালনায় Passive Resistance নিখুঁতভাবে পালন করা হইয়াছিল বলিয়া তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে (A Nation In Making) গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছেন। মি: গোখ্‌লে বলেন, প্রতিরোধের এই নিষ্ক্রিয়তার দরুণ গভর্ণমেণ্ট দমনমূলক শাস্তি দিতে বিরত থাকিবে না। কারণ, প্রতিরোধের এই নিষ্ক্রিয়তাকে গভর্ণমেণ্ট উস্কানী দিয়া সক্রিয় করিয়া তুলিবে। এবং প্রতিরোধ একবার সক্রিয় হইলেই তাহা আত্মরক্ষামূলকই হউক (Defensive—Active) অথবা আক্রমণাত্মকই (Aggressive) হউক, কিছুই আসে যায় না। গভর্ণমেণ্ট সৈন্য দিয়া গুলী করিয়া এই সক্রিয় প্রতিরোধ অনায়াসেই দমন করিবে। প্রতিরোধের নিষ্ক্রিয়তার উপর জোর দিয়া কোন লাভ নাই। গভর্ণমেণ্ট উহা নিষ্ক্রিয় থাকিতে দিবে না। সক্রিয় করিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্যদের গুলীর দ্বারা দমন করিবে। এই জন্যই পরবর্ত্তীযুগে মহাত্মা গান্ধী প্রতিরোধের নিষ্ক্রিয়তা রক্ষার উপর এতটা জোর দিয়াছিলেন। কেননা, তিনি রাজনীতিতে গোখলের শিষ্য বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন।

:

১। আমাদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হইতেছে—স্বরাজ, বিদেশীর কর্ত্তৃত্বহীন পূর্ণস্বাধীনতা—যাহা ইংলণ্ডে বর্ত্তমান।

২। ইহা লাভ করিবার উপায় কী?

(ক) আবেদন-নিবেদন নীতিতে ইহা লাভ হইবে না।

(খ) জাতির আত্মবিকাশ দ্বারা ইহা লাভ হইবে।

(গ) এই আত্মবিকাশের পথে গভর্ণমেণ্ট বাধা দিবে, সেই বাধাকে প্রতিরোধ করিতে হইবে।

৩। এই প্রতিরোধ বিভিন্ন প্রকারের—

(ক) সশস্ত্র বিদ্রোহ (armed revolt)।

(খ) আক্রমণাত্মক প্রতিরোধ (aggressive resistance)।

(গ) সক্রিয় প্রতিরোধ (active but defensive resistance)।

(ঘ) নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ—নির্জ্জলা (Passive Resistance)।

রাজ অত্যাচারের গুরুত্ব, প্রতিরোধের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিবে। অর্থাৎ, প্রতিরোধের প্রকৃতি স্থির হইবে আমাদের বর্ত্তমান সামর্থ্য দ্বারা এবং অত্যাচারের গুরুত্ব দ্বারা।

৪। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ জাতীয় কর্ম্মপদ্ধতি (National Policy) বলিয়া এখনও গৃহীত হয় নাই। যদিও 'বয়কটের' মারফৎ প্রয়োজন অনুসারে ইহা একরূপ গৃহীত হইয়াছে।

৫। বাংলাদেশ 'বয়কট' গ্রহণ করিয়াছে। আমরা শুধু বিদেশী বণিকদের পণ্যদ্রব্য 'বয়কট' করিব না, বৃটিশ আমলাতন্ত্র শাসনকেও 'বয়কট' করিব।

৬। বর্ত্তমানে আমরা শুধু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আরম্ভ করিব। অবশ্য প্রয়োজন হইলে ইহাকে আত্মরক্ষামূলক সক্রিয় প্রতিরোধ দ্বারা (defensive active resistance) সাহায্য করিব। ট্যাক্স দেওয়া এখন বন্ধ করিব না। কেননা, তাহার প্রতিক্রিয়া সামলাইবার প্রস্তুতি আমাদের এখনও হয় নাই।

৭। Moderateরা যদি কংগ্রেসে বাধা দেয়, তবে কংগ্রেসের বাহিরে আমরা নূতন দল শৃঙ্খলার সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইব। গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া রাজধানী পর্য্যন্ত এই সঙ্ঘ বিস্তৃত হইবে। এবং ইহার একটী শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন (Central Authority) হইবে—যাহার কথা সর্ব্বস্তরে, সর্ব্বশ্রেণী মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে।

৮। ব্রহ্মতেজদ্বারা মাতৃভূমির মুক্তিকামনায় আমরা যজ্ঞ করিব। রাক্ষসেরা এই যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসিবে। তখন ক্ষাত্রশক্তির দ্বারা এই রাক্ষসদের তাড়াইয়া দিতে হইবে। ক্ষাত্রশক্তি ব্যতিরেকে রাজনীতি করা চলিবে না। ক্ষাত্রশক্তি ব্যতিরেকে কোনপ্রকার রাজনীতি সম্ভব নয় ("... without Kshatriya strength at its back, all political struggle is unavailing. ... ... Politics is specially the business of the Kshatriya.")।

মন্তব্য—(ক) অরবিন্দ শুধু বিদেশী কাপড় ও নুন বয়কটের কথা বলিতেছেন না। বিদেশী শাসন বয়কটের উপরেই অধিক জোর দিতেছেন। বিপিনচন্দ্র পাল কলিকাতায় নৌরজী কংগ্রেসে 'বয়কট' অর্থে ইংরেজের শাসনকে বয়কট

করার কথাই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন। অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একমত হইলে কী হয়, মি: মেহতা ও মি: গোখলের মত Moderateরা কিছুতেই ইংরেজের অধীন ভিন্ন স্বাধীন হইবে না।

(খ) অরবিন্দ সর্ব্বাগ্রে Passive Resistance গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিতে নিষেধ করিতেছেন। কেননা, জাতি এখনও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রস্তুত হয় নাই। অরবিন্দ অলীক স্বপ্ন দেখিতেছেন না। জাতির পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান সম্পূর্ণ অটুট রহিয়াছে। তিনি বাস্তবের ভূমিতেই এক্ষেত্রে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

(সাতটি প্রবন্ধই পর পর উল্লেখ করা হইল, সেই সঙ্গে মন্তব্যও দেওয়া হইল। এইবার একটু তুলনামূলক সমালোচনা করা যাক।

১৯২১ খৃ: বরিশাল কন্‌ফারেন্সে বিপিনচন্দ্র বলিয়াছেন—"Passive Resistance is practically a synonym for non-cooperation. Our Movement in 1905 and 1906 and 1907 failed because it did not reach the stage of a great National Strike."

অরবিন্দের Passive Resistanceএর প্রবন্ধগুলি না পড়িলে এবং পড়িয়া না বুঝিলে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন বুঝা যাইবে না। এবং 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা না পড়িলে অরবিন্দের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বুঝা যাইবে না। মি: সি. আর. দাশ আলীপুর বোমার মামলায় বলিয়াছেন যে, 'বন্দে-মাতরম্' পত্রিকা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মুখপত্র। স্বদেশীযুগে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ইতিহাস আছে। উহা বাংলা দেশের এবং বাঙ্গালীর ইতিহাস—সমগ্র ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর নেতৃত্ব করিবার ইতিহাস।

মহাত্মা গান্ধী ও আইন অমান্য (১৯০৭।৮ই জুন): ১৯০৭।এপ্রিল মাসে অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের উপর একাদিক্রমে সাত সাতটী প্রবন্ধ লিখিলেন। আবার ১৯০৭।৮ই জুন 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা প্রকাশ করিল যে, মি: গান্ধী দক্ষিণ-আফ্রিকায় আইন অমান্য করিয়া জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন ("Mr. Gandhi will resist the ordinance and face imprisonment."— *8th June, 1907 Bandemataram.*)।

অরবিন্দ যাহাকে Passive Resistance বলিতেছেন, মিঃ গান্ধী তাহাই শুধু কলমে নয় হাতে কাজ করিয়া জেলে গিয়া দেখাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন। অরবিন্দ দেখাইতেছেন, ব্যাখ্যা করিতেছেন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের তথ্য; আর মিঃ গান্ধী দেখাইতেছেন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অভাবনীয় কাণ্ড—আইন অমান্য করিয়া দলে দলে জেলে গমন। অরবিন্দ ও মিঃ গান্ধীর নিগূঢ় যোগাযোগ একই সময়ে ১৯০৭ খৃঃ আমাদের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালার স্বদেশীযুগের সহিত দক্ষিণ-আফ্রিকার গান্ধী-আন্দোলনের যোগ রহিয়াছে।

১৯০৭।৮ই জুন আমরা মিঃ গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনের কথা 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় পাঠ করিলাম। ঠিক ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৬।৮ই জুন অরবিন্দ তাঁহার শ্বশুর ভূপাল বসুকে শিলং চিঠি লিখিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকে তথায় পাঠাইয়াছিলেন ছোটলাট ফুলারকে গুপ্তহত্যা করিবার জন্য। এই গুপ্তহত্যা বিপিনচন্দ্রের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধও নয় এবং মিঃ গান্ধীর আইন অমান্য করিয়া জেলে গমনও নয়। অরবিন্দের কার্য্যপ্রণালী এই সময়ে বিপিনচন্দ্র ও মিঃ গান্ধীর কার্য্য-প্রণালী হইতে পৃথক্। অরবিন্দচরিত্রের, তাঁহার মতবাদের ও তাঁহার কার্য্য-প্রণালীর এই পার্থক্য ইতিহাসে গভীর রেখাপাত করিয়া গিয়াছে। ইতিহাস আর তাহা এখন মুছিয়া ফেলিতে পারে না। সুতরাং অরবিন্দের সত্যিকার জীবনচরিত হইতেও আর ইহা মুছিয়া ফেলা যায় না। বিপিনচন্দ্র, মিঃ গান্ধী ও অরবিন্দচরিত্রের পার্থক্য ১৯০৬-১৯০৭ খৃঃ স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। একে অন্য হইতে কোথায় পৃথক তাহাও দেখা গেল। ১৯০৭।২০শে জুন 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিলেন—

"*Our Programme*······To bring about a revolution in the world-thought is the very important spade-work that goes before all operations to remove the superstitions, the scepticism, the indolence, the vacillation that cumber the field and clog action is almost a giant's work."

মিঃ সি, আর, দাশ ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা:—আলীপুর বোমার মামলায় মিঃ নর্টন্ বলিয়াছিলেন যে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের আদর্শ লইয়াই

'বন্দেমাতরম্' (* ক) পত্রিকা ভূমিষ্ঠ হয়। ("This paper was born in conspiracy.")। ইহার উত্তরে মিঃ সি. আর. দাশ বলেন যে, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় গুপ্ত সমিতি বা বোমা-রিভল্বারের নামগন্ধ নাই, বরং গুপ্ত-সমিতির বিরুদ্ধে কথা আছে। এই পত্রিকার আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা এবং উহা লাভের উপায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী, বয়কট ইহার উপরই জোর দিয়া এই পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে। এবং ইহাই এই কাগজের বিশেষত্ব। মিঃ সি. আর. দাশ আরো বলেন, অরবিন্দ এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন না। থাকিতে পারেন না—কেননা, তিনি তখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ ছিলেন। অরবিন্দ এই পত্রিকায় জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী, বয়কট এবং সালিশী বিচারের পক্ষে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

যুগান্তর পত্রিকার আদর্শের সহিত বন্দেমাতরম্ পত্রিকার আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধ দেখা যায়। যুগান্তর পত্রিকা বলে যে—আগে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ

(* ক) "Mr. Norton says that this paper (Bande Mataram) was born in conspiracy. Let us look into it and see if we can find anything dangerous or anything that suggests bombs or conspiracy or waging war against the Government. Far from any such suggestion, your Honour will find suggestions which, I have said, are the ideals of Independence and the means suggested are those of Passive Resistance. The point on which the greatest stress is laid in the articles is National Education, Swadeshi and Boycott. These points are typical of this paper.······ I do not admit for a moment that he (Aurobindo) was Editor of the Bande Mataram. But I do not for a moment deny that he was connected with it, and certainly he was connected with it as a contributor. ············Aurobindo Ghose was offered the editorship, but he refused to take the sole responsibility. For, he could not do that. He was at that time the Principal of the National College. In only one issue his name was published as editor. But in the next issue it was taken off.······ According to the Bande Mataram, the ideal of Freedom must be attained by Passive Resistance, Swadeshi, Boycott,

করিতে হইবে, যে উপায়েই হউক। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করার পরে স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা, সালিশী বিচার আপনা হইতেই আসিবে। স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা, সালিশী বিচারের দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা আসিবে না। সুতরাং অরবিন্দ যুগান্তরের আদর্শের বিরোধী এবং বন্দেমাতরম্ পত্রিকার আদর্শের পক্ষপাতী।

মিঃ সি. আর. দাশ বন্দেমাতরম্ পত্রিকার কতকগুলি বিখ্যাত প্রবন্ধ অরবিন্দের লেখা বলিয়া পাঠ করেন এবং প্রবন্ধগুলি হইতে প্রমাণ করিতে চান যে, অরবিন্দ গুপ্ত সমিতির বিরোধী ছিলেন। প্রবন্ধগুলির নাম ও তারিখ হইতেছে "That Sinful Desire", 1906, 18th September. এইটী বিপিন বাবুর লেখা, অরবিন্দের নয়। "Golden Bengal Scare", 1906, 3rd October. এইটীও বিপিন বাবুর লেখা, অরবিন্দের নয়। এই প্রবন্ধটীতে বিপিন বাবু গুপ্তসমিতির বিরুদ্ধে লেখেন এবং অরবিন্দ মৌখিকভাবে ইহার প্রতিবাদ করেন। এবং তাহারই ফলে বিপিনবাবু প্রধান সম্পাদকের পদ

National Education, Courts of Arbitration etc.…… Aurobindo has advocated National Education, Swadeshi, Boycott and Court of Arbitration; whereas the Jugantar in its articles headed, the Suchona, holds that no progress of the country is possible without Independence. Talk of Swadeshi—the Jugantar laughs at it. Talk of National Education, Arbitration Court—the Jugantar says all that is a pastime. No progress of the country can ever take place unless you have absolute Independence. This is the essential difference between the principles of the Bande Mataram and the Jugantar.……I shall read a few articles to show that it is not true that the Bande Mataram was born in conspiracy. I shall refer to an issue of the 18th September, 1906, under the heading—"That Sinful Desire."……Mr. Das then read an article entitled "The Idea of National Council" to show the attitude of the Bande Mataram towards secret societies. Counsel read a paragraph, dated 3rd October, 1906, which he put to Purna Chandra Lahiri in cross-examination. The article was entitled "Golden Bengal Scare."—*Mr. C. R. Das ; Alipore Bomb Case ; 1908-1909.*

ছাড়িয়া দেন। অথচ আদালতে মিঃ সি. আর. দাশ বিপিন বাবুর এই লেখাটী অরবিন্দের লেখা বলিয়া অম্লানবদনে চালাইয়া দেন। এবং অরবিন্দ যে গুপ্ত সমিতির বিরোধী তাহা এই লেখা হইতে প্রমাণ করেন। সুতরাং মিঃ সি. আর. দাশ যে বলিয়াছেন, আমি বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় বিপিন বাবুর লেখা দিয়া অরবিন্দকে খালাস করিয়াছি, ইহার প্রমাণ হাতে হাতেই পাওয়া গেল। অরবিন্দ বলিয়াছেন যে, নারায়ণ তাঁহাকে খালাস করিয়াছেন। তাহা যদি করিয়া থাকেন তবে সেই নারায়ণও বিপিনবাবুর প্রবন্ধ দিয়াই তাঁহাকে খালাস করিয়াছিলেন, অন্য কোন অলৌকিক উপায়ে তিনি খালাস পান নাই।

বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দের মতবাদের বৈশিষ্ট্য ঃ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় আলোচ্য প্রথম বৎসরে আমরা প্রধানতঃ চারিটি বিষয়ে অরবিন্দের মতের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিব।

১ম, মডারেট নীতির প্রতিরোধ। অবশ্য সকল চরমপন্থী নেতাই—যেমন বিপিনচন্দ্র উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, ইহারা সকলেই মডারেট-বিরোধী। আবার এই বিরোধীদের মধ্যেও অরবিন্দ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিরোধী।

কলিকাতা নৌরজী কংগ্রেসে বাঙ্গালার চরমপন্থীরা মিঃ তিলককে সভাপতি করিতে চাহিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান্ মিরার পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন মিঃ তিলকের সভাপতি হওয়ার প্রতিবাদ করেন, এবং চরমপন্থীদের বন্দেমাতরমে প্রচারিত পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শপোষণকারীদের ইডিয়ট্ (idiot) বলেন। এই ইডিয়ট্ কথার উত্তর সম্ভবতঃ অরবিন্দই দিয়া থাকিবেন (১৯০৬।২৮শে আগষ্ট এবং ২০শে সেপ্টেম্বর)। সেই উত্তরের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা অনুবাদ করা যায় না, মূল ইংরাজী পড়িতে হয়। মিঃ গোখলে বিপিন পালকে এই বলিয়া আক্রমণ করিলেন যে, বিপিন পালের চরমপন্থী দলে মুষ্টিমেয় মাত্র কয়েকজন লোক আছে। অরবিন্দ চিরদিনই মিঃ গোখলেকে আক্রমণ করিতে সিদ্ধহস্ত। এক্ষেত্রেও অরবিন্দের আক্রমণের পরাক্রম গোখলে মহোদয় সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, যদিও এই প্রথমবারে অরবিন্দ গোখলেকে "বিভীষণ" বলিয়া বিদ্রূপ করেন নাই (১৯০৬।৯ই অক্টোবর)। প্রসিদ্ধ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ কলিকাতার নৌরজী কংগ্রেসে নিবেদন-নীতি পাপ নহে বলিয়া চরমপন্থীদের উপর কিছুটা বক্রোক্তি

করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে অরবিন্দ "A sitter on the fence" লিখিয়া এমন এক চোট নিলেন যাহা পাঠ করিয়া বাগ্মী লালমোহন শেষ বয়সে বুঝিতে পারিলেন যে, বাঙ্গালার চরমপন্থীদের মধ্যে ইংরাজীতে গালাগালি দিতে পারে এমন লোক আছে (১৯০৬।৩০শে ডিসেম্বর)। ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ বহরমপুর কন্‌ফারেন্সে বলিলেন যে, ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজের বিজ্ঞান আমাদের নির্জ্জীব দেশের মৃত অস্থিগুলির মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে। ইহার উত্তরে অরবিন্দ লিখিলেন—"But he (Dr. Ghose) is a living contradiction." এমন টিপ্পনী যে-সে দিতে পারে না, অরবিন্দই পারেন। তৎকালীন মডারেট কোন নেতাই অরবিন্দের হস্তে নিস্তার পান নাই।

২য়, কুমিল্লা ও জামালপুরের ঘটনায় অরবিন্দ নিপীড়িত, নির্য্যাতিত হিন্দুদের পুলিশের নিকট সাহায্যের জন্য বা প্রাণ রক্ষার জন্য বা মাতা, ভগিনী, স্ত্রী ও কন্যার ইজ্জত রক্ষার জন্যও যাইতে বলেন নাই। এমন কি গভর্ণমেণ্টের উপরেও কোন আক্রোশ প্রকাশ করিয়া কটূক্তি পর্য্যন্ত করেন নাই। শুধু আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বলিয়াছেন। এমন প্রতীকারের কথা এমনটী করিয়া আর কেহ বলেন নাই। ইহাতে অরবিন্দ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দেদীপ্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

৩য়, কলিকাতা এলবার্ট-হলে হিন্দু-মুসলমান সকল জাতি মিলিয়া এবং হিন্দুদের মধ্যেও উচ্চজাতি নিম্নজাতি মিলিয়া-মিশিয়া এক জাতীয় ভোজের আয়োজন হয়। উদ্দেশ্য যে, ইহাতে আমাদের মধ্যে জাতীয়তা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু অরবিন্দ বলিলেন, আন্তর্জাতিক ভোজের দ্বারা জাতি গঠন হইবে না। ব্রহ্মজ্ঞানীরা এবং মুসলমান ভ্রাতাগণ যাহাই বলুন না কেন, আমরা জাতি গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক ভোজে বিশ্বাস করি না। ইহাতে সমাজ-সংস্কারকেরা আমাদিগকে যদি প্রতিক্রিয়ামুখে রক্ষণশীল বলিয়া উপহাস করেন তথাপি আমরা দমিব না।

"Last Friday's folly-interdining is not a necessary condition of Nation-building in India—refers to Albert Hall dining. The Brahmo, the propagandist Mahommadan method will not build the Nation. We say this at the risk of being

branded as social reactionaries."—*17th September, 1906; Bande Mataram.*

অরবিন্দ একেবারে গোঁড়া হিন্দু হইয়া গিয়াছেন। ইহাও তাঁহার চরিত্রের ও মতবাদের একটা বৈশিষ্ট্য। স্বদেশী যুগে চরমপন্থী ও বৈপ্লবিক রাজনীতির সহিত হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, রোমান্ ক্যাথলিক্ খৃষ্টান উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব গোবর খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু-সমাজে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বদেশী যুগে চরমপন্থী নেতারা গোঁড়া হিন্দু সাজিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অরবিন্দের পক্ষেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

৪র্থ, কুমিল্লা-জামালপুরের ঘটনা ও লাজপৎ-অজিত সিংহের নির্ব্বাসনের পরে ১৯০৭।১৮ই জুলাই অরবিন্দ খোলাখুলি লিখিলেন যে—আরও অত্যাচার চাই—("Wanted More Repression")। এ অতি ভয়ঙ্কর কথা! এমন কথা ত আর কোন ভারতীয় নেতা লেখেন নাই বা বলেন নাই। ডাকিয়া রাজ-অত্যাচার আনিবার উৎসাহ ত আর কোন ভারতীয় নেতার মধ্যে দেখা যায় না। অরবিন্দ কী বুঝিয়া আরও অত্যাচার চাহিলেন, তাহা তিনিই জানেন। আমরা শুধু অনুমান করিতে পারি। কিন্তু সে অনুমান সত্য হইতেও পারে আবার সত্য না-ও হইতে পারে। এক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী ও দূরদর্শিতা অরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। যেহেতু বিপিনচন্দ্র স্বাধীনচিন্তা ও তাহা প্রকাশের সুযোগ চান, সে সুযোগ না পাইলে জাতি গঠন করা যাইবে না। রাজ-অত্যাচার স্বাধীনচিন্তা প্রকাশে বাধা দিলে জাতির সংগঠন-শক্তির এবং সেই সঙ্গে জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে—বিপিনচন্দ্র এইরূপ আশঙ্কা করিতেন। কিন্তু অরবিন্দ তাহা স্বীকার করেন না। তিনি লিখিলেন—আরও অত্যাচার চাই। অবশ্য এই লেখার সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদপত্র দলনের অত্যাচার আসিয়া পড়িল। যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্—সকলেই রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লেখার দরুন গ্রেপ্তার হইয়া আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অরবিন্দ কি ইহাই চাহিয়াছিলেন?

বয়স ছত্রিশ বৎসর (১৯০৭।১৫ই আগষ্ট—১৯০৮।১৪ই আগষ্ট) ঃ

ভগিনী নিবেদিতার ২ বৎসরের জন্য ইয়োরোপভ্রমণ (১৯০৭, আগষ্ট—১৯০৯।আগষ্ট) ★ অরবিন্দের জীবনে ৩৫শ ও ৩৬শ বৎসর ★ অরবিন্দের অধ্যাপক জীবনের অবসান ★ "বন্দেমাতরম্" মোকদ্দমা ও অরবিন্দ ★ বিপিনচন্দ্রের বিবেক ও তাঁহার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ—বিপিনচন্দ্রের বিনাশ্রমে ৬ মাসের কারাদণ্ড ★ অরবিন্দ জেলে গেলেন না কেন ★ "বন্দেমাতরম্" মোকদ্দমায় অরবিন্দের আত্মপক্ষ সমর্থনের কৈফিয়ৎ ★ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৯০৭।২৭শে অক্টোবর) ★ "যুগান্তর"-এর হস্তান্তর ★ রাজদ্রোহদ্দীপক সভা নিষিদ্ধ (১৯০৭।১লা নভেম্বর) ★ ছোটলাট ফ্রেজার ★ ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ্যালেনকে গুলি ★ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও সন্ত্রাসবাদ ★ অরবিন্দ ও মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্স ★ সুরাট কংগ্রেসের আগে অরবিন্দ ★ সুরাট অভিমুখে অরবিন্দ ★ সুরাটে অরবিন্দ—বিপিন পাল তখন বক্‌সার জেলে বন্দী ★ অরবিন্দ ও গান্ধী ★ সুরাট-কংগ্রেসের (১৯০৭) অধিবেশন ★ কংগ্রেস ভাঙ্গিল কেন—কে ভাঙ্গিলেন ★ সুরাট-কংগ্রেসের পর অরবিন্দ কোথায় গেলেন ★ অরবিন্দ ও বিষ্ণুভাস্কর লেলে ★ অরবিন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ★ অরবিন্দের অমরাবতীর বক্তৃতা (১৯০৮।২৯শে জানুয়ারী) ★ প্যারিস্ হইতে হেমচন্দ্রের প্রত্যাবর্ত্তন ও মহারাষ্ট্রীয় গুপ্তসমিতি পরিদর্শন ★ লেলে মহারাজের মাণিকতলা বোমার বাগান দর্শন ও তাঁহার হিতোপদেশ ★ অরবিন্দ ও লেলের হিতোপদেশ ★ রবীন্দ্রনাথের পাবনা-বক্তৃতা (১৯০৮।১১ই ফেব্রুয়ারী) ★ বিপিনচন্দ্র পালের কারামুক্তি (১৯০৮।১০ই মার্চ্চ) ★

"...বক্তৃতা (৩রা এপ্রিল এবং ১০ই এপ্রিল— পান্থির মাঠে) ★ অরবিন্দ ও অন্ধকারের রাজনীতি

ভগিনী নিবেদিতার ২ বৎসরের জন্য ইয়ুরোপ ভ্রমণ (১৯০৭, আগষ্ট—১৯০৯।আগষ্ট) ঃ "যুগান্তর"-এর মোকদ্দমার সময় (১৯০৭।জুলাই) আসামী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের পক্ষে জামিন হইবার জন্য ভগিনী নিবেদিতাকে আমরা আদালতে উপস্থিত দেখিতে পাই। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা।

ইহার পরেই ভগিনী নিবেদিতাকে গ্রেপ্তারের জন্য আয়োজন চলিতে লাগিল। ভগিনী নিবেদিতাকে এই গ্রেপ্তারের কথা বলা হইলে তিনি শুধু হাস্য করিলেন। ("She laughed at it ; she cared little for the prison.")। কিন্তু গুপ্ত সমিতির কাজের জন্য তাঁহাকে কারাগারের বাহিরে রাখা প্রয়োজন হইল ; এবং বন্ধুবান্ধবগণের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহাকে এদেশ ছাড়িয়া ইয়োরোপ গমনে বাধ্য করা হইল ("But the necessity was stronger than the contest itself to save her in spite of herself. At the importunity of the Nationalist leaders she agreed to a voluntary exile during which she could yet serve India.")। ১৯০৭।আগষ্ট মাসে ভগিনী নিবেদিতা ইয়োরোপ গমন করিলেন।

তিনি প্রথমে লণ্ডনে গেলেন। সেখানে তাঁহার দুই বন্ধু—মিসেস ওলে বুল্ ও মিস্ ম্যাক্লয়েড-এর সহিত সাক্ষাত হইল। তাঁহারা তাঁহাকে গুপ্ত সমিতির কার্য্যে সকল রকম আর্থিক সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। ভগিনী নিবেদিতা দুই প্রসিদ্ধ সাংবাদিকের—র‍্যাটক্লিফ্ ও ষ্টেড্—সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবং তাঁহাদের সহানুভূতি পাইলেন। পরে প্রিন্স্ ক্রোপাট্‌কিনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরামর্শাদি করিলেন। কেয়ার হার্ডির সহিতও লণ্ডনে দেখা করিলেন। ভগিনী নিবেদিতা লণ্ডনে পৌঁছিবার কয়েক সপ্তাহ পরেই জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার পত্নী লণ্ডনে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

১৯০৮।সেপ্টেম্বর ১৫ বৎসর পর, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার জন্মভূমি আয়র্ল্যাণ্ডে গেলেন। আইরিশ সংবাদপত্রগুলি (separatist journals) বাংলা দেশের সংবাদগুলির সহিত সহযোগিতার (mutual aid) প্রস্তাব করিল।

১৯০৮।অক্টোবরে মিসেস্ ওলে বুল্-এর সাহায্যে তিনি আমেরিকা গমন করিলেন। ১১'মাস কারাগারে থাকিয়া ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তখন সেখানে গিয়া ভগিনী নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আরও অনেক বাংলা দেশের বিপ্লবী পলাতক যুবক তখন আমেরিকায় অসহায় অবস্থায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া তাঁহাদের বাসোপযোগী ব্যবস্থা করিলেন। মা যেমন সন্তানের জন্য করেন, তিনিও ঐ বিপ্লবী যুবকদের জন্য তাহাই করিলেন। ভারতবর্ষের ফরাসী-অধিকারভুক্ত কোন সহরে এই সব পলাতক বিপ্লবীদের জন্য একটি বাড়ী ক্রয় করিতে সংকল্প করিয়া, তিনি চাঁদা তুলিলেন।

আমেরিকা হইতে তিনি ইংলণ্ডে চলিয়া আসিয়া তাঁহার মাতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপনীত হইলেন। মায়ের মৃত্যু হইলে ২।১ সপ্তাহ পরেই তিনি পুনরায় লণ্ডন প্যারিস ও বার্লিনে গেলেন। সেখানকার কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জেনেভা (Geneva)-তে আসিলেন। জেনেভাতে তখন "বন্দেমাতরম্" পত্রিকা গোপনে ছাপা হইয়া বাংলা দেশে পাঠান হইতেছিল। ভগিনী নিবেদিতা এই কার্য্যে সহায়তা করিলেন। তার পর ১৯০৯।১লা জুলাই, ধিঙড়া নামে একজন হিন্দু যুবক কার্জ্জন উইলিকে লণ্ডনে গুপ্তহত্যা করিল। জেনেভাতে ভগিনী নিবেদিতা "বন্দেমাতরম্"-এর আফিসে এই সংবাদ পাইলেন।

অরবিন্দ কলিকাতায় বসিয়া ৩১শে জুলাই, এই হত্যা সম্পর্কে "কর্ম্মযোগিন্"-এ লিখিলেন—

"*Madanlal Dhingra :* We have no wish whatever to load the memory of the unfortunate youngman with curses and denunciation. If a random patriotism was at its back, we have little hope that reflection will induce him to change his views······Here his country remains behind to bear the consequences of his act."—*Karmayogin ; July 31, 1909.*

এক অরবিন্দ ভিন্ন এই ঘটনায় এরকম লেখা আর কেহ লিখিতে পারিতেন না।

ভগিনী নিবেদিতা গত ২ বৎসর ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ সহরগুলি বাংলার গুপ্তসমিতির কার্য্যব্যপদেশে চষিয়া ফেলিয়াছেন। কার্জ্জন উইলির

হত্যা কি তাহারই ফল ? এই হত্যার পরের মাসেই ১৯০৯।আগষ্ট জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার পত্নীর সহিত "মিসেস্ মার্গেট" ছদ্মনামে ভগিনী নিবেদিতা জাহাজে চড়িয়া বোম্বাই পৌঁছিলেন। তখন কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে এদেশে আসা অতিশয় বিপজ্জনক ("Nivedita returned to India in full crisis.")।

ভগিনী নিবেদিতার ফরাসী জীবন-চরিতের পৃঃ ২৯৬-৩১০ হইতে উপরে লিখিত অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আমরা দেখিতেছি—যে দুই বৎসর ভগিনী নিবেদিতা ইয়োরোপে ছিলেন, তাহার প্রত্যেকটি দিন এবং প্রত্যেকটি মাসে গলদঘর্ম্ম অবস্থায় তিনি বাংলার গুপ্তসমিতির কার্য্যের জন্য ছুটাছুটি করিতেছেন। এরূপটি আর কে পারিত ? নিশ্চিন্ত আলস্যে বিশ্রাম উপভোগ করিবার জন্য ভগিনী নিবেদিতা ইয়োরোপ ভ্রমণে যান নাই। ভারতের বাহিরে যে-সকল যুবকেরা—বিশেষত: বাঙ্গালী যুবকেরা—ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য বৈপ্লবিক কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের সম্পর্কে একটি পৃথক, ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হইলে দেখা যাইবে যে—ভগিনী নিবেদিতার এই দুই বৎসরের ইয়োরোপ ভ্রমণ সেই ইতিহাসে নেতৃত্ব করিয়াছে। অরবিন্দ বৈপ্লবিক কর্ম্মের জন্য ভারতের বাহিরে যান নাই। নিবেদিতা গিয়াছিলেন।

এই দুই বৎসর তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বাংলা দেশে যে-সকল বিপর্য্যয়-কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহা আমরা এখন পর পর দেখিব।

অরবিন্দের জীবনে ছত্রিশ ও সাঁইত্রিশ বৎসর : ১৯০৭।১৫ই আগষ্ট অরবিন্দ ৩৬ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই বৎসর এবং এর পরের বৎসর অরবিন্দের জীবনে খুব একটা সঙ্কটকাল উপস্থিত হইবে। অরবিন্দ কোষ্ঠীতে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার কোষ্ঠীতে এই সময় কী লেখা ছিল—তা আমরা জানি না।

অরবিন্দ ৭ বৎসর বয়সে বিলাত গমন করেন। ২০ বৎসর বয়সেই বিলাতে থাকা কালে (কেম্ব্রিজ) বিপ্লবাত্মক বোমা নিক্ষেপাদির কল্পনা তাঁহার মাথায় আইসে—"The idea of terrorist activity (bombing) came at that time". ২১ বৎসর বয়সে দেশে ফিরিবামাত্রই তিনি বুর্জ্জোয়া কংগ্রেসের নিবেদন-নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া প্রবন্ধ লিখিলেন।

৩০ বৎসর বয়সে বরোদা হইতে বাংলা দেশে আসিয়া, মেদিনীপুরের কাঁকরপূর্ণ মাঠের গর্ত্তে ঢুকিয়া, নিজ হাতে বন্দুক ছুড়িতে শিখাইয়া, গুপ্ত

এই যুক্তিবলে মিঃ নর্টনের কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না। এখন দেখা যাক জাতীয় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কে বা কাহারা? ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, স্যার গুরুদাস ব্যানার্জ্জী, মিঃ নগেন্দ্র নাথ ঘোষ—ইঁহারাই কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এই তিন খ্যাতনামা ব্যক্তির নামের সহিত কেহই কোন প্রকার রাজনীতির সংশ্রব কল্পনাও করিতে পারে না। ইঁহারা মডারেটস্য মডারেট, ইঁহাদের যদি কোন রাজনীতি থাকে তবে তাহা নির্জলা রাজভক্তি-নীতি ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং এই তিন কর্তৃপক্ষের অধীনে জাতীয় বিদ্যালয় কোন বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের আড্ডা হইতেই পারে না। ২য় কারণ, জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালন ব্যাপারে, এমন কি ছাত্রদের পাঠ্য-পুস্তকের তালিকা-নির্ব্বাচনে পর্য্যন্ত অরবিন্দের কোনই হাত ছিল না ("No evidence even that Aurobindo exercised any active control so far as the selection of the course of studies was concerned. *Aurobindo had no control over it.*"—*Mr. C. R. Das*)। সুতরাং এ হেন নিরামিষ চাকরীতে বিপ্লবী অরবিন্দ যে এক বৎসর টিকিয়া ছিলেন—ইহাই যথেষ্ট।

অরবিন্দ ২রা আগষ্ট জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দেওয়ার মাত্র দুই সপ্তাহ পরে, ১৬ই আগষ্ট পুলিশ তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিল। অপরাধ—বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় ২৭শে জুন "India For The Indians" রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, এবং যুগান্তরের যে-সকল বৈপ্লবিক প্রবন্ধের জন্য যুগান্তরসম্পাদক জেলে গিয়াছেন, সেই সকল বে-আইনি প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ বন্দেমাতরম্ ২৮শে জুলাই আবার ছাপাইয়া দিয়াছে। প্রশ্ন হইবে: তাতে অরবিন্দের কী? পুলিশের বিবেচনায় অরবিন্দই বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক, অতএব তিনিই দায়ী, সুতরাং তাঁহার অপরাধের বিচার হইবে, অতএব তিনি গ্রেপ্তার! অরবিন্দ ১৬ই আগষ্ট তারিখেই পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ (surrender) করিয়া আড়াই হাজার টাকার জামিনে বিচারসাপেক্ষ তখনকারমত খালাস পাইলেন।

এই ঘটনার ৪ দিন মাত্র পরে ২১শে আগষ্ট বুধবার বেলা ৩টা ৪৫ মিনিটের সময় জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সভা করিয়া অরবিন্দকে বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল। সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জী সভাপতি হইলেন।

অভিনন্দনের পরের দিন ২২শে আগষ্ট অরবিন্দ ছাত্রদের উপদেশ দিয়া

বক্তৃতা দিলেন। সম্ভবতঃ অরবিন্দের ইহাই প্রথম বক্তৃতা। এর আগে অরবিন্দের কোন বক্তৃতার খবর আমরা পাই নাই।

২৩শে আগষ্ট বন্দেমাতরম্ পত্রিকা নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশ করিল—

"*Sympathy With Srijut Arabindo Ghose :*

A meeting of the students and teachers of the Bengal National College and School, Calcutta, was held on Wednesday, the 21st August, at 3-45 p. m. to express regret at the resignation of Srijut Arabindo Ghose, B.A. (Cantab), the late Principal, and to record its expression of sympathy with him *in his present troubles*, under the presidency of Srijut Satish Chandra Mukherji, M.A.,B.L., Hon. Principal and Superintendent of the College, resolved—

That the students and teachers of the Bengal National College and School in meeting assembled do hereby express their hearty appreciation of the eminent qualities as a teacher of Srijut Arabindo Ghose, B.A. (Cantab), late Principal, and record their deep regret at his resignation on the 2nd of August, 1907 of the high office which he had filled with such conspicuous ability, and at so much personal sacrifice to himself during the first year of the existence of the College."—*Bandemataram,23rd August, 1907.*

ছাত্রদের বিদায়-অভিনন্দনে স্পষ্টই অরবিন্দের গ্রেপ্তারের কথার উল্লেখ রহিয়াছে ("in his present troubles")। পরের দিন অরবিন্দ ছাত্রদের নিকট যে বক্তৃতা করিলেন, তাহাতে তিনিও এই গ্রেপ্তারের কথাই সর্বপ্রথম উল্লেখ করিলেন।

"You all know that I have resigned my post. In the meeting you held yesterday, I see that you expressed sympathy with me in what you call *my present troubles.*"

কিন্তু এই present troubles সম্পর্কে অরবিন্দ দুইটি কথা ছাত্রদের

বলিলেন : ১ম, তিনি এই গ্রেপ্তার হওয়াটা troubles বিবেচনা করেন না। কেননা, যে ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, সে ব্রতের এই ফল আগে হইতেই তাঁহার জানা আছে। ২য়, তিনি বিপদের মুখে পড়িয়াছেন বলিয়া শুধু নিজের জন্য ছাত্রদের নিকট কোনই সহানুভূতি চান না। কিন্তু যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া তিনি বিপদকে বরণ করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্যের প্রতি ছাত্রদের সহানুভূতি তিনি প্রত্যাশা করেন।

"I don't know whether I should call them troubles at all. It was long foreseen as inevitable in the discharge of the mission that I have taken up *from my childhood*, and I am approaching it without regret. What I want to be assured is not so much that you feel sympathy for me in *my troubles*, but that you have sympathy for *the cause*, in serving which I have to undergo what you call *my troubles*."

যে দেশে স্বাধীনতা নাই সেই দেশের কোন লোক যদি দেশের কাজ করিতে গিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়, তবে সেই রাজদ্রোহী বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি সাধারণতঃ লোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ভয় পায়। কেননা, সহানুভূতি করিতে গিয়া পাছে তাহারা কোন বিপদে পড়ে। আর যদিই বা সহানুভূতি করে তবে শুধু সেই ব্যক্তির জন্যই করে ; যে দেশাত্মবোধের আদর্শের জন্য সে অপরাধী, সেই আদর্শ বা মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি করে না। অরবিন্দ এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই ছাত্রদিগকে কথাটা বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

ঠিক এই তারিখেই (৭ই ভাদ্র, ১৩১৪) অরবিন্দের এই present troublesকে লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সেই বিখ্যাত কবিতাটি লিখিলেন—"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"। কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে বহুমূল্য একখণ্ড হীরকের ন্যায় জ্বল জ্বল করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অভিযুক্ত অরবিন্দের লেখাটিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন। যদিও অরবিন্দের বিরুদ্ধে বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বে এইরূপ সমর্থন আইনসঙ্গত নয়। সেই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি বে-আইনী। অভিযোগ এই, অরবিন্দ লিখিয়াছেন—"India

for Indians" অর্থাৎ ভারতবাসীর জন্যই ভারতবর্ষ। যদি কোন ইংরেজ লেখে যে England for Englishmen অর্থাৎ ইংরেজদিগের জন্যই ইংলণ্ড—তবে কি তাহা অপরাধ হইবে, না রাজদ্রোহ হইবে, না বে-আইনী হইবে? কিছুই হইবে না। প্রত্যেক ইংরেজ বলিবে যে, "ইংরেজদিগের জন্যই ইংলণ্ড—ইহা খুব ঠিক কথা। আবার প্রত্যেক ইংরেজ বলিবে যে, ভারতবাসীর জন্য ভারতবর্ষ—ইহা অতি ভয়ঙ্কর রাজদ্রোহমূলক বে-আইনী কথা। তাহা না বলিলে অরবিন্দ গ্রেপ্তার হইবেন কেন? ভারতবাসীর জন্যই ভারতবর্ষ, এই কথাটার সঙ্গেই আর একটা কথা আসিয়া পড়ে: ইংরেজদিগের জন্য ভারতবর্ষ নয়। সর্ব্বনাশ! এ একেবারে সাক্ষাৎ "Quit India", আর "Quit India" যে কী ভয়ঙ্কর চিজ্, তা ত প্রত্যক্ষই দেখা গিয়াছে! অরবিন্দের সেদিনকার লেখাটিতে এই ভাবী Quit Indiaর পূর্ব্বাভাস ছিল। আর রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দের সে লেখাটিকেই কবিতায় সমর্থন করিয়াছিলেন। যথা—

"হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণী-মূর্ত্তি তুমি। ......
............কোন ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোন ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। ....
.........বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছো দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়,
সত্যের গৌরবদীপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।"

ইহা India for Indians—প্রবন্ধটিকে লক্ষ করিয়াই লেখা। সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

"বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্ত্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
.........ভারতের বীণাপাণি
হে কবি, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তাঁর

তারে তারে দিয়াছেন নিপুণ ঝঙ্কার,
নাহি তাহে দুঃখ তান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস। তাই শুনি আজ
কোথা হ'তে ঝঞ্ঝা সাথে সিন্ধুর গর্জ্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্ত্তন
পাষাণ পিঞ্জর টুটি; বজ্র গর্জ্জরব
ভেরি মন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব
এ উদ্দাত্ত সঙ্গীতের তরঙ্গ মাঝার
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

কবিতার মধ্য দিয়া যেন একটা তুমুল ঝড় বহিয়া গেল। অরবিন্দ ছাত্রদের নিকট যে ধরণের সহানুভূতি বক্তৃতায় চাহিয়াছিলেন, কবির নিকট ঠিক সেই ধরনের সহানুভূতিই ঠিক সেই সময়েই পাইয়াছিলেন। এমনটি আর কেহ পান নাই, কারু ভাগ্যে ঘটে নাই।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি ৭ই সেপ্টেম্বর বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। অরবিন্দ ছাত্রদের আরো একটি কথা বলিলেন, "... the mission that I have taken up from my childhood." ইহার ঠিক দুই বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীর নিকট পত্রে (৩০শে আগষ্ট, ১৯০৫) অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন— "প্রিয়তমা মৃণালিনী—......চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।" অতি বাল্যকাল হইতেই যে অরবিন্দ দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে তিনি খুব সচেতন। নতুবা স্ত্রীর নিকট, ছাত্রদের নিকট এই কথা বারংবার তিনি এত জোর দিয়া বলিতেন না।

স্ত্রীর নিকট পত্রে আমরা পাই যে—অরবিন্দ দেশকে মা বলিয়া পূজা করেন। বঙ্কিমের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দুই বৎসর পর ছাত্রদের বলিলেন যে—তোমরা আমাকে সম্মান করিলে না, আমার মধ্যে যে মা আছেন, সেই মাকে সম্মান করিলে। এই মা, বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্। এই মা এখন অরবিন্দের বাহিরে নয়, অন্তরে—"The mother in me. Whatever respect you have shown to me to-day is...... to *the mother in me.*" দেশাত্মবোধের সাধনায় অরবিন্দ এখন শুধু অন্তর্মুখী

নহেন, সম্পূর্ণ আত্মস্থ। "The mother in me"—সাধনার অবস্থা নয়, পূর্ণ সিদ্ধির অবস্থা। উপলব্ধি ব্যতিরেকে অরবিন্দের মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হইত না। তিনি উত্তেজনাবশে বে-ফাঁস কথা বলিবার লোক নহেন।

গভর্ণমেণ্টের স্কুল-কলেজ হইতে জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষার পার্থক্য কোথায় সে সম্বন্ধে ছাত্রদের বলিলেন—

"What we want here is not merely to give you a little information, not merely to open to you careers for earning a livelihood, but to build up sons for the motherland, to work and to suffer for her. That is why we started this College and that is the work to which I want you to devote yourselves in future."

মিঃ সি. আর. দাশ আলিপুর বোমার মামলায় বলিয়াছেন যে—জাতীয় বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই শিক্ষায়তনকে সর্ব্বপ্রকার রাজনীতির সংস্রব হইতে দূরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন ("It was intended to be free from all political bias of either party."—*Mr. C. R. Das*)। কিন্তু অরবিন্দ বলিতেছেন অন্যরূপ কথা। মতবিরোধের হেতু প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে।

তারপরে অরবিন্দ ছাত্রদের একটি চরম কথা বলিলেন—

"There are times in a nation's history when Providence places before it one work, one aim, to which everything else, however high and noble in itself, has to be sacrificed. *Such a time has now arrived for our motherland* when nothing else is dearer than her service, when everything else is to be directed to that end."

অরবিন্দের এই কথাটি তাঁহার পূর্ব্বগামী স্বামী বিবেকানন্দের এইরূপ কথার সম্পূর্ণ অনুরূপ। সম্ভবতঃ অরবিন্দ এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দকেই অনুসরণ করিয়া থাকিবেন।

স্বামীজী বলিতেছেন—

"আগামী ৫০ বৎসর ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন। অন্যান্য অকেজো দেবতাগুলিকে এই কয়েক বৎসর

তুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন। এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত। ...... যখন তুমি এই দেবতার পূজায় সক্ষম হইবে, তখন অন্যান্য দেবতাকেও পূজা করিতে তোমার ক্ষমতা জন্মিবে।"—(ভারতে বিবেকানন্দ, পৃ: ৩৪৩-৩৪৪)

"উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন স্বাধীনতা।"—(ভা: বি:—পৃ: ২৪৫)

"প্রথম প্রয়োজন স্বাধীনতা"—এ একেবারে যুগান্তর দলের কথা! নরমপন্থীও নয়, চরমপন্থীও নয়; এ একেবারে হাতে-গরমপন্থী—বিপ্লববাদীদের কথা।

অরবিন্দ শেষ কথা বলিলেন—

"Work that she (Motherland) may prosper. Suffer that she may rejoice. All is contained in that one single advice.'

বন্দেমাতরম্ মোকদ্দমা ও অরবিন্দ: এই মোকদ্দমায় শ্রীঅরবিন্দের চরিত্র কোন্ দিকে কিভাবে ফুটিয়া উঠিল, আগে তা-ই আমাদের বিবেচ্য। পরে আর যেসব ঘটনা এই মোকদ্দমাকে আশ্রয় করিয়া সেই সময়কার ইতিহাস রচনা করিয়াছে, তা-ও দেখিতে হইবে।

এই মোকদ্দমায় তিনটি ধারা দেখা দিল। ১ম ধারা—বিপিনচন্দ্র পালকে নিয়া নিরাপদে বক্সার জেলে পৌঁছাইয়া দিল। বিপিনচন্দ্রের কৌঁসুলী মি: সি. আর. দাশ বাধা দিলেন না, বরং সাহায্যই করিলেন। ২য় ধারার তরঙ্গাভিঘাত—অরবিন্দকে এক বালুচরে আটকাইয়া ধরিল, জেলে যাইতে দিল না। মি: ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিতে দাঁড়াইয়া আইনের কেরামতি খুব দেখাইলেন। এই ধারার মুখেই মি: কে. এন. চৌধুরী বন্দেমাতরম্-এর কার্য্যাধ্যক্ষ হেমচন্দ্র বাগচীকে ভরাডুবি হইতে দিলেন না, টানিয়া তীরে উঠাইলেন। ৩য় ধারার মুখে—মি: জে. এন. রায়ের কথা আদালত শুনিল না, মুদ্রাকর অপূর্ব্ব তিন মাসের জন্য সশ্রম কারাবাসে প্রেরিত হইল। বেচারী!

১৬ই আগষ্ট গ্রেপ্তারের কথা শুনিবামাত্রই মি: ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর সহিত পরামর্শ করিয়া অরবিন্দ নিজেই পুলিশের কাছে গিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। গিরিশচন্দ্র বসু ও নীরদচন্দ্র মল্লিক আড়াই হাজার টাকার জামিনে অরবিন্দকে বিচারসাপেক্ষ তখনকারমত খালাস করিলেন। কথাটা সংবাদ-পত্রে রটিয়া ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়িল।

২২শে আগষ্ট অরবিন্দ জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট বিদায়-অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতা দিলেন। ঐ তারিখেই বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় তিনি নিজের সম্বন্ধে লিখিলেন—

"*The Crime Of Nationalism :* Can I be false to the fundamental message of my religion, my civilisation and its philosophy? *I am a Hindu. I am a Nationalist.*"—*Bandemataram, the 22nd August, 1907.*

অরবিন্দ বলিতেছেন যে—তিনি হিন্দুও বটেন আবার জাতীয়তাবাদীও বটেন। হিন্দুত্ব ছাড়িয়া তিনি জাতীয়তাবাদী নহেন আবার জাতীয়তাবাদ ছাড়িয়াও তিনি হিন্দু নহেন। স্বদেশী যুগের চরমপন্থীদলের নেতাদের মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই এরূপ মতাবলম্বীই ছিলেন। কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন। কিন্তু ধর্ম্মবিহীন জাতীয়তা অরবিন্দে আরোপ করা যায় না। সুতরাং কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদ অরবিন্দে আরোপ করা যায় না। অরবিন্দের জাতীয়তাবাদ যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে এই তথ্যই উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে।

ঐ ২২শে আগষ্ট তারিখের বন্দেমাতরম্ পত্রিকা পাঠ করিলেই দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সংবাদপত্রগুলি এই রাজদ্রোহমূলক মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে অরবিন্দকে লইয়া এক তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে। অরবিন্দ এতদিন শুধু বাংলা দেশের নেতা ছিলেন; কিন্তু এক সপ্তাহেরও অল্পকাল মধ্যে তিনি এখন সমস্ত ভারতবর্ষে বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। বন্দেমাতরম্ মোকদ্দমার এই প্রথম ফল দেখা গেল। কিন্তু ইহার ২য় ফল—অরবিন্দের পক্ষে আরও বেশী গুরুতর। ১৯০২ খৃঃ হইতে অরবিন্দ বাংলা-দেশে গুপ্ত-সমিতির প্রবর্ত্তক একজন গোপন বিপ্লবী ছিলেন। বন্দেমাতরম্-এর সম্পাদক-সত্ত্বেও বিপিনচন্দ্রের নামই প্রকাশ ছিল, অরবিন্দের নাম অ-প্রকাশ ছিল। কিন্তু এই মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে ১৯০৭।আগষ্ট মাসে ৭ দিনেরও কম সময়ের মধ্যে অরবিন্দের নাম ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে প্রচার হইয়া পড়িল। অরবিন্দ প্রকাশ্য রাজনৈতিক নেতারূপে ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে একজন খুব বড় অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। গোপন বিপ্লবী হইতে প্রকাশ্য রাজনৈতিক নেতা—

এক মস্ত বড় পরিবর্ত্তন। অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের গতিপথে আমরা এই অকস্মাৎ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। ইহা অরবিন্দের পক্ষে ভাল কি মন্দ হইল, বলা কঠিন। তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস ইহার বিচার করিবে।

ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ, এম্পায়ার, মান্দ্রাজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়ট, মাহারাট্টা প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলি ১৬ই আগষ্টের পরে এবং ২২শে আগষ্টের পূর্বে অরবিন্দ সম্পর্কে এই মোকদ্দমা উপলক্ষ করিয়া যে-সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে, ২২শে আগষ্টের বন্দেমাতরম্ ঐসকল মন্তব্যের কতকাংশ তুলিয়া ছাপাইয়া দিয়াছে।

Madras Standard—বলে যে, বাংলার বাহিরে খুব অল্প লোকেই অরবিন্দের নাম শুনিয়াছে। এমন কি London Times পর্য্যন্ত এই ভুল ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছে যে, বন্দেমাতরম্ পত্রিকার শাঁসালো এবং ঝাঁঝালো প্রবন্ধগুলি সবই বিপিনচন্দ্র পালের লেখা। কিন্তু এখন সে ভুল দূর হইল, এখন সকলেই জানিতে পারিল যে—অরবিন্দই "the power behind the paper."

Mahratta—বলে, আমরা যখন প্রেসে যাইতেছি তখন এই মামলা সম্বন্ধে টেলিগ্রাফ পাইলাম। মিঃ অরবিন্দ ঘোষ I. C. S. পাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঘোড়ায় চড়িতে না-পারিয়া আজ তিনি যে-হাকিমের এজলাসে কয়েদীরূপে দণ্ডায়মান, যদি তিনি ঠিকমত ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন তবে ঐ বিচারক হাকিম হয় ত তাঁহার অধীনে নিম্নকর্ম্মচারী হিসাবে কাজ করিত।

Indian Patriot—বলে, বাংলা দেশের উদীয়মান যুবকদের মধ্যে অরবিন্দ সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাবান মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার দাবী করিয়া দুঃখ বরণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছেন। নতুবা রাজদ্রোহের অছিলায় জেলে গিয়া সস্তায় নাম কিনিবার মত হালকা ব্যক্তি তিনি নহেন।

"A man of very fine culture, his is a lovable nature, merry sparkling with wit and humour, ready in refined repartee. He is one of those men, to be in whose company is a

joy; and behind whose exterior, is a steadily glowing fire of unseen devotion to a cause."

এক Mr. Nevinson ছাড়া, এত অল্প কথায় এমন নিখুঁত ও নিপুণ ভাবে অরবিন্দের চরিত্র-চিত্র আর কেহ আঁকিতে পারেন নাই।

The Empire—বলে যে, ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ গণ্ডকল্য অরবিন্দ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া অনেক ভুল সংবাদ ছাপাইয়াছে। অরবিন্দের প্রকৃত নাম—Arabindo *Akroyd* Ghose. মিসেস বিভারিজের কুমারী নাম ছিল Miss Akroyd. মিস এক্রয়েড অরবিন্দের পিতা মিঃ কে. ডি. ঘোষের অতিশয় বান্ধবী ছিলেন। তাই মিঃ কে. ডি. ঘোষ তাঁহার প্রিয়তমা বান্ধবীর নামের সম্মানার্থে অরবিন্দের জন্মকালে তাঁহার নামের সহিত *Miss Akroyd*-এর নাম জুড়িয়া দিয়াছিলেন। (ইহা বিলাতী কায়দা। আর ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, অরবিন্দের পিতা তাঁহার জীবনে অকপটে বিলাতী সভ্যতা ও বিলাতী কায়দায় ভরপুর ছিলেন।) অরবিন্দ বিলাতে I. C. S. পরীক্ষায় চতুর্থ হইয়াছিলেন। ক্লাসিক ট্রাইপসে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শৈশব হইতে সুদীর্ঘ বৎসর বিলাতে বাস করিয়াও, দেশে ফিরিয়াই বিলাতী জীবনযাত্রার অভ্যাস ("English habits of life") একবারে পরিত্যাগ করিলেন।

তখনকার দিনে ইহা কম কথা নয়। অরবিন্দ এক পুরুষে সাহেব নন। তিনি দুই পুরুষে পাকা সাহেব। সেই সাহেবিয়ানা দেশে ফিরিবামাত্র ১৮৯৩ খৃঃ ছাড়িয়া দিলেন। এই সাহেবিয়ানা ছাড়ার মধ্যেও তাঁহার অকৃত্রিম স্বাদেশিকতা ও স্বজাতিপ্রেম প্রকাশ পাইল।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির এই তুমুল কোলাহলের মধ্যেই ২৬শে আগষ্ট অরবিন্দের মোকদ্দমার প্রথম শুনানী আরম্ভ হইল। ২৭শে আগষ্ট বন্দেমাতরম্ পত্রিকা খবর দিল:

"Yesterday on the opening of the Bande Mataram Case the students mustered strong in the Court premises and its neighbourhood. They were there to pay their tribute of respects to Srijut Arabindo Ghose. ··· Students were assaulted by the police."

গভর্ণমেণ্টের পক্ষে Mr. Gregory ধূমধামের সহিত তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—"This prosecution is in consequence of the publication", অর্থাৎ যুগান্তরের প্রবন্ধ যে রাজদ্রোহমূলক তাহাতে ভূপেন্দ্রনাথের জেল হওয়াতেই প্রমাণ হইয়াছে; সুতরাং ঐ প্রবন্ধের ইংরাজি অনুবাদ পুনরায় প্রকাশ করা অবধারিতরূপে অপরাধমূলক। ২য় প্রবন্ধ, "Politics for Indians" অথবা "India for Indians" (আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত সুরে) রাজদ্রোহসূচক—("The whole *tone* of this article is of a seditious character.")। এখন শুধু বিবেচ্য অরবিন্দের উপর এই প্রবন্ধগুলির দায়িত্ব আরোপ করিয়া তাঁহাকে সাজা দেওয়া যায় কি-না? উত্তম বক্তৃতা! কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ প্রবন্ধগুলির দায়িত্ব অরবিন্দের স্কন্ধে আরোপ করিবার যথেষ্ট প্রমাণ শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। প্রমাণাভাবে অরবিন্দ খালাস পাইলেন। যুগান্তরের প্রবন্ধটির ইংরেজী অনুবাদের হেডলাইন হইতেছে—"Dispelling Of Fear", অর্থাৎ কি-না ভয় দূর করা।

বিপিনচন্দ্রের বিবেক ও তাঁহার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধঃ বন্দেমাতরম্ কাগজখানি একটা কোম্পানীর অধীনে চলিতেছিল। সেই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন রাজা সুবোধ মল্লিক। তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণের পর পুলিশ বুঝিতে পারিল যে, বিপিন পাল এক্ষণে সম্পাদক হিসাবে না হউক অন্ততঃ লেখক হিসাবে এই পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সুতরাং অভিযুক্ত প্রবন্ধগুলির লেখকই বা কে আর ইহার সম্পাদকীয় দায়িত্বই বা কাহার—একথা বিপিন বাবু বিলক্ষণ অবগত আছেন। কাজেই বিপিন পালকে সাক্ষী তলব করা হইল। ঘটনাচক্রে বিপিন পাল জড়িত হইলেন। একটা নূতন ফ্যাসাদ আসিয়া জুটিল।

মিঃ সি. আর. দাশ তখন বিপিনচন্দ্রের অনুগামী, অন্তরঙ্গ ব্যক্তি। মিঃ দাশ বিপিন বাবুকে বলিলেন যে—দেখুন, আপনি মাদ্রাজে যে প্রলয়ঙ্কর বক্তৃতা চারি মাস আগে দিয়াছেন তাতে লাজপৎ রায়ের মত আপনাকেও গভর্ণমেণ্ট অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মান্দালয় দুর্গে নির্ব্বাসনে পাঠাইতে পারে (লাজপৎ তখন মান্দালয় দুর্গে বন্দী ছিলেন)। আর যদি এই মোকদ্দমায় আপনি সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন, তবে আদালত-অবমাননার জন্য

আপনার বড় জোর ছয় মাস জেল হইবে। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মান্দালয় দুর্গে বন্দী হওয়ার চেয়ে ছয় মাস জেল অধিকতর লোভনীয় শাস্তি। আবার অন্যদিকে দেখুন, আপনি সাক্ষ্য না দিলে পুলিশ প্রমাণাভাবে অরবিন্দকে জেলে দিতে পারে না। শুধু তা-ই নয়, পুলিশ বন্দেমাতরম্ পত্রিকাখানিকেও বাজেয়াপ্ত করিতে চায়। আপনি সাক্ষ্য না দিলে কাগজখানিও বাঁচিয়া যায় এবং বাংলায় নূতন চরমপন্থীদলও জখম হয় না। সুতরাং দেশের জন্য এই vicarious martyrdom আপনি করুন। কিছুটা ইতঃস্তত করিয়া বিপিন বাবু রাজী হইলেন। বিপিন বাবুর সাক্ষ্য না দেওয়ার কৈফিয়তের খসড়া রাতারাতি মুসাবিদা হইয়া গেল। মুসাবিদায় মিঃ দাশের মুন্সীয়ানা ছিল।

ঐ ২৬শে আগষ্ট Mr. Kingsford এর আদালতে বিপিনচন্দ্র সাক্ষীমঞ্চে দাঁড়াইলেন এবং উদগ্রীব জনতার কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে নিম্নলিখিত জবাব দাখিল করিলেন—

"I have conscientious objection against taking part in a prosecution which I believe to be unjust and injurious to the cause ot popular freedom and the interests of public peace."—(*August 26th,* 1907)

ইতিহাসে একাধিক কারণে বিপিনচন্দ্রের এই অভিনব অপ্রত্যাশিত জবাবের গুরুত্ব খুব বেশী। এই শ্রেণীর জবাব আইন-অমান্য ও অসহযোগের যুগে যদি মহাত্মা গান্ধীও দিয়া থাকেন, তবে তিনিও স্বদেশী যুগের বিপিন-চন্দ্রের এই জবাবকেই অনুকরণ করিয়াছেন—না হয় বলিলাম, অনুসরণ করিয়াছেন।

বিপিনচন্দ্র বলিলেন যে, সাক্ষ্য দিতে তাঁহার বিবেক নিষেধ করিয়াছে। বিবেকের এই রকম নিষেধ করিবার হেতু কি? হেতু আছে। সাক্ষ্য দিলে লোকের স্বাধীনতা ও শান্তির ব্যাঘাত জন্মিবে। বিনা কারণে বিবেক নিষেধ করে নাই। অতএব বিপিনচন্দ্র লোকের স্বাধীনতার জন্য ("cause of popular freedom") সাক্ষ্য দিবেন না; আইন অমান্য করিবেন, অসহযোগ করিবেন, জেলে যাইবেন। ইহাই বাংলার স্বদেশী যুগের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance)। অরবিন্দ বলেন—বিপিনচন্দ্রই নিষ্ক্রিয়

প্রতিরোধের প্রথম প্রবর্ত্তক ও প্রচারক। আমরা দেখিলাম—শুধু প্রচারক নন, তিনিই ইহার প্রথম দৃষ্টান্তও ইংরেজের আদালতে দাঁড়াইয়া দেখাইলেন। গান্ধীযুগের অসহযোগ আন্দোলনের আইন অমান্যের কথা তখন অনেক দূরের, অনেক পরের ইতিহাস। আগের ইতিহাস না জানিলে, পরের ইতিহাস বুঝা যাইবে না। বাঙ্গালীকে আগের এবং পরের দুই ইতিহাসই দেখিতে হইবে। মাত্র ৫০৲ টাকার জামিন মুচলিকা লইয়া বিপিনচন্দ্রকে সেদিনকার মত ছাড়িয়া দিয়া পরের দিন আসিতে বলা হইল। কিন্তু পরের দিনও আদালতে উপস্থিত হইয়া তিনি ঐ একই কথা বলিলেন—

"I have conscientious objection to take part or swear in these proceedings. I refuse to answer any question in connection with this case."

এরই নাম passive resistance—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ! আদালত শুদ্ধ লোক অবাক! এ কী কাণ্ড! আদালতে দাঁড়াইয়া আদালতের হুকুম অমান্য!

বালক সুশীল সেন ঐ দিন এরি মধ্যে আবার সঙ্গে সঙ্গে একটা সক্রিয় প্রতিরোধ ঘটাইয়া বসিল। এইদিন আদালত প্রাঙ্গনের ভিড় সরাইবার জন্য পুলিশ জনতাকে প্রহার করিতেছিল। সুশীল সেন নামে ১৪ বছরের একজন বালক এইরূপে মার খাইয়া আদালতগৃহে বিপিনচন্দ্রের দৃষ্টান্ত দেখিয়াও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বন করিতে পারে নাই। প্রহারক ইনস্পেক্টর হেনরীকে পাল্টা আক্রমণ করিয়াছিল এবং কয়েকটা উত্তম ঘুষিও দিয়াছিল। ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড ঐ ১৪ বছরের বালককে ১৫টি প্রচণ্ড বেত্রাঘাতের দণ্ড দিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল। ১৪ বৎসরের বালক কি-না ঘুষি দেয় সাহেব ইনস্পেক্টারকে—কতবড় দুঃসাহস! ম্যাজিষ্ট্রেটের রাগ হইবারই কথা।

ফল কী হইল? ফল অত্যন্ত খারাপ হইল! সুশীল পরে অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত বারীন্দ্র-পরিচালিত গুপ্তসমিতিতে যোগ দিয়াছিল। মুরারিপুকুর বাগানে সে ভর্ত্তি হইয়াছিল। হেমচন্দ্র কানুনগো লিখিয়াছেন—

"বোমা দিয়ে মানুষ মারবার কেরদানী শেখাবার জন্য বারীনের নিকট দু'একজন যুবক চেয়েছিলাম। প্রথমে পাঠিয়েছিল শ্রীমান সুশীলকে। সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবকে মারবার আদেশ দিয়েছিলেন কর্ত্তারা।"—(বাং—বিঃ—প্রঃ; পৃঃ ২৪১)

দেখা গেল বারীন্দ্র এই সুশীলকে দিয়াই মিঃ কিংসফোর্ডকে পাল্টা গুপ্ত-হত্যা করিবার প্ল্যান করিয়াছিল। ইহা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়। ইহা বিপিনচন্দ্রের মতবিরুদ্ধ। হইলে কি হয়—প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পাশাপাশি বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতিও আঁকিয়া-বাঁকিয়া অন্ধকারে নিজের পথ করিয়া চলিতেছে। বাংলায় স্বদেশী যুগে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধও আছে আবার গুপ্তসমিতিও আছে। বিপিনচন্দ্রও আছে, আবার অরবিন্দও আছে। একজন আছে আর একজন নাই—একথা ত বলা চলে না।

আরো দেখা গেল, মি: কিংসফোর্ডের ১৫টি নির্মম বেত্রাঘাত ১৪ বছরের বালক সুশীলকে মুরারিপুকুরের বাগানে বারীনদের বোমা-রিভলবারের দলে পাঠাইয়া দিল। রাজ-অত্যাচার বিপ্লবীদের সাহায্য করে—এ কথার প্রমাণও হাতে হাতেই পাওয়া গেল। আর হয়ত এই জন্যই অরবিন্দ লিখিয়াছেন—"আরো অত্যাচার চাই" ("Wanted more Repression"—*Bande-mataram ; 18th July, 1907*)। কেননা, অত্যাচার বিপ্লবীদের দল পুষ্ট করিয়া দেয়, সুতরাং সাহায্যই করে। বিপিনচন্দ্র অত্যাচার চান না, কেননা বিপ্লবীদের দলপুষ্ট করা তাঁর অভিপ্রেত নয়। এবং তিনি আশঙ্কা করেন, অত্যাচারে জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ : ২রা সেপ্টেম্বর বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের উপর নিম্নের লেখাগুলি লিখিলেন। ইহা যে বিপিনচন্দ্রের লেখা, তার আভ্যন্তর প্রমাণ আছে।

"It was at a singularly happy moment that Bengal hit upon the plan of Passive Resistance. The method has proved exceptionally successful during the short time it has been resorted to ; and the wonderful rapidity with which it has spread to other provinces, bears an eloquent testimony to its suitability and efficacy in the present stage of our unity and preparedness. The natural antipathy to violence of the Hindu temper is also a reason of the growing recognition of this method of resistance. Our unbounded capacity for suffering too, opens up a prospect of its success, which can-

not be expected in European countries".—*Bandemataram*; *2nd Sept., 1907.*

ইউরোপে নয় ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ হিন্দুর জাতীয় চরিত্রে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের উপযোগিতা সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র এমন একটা বিশ্লেষণমূলক আলোচনা ও মন্তব্য করিলেন—যার প্রত্যেকটি যুক্তিই অসহযোগ ও আইন অমান্যের যুগে মহাত্মা গান্ধীর মুখে অবিকল প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তথাপি আমাদের 'কিন্তুর' অবকাশ রহিয়াই গেল। বিশ্লেষণের বিশ্লেষণ মুশকিলের কথা। অথচ না বলিলেও নয়।

পড়িয়া পড়িয়া মার খাওয়া, হিন্দু চরিত্রের বিশেষত্ব ("unbounded capacity for suffering")—ইহা কি সাচ্চা কথা? কুমিল্লা-জামালপুরের হিন্দুরা মুসলমানের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িয়া মার খাইয়াছে অথবা পলাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে কি কুমিল্লা-জামালপুরের নির্য্যাতিত হিন্দু-সম্প্রদায়ের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বনের উপযোগিতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে? মারাঠার হিন্দুকেশরী তিলক মহারাজ কি ঐ ঘটনায় বাংলার হিন্দু-সম্প্রদায়কে মুসলমানের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন? তা বলেন নাই। উল্টা কথাই বলিয়াছেন। আর অরবিন্দ? তিনি তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষায় প্রতিকারে অসমর্থ বাংলার ভীরু হিন্দু-সম্প্রদায়কে পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে বলিয়াছেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা বলেন নাই।

আর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বনে হিন্দু-চরিত্রের উপযোগিতার উপর এমনভাবে এতটা জোর দেওয়া হইয়াছে যে, মুসলমানের জাতীয় চরিত্রে ইহার সম্পূর্ণ অনুপযোগিতাই যেন আশঙ্কা করা হইয়াছে। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সাম্প্রদায়িক হইলে ত চলিবে না, জাতীয় হওয়া চাই। যদি মুসলমান ভ্রাতাগণ ইহার উপযুক্ত আধার না হন, তবে ইহা জাতীয় হইবে কি করিয়া? এবং জাতীয় না হইলে ইহার প্রয়োগে এদেশে ইংরেজের শাসন অচল (paralysed) হইবার সম্ভাবনা আছে কি? আমাদের বিশ্বাস—নাই।

১৯২১ খৃঃ বরিশালে বিপিনচন্দ্র বলিয়াছেন—

"Our movement in 1905 and 1906 and 1907 failed, because it did not reach the stage of a great National Strike."

১৯০৯ খৃঃ আলিপুর বোমার মামলায় মিঃ সি. আর. দাশ বলিয়াছিলেন—

"If passive resistance could be so well-organised that all the people refused to pay taxes, there would be firing of guns and the result of that would be that the people would be weltering in blood."

কেন? কেন, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ স্বদেশী যুগে Great National Strike এ গিয়া পৌঁছিল না এবং সমস্ত লোক একসঙ্গে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিল না? যে কারণে স্বদেশী যুগে বিপিনচন্দ্রের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সার্থক হইতে পারিল না, সেই কারণেই গান্ধী যুগে আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন সার্থক হইতে পারে নাই। কী সে কারণ? এখনো চিন্তার রাজ্যে তাহার ঠিক ঠিক বিশ্লেষণ হয় নাই। সক্রিয় প্রতিরোধ সম্ভব নয় বলিয়াই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অবতারণা। সহযোগে কিছু পাওয়া গেল না বলিয়াই অসহযোগ। জাতি অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্র না হইলে স্বাধীনতা মিলিবে না বলিয়াই অরবিন্দের বৈপ্লবিক অভিযানমুখে গুপ্ত-সমিতির বোমা-রিভলবারসমন্বিত সন্ত্রাসবাদ। রাজ্যশাসন ব্যাপারে কার্য্য-কারণসম্পর্ক সর্ব্বদাই বিদ্যমান। সহসা কোন বাদ (ism) বা বিবাদ রাজনীতিক্ষেত্রে অঙ্কুরোদ্গম করে না। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বল, সন্ত্রাসবাদ বল—ইহার উদ্ভবের কি কোন কারণ নাই? নিশ্চয়ই আছে। বিনা কারণে কিছু হয় না। আদালতে সাক্ষ্য না দেওয়ার দরুন ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ হইতে ধন্য ধন্য করিয়া বিপিনচন্দ্রকে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অভিনন্দন পাঠাইল। এপ্রিল মাসে বিপিনচন্দ্র মাদ্রাজে দুই হাতে চরমপন্থী রাজনীতির বীজ ছড়াইয়া আসিয়াছিলেন। এ অভিনন্দন তারই ফল।

১১ই সেপ্টেম্বর রামানুগ্রহনারায়ণ সিংহের এজলাসে মিঃ সি. আর. দাশ বিপিন পালকে লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন —

Mr. C. R. Das—Your Honour will please allow the accused (Bipin Pal) to sit by me?

Mr. Sinha—Yes.

তারপর মিঃ সি. আর. দাশ বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—

"I honestly believe that prosecutions like that of Bande-mataram are unjust and injurious, because they are subversive of the rights of the people and injurious because they

are calculated to stifle freedom of thought and speech, nor are they justified in the interests of the public peace."

মিঃ দাশ বিপিন বাবুর জবাবের পুনরাবৃত্তি অক্ষরে অক্ষরে করিলেন। তারপরে বিবেকের কথা আসিল। মানুষের বিবেক এমনি এক শাণিত তরবারি, যাহা দ্বারা ধর্ম্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের এমন কোন বন্ধন নাই যাহা ছেদন করা যায় না।

মিঃ দাশ বলিলেন—

"Is a man, who acts according to the dictates of his conscience, to be prosecuted; then all that he can say is that in the history of nations, no right was ever secured anywhere in the world except through suffering of the individuals.

"I stand upon my right which is the birth-right of every human being to say that : my conscience is against this, and my conscience tells me in emphatic language not to assist in a prosecution of this iniquitous character, and if for this I am to be punished, well—*let it be so.*"

মিঃ দাশ একেবারে খাপখোলা বিবেক-তলোয়ার ঘুরাইয়া দিলেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা এ বক্তৃতায় মিঃ দাশ বলিলেন না বটে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রেরণা যে মানুষের বিবেক হইতেই আসে, ইহা তিনি খুব জোরের সঙ্গেই বলিলেন।

১৮২৩ খৃঃ এতদ্দেশীয়দের সংবাদপত্রে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারের জন্য রাজা রামমোহন (ক) Memorial to the Supreme Court, এবং (খ) Appeal to the King in Council—এই দুইটি দরখাস্তে যে-সকল অকাট্য যুক্তি ও উদার মতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, মিঃ দাশের কণ্ঠে তারি প্রতিধ্বনি ১৯০৭ খৃঃ আমরা শুনিতে পাইলাম। বাংলার উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যে যে যোগসূত্র আছে, তাহাও যাহারা দেখিবার তাঁহারা দেখিলেন।

হাকিম বড়ই মুশকিলে পড়িলেন। কৌসুলী যেখানে হেঁকে বলে, "Let it be so"—যাক্ আমার মক্কেল জেলে, কুছ্ পরোয়া নেহি, সেখানে বেচারী হাকিম বিপিনচন্দ্রকে জেলে ছাড়া ত আর কোথাও পাঠাইতে পারেন না।

আইন বড় বেয়াড়া জিনিস। সে ত বিবেকের দোহাই মানিবে না। আর প্রত্যেকের বিবেকের দোহাই মানিলে আইনের অস্তিত্বই থাকিবে না।

বিপিনচন্দ্রের বিনাশ্রমে ছয় মাস কারাদণ্ড : ইহার চেয়ে বেশী শাস্তি দিবার অধিকার আইনের বিধানে হাকিমের ছিল না। থাকিলে হয়ত দিতেন।

যুগান্তর মোকদ্দমায় ভূপেন্দ্রনাথ ২৪শে জুলাই যখন এক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তখন ২৫শে জুলাই বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দ নিজে লিখিয়াছিলেন—

"To meet prosecution with indifference, to take punishment quietly as a matter of course, with erect head and undimmed eyes—this is the spirit with which we must conquer."—*Bandemataram ; 25th July, 1907.*

বিপিনচন্দ্র অরবিন্দের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া হাওড়া ষ্টেসন হইয়া বকসার জেলে গমন করিলেন। পরের দিন—

১২ই সেপ্টেম্বর বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দ "The Martyrdom Of Bepin Chandra"—জোর প্রবন্ধ লিখিলেন।

অরবিন্দ জেলে গেলেন না কেন : মিঃ গ্রেগরী ১২ই সেপ্টেম্বর অরবিন্দকে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধগুলির জন্য দায়ী এবং অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া বক্তৃতা শেষ করেন। এই দিনই সন্ধ্যাকালে বিপিনচন্দ্র কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ছয় মাসের জন্য বকসার জেলে গমন করেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় ১৩ই আগষ্ট "এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে"—এই রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধটি লেখার দরুণ ৩১শে আগষ্ট গ্রেপ্তার হইয়া বিচারের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। উপর্যুপরি অনেকগুলি ঘটনা একসঙ্গে ঘটিয়া এই সময়কার প্রত্যেকটি দিনকে কণ্টকিত করিয়া তুলিতেছে। এইসব সঙ্গীন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়া অরবিন্দের বন্দেমাতরম্ মোকদ্দমা চলিতেছে। ১৬ই সেপ্টেম্বর অরবিন্দের পক্ষে মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি বিপিন পালের এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য না দিয়া আইন অমান্য ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধমূলক জেলে গমন সমর্থন করিলেন না। মিঃ সি. আর. দাশ ও মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী একই মোকদ্দমায় একই পক্ষ সমর্থন

করিতে গিয়া তাঁহাদের উভয়েরই বক্তৃতায় মতবিরোধ প্রকাশ করিলেন—ইহার কারণ কি? প্রথম কারণ বলা যাইতে পারে—এই দুই মহারথী কৌঁসুলী এক ছাঁচের মানুষ ছিলেন না, এক ধাতুতে গঠিত ছিলেন না। দ্বিতীয় কারণ—বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দের রাজনৈতিক মতবাদ, কর্ম্মপদ্ধতি ও উভয়ের চরিত্রগত পার্থক্য। বিপিনচন্দ্র আগে হইতে স্থির করিয়াছিলেন যে—তিনি জেলে যাইবেন আর অরবিন্দ স্থির করিয়াছিলেন যে, যদি সম্ভব হয় তিনি জেলে যাইবেন না। এই মোকদ্দমায় অরবিন্দের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে সেই অভিযোগ অরবিন্দ স্বীকার করিলেন না, অস্বীকার করিলেন অর্থাৎ অরবিন্দ ঐ রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধগুলি লিখেন নাই, কাজেই লেখক হিসাবে তিনি দায়ী নহেন। আর যেহেতু বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক তিনি নহেন, কাজেই সম্পাদক হিসাবেও তিনি দায়ী নহেন। মিঃ গ্রেগরী তাঁহার পুলিশবাহিনীসহ অরবিন্দকে ঐ প্রবন্ধগুলির লেখক বলিয়াও প্রমাণ করিতে পারিলেন না। অথবা অরবিন্দকে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক বলিয়াও প্রমাণ করিতে পারিলেন না। অরবিন্দ যদি লেখকও না হন এবং সম্পাদকও না হন, তবে আদালত তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারেন কি করিয়া? প্রমাণাভাবে আইনের চক্ষে আদালত তাহা পারেন না। আদালতের মনে যদি অরবিন্দ অপরাধী বলিয়া সন্দেহও হইয়া থাকে, তথাপি প্রমাণাভাবে এই সন্দেহ নাকচ করিতে হইবে এবং এই সন্দেহের সুযোগ (benefit of doubt) আসামী অরবিন্দ পাইবেন; পাইবেন কী—পাইলেন। প্রমাণাভাবে আদালত অরবিন্দকে ছাড়িয়া দিলেন। কাজেই অরবিন্দের জেলে গমন হইল না। ২৩শে সেপ্টেম্বর রায় প্রকাশিত হইল। এই মোকদ্দমায় জাপানের টোকিও সহর হইতে অরবিন্দের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া.কে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন ("...a letter written to Aravindo from Tokio sympathising with him in his trouble with the Bandemataram trial.") । জাপানে অরবিন্দের এমন দরদী কে? ইনি কি ঠাকুর সাহেব, না অপর কেহ?

বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক কে ঃ বিপিন পালকে সম্পাদক করিয়াই বন্দেমাতরম্ পত্রিকা ১৯০৬।৭ই আগষ্ট ভূমিষ্ঠ হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মাত্র প্রথম আড়াই মাস বিপিন পাল সম্পাদক ছিলেন; পরে এক বৎসর ছয় মাস কাল অর্থাৎ ১৯০৮।৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত অরবিন্দ সম্পাদকের কর্তৃত্ব গ্রহণ

করিয়াছেন, কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। ১৯০৬।ডিসেম্বর (কংগ্রেসের সময়) মাত্র ১ দিনের জন্য অরবিন্দের নাম সম্পাদকরূপে ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পরের দিন আর ঐরূপ ছাপান হয় নাই। কেননা, অরবিন্দ স্পষ্ট নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই নিষেধ হইতে প্রমাণ হয় যে, তিনি ইহার সম্পাদকীয় দায়িত্ব নিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। ১৯০৮।মে হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত আবার ছয় মাস বিপিনচন্দ্রই সম্পাদক হন, কেননা তখন অরবিন্দ বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হইয়া কারাবাস করিতেছিলেন। সুতরাং বন্দেমাতরমের প্রথম আড়াই মাস ও শেষ ছয় মাস বিপিনচন্দ্রই সম্পাদক, কিন্তু মাঝের দেড় বৎসর কেহই সম্পাদক নহেন—বিপিনচন্দ্রও নন, অরবিন্দও নন। অরবিন্দ দেড় বৎসর সম্পাদকের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে অরবিন্দের মনের কী অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছে? তিনি কেন প্রকাশ্যে সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন না?

মিঃ সি. আর. দাশ আলীপুর বোমার মামলায় ইহার এক সাফাই উত্তর দিয়াছেন যে—যেহেতু অরবিন্দ জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং জাতীয় বিদ্যালয়ের কর্ত্তারা রাজনীতির সংস্রব হইতে জাতীয় বিদ্যালয়কে দূরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন, অতএব অরবিন্দ চরমপন্থী রাজনীতির মুখপত্র বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক হইতে পারেন নাই। কিন্তু একথা টেকসই নয়, কেননা ১৯০৭।২রা আগষ্ট অরবিন্দ জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দেন এবং তাহার পর হইতে ৯ মাস তিনি প্রকাশ্যে অবশ্যই বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক হইতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তিনি হন নাই, সম্পাদকের দায়িত্ব লইতে অরবিন্দ বরাবর অনিচ্ছুক ছিলেন। বন্দেমাতরম্ মোকদ্দমায় মিঃ গ্রেগরী এবং আলীপুর বোমার মামলায় মিঃ নর্টন, এই দুই ধুরন্ধর কৌঁসুলীর কেহই আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও অরবিন্দকে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক বলিয়া আদালতে প্রমাণ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে মিঃ নর্টন বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"I do not care whether he (Aurobindo) was editor or not. I say he is the paper itself. This paper was born in conspiracy."

মিঃ সি. আর. দাশ বলেন—"In only one issue his (Aurobindo's)

name was published as editor. But in the next issue it was taken off. I do not admit for a moment that he (Aurobindo) was editor of the 'Bandemataram'. But I do not for a moment deny that he was connected with and certainly he was connected with it as a contributor. Aurobindo was not responsible for anything that appeared in the 'Bandemataram".

এই সব ঘোরপ্যাঁচওয়ালা কথার অন্তরালে একটা সাদা কথা বলা দরকার। কথাটা এই যে—গুপ্তসমিতি ও বিপ্লববাদ সম্পর্কে অরবিন্দ ছিলেন ইহার পক্ষে, আর বিপিনচন্দ্র ছিলেন ইহার বিপক্ষে। এই দুই বিরুদ্ধ-মতবাদী নেতার লেখা সম্পাদকহীন বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় পর পর ছাপা হইয়াছে, কোন্‌টা কার লেখা বুঝা কঠিন। মিঃ সি. আর. দাশ এই সুযোগে বিপিনচন্দ্রের লেখা অরবিন্দের বলিয়া আদালতে চালাইয়া দিয়াছেন। সাহিত্য বা ইতিহাস আদালত নয়, সুতরাং এই উভয়ের প্রবন্ধগুলি বাছাই করিয়া পৃথক পৃথক পুস্তক আকারে এখন ছাপান উচিত, নতুবা বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দের মতবাদ তুলনা করিবার সুযোগ আমরা পাইব না। বন্দেমাতরম্ দুই বৎসর তিন মাসে যে ইতিহাস রচনা করিয়াছে, সেই ইতিহাসের স্বরূপও আমরা বুঝিতে পারিব না এবং স্বরূপ বুঝিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা কোনও রূপের জন্ম দিতে পারিবে না; "স্বরূপ বিহনে, রূপের জনম কখনও নাহিক হয়।"

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও বিপিনচন্দ্র পাল : ২৩শে সেপ্টেম্বর অরবিন্দ খালাস পাইলেন। ঠিক ঐদিন আবার উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা' মোকদ্দমায় "I accept the entire responsibility of the paper and the article in question" বলিয়া বিপিন পালের চেয়েও জোরালো এবং ধারালো এক জবাব আদালতে দাখিল করিলেন। পরের দিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর গ্রীয়ার পার্কে এক সভা হইল। সভার উদ্দেশ্য—বিপিন পাল যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করিয়া অরবিন্দের মোকদ্দমায় সাক্ষ্য না দিয়া জেলে গমন করিয়াছেন, তজ্জন্য বিপিনচন্দ্রের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা। ১২ হাজার লোক এই সভায় যোগদান করিয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায়, জনমত কোন্ দিকে প্রবাহিত হইতেছিল। এই সভার সভাপতি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।

সভা আরম্ভ হইবার অনেক পরে তিনি আসিলেন এবং আসিয়া বলিলেন যে, যদিও তিনি বিপিন পালের কারাবাসের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন, তথাপি বিপিনচন্দ্রের চরমপন্থীয় রাজনৈতিক মতের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য নাই অর্থাৎ ধার্মিক খৃষ্টানের মত সুরেন্দ্রনাথ পাপীকে ঘৃণা করিলেন না, কিন্তু পাপকে ঘৃণা করিলেন! এই কথা কয়টি বলিয়াই কৃষ্ণকুমার মিত্রকে সভাপতি করিয়া তিনি অবিলম্বে প্রস্থান করিলেন। সভার লোকে ছিঃ ছিঃ করিতে লাগিল। বন্দেমাতরম্ পত্রিকা এই ঘটনা উপলক্ষে নিম্নের লেখাটি লিখিলেন—

"*A Lost Opportunity*: I come to bury Bepin, not to praise him – might almost be said of Sjt. Surendranath at the Parsibagan on Wednesday. We seriously think that the leader of Bengal failed by a great deal to rise to the height of the occasion in his speech in Grear Park. The twelve thousand men who had assembled all round him expected an utterance that would breathe the same spirit that had inspired Bepin Chandra Pal in the witness-box." —*Bandemataram*; *27th September, 1907.*

এ লেখাটি অরবিন্দের হওয়া অসম্ভব নয়।

সন্ধ্যার মোকদ্দমা ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ঃ ১৩ই আগষ্ট সন্ধ্যা কাগজে উপাধ্যায় এক প্রবন্ধ লিখিলেন—'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে।' এই প্রবন্ধটি রাজদ্রোহমূলক। অতএব ৩১শে আগষ্ট উপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইলেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর মিঃ সি. আর. দাশ হাইকোর্টে দরখাস্ত করিলেন যাহাতে মিঃ কিংসফোর্ডের এজলাসে এই মামলার বিচার না হয়; কিন্তু জজ কেস্প্যাস মিঃ দাশের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মিঃ হিউম মোকদ্দমার বিবরণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই মিঃ দাশ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের জবাব দাখিল করেন।

"I accept the entire responsibility of the paper and the article in question. But I don't want to take any part in the trial, because I do not believe that in

carrying out my humble share of this God-apppointed mission of 'Swaraj', I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is, and must necessarily be, in the way of our National development."

যে রাজশক্তি বিদেশী এবং যাহা স্বভাবতই আমাদের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী, তাহার নিকট উপাধ্যায় কোন কৈফিয়ৎ দিবেন না। দেশের জন্য তিনি যাহা ভাল বুঝিয়াছেন তাহা করিয়াছেন। গত শতাব্দীতে এদেশে ইংরেজের আদালতে এরকম জবাব একখানি দাখিল হয় নাই। ইহা স্বদেশী যুগের নূতন সৃষ্টির নূতন ইতিহাস। মোকদ্দমা রুজু হওয়ার পর ঐ সন্ধ্যা কাগজেই উপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন—'ভূপেনের বেলা জোড়া রম্ভা আর সন্ধ্যার বেলায় বাঘ লম্বা'। এ রকম সব বিটকেল কথা উপাধ্যায় বেপরোয়াভাবে লিখিতেন। আরও যে-কিছু হেঁয়ালিপূর্ণ কথায় রাজদ্রোহের গন্ধ পাওয়া গিয়াছিল, সেগুলি তুলিয়া দিতেছি—

যুগান্তরের রক্তারক্তি, টিকটিকির ফাটিল পিত্তি।
ফিরিঙ্গীদের কৃপায় দাড়ি গজায়।
আমাদের পোয়াবারো,
ফিরিঙ্গীদের তেরো॥
ঢিলটি মারিবে
পাটকেলটি পাইবে॥

দুশো গজা তিলে খাজা
কালীঘাটের জোড়া পাঁঠা
একটা কালো একটা সাদা।
শ্রীমুখে দু'রূপ কথা।
গোদা পায়ের ভোঁথা লাথি,
আজ ত্রয়োদশী তিথি
বড় সিদ্ধিদায়ী॥

২রা অক্টোবর মিঃ দাশ, মিঃ কিংসফোর্ডের খামখেয়ালীর স্বরূপ 'ইচ্ছা' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটির জেরা শেষ করিয়া আদালতগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যান;

হাকিম সেদিন ভাল মেজাজের পরিচয় দেন নি। উপাধ্যায় মিঃ দাশকে বলিলেন—"তুমি বেশ করেছ ; আমি ইংরেজের আদালত মানি না, আমি জেরা করিব না। আমি তোমাকে বলিতেছি, ইংরেজের সাধ্য নাই আমাকে জেলে দেয়।" মিঃ দাশ বলিয়াছেন, "উপাধ্যায় আমার বাড়ীতে আসিয়া মোকদ্দমা বুঝাইতে বুঝাইতে অধিক রাত্রিতে আর গৃহে ফিরিয়া যাইত না, আমার বাড়ীতেই বিছানা থাকা সত্বেও ভূমিশয্যায় নিদ্রাসুখ উপভোগ করিত।"

২৭শে অক্টোবর ক্যাম্বেল হাসপাতালে উপাধ্যায়ের মৃত্যু হইল, কাজেই ইংরেজের আদালতে তাঁহাকে আর যাইতে হয় নাই।

এই তেজস্বী ব্রাহ্মণের অকস্মাৎ মৃত্যুতে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। কি আশ্চর্য্য! যেই কথা সেই কাজ—যাহা বলিল তাহাই হইল! উপাধ্যায়ের মৃত্যু সম্পর্কে অরবিন্দ বারুইপুর বক্তৃতায় বলিলেন—

"We preach the gospel of unqualified Swaraj, and it is for this that Bhupen (Dutt) and Upadhyaya refused to plead before the alien court. Upadhyaya saw the necesssity of realising Swaraj within us and hence he gave himself up to it. He said that he was free and the Britishers could not bind him ; his death is a parable to our Nation"—*Baruipur Speech, 12th April, 1908—Aurobindo Ghose.*

লক্ষ্য করিবার বিষয় অরবিন্দ, ভূপেন দত্ত জেলে যাইবার ৮ মাস পরে এবং উপাধ্যায়ের মৃত্যুর ৫ মাস পরে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিলেন—ইহারা উভয়ে ইংরেজের আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন না করিয়া ঠিক কার্য্য এবং উচিত কার্য্য করিয়াছেন। এই যদি অরবিন্দের সুচিন্তিত অভিমত, তবে এক অতি গুরুতর প্রশ্ন উঠিবে যে—বন্দেমাতরম্ মোকদ্দমায় অরবিন্দ নিজে আত্মপক্ষ সমর্থন করিলেন কেন? আমরা এই প্রশ্নের গুরুত্ব অস্বীকার করিতে পারি না।

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ও মৌলবী লিয়াকত হোসেন : গভর্ণমেণ্ট এই সময় যে চণ্ডনীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার আক্রমণ হইতে এই দুই নির্ভীক স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তি নিস্তার পান নাই। ৪ঠা সেপ্টেম্বর বন্দে-

মাতরম্ পত্রিকা সংবাদ দিল যে, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, 'নবশক্তি'র সম্পাদক ও পরিচালক এবং অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি গিরিডিতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ("Arrest of Sjt. Monoranjan Guha Thakurta and others at Giridhi.")

২রা অক্টোবর বন্দেমাতরম্ লিখিলেন, মৌলবী লিয়াকত হোসেনকে কাপুরুষোচিতভাবে গভর্ণমেণ্ট আক্রমণ করিয়াছেন ("Cowardly persecution of Moul. Liakut Hussain.")।

১৬ই অক্টোবর মডারেট ভূপেন বসু গভর্ণমেণ্টের নিকট নাকে খত দিয়া মুচলিকা দিয়া আসিয়াছিলেন যে—(৩০শে আশ্বিন) ১৭ই অক্টোবর মিলনমন্দিরের ভূমিতে রাখিবন্ধনের সভায় কেহ লাঠি লইয়াও আসিবে না, আর রাজদ্রোহমূলক কোন বক্তৃতাও দিবে না। ৩০ হাজার লোক সভায় আসিয়াছিল এবং অধিকাংশের হাতেই লাঠি ছিল। মৌলবী লিয়াকত হোসেন তাঁহার অদ্ভুত বালকবাহিনীর হাতে লাঠি দিয়া সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের সমুন্নত মস্তকে লাল রংয়ের ফেজটুপী—ইসলামের বীরত্ব ও গৌরব বহন করিয়া আনিল। মতিলাল ঘোষ সভাপতি হইলেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা দিতে উঠিলেন। মডারেটরা তাঁহার কাছা টানিয়া ধরিলেন। কিন্তু চরমপন্থীদের উত্তেজক প্রেরণার চোটে তিনি এক লম্বা বক্তৃতা দিয়া ফেলিলেন!

৫ই নভেম্বর বন্দেমাতরম্ সংবাদ দিলেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম অমান্য করার দরুণ মৌলবী লিয়াকত হোসেনের ছয় মাস জেল হইয়াছে ("...Moulvi Liakut Hussain sent to jail for 6 months for disobeying Magisterial Orders.")

বাঙ্গালী এই সময় যে ইতিহাস রচনা করিয়াছে, ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হিসাবে তাহার গুরুত্ব খুব বেশী। কিন্তু বাঙ্গালীর সেই ইতিহাস আজিও লেখা হইল না। কবে হইবে কে জানে! এই ইতিহাসের মধ্যেই অরবিন্দ-চরিত্র বিকাশ লাভ করিয়াছে। অরবিন্দ-চরিত্রের বিকাশ এই ইতিহাস ছাড়া নয়, এই ইতিহাসের সহিত জড়িত।

বন্দেমাতরম্ মোকদ্দমায় অরবিন্দের আত্মপক্ষ সমর্থনের কৈফিয়ৎ: 'যুগান্তরের' বেলায় অরবিন্দ ভূপেন দত্তকে পরামর্শ দিয়াছিলেন

যে—'যুগান্তরে' প্রকাশিত যে প্রবন্ধগুলির জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগ হইয়াছে, ঐ প্রবন্ধগুলির ও কাগজের সম্পাদকের দায়িত্ব আদালতে স্বীকার করিয়া মাথা উঁচু করিয়া সোজা জেলে চলিয়া যাও। বেচারী ভূপেন দত্ত কিছুই জানেন না। জামালপুর হইতে সদ্য ফিরিয়া আসিয়াই 'যুগান্তর' পত্রিকা অফিসে বসিয়াছেন। ভূপেন দত্ত ঐ প্রবন্ধগুলি লেখেনও নাই, আর যুগান্তর কাগজের সম্পাদকও তিনি নহেন। সম্ভবতঃ যুগান্তর কাগজের সম্পাদক বলিয়া কেহই ছিলেন না, তথাপি গুরুর আদেশ মান্য করিয়া ভূপেন দত্ত অধরে মৃদু হাস্য আনিয়া ("with smiling face") ২৪শে জুলাই জেলে গমন করিলেন। ২৫শে জুলাই 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় অরবিন্দ ভূপেন দত্তকে বাহবা দিয়া প্রশংসা করিয়া লিখিলেন—"Bhupendra Nath Dutta imprisoned for telling the truth with too much emphasis." এখন প্রশ্ন, নিজের বেলায় অরবিন্দ এরূপ করিলেন না কেন? তিনি কি যথেষ্ট সাহসী নহেন? নতুবা পরোপদেশে যে পাণ্ডিত্য ও সাহস দেখাইলেন নিজের বেলায় তাহা হইতে পিছাইয়া গেলেন কেন? কেন? অরবিন্দের মন্ত্রশিষ্য হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"ভূপেন বাবুর বেলায় বীরত্ব-ব্যঞ্জক রাজদ্রোহিতার স্বীকারোক্তি দেওয়াবার জন্য "ক" বাবু (অরবিন্দ) অন্য নেতাদের নিয়ে উঠেপড়ে লাগলেন। ......পরে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বাবু 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকাতে রাজদ্রোহসূচক প্রবন্ধের জন্য অনুরূপ অবস্থাতে সমানভাবে অভিযুক্ত হয়ে ভূপেনবাবুর ঠিক উল্টো ব্যাপার করেছিলেন। তাতেও দেশে ধন্য ধন্য পড়ে গেছল। আমাদের লোকমতের বাহাদুরী নয় কি!"—(বাংলায় বিপ্লবপ্রচেষ্টা, পৃঃ ৩০০-৩০১)

হেমচন্দ্র স্পষ্টই অরবিন্দ-চরিত্রে অসামঞ্জস্য দেখিলেন এবং আমাদের দেশের লোকমতকে বলিলেন 'আহাম্মক'। হেমচন্দ্র লোকমতকে কড়া কথা কহিয়া অরবিন্দকেও কড়া সমালোচনা করিলেন।

শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"যুগান্তরের মোকদ্দমায় তিনি (অরবিন্দ) ভূপেন্দ্রনাথকে যেভাবে কাজ করিতে, যে-পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার পর তিনি কেন আত্মপক্ষ সমর্থন করিলেন, কেহ কেহ অরবিন্দকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অরবিন্দ তাঁহার কার্য্যের দ্বারা ও 'বন্দেমাতরম্' প্রবন্ধে তাঁহার কৃতকার্য্যের কারণ বুঝাইয়া দিলেন।"—(কংগ্রেস, পৃঃ ২০৯)

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার কোন্ সংখ্যায় অরবিন্দ তাঁহার কৃতকার্য্যতার কারণ বুঝাইয়া দিলেন, হেমেন্দ্র বাবু সেইটি আমাদের জানাইলে বড়ই উপকৃত হইতাম। আমরা 'বন্দেমাতরম্' অনুসন্ধান করিয়া উহা পাই নাই। অরবিন্দের কৈফিয়ৎ কি, না জানিয়াও আমাদের যাহা বক্তব্য তাহাই বলিতেছি।

১ম, হইতে পারে 'শিরদার তো সরদার' এই আদর্শ অরবিন্দের কর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না।

২য়, সেনাপতি ও সৈন্যকে একই নিয়মের অধীনে আনা যায় না। যুদ্ধে সৈন্যরাই বেশী মরে, সেনাপতি কম মরে। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই যদি সেনাপতি গিয়া তোপের মুখে প্রাণটা দেয়, তবে কি সেনাপতিহীন সৈন্যরা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে? ভূপেন জেলে যাইতে পারেন, অরবিন্দ পারেন না; গেলে যুদ্ধ চলে না।

৩য়, অরবিন্দ দায়িত্ব স্বীকার করিলে শুধু তাঁহারই জেল হইবে না, পরন্তু 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকাখানি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। বাজেয়াপ্ত হইলে বাঙ্গালার চরমপন্থী দলের শ্রেষ্ঠ মুখপত্রখানির অপঘাত মৃত্যু হইবে। ইহাতে চরমপন্থীদল অত্যন্ত জখম হইবে আর গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছাও তাই। বিশেষতঃ কেবল রাজা সুবোধ মল্লিক নয়, আরও অনেক গোপনদাতার টাকায় এই কাগজখানি চলিতেছিল। কাগজখানি বাজেয়াপ্ত হউক ইহা তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না; সুতরাং অরবিন্দ জেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি কাগজখানি বাজেয়াপ্ত হয়, তবে অরবিন্দ জেলে যান কেমন করিয়া?

৪র্থ, 'বন্দেমাতরমের' অভিযুক্ত প্রবন্ধগুলির লেখক কে? যদি অরবিন্দ উহার লেখক না হইয়া থাকেন; শুনা যায়, ঐ প্রবন্ধগুলি উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। তিনি জীবিতকালে ইচ্ছা করিলেই এই কথার জটা ছাড়াইয়া দিতে পারিতেন। অরবিন্দ যদি এই প্রবন্ধগুলির লেখক না-ও হন, তাহাতেই বা কি আসে-যায়? ভূপেন দত্তও 'যুগান্তরের' প্রবন্ধগুলির লেখক ছিলেন না, শুনা যায় যুগান্তরের প্রবন্ধগুলিও নাকি ঐ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন। পরের লেখাকে নিজের লেখা বলিয়া ভূপেন দত্ত আদালতে স্বীকার করাতেই না অরবিন্দ লিখিলেন, "telling the truth with too much emphasis". অরবিন্দও ত ইচ্ছা করিলে এই "telling the truth with too much emqhasis" করিতে পারিতেন। ১৯০৮।২৪শে

জুন মিঃ তিলক 'কেশরী' পত্রিকার কতকগুলি প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহে অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ঐ প্রবন্ধগুলি একটাও তাঁহার নিজের লেখা ছিল না। তথাপি "কেশরী" কাগজের সম্পাদক হিসাবে তিনি অপরের লিখিত ঐ সমস্ত প্রবন্ধগুলির দায়িত্ব আদালতে গ্রহণ করিলেন এবং ফলে ছয় বৎসর যাবৎ মান্দালয় দুর্গে বন্দী থাকিলেন। তিলকের আদর্শ পারস্পরিক সহযোগিতা ('responsive co-operation')। ইহা অনেকটা সুবিধাবাদ—সুবিধা হইলে সহযোগ, অসুবিধা হইলে অসহযোগ। অরবিন্দের আদর্শ তাহা নহে, বিপ্লবে সহযোগ চলে না। মিঃ তিলক বিপ্লবী নহেন, তিনি জেলে যাইতে পারেন এবং তিনি জেলে যাইবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "আমি জেলের বাহিরে থাকা অপেক্ষা জেলে আবদ্ধ থাকিলে দেশের অধিক কাজ হইবে।" অরবিন্দের আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতি তিলক হইতে পৃথক, সুতরাং তিলকের জেলে গমনের দৃষ্টান্ত অরবিন্দ গ্রহণ করিতে পারেন না। ১৯০৮।১২ই এপ্রিল, বারুইপুর বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে—তিলকের 'responsive co-operation' তিনি বিশ্বাস করেন না ("cannot work in co-operation with, and also in opposition to, government").

৫ম, অরবিন্দ শুধু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদী, বয়কট অনুরাগী, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেওয়া'র নেতা নহেন। 'বন্দেমাতরম্' কাগজ সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে তিনি ঐ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দলে আসিয়া যোগ দিয়াছেন, কিন্তু এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ জন্মের চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি বাংলা দেশে গীতা-তলোয়ার ও রিভলবার হাতে বিপ্লবের অগ্রদূত গুপ্ত সমিতির জন্ম দিয়াছেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের চরম গতি জেলপ্রাপ্তি। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই জেলে যান। তাঁহাদের মতে জেলে যাওয়াই দেশের কাজ করা, কিন্তু গুপ্ত সমিতির কর্ম্মপদ্ধতি জেলে যাইতে বলে না। জেল এড়াইয়া গোপনে অন্ধকার পথে চলিতে বলে। অরবিন্দ এই গুপ্তসমিতির প্রবর্তক ও নেতা। অরবিন্দের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বিপিন পালের হইতে পৃথক। সুতরাং তিনি তাঁহার গোপন কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া জেলের পথে যাইতে পারেন না। নিষ্ক্রিয়বাদীরা জেলে যান, তা যাউন, কিন্তু বিপ্লবীরা জেলে যাইতে চাহেনও না এবং জেলে যানও না।

অরবিন্দ বিপ্লবী, বিপ্লবের নেতা, সুতরাং তিনি জেলে যান কেমন করিয়া?

যে প্রকারেই হউক তাঁহাকে জেলের বাহিরে থাকিতে হইবে, নতুবা গুপ্তসমিতি মারা যায়, বিপ্লব মারা যায়।

৬ষ্ঠ, বিপিন পাল ও উপাধ্যায়ের জবাব নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের চরম দৃষ্টান্ত এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পরিণাম সোজা জেলে গমন। ইহা বিপ্লববাদের যে কর্ম্মপদ্ধতি, তাহার উল্টা জিনিষ। আলিপুর বোমার মামলায় মি: সি. আর. দাশ ১৯০৯ খৃ: বিপ্লবী অরবিন্দকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মুখোস পরাইয়া ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে অরবিন্দের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্পর্কে তখন মিঃ সি. আর. দাশ বলিয়াছিলেন—"If there is a law which is unjust and offensive against the development of the Nation, break that law by all means and take the consequences. If the law says, you must go to jail—go to jail. That was the cardinal feature of the Doctrine Of Passive Resistance which Aurobindo preached."

মিঃ দাশ যাহাই বলুন না কেন, অরবিন্দ কোন কালেই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথে 'গো টু জেলের' পক্ষপাতী ছিলেন না। বিপিনচন্দ্র গুপ্তসমিতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। উপাধ্যায় গুপ্তসমিতির বিরোধী না হইলেও গুপ্তসমিতির দলভুক্ত ছিলেন না। বিপ্লবী অরবিন্দ এই উভয় নেতা হইতে পৃথক। সুতরাং চরম নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদী বিপিনচন্দ্র ও উপাধ্যায়ের জেলে গমনরূপ দৃষ্টান্ত বিপ্লবীদের গুরু ও নেতা অরবিন্দ গ্রহণ করিতে পারেন না। যদি কেহ বলে অরবিন্দ কি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদী নহেন—শুধুই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মুখোস তিনি পরিয়াছিলেন? অসম্ভব নয়। কেননা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কোন দৃষ্টান্ত আমরা অরবিন্দের নিকট হইতে পাই নাই এবং স্পষ্ট দেখিয়াছি যে, তিনি এক হাতে গুপ্তসমিতি আর এক হাতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সব্যসাচীর মত দুই হাতে সমানে চালাইয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে জলজীবন্ত ঈশ্বর প্রত্যক্ষ, পায়ের তলায় অন্ধকার গহ্বরে বোমা-রিভলবার গীতা-তলোয়ারসমন্বিত বিভীষিকাপূর্ণ গুপ্তসমিতি, আর লেখনীমুখে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।

৭ম, 'বন্দেমাতরম্' মোকদ্দমার পর আলীপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তির পক্ষপাতী ছিলেন না এবং হাজতবাসের সময় হেমচন্দ্রকে দিয়া অরবিন্দ বারীন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ আদেশ দিয়াছিলেন যাহাতে বারীন্দ্র

স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেন। উত্তরে বারীন্দ্র বলিয়াছিলেন, "অরবিন্দ এসব কি বোঝে?" (বারীনের মুখের কথা)—[বাংলায় বিপ্লব-প্রচেষ্টা, পৃ: ২৮৮]

বারীন্দ্রও অরবিন্দের মন্ত্রশিষ্য, সুতরাং এক্ষেত্রে বারীন্দ্রের অবাধ্যতা একেবারে প্রত্যক্ষ গুরুমারা বিদ্যা। বারীনের স্বীকারোক্তিকে হেমচন্দ্র কানুনগো, নরেন গোঁসাইর স্বীকারোক্তির মতই দেশদ্রোহিতা বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। সে প্রসঙ্গের আলোচনা এখন নয়। আমরা দেখিতেছি যে—কি বন্দেমাতরম্ কি আলীপুর বোমার মামলা, অরবিন্দ সত্য কথা বলিয়া শাস্তি নিতে প্রস্তুত নন; ইহা তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতি নয়। সুতরাং বিপিন পাল, উপাধ্যায়, মিঃ তিলক ইঁহাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা অরবিন্দকে তুলনা করা যায় না। কেননা ইঁহারা কেহই বিপ্লবী নহেন, বিপ্লবীর তুলনা হইতে পারে শুধু আর এক বিপ্লবীর সঙ্গে। কিন্তু অ-বিপ্লবীর সঙ্গে বিপ্লবীর তুলনা হইতে পারে না। বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশেই অরবিন্দের মত উচ্চশিক্ষিত অদ্ভুত মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি কেহই বিপ্লবী ছিলেন না বা নাই; সুতরাং অরবিন্দের তুলনা মিলে না, তিনি অতুলনীয়।

৮ম, এত কথার পর মাত্র আর একটি কথা বলা দরকার। অরবিন্দের সাহস লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে, তাঁহার জেলে গমন-ভীতি তাঁহাকে ভীরু এবং কাপুরুষ বলিয়া সন্দেহ করিবার সুযোগ দিয়াছে; কিন্তু আমরা দেখিতেছি তিনি ভীরুও নহেন, কাপুরুষও নহেন। কোন সাধারণ বিপ্লবীর বিরুদ্ধেই ভীরুতার অপবাদ দেওয়া চলে না। আর যিনি বিপ্লববাদের গুরু তাঁহাকে ত কোন মতেই ভীরু বলা যাইতে পারে না। অরবিন্দ জেলে গমন করিতে অনিচ্ছুক, তাহার কারণ ভীরুতা নয়, সাহসের অভাব নয়; ইহা তাঁহার বৈপ্লবিক কর্ম্মপদ্ধতির বিরোধী।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যু : 'সন্ধ্যা'র রাজদ্রোহের বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বেই, ১৯০৭।২৭শে অক্টোবর ক্যাম্বেল হাসপাতালে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রাণত্যাগ করিলেন। ১০ই ডিসেম্বর "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিলেন—"The great Upadhaya mystically borne away from us on the wings of a kindly death." অরবিন্দ ইচ্ছা করিয়াই mystically কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। উপাধ্যায়ের মৃত্যু একটা রহস্য। কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে যেন ভীষ্মের মতই ইচ্ছা করিয়া তিনি মৃত্যুকে বরণ করিলেন।

আমার বেশ মনে আছে, আমি তখন দিল্লীতে ছিলাম। উপাধ্যায়ের মৃত্যু-সংবাদ দিল্লীর বাঙ্গালী সমাজে এক বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত করিয়াছিল। আগ্রায় গিয়া দেখিলাম, সেখানকার বাঙ্গালী সমাজও সংক্ষুব্ধ হইয়া এক শোক-সভা পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহা বিদ্যুৎচমকের মতই চক্ষু প্রতিহত করিয়া অন্ধকারে নিভিয়া গিয়াছে। অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালী ব্রহ্মবান্ধবের স্মৃতিরক্ষার জন্য আজও পর্যন্ত কোনও চেষ্টাই করে নাই।

অরবিন্দ উপাধ্যায় সম্পর্কে আরও বলিয়াছেন—"Upadhyaya refused to plead before the alien court. Upadhyaya saw the necessity of realising *Swaraj within us* and hence he gave himself up to it. He said that he was free and the Britishers could not bind him ; his death is a parable to our nation."
—[*Baruipur Speech, 12th April, 1908.*]

উপাধ্যায়ের জীবনকে, তাঁহার রাজনৈতিক আশা ও আকাঙ্খাকে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অরবিন্দ অনেক জটিল কথা বলিয়া ফেলিলেন। যাহা সহজ ছিল, তাহা আরও কঠিন হইল। অন্তরের মধ্যে স্বরাজ উপলব্ধির কথাটা আসিয়া পড়িল, যদিও বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ লাভ করাই স্বদেশী আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

রাওলাট কমিটি "সন্ধ্যা" কাগজ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"*Sandhya Proclaimed Abroad :* We want complete Independence. The country cannot prosper so long as the veriest shred of the Feringhi's supremacy over it is left. Swadeshi, boycott—all are meaningless to us if they are not the means of retrieving our whole and complete Independence···Rights granted by the Feringhis as favour—we shall spit at and reject, and we shall work out our own salvation."
—[*pp 16-17*]

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব সম্পর্কে নেভিন্‌সন্ লিখিয়াছেন—

"*Sandhya* ('Evening'), written in Bengali of the roughest popular dialect, and deliberately going all lengths in virulence

and abuse. That had been the policy of its founder and editor, Pandit Upadhyaya Brahmabandhab, who had died a few months before while under trial for sedition. One of the Brahmo Samaj by training, he had travelled much in Europe, had lectured in Cambridge, tried to become a Roman Catholic, but failed (so rare a failure!) and on returning to Calcutta had startled the reformers of the Congress Party by a light-hearted violence that must have ended in gaol, had not death anticipated imprisonment by release."—[*The New Spirit In India—p 219*]

অরবিন্দ কেম্ব্রিজ হইতে ইয়ুরোপের 'ক্লাসিক্'-এ দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন। আর উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব কেম্ব্রিজে গিয়া ভারতের বেদান্ত শিক্ষা [illegible]য়াছেন। উপাধ্যায় হিন্দু হইতে ব্রাহ্ম, ব্রাহ্ম হইতে খৃষ্টান, খৃষ্টান হইতে আবার হিন্দু-ব্রাহ্মণ হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অরবিন্দ ব্রাহ্ম হইতে সন্দেহবাদী নাস্তিক এবং তার পর গোঁড়া হিন্দু হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দুত্বের দিকে উভয়ে আকৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু উপাধ্যায় ধর্ম্ম হইতে রাজনীতিতে আসিয়া জীবন শেষ করিয়াছেন, আর অরবিন্দ রাজনীতি হইতে যোগাদি ধর্ম্মব্যাপারে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। উভয়ের জীবনের গতি এক দিকে নয়; বরং একজন হইতে আর একজন উল্টা দিকে গিয়াছেন— উপাধ্যায় ধর্ম্ম হইতে রাজনীতি, আর অরবিন্দ রাজনীতি হইতে যোগাদি ধর্ম্ম। অথচ এই দুই উগ্র-প্রচণ্ড চরমপন্থী নেতা, স্বদেশীযুগে একত্রে হাত মিলাইয়া একই কর্ম্মক্ষেত্রে সমান কাজ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের কৃতকার্য ইতিহাস রচনা করিয়াছে, ইঁহাদের মুখের বাণী আমাদিগকে চমকিত করিয়াছে। ইঁহাদের অঙ্গুলী-সঙ্কেত অন্ধকারে আমাদের পথ দেখাইয়াছে।

মিঃ নেভিন্‌সন্ ও মিঃ কেয়ার হার্ডি : এই দুই ইংরেজ ভদ্রলোক অক্টোবর মাসে বিলাত হইতে আমাদের দেশ দেখিতে আসিলেন, বাংলা দেশে আসিয়া পদার্পণ করিলেন। তখন স্বদেশীর প্রজ্জলিত অবস্থা। লাজপৎ, অজিত সিং মান্দালয় দুর্গে বন্দী আছেন। অরবিন্দের পরামর্শে ভূপেন দত্ত জেলে গিয়াছেন। মাত্র কয়েকদিন আগে, অরবিন্দকে বাঁচাইতে

গিয়া বিপিন পালও বকসার জেলে বন্দী হইয়াছেন। উপাধ্যায় ব্রহ্ম-বান্ধবকে জেলে দিবার জন্য মোকদ্দমা চলিতেছে, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে—তিনি জেলে যাইবেন না। তার পরিবর্তে ২৭শে অক্টোবর ক্যাম্পবেল হাসপাতালে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার কথাই ঠিক হইল; তিনি জেলে গেলেন না। মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনকে ২রা অক্টোবর গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ৫ই নভেম্বর তিনিও জেলে যাইবেন। অরবিন্দ জেলে যাইতে অনিচ্ছুক, সুতরাং 'বন্দেমাতরম্'-এর প্রবন্ধগুলির দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিলেন না। অতএব তাঁহার জেলে গমন হইল না। আবার ২য়া অক্টোবর বীডন স্কোয়ারে পুলিশের সহিত স্বদেশী জনতার একটা সংঘর্ষ হইয়া গেল। হাতাহাতি ও লাঠালাঠি ব্যাপারে পুলিশের পরাজয় হইল। মডারেট নেতারা প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী অরবিন্দ কোনই অনুতাপ করিলেন না—উপবাস তো দূরের কথা! বরং "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় পুলিশের পরাজয়ে উল্লাস প্রকাশ করিলেন। তিনি জুলাই মাসে গভর্ণমেন্টকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন—'আরও অত্যাচার চাই' ("Wanted more repression.")। উত্তরে, এই অক্টোবর মাসেই ২১শে তারিখে, আরব্রোথ্-বক্তৃতায় ভারতসচিব মর্লি সাহেব বলিলেন: "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই; আরো অত্যাচার করা হইবে" ("The Government have been obliged to take measures of repression ; they may be obliged to take more.")।

মিঃ নেভিন্‌সন্ ও মিঃ কেয়ার হার্ডি এই সব বিপর্যায় কাণ্ডের মধ্যে আসিয়া পতিত হইলেন। সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া সম্ভবতঃ তাঁহারা তাজ্জব বনিয়া গেলেন। ৫ই অক্টোবর মিঃ কেয়ার হার্ডি অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 'বন্দেমাতরম্' অফিসে গেলেন। অরবিন্দ অফিসে উপস্থিত ছিলেন না। পরে তিনি এই খবর শুনিয়া মিঃ কেয়ার হার্ডির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্পেন্সেস্ হোটেলে গেলেন। কিন্তু তাঁহার পেণ্টলুন পরা ছিল না, ধুতি পরা ছিল—ঢুকিতে পারিলেন না। মিঃ কেয়ার হার্ডি এই কথা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং নিজে রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে আসিয়া অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মিঃ নেভিন্‌সন্ ডিসেম্বর মাসে সুরাট-কংগ্রেসের

অব্যবহিত পূর্ব্বে ৬ নং কলেজ স্কোয়ারে কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ী আসিয়া অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

এই দুই বিদেশী ইংরেজ ভদ্রলোক বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। মিঃ কেয়ার হার্ডি, ক্যানাডার মত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ভারতবাসীকে দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে উপদেশ দিলেন। মিঃ মর্লি আরব্রোথ্-বক্তৃতায় মিঃ কেয়ার হার্ডির কথা—ক্যানাডার "ফার" (fur) কোটের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে চলিবে না বলিয়া উপহাস করিলেন, এবং উড়াইয়া দিলেন। মিঃ নেভিন্‌সন্‌ "New Spirit In India" বলিয়া স্বদেশী আন্দোলনের উপর একখানি অতি উপাদেয় সুন্দর গ্রন্থ লিখিলেন। এবং ঐ গ্রন্থে অন্যান্য নেতাদের সহিত অরবিন্দের চরিত্রচিত্র অতিশয় নিখুঁত এবং নিপুণভাবে অঙ্কিত করিলেন। এবং অরবিন্দের রাজনৈতিক আশা ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে এক অতি সুন্দর বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিলেন। মিঃ নেভিন্‌সন্‌ লিখিয়াছেন যে, অরবিন্দ আয়র্ল্যাণ্ডের 'সিন্‌ফিন্‌'দের মতাবলম্বী; গভর্ণমেণ্ট যত বেশী অত্যাচার করিবে, জাতীয়তাবাদীদের ততই উপকার হইবে ("The more repression it became, so much the better for the Nationalist cause.")। তিনি (অরবিন্দ) একজন স্বপ্নবিলাসী ব্যক্তি, এবং তাঁহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উপায় সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ বে-পরোয়া ("He was of the stuff that dreamers are made of, but dreamers who will act their dream, indifferent to the means.")।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (PASSIVE RESISTANCE) ও সন্ত্রাসবাদ (TERRORISM) : বিপিন পাল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। আর অরবিন্দ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পূর্ব্বেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গুপ্তহত্যামূলক সন্ত্রাসবাদ প্রবর্তন করিয়াছেন। সন্ত্রাসবাদের পর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আসিয়াছে। লোকে কিন্তু, বিশেষত: ছেলে-ছোক্‌রারা, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের তত্ত্বটা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না, গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছে। অথচ গুপ্তহত্যার কথাটা বুঝিতে কিছুই কষ্ট হইতেছে না। তবে হত্যাকারী যুবকদের মনে একটু ভয় হইতেছে, এই যা। কেননা, ভদ্রলোকের ছেলেরা এরকম দুঃসাহসের কার্য্য ইতঃপূর্ব্বে

কেহই করে নাই; এবং ইহা করিতেও কেহ তাহাদিগকে বলে নাই। সুতরাং স্বদেশীর প্রজ্জলিত অবস্থায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অপেক্ষা গুপ্তহত্যার কল্পনা ও তাহার ব্যর্থ চেষ্টা অধিকতর প্রসার লাভ করিয়াছিল। স্বদেশী না আসিলে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আসিত না; এবং অরবিন্দের গুপ্তসমিতি মেদিনীপুরের কাঁকরপূর্ণ মাঠের গর্ত্তে মরিয়া শুকাইয়া যাইত। স্বদেশী আন্দোলন এই দুইটি পরস্পরবিরোধী মতবাদকে বাংলার চরমপন্থী রাজনীতি বলিয়া ইতিহাসকে উপঢৌকন দিয়া গিয়াছে।

কিন্তু ২রা অক্টোবর বীডন্ উদ্যানে মারমুখ পুলিশের সহিত ক্ষুব্ধ জনতার যে সংঘর্ষ দেখা দিয়াছিল, তাহা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধও নয়, গুপ্তহত্যাও নয়। বিপিনচন্দ্রও নয়, অরবিন্দও নয়। আন্দোলনমুখে উত্তেজনার সময় জনতা দার্শনিক স্বপ্নবিলাসী নেতাদের বিকট এবং উৎকট তত্ত্বকথা ভুলিয়া যায়। পরবর্ত্তী গান্ধীযুগের "চৌরিচৌরা" এবং ১৯৪২।৮ই আগষ্টের বিদ্রোহাত্মক দাঙ্গাহাঙ্গামা ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অহিংসার বাগাড়ম্বর রাজনীতিক্ষেত্রে কোনই কাজে আসে না।

বিপিনচন্দ্র সন্ত্রাসবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। আর সন্ত্রাসবাদী অরবিন্দ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের বিরোধী নহেন। "বন্দেমাতরম্"-এর যুগে যখন অরবিন্দ পূরা সন্ত্রাসবাদী, তখন তিনি কোথাও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের বিরুদ্ধে একটি কথা বলেনও নাই, লেখেনও নাই। এবং এক বৎসর কারাবাসের পরে "কর্ম্ম-যোগিন্"-এর যুগে, লেখনীমুখে তিনি নিজেকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদী বলিয়া একাধিকবার ঘোষণা করিয়াছেন। সেইজন্য অনেকে মনে করেন যে—"কর্ম্মযোগিন্"-এর যুগে তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মুখোস পরিয়াছেন মাত্র। হয়ত আত্মরক্ষার জন্য ইহার প্রয়োজন ছিল; আর না হয়ত, তিনি সন্ত্রাসবাদে ঠেকিয়া শিখিয়া ক্রমে বিপিনচন্দ্রের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-তত্ত্বে অধিকতর আস্থাবান হইয়া উঠিয়াছেন।

অরবিন্দ কেম্ব্রিজে থাকাকালীন ১৮৯২ খৃঃ হইতেই মডারেট-নীতির বিরোধী। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়াই তিনি, সকলের আগে, কংগ্রেসের এই মডারেট-নীতিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তেমন আক্রমন আর কেহ করে নাই। যে সময়ের মধ্য দিয়া যাইতেছি, এই সময়েও তিনি তাঁহার মডারেট-বিরোধী নীতি সমান বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন। মর্লির আরব্রোথ-

বক্তৃতার চার দিন পরে এবং উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে, তিনি মডারেট-নীতি সম্পর্কে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে—"মডারেট-নীতি দ্বারা কংগ্রেস এই ২২ বছরের মধ্যে দেশের কোনই যথার্থ উপকার করিতে পারে নাই।"

"Did the country advance a step for their moderation and wisdom ? Were there no famines and plague, social abuses and industrial stagnation because the people were loyal and moderate ; did not shout 'Bande Mataram' and had no idea of Swadeshi and boycott ? The masterminds of *Narendranath Sen* and *Nagendranath Ghose* were at work for half a century, but the country, so far as we know, has reaped no benefit from their wisdom and foresight. *The Congress has sat for the last 22 years, but did not attract the attention of the civilised world.*"—[*Bande Mataram, Oct. 25, 1907*].

বিপিনচন্দ্র ও উপাধ্যায়ের অভাবে অরবিন্দই এখন বাংলায় চরমপন্থীদের নেতা। তিনি মডারেটদের তাড়িত করিতে চান, যেহেতু তাহাদের পক্ষে পরিবর্ত্তন অসম্ভব—"...without them (moderates), if it must be."। আবার ৪ দিন পূর্ব্বে আরব্রোথ্-বক্তৃতায় ভারতসচিব মিঃ মর্লি অরবিন্দের চরমপন্থীদল তাড়াইয়া দিয়া, সুরেন্দ্র ব্যানার্জি-ভূপেন বসুর মডারেটদলকে কোলে তুলিয়া নিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন। এই বিতাড়ন ও আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া মডারেট দল যাহা করা স্বাভাবিক তাহাই করিতেছে। গভর্ণমেণ্ট শুধু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেই ভেদনীতি প্রয়োগ করিতেছেন না, পরন্তু মডারেট ও চরমপন্থীদের মধ্যেও সেই একই নীতি প্রয়োগ করিতেছেন। দুর্দ্দান্ত চরমপন্থীদের সায়েস্তা করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এরূপ করা স্বাভাবিক।

অরবিন্দ ও গভর্ণমেণ্টের চণ্ডনীতি : ২রা নভেম্বর, অর্থাৎ Seditious Meeting Act পাশ হইবার (১লা নভেম্বর) এক দিন পর, অরবিন্দ লিখিলেন—"How To Meet The Inevitable Repression". সুতরাং দেখা যাইতেছে, অরবিন্দ গভর্ণমেণ্টের নিকট যে অত্যাচার প্রার্থনা করিয়াছিলেন,

গভর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। অরবিন্দকে গভর্ণমেণ্ট নিরাশ করেন নাই। এখন এই প্রত্যক্ষ "Repression"—অত্যাচার-কে জাতি কী ভাবে গ্রহণ করিবে, অরবিন্দ তাহারই নির্দ্দেশ দিতেছেন। গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারপ্রার্থী নেতা, ভুভারতে এক অরবিন্দ ছাড়া আর কেহই নাই। উপাধ্যায়ের মৃত্যুর মাত্র একদিন পূর্ব্বে অরবিন্দ গভর্ণমেণ্টের এই চণ্ডনীতিকে আত্মঘাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া লিখিলেন—

"Bureaucracy falls at one swoop upon Sjts. Bepin Pal, Aurobindo Ghose, B. B. Upadhaya, Bhupendra Nath Dutta and others, who by their dignified sufferings, matchless patriotism and whole-hearted devotion to the country's cause have enkindled a fire which is simply impossible for the bureaucrats to extinguish even with all the waters of the Ganges and the Indus."—*Bandemataram* ; *'Suicidal Policy'*, *October 26, 1907*.

এই প্রত্যক্ষ অত্যাচারকে নেতারা মহৎ কষ্টস্বীকার ("dignified suffering") দ্বারা বরণ করিয়া লইবেন, ফলে এমন আগুন জ্বলিবে যে, সিন্ধু ও গঙ্গা এই দুই নদ-নদীর জলেও এই আগুন নিভিবে না—কবি ও স্বপ্নবিলাসী অরবিন্দ কোনও সুস্পষ্ট উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না, সমস্তটাই অস্পষ্ট রহিয়া গেল। সম্ভবতঃ সন্ত্রাসবাদের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না বলিয়াই, উপায় নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া অরবিন্দ ইহার চেয়ে বেশী সুস্পষ্ট হইতে পারিলেন না। কেননা, ইহার পরক্ষণেই দেখিতে পাইব এই অত্যাচারের উত্তরে অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত বারীন্দ্র-পরিচালিত "যুগান্তর"-এর দল ২৮শে অক্টোবর কাগজখানি অন্য হস্তে সমর্পণ করিয়া অরবিন্দের পৈতৃক ভিটা মুরারীপুকুরের বাগানে গিয়া বোমার কারখানা খুলিলেন। সেখানে বোমা তৈয়ারী হইবে, রিভল্‌ভারাদি আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করা হইবে। এবং এই মুরারীপুকুর বাগানের বোমার আড্ডা গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অরবিন্দের পরামর্শে যে ইতিহাস রচনা করিবে, তাহাতে ছোটলাট ফ্রেজার, চন্দননগরের মেয়র ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংস্‌ফোর্ডকে গোপনে হত্যা করিবার ব্যর্থ প্রয়াস লেখা থাকিবে। সম্ভবতঃ এই উপায়কে অরবিন্দ "dignified

suffering"-এর পর্য্যায়ে ফেলেন নাই। অথচ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের এই যে গুপ্তহত্যারূপ উপায় অবলম্বন দেখা যাইবে, অরবিন্দ তাহার সহিত পরিচালক ও নেতা হিসাবে জড়িত ছিলেন।

অরবিন্দ ও মিঃ মর্লির আরব্রোথ্-বক্তৃতা: ১৯০৭।২১শে অক্টোবর মর্লি সাহেব আরব্রোথে ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে এক বিখ্যাত বক্তৃতা দিলেন। মাত্র দুই দিন পর, ২৩শে অক্টোবর, অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় লিখিলেন, "মিঃ মর্লি আরব্রোথে বাগাড়ম্বর অর্থাৎ অল্পার্থে বহু শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন"—("...hollow verbiage uttered at Arbroath.")।

আমরা কিন্তু মিঃ মর্লির আরব্রোথ-বক্তৃতাকে একেবারে "ফাঁকা আওয়াজ" ("hollow verbiage") মনে করিতে পারিলাম না। ফাঁকা ত নয়ই—এমন কি, সীসার গুলীর মত নীরেট মনে হইল। দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১ম—অরবিন্দের দল পূর্ণ স্বাধীনতা চান ("complete Independence free of British control")। ইহার উত্তরে মিঃ মর্লি বলেন—ইহা আকাশের চাঁদ, তাঁহার হাতে নাই; সুতরাং তিনি ইহা দিতে পারেন না। আর থাকিলেও, তিনি ইহা দিবেন না। "I have got no moon, and if I had, I would not give them the moon."—ইহা ফাঁকা কথা নয়, একেবারে নীরেট সাচ্চা কথা বলিয়াই ত আমাদের মনে হইল।

২য়—মিঃ মর্লি ক্যানাডার মত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনও ভারতবর্ষকে দিতে পারেন না, যেহেতু ক্যানাডার "ফার" (fur) কোট গ্রীষ্মপ্রধান ভারত-বাসীদের সহ্য হইবে না। শীত আর গ্রীষ্ম তফাৎ আছেই, অস্বীকার করিলে চলিবে কেন ?

৩য়—মিঃ মর্লি ভারতবাসীদের "Quit India"র হুকুম তামিল করিতে পারেন না। যেহেতু, ইংরেজ চলিয়া গেলেই ভারতবাসীদের মধ্যে এমন মারামারি কাটাকাটি লাগিয়া যাইবে যে, তাহাদের নৃশংস হত্যা অর্থাৎ আত্মহত্যা এবং ক্রন্দনের রোল সভ্য ইংলণ্ডবাসীদের বিবেককে দংশন করিবে। ("How should we bear the savage stings of our own consciences when, as assuredly we should, we heard through the dark distances the roar and scream of confusion and carnage in India?")। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজজাতির একটা দায়িত্ব

আছে, একটা কর্তব্য আছে; সে দায়িত্ব রক্ষা করিয়া কর্তব্য পালন তাহাদের করিতেই হইবে। সাদা কথা—কোনই ঘোর-প্যাঁচ নাই।

৪র্থ—অরবিন্দ ১৮ই জুলাই গভর্ণমেণ্টের নিকট আরও অত্যাচার চাহিয়াছেন। ডিসেম্বরের শেষে, মিঃ নেভিন্‌সনের নিকটও সেই কথা বলিয়াছেন। মিঃ মর্লি অরবিন্দের একথার উত্তরে বলিলেন, "হে বাংলার চরমপন্থীগণ, তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম। তোমরা আরও অত্যাচার পাইবে।" ("The Government have been obliged to take measures of repression, they may be obliged to take more".)। অরবিন্দ মিঃ মর্লির এই কথার মধ্যে ফাঁকা আওয়াজ ("hollow verbiage") কোথায় পাইলেন? আমরা দেখিতেছি, স্পষ্ট কথার স্পষ্ট উত্তর।

৫ম—মিঃ মর্লি চরমপন্থীদের তাড়াইয়া দিয়া নরমপন্থী মডারেটদের গভর্ণমেণ্টের পক্ষে আনিবার জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ("rally the Moderates to the cause of the Government")। ইহা সনাতন ভেদনীতি। রাজ্য রক্ষা করিতে হইলে ইহার প্রয়োজন আছে।

মিঃ মর্লির আরব্রোথ-বক্তৃতার এক সপ্তাহ পরে অরবিন্দ-প্রবর্তিত বারীন্দ্র-পরিচালিত যুগান্তর দল কাগজখানি অন্য হস্তে সমর্পণ করিয়া মুরারীপুকুরের বাগানে আসিয়া আড্ডা গাড়িল। তাঁহাদের উদ্দেশ্য—"battle for the Motherland"—*Bandemataram, November 1, 1907.*

"যুগান্তর"-এর হস্তান্তর: অরবিন্দের নেতৃত্বে এখন "বন্দেমাতরম্" পরিচালিত হইতেছে। ১লা নভেম্বর "বন্দেমাতরম্" খবর দিল যে, বারীন্দ্রের দল "যুগান্তর" কাগজখানি প্রকাশের ভার অন্য এক হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা "battle for the Motherland"-এর জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং চাঁপাতলায় "যুগান্তর" আফিসে যে গুপ্তসমিতির আড্ডা ছিল, তাহা মুরারিপুকুর বাগানে উঠাইয়া লইয়া গেলেন।

"The paper is transferred to new hands on 28th October, 1907. Abinash Chandra Bhattacharji makes the statement: Jugantar was started at a time when there was no other exponent in the press of the now well-known views it has championed without reserve and without fear—the gospel

of Independence and the right and the duty of the Nation *to win liberty by any means and at any cost.* Other journals are arising which breathe the same spirit. Our mission, therefore, is accomplished. For a year and a half we maintained Jugantar. There is a vast field of work before us, in which the labourers are few. *To this we now turn* and take farewell of those with whom through Jugantar we have established a spiritual communion and brotherhood which will, in future, we hope, be manifested in *a brotherhood of action and battle for motherland.*"—[*Bande-Mataram,* "Jugantar & Its Early Workers", *Nov. 1, 1907*]

অরবিন্দের জ্ঞাতসারেই এই সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল। সংবাদটি অতি গুরুতর। এবং ইহার ইঙ্গিত আরও গুরুতর (* ক)। লাজপতের নির্ব্বাসনের পর অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন—"the hour for speeches and fine writings is past." ভগিনী নিবেদিতাও বক্তৃতা করিয়াছিলেন—"No more words—words—words. Let us have deeds—deeds—deeds". এই দুই মনীষাসম্পন্ন বিপ্লবী বারীন্দ্রের দলের উদ্ভাবনকর্ত্তা, মন্ত্রণাদাতা ও পৃষ্ঠপোষক।

(* ক) "Sometime after, they (Barindra Kumar Ghose and his party) gathered a small band and leaving the charge of the paper in the hands of another group, went in to establish a secret society for the purpose of organising the country with the object of using bombs, dynamite and fire-arms as a first instalment of National preparation for an armed revolution in the country to secure political Independence. This party tried unsucessfully to wreck the train of the then Lieutenant-Governor by the use of dynamite and among other things, mistakenly mudered two European ladies by a bomb, which they threw at a carriage in the darkness of the night at Muzaffarpore in April, 1908, mistaking it to be the carriage of Mr. Kingsford, the then Sessions Judge of the

লাজপতের নির্ব্বাসন হইতে উপাধ্যায়ের মৃত্যু পর্য্যন্ত—এই ৬ মাস গভর্ণমেন্ট যে চণ্ডনীতি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং আরব্রোথ্-বক্তৃতায় মিঃ মর্লি যেরূপ আরও অত্যাচার (repression) করিবার ভয় দেখাইয়াছেন, তাহাতে সন্ত্রাসবাদীরা উত্তেজিত হইয়া প্রতিশোধ লইবার সুযোগ পাইয়াছে। চাঁপাতলায় "যুগান্তর"-এর আড্ডা হইতে ফুলার বধের চেষ্টা হইয়াছিল। এইবার মুরারিপুকুর বা মাণিকতলার আড্ডা হইতে ছোটলাট ফ্রেজার, চন্দননগরের মেয়র ও মিঃ কিংসফোর্ড বধের গোপন চেষ্টা হইবে এবং উহার প্রত্যেকটিই ফুলার-বধের মত ব্যর্থ প্রয়াসে পর্যবসিত হইবে।

"যুগান্তর"-এর চাঁপাতলার আড্ডা হইতে এই গুপ্তসমিতি যে-সকল স্থানে শাখা বিস্তার করিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল:

১। চাঁপাতলা: ১৯০৬।মার্চ্চ—১৯০৭।অক্টোবর; ১ বৎসর ৮ মাস।

২। মাণিকতলা: ১৯০৭।নভেম্বর—১৯০৮।এপ্রিল; ৬ মাস।

৩। বৈদ্যনাথ (Seal's Lodge): ১৯০৮।জানুয়ারী—এপ্রিল; ৪ মাস।

৪। ভবানীপুর: ১৯০৮।মার্চ্চ—এপ্রিল; ২ মাস।

৫। শ্যামবাজার—(১৫ গোপীমোহন দত্ত লেন): ১৯০৮।এপ্রিল; ১ মাস।

ইহার প্রত্যেকটি আড্ডাই অরবিন্দের বিদিত ছিল।

ইতিহাসের পদচিহ্ন: শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে যেমন ভৃগুপদচিহ্ন, "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার বক্ষে তেমনি ইতিহাসের পদচিহ্ন রেখাঙ্কিত করিয়া গিয়াছে। অরবিন্দের জীবন-চরিত এই ইতিহাসের পদচিহ্নের সহিত জড়িত। শুধু জড়িত নয়—অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যে সময়কার ইতিহাসের মধ্য দিয়া আমরা যাইতেছি, সেই সময়কার ইতিহাসের একটা বড় অংশ অরবিন্দের বাক্য, "বন্দেমাতরম্"এ তাঁহার লেখা ও বারীন প্রভৃতির গুপ্তসমিতির দলে পরামর্শদাতা ও নেতা হিসাবে তাঁহার কার্য্য উল্লেখযোগ্য। আলো ও আঁধারের মধ্য

---

district, who had sent to jail many of the members of the party when he was the Chief Presidency Magistrate in Calcutta.......The police arrested many young men including Sri Aurobindo, whom they considered to be the brain, the motor-power behind the whole organisation and the ring-leader of the Conspiracy."—*Life-Work af Shri Aurobindo*, Jyotish Ch. Ghose, *pp. 47-48.*

দিয়া যে ইতিহাস তাঁহার জীবন সৃষ্টি করিয়াছে, সেই ইতিহাসকে আজ আমরা আলোচনা করিতেছি—এমন কি, বিচার পর্য্যন্ত করিতেছি। সেই সঙ্গে অরবিন্দের জীবনকেও বিচার করিতেছি।

এই সময়ে "বন্দেমাতরম্"-এ যাহা বাহির হইয়াছে, সমস্তগুলি তাঁহার নিজের লেখা না হইলেও, তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত কোন লেখা বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গোড়ার দিকে বিপিন বাবুও অরবিন্দের বিনা অনুমোদনে "Golden Bengal Scare" প্রবন্ধটি লিখিয়া অরবিন্দের হাতে নিস্তার পান নাই।

কিছুদিন আগে হইতেই (প্রায় তিন বৎসর হইবে) অরবিন্দ গুপ্তসমিতির সন্ত্রাসবাদকে "শ্রীকালী মার্কা" ধর্ম্মের আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছেন। হালে প্রতিষ্ঠিত মুরারিপুকুর বাগানের গুপ্ত আড্ডাটি বালখিল্য যোগীদের একটি যোগাশ্রম বলিলেও চলে।

—"মুরারিপুকুর বাগান-বাড়ীতে কর্ম্মীদের ধর্ম্মের সাধন-ভজন শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তার গুরু নিযুক্ত হয়েছিলেন উপেন ভায়া। এই ব্যবস্থা কতকটা বাধ্যতামূলক অর্থাৎ compulsory ছিল।"—[বাঃ-বিঃ-প্রঃ—পৃ: ২৩১]

—"মেদিনীপুরের গুপ্তসমিতির পূর্ব্বের আড্ডা তুলে দিয়ে সত্যেনের বাড়ীর পাশে একটা ঘর "আনন্দ মঠ" নাম দিয়ে তাতে একটি হাতখানেক লম্বা কালীমূর্ত্তি স্থাপন করা হ'য়েছে। ··· মুরারিপুকুরের আড্ডাতে আর আমাদের ভবানীপুরের নূতন আড্ডাতে কালীর প্রতিমূর্ত্তি ঝোলান ছিল।"—[বাঃ-বিঃ-প্রঃ—পৃ: ২৫২-২৫৩]

প্রকাশ্য রাজনীতিতেও অরবিন্দ "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় ১৯০৭।৯ই নভেম্বর "Politics & Spirituality" এই প্রবন্ধে রাজনীতিতে আধ্যাত্মিকতার স্থান আছে, এমন কি উহা অপরিহার্য্য—এই কথা লিখিয়াছেন। সুতরাং কি গুপ্ত কি প্রকাশ্য অর্থাৎ কি সন্ত্রাসবাদ কি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ—এই দুই প্রকার বিপরীতগামী রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকেই ধর্ম্মের নামে শুধু হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামি দিয়া আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে। ক্রমে আত্মসমর্পণ (absolute surrender to the divine will)-এর সঙ্গে যোগকে জুড়িয়া দেওয়া হইবে।

১৯০৭।১১ই নভেম্বর লাজপৎ ও অজিৎ সিংকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ২০শে নভেম্বর "বন্দেমাতরম্‌" লিখিলেন—"We welcome you, acknowledged patriots of India, we welcome you when the laurels are fresh on your brows."

অরবিন্দ ইতিপূর্ব্বে এবং এবারেও মিঃ তিলককে কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এখন আবার মিঃ তিলককে ছাড়িয়া সদ্যমুক্ত লাজপতকে সভাপতি করিবার কথা তুলিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে যখন লাজপত নিজেই গণ্ডগোল দেখিয়া সভাপতি হইতে অস্বীকার করিলেন, তখন ২০শে ডিসেম্বর অরবিন্দ লাজপতের এই অনিচ্ছা প্রকাশকে "A Fatal Blunder" নাম দিয়া "বন্দেমাতরম্‌" পত্রিকায় লিখিয়া পরের দিন (২১শে ডিসেম্বর) সদলবলে সুরাটের দক্ষযজ্ঞ অভিমুখে রওনা হইলেন।

লাজপতকে অভ্যর্থনার পরের দিন (২১ নভেম্বর) 'বন্দেমাতরম্‌' পত্রিকা বিপ্লব ও তাহার নেতা (Revolution & Leadership), এই নাম দিয়া লিখিল—"The patriot lives for his contry, because he must; he dies for her, because she demands it. That is all." ২৫শে নভেম্বর আবার লিখিল—"The Nation that looks up to Sri Krishna as their ideal hero and man of action, can never submit to autocracy in any form." শুধু মা-কালী নন, শ্রীকৃষ্ণও আছেন। অরবিন্দ এক স্থানে লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণকে ঘিরিয়া কালী, কালীকে ঘিরিয়া কৃষ্ণ"...। লেখাটা কিছু হেঁয়ালিপূর্ণ। কি অর্থ, অরবিন্দই জানেন। কালীও পাইলাম, কৃষ্ণও পাইলাম—আরও পাইব। কিন্তু শিবকে তো দেখিতে পাইতেছি না। সম্মুখে অ-শিব তাঁর অমঙ্গলের দীর্ঘ ছায়া ফেলিতেছেন বলিয়াই কি শিব নাই ?

২৭শে নভেম্বর 'বন্দেমাতরম্‌' কংগ্রেস সত্ত্বেও, অপর একটি জাতীয় মহাসভা গঠনের প্রস্তাব করিলেন। এবং ঐ জাতীয় মহাসভার কর্তব্য হইবে—"to organise the Nation", অর্থাৎ জাতিকে ব্যাপকভাবে শৃঙ্খলার মধ্যে গড়িয়া তোলা। কেননা, অরবিন্দ মনে করেন—তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে না হইলেও, সমগ্র জাতির মধ্যে জীবনীশক্তি আছে এবং তাহার প্রমাণও আছে।

"*A Real National Assembly* : There is still left vitality to the people as a whole, though it may have disappeared from the so-called educated classes. Spirit of revolt against Colonization Bill in the Punjab, in the Boycott of Bengal and revolt against white insolents in Transvaal—are proofs thereof. If National Assembly is to be worthy of its name, its chief duty would be to organise the Nation."—*Bande-mataram—Nov. 27, 1907.*]

২রা এবং ১২ই ডিসেম্বর স্বামী বিবেকানন্দের কথা লেখা হইল। যথা—"*Swami Vivekananda on Patriotism* : They talk of patriotism—I believe in patriotism."

এই সময় কিম্বা ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই অরবিন্দের মন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি অতি মাত্রায় ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। কেননা, ঠিক ইহার পরের মাসেই (১৯০৮।১৯শে জানুয়ারী) বোম্বাইতে অরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে খুব ব্যাপকভাবে বিস্তৃত বক্তৃতা করিলেন।

ইহার মধ্যে, ৭ই ডিসেম্বর, "পাইওনিয়ার" পত্রিকা Pan-Islam সম্পর্কে যে উস্কানি দিয়াছিলেন, বন্দেমাতরম্'-এ তাহার উল্লেখ থাকিবে। ১০ই ডিসেম্বর অতীত বৎসরের (১৯০৭) সালতামামি করিয়া "বন্দেমাতরম্" লিখিবে—

"The year that is fast nearing its end has been a year of revolution in the history of India's dependence—revolution in thought and action. Lajpat, Ajit, Basanta, Bhupen, Bipin, Liakat ··· . The great Upadhyaya mystically borne away from us on the wings of a kindly death."—The Congress & The New Thought—*Bande Mataram*; *Dec. 10, 1907.*]

১২ ডিসেম্বর, 'Disgraceful Affairs In The Transvaal' নাম দিয়া অরবিন্দ মহাত্মা গান্ধীর প্রথম উদ্যমকে সমর্থন করিলেন। এই উভয় নেতার জীবনচরিতে এ ঘটনাটি অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী ট্রান্স্ভালে তাঁহার প্রথম উদ্যমে বাঙ্গলার মডারেট নেতাদের নিকট যত না সমর্থন পাইয়াছেন, তার অপেক্ষা অনেক বেশী সমর্থন পাইয়াছেন

বাঙলার চরমপন্থী নেতাদের নিকট হইতে। এই চরমপন্থীদলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদী আছেন, আবার সন্ত্রাসবাদীও আছেন। নাই, একথা বলিলে তো চলিবে না। কেননা, অরবিন্দ শুধু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদী নহেন।

এই সময়ের ইতিহাসের পদচিহ্ন অনেকগুলি অস্পষ্ট হইয়াছে, আবার অনেকগুলি একেবারেই মুছিয়া গিয়াছে। কালস্রোতে এই রকমই হয়। বন্দেমাতরম্-এ যে পদচিহ্ন, তার সবগুলিই অরবিন্দের লেখনীমুখে রেখাঙ্কিত হইয়া আছে, এমন নয়। কিন্তু ইহার কোনটিই অরবিন্দের মতবিরুদ্ধ নয় এবং ইহার প্রায় সবগুলিতেই অরবিন্দের সমর্থন আছে—একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

রাজদ্রোহ-উদ্দীপক সভা নিষিদ্ধ : যে-সকল খবরের কাগজে 'সিডিসন' লেখা হইতেছিল গভর্ণমেণ্ট সেগুলিকে একয়মাস যাবৎ দলন করিয়াছেন। কিন্তু সভাতেও 'সিডিসন' বক্তৃতা করা হয়। অথবা, বক্তৃতায় 'সিডিসন্' করা হয়। সুতরাং এই সভাগুলিকেও দলন অথবা দমন করা আবশ্যক। অতএব ১লা নভেম্বর (১৯০৭) সিমলায় বৈঠকে বড়লাট আইন পাস করিলেন যে—কোন সভা করিতে হইলে সাতদিন আগে দরখাস্ত করিতে হইবে। সভা করিতে দেওয়া বা না-দেওয়া, পুলিশ বা ম্যাজিষ্ট্রেটের মর্জ্জী ও মেজাজের উপর নির্ভর করে। কাহারও বাড়ীতেও যদি কুড়ি জনে জটলা করে, তবে তাহাও এই সভা-বিমর্দ্দন আইনের কবলে পড়িবে। মি: গোখলে অনেক সদ্যুক্তি দিলেন যে—এ রকম আইন একেবারে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ গ্রীবা বাঁকাইলেন—হুমকি দেখাইলেন যে, ইহার ফলে ছেলেরা সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে। সুতরাং তিনি বলিলেন—

"I oppose this Bill, because it violates all the traditions which have up to this time guided the Government. I oppose this Bill, because I wish to see the English Rule broad-based on the people's will and not resting merely on the sword, whether Indian or British. And lastly, I oppose this Bill, because it will kill all political life in the countty."

বার্ক (Burke) ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের ইম্‌পিচ্‌মেণ্ট (impeachment) বক্তৃতা অনেকটা এই কায়দাতেই করিয়াছিলেন।

বুদ্ধিমান বলিয়া বাঙ্গালীর একটা দুর্নাম আছে। বাঙ্গালীর কলমের জোর ও গলার জোরের কথাও লোকে বলে। কিন্তু সংবাদপত্র ও সভা দলনের চোটে, এই দুই জোরের একটাও টিকিতে পারিল না। সুতরাং সন্ত্রাসবাদীদের আবার একটা সুযোগ আসিল। অরবিন্দ আরো অত্যাচার চাহিয়াছিলেন। ১লা নভেম্বর আর এক দফা তিনি তাহা পাইলেন। অত্যাচার ও সন্ত্রাসবাদ, এইবার একে অন্যের মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল। বাঙ্গলার ইতিহাসে ইহার ফল অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াইয়া চলিবে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইব। এবং সেই ভয়ঙ্কর ইতিহাসের উদ্বেলিত তরঙ্গের মধ্যে অরবিন্দকে চিনিতে আমাদের ভুল হইবে না।

ছোটলাট ফ্রেজার ঃ ছোটলাট ফুলার বধের ব্যর্থ চেষ্টায় অরবিন্দের কতখানি হাত—হাত না-ই বা বলিলাম, মস্তিষ্ক—অর্থাৎ পরামর্শ ও নেতৃত্ব ছিল, তাহা আমরা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছি। কাহারও কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না। 'হত্যাকারী' ছিলেন হেমচন্দ্র। শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত সঙ্গী ছিলেন ভূপেন দত্ত। শিলং-এ উপনেতা বা উপদেষ্টা ছিলেন বারীন্দ্রকুমার স্বয়ং। আর কলিকাতায় নেতা ছিলেন অরবিন্দ। তখন কলিকাতায় শিবাজী উৎসবের ধুম চলিতেছে। তিলক মহারাজ আসিয়াছেন। ফ্রেজার বধের চেষ্টার সময় হেমচন্দ্র ইয়ুরোপ হইতে ফিরিবার পথে, তখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই। যেমন ফুলার বধের চেষ্টায়, তেমনি ছোটলাট ফ্রেজার বধের চেষ্টার সময়েও বারীন্দ্রই উপনেতা। তিনি কর্ম্মস্থল হইতে কিছুটা দূরে থাকিয়া উপদেশ দিতেছেন, কলকাঠি নাড়িতেছেন।

ফ্রেজার বধের চেষ্টা পর্য্যন্ত আসিবার পূর্ব্বে কিছুটা বলা দরকার। স্বয়ং উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"এই সময় হইতে দেশে রাজদ্রোহের মামলার ধুম লাগিয়া গেল। দুই সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই যুগান্তরের উপর আবার মামলা সুরু হইল এবং যুগান্তরের প্রিণ্টার বসন্তকুমারকে জেলে যাইতে হইল।

"একে একে এরূপে অনেকগুলি ছেলে জেলে যাইতে লাগিল। তখন বারীন্দ্র বলিল : এরূপ বৃথা শক্তিক্ষয় করিয়া লাভ নাই। বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া গভর্ণমেণ্টকে ধরাশায়ী করিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। এতদ্ভিন্ন

যাহা প্রচার করিয়া আসিলাম, তাহা এইবার কাজে করিয়া দেখাইতে হইবে।—এই সঙ্কল্প হইতেই মানিকতলার বাগানের সৃষ্টি।

"মানিকতলায় বারীন্দ্রের একটা বাগান ছিল। স্থির হইল যে, একটা নূতন দলের উপর যুগান্তরের ভার দিয়া যুগান্তর অফিসের জনকতক বাছাই ছেলে লইয়া ঐ বাগানে একটা নূতন আড্ডা গড়িতে হইবে।

"মানিকতলার বাগানে যখন আশ্রমের সূত্রপাত হইল তখন সেখানে চার পাঁচজনের অধিক ছেলে ছিল না। হাতে একটিও পয়সা নাই…ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশের নানা জেলা হইতে প্রায় ২০ জন ছেলে আসিয়া জুটিল।… বাগানের কাজকর্ম যখন আরম্ভ হইয়া গেল, তখন ছেলেদের বারীনের কাছে রাখিয়া দেবব্রত ও আমি আর একবার আশ্রমের উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে বাহির হইলাম।…প্রথমেই গিয়া এলাহাবাদে একটা প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালায় দুই চারিদিন পড়িয়া রহিলাম। … প্রয়াগ হইতে বিন্ধ্যাচলে আসিয়া এক ধর্ম্মশালায় কিছুদিন পড়িয়া রহিলাম…বারীনের চিঠি আসিল—'শীঘ্র ফিরিয়া এসো'।…বারীনের চিঠি পাইয়াই তল্পি-তল্পা গুছাইয়া রওনা হইলাম। বাগানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম একেবারে 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গিয়াছে। যে সমস্ত নূতন ছেলে আসিয়া জুটিয়াছে, উল্লাসকর তাহাদের মধ্যে একজন।… সে-সময় কিংসফোর্ড সাহেব একে একে সব স্বদেশী কাগজওয়ালাদের জেলে পুরিতেছেন। পুলিসের হাতে এক তরফা মার খাইয়া দেশশুদ্ধ লোক হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। যাহার কাছে যাও, সেই বলে—'না, এ আর চলে না। ক'বেটার মাথা উড়িয়ে দিতেই হবে।' তথাস্তু।

"পরামর্শ করিয়া স্থির হইল—যখন সাহেবদের মধ্যে ছোটলাট আণ্ড্রু ফ্রেজারের মাথাটাই সব চেয়ে বড়, তখন তাঁহারই মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা আগে করা দরকার। কিন্তু লাট-সাহেবের মাথার নাগাল পাওয়া তো সোজা কথা নয়। ডিনামাইট-কার্ট্রিজ লাট-সাহেবের গাড়ীর তলায় রাখিয়া দিলে কাজ চলিতে পারে কি-না, তাহা পরীক্ষার জন্য চন্দননগর ষ্টেশনের কাছাকাছি রেলের উপর গোটা কয়েক ডিনামাইট কার্ট্রিজ রাখিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু উড়াতো দূরের কথা—ট্রেণখানা একটু হেলিলও না। শুধু কার্ট্রিজ ফাটার গোটাদুই ফট ফট আওয়াজ শূন্যে মিলিয়া গেল, লাটসাহেবের একটু ঘুমের ব্যাঘাত পর্য্যন্ত হইলনা। দিনকতক পরে শোনা গেল যে, লাট-সাহেব রাঁচি না কোথা হইতে

কলিকাতায় স্পেশ্যাল ট্রেণে ফিরিতেছেন। মেদিনীপুরে গিয়া নারায়ণগড় ষ্টেশনের কাছে ঘাটী আগলান হইল। বোমাবিদ্যার যিনি পণ্ডিত তিনি পরামর্শ দিলেন যে, রেলের জোড়ের মুখের নীচে মাটির মধ্যে যেন বোমাটা পুতিয়া রাখা হয়। তাহার পর সময়মত তাহাতে শ্লো ফিউজ লাগাইয়া আগুন ধরাইয়া দিলেই কার্য্যোদ্ধার হইবে। কিন্তু লাট সাহেবের এমনি অদৃষ্টের জোর যে, বোমা পুতিবার দিন আমাদের ওস্তাদজী পড়িলেন জ্বরে; আর যাঁহারা কেল্লা ফতে করিতে ছুটিলেন তাঁহারা একেবারে ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস। কাজেই বোমা ফাটিল, রেলও বাঁকিল—গাড়ী উড়িল না। তবে ইঞ্জিনখানা নাকি জখম হইল; এবং খড়গপুর ষ্টেশন হইতে আর একটা ইঞ্জিন লইয়া গিয়া লাট-সাহেবের স্পেশালকে টানিয়া আনিতে হয়।

"পুলিশের কর্ত্তারা গাড়ী ভাঙ্গার আসামী ধরিবার জন্য ৫০০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিলেন। সুতরাং আসামীরও অভাব হইল না। জনকত রেলের কুলিকে ধরিয়া চালান করা হইল; তাহারা নাকি পুলিশের কাছে আপনাদের অপরাধও স্বীকার করিল। জজ-সাহেবের বিচারে তাহাদের কাহারও পাঁচ কাহারও বা দশ বৎসর দ্বীপান্তরের হুকুম হইল।"—['নির্ব্বাসিতের আত্মকথা'—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ৬-২৩]

বহু বৎসর গত হয় উপেন্দ্রনাথ উপরি-উদ্ধৃত লেখাগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া দিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথের লেখা হইতে বোঝা যায় যে—

১ম—মানিকতলার আড্ডার ছোকরা-বিপ্লবীদের প্রথম উদ্যম ছোটলাট ফ্রেজার সাহেবের প্রতি। প্রথম চেষ্টা চন্দননগর রেল লাইনের কাছাকাছি। তার মাত্র কয়েকদিন পরেই দ্বিতীয় চেষ্টা, মেদিনীপুরের নিকট নারায়ণগড় ষ্টেশনে। ২য়—এই বোমা হেমচন্দ্রের তৈরী নয়। কেননা, তিনি ইউরোপ হইতে ফিরিবার পথে, কিন্তু তখনও আসিয়া কর্ম্মস্থলে পৌছান নাই এবং দলে যোগ দেন নাই। সম্ভবতঃ এই বোমা উল্লাসকরের তৈরী হইতে পারে। এই বিদ্যা তাঁহার কিছুটা আয়ত্তের মধ্যে ছিল। ৩য়—মানিকতলা বাগানটি শুধু বারীনের নয়, অরবিন্দও উত্তরাধিকারসূত্রে ইহার আংশিক মালিক ছিলেন। ৪র্থ—বারীন অরবিন্দের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে মানিকতলায় বোমার আড্ডা খুলিয়াছে, একথা আদালতে বলা চলে। কিন্তু ইতিহাসে বা জীবনচরিতে একথা বলিলে ঠিক কথা বলা হইবে না। ৫ম—ফুলারবধের ভূমিকায় অরবিন্দ যে

অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ফ্রেজারবধের ভূমিকায় তিনি সেরূপটি করেন নাই—তাঁহার অজ্ঞাতসারে বারীন্দ্রই সবটা করিয়াছে, ইহারও কোন প্রমাণ নাই। ৬ষ্ঠ—পুলিশ এই বোমা ফাটার দরুণ নির্দ্দোষ কুলিদের ধরিয়া আদালতের বিচারে যেরূপ দ্বীপান্তরের শাস্তি পর্য্যন্ত দেওয়াইয়াছিল, তাহা যে পুলিশের পক্ষে কতদূর গর্হিত ও লজ্জাকর, তাহা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু বড় কথা এই যে, পুলিশ তখনও মানিকতলার বোমা-বিপ্লবীদের কোনই খোঁজ বা সন্ধান পায় নাই। পুলিশের পক্ষে ইহা কর্ম্মকুশলতার পরিচয় নয়। অকর্ম্মণ্যতাই প্রমাণ করে।

হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"কয়েক সপ্তাহ আগে অর্থাৎ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর বাংলার লাট ফ্রেজার সাহেবের গাড়ী বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল—আমারই বাড়ীর কাছে। তাই বম্বেতে এই খবর পেয়ে একটু বিব্রত হয়েছিলাম। মেদিনীপুরের বিপ্লবী বন্ধুদের কাছে এই ঘটনার বিশেষ বিবরণ শুনলাম। বারীনের এও একটা honest attempt. 'রণনীতির' ধারা অনুযায়ী, জান্ড্রেলের নাকি রণক্ষেত্রে অর্থাৎ ঘটনাস্থলে যাওয়া নিষিদ্ধ; তাই বুঝি বারীন খড়্গপুর থেকে শ্রীমান্ বিভূতিকে খড়্গপুরের প্রায় দশ কি বার মাইল দূরে নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত একটা নির্জ্জন স্থানে রেল লাইনের তলায় কয়েক পাউণ্ড ডিনামাইট পুঁতে দিয়ে আসতে পাঠিয়েছিল। লাট 'সাহেবের' গাড়াটা নাকি জখম হয়েছিল। যাই হোক, এই অপরাধের অপরাধীকে ধরে দিতে পারলে সরকার থেকে এক হাজার আর বি. এন. রেল কোম্পানী থেকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

"বিপ্লববাদীদের দ্বারা যে এ ঘটনা ঘটতে পারে, অথবা বিপ্লববাদী বলে কোন জীবের অস্তিত্ব যে বাংলাদেশে থাকতে পারে সে ধারণা তখন বেঙ্গল পুলিশের গজায় নি। তার প্রমাণ, তাঁরা নাগপুরী কুলীদের ভেতর থেকে কি রকম করে একদল আসামী বের করে আইন-কানুন মোতাবেক তাদের অপরাধ সাব্যস্ত করে ফেলেছিলেন।

"উক্ত ৬ই ডিসেম্বরের পরের দিন মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর বাৎসরিক অধিবেশন হয়েছিল।"—[বাং-বি-প্র—পৃঃ ২২৮-২৯]

হেমচন্দ্রের লেখা হইতে পাই যে—১ম, লাটসাহেবের গাড়ীর নীচে বোমা

ফাটাইবার তারিখ ৬ই ডিসেম্বর ১৯০৭ ; আর মেদিনীপুর কনফারেন্সের তারিখ তার পরের দিন—৭ই ডিসেম্বর ১৯০৭। ২য়,—বোমা ফাটাইবার স্থানটি মেদিনীপুর কনফারেন্স হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। ৩য়,—উপেন্দ্রনাথ যেমন বারীন্দ্রের গুণমুগ্ধ, হেমচন্দ্র আবার ঠিক তার উল্টা—বারীন্দ্রের উপর বিরূপ। হেমচন্দ্র বারীন্দ্রকে, বারীন্দ্রের কার্য্যকে পরোক্ষে ভীরুতা বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন।

আমাদের বক্তব্য, অরবিন্দ ৭ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন এবং বিপিন পালের জেলে গমনের দরুণ তিনিই মডারেট-বিরোধী চরমপন্থী দলের এক অদ্বিতীয় অবিসংবাদিত নেতার ভূমিকায় মেদিনীপুর কনফারেন্সে কার্য্য করিয়াছেন। ঐ কার্য্যের ভাল বা মন্দ, নিন্দা বা প্রশংসা—দুই-ই তাঁহার প্রাপ্য।

ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ অ্যালেনকে গুলী : মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্সের একদিন আগে, রেল লাইনের নীচে ডিনামাইট পুঁতিয়া ছোটলাট ফ্রেজার সাহেবের গাড়ী উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা বারীন্দ্রের দল এবং বারীন্দ্র নিজে করিলেও উহা ফস্কাইয়া যায়। বোমা ফাটিয়াছিল ; লাইনও কিছুটা বাঁকিয়াছিল—কিন্তু গাড়ী উল্টায় নাই।

এই ঘটনার ১৭ দিন পর, ২৩শে ডিসেম্বর, (মেদিনীপুর কনফারেন্সের দুই সপ্তাহ পর এবং সুরাট কংগ্রেসের তিন দিন পূর্ব্বে) ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ অ্যালেনকে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে বিপ্লবীর দল গুলী করে। বারীন্দ্র বলিয়াছেন যে, তাঁহার দল এই কার্য্য করে নাই। বাঙ্গলা দেশে তখন "বিপ্লববাদীরা অনেক ছোট ছোট দলে ভাগাভাগি হয়ে গেছে।" সুতরাং ইহা অন্য দলের কার্য্য হওয়া অসম্ভব নয়। কাজেই প্রমাণ হইতেছে যে, তখন সন্ত্রাসবাদীদের সবগুলি দল এক নেতৃত্বের অধীনে একত্রে মিলিত হইতে পারে নাই। বারীন্দ্রের উপনেতৃত্ব ও একাধিপত্যের চোটে ইহা সম্ভব হয় নাই। "আর, ক-বাবু (অরবিন্দ) বারীনের কথা ছাড়া আর কারও কথা কানে তোলেন না। আর অন্যে যে suggestion দেয়, ঠিক তার উল্টো করাই বারীনের স্বভাব।"—[বাং-বিঃ-প্রঃ—পৃঃ ২৩০]

বারীন্দ্রের এই উপনেতৃত্ব ও একাধিপত্য এবং বারীন্দ্রের উপর অরবিন্দের যুক্তিহীন অসঙ্গত পক্ষপাতিত্ব, গুপ্ত-সমিতির প্রথম পর্ব্বে (১৯০২-১৯০৪) যতীন্দ্র

ব্যানার্জিকে বিতাড়নের সময় আমরা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তাহার ফলে দল ভাঙ্গাভাঙ্গিও দেখিয়াছি। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"সেই ডিসেম্বরের ২৩শে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন (Mr. Allen) সাহেবকে অকারণে কে পিস্তল দিয়ে গুলী করেছিল। যদিও নাকি বিপ্লববাদীদের প্রায় সবগুলি দল এই কীর্ত্তির অধিকারী ব'লে নিজেদের মধ্যে দাবী করেছিল, তথাপি ঐ জন্য কেউ অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে দণ্ড পায় নি।"—[বাং-বিঃ-প্রঃ—পৃঃ ২২৯]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত বারীন্দ্র-পরিচালিত সন্ত্রাসবাদীর দল ছোট লাট ফুলার এবং ফ্রেজার বধের উদ্দাম কল্পনায় দুঃসাহসের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। কিন্তু কাজে তাঁহাদের হাত পাকে নাই। তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত বোমা কোথাও ফাটিয়াছে এবং কোথাও ফাটে নাই। আর শেষ যেখানে ফাটিয়া প্রলয় কাণ্ড করিয়াছে (মজঃফরপুর), সেখানে দুইটি নির্দ্দোষ ইংরেজ মহিলাকে বিনা কারণে, অত্যন্ত কাপুরুষোচিত ও নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। মিঃ অ্যালেনকে গুলী করায় প্রমাণ হইল যে, বারীন্দ্রের দল ছাড়া তখন সন্ত্রাস-বাদীদের আরও দল বাঙ্গলা দেশে আছে এবং তাহারাও গুলী করে। মিঃ অ্যালেন গুরুতর আহত হইলেও, শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু পুলিশ এই ঘটনার অপরাধীকে ধরিতেও পারে নাই এবং নিরপরাধকে ফ্রেজার বধের কুলীদের মত দ্বীপান্তরের শাস্তিও দিতে পারে নাই। তথাপি, তখনও এই পুলিশের প্রশংসাই আমরা শুনিয়া আসিয়াছি।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও সন্ত্রাসবাদ ঃ ছোটলাট ফুলার বধের ব্যর্থ চেষ্টা সম্পর্কে সুরেন্দ্র ব্যানার্জী তাঁহার আত্মজীবনীতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। এইবার ছোটলাট ফ্রেজারবধের ব্যর্থ চেষ্টা সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা তুলিয়া দিতেছি :

"Soon after the incidents (ফুলার বধের ব্যর্থ চেষ্টা) which I have described at some length, came the attempt to blow up Sir Andrew Fraser's train at Nursinggarh near Minapore. Sir Andrew Fraser was Lieutenant-Governor and was one of the authors of the partition of Bengal, and that alone made him one of the most unpopular among our rulers

within living memory. His administration of the province created a violent prejudice against him."—[*A Nation In Making*, P. 234-235]

বিপিন পাল অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত সন্ত্রাসবাদের বিরোধী, একথা সবিস্তারে উল্লেখ ও প্রমাণ করা হইয়াছে। সুরেন্দ্র ব্যানার্জীও সন্ত্রাসবাদের বিরোধী, তাহার প্রমাণ তাঁহার লেখা হইতেই তুলিয়া দিতেছি—

"With anarchism no one can have any sympathy. Murder is murder, no matter by what name the deed is sought to be palliated, or by what motives excused. But let not the historian of the future lose sight of the atmosphere of mistrust, of hopelessnesss and helplessness, created by the acts of an administration which no British historian can refer to without a blush on his countenance."—(*Ibid*, *P.* 234)

সুরেন্দ্র ব্যানার্জী সন্ত্রাসবাদকে গালি দিলেন এবং সেই সঙ্গে ইংরেজের এদেশে শাসনপদ্ধতিকেও গালি দিলেন। কিন্তু বিপিন পাল যে-কারণে সন্ত্রাস-বাদের বিরোধী, সুরেন্দ্র ব্যানার্জী ঠিক সেই কারণেই বিরোধী নহেন—উভয়ের বিরুদ্ধতায় পার্থক্য আছে।

অরবিন্দ আইরিশ্ সিন্‌ফিন্ মতাবলম্বী কি-না : মিঃ নেভিন্‌সন্ বলেন যে—অরবিন্দ নিজে তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তিনি (অরবিন্দ) সিন্‌ফিন্ মতাবলম্বী। ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষও সুরাট কংগ্রেসের অপঠিত বক্তৃতায় লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গলার নূতন চরমপন্থী দল আয়ারল্যাণ্ডের সিন্‌ফিন্‌দের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। ["Like the Sinn Fein Party in Ireland it (*The New Party*) has lost all faith in constitutional movements".] তবে খুনাখুনির কথা তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন ; তার কারণ—হয় তিনি অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত সন্ত্রাসবাদীদের খবর জানিতেন না অথবা জানিয়াও, উকিল মানুষ, চাপিয়া গিয়াছেন। তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকেই ('passive resistance of a most comprehensive kind') নূতন দলের একমাত্র অস্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি নূতন দলের অস্ত্র শুধু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ তো নয়, তার সঙ্গে ফুলার বধ ও ফ্রেজার-বধের

চেষ্টাও আছে। সুতরাং বাংলার নূতন দল পুরাপুরি সিন্‌ফিন্‌দের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছে। খুনাখুনি কাণ্ড বাদ দেয় নাই।

আয়ারল্যাণ্ডের মেয়ে, ভগিনী নিবেদিতা আয়ারল্যাণ্ড ও রাশিয়ার বিপ্লববাদে ভরপুর ছিলেন।* তিনি এই সময়টায় (১৯০৭।আগষ্ট—১৯০৯।আগষ্ট) ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গিয়া বাঙ্গালী সন্ত্রাসবাদী ফেরার যুবকদিগের সংঘবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার এই দুই বৎসরের কার্য্যাবলী একটি অলিখিত ইতিহাস।

এই সম্পর্কে মিঃ নেভিন্‌সন্‌ লিখিয়াছেন--

"In the grey light of Christmas morning, as we came through some obscure junction in the train, we had heard that Mr. Allen, the Collector of Dacca, had been shot on the platform at Goalundo in Eastern Bengal, and his life was despaired of. Mr. Allen did in the end recover, but at the time recovery was said to be impossible, and the news threw the same gloom and consternation over the Indian party of reform as struck the Irish Home Rulers on the news of the Phœnix Park murders. The month before there had been an attempt to wreck Sir Andrew Fraser's train as he was returning from Orissa ; but this was the first political assassination, and every one knew that it would be answered by more repression, leading to further outrages and more repression again."—[*The New Spirit In India*—P. 238.]

মিঃ নেভিন্‌সন্‌ ছোটলাট ফ্রেজার ও মিঃ অ্যালেন সম্পর্কে Phœnix murder-এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেন। তিনি সুরাট কংগ্রেস অভিমুখে ট্রেনে রওনা হইয়াছেন। ইহার মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে কলিকাতায়, ৬ নং কলেজ স্কোয়ারে, তিনি অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লিখিয়াছেন যে—

"Arabindo's purpose, as he explained it to me, was the Irish policy of Sinn Fein."—[*The New Spirit In India*, P. 221]

Phœnix Murder আয়ারল্যাণ্ডের সিন্‌ফিন্‌দের কার্য্য বলিয়াই সন্দেহ করা

হইয়াছিল। মিঃ নেভিন্‌সনের নিকট অরবিন্দ বলিয়াছিলেন যে, তিনি সিন্‌ফিন্ মতাবলম্বী। অরবিন্দ যে পার্ণেলগুণমুগ্ধ, ইহাও আমরা দেখিয়াছি। ছোটলাট ফুলারবধের ব্যর্থ চেষ্টায় অরবিন্দ যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ছোটলাট ফ্রেজারবধের ব্যর্থ চেষ্টার সময়ও তিনি সেই ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অরবিন্দ ও মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্স ঃ অরবিন্দ মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্সে চলিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে চিঠি লিখিলেন—

"প্রিয় মৃণালিনি, *6th December, 1907.*

আমি আজ মেদিনীপুরে যাব। ফিরে এসে এখানকার সব ব্যবস্থা করে, সুরাটে যাব। হয়ত 15th বা 16thই যাওয়া হইবে। জানুয়ারি ২রা তারিখে ফিরিয়া আসিব। ...

আমার এইখানে এক মুহূর্তও সময় নাই; লেখার ভার আমার উপর, কংগ্রেস সংক্রান্ত কাজের ভার আমার উপর, 'বন্দেমাতরমে'র গোলমাল মিটাইবার ভার আমার উপর। আমি পেরে উঠছি না। তাহা ছাড়া আমার নিজের কাজও আছে, তাহাও ফেলিতে পারি না।

আমার একটী কথা শুনিবে কি? আমার এখন বড় দুর্ভাবনার সময়, চারি দিকে যে টান পড়েছে, পাগল হইবার কথা। এই সময় তুমি অস্থির হইলে, আমারও চিন্তা ও দুর্ভাবনা বৃদ্ধি হয়, তুমি উৎসাহ ও সান্ত্বনাময় চিঠি লিখিলে আমার বিশেষ শক্তিলাভ হইবে, প্রফুল্লচিত্তে সব বিপদ ও ভয় অতিক্রম করিতে পারিব। জানি দেওঘরে একেলা থাকিতে তোমার কষ্ট হয়, ... আমি সাধারণ বাঙ্গালীর মত পরিবার বা স্বজনের সুখ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতে পারি না। ... যদি নিতান্ত না থাকিতে পার, আমি গিরিশবাবুকে বলিব, তোমার দাদামহাশয় বাড়ীতে থাকিতে পারেন আমি যতদিন কংগ্রেসে থাকি।

তো—"

অরবিন্দের সব চিঠিটা ছাপান হয় নাই। আমিও প্রয়োজনমত উল্টাপাল্টা করিয়া সাজাইলাম। মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্সের তারিখ ৭ই ডিসেম্বর। অরবিন্দ ৬ই ডিসেম্বর রওনা হইলেন। আর এই ৬ই ডিসেম্বর ছোটলাট ফ্রেজার সাহেবের গাড়ী মেদিনীপুরের নিকটেই বারীন্দ্রের উপনেতৃত্বে বোমা দিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইল।

অরবিন্দ মেদিনীপুরে যাইবার পূর্ব্বে ৪ঠা ডিসেম্বর কলিকাতায় চরমপন্থীদের এক সভা হইল। অরবিন্দ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার উদ্দেশ্য ছিল বাংলার চরমপন্থীরা বোম্বাইয়ের মিঃ ফিরোজ সাহ মেহেতা-পরিচালিত স্থরাট কংগ্রেসে যাইবেন কি যাইবেন না। বাংলার চরমপন্থীদের মধ্যে অনেকে এই সময় মডারেট-পরিচালিত কংগ্রেস বর্জ্জন করিবার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। চরমপন্থীদের মধ্যে কংগ্রেস-বর্জ্জন-প্রয়াসী এই অতি উগ্র দলটী অরবিন্দের মতদ্বারাই প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। কেননা বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় ৮ই নভেম্বর "Without Them (Moderates) If It Must Be" এবং ২৭শে নভেম্বর "A Real National Assembly" এই দুইটী প্রবন্ধে মডারেটদের সংশ্রব বর্জ্জনের কথাই লেখা ছিল। যদি ইহা অরবিন্দের অভিমত না হইত তবে ইহা বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় ছাপা হইতে পারিত না। কিন্তু মহারাষ্ট্র হইতে তিলক লিখিয়া পাঠাইলেন যে, কংগ্রেস বর্জ্জন করিলে আত্মহত্যা করা হইবে। ৪ঠা ডিসেম্বরের সভায় বাংলার চরমপন্থীরা মিঃ তিলকের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। দেখা গেল তিলক ও অরবিন্দের মডারেট-সংশ্রব বর্জ্জন সম্পর্কে কিছু মত-পার্থক্য আছে। এবং এই পার্থক্য সত্ত্বেও অরবিন্দ তিলকের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া নিলেন। বিপিন পাল জেলে আবদ্ধ। তিনি জেলের বাহিরে থাকিলে নিশ্চয়ই মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্সে এবং স্থরাট কংগ্রেসে বাংলার চরমপন্থীদের মুখপাত্রস্বরূপ নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করিতেন। কলিকাতা কংগ্রেসে বাংলার চরমপন্থীদের নেতা হিসাবে তিনিই বয়কট প্রস্তাবে—এদেশে ইংরেজের শাসন বয়কট করিবার কথা প্রথম তোলেন। মিঃ তিলক পর্য্যন্ত এতদূর অগ্রসর হন নাই। বিপিন পালের জেলে থাকা অবস্থায় অরবিন্দই এখন বাংলার চরমপন্থীদের নেতা। কিন্তু অরবিন্দ ত শুধু বিপিন পালের মত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদী নহেন, তিনি সন্ত্রাসবাদীও বটে। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রকাশ্য রাজনীতি। সন্ত্রাসবাদ অন্ধকারের গোপন রাজনীতি।

অরবিন্দ প্রকাশ্য ও গোপন--এই দুই প্রকার রাজনীতির মুখপাত্রস্বরূপ নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করিয়া মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্সে গমন করিলেন। এই মেদিনীপুরে পাঁচ বৎসর আগে বারীন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া (১৯০২ খৃঃ) তিনি দুই দুইবার আসিয়াছিলেন এবং এই মেদিনীপুরেই গুপ্ত সমিতির একটী কেন্দ্র

স্থাপন করিয়া হেমচন্দ্রকে এক হাতে গীতা আর এক হাতে তলোয়ার দিয়া গুপ্ত সমিতির মন্ত্রে এই বলিয়া স্বয়ং দীক্ষা দিয়াছিলেন যে—

"ভারতের অধীনতা মোচনের জন্য সব করবো। সোসাইটীর তরফ থেকে যখন যা আদেশ আসবে, তা পালন করতেই হবে, নচেৎ মৃত্যু-দণ্ড।" —(বাং-বি-প্র—পৃঃ ২০-২২ ; হেমচন্দ্র কাননগো)

ছোটলাট ফ্রেজার বধের জন্য বোমা বারীন্দ্রের মারফৎ একদিন আগে আসিল—অরবিন্দ কনফারেন্সে পরের দিন যোগ দিলেন। ডিসেম্বরের ৬ই এবং ৭ই—এই দুইটি তারিখই অরবিন্দের জীবনচরিতে গভীর রেখাপাত করিয়া গিয়াছে। অরবিন্দ একই সময়ে এক হাতে প্রকাশ্য, আর এক হাতে অন্ধকারের রাজনীতি, সব্যসাচীর মত পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। এমনটি আর কোন নেতা করেন নাই। বিপিন পালও নহেন, তিলকও নহেন। অরবিন্দের এই স্বরূপটি বারীন্দ্র অতি অল্প কিছুটা মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, সমস্তটা প্রকাশ করেন নাই—

"*Aurobindo* was not only the leader and prophet of an open National Movement, but also *the demi-god and creator of an underground movement too.*"—Dawn of India—15th December, 1933—*Barindra K. Ghose.*

সুতরাং মেদিনীপুর কনফারেন্সে অরবিন্দের নেতৃত্বের স্বরূপ কী, গুরুত্ব কোথায়—তাহা বুঝিতে হইলে শুধু দিবালোকের যোগনিমগ্ন ধ্যানী অরবিন্দ (এই সময় এবং ইহার আরও পূর্ব্ব হইতে অরবিন্দ ধ্যানযোগ অভ্যাস করিতেছেন), বন্দেমাতরমের লেখক অরবিন্দ, সভা-সমিতির প্রকাশ্য রাজনীতির চরমপন্থী নেতা অরবিন্দকে জানিলেই চলিবে না। সেই সঙ্গে "The demi-god and creator of an underground movement"—অন্ধকারের অরবিন্দকেও জানিতে হইবে। ফুলারবধের অরবিন্দকে যেমন চিনিয়াছি, অন্ধকার যতই গভীর হউক ফ্রেজারবধের চেষ্টায় অরবিন্দকেও তেমনি বুঝিতে হইবে। স্বরূপ না জানিলে রূপের জন্ম দেওয়া যায় না। যাহারা অরবিন্দের স্বরূপ না-জানিয়া অথবা গোপন রাখিয়া রূপের জন্ম দিতে এযাবৎ চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই মারাত্মক ভুলটি করিয়াছেন।

এখন মেদিনীপুর কনফারেন্স ও সুরাট কংগ্রেস সম্পর্কে একজন কর্ম্মকর্ত্তা অভিজ্ঞ ব্যক্তির লেখা হইতে কিছুটা তুলিয়া দিতেছি—

"কংগ্রেসে কি মেহেতার যথেচ্ছাচারই সহ্য করিতে হইবে? জাতীয় দলের কেহ কেহ কংগ্রেস-বর্জ্জনের প্রস্তাব করিলেন। তিলক তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, তাহা হইলে রাজনীতিক ব্যাপারে আত্মহত্যা করা হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের নেতারা কংগ্রেস বর্জ্জন করিতে চাহিলেন। তাই ৪ঠা ডিসেম্বর কলিকাতায় জাতীয় দলের নেতাদের এক সভা হইল। অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, কৃতান্ত কুমার বসু, কামিনী কুমার চন্দ, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, রজত নাথ রায়, সুরেন্দ্র নাথ হালদার, বিজয় চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় তিলকের মতই গৃহীত হইল। স্থির হইল, পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে কংগ্রেসে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র প্রচারিত হইবে; পত্রে অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, কৃতান্ত কুমার বসু, কামিনী কুমার চন্দ ও সুন্দরীমোহন দাস—এই কয়জনের স্বাক্ষর থাকিবে। ইহার পর ১১ই তারিখে আর এক পরামর্শ-সভাতেও ইহাই স্থির হয়। ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মেদিনীপুরে জেলা-সমিতির অধিবেশন হয়। মডারেট দলের সুরেন্দ্রনাথ, জাতীয় দলের অরবিন্দ শ্যামসুন্দর প্রভৃতি তথায় গমন করেন। মেদিনীপুরের কতিপয় স্বদেশী-সেবকের উপর শমন জারী হয় এবং সভায় পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডের ভয় দেখাইয়া কোন মডারেট জাতীয় দলকে শঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন। ফলে জাতীয় দলের প্রতিনিধিরা সভা ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র সভা করেন। 'বেঙ্গলী' এই ব্যাপারে জাতীয় দলকে গালি দিতে ত্রুটি করিলেন না।"—(কংগ্রেস, পৃঃ ২১৬-২১৭, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ)

একটী কথা পাইলাম—মিঃ সি. আর. দাশ চরমপন্থী দলভুক্ত, অরবিন্দের সহকর্ম্মী। আর একটী কথা পাইলাম—অরবিন্দের নেতৃত্বে চরমপন্থী দল সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর মডারেট কন্‌ফারেন্স ছাড়িয়া চরমপন্থী দলের স্বতন্ত্র কন্‌ফারেন্স করিলেন। মেদিনীপুরে একই সময়ে দুইটী কন্‌ফারেন্স হইল। একটী নরমপন্থীদের—নেতা সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী, সভাপতি Mr. K. B. Datta. আর একটী চরমপন্থীদের—নেতা ও সভাপতি দুইই হইলেন অরবিন্দ। "Without them (মডারেট) if it must be"—অরবিন্দের নিজের এই কথা মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্সে নিজেই প্রতিপন্ন করিলেন (* ক)। "বেঙ্গলী" পত্রিকার গালাগালির উত্তরে

(* ক) "The Nationalists, though forming the majority, seceded from the Midnapore Conference and held an inde-

"বন্দেমাতরম্" পত্রিকা সমান গালাগালি দিল। বাংলা দেশে নরমপন্থী ও চরমপন্থী মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্সে গিয়া একেবারে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। অরবিন্দের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিল। তিনি সাড়ে নয় মাস আগে তাঁহার স্ত্রীকে পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তুলিয়া দিতেছি—

"প্রিয় মৃণালিনি— 23 Scott's Lane, Calcutta.
17th February, 1907

আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে ভগবান আমাকে নিয়া যাইবেন সেইখানে পুতুলের মত যাইতে হইবে, যাহা করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে।

—তোমার স্বামী"

অরবিন্দ দিবালোক ও অন্ধকার, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসবাদ—এই উভয় শ্রেণীর রাজনীতিক্ষেত্রে একই সময়ে নেতৃত্ব করিতেছেন। এবং উভয় শ্রেণীর রাজনীতিতেই তিনি আর নিজের ইচ্ছাধীন নাই—তিনি এখন ভগবানের ইচ্ছাধীন। এবং ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যাইয়া তিনি শুধু পুতুলের মত কাজ করিয়া যাইতেছেন। সুতরাং মেদিনীপুরে সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর মডারেট কন্‌ফারেন্স ছাড়িয়া চরমপন্থীদের স্বতন্ত্র কন্‌ফারেন্স করা এবং ঠিক সেই সময়েই ছোট লাট ফ্রেজারবধের চেষ্টা—এই দুই কর্ম্মই ভগবানের ইচ্ছা। অরবিন্দ শুধু ভগবানের ইচ্ছাতেই পুতুলের মত কাজ করিয়া যাইতেছেন। ভগবানের হাতে অরবিন্দ রাজনীতিক্ষেত্রে পুতুল নাচিতেছেন মাত্র—এই দৃঢ় বিশ্বাস অরবিন্দের তখন ছিল। ইহা শুধু ১৯০৭।১৭ই ফেব্রুয়ারীর মনোভাব নয়। মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্সের মাত্র কয়েক দিন পরে মিঃ নেভিন্‌সন্ অরবিন্দকে দেখিয়াও এই রকমের কথাই অরবিন্দ সম্পর্কে লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে,

pendent conference of their own with Sri Aravindo as the President."—(*Life-work of Aravindo—by Jyotish Chandra Ghose—p. 37*)

"মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে সংখ্যাধিক্য থাকিলেও, জাতীয় দল একটা বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি না করিয়া, শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে পৃথক সম্মেলন করিল।"—(শ্রীঅরবিন্দ—প্রমোদ কুমার সেন, পৃঃ ৪৩)

ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন ব্যক্তিরা অরবিন্দকে 'ফ্যানাটিক' (fanatic) বলিয়া যদি বিদ্রূপ করে তবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। Fanatic কথাটা প্রশংসাবাচক নয়। সুখের বিষয় আমাদের দেশে ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন লোক নাই। থাকিলেও সংখ্যা খুব কম। মিঃ নেভিন্‌সন্‌ লিখিতেছেন—

"There is a religious tone, a spiritual elevation in such words very characteristic of Arabindo Ghose himself and of all Bengali Nationalists, contrasted with the shrewd political judgement of Poona Extremists. In an age of supernatural religion Arabindo would have become what the irreligious mean by a *fanatic*. He was possessed by that concentrated vision, that limited and absorbing devotion. Like a horse in blinkers, he ran straight, regardless of everything except the narrow bit of road in front. But at the end of that road he saw a vision more inspiring and spiritual than any fanatic saw, who rushed on death with Paradise in sight. Nationalism to him was far more than a political object or a means of material improvement. To him it was surrounded by a mist of glory, the halo that mediæval saints beheld gleaming around the head of martyrs. Grave with intensity, careless of fate or opinion, and one of the most silent men I have known, he was of the stuff that dreamers are made of, but dreamers who will act their dream, indifferent to the means. Nationalism—he said in a brief address delivered in Bombay, early in 1908—is a religion that comes from God."—(*The New Spirit In India*, *p. 226.*)

মিঃ নেভিন্‌সন্‌ মেদিনীপুর কনফারেন্সের পরে এবং সুরাট কংগ্রেসের আগে উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্যটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অরবিন্দের চরিত্রচিত্র আর কেহ এমন সুন্দর ও নিখুঁতভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। বিপিন পাল এই সময়টা জেলে ছিলেন বলিয়া মিঃ নেভিন্‌সনের সহিত তাঁহার

সাক্ষাৎ হয় নাই এবং সেইজন্য বিপিন পাল সম্পর্কে তিনি তাঁহার (বিপিন বাবুর) চরিতচিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। বিপিন পালও ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তবে অরবিন্দের মত এতটা এ রকমের নয়। তিনি মিষ্টিক্ (mystic) নন্, ভীষণ যুক্তিবাদী, জীবন্ত Logic।

সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে—যাঁহারা ছোট লাট ফ্রেজারবধের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারাই মডারেটদের বিরুদ্ধে গোলমাল করিয়া কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গিয়া নিজেদের স্বতন্ত্র সভা করিয়াছিলেন। কথাটা বড়ই সাংঘাতিক এবং মারাত্মক। যাঁহারা অন্ধকারে ফ্রেজারবধের চেষ্টায় লিপ্ত, আবার তাঁহারাই প্রকাশ্যে কনফারেন্সের সভায় অরবিন্দের দলভুক্ত।

"About the same time, *almost on the same day,* that this attempt (ফ্রেজারবধ) was made, the District Conference that met at Midnapore was sought to be wrecked, and *by some of those men upon whom there was a strong suspicion of being associated with the anarchical movement.* ... ... But what happened was to me a revelation, and it was the augury, the precursor of a similar scene enacted on a larger scale in the Surat Congress held a month later. .. The popular faith in constitutional methods was shaken; and young and ardent spirit, writhing under disappointment, but eager to serve their country, were led into the dangerous paths of lawlessness and violence, unrestrained by the voice of their elders."
—(*A Nation In Making, p. 235.*)

আমরা দেখিয়াছি শিলংএ অরবিন্দ যখন বারীন্দ্রকে দিয়া ফুলারবধের চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন কলিকাতায় মহাসমারোহে শিবাজী উৎসব চলিতেছে, তিলক আসিয়াছেন। ঠিক সেই রকম ফ্রেজার বধের চেষ্টার সময়েও মেদিনীপুরে কনফারেন্সের সমারোহ চলিতেছে। প্রকাশ্য ও অন্ধকারের রাজনীতির মধ্যে একটা যোগাযোগ আছে। সুখের বিষয় উভয় বঙ্গের দুইটি লাটই প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিলেন। কারণ অরবিন্দের মন্ত্রশিষ্য বারীন্দ্র বচনে ও কলমে বিপ্লবী—কাজে নয়। মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গিবার কারণ, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

বলিতেছেন যে—মডারেট দল পুলিশ আনিয়া চরমপন্থীদের অর্থাৎ অরবিন্দের দলকে হুমকি দেখাইয়াছিল। অপর পক্ষে সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী বলেন যে—অরবিন্দের দল সভাপতি মিঃ কে. বি. দত্তকে বক্তৃতা করিতে বাধা দিয়াছিল ("Mr. K. B. Dutta, the President of the Conference was repeatedly interrupted in the course of his speech.")। মিঃ তিলক সুরাট কংগ্রেসে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন অরবিন্দের নেতৃত্বে মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্সে অরবিন্দের দল মাত্র বিশ দিন পূর্ব্বে সেই ভূমিকাতেই সম্পূর্ণ 'ষ্টেজ্ রিহার্সেল্' দিয়া ফেলিল। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী বলিলেন—মে দনীপুর কন্‌ফারেন্স সুরাট কংগ্রেসের পূর্ব্বাভাস (precursor)। অরবিন্দের দলের উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীও লিখিয়াছেন—"সুরাটে যে সেবার একটা লঙ্কাকাণ্ড ঘটিবে তা' মেদিনীপুরের কন্‌ফারেন্সে গিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম"—(নিঃ আত্মকথা, পৃঃ ২৫)। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর কথার সহিত উপেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর কথা মিলিয়া গেল। পুলিশের ভয় অরবিন্দের দলের সন্ত্রাসবাদী চেলারা বড় একটা করিতেন না। উপেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর কথা হইতেই তুলিয়া দিতেছি—

"একদিন সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে একখানা চিঠি আসিয়া হাজির হইল যে, যুগান্তরে যেরূপ লেখা বাহির হইতেছে তাহা রাজদ্রোহসূচক। ভবিষ্যতে ওরূপ করিলে আইনের কবলে পড়িতে হইবে। আমরা ত হাসিয়াই অস্থির! আইন কিরে বাবা! আমরা ভারতের ভাবী-সম্রাট, গভর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তরাধিকারী—আমাদের আইন দেখায় কেটা?"—(নিঃ আত্মকথা, পৃঃ ৫-৬)

অরবিন্দের দলের তখনকার দিনের চেলাদের পুলিশের ভয় সম্বন্ধে মনোভাবের একটা অতি পরিষ্কার ছবি আমরা পাইলাম। এই দলটী লইয়াই—সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী লিখিয়াছেন—অরবিন্দ প্রকাশ্য রাজনীতিক্ষেত্রে মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। মডারেটবিমর্দ্দন নাটকাভিনয়ে আগে মেদিনীপুর পরে সুরাট, আগে অরবিন্দ পরে তিলক। বিপিন পাল জেলে আবদ্ধ। তিনি থাকিলে মেদিনীপুরে ও সুরাটে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিতেন, তাহা সঠিক বলা যায় না। এক্ষেত্রে অনুমান সত্যও হইতে পারে আবার সত্য না-ও হইতে পারে। কলিকাতা নৌরজী কংগ্রেসে বিপিন পালের নেতৃত্ব ইতিহাস রচনা করিয়াছে। অরবিন্দ নীরবে শুধু বসিয়াছিলেন, নেতৃত্ব করেন নাই।

অরবিন্দ ও মডারেটপন্থী আবেদন-নিবেদন নীতি : অরবিন্দ ১৮৯৩ খৃঃ "ইন্দুপ্রকাশে' কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় বিদ্যুৎবর্ষণ করেন—বজ্রগর্জ্জনে কংগ্রেসকে সাবধান করিয়া দেন। ইহা পনর বৎসর আগের কথা। অরবিন্দের সতর্কমূলক ভবিষ্যৎবাণীর পর ১৯০৭ খৃঃ ডিসেম্বরে সুরেন্দ্র ব্যনার্জ্জী তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিলেন যে—যুবকের দল আবেদন-নিবেদন নীতিতে বিশ্বাস হারাইয়াছে এবং হিংসামূলক আইনভঙ্গের পথে ধাবিত হইয়াছে ("...were led into the dangerous paths of lawlessness and violence.")। এবং ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ সুরাটের অপঠিত বক্তৃতায় বলিতেছেন যে—চরমপন্থী দল কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতিতে একদম বিশ্বাস হারাইয়াছে ("The new party seems to have persuaded itself that it is hopeless to expect any concessions from our Rulers and that political agitation on the lines of the National Congress are a delusion and a snare.")। ১৮৯৩ খৃঃ মিঃ রাণাডে অরবিন্দকে ধমকাইয়াছিলেন। কিন্তু পনর বৎসর পর সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী ও ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের সুর ধম্‌কানির মত মনে হইতেছে না। মডারেট সুর অনেকটা নামিয়া আসিয়াছে। কুড়িদিন পর সুরাটে মিঃ মেহেতা যে শেষ ধমকানি দিয়াছিলেন তাহার উত্তরে অতি অল্পের জন্য তিনি জুতোপেটা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। মিঃ নেভিন্‌সন্‌ লিখিয়াছেন—

"Suddenly something flew through the air—a shoe !—a Mahratta shoe !—reddish leather, pointed toe, sole studded with lead. It struck Surendra Nath Banerjea on the cheek ; it cannoned off upon Sir Pherozeshah Mehta."—(*Ibid, P. 257-258*)

মারাঠার জুতা এবং বাংলার বোমা-রিভল্‌বার এই সময় রাজনীতিক্ষেত্রে যে উপদ্রব সুরু করিয়াছিল, তাহা ইতিহাস মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। অরবিন্দ পনর বৎসর আগে আবেদন-নিবেদন নীতির বিরুদ্ধে যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, তাহাও ইতিহাস মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। প্রকাশ্য বা গোপন রাজনীতিতে নেতৃত্বের কর্ম্মকুশলতা অরবিন্দের চরিত্রে থাকুক অথবা না-ই থাকুক, অগ্রগামী চিন্তানায়ক হিসাবে তাঁহার স্থান কোন নেতা

অপেক্ষাই নীচে নয়। অরবিন্দ নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"আমি কবিতা ও দেশকে সমান ভালবাসি।" মুশকিল ত এইখানেই। কেননা, রাজনীতি কবিতা নয়।

মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্স সম্পর্কে একটি প্রশ্ন মনে হয়। অরবিন্দ কি সত্যই কংগ্রেস ছাড়িয়া, কংগ্রেসের বাহিরে গিয়া কংগ্রেসবিরোধী আর একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন? সুরাট কংগ্রেসের পর মনে হয় এ বিষয়ে তাঁহার মত মি: তিলকের পরামর্শে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কেননা সুরাট কংগ্রেসের পর বোম্বাই হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে নূতন দলের কংগ্রেস ছাড়িয়া আসিবার কথা নাই। কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়াই কাজ করিবার কথা আছে।

"Our position is—let us work on our different party-lines through our own institutions, but at the same time *let us have the united Congress of the whole people.*"—(United Congress-Speech *by* Sj. Arabindo Ghosh—Calcutta, 10th April, 1908)

অরবিন্দের মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন : অরবিন্দ কলিকাতায় ফিরিবার পর যাহা ঘটিল তাহা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের লেখা হইতে তুলিয়া দিতেছি, তাঁহার অপেক্ষা নিখুঁত ও সত্য ইতিহাস এপর্য্যন্ত আর কেহ লেখেন নাই।

"অরবিন্দ ও শ্যামসুন্দর কলিকাতায় ফিরিবার পর ১৪ই ডিসেম্বর শনিবার গোলদীঘিতে এক সভা আহূত হইল। উদ্দেশ্য—ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষকে কংগ্রেসের সভাপতিপদ ত্যাগ করাইয়া সে পদ লালা-লাজপৎ রায়কে দিতে অনুরোধ করা। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সভার আহ্বানকারীদিগের অন্যতম ছিলেন। অরবিন্দ সভাপতি হইবেন, প্রকাশ করা হয়। তিনি পূর্ব্বে তাহা জানিতেন না; জানিতে পারিয়া বাড়ী ছাড়িয়া যাইয়া 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কার্য্যালয়ে বসিয়া রহিলেন। সভাপতি হইতে বা সভায় যাইতে তাঁহার আপত্তির কারণ তিনি পরদিন বিডন-বাগানে বিবৃত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—'আমি সাধারণের সভাদিতে কোন বক্তৃতা করি না। তাহার বিশেষ কারণ আছে। আমি যখন বিলাতে যাই, তখন আমি শিশু, মাতৃভাষাও শিখি

নাই, সে ভাষায় আমি বক্তৃতা করিতে পারি না। যে ভাষা আমার ও আমার দেশবাসীর মাতৃভাষা নহে, সে ভাষায় দেশবাসীর কাছে বক্তৃতা করা অপেক্ষা বক্তৃতা না-করাই আমি শ্রেয়ঃ মনে করি।' শুনা গেল, পাঁচকড়ি বাবু সভার অন্যতম আহ্বানকারী হইলেও যে উদ্দেশ্যে সভা আহুত, তাহার প্রতিবাদ করিবেন। তিনি তখনকার দিনে জাতীয় দলের 'সন্ধ্যা' সম্পাদনা করেন, রাত্রিতে মডারেট দলের 'বেঙ্গলী'তে কাজ করেন।

"পরদিন বিডন-বাগানে সভা হইল। শ্যামসুন্দর, মনোরঞ্জন ও অরবিন্দ বক্তৃতা করিলেন। শ্যামসুন্দর বলিলেন—'আমাদের এ ফকিরের দেশ; তাই ফকির অরবিন্দই আমাদের উপযুক্ত নেতা।' জাতীয় দলের প্রতিনিধিদিগের সুরাট যাতায়াতে ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হইল এবং সভাস্থলেই কিছু অর্থ সংগৃহীত হইল। মোট প্রায় ৩ শত ৫০ টাকা সংগৃহীত হয়।

"কংগ্রেসের পূর্ব্বে সুরাটে ২৪শে ডিসেম্বর জাতীয় দলের এক পরামর্শ-সভা হইবে বলিয়া অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর এবং আর দশ-বার জন ২১ তারিখে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলেন।"—(কংগ্রেস, পৃ: ২১৭-২১৯)

অরবিন্দ বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারেন না, এই দুঃখে সভাপতি হইবার ভয়ে তিনি বাড়ী ছাড়িয়া পালাইয়া যান। কিন্তু বিপিন পাল ঠিক তার উল্টা। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের পর, বিপিন পালের মত বাংলা ভাষায় এমন বাক্-বিভূতি-সম্পন্ন বক্তৃতা আর কোন বাঙ্গালী নেতাই করিতে পারেন নাই। প্রকাশ্য রাজনীতিতে বক্তা ভিন্ন নেতা হওয়া যায় না। তাই অরবিন্দ অপেক্ষা বিপিন পাল বেশী নেতৃত্ব করিয়াছেন। অরবিন্দ বাংলা না-জানার দুঃখ সম্বন্ধে মিঃ নেভিন্‌সনের নিকটেও আক্ষেপ করিয়াছেন—

"His (Aurobindo's) parents had been half-anglicised, and had never fully taught him his own language. so that he could not write Bengali correctly, or make a speech in the only tongue, as he said, that really went to the heart of the people."—(*Ibid, P. 221*)

১৪ই ডিসেম্বর কম দুঃখে অরবিন্দ সভাপতি হইবার ভয়ে বাড়ী ছাড়িয়া অমৃতবাজার-পত্রিকা আফিসে গিয়া লুকাইয়া থাকেন নাই। যাঁহারা বিপিন পাল ও অরবিন্দের মধ্যে, কে বড় নেতা—এই গবেষণা লইয়া উত্তেজিত হন,

তাঁহারা শান্তভাবে এই উভয় নেতার বাংলা ভাষা জানা ও না-জানা সম্বন্ধে বিবেচনা করিলেই অনেকটা গোল মিটিয়া যায়। তা ছাড়া বিপিন পাল বাগ্মী—অরবিন্দ বাগ্মী নহেন।

সুরাট কংগ্রেসের আগে অরবিন্দ ঃ দুইটি প্রশ্ন। প্রথম—কী মন লইয়া অরবিন্দ সুরাট কংগ্রেসে যাইতেছেন? দ্বিতীয়—অরবিন্দের সঙ্গে যাইতেছেন কে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর কঠিন, অনুমানসাপেক্ষ। কে কার মনের খবর বলিতে পারে? তবে প্রায় এক বৎসর আগে (১০।২।১৯০৭) অরবিন্দ তাঁহার স্ত্রীকে লিখিয়াছেন যে—ভগবান অরবিন্দকে কৃপা করিয়াছেন।

"ভগবান আমাকে তাঁহার অপার করুণার যে আলোক দেখাইয়াছেন, তোমাকেও দেখাইবেন; কিন্তু সে তাঁহারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।"

ইহার অর্থ—ভগবান স্বামীকে কৃপা করিলেই যে সেই সঙ্গে স্ত্রীকে কৃপা করিবেন, এমন কোন কথা নয়। তবে করিতে পারেন, সবই তাঁর ইচ্ছা! অরবিন্দ ঐ চিঠিতে আরো লিখিয়াছেন—

"আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই। যেইখানে ভগবান আমাকে নিয়া যাইবেন সেইখানে পুতুলের মত যাইতে হইবে, যাহা করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে। এখন এই কথার অর্থ বোঝা তোমার পক্ষে কঠিন হইবে।"

হওয়ার কথাই! বেচারী স্ত্রী! লক্ষ্য করিবার বিষয় অরবিন্দ মেদিনীপুর সুরাট পুতুলের মত যাতায়াত করিতেছেন। বাহিরের একটা শক্তিদ্বারা তিনি পুতুলের মত পরিচালিত হইতেছেন। এই শক্তিকে তিনি "ভগবান" বলিয়া কল্পনা করিতেছেন। তিনি আর এখন নিজের ইচ্ছায় কোন কর্ম্মই করিতেছেন না। "আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই"—এই মনের পরিচয় দেওয়া কি সহজ কথা? ইহা সাধারণ নয়, অসাধারণ। লৌকিক নয়, অলৌকিক। এরকম এতটা অলৌকিক মন লইয়া অপর কোন ভারতীয় নেতা সুরাট কংগ্রেসে উপস্থিত হন নাই—মিঃ তিলকও নহেন! অরবিন্দ ও তিলক—এই দুই জনের মন ঠিক এক রকমের নয়, কিছুটা বা অনেক কিছুটা পার্থক্য আছে। মিঃ নেভিন্সনের (Mr. Nevinson) মতে মিঃ তিলকের মনে যে "shrewd political judgement" আছে তাহা অরবিন্দের মনের "spiritual elevation"-এর মধ্যে নাই।

অরবিন্দের নিজের স্বীকারোক্তির মধ্যেই স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে যে, তিনি তাঁহার দেশকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবার জন্য যা কিছু করিতেছেন, তা সমস্তই ভগবান করিতেছেন—তিনি করিতেছেন না, তিনি পুতুল মাত্র। অরবিন্দের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায়—আদেশবাদ ও পুতুল, দুই-ই আমরা পাইলাম। অরবিন্দ সুরাট যাইতেছেন—ভগবানের আদেশ। যা কিছু সেখানে করিবেন—ভগবানের আদেশে। যাহা কিছু সেখানে ঘটিবে—ভগবানের ইচ্ছায়। আর যাহা কিছু ঘটিবে না—তাহাও ভগবানের ইচ্ছা।

অরবিন্দ সুরাট হইতে বোম্বে গিয়া বক্তৃতা দিলেন—"আমরা কিছুই করিতেছি না, সমস্তই ঈশ্বর করিতেছেন"—("God is doing everything. We are not doing anything")। কলিকাতা ফিরিয়া বক্তৃতা দিলেন—"সুরাট কংগ্রেস যে ভাঙ্গিয়াছে ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা। আবার যদি জোড়া লাগে, তা-ও ঈশ্বরের ইচ্ছা। ("The breaking up of the Congress at Surat was God's will and if it can meet again on a basis of union that would also come from His will."

কি মন লইয়া অরবিন্দ সুরাটে যাইতেছেন—তার কিছুটা পরিচয় আমরা পাইলাম। তিনি নিজের অন্তরেও ভগবানের আদেশ পাইতেছেন, আবার বাহিরে রাষ্ট্রক্ষেত্রে যা কিছু ঘটিতেছে তাতেও ঈশ্বরের ইচ্ছাই দেখিতেছেন। ইহাকেই বলে অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরকে (God in soul) দেখা আর ইতিহাসে ঈশ্বরকে (God in history) দেখা। অরবিন্দ দুই রকমেই ঈশ্বরকে দেখিতেছেন।

কিন্তু সুরাটের অব্যবহিত পূর্ব্বে দুইটি ঘটনায় অরবিন্দের মন বিষম আলোড়িত হইয়াছে। প্রথম, বারীন্দ্র কর্ত্তৃক ছোটলাট ফ্রেজার বধের চেষ্টা—(ছোটলাট ফুলার বধের চেষ্টার মত) ৬ই ডিসেম্বর ১৯০৭ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে; আর দ্বিতীয়, মেদিনীপুরে মডারেট-বিমর্দ্দন করিতে গিয়া পুলিশের হুমকি দেখিয়া মডারেটদের ত্যাগ করিয়া অরবিন্দ চরমপন্থীদের লইয়া ৭ই ডিসেম্বর ১৯০৭ একটা পৃথক সভা করিয়া আসিয়াছেন। মডারেটদের সহিত একসঙ্গে একত্রে সভা করা অরবিন্দের পক্ষে আর সম্ভব নয়। ইহা সুরাট নয়, মেদিনীপুর। ইহা তিলক নয়, অরবিন্দ। অরবিন্দই এ পথের প্রথম পথপ্রদর্শক ও পথচালক।

মডারেট আদর্শ—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন। অরবিন্দের আদর্শ—পূর্ণ

স্বাধীনতা। মডারেট উপায়—বৈধ ও শান্তিপূর্ণ আবেদন-নিবেদন। অরবিন্দের উপায়—প্রকাশ্যে লেখনীমুখে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আর অন্ধকারে তরুণ বিপ্লবীদের দ্বারা লাট বে-লাটের উপর সন্ত্রাসবাদমূলক বোমা নিক্ষেপ। কংগ্রেসের সহিত অরবিন্দের কোন কিছুই মিল নাই। সমস্তই গরমিল। এই মন লইয়াই অরবিন্দ সুরাট যাইতেছেন। "Without them (মডারেট) if it must be"—সুরাট যাইবার আগে এইত মনের ভাব।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সহজ। কেননা প্রত্যক্ষ। সঙ্গে যাইতেছেন—ফুলার-ফ্রেজার বধের চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়াছেন যে বোমারুবীর তিনি, অরবিন্দের মন্ত্রশিষ্য কনিষ্ঠ বারীন্দ্রকুমার। বারীন্দ্রের সুরাটে যাইবার উদ্দেশ্য, বারীন্দ্র নিজেই বলিলেন—

"সুরাটে গিয়া আমি ··· কয়েকজন মারাঠি, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী ও বাঙ্গালী বিপ্লব-পন্থী নেতাকে একটি গুপ্ত-চক্রে আহ্বান করিলাম।"—(আত্ম-কাহিনী—গুপ্তচক্র ; পৃঃ ২৯—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ)

এই সুরাটেই বারীন্দ্র অরবিন্দকে সারা ভারতে মিষ্টান্ন বিতরণের ("Sweet Letter") অর্থাৎ বোমা সরবরাহের সেই বিখ্যাত চিঠিখানি লিখিবেন। বোমারু বারীন্দ্র অমনি বিনা কাজে অরবিন্দের সঙ্গে সুরাট যাইতেছেন না। অরবিন্দের সহিত বারীন্দ্র সন্ত্রাসবাদ ব্যাপারে সুরাটে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত আছেন। বারীন্দ্রের মিষ্টান্নের চিঠি জাল নয়, সত্য চিঠি। কে বলিল? বারীন্দ্র নিজেই আমাকে বলিয়াছেন।

সুতরাং ক্রমে বুঝা যাইতেছে অরবিন্দ কী মন লইয়া সুরাট যাইতেছেন এবং কেনই বা বারীন্দ্র সঙ্গে যাইতেছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত ইহার সমস্তটাই ভগবানের আদেশ আর ভগবানের ইচ্ছা! ইহাই অরবিন্দের অভিমত।

আদেশ ও সন্ত্রাসবাদ : তারপরে প্রশ্ন—গুরুতর প্রশ্ন—অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্তসমিতির দ্বিতীয় পর্ব্বে (১৯০৬—১৯০৮), বঙ্গ-ভঙ্গের পর, পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের দুই দুই জন লাট ফুলার-ফ্রেজারের চলন্ত রেলগাড়ী বোমা দিয়া উল্টাইয়া তাঁহাদের প্রাণ বধের যে চেষ্টা হইয়াছিল—এর জন্য অরবিন্দ ভগবানের নিকট হইতে আদেশ পাইয়াছিলেন কি-না? উত্তর—নিশ্চয়

পাইয়াছিলেন। অরবিন্দ আদেশ না-পাইলে আর বারীন্দ্র তাহা প্রচার না-করিলে বাঙ্গালীর ছেলে এই রকম অভূতপূর্ব্ব দুঃসাহসিক কার্য্যে মাথা দেয়—না, পা বাড়ায়!

ছোটলাট ফুলার (১৯০৬জুন-জুলাই) ও ছোটলাট ফ্রেজার (১৯০৭, ডিসেম্বর) বধের চেষ্টার মধ্যে সময়ের ব্যবধান পুরা দেড় বৎসর। ফুলার বধ-পর্ব্বে, প্যারিস যাইবার পূর্ব্বে হেমচন্দ্র হইয়াছিলেন হত্যাকারী। ফ্রেজার বধের সময় হেমচন্দ্র প্যারিস হইতে দেশে ফিরিবার মুখে, সুতরাং হত্যাকারী মনোনীত হইয়াছিলেন শ্রীমান বিভূতি। উপনেতা বারীন্দ্র—নেতা অরবিন্দ।

হেমচন্দ্র দেশে ফিরিবার পর—সুরাট কংগ্রেসের পর—চন্দননগরের ফরাসী মেয়র মিঃ তার্দ্দিভিলের উপর বারীন্দ্র বোমা নিক্ষেপের যে আবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করেন সেই প্রসঙ্গেই রাজনৈতিক গুপ্ত-হত্যা ব্যাপারে অরবিন্দের আদেশ পাওয়ার কথা এবং তার প্রমাণ আমরা পাই। আর কেহ নহে, হেমচন্দ্র স্বয়ং এই প্রমাণ দিতেছেন—

"ইতিমধ্যে চন্দননগরের মেয়রকে মারবার জন্য একটা বোমার ফরমায়েস বারীন করে পাঠাল। আমি কিছুতেই তখন বুঝতে পারি নি যে ... ... সকল প্রদেশে এক সঙ্গে terroristic work করবার মত সামর্থ্য লাভ করবার আগে—কেন বৈপ্লবিক হত্যা করবার খেয়াল ক-বাবুর (অরবিন্দের) মত মানুষের মাথায় জেগে উঠেছিল। ... ...

"তারপর ক-বাবুর (অরবিন্দের) ওপর অন্ধ বিশ্বাস। অতবড় জ্ঞানী লোক যখন আদেশ দিয়েছেন, তখন এটা উচিত না-হয়ে যায় না। পরে এই কাজটার অ-ন্যায্যতা সম্বন্ধে বাদানুবাদ করতে গিয়ে শুনেছিলাম—ক-বাবুর (অরবিন্দের) কাছে 'বাণী' এসেছিল। সেই 'বাণী' বারীন জারী করেছিল।"
—[বাং-বি-প্র—পৃঃ ২৩৮-২৩৯—হেমচন্দ্র কাননগো]

অরবিন্দের আদেশ পাওয়ার প্রমাণ স্পষ্ট পাওয়া গেল—'বাণী' আসার অর্থই আদেশ পাওয়া।

চন্দননগরের মেয়রের জন্য যদি 'বাণী' আসিয়া থাকে, 'বাণী' আসার প্রয়োজন হয়—তবে বাংলার দুই দুই জন লাটের জন্য কি অরবিন্দের নিকট 'বাণী' আসে নাই? মেয়রের জন্য প্রয়োজন, আর লাটের জন্য প্রয়োজন নাই—তাও কি হয়? যে কারণে মেয়রের জন্য 'বাণী' আসার প্রয়োজন

হইয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই লাটের জন্যও প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রমাণ হইল—সন্ত্রাসবাদে গুপ্ত হত্যার জন্য অরবিন্দ ভগবানের আদেশ পাইয়াছিলেন।

সেকালে ডাকাতেরা কালীপূজা করিয়া, মা-কালীর আদেশ লইয়া ডাকাতি করিতে যাইত—এও অনেকটা সেই রকম। উদ্দেশ্য ভিন্ন হইতে পারে—উপায় এক।

আর একটা কথা। য়ুরোপের বহু দেশেই সন্ত্রাসবাদ আছে, গুপ্ত-সমিতি আছে, তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গুপ্ত-হত্যাও করে। কিন্তু ভগবানের প্রত্যক্ষ আদেশ পাইয়া এরূপ কার্য্য করে—এমন ত শুনা যায় না! ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত আর কোথাও ত দেখা যায় না। আয়ারল্যাণ্ডের ফিনিক্স-হত্যা, বোম্বাইয়ের র‍্যাণ্ড এণ্ড আয়ার্ষ্ট হত্যাতে ত ভগবানের আদেশের কথা শুনা যায় নাই। নিছক রাজনৈতিক অত্যাচার—অভিযোগের কথাই শুনা গিয়াছে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার মুখে গুপ্তহত্যা হইয়াছে।

বিশেষতঃ ১৯০২ খৃঃ অরবিন্দ যখন প্রথম গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ত এরকম আদেশবাদ প্রচার করেন নাই। সুতরাং ইহা ক্রম-অভিব্যক্তি, ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"১৯০২ খৃঃ হ'তে দু'বছর যাবৎ বাংলায় বিপ্লববাদ প্রচার পাশ্চাত্য উপায়ে সহজসাধ্য নয় দেখে, ক-বাবু (অরবিন্দ) বিপ্লববাদে ধর্ম্মের খোলস পরাবার জন্য ধর্ম্ম সাধনায় প্রবৃত্ত হন। তারপর স্বদেশী আন্দোলন যখন বিরাট আকার ধারণ করে, তখন এর সুযোগে বিপ্লববাদ প্রচারের চেষ্টা করেন।"—(পৃঃ ২৪৪)

"সেকালে যেমন মহম্মদ গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি অবতারেরা ধর্ম্মের সাহায্যে লোককে অন্ধভাবে চালিত করেছিলেন ক-বাবু (অরবিন্দ) দেখলেন, সে রকমটি না হ'লে চলছে না। প্রথমে তাই ধর্ম্মকে উপায় স্বরূপে ধরে নিয়ে বিপ্লববাদ প্রচারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সুরু করলেন।"—(পৃ: ২৫১)

একদিন যাহা উপায় ছিল, পরে তাহাই উদ্দেশ্যে পরিণত হইল। ইহাই ক্রম-অভিব্যক্তি (evolution)।

কিন্তু এরি মধ্যে অপর একটি প্রহেলিকা দেখা যায়। ভগবান যদি অরবিন্দকে আদেশ দিয়া থাকেন যে, বোমা দিয়া লাটের গাড়ী উল্টাইয়া প্রাণ বধ কর—তবে সেই গাড়ীতে অপর লোকগুলিও ত মারা যাইতে পারে? তাহারা লাট নয়। তাহারা কী দোষ করিল? তারপরে যখন লাট মারা গেলেন না,

বাঁচিয়া গেলেন, তখন নিশ্চয়ই ভগবানের ইচ্ছাতেই বাঁচিয়া গেলেন। অতএব ভগবানের ইচ্ছাতেই যাঁহার জীবন রক্ষা পায়, তাঁহার জীবননাশের জন্য আবার সেই ভগবান অরবিন্দকে আদেশ দিলেন কিরূপে? সাধারণ ভদ্রলোকের যে কাণ্ডজ্ঞান আছে, ভগবানের কি তাহা নাই? ফুলার, ফ্রেজার, চন্দননগরের মেয়র—এই তিনের জীবন যদি ভগবানের ইচ্ছায় রক্ষা পাইয়া থাকে, তবে ইহার কোন একটিকেও গুপ্ত-হত্যার আদেশ ভগবান দেন নাই বা দিতে পারেন না।

তবে অরবিন্দ যে আদেশ পাইলেন? ইহা ভগবানের আদেশ নয়, তাঁহার নিজের মনের কল্পনা। এবং প্রমাণ হইল যে, এই কল্পনা সম্পূর্ণ মিথ্যা!

আরো একটা কথা আছে। সেকালের মুনি-ঋষিরা সকলেই ঈশ্বর মানিতেন না। বাংলার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের আধুনিককালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক নবদ্বীপবাসী স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মাত্র সেদিন সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন—"চার্ব্বাক মীমাংসক সৌগত দিগম্বর কপিল, এই পাঁচজন ঈশ্বরে বিপ্রতিপন্ন"। সেকালের এই পাঁচজন শাখা-প্রশাখায় একালে পঁচিশজনে পরিণত হওয়াই সম্ভব। এদের ত দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। তাঁহারা বলিবে—মাথা নাই তার মাথা ব্যথা; ঈশ্বর নাই তার আবার আদেশ কোথা হইতে আসিবে? সকল রকমের লোকই ত আছেন।

সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী ও তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা: অরবিন্দ বাগ্মী নহেন। তিনি বাগ্মী হইলে প্রকাশ্য রাজনীতিতে যত বড় নেতা হইতে পারিতেন, বাগ্মী না-হওয়ার দরুন তাহা পারেন নাই। অথচ তাঁহার বিরুদ্ধদলে সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী জগৎ-বিখ্যাত বাগ্মী। আর তাঁহার নিজের দলে বিপিন পালও ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই অসাধারণ বাগ্মী। সুতরাং এই দুই বাগ্মীর সমক্ষে অরবিন্দের নেতৃত্ব তেমন ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই।

কলিকাতা নৌরজী কংগ্রেসে বিশ্ববিশ্রুত বাগ্মী লালমোহন ঘোষ সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া বলিলেন যে—নিবেদননীতি পাপ নহে ("Mendicancy was no sin.") এবং চরমপন্থী দলের উপর কিছুটা বক্রোক্তি করিলেন। ফলে অরবিন্দ ৩০শে ডিসেম্বর ১৯০৬ "বন্দেমাতরম্‌" পত্রিকায় লালমোহন ঘোষের বাগ্মিতার উপর বিদ্রূপবাণ এই বলিয়া নিক্ষেপ করিলেন যে—বাগ্মিতার দিন আর নাই। "We must remind the old-day

politicians, that the days when politics consisted in dangling before the College youngmen fine phrases of parliamentary parlance have gone by." স্বদেশী যুগের রাজনীতিক্ষেত্রে ইংরেজি বক্তৃতার উপর অরবিন্দের মনোভাব বুঝা গেল।

কিন্তু সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর বাগ্মীতা সম্পর্কে মিঃ নেভিন্‌সন যে উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ না-করিলে সত্যের মর্য্যাদার হানি হয়, বাঙ্গালীর একটা আত্মশ্লাঘার জিনিষকে উপেক্ষা করা হয়, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে অরবিন্দের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা ফুটিয়া উঠিতেছে তাহাকেও সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। অরবিন্দ নীরব মানুষ। বক্তৃতা করিতে না-পারিলেও তিনি লেখনীমুখে ইংরেজি ভাষায় 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার প্রতিপৃষ্ঠায় সংবর্ষণ করিয়া চলিয়াছেন। ইহাই তাঁহার নেতৃত্বের পাদপীঠ। বন্দেমাতরম্ পত্রিকা না-থাকিলে অরবিন্দের নেতৃত্ব ফুটিত না। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী আসন্ন সুরাট কংগ্রেসে যাইবার পূর্ব্বে গোলদীঘিতে একটি বক্তৃতা করিলেন, মিঃ নেভিন্‌সন ঐ বক্তৃতা শুনিলেন। শুনিয়া তিনি লিখিলেন যে—এই রকম বক্তৃতা কোন ইংরেজ করিতে পারে না। Cicero Pitt Brougham, ইঁহারা হয়ত সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর মত বাগ্মী ছিলেন। এক Gladstone ছাড়া আর কাহাকেও এরকম বক্তৃতা করিতে মিঃ নেভিন্‌সন শুনেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—

"Except for Mr. Gladstone, I have heard no speakers use the grand and rhetorical style of English with more assurance and success. ... ... Sentence answered to sentence, period to period, thunder to thunder. There was no hesitation, no throwing back, no wandering for ideas or words. But the great language rolled without a break and without a drop, each syllable in its exact place and order, each sentence following some cadence of its own, so inevitable that you could foretell the stress and rhythm of its rise and fall far in advance of the actual words, just as you can in Macaulay's declamations. It was oratory such as, I suppose, Cicero

loved to practise, and Pitt and Brougham—such oratory as few living Englishmen dare venture on for fear of drowning in the gulfs of bathos. But Surendra Nath loved it, as Cicero might."—(*New Spirit In India*; *pp. 217-218*; *Mr. Nevinson*)

অরবিন্দ লালমোহন ঘোষের বাগ্মিতাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন, লালমোহনের মডারেট মতবাদের জন্য ("A sitter on the fence")। সুরেন্দ্রনাথের মডারেট মতবাদকেও অরবিন্দ কম গালি দেন নাই; বিপিন পালের চেয়ে অনেক বেশী গালি দিয়াছেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা আর এক বস্তু, ইহা কোন মতবাদ নয়। ইহা একটা আর্ট (art)। মিঃ নেভিন্‌সনের উচ্চপ্রশংসা হইতে সুরেন্দ্রনাথকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। অবশ্য অরবিন্দ এই চেষ্টা করেন নাই।

সুরাট অভিমুখে অরবিন্দ: সভাপতি ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ ট্রেনে সুরাট যাত্রা করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে সুরাট ট্রেনে ৪৪ ঘণ্টার রাস্তা। মিঃ নেভিন্‌সন লিখিয়াছেন—

"It was roses, roses all the way—almost all the way during the forty-four hours in the train from Calcutta to Surat."

দুই মাস আগে হইতেই অরবিন্দ মিঃ তিলককে সভাপতি হইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। পরে লাজপৎ রায় মুক্তি পাইবার পর মিঃ তিলক লাজপৎ রায়কেই সভাপতি হইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু গোলমাল দেখিয়া লাজপৎ রায় সভাপতি হইতে অস্বীকার করিলেন। লাজপৎ রায়ের এই অস্বীকার করাকে অরবিন্দ ২০শে ডিসেম্বর ১৯০৭ "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় "a fatal blunder" বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পরেরদিন ২১শে ডিসেম্বর অরবিন্দ সুরাট যাত্রা করিলেন। সঙ্গে বারীন্দ্রও চলিলেন। বারীন্দ্র লিখিয়াছেন—

"আমি অরবিন্দ ও শ্যামসুন্দর বাবুর সহিত সুরাট যাত্রা করিলাম। বোম্বে মেল খড়্গপুরে আসিয়া থামিল। এমন সময় অরবিন্দ তাঁহার গাড়ীতে আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন, গিয়া দেখি সেটাও তৃতীয় শ্রেণী, ভিতরে নরককুণ্ডলার। প্রতি ষ্টেশনে ফুলের মালা, লুচি-মণ্ডা-মেঠাই ও চা। অনেক ষ্টেশনে বহু লোক

নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল, অরবিন্দের সাক্ষাৎ প্রাণ ভরিয়া বড় একটা কেহই পায় নাই। কারণ সবারই ধারণা ছিল যে, দেশের একটা এতবড় গণ্যমান্য মানুষ নিশ্চয় প্রথম শ্রেণীতেই, অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসিতেছেন। কাজেই প্রথম শ্রেণী হইতে খুঁজিতে খুঁজিতে এই ক্ষীণজীবী নিরীহ মানুষটীকে তৃতীয় শ্রেণী হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে করিতে, এদিকে ট্রেন ছাড়িবার সময় হইয়া যায়। আমাদের তো রাত্রে নিদ্রা নাই, পেটে স্থান নাই, সেজদার গলার মালায় গাড়ী বোঝাই!"—(আত্মকাহিনী—বারীন্দ্র, পৃঃ ১২-১৬)

রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর বহু পূর্ব্বে অরবিন্দ ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতেছেন। শৈশব হইতে তিনি সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত। তিনি সাহেবিয়ানা পরিত্যাগ করিয়াছেন; দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ত্যাগের তুলনা নাই। বিপিন পাল অপেক্ষাও তিনি অধিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। মডারেট নেতাদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম।

"বোধ হয় নাগপুর আর অমরাবতীতে কয়েক ঘণ্টার জন্য নামিতে হইয়াছিল। সেখানে অরবিন্দের বক্তৃতা হইল, কিন্তু বক্তৃতাস্থানে লোকসমুদ্র ঠেলিয়া যায় কার সাধ্য!"……

"সেজদাকে (অরবিন্দ) ধরিয়া যেখানে লইয়া বসাইয়া দেয়, নীরব মানুষটী সেইখানেই বসিয়া থাকেন, আর সবাই নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া দেখে। অত বড় জনসঙ্ঘে তাঁর বক্তৃতা বড় বেশী দূর শোনা যায় না, তবুও সহস্র সহস্র মানুষ ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।…… তাহার পর সুরাট! সে এক ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড। নবজাগ্রত ভারতের সেসকল স্বপ্নছবি ভুলিবার নয়!" —(আত্ম-কাহিনী—বারীন্দ্র, পৃঃ ১৬-১৭)

সুরাটে যাইবার পথে কিংবা সুরাট হইতে ফিরিবার পথে অরবিন্দ নাগপুর, অমরাবতী ও বোম্বাই-এ নামিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন—সে সম্বন্ধে বারীন্দ্রকুমার "বোধ হয়" লিখিয়াছেন। সুতরাং আমাদেরও সন্দেহ থাকিয়া গেল। তা যাই হউক অরবিন্দ সুরাট পৌঁছিলেন। সুরাটে "তাঁহার স্থান হইল একটি মন্দিরে।" আর তিলকের স্থান হইল আর একটি মন্দিরে।

সুরাটে অরবিন্দ: অরবিন্দ সুরাটে পৌঁছিলেন। বরোদা ও বোম্বাইয়ের মাঝখানে সুরাট একটি ছোট প্রাচীন সহর। মোগল সম্রাট-আকবরের মৃত্যুর পর হইতেই এই প্রাচীন সহরে ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ

প্রভৃতি য়ুরোপীয় বণিকেরা ফ্যাক্টরী নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিল। যে ভূমির উপর কংগ্রেস-প্যাণ্ডাল নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল একদিন সেই ভূমির উপরেই মোগল, মারাঠা ও ফরাসীদের ফ্যাক্টরী ছিল। এই সব ইতিহাসের কথা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ মালভি যখন তাঁহার অভিভাষণে পাঠ করিতেছিলেন, তখন অসহিষ্ণু শ্রোতারা কেহই সে-কথা মন দিয়া শুনে নাই। কেননা মিঃ নেভিন্‌সন্ লিখিয়াছেন—"People do not want to hear history when they are making it." নেভিন্‌সন্ সুরাট কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন; অভিজ্ঞ ইংরেজ সাংবাদিকের বিবেচনায় সুরাট-কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে এক নূতন ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হইল। আমরা দেখিব অরবিন্দ এই কংগ্রেস-ভাঙ্গা ব্যাপারে এবং এই নূতন ইতিহাস রচনায় কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কংগ্রেস ভাঙ্গার পর বোম্বাইয়ের মডারেটরা যখন কংগ্রেসের এক নূতন creed তৈরী করিলেন, তখন দেখা গেল যে—উহা চরমপন্থী দলের বিশেষতঃ অরবিন্দ, বিপিন পাল প্রচারিত আদর্শ ও উপায়ের সম্পূর্ণ বিরোধী। তথাপি—

"মিঃ তিলক মত দিয়াছিলেন যে, গরমদল যখন দলে ভারী আছে তখন ঐ অঙ্গীকার-পত্র (creed) সহি করিয়াই ঢুকিয়া পড়া যাক, গরমদলের বানে সব ভাসাইয়া দাও,—"Let us swamp the Congress."

অরবিন্দ কিন্তু তাহাতে রাজী হন নাই। তিনি বলিলেন, "যাহা একবার খাঁটি বলিয়া, সত্য বলিয়া ধরিয়াছি সে মত, সে principle কি করিয়া বদলাইব?"......

"তিলকের দক্ষিণহস্ত খাপার্দেও অরবিন্দের দিকে বাঁকিয়া বসিলেন। অগত্যা সে-যাত্রা গরমদল পৃথক কন্‌ভোকেশনে মিলিত হইয়া ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিলেন।"
—(আত্ম-কাহিনী— বারীন্দ্র, পৃঃ ২৯)

মেদিনীপুরের কথাই মনে পড়ে। মেদিনীপুর ও সুরাটে একই অরবিন্দকে আমরা দেখিতে পাই। ৮ই নভেম্বর, ১৯০৭—বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিয়াছেন, "Without them (মডারেট) if it must be." সেই মনোভাবকেই সুরাটে আসিয়া প্রলয়ের মুখেও মিঃ তিলকের বিরুদ্ধে দৃঢ় করিয়া ধরিয়া থাকিলেন। অরবিন্দের কথাতেই সুরাটে জাতীয়তাবাদীদের পৃথক কন্‌ভোকেশন হইল। বিশ দিন মাত্র আগে (৭ই ডিসেম্বর, ১৯০৭) মেদিনী-

পুরেও অরবিন্দের নেতৃত্বেই চরমপন্থীদের পৃথক কন্ফারেন্স হইয়াছিল। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে পাশে চেয়ারে বসাইয়া মডারেট কন্ফারেন্স করিয়াছিলেন। অরবিন্দকে চিনিতে হইলে তাঁহার গতিকে নিরীক্ষণ করিতে হইবে—অনুসরণ করিতে হইবে।

নীরব অরবিন্দ সুরাটে শুধু তিলকের প্রতিধ্বনি করেন নাই। তিলকের পশ্চাতে অরবিন্দ শুধু তিলকের ছায়া নহেন। সুরাটের রঙ্গমঞ্চে অরবিন্দ একটা বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। যদি তিনি তিলককে সম্মত করিয়া কংগ্রেস হইতে বাংলা ও মারাঠার জাতীয়তাবাদীদের সরাইয়া না আনিতেন, তবে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদীদের আবার কংগ্রেসে গৌরবময় পুনঃপ্রবেশ আমরা দেখিতে পাইতাম না। যদি একাদিক্রমে আট বৎসর জাতীয়তাবাদীরা কংগ্রেসে মডারেটদের creed সহি করিয়া টাকের বায়া হইয়া থাকিতেন, তবে তাঁহারা নিষ্পেষিত অবস্থায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আর তাঁহাদের খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। সুরাটে নীরব অরবিন্দের নেতৃত্ব যে-ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করিয়াছিল—আমরা সংক্ষেপে তাহার দিগ্‌দর্শনমাত্র করিয়াই এখনকার মত ক্ষান্ত হইলাম। মডারেটদের সংস্রব ত্যাগ করার দায়িত্ব অরবিন্দ নিজের স্কন্ধে বহন করিলেন। সুরাট-কংগ্রেসে মডারেট সংস্রব ত্যাগ করার প্রয়োজন হইয়াছিল। এখন দেখা যাক—অরবিন্দ সুরাটে আসিয়া কোথায় থাকিলেন, তিলক ও অরবিন্দ বসিয়া কোথায় কী পরামর্শ করিলেন, এবং খড়্গপুর ষ্টেশনে অরবিন্দ বারীন্দ্রকে নিজের গাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া সুরাটে পৌঁছিয়াই আবার তাঁহাকে কোথায় কেনইবা ছাড়িয়া দিলেন, বারীন্দ্র সমস্ত ভারতব্যাপী এক সঙ্গে বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদের স্বপ্ন লইয়া কোথায়ইবা 'গুপ্তচক্রে' বসাইলেন; এবং অরবিন্দকে চিঠি লিখিলেন—

"*Dear Brother!*—we must have sweets all over India ready-made for emergency. I wait here for your answer."
—Barindra Kumar Ghose.

বারীন্দ্র নিজে আমাকে বলিয়াছেন—তাঁহার এই চিঠি সত্য চিঠি, জাল নহে। সুতরাং সুরাটে অরবিন্দ প্রথম প্রকাশ্য রাজনীতিতে মডারেটসংস্রব-ত্যাগী তিলকের সঙ্গী—আর দ্বিতীয়, গুপ্ত সন্ত্রাসবাদের রাজনীতিতে বারীন্দ্রের

পরামর্শদাতা ও নেতা। কেননা বারীন্দ্র স্পষ্ট লিখিতেছেন—"I wait here for *your* answer."

ষ্টেশনের কাছেই কংগ্রেসের বড় তাঁবু। আর তাঁর নিকটেই কৌরব-শিবির—মডারেটদের ছোট ছোট তাঁবু, সাহেবী কেতায় সাজান; মিঃ মেহেতা থাকিবেন, মিঃ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী থাকিবেন। আর সুরাট নগরীর মাঝখানে পাণ্ডবশিবির—চরমপন্থীদের কতকগুলি সেকেলে ভাঙ্গা দেবমন্দির আর বাড়ী। তারি একটা মন্দিরে তিলকের স্থান, আর একটা মন্দিরে অরবিন্দের স্থান।

"সেখানে তিলক ও অরবিন্দ বসিয়া আপনাদের কাজ-কর্ম্ম করেন। আর সহস্র সহস্র জনস্রোত সকাল হইতে রাত একটা অবধি, এক সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া শুধু দর্শন করিয়া অপর সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যায়। একদিন আহারে বসিতে গিয়া দেখিলাম, তিলকের পাশে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়াছেন চিদম্বরম্ পিলে, হায়দর রেজা, অরবিন্দ, আরও কত কে। ভারতের এমন প্রদেশ নাই যেখানকার হিন্দু-মুসলমান সে পঙ্‌ক্তিতে নাই।...

"অরবিন্দ, তিলক, খাপার্দ্দে, মুঞ্জি প্রভৃতি নেতাদের ভিতরে ভিতরে কী পরামর্শ হইত আমি জানিতাম না, কারণ আমি থাকিতাম আপনার তালে। ......আমাদের গুপ্তচক্র বসাইবার সব বন্দোবস্তই করিয়া তুলিলাম।" —(আত্মকাহিনী—বারীন্দ্র, পৃঃ ১৮)

বারীন্দ্র 'গুপ্তচক্র' বসাইবার তালে ছুটাছুটি করিতেছেন। নরেন গোঁসাইয়ের হত্যাকারী অরবিন্দ ও বারীন্দ্রের মাতুল মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্রনাথ বসুও বারীন্দ্রের সঙ্গেই আছেন। ইহারা উপস্থিত থাকিতে গুপ্তচক্র বসিবে না, সে কী কথা!

তিলক ও অরবিন্দ কংগ্রেস বসিবার তিন দিন আগে ২৩শে ডিসেম্বর সুরাট আসিয়া পৌছিয়াছেন। পৌছিয়াই ঐদিন সন্ধ্যাকালে তিলক সুরাটবাসীদের এক মহতী সভা ডাকিয়া বলিলেন যে: কলিকাতা কংগ্রেসের চারটি প্রস্তাব—স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা যেন এবারকার কংগ্রেসেও অনুমোদিত হইয়া পাশ হয়। কেননা চরমপন্থীরা আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, সুরাট-কংগ্রেসে বোম্বাইয়ের মডারেট-পুঙ্গবেরা ঐ চারটি প্রস্তাব এবার প্রত্যাহার করিবেন। আশঙ্কার কারণ ছিল। বিপিন পাল তখন বক্সার জেলে বন্দী।

অরবিন্দ ও গান্ধী : তিলকের সভার পরের দিন ২৪শে ডিসেম্বর আবার আর একটি সভা হইল। সভাপতি হইলেন অরবিন্দ। জাতীয় দলের ৫০০ শত ডেলিগেট এই সভায় উপস্থিত হইলেন। আগের দিন কংগ্রেসের 'পশ্চাৎগমন' নিবারণের জন্য তিলক সুরাটবাসীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অরবিন্দ এই সভায় মডারেটদের একেবারে সরাসরি চরমপত্র পাঠাইয়া দিলেন। যদি সুরাট-কংগ্রেস, কলিকাতা-কংগ্রেস হইতে এক পা পিছু হটে, তবে জাতীয় দল ডাঃ ঘোষের সভাপতি নির্বাচন হইতেই বাধা দিতে সুরু করিবে। এবং যে-কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইবে—তাহা উপস্থিত ডেলিগেটদের ভোটের দ্বারা মীমাংসা করিতে হইবে। সোজা কথা, কোনই ঘোরপ্যাঁচ নাই। ইহা অনেকটা পার্ণেলী এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মত। অরবিন্দের সভার এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের সম্পাদকদের খোলসা চিঠি লিখিয়া জানান হইল। আকাশে মেঘ আগে হইতেই দেখা দিয়াছে, এইবার গুরু গুরু গর্জ্জন আরম্ভ হইল।

মিঃ গান্ধী ট্রান্সভালের ভারতবাসীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা কংগ্রেসের নিকট আবেদন-নিবেদন করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এবং সেই সঙ্গে সভাসমিতি করিয়া কিছু চাঁদা আদায়ের চেষ্টাও আছে। মিঃ জে. ঘোষাল সরলা দেবীর পিতা। কংগ্রেসের একজন সম্পাদক। তাঁহার অধীনে মিঃ গান্ধী ঘটনাচক্রে অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। চিঠি-চাপাটি লইয়া এঁর-তাঁর কাছে ছুটাছুটি করিতেছেন। মডারেট কর্মকর্ত্তারা এই সুযোগে মিঃ গান্ধীকে দিয়া অরবিন্দের চিঠির এই বলিয়া জবাব দিলেন যে, কলিকাতা-কংগ্রেসের চারিটি প্রস্তাব এবারেও বাহাল আছে, বাদ দেওয়া হয় নাই। কিন্তু মিঃ গান্ধী বোম্বাইয়ের মডারেট নেতা মিঃ মেহেতা ও মিঃ গোখলের সম্পূর্ণ অধীন। তিনি কর্ম্মকর্তাদের কেহই নহেন। সুতরাং এতবড় গুরুতর বিষয়ে তাঁহার এক টুকরা চিঠির মূল্য তিলক বা অরবিন্দ দিলেন না। মিঃ গান্ধী প্রথম হইতেই বোম্বাইয়ের মডারেট নেতাদের অনুগত ভক্ত। এবং বিশেষ করিয়া মিঃ গোখলের শিষ্য। কে জানিত একদিন এই মিঃ গান্ধীই মহাত্মা হইয়া সেই কংগ্রেসে মিঃ মেহেতার ভূমিকায় সুভাষ-বিতাড়ন ব্যাপারে অভিনয় করিবেন।

২৫শে ডিসেম্বর প্রাতে কংগ্রেসের তাঁবুর নীচে মিঃ তিলক ডেলিগেটদের

আর একটি সভা ডাকিয়া বলিলেন যে, যদি কলিকাতা-কংগ্রেসের চারিটি প্রস্তাব বাদ দেওয়া না-হয় এবং কংগ্রেসকে পিছু হটাইয়া না-লওয়া হয়, তবে তিনি ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের সভাপতি নির্ব্বাচনে বাধা দিবেন না।

এইদিন প্রাতঃকালেই লাজপত রায় আসিয়া পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়াই তিনি বৈকালে তিলক ও খাপার্দ্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দুই দলের বিবাদ আপোষে মিটাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ২৬শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত লাজপতের আপোষ-চেষ্টার কোন ফল দেখা গেল না। ২৬শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে তিলক, খাপার্দ্দে, অরবিন্দ, মতিলাল ঘোষ, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর তাঁবুতে গিয়া ঐ একই কথা বলিলেন যে—যদি কলিকাতার চারিটি প্রস্তাব এবারে বাদ দেওয়া না-হয়, তবে তাঁহারা ডাঃ ঘোষের সভাপতি নির্ব্বাচনে বাধা দিবেন না। এবং সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীকে বক্তৃতায় সময় উল্লেখ করিতে হইবে যে, জনসাধারণ লাজপত রায়কে সভাপতি করিতে চাহেন। সুরেন্দ্রনাথ উভয় প্রস্তাবেই স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু মিঃ মেহেতা, মিঃ গোখলে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ মালভি, ঐ দিন বেলা ২॥টার সময় কংগ্রেস-অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মিঃ তিলক বা অরবিন্দকে কোন কিছুই আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দিয়া উঠিতে পারিলেন না। অথবা ইচ্ছা করিয়াই দিলেন না।

কংগ্রেসের অধিবেশন ঃ ২৬শে ডিসেম্বর বেলা ২।।৹টার সময় যথাবিধি কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইল। সভাপতি যথাবিধি প্রস্তাবিত হইলেন। প্রস্তাবিত হইবার সময়েই মিঃ গোখলে নিজহাতে মিঃ তিলককে একখণ্ড প্রস্তাব-তালিকা দিলেন। এই প্রস্তাব-তালিকায় কংগ্রেসের চারটি প্রস্তাব ছিল বটে, কিন্তু উহা অ'দি ও অকৃত্রিমভাবে ছিল না। কোনটার নলচে, কোন-টার বা খোল বদলান হইয়াছে। "বয়কট" প্রস্তাবে "বিদেশী দ্রব্য" স্পষ্ট জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বিপিন পাল জেলে আবদ্ধ আছেন, তা থাকুন; কিন্তু তিনি আর "ইংরেজ শাসন বয়কট", এমন অপব্যাখ্যা করিবার সুযোগ পাইবেন না। বোম্বাই মডারেটদের ভয় দূর হইল।

সভাপতি প্রস্তাবিত হইলেন, কিন্তু সমর্থিত হওয়া ত চাই। অতএব সুরেন্দ্র-নাথ দণ্ডায়মান হইলেন। যেই দণ্ডায়মান হওয়া, অমনি সভাস্থ বঙ্গদেশ চীৎকার করিয়া উঠিল—Remember Midnapore !"—কি সর্ব্বনাশ! মধ্যপ্রদেশ চীৎকার করিয়া উঠিল—"Remember Nagpur !"—কি বিপদ! নাগপুরেই

কংগ্রেস হইবার কথা ছিল, মিঃ মেহেতা চালাকি করিয়া কংগ্রেসকে সুরাটে টানিয়া আনিয়াছেন। এবং কিছুদিন আগে এই সুরাটেই প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে মিঃ মেহেতা জবরদস্তি করিয়া বাংলার বয়কট্ ও জাতীয় শিক্ষাপ্রস্তাব ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন। মডারেট ধাপ্পা সকলই ধরা পড়িয়াছে এবং আসন্ন প্রলয়ের মুখে বানচাল হইবার জোগাড় হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ বেগতিক দেখিয়া লম্ফ দিয়া টেবিলের উপর উঠিলেন এবং খাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন ("Surendranath sprang upon the very table itself.")। কেহই তাঁহার কথা শুনিল না। মিঃ মালভি গোলমাল থামাইতে ঘণ্টা বাজাইলেন—কিন্তু কেহই শুনিল না ("Rang his Benares bell and rang in vain.")। সুতরাং "he declared the sitting suspended." বাইশ বৎসর পরে এইরূপে কংগ্রেস ভাঙিয়া গেল! আগামী কল্যের জন্য শুধু জুতোপেটা বাকী রহিল!

২৭শে ডিসেম্বর আবার কংগ্রেস বসিল। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—"Brother delegates, ladies and gentlemen"... বাস্, আর বেশী বলিতে হইল না। মিঃ তিলক গম্ভীরভাবে গিয়া মঞ্চের উপর উঠিলেন এবং সভাপতির সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং কিছু বলিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মালভি তখন চীৎকার করিয়া বলিলেন—

"You cannot move an adjournment of the Congress"—cried Mr. Malvi. "I declare you out of order. I wish to move an amendment to the election of President, and you are not in the chair !"—Mr. Tilak replied. "I declare you out of order !"—cried Dr. Ghose. "You have not been elected,"—answered Mr. Tilak—"I appeal to the delegates."—(*The New Spirit In India—Mr. Nevinson—pp 256-257*).

তার পরেই 'মারাঠী জুতা'—

"Suddenly something flew through the air—a shoe !—a Mahratta shoe !—reddish leather, pointed toe, sole studded with lead. It struck Surendra Nath Banerjee on the cheek ; it cannoned off upon Sir Pherozeshah Mehta. ... I caught glimpses of the Indian National Congress dissolving in

chaos.···Like Goethe at the battle of Valmy, I could have said : To-day marks the beginning of a new era, and you can say that you were present at it."—(*Ibid, P. 258*).

কংগ্রেস এইভাবে ভাঙিবার পর (* ক) ঠিক মেদিনীপুরের মতই মডারেটরা পৃথক সভা করিলেন। এবং সেই সভার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—লাজপত রায় তাহাতে যোগ দিলেন।

সুরাটের ইতিহাসে লেখা থাকিবে—গান্ধীজি মডারেট, লাজপত্ মডারট্।

(* ক) ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ যদিও তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিতে পারিলেন না, তথাপি আগের দিন কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্রে উহা ছাপা হইয়া গিয়াছিল এবং চরমপন্থীদল উহা আগেই পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে যে-সকল কথা বলা হইয়াছে তাহাতে তাহাদের উত্তেজনার মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া সুরাট-কংগ্রেস ভাঙ্গিবার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। New Party সম্পর্কে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ অভিভাষণে (অপঠিত) নিম্নলিখিতরূপ লিখিয়াছিলেন :

> "The New Party seems to have persuaded itself that it is hopeless to expect any concessions from our Rulers and that political agitation on the lines of the National Congress are a delusion and a snare. The true bureaucrat, it says, does not appreciate moderation and always treats the constitutional reformer with secret contempt. Like the Sein Fein Party in Ireland, it has lost all faith in constitutional movements, but it must be said to its credit that it has also no faith in physical force ; nor does it advise the people not to pay taxes with the object of embarrassing the Government. I am, of course, speaking of the leaders. All its hopes are centred in passive resistance of a most comprehensive kind, derived, I presume, from the modern history of Hungary, the pacific boycott of all things English. If I understand its programme aright, we must refuse to serve Government in any capacity—either as paid servants or as members of Legislative Councils,

এদিকে জাতীয়তাবাদীর দলও পৃথক সভা করিলেন। সভাপতি হইলেন অরবিন্দ। আর বক্তা হইলেন তিলক।

"Grave and silent—I think without saying a single word —Mr. Arabindo Ghose took the chair, and sat unmoved, with far-off eyes, as one who gazes at futurity. In clear, short sentences, without eloquence or passion, Mr. Tilak spoke till the stars shone out and someone kindled a lantern at his side."

সুরাটে জাতীয়তাবাদীর দল মিঃ তিলককে সম্মুখে রাখিয়াই যুদ্ধ করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু নীরব অরবিন্দের পরামর্শ দ্বারা তিলক ও জাতীয়তাবাদী

> Local Boards or Municipalities. British Courts of Justice too shall be placed under a ban and Courts Of Arbitration substituted for them—a proposal, by the way, which shows that the agitation is not the work of hungry lawyers. All schools and colleges, maintained by the Government, should also be boycotted. In a word, we must get rid of our habit of leaning on the Government and create in its place a habit of thinking and acting as if the Government were not. All this, however, is to be effected not by physical force but by its social pressure; for there has as yet reason no party to counsel violence or any other breach of the law......
>
> "But suppose your movement is successful and the English retire from the country leaving the people to stew in their own juice, imagine the chaos and disorder into which the whole country would be immediately plunged. I really cannot—I hope to be forgiven for this remark—take the members of the New Party seriously; I believe they are at present only in a sulky mood, because constitutional and peaceful methods have failed."

দলের কার্য্যপদ্ধতি যে কতটা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, সে ইতিহাস আজও প্রকাশিত হয় নাই।

বিলাত হইতে সদ্য দেশে ফিরিবার পরেই ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ যে আবেদন-নিবেদনের মডারেট-কংগ্রেসকে ভাঙিয়া ফেলিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং এই un-National Congress হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আজ পনর বৎসর পরে সেই কংগ্রেসকে অরবিন্দ নিজ হস্তে, তিলক হইতে অধিক জোরে আঘাত করিয়া ভাঙিয়া ফেলিলেন। মিঃ নেভিন্‌সন্‌ সত্যই লিখিয়াছেন—"In the twinkling of a shoe it had been changed and a new spirit, a different and difficult spirit, had indeed arisen in the country,"

কংগ্রেস ভাঙিল কেন—কে ভাঙিল ঃ তিলক ভাঙিলেন, কি অরবিন্দ ভাঙিলেন? মনে হইতেছে মিঃ তিলক অপেক্ষা অরবিন্দই বেশী করিয়া ভাঙিলেন। কেননা, তিলক তো কংগ্রেসের creed সহি করিয়া ঢুকিয়া পড়িতে চাহিয়াছিলেন। "Let us swamp the Congress"—এই কথাইতো তিলক বলিয়াছিলেন। ইহাও ভাঙিবার একটা পদ্ধতি বটে। যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন Council এ প্রবেশ করিয়া Council ভাঙিয়াছিলেন। কিন্তু সেরূপ ভাঙাতো সুরাটে হইল না। অরবিন্দের পরামর্শ অনুযায়ী, মডারেটদের কংগ্রেস creed সহি না-করিয়াইতো জাতীয়দল কংগ্রেস ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া কংগ্রেসকে ভাঙিল। সুতরাং বলিতে হয় বৈকি—অরবিন্দই কংগ্রেস ভাঙিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া ১৯০৮।১০ই এপ্রিল তারিখে অরবিন্দ পান্থীর মাঠে যে বক্তৃতা দিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে—তিনটি বিষয়ের জন্য সুরাট-কংগ্রেস ভাঙিয়া গেল ঃ (১) অবৈধ উপায়ে সভাপতি নির্ব্বাচন, (২) কলিকাতার চারটি প্রস্তাবকে নাকচ করিবার চেষ্টা, (৩) নূতন creed বা অঙ্গীকার-পত্র রচনা করিয়া জাতীয় দলকে ছাঁটিয়া ফেলিবার চেষ্টা। এই তিনটির প্রত্যেকটিই সত্য ঘটনা।

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায়, অরবিন্দ ও তিলকে পার্থক্য আছে। তিলক পারস্পরিক সহযোগিতা (responsive co-operation) চাহেন। সুবিধা হইলে সহযোগ, অসুবিধা হইলে অসহযোগ। কিন্তু অরবিন্দ সুবিধা হইলেও গভর্ণমেন্ট অথবা মডারেটদের সঙ্গে সহযোগ চাহেন না। তিনি বলেন—"We

preach the gospel of unqualified Swaraj." আরও বলেন—"In proportion as you depend on others, the bondage of Maya will be upon you." —(*Arabido Ghose's Baruipur Speech—12th April, 1908*)। সুতরাং "In co-operation with and also in opposition to"—তিলকের এই অভিমত হইলেও অরবিন্দের মত তাহা ছিল না। অতএব অরবিন্দ ও তিলকে যে পার্থক্য তাহা অস্পষ্ট নয়, স্পষ্টই দেখা গেল। এবং সুরাট-কংগ্রেস ভাঙা ব্যাপারে তাহা প্রকাশ পাইল।

এখন দেখা যাক সুরাট কংগ্রেস ভাঙিল কেন। অনেক কারণ একত্র হইয়া সুরাট কংগ্রেস ভাঙিল।

(১) মডারেট ও জাতীয় দলের আদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্ন। বোম্বাই-এর মডারেটরা ইংরেজের অধীনতা কিছুতেই ছাড়িবেন না। আর বাঙলার বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দ ইংরেজের অধীনতা কিছুতেই মানিবেন না।

(২) দুই দলের নির্দ্ধারিত উপায়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মডারেটদল করিবে শুধু আবেদন আর নিবেদন। আর বাঙলার স্বদেশী যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়াছে যে দুইটি শিখা—একটি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance), অন্যটি সন্ত্রাসবাদ (terrorism)—এই দুই উপায়ে ইংরেজের শাসন সমূলে বর্জন। সুতরাং মিল হইবে কিরূপে?

(৩) কলিকাতা কংগ্রেসের পর হইতে এক বৎসর বাঙলার স্বদেশী আন্দোলন যাহা করিয়াছে, অন্য প্রদেশে তাহা ঘটে নাই। এই এক বৎসর 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় অরবিন্দ লেখনীমুখে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়াছেন সে আগুন শুধু একস্থলে আবদ্ধ থাকে নাই। আগুন তাহা থাকে না। বিপিন পাল মাদ্রাজে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে মাদ্রাজে অগ্নিকাণ্ড দেখা দিয়াছে। বাঙলাদেশে সংবাদপত্র যে-ভাবে দলিত হইয়াছে, ভূপেন (জুলাই, ১৯০৭) বিপিন (সেপ্টেম্বর) লিয়াকৎ (নভেম্বর) জেলে গিয়াছেন, উপাধ্যায় (অক্টোবর) প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, অন্য প্রদেশে এরূপটি কিছুমাত্র ঘটে নাই। রাজনীতিমূলক সভা বাঙলায় নিষিদ্ধ। তাছাড়া বঙ্গভঙ্গের জন্য বাঙালী অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়াছে, অন্য প্রদেশে ততটা কিছুই হয় নাই। বাঙলা নেতৃত্ব করিতেছে; নূতন আদর্শ, নূতন উপায় প্রচার করিতেছে—ইহা বোম্বাই মডারেটদের অসহ্য বোধ হইতেছে।

(৪) তারপরে জেলে যাওয়া, দ্বীপান্তরে যাওয়া—অন্য প্রদেশের মডারেটদের মনে ভয়ের সঞ্চার করিয়াছে। রাজ-অত্যাচার বাঙলায় অনেকটা সহিয়া গেলেও অন্য প্রদেশগুলি এই অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখে আসিতে ভয় পাইতেছে। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব আদালতে দাঁড়াইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে যে জবাব দিয়াছেন, তাহাতে এমন কোন্ প্রদেশের কোন্ মডারেট আছেন যে, তাঁহার পীলে চমকাইবে না?

(৫) ২১শে অক্টোবর মর্লি সাহেব মডারেটদের প্রলোভন দেখাইয়াছেন ("Rally the Moderates")—নূতন শাসন-সংস্কার আসিতেছে। মডারেটরা প্রলুব্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা জাতীয় দলকে না-ছাড়িলে গবর্ণমেণ্টর কোলে কি করিয়া উঠিবেন?

(৬) মডারেটরা কেহই লোকমতের নিকট মাথা নত করিতে শিখেন নাই। তাঁহারা কেহই গণতান্ত্রিক নহেন। কায়েমী স্বার্থ আগে বজায় রাখিয়া দেশ-উদ্ধার যতটা হয়, তাহাই তাঁহারা করিতে প্রস্তুত।

(৭) ইংরেজের কূটনীতি হিন্দু-মুসলমান ভেদ যেমন সৃষ্টি করিয়াছে, মডারেট ও জাতীয়দলের মধ্যে তার চেয়ে অনেক বেশী ভেদ সৃষ্টি করিয়াছে।

(৮) বিশেষতঃ কুমিল্লা (March, 1907). জামালপুর (April, 1907)-এর ঘটনা ভারতের অন্য কোন প্রদেশে হয় নাই। সুতরাং বাঙালীর সঙ্গে অন্য প্রদেশ কি করিয়া চলিবে? এক শিবাজীর মারাঠা ব্যতীত বাঙালার সঙ্গে আর কেহই চলিতে পারিল না। এমন কি রঞ্জিত সিংহের পাঞ্জাবও নহে। যে লাজপতকে অরবিন্দ তিলকের পরিবর্ত্তে সভাপতি করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই লাজপত কি-না ভিড়িলেন মডারেটদের দলে! এর পরে আর কি বলা যায়!

(৯) এদিকে আবার সভাপতি ডাঃ ঘোষের অপঠিত বক্তৃতা কলিকাতার সংবাদপত্রে ছাপা হইয়া সুরাটে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাতে দেখা গেল, ডাঃ ঘোষ জাতীয়দলের উপর খুব একচোট নিয়াছেন। জাতীয় দলের বিরুদ্ধে আগুন লাগাইলেন। আর আপোষে মীমাংসার কোনই সম্ভাবনা থাকিল না।

বারীন্দ্রের 'গুপ্তচক্রে' ও অরবিন্দের নিকট চিঠি: বারীন্দ্র লিখিতেছেন—

"ইত্যবসরে আমি অনুরোধ-উপরোধ করিয়া কয়েকজন মারাঠী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী ও বাঙ্গালী বিপ্লবপন্থী নেতাকে একটি গুপ্তচক্রে আহ্বান করিলাম।..

কাজেই তিলককেও ডাকিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি এ-দলের নন বলিয়া আসিলেন না, বলিয়া পাঠাইলেন : আমি বুড়া হইয়াছি, আমি চিরদিন আমার কর্ম্মের বাঁধা-সড়কেই চলি, তোমরা তরুণেরা যাহা পার কর। তিনি হয়তো ভাবিয়াছিলেন, দুই-চারটা পাগল জুটিয়া দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে। সর্দ্দার অজিত সিংও আসিলেন না; শুনিলাম পাঞ্জাবের যে একজন মুসলমান নেতাকে আমি ভ্রমক্রমে ডাকিয়াছি, তিনি নাকি গোয়েন্দা।

"গুটিকয়েক বাঙ্গালী, গুটিকয়েক মারাঠী ও সেই পাঞ্জাবী দুমুখো সর্পকে লইয়া অগত্যা একটা-যা'-হোক গতিকের চক্রে বসিল। কথায়বার্ত্তায় বুঝিলাম মারাঠীরা বাক্যেই কাজ সারেন ও অতিমাত্র সাবধানী চালে চলিতে গিয়া তাঁহাদের চলাটাই থাকিয়া যায় উহ্য, সাবধানতাটা জুড়িয়া বসে প্রায় সবখানি আসর। ··ব্যাপার দেখিয়া পেশোয়া বুদ্ধির খুরে হাজার দণ্ডবৎ করিলাম।

"অগত্যা ভারতব্যাপী বিপ্লবের স্বপ্ন মনে মনে ধামা চাপা দিয়া সে-রাত্রের মত উঠিয়া পড়িলাম। মনে মনে বলিলাম : কুছ পরোয়া নেই, ও মন একলা চলোরে। এতদিন জানিতাম মহারাষ্ট্র আশা সোঁটা ধরিয়া প্রস্তুত। শিবাজীর সেই মাওলী সেনা, ভাস্কর পণ্ডিতের বর্গির পাল, দশ গুরুর বান্দারা সব পিছনে আছে। আজ বোধ হইল সব ফাঁকা, শূন্য মরু বিস্তারে অসহায় সর্ব্বত্যাগী শুধু আমরা মুষ্টিমেয় কয়জন।

"আমরাত অনেকস্থলে বচনেই কাজ সারিতাম। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম—আমরা সংখ্যায় বেশি নই, পঞ্চাশ হাজার। কত খরচ হয় জানিতে চাহিলে হাঁকিতাম—দু'দশ লাখ। তবে পার্থক্যের মধ্যে আমাদের বাঙলার পিছনে তবু একটা দল ছিল, বোমা বারুদ পিস্তল বন্দুক ছিল, কিন্তু মহারাষ্ট্রে প্রায় সবটাই ছিল অশ্বডিম্ব। ইঁহারা তখনও সেই প্রথম বিপ্লব নেতা ঠাকুর সাহেবের নাম ভাঙাইয়া দিন গুজরান করিতেছিলেন, প্রথম মূল সমিতি তখন মরিয়া পঞ্চত্ব পাইয়া গিয়াছিল।"—(বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী—পৃঃ ২৯-৩২)।

তারপর বারীন্দ্র অরবিন্দকে সমগ্র ভারতে "মিষ্টান্ন" (Bombs) বিতরণের জন্য স্মরণীয় চিঠিখানি লিখিলেন।

আলিপুর বোমার মামলার কৌঁসুলি মিঃ সি. আর. দাশ বলিলেন যে : অরবিন্দ এই চিঠিখানা কলিকাতায় নিয়া আসিলেন এবং ২৩নং স্কটস্ লেনে দুই মাস রাখিলেন; পরে ৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে পুলিশ এই চিঠি উদ্ধার করিল—

ইহা কখনই সম্ভবপর নহে, সুতরাং এই চিঠি জাল। এসেসাররাও বলিলেন—জাল। কিন্তু জজ মিঃ বিচক্রাফ্‌ট্ জাল বলিলেন না। তিনি শুধু বলিলেন—ইহা প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায় না। আগেই বলিয়াছি, বারীন্দ্র আমাকে স্পষ্ট বলিয়াছেন—এ চিঠি জাল নয়, সত্যই তিনি ইহা অরবিন্দকে লিখিয়াছিলেন। অরবিন্দ চিত্রকর মুকুল দে'র নিকট বলিয়াছেন—"আমি বিপ্লবী ছিলাম"। সুতরাং সত্যচিঠি মিথ্যা করিয়া তিনি জাল বলিলেন, ইহা সম্ভব নয়।

অতএব সুরাটে আমরা দেখিতেছি, অরবিন্দ একসঙ্গে দুইটি পৃথক ভূমিকায় কার্য্য করিতেছেন। প্রথম প্রকাশ্য মডারেট-বিরোধী চরমপন্থী রাজনীতি; দ্বিতীয় সমগ্র ভারতব্যাপী একটা বিপ্লবের দুঃস্বপ্ন লইয়া বারীন্দ্রকে দিয়া গুপ্তচক্রের অনুষ্ঠান। এই দুইটি ভূমিকার একটিও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অরবিন্দের চরিত্র অত্যন্ত জটিল। বিপিনচন্দ্র, তিলক—কাঁহারও সঙ্গে তাঁহার তুলনা হয় না। জটিলতায় তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। এবং এইখানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

সুরাট-কংগ্রেসের পর অরবিন্দ কোথায় গেলেন: বারীন্দ্র লিখিয়াছেন—"সুরাট হইতে অরবিন্দ আসিলেন গায়কোবাড়ের রাজধানী বরোদায়। অরবিন্দ আসিতেছেন শুনিয়া বরোদা কলেজের প্রিন্সিপাল আদেশ জারী করিয়াছিলেন যে, কোন ছাত্র যেন তাঁর অভ্যর্থনায় না যায়। ষ্টেশন হইতে কলেজ-গেটের পাশ দিয়াই পথ। আমাদের গাড়ী ঐ অবধি আসিবামাত্র সমস্ত কলেজ ভাঙ্গিয়া ছাত্র বাহির হইয়া আসিল ও ঘোড়া খুলিয়া বন্দেমাতরম্ রবে গাড়ী টানিতে লাগিয়া গেল। কলেজ শূন্য, ক্লাসে প্রফেসাররা একা বসিয়া কড়িকাঠ গুনিতে গুনিতে প্রহর অতীত করিলেন। বরোদা যাত্রার পূর্ব্বেই আমি লেলেকে তার করি যে, অরবিন্দ তাঁর দর্শনাভিলাষী। বেলা চারটায় লেলে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাতে ও অরবিন্দে একান্তে আধঘণ্টা আলাপ হইল, আমরা তখন স্যার সুবা খাসিরাও যাদবের বাড়ীতে। লেলের সহিত সেই প্রথম আলাপের পর বরোদায় তিনটি সভায় অরবিন্দ বক্তৃতা দেন; একবার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহার পর আর কেহ অরবিন্দকে পায় নাই। তখন দেশময় তাঁহাকে চায়। বরোদায় কত মানুষ তাঁহাকে দেখিতে উন্মুখ। লেলে কিন্তু বলিলেন: আমার সাধনা তোমায় দেব, কিন্তু একান্তে সাত দিন আমার সঙ্গে থাক। অরবিন্দ বলিলেন: কোথায়? লেলে: আমি গোপন স্থানের ব্যবস্থা করবো।....

"তাহাই হইল। হঠাৎ অরবিন্দ উধাও হইলেন। চারিদিকে পাগলের মত শহর সমেত মানুষ যাঁহাকে খুঁজিতেছে, তিনি কোথাও নাই। যেখানে লেলের নির্দ্দেশে আমরা গেলাম, সে এক বিরাট জনহীন পুরী; সেখানে লেলের স্ত্রী রাঁধেন, অরবিন্দ লেলে ও আমি খাই। তাঁহারা দুজনেই দিবারাত্র মুখোমুখী ধ্যানে কাটান। আমায়ও লেলে বসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, আমি মাঝে মাঝে বসি বটে কিন্তু মাথায় তখন বিপ্লবের পোকা গজ গজ করিতেছে; তাহারা আমায় স্থির হইয়া বসিতে দিবে কেন? কাজেই কোন গতিকে ফাঁক পাইলেই আমি সরিয়া পড়ি এবং একটি তালা-ঢালাইয়ের কারখানায় বসিয়া ঢালাইয়ের কাজ দেখি ও শিখি। বোমার বারুদের জন্য পিতলের বা কাঁসার আধার ঢালাই করিতে হইবে, কোথায় তাহা শিখিব তখন আমার কেবল সেই চেষ্টা। ভগবানকে ঠিক তখনই সদ্য সদ্য না পাইলেও আমার চলে, তবে তিনি যদি বোমার কারখানায় মিস্ত্রী বা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ভরা লোহার সিন্দুক হইয়া আসিতেন তাহাতে আমার বড় আপত্তি ছিল না।···

"অরবিন্দ স্বভাবযোগী ও ধীর প্রকৃতি. বরোদায় সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি পুস্তকের রাশির মধ্যে ডুবিয়া যে অসাধ্য জ্ঞানের তপস্যা তাঁহাকে করিতে দেখিয়াছি, তাহাতে বেশ স্পষ্টই বুঝা গিয়াছিল যে—তিনি কোন অসাধারণ ধাতুর তৈয়ারী। কয়েক দিনের অনন্যমন সাধনায় লেলের সমস্ত যোগবল অরবিন্দে সঞ্চারিত হইয়া গেল, মাত্র তিন দিনে তিনি অচল নীরব ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিলেন। বরোদা হইতে বোম্বাইয়ে আসিলে এই অপূর্ব্ব সাধনা আরও ফুটিল, স্বতঃস্ফূর্ত্ত মন্ত্র আপনি উঠিতে লাগিল।······

"পুণায় বক্তৃতাকালে অরবিন্দ লেলের উপদেশে আগে কর্ত্তব্যবিষয় ভাবিয়া-চিন্তিয়া বক্তৃতা দেওয়া ছাড়িয়া দিলেন। শান্ত হইয়া শূন্যমন নিয়া বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইবামাত্র, আপনি অনর্গল কথার পর কথা কে যেন অন্তরে বসিয়া যোগাইয়া দিত। তাহার পর তাঁহার কলকাতা যাত্রা। যাইবার পূর্ব্বে তিনি লেলেকে জিজ্ঞাসা করেন—এখন তো আমি আপনাকে সঙ্গে পাব না, কিরূপ কী প্রণালীতে সাধনায় চলতে হবে আমায় বলে দিন। লেলে প্রথমে সাধনার নানা উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ থামিয়া বলিলেন—তোমার কাছে যে বাণী এসেছে, তাতে অকপট বিশ্বাস স্থাপন করে চলতে পারবে?

অর—হাঁ, তা সহজেই পারবো।

লে—তবে তাই করো, তা'হলে আর কোন উপদেশই দরকার হবে না। ঐ বাণীই তোমায় সব বুঝাবে ও করাবে। তাহার পর আমার কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন ও অরবিন্দের পুণার দিকে যাত্রা।"—আত্ম-কাহিনী, বারীন্দ্র—পৃ: ৩৩-৩৬।

সুরাট হইতে অরবিন্দ বরোদা আসিলেন। সঙ্গে বারীন্দ্র ছিলেন। সুরাটে বারীন্দ্র ভারতব্যাপী বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়া 'গুপ্তচক্র' অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বরোদায় আসিয়া বিষ্ণুভাস্কর লেলের সহিত অরবিন্দের সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়া এখানেও তিনি একটী তালা-ঢালাইয়ের কারখানায় বসিয়া ঢালাইয়ের কাজ দেখিতেন ও শিখিতেন। কেননা, "বোমার বারুদের জন্য পিতলের বা কাঁসার আধার ঢালাই করিতে হইবে।"

বরোদা হইতে অরবিন্দ গেলেন পুণায়, আর বারীন্দ্র আসিলেন কলিকাতায়। বরোদায় তিনটি সভায় অরবিন্দ বক্তৃতা দেন। পুণাতেও অরবিন্দ বক্তৃতা দেন ("I was speaking at Poona on this subject and I told them my exp2rience in B2ngal.")। ১৯শে জানুয়ারী, ১৯০৮ অরবিন্দ বোম্বাইয়ে বক্তৃতা দেন--"The Present Situation." ইহা একটি দীর্ঘ বক্তৃতা। পরে ২৯শে জানুয়ারী, ১৯০৮ অমরাবতীতে (বেরার) বক্তৃতা দেন—'বন্দেমাতরম'। জানুয়ারী মাস কাটিয়া গেল।

"১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লেলে বাঙলায় আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি আমার সেজদা অরবিন্দের স্কটস্ লেনের বাসায় ছিলেন।"—আত্মকাহিনী, বারীন্দ্র, পৃঃ ৩৯-৪৩।

সুতরাং ১৯০৮।ফেব্রুয়ারী মাসে আরবিন্দ ২৩নং স্কটস্‌লেনে ছিলেন। মার্চ্চ মাসেও ঐ বাড়ীতেই ছিলেন। সম্ভবতঃ এপ্রিল মাসে ৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উঠিয়া আসেন। এপ্রিল মাসে অরবিন্দ কলিকাতা পান্তীর মাঠে (১০ই এপ্রিল), বারুইপুর (১২ই এপ্রিল) এবং কিশোরগঞ্জে—এই তিন স্থানে তিনটী বক্তৃতা দিয়া ২রা মে, ১৯০৮ আলীপুর বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হন। গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীতেই অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অরবিন্দ ও বিষ্ণুভাস্কর লেলে : ১৯০৮।জানুয়ারীর প্রথমভাগে সুরাট-কংগ্রেসের পরের সপ্তাহে অরবিন্দ বরোদায় গিয়া বিষ্ণুভাস্কর লেলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অরবিন্দের কথামত বারীন্দ্রই তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত লেলে

মহারাজকে তার করিয়া বরোদায় আনিয়া অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। অরবিন্দের জীবনে এই সাক্ষাতের গুরুত্ব দুই দিক দিয়া খুব বেশী--প্রথম, লেলে "প্রেমভক্তির পথেই সাধনা করিতেন।" লেলে বলিতেন—"দেখ, অরূপ সত্য, কিন্তু রূপও সত্য আমি দেখেছি।"—লেলের বিশেষ যোগ-পদ্ধতি অরবিন্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, লেলে পরের মাসে (ফেব্রুয়ারী) কলিকাতায় আসিয়া অরবিন্দের স্কটস্ লেনের বাড়ীতে ছিলেন এবং সেখান হইতে মুরারিপুকুর বাগানে বারীন্দ্রের বোমার আড্ডা দেখিয়া বলিয়াছেন, "দেখো, তোমরা এ পথ কিসের জোরে ধরেছ? ভারত স্বাধীন একদিন হবেই, কিন্তু এ পথে নয়। দেশকে, মানুষকে মুক্ত করতে হলেই কি আর রক্তারক্তি ছাড়া হয় না? ভারত বিনা রক্তপাতে মুক্ত হবে।"—আত্মকাহিনী, বারীন্দ্র, পৃঃ ৪০।

অরবিন্দ ১৮৯৩ সালে 'ইন্দুপ্রকাশে' স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন, "ভারত বিনা রক্তপাতে মুক্ত হবে না।—"Purification by blood and fire" একান্ত আবশ্যক। সুতরাং লেলের বিরুদ্ধমতই তিনি পোষণ করিতেন এবং যে সময়ে বিনা রক্তপাতের সদুপদেশ লেলের নিকট হইতে তিনি শুনিতে পাইলেন, তাহা মজঃফরপুরে মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যার যে চেষ্টা হয় তার মাত্র দুই কিংবা এক মাস আগের ঘটনা। পরবর্ত্তী জীবনে অরবিন্দ যদি লেলে-কথিত 'বিনা রক্তপাতে ভারতের মুক্তি'—এই মত গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে লেলের প্রভাব অরবিন্দের জীবনে খুব বেশী বলিয়াই কি মনে হয় না?

লেলের সহিত সাক্ষাতের প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন বাঙ্গলা দেশে অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত গুপ্ত-সমিতির প্রথম পর্ব্ব পুরাদমে চলিতেছে (১৯০২—১৯০৪), তখন সম্ভবতঃ ১৯০৩ সালে অরবিন্দ বরোদা হইতে নর্ম্মদাতীরে চান্দোতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে এক প্রাচীন যোগীর কাছে গিয়াছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ অরবিন্দের দিকে ক্ষণেক তাকাইয়াছিলেন। ফলে অরবিন্দের অন্তরের সুপ্ত দিব্যভাব ব্রহ্মানন্দের ঈক্ষণে অকস্মাৎ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল' বারীন্দ্র লিখিয়াছেন যে—স্বামী ব্রহ্মানন্দের দৃষ্টিপাতেই অরবিন্দের আধ্যাত্মিক জীবনের সর্ব্বপ্রথম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। বারীন্দ্র স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, অরবিন্দের উপর ব্রহ্মানন্দের এই দৃষ্টিপাত—

"This must have been the first real spiritual touch which

was destined in time to open Aurobindo's being to Higher Truths."—*Barindra K. Ghose.*

১৯০৩ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ১৯০৮ সালে শ্রীবিষ্ণুভাস্কর লেলে; সুতরাং অরবিন্দের গুরু হিসাবে আগে ব্রহ্মানন্দ, পরে লেলে। অথচ উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান দীর্ঘ পাঁচটী বৎসর। এই পাঁচ বৎসর অরবিন্দ নিশ্চিন্ত আলস্যে বসিয়া থাকেন নাই। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া প্রকাশ্য রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধবাদ এবং অন্ধকারের রাজনীতিতে গুপ্তহত্যামূলক সন্ত্রাসবাদ সমানে চালাইয়া সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনও খুব জোরের সঙ্গে চালাইয়াছেন। কেননা, আমরা দেখিতে পাই, স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত সাক্ষাতের পর অরবিন্দ তাঁহার বরোদার বাড়ীতে সোনার বগলামূর্ত্তি নির্মাণ করাইয়া তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের দ্বারা রীতিমত পূজা করাইয়াছেন। ১৯০৫।৩০শে আগষ্ট তিনি তাঁহার স্ত্রীকে স্পষ্ট পত্রে লিখিয়াছেন—

"যে-কোনমতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিতে হইবে।......ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোন পথ থাকিবে, সেপথ যতই দুর্গম হোক আমি সেপথে যাইবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মে বলে, নিজের শরীরে নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্মের কথা মিথ্যা নয়; যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে, সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই।"

ইহা লেলের সহিত সাক্ষাতের আড়াই বৎসর আগের কথা। অরবিন্দ স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে—'হিন্দুধর্মের' কথিত নিয়মাদি তিনি পালন করিতে আরম্ভ করিবার মাত্র এক মাসের মধ্যেই অনুভব করিতে পারিয়াছেন যে, 'হিন্দুধর্ম্মের' কথা মিথ্যা নয়! "যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি"—এক মাসে যিনি ইহা পারেন, আড়াই বৎসর পর লেলে মহারাজের সম্মুখে বসিয়া মাত্র সাত দিনে লেলের সমস্ত যোগশক্তি ও যোগ-প্রক্রিয়া তিনি আত্মসাৎ করিয়া ফেলিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

ইহার দেড় বৎসর পর অরবিন্দ তাঁহার স্ত্রীকে লিখিতেছেন—

"প্রিয় মৃণালিনি— 23 Scott's Lane, Calcutta.

17th February, 1907.

আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই। যেইখানে ভগবান আমাকে নিয়া যাইবেন সেইখানে পুতুলের মত যাইতে হইবে। যাহা করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে।

—তোমার স্বামী"

ইহা লেলের সহিত সাক্ষাতের মাত্র এক বৎসর আগের ঘটনা। ভগবানে আত্মসমর্পণ এবং ভগবানের আদেশ পাইয়া ভগবানের ইচ্ছায় পুতুলের মত কাজ করা—অরবিন্দ লেলের নিকট হইতে পান নাই। কেননা লেলের সহিত সাক্ষাতের এক বৎসর পূর্ব্বেই এসকল তাঁহার হইয়া গিয়াছে। শুধু বিনা রক্তপাতে ভারত-উদ্ধার—এইটি তিনি লেলের নিকট হইতে ১৯০৮, ফেব্রুয়ারীতে নূতন শুনিয়াছিলেন। অবশ্য বিনা রক্তপাতে ভারত উদ্ধার—ইহা অরবিন্দের নিজস্ব মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা। এবং এই বিরুদ্ধ কথাই লেলের নিকট হইতে তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন।

শুধু লৌকিক উপায়ে নয়, সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট হইতে কোন অলৌকিক শক্তিলাভ করিয়া উহার প্রভাবে অথবা প্রয়োগদ্বারা দেশ-উদ্ধারের কল্পনা ও চেষ্টা অরবিন্দের মধ্যে বাঙ্গলাদেশে গুপ্ত-সমিতির প্রথমপর্ব্ব প্রবর্তনের (১৯০২—১৯০৪) সময়ে যত না হউক, দ্বিতীয় পর্ব্বের (১৯০৬—১৯০৮) সময় হইতেই তাহা পরিষ্কার দেখা গিয়াছিল এবং সেই পথেই তিনি কাজ করিতেছিলেন, অগ্রসর হইতেছিলেন। এই অলৌকিক শক্তি লাভ করিবার চেষ্টার পথেই সুরাট-কংগ্রেসের পর বরোদাতে লেলে মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এবং লেলে মহারাজের সহিত সাক্ষাতের মাত্র ১০।১২ দিন পরেই ১৯০৮।১৯শে জানুয়ারী তিনি বোম্বাই সহরে বক্তৃতায় স্পষ্ট বলিলেন যে—(১) শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবই বাঙ্গলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন প্রকৃত প্রস্তাবে চালাইতেছেন ("... really leading the present movement")। (২) একজন সাধু বিপিনচন্দ্র পালের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিয়া দিয়াছেন ("If you ask who influenced Babu Bipin Chandra Pal, it was a Sadhu.")। এখানে অরবিন্দ বিপিনচন্দ্রের গুরু প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর

কথাই বলিতেছেন। (৩) জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও একজন সন্ন্যাসীর শিষ্য ("The man who really organised the National College in Calcutta is a disciple of a Sannyasin.")। সতীশচন্দ্র মুখার্জিও প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। অতএব দাঁড়াইল এই যে—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ইঁহারাই ইঁহাদের বিখ্যাত শিষ্যদের মধ্যে অলৌকিক উপায়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলন চালাইতেছেন! সুতরাং অরবিন্দেরও একজন গুরুর প্রয়োজন! এই গুরু খোঁজার পথেই লেলের সহিত সাক্ষাৎ এবং বরোদার একান্তে বসিয়া শক্তিসঞ্চার যোগের সাধন। অরবিন্দ স্পষ্ট গুরুবাদী।

লেলে মহারাজের সহিত সাক্ষাতের সপ্তাহখানেক পরেই অরবিন্দ বোম্বাই সহরে বক্তৃতায় স্পষ্ট বলিলেন যে—রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্য সাধু-সন্ন্যাসী এবং অবতারদিগের নিকট হইতে অলৌকিক শক্তিলাভ করা একান্ত প্রয়োজন এবং ইহা যে সম্ভব হইতে পারে এবং হইতেছে, তাহা তিনি দৃষ্টান্ত-দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়া দিলেন। অস্বীকার করিবার জো নাই।

ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাকামী, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসবাদী অরবিন্দের মনে অলৌকিকের মোহ, গুরুবাদ ও অবতারবাদ কিরূপ দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাইয়া কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষই পাওয়া যাইতেছে। অপর কোন নেতার মনে এরকম এতটা অলৌকিকের মোহ দেখা যায় না।

অরবিন্দ বরোদা হইতে পুণা অভিমুখে চলিলেন। যখন ষ্টেশনে আসিয়া তিনি ট্রেনে উঠিয়াছেন তখন হঠাৎ লেলে মহারাজ ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অরবিন্দকে ট্রেনের কামরা হইতে নামিয়া লেলেকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে বলিলেন। বলা বাহুল্য, অরবিন্দ তাহাই করিলেন। ষ্টেশনের বিপুল জনতা ইহা বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া দেখিল। বারীন্দ্র লিখিয়াছেন—

"In the presence of the vast concourse of people assembled on the station platform to see Aurobindo off, Lele most unnecessarily made him come down from his compartment and bow down to his feet in the full view of the multitude. The whole thing was such a childish trick to show himself

off as the spiritual preceptor of this great leader of all-India political fame."

দেখা গেল, সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত না হইয়াও লেলের মত যোগী হওয়া যায়। বারীন্দ্র লেলের এই দুর্বলতা সমর্থন করিলেন না; বলিলেন—"childish"।

বারীন্দ্রই লেলে মহারাজকে বরোদাতে অরবিন্দের নিকট সাধন-পথের গুরু হিসাবে জুটাইয়া দিলেন। অরবিন্দের বরোদার চাকরী ছাড়িবার দেড় বৎসর পরে বরোদাতেই এই ঘটনা ঘটিল। লেলে কিন্তু বারীন্দ্রকে সাধন দিলেন না। লেলে বলিলেন, "তোমার (বারীন্দ্রের) মনে প্রাণে অশুদ্ধি রয়েছে, কাম রয়েছে, তাই এ বিঘ্ন।"—আত্মকাহিনী, বারীন্দ্র, পৃঃ ৩৫।

ইতিপূর্বে আত্মকথায় বারীন্দ্র নিজেও লিখিয়াছেন যে, "জন্মাবধি আমার (বারীন্দ্রের) মধ্যে কামশক্তি অতিশয় প্রবল।" সুতরাং লেলের কথায় রাগ করিবার কিছুই নাই। বরং বারীন্দ্রের গুণমুগ্ধদের মধ্যে একজন বলিয়াছেন যে "কামশক্তি প্রবল থাকা প্রতিভার লক্ষণ।"

অরবিন্দের বোম্বাই-এ বক্তৃতা : The Present Situation (*19th Jan., 1908*)—সুরাটে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া ও বরোদায় লেলে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহারাষ্ট্র ও বোম্বাই প্রদেশে অরবিন্দ যেসকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে এইটি প্রধান বক্তৃতা। এই বক্তৃতাটি বিশ্লেষণ করিলে অরবিন্দের মনের গতি কোন দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়া কোন দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহা বুঝা যাইবে

অরবিন্দ যখন এই বক্তৃতা করিতে যাইতেছেন তখন তাঁহার হাতে একখানি 'বন্দেমাতরম্' কাগজ আনিয়া দেওয়া হইল। উহাতে 'যুগান্তর' 'নবশক্তি'র উপর আদালতের বিচারে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড প্রভৃতির উল্লেখ ছিল। অরবিন্দ বক্তৃতা দিতে উঠিয়াই সর্ব্বপ্রথম এই দণ্ডের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "This is the situation of the country to-day." অরবিন্দ "আরও অত্যাচার চাই"—এই মতের পক্ষপাতী। মডারেট সুরেন্দ্র ব্যানার্জী ও চরমপন্থী বিপিনচন্দ্র উভয়েই আরও অত্যাচার চাওয়ার পক্ষপাতী নহেন। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের এই প্রচণ্ড দমন-নীতিতে অরবিন্দ যে কিছুটা বিচলিত এবং কিছুটা উত্তেজিত হইয়াছিলেন, তাহা বক্তৃতাটি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

সুরাটে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের অপঠিত বক্তৃতা খবরের কাগজে ছাপা হইয়া বিলি হইয়াছিল। অরবিন্দ উহা পাঠ করিয়াছিলেন। ডাঃ ঘোষের বক্তৃতায় চরমপন্থীদের কর্ম-পদ্ধতির উপর তীব্র ও কঠোর মন্তব্য ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "You cannot put an end to British Rule by boycotting the administration." সুতরাং চরমপন্থীদের ইংরেজের শাসন-পদ্ধতি বয়কট করার যে প্রস্তাব, ডাঃ ঘোষ তাহার কোন মূল্যই দিলেন না। অরবিন্দ প্রমুখ চরমপন্থীদের পক্ষে ইহা কম আক্ষেপ ও কম আক্রোশের কথা নয়। বলে কি ?

সুতরাং অরবিন্দের এই বক্তৃতায় সুরাটে ডাঃ ঘোষের অপঠিত বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া দেখা যাইবে। অরবিন্দ বলিলেন, মডারেটরা চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে যেসকল কথা বলেন অর্থাৎ ডাঃ ঘোষের বক্তৃতায় যাহা উল্লেখ আছে, তাহা শুধু বুদ্ধি 'intellect' ও তর্কের দ্বারা বিচার করিলে সত্যই মনে হইবে। এমন কি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ passive resistance নেতাদের নির্বাসনরূপ অত্যাচারের কবলে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইয়া যাইতে পারে এবং ইংরেজের যেরূপ শক্তি-সামর্থ্য, তাহার বিরুদ্ধে নিরস্ত্র নিঃসহায় ও ছত্রভঙ্গ ভারতবাসী কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না—ইহাও ঠিক। তবে ? তথাপি অরবিন্দ নিরাশার কথা বলেন নাই, বরং অতিমাত্রায় আশার কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—(ক) এ দেশের ত্রিশ কোটি নরনারীর মধ্যে ঈশ্বর জাগরিত হইতেছেন। এই জাগরণে বাধা দিতে পারে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে নাই। (খ) শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বাল্যকালে বৃন্দাবনে দরিদ্র গোয়ালাদের বাড়ীতে লুকাইয়া থাকিয়া পরে কংস জরাসন্ধ প্রভৃতি বধ করিয়া পরিশেষে ভারতের মুক্তির জন্য কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, এবারও তাহাই আরম্ভ করিয়াছেন। (গ) আমাদের কর্তব্য হইতেছে যে—বুদ্ধি, বিচার ও তর্কের পথ ছাড়িয়া দিয়া এই মহাশক্তির আদেশ পালন করিয়া যাওয়া।

"...a great power at work to help India. We have simply to obey that power......Krishna, who is now among the cowherds of Brindaban, will declare the god-head, and the whole people of this great country will rise and no power on earth shall resist and no danger or difficulty shall stop it in its onward course."

ইহা অতি হেঁয়ালিপূর্ণ কথা এবং বুদ্ধি-বিচারকে অতিক্রম করিয়া এক অসম্ভবের প্রতি অন্ধবিশ্বাসের কথা। অরবিন্দ ভারতবর্ষে যদি ফরাসী বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন, তবে হয়ত তাহা তিনি এই হেঁয়ালি কথার মধ্য দিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। পরে তিনি বলিলেন যে, কোন পলিটিক্যাল প্রোগ্রামের দ্বারা আমাদের এই জাতিকে রক্ষা করা যাইবে না।

"It is not by any mere political programme, not by National Education alone, not by Swadeshi alone, not by Boycott alone, that this country can be saved."

সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে অরবিন্দের মনের ভাব বুঝিবার পক্ষে এইটি সবচেয়ে গুরুতর কথা। অরবিন্দের স্পষ্ট স্বীকারোক্তির মধ্যে পাওয়া গেল যে, তিনি চরমপন্থীদের প্রকাশ্য রাজনীতির কোন প্রোগ্রামেই বিশ্বাস করেন না। যুগান্তরের দলও এইসব প্রোগ্রামে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা বিপ্লবে বিশ্বাস করেন। সুতরাং অরবিন্দও বিপ্লবে বিশ্বাস করেন। মিঃ সি. আর. দাশ আলীপুর বোমার মামলায় যে বলিয়াছেন, অরবিন্দ চরমপন্থীদের প্রকাশ্য প্রোগ্রামে বিশ্বাস করেন—তাহা অরবিন্দের নিজের কথার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা। আরও প্রমাণ হইল যে—৭।৮ মাস পূর্ব্বে বিপিনচন্দ্র মাদ্রাজে বাঙ্গালার চরমপন্থী রাজনীতির বিভিন্ন প্রোগ্রামের উপর যে-সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, অরবিন্দের এই প্রোগ্রামে অবিশ্বাসী বক্তৃতা বিপিনচন্দ্রের মাদ্রাজের বক্তৃতা হইতে পৃথক। এবং সেই সঙ্গে ইহাও প্রমাণ হইল যে, যুগান্তরের মডারেট প্রোগ্রামে অবিশ্বাসী ও বিপ্লবে বিশ্বাসী মতবাদের সহিত অরবিন্দ সম্পূর্ণ একমত। আমরা কোন কিছুই অনুমান করিলাম না, অরবিন্দের নিজের মুখের কথা হইতেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল।

পরে অরবিন্দ বাঙ্গলা দেশের কথা বলিলেন। ১৯০৫-১৯০৬-১৯০৭—এই তিন বৎসরে বাঙ্গলা দেশে এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়াছে। বাঙ্গলা দেশ ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশের ত্রাণকর্ত্তারূপে সকল প্রদেশের পুরোভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহার কারণ কি? মহারাষ্ট্র নয়, পঞ্জাব নয়, বাঙ্গলা দেশ ভারতবর্ষের ত্রাণকর্তা (Saviour of India) হইবে—এ অতি অদ্ভুত কথা! কিসে এরূপ হইল? অরবিন্দ উত্তরে বলিতেছেন যে, বাঙ্গলাদেশে জাতীয়তাবাদ নামে এক ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। ("There is a creed in India

to-day which calls itself Nationalism, a creed which has come to you from Bengal. Nationalism is a religion that has come from God. Nationalism cannot die, because God cannot be killed, God cannot be sent to jail. Nationalism is not a mere political programme.")। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের ডাকাতেরা বলিয়াছিল—আমরা দেশকে দেবতা বলিয়া জানি, অন্য দেবতা মানি না। অরবিন্দ বলিলেন—ঈশ্বর ও জাতীয়তাবাদ এক বস্তু, সুতরাং জাতীয়তাবাদ ধর্ম্ম।

ভগিনী নিবেদিতা বলিয়াছেন—জাতীয়তার আদর্শ সৃষ্টি করাই বর্ত্তমান ভারতের প্রধান সমস্যা। "The mind of India may to-day be held to have understood that the most important problem before it is the creation of a National idea." তিনি আরও বিশদ করিয়া বলিয়াছেন, "It is perhaps true that the Bengalee is the Irishman of India ; the Mahratti, the Scott ; the Panjabee, Welshman or Highlander. But is there any unity of life and type perceptible amongst the Indian people, which might sooner or later serve as the foundation for a realised Indian Nationality ?"

ভগিনী নিবেদিতা এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইয়াছেন এবং এই ভারতীয় ঐক্যই তাঁহার মতে জাতীয়তাবাদ। তিনি বলিতেছেন যে—এই বৈচিত্র্যই ঐক্যের প্রমাণ এবং এই ঐক্য যান্ত্রিক (mechanical) নয়, পরন্তু ইহা জৈবিক (organic), ইহা জীবনধর্মী। তিনি বলিয়াছেন—

"For myself, I find an overwhelming aspect of Indian unity in the fact that no single member or province repeats the function of any other."

বিপিনচন্দ্র পাল শুধু জীববিজ্ঞান (organic)-এর দিক হইতে এই জাতীয়তাবাদকে দেখেন নাই, যেমন ভগিনী নিবেদিতা দেখিয়াছেন। পরন্তু তিনি ইহাকে সমাজ-বিজ্ঞানের (super-organic) দিক হইতে দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "It is a federal unity, which means the freedom

of the parts in the unity of the whole." অরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্র—ইঁহারা প্রত্যেকেই বাঙ্গালার জাতীয়তাবাদকে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের দেখা একত্রে মিলাইলে তবে আমরা বাঙ্গালীর জাতীয়তাবাদের সম্পূর্ণ ছবিটি দেখিতে পাইব। বাঙ্গালীর স্বদেশী-যজ্ঞের যে লেলিহান রসনা হইতে এই যাজ্ঞসেনী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ইন্ধন যোগাইয়াছে রাজনারায়ণ বসুর "জাতীয়-গৌরব"; বঙ্কিমের "দেখ, মা যা হইয়াছেন"—দেশভক্তি; আর স্বামী বিবেকানন্দের "হে-ভারত" বলিয়া স্বাজাত্যবোধের গুরুগম্ভীর আহ্বান।

অরবিন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব : এই বোম্বাইয়ের বক্তৃতাতেই অরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"The man who had the greatest influence, and has done the most to regenerate Bengal, could not read and write a single word. He was a man, who had been, what they call, absolutely useless to the world. But he had this one divine faculty in him, that he had more than faith and had realised God. God sent that man to Bengal and sent him in the temple of Dakshineswar in Calcutta; and from North and South, and East and West, the educated men—men who were the pride of the University, who had studied all what Europe can teach—came to fall at the feet of this ascetic.

"The work of salvation, the work of raising India was begun. Consider the men who are really leading the present movement."

"The Present Movement"—স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণদেব হইতে প্রেরণা পাইতেছে—এমন কথা এত স্পষ্ট করিয়া এক অরবিন্দ ছাড়া আর কেহ বলেন নাই। এখানে ভগিনী নিবেদিতার প্রভাব অনুমান করা অসমীচীন নয়।

অরবিন্দের অমরাবতীর বক্তৃতা : বোম্বাইয়ের বক্তৃতার দশ দিন পরে অরবিন্দ অমরাবতীতে বক্তৃতা দেন (২৯শে জানুয়ারী, ১৯০৮)। বক্তৃতার

বিষয়—বঙ্কিমের আনন্দমঠের বন্দেমাতরম্ গান। বোম্বাইয়ের বক্তৃতায় অরবিন্দ ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে 'সম্ভবামি যুগে যুগে' গীতার এই বাক্য অনুসরণ করিয়া ঈশ্বরের (শ্রীকৃষ্ণ) আবির্ভাব হইবে, এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাস তাঁহার দৃঢ় ছিল। সকলকে ইহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রকাশ (revelation) দ্বারা ভারতের মুক্তি হইবে—এই কথার মধ্যে হয়ত তিনি ফরাসী বিদ্রোহের মত একটা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কবি ও বিপ্লবী অরবিন্দের পক্ষে ইহা আশ্চর্য্য কিছু নয়। কিন্তু তাঁহার সহকর্মী মিঃ তিলক এইরূপ কল্পনাকে ১৯০৭ সনে বাস্তবের সহিত খাপছাড়া বলিয়াই মনে করিয়াছেন। মিঃ তিলক তাঁহার এক ইংরেজ বন্ধুকে এই বৎসর স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—

"Certainly, there is a very small party which talks about abolishing British rule atonce and completely; that does not concern us; it is much too far in the future. Unorganised, disarmed and still disunited, we should not have a chance of shaking the British suzerainty."

মিঃ তিলক অরবিন্দের মত বিপ্লবী নহেন। তিনি অনেকটা বাস্তববাদী। অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেও যখন অরবিন্দের আশানুরূপ ঈশ্বরের প্রকাশ কেহ দেখিতে পাইল না, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনেই লুকাইয়া রহিলেন, মথুরা ও কুরুক্ষেত্রে তাঁহার আবির্ভাব দেখা গেল না—তখন আর অরবিন্দের ভবিষ্যৎবাণীর সার্থকতা কোথায়?

অমরাবতীর বক্তৃতায় অরবিন্দ বলিলেন—বন্দেমাতরম্ গান নহে, ইহা একটা মন্ত্র। বঙ্কিম এই মন্ত্রের ঋষি। তিনি এই মন্ত্র তাঁহার সন্ন্যাসী-গুরুর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। বরোদায় লেলে মহারাজের সহিত সাক্ষাতের পর অরবিন্দ বোম্বাই ও অমরাবতীর বক্তৃতায় সন্ন্যাসী-গুরুর কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন। গুরুবাদের দিকে ঝোঁক অরবিন্দের মানসিক পরিবর্তনের একটা সুস্পষ্ট লক্ষণ। পরবর্ত্তীকালেও অরবিন্দ বঙ্কিম সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"He, first of our great publicists, understood the hollowness and futility of the methods of political agitation—which prevailed in his time and exposed it with merciless

satire in his 'Lokarahasya' and 'Kamala Kanter Daftar'...... He bade us leave the canine method of agitation for the leonine. The mother of his vision held trenchant steel in her twice-seventy million hands and not the bowl of the mendicant."

তারপর অরবিন্দ ব্রাহ্মসমাজ-সংস্কারক ও মডারেটদের উপর এই বলিয়া এক-চোট নিলেন যে—তাঁহারা মাতৃভূমিকে, মাকে যেমন ভালবাসা উচিত সেরকম ভালবাসে না। কেননা "One who loved his mother never looked to her defects, never disregarded her as an ignorant, superstitious, degraded and decrepit woman." অরবিন্দের নিকট দেশভক্তি আর মাতৃভক্তি একই কথা। বঙ্কিমের যাহা আদর্শ ছিল, অরবিন্দে তাহাই জীবন্তমূর্ত্তি। তারপর অরবিন্দ যেমন ব্যক্তির দেহে তেমনি জাতির দেহেও স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর আছে—এইরূপ বলিয়া "higher mystries of life" ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা সমাপন করিলেন।

প্যারিস হইতে হেমচন্দ্রের প্রত্যাবর্ত্তন ও মহারাষ্ট্রীয় গুপ্তসমিতি পরিদর্শন : দেবতাদের পক্ষ হইতে কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট মারাত্মক বিদ্যাসকল শিখিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন এবং উহা শিখিয়া পুনরায় স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ১৯০২ সনে গুপ্তসমিতির প্রথমপর্ব্বে অরবিন্দের সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য হেমচন্দ্র বোমা তৈয়ারী শিখিবার জন্য ইউরোপে, বিশেষতঃ প্যারিসে গিয়াছিলেন এবং গুপ্তসমিতির নিয়মপ্রণালী ও বোমা তৈয়ারী শিখিয়া ১৯০৮ সনের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে বম্বে আসিয়া পৌঁছিলেন। অরবিন্দ ঠিক সেই সময় বরোদাতে মহারাষ্ট্রীয় যোগী লেলের সম্মুখে বসিয়া যোগাভ্যাসে নিযুক্ত আছেন।

হেমচন্দ্র বম্বে হইতে নাসিক ও পুণাতে গেলেন। এই দুই সহরে মারাঠার বিপ্লবীদের কেন্দ্রসমিতি ছিল। নাসিক হইতে হেমচন্দ্র নাগপুরে আসিলেন এবং সেখানকার গুপ্তসমিতিও পরিদর্শন করিলেন। হেমচন্দ্র লিখিতেছেন—

"কয়েক দিন মাত্র আগে সুরাট-কংগ্রেস থেকে ফেরবার পথে অরবিন্দ বাবু নাগপুরে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার প্রভাবে নাগপুরে শিক্ষিত মহলের রাষ্ট্রনৈতিক মতটা একটু উগ্র হয়ে উঠেছিল। সে বক্তৃতায় বিশেষ করে ছিল পূর্ণ স্বাধীনতার

বাণী, অর্থাৎ কিনা ভারত ভারবাসীরই জন্য, আর ইংরেজের সঙ্গে ভারতের কোন সম্পর্ক না রাখা। বিপ্লববাদের সুরুতে বাংলায় যেমন বৈপ্লবিক গুরু ব'লে মারহাট্টাদের উপর আমাদের একটা বড় রকমের ধারণা ছিল, নাগপুরে বিপ্লববাদী আর চরমপন্থী যে-ক'জন ছিলেন তাঁদের সেইরকম বাঙ্গালীদের ওপর একটা ভারী আশাপ্রদ ধারণা জন্মেছিল।

"বাংলা দেশে যেদিন থেকে গুপ্তসমিতির পত্তন হয়েছিল, সেইদিন থেকে অর্থাৎ পাঁচ কি ছয় বছর ধ'রে মহারাষ্ট্রীয় গুপ্তসমিতির বিশাল অনুষ্ঠান আয়োজনের গালভরা গল্পই ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীন বাঙ্গালীকে বিপ্লববাদীতে পরিণত করবার প্রধান সম্মোহন-মন্ত্র।

"সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিক সমিতির কাজকর্মের মোটামুটি একটা সঠিক বিবরণ জানতে পেরে তেমনই এতকালের সঞ্চিত আশা একদম হতাশায় পরিণত হয়েছিল।

"প্যারিসে থাকাকালীন হেমচন্দ্র অরবিন্দকেই গুরু ব'লে প্রচার করতেন এবং প্রচার করে গৌরব অনুভব করতেন।

"প্যারিসে 'ক' বাবুকে (অরবিন্দ) শুধু ভারতের একমাত্র আদর্শ নেতা ব'লে ক্ষান্ত হতাম না, সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ ব'লে, বিশেষ ক'রে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে অদ্বিতীয় বলেও জাহির করতাম ; আর লোকের কাছে আমার কদর বেড়ে যেত। সেই লোকগুলি অবশ্য ভারতবাসী।

"তা'ছাড়া প্যারিসে থাক্‌তে বারীনের এক চিঠি পেয়েছিলাম। আমি ফিরে এসে 'কাজ'(action) আরম্ভ করতে যত টাকা চাই তা' বারীন দেবে।"
—(বাং-বি-প্র, পৃ: ২২২-২২৬)

হেমচন্দ্র মারাঠার গুপ্তসমিতির তরফ হইতে র‍্যাণ্ড এণ্ড আয়ার্ষ্ট হত্যাকারী চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফটো উপহার লইয়া হতাশমনে বাংলায় ফিরিলেন।

১৯০২ সনে অরবিন্দ যতীন্দ ব্যানার্জ্জিকে দিয়া মারাঠা হইতে গুপ্তসমিতির বীজ বাংলাদেশে রোপণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তখন গুজরাটে গুপ্তচক্রের প্রেসিডেণ্ট ঠাকুর সাহেব জাপানে ছিলেন এবং অরবিন্দ তখন ঠাকুর সাহেবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বরোদা হইতে বারীন্দ্রের কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন : অরবিন্দকে বরোদা হইতে পুণা-যাত্রার অভিমুখে ছাড়িয়া দিয়া বারীন্দ্র কলিকাতা

ফিরিলেন। তিনি কলিকাতা ফিরিয়া মারাঠার গোপন বিপ্লবীদের সম্বন্ধে ঠিক হেমচন্দ্রের অনুরূপ কথাই বলিলেন। বারীন্দ্র—

"এক কথায় বলিয়া দিল—'চোর, বেটারা চোর।' সমস্বরে আমরা সকলেই ধ্বনি করিয়া উঠিলাম—'কেন? কেন? কেন?'

"বারীন্দ্র বলিল—এতদিন স্যাঙাতেরা পট্টি মেরে আসছিলেন যে, তাঁরা সবাই প্রস্তুত; শুধু বাংলা দেশের খাতিরে তাঁরা বসে আসেন। গিয়ে দেখি না সব ঢুঢু। কোথাও কিছু নেই; শুধু কর্তারা চেয়ারে বসে বসে মোড়লি কচ্ছেন। দু'একটা ছেলে একটু আধটু করবার চেষ্টা করছে, তা-ও কর্ত্তাদের লুকিয়ে। খুব কসে বেটাদের শুনিয়ে দিয়ে এসেছি।"

"চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি বর্গীরা একেবারে খাপ খুলিয়া বসিয়াছেন; আর আজ এইসব ফক্কিকারের কথা শুনিয়া মনটা বেশ খানিকটা দমিয়া গেল। কিন্তু বারীন বলিল : কুচ পরোয়া নেই; ওরা যদি সঙ্গে এল তো এল; আর তা যদি না হয় ত একলা চলরে। আমরা বাঙ্গলা দেশ থেকেই পাঁচ বছরের মধ্যে গরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করে দেব। লেগে যাও সবে আজ থেকে ছেলে জোগাড় করতে।"—(নি: আ:, উপেন্দ্র, পৃ: ২৬)

সুতরাং প্যারিস-ফেরৎ হেমচন্দ্রের কল্পনা অনুযায়ী 'ভারত জুড়ে বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতিতে ছেয়ে ফেলা' শিকায় তুলে রেখে এবং মারাঠা-বর্গীদের জন্য অপেক্ষা না-করে এবং বাংলা দেশেরও আরও যে কয়েকটি দল ছিল তাদের সঙ্গে কোন-রূপ পরামর্শ বা বিবেচনা না-করিয়াই বারীন্দ্র তাঁহার নিজের দলের মুরারি-পুকুর বাগানের মাত্র কয়েকটি বেপরোয়া যুবক লইয়া "battle for the motherland" আরম্ভ করিয়া দিলেন। বারীন্দ্র বলেন—না দিয়া উপায় ছিল না, কেননা বোমা ফাটাইবেন বলিয়া যাঁহাদের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা লইয়াছেন তাঁহারা বোমা ফাটাইতে না পারিলে মাথা ফাটাইবেন বলিয়া শাসাইতেছিলেন অথবা তাঁহাদের দেওয়া টাকা ফেরৎ চাহিতেছিলেন। সুতরাং নিরুপায় হইয়াই বারীন্দ্রকে বোমা ফাটাইতে হইয়াছিল। জলে কুমির, ডাঙ্গায় বাঘ; সুতরাং বোমা না ফাটাইয়া উপায় কি!

মহারাষ্ট্রীয় যোগী লেলের কলিকাতা আগমন ও অরবিন্দের গৃহে অবস্থান: বারীন্দ্র লেলেকে লিখিলেন—

"তুমি একবার বাঙলায় এসো, আমি পাথেয় দেব। ১৯০৮ সালের

ফেব্রুয়ারী মাসে লেলে বাঙলায় আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি আমার সেজদা অরবিন্দের স্কটস্ লেনের বাসায় ছিলেন। বেলুড় মঠে একদিন লেলে গিয়া ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সহিত ঘরে দুয়ার দিয়া সাধনায় বসিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধেও লেলের খুব উচ্চধারণা ছিল। তাঁহার সহিত তাঁহার একটি মারাঠী শিষ্যও বঙ্গদেশে আসেন। একদিন স্কটস্ লেনস্থ সেজদার (অরবিন্দ) বাড়ীতে লেলেকে খুঁজিতে গিয়াছিলাম। হঠাৎ একটা দুয়ার ঠেলিয়া দেখি তিনি চক্ষু মুদিয়া মৃতের মত পড়িয়া আছেন আর তাঁহার একজন মারাঠী শিষ্য তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

"কলিকাতায় আসিয়া লেলে অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

: এখন তুমি কি কি সাধনা কর?

অর। কিছুই করিনে।

লে। সে কি?

অর। সব ছেড়ে দিয়েছি। যিনি আমার মাঝে মন্ত্র তুলেছিলেন তাঁর ওপর নির্ভর করার পর বাণী এসেছে। এই বাণীই এখন আমার পথ-প্রদর্শক, তারই ইঙ্গিতে আমি সকল সাধনা ছেড়ে দিয়েছি।

লে। ওহ! তোমায় শয়তান পথ ভোলাচ্ছে—Oh! the devil has got hold of you.

"অরবিন্দের তখন গভীর সাধনার অবস্থা। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—সেই সর্ব্ব সমর্পণের পথে জীবন ও অহঙ্কারের সাধনা ভগবৎচরণে নিবেদিত হইয়া গিয়াছে। ভক্ত ও প্রেমের সাধক লেলে তাহা বুঝিতে ভুল করিলেন, অরবিন্দও তাঁহার কাছে অতঃপর ভাব গোপন করিতে লাগিলেন।" —(আত্মকাহিনী, পৃঃ ৩৮-৪৩)

হেমচন্দ্র লিখিতেছেন—

"ক-বাবু (অরবিন্দ) না কি এক সিদ্ধপুরুষের মন্ত্রশিষ্য হয়ে আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের জন্য যোগসাধনা করছিলেন।

"অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে চেলা জুটাইবার জন্যই নাকি লেলে মহারাজকে আনা। কেননা, এখানে দলে চেলা জোটে না; যারা জোটে, তারাও অনন্যপরায়ণ হয়ে মাথা গুঁজে বেশীদিন থাকে না; আর দু'একজন যারা থাকে তারাও একদম পোষ মান্‌তে চায় না।

"তখন অনন্যোপায় হ'য়ে পূর্ব্বোক্ত লেলে মহারাজকেই ডেকে পাঠান হ'ল ; তিনি কয়েকদিন পরে এসেছিলেন ; আমি প্যারিস থেকে আসবার পর একদিন গিয়ে দেখলাম, 'ক'-বাবুর (অরবিন্দ) বাড়ীর নীচের তলায় একটি ঘরে খাটিয়ার ওপর লম্বা হয়ে তিনি (লেলে মহারাজ) শুয়ে আছেন, একজন তাঁর ভুঁড়িতে আর একজন পায়ে ঘি মালিশ করছে।"—(বাং-বি-প্র, পৃঃ ২৪৬)

লেলে মহারাজকে আমরা অরবিন্দের স্কট্‌স্ লেনের বাড়ীতে দেখিতে পাইলাম এবং অরবিন্দের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইল, সবটা শুনিতে না-পাইলেও কিছুটা শুনিলাম। ইহা ১৯০৮ ফেব্রুয়ারী মাসের ঘটনা। এইবার লেলে মহারাজ অরবিন্দের বাড়ী হইতে মানিকতলার বোমার বাগান দেখিতে আসিবেন।

লেলে মহারাজের মাণিকতলা বোমার বাগান দর্শন ও তাঁহার হিতোপদেশ : বারীন্দ্র লিখিয়াছেন—

"তখন বাগানের কাজ জোর কদমে চলিয়াছে, বৈদ্যনাথ জংসনের আড্ডাও দুই-একমাস হইল আরম্ভ হইয়াছে। লেলেকে বাগানে আনিয়াছিলাম; তাঁহাকে ভিতরের খবর কিছুই দিই নাই বটে, কিন্তু তিনি সবই টের পাইয়াছিলেন।"—(আত্মকাহিনী, পৃঃ ৩৯-৪০)

লেলে বলিলেন—

"দেখো, তোমরা এপথ কিসের জোরে ধরেছ? ভারত স্বাধীন এক দিন হবেই, কিন্তু এপথে নয়।

আমি। তবে কোন্ পথে?

লে। দেশকে—মানুষকে মুক্ত করতে হলেই কি তা রক্তারক্তি ছাড়া হয় না? ভারত বিনা রক্তপাতেই মুক্ত হবে।

আমি। কি করে?

লে। কি করে, তা-ই যদি দেখবে তো আমার সঙ্গে এসো। একটি নির্জ্জন পার্ব্বত্য গুহায় আমি তোমায় বসিয়ে দেব, ছয় মাস সেখানে সাধনা কর; আমি বলছি, ভগবানের আদেশ পাবে।

আমি। তা কী করে হয়? আমি কত মানুষের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা নিয়েছি; গীতা ও অসি ছুঁয়ে শপথ করেছি, যতদিন দেহে প্রাণ আছে

ততদিন আমার এই ব্রত। আমি ছয় মাসের জন্যে কী করে কাজ ছাড়তে পারি?

লে। শীঘ্রই তোমাদের সামনে ভীষণ বিপদ আসছে।

আমি। কি? মৃত্যু? না হয় ধরে ঝুলিয়ে দেবে, তার জন্যে তো প্রস্তুত হয়েই একাজ করতে নামা।

লে। সে বিপদ মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ।

লেলে যাইবার সময় আমাকে ও উপেনকে না-পাইয়া প্রফুল্ল চাকীকে লইয়া চলিলেন। আমি আপত্তি করি নাই, কিন্তু উপেন তাঁহাকে বুঝাইয়া বুঝাইয়া আধপথ হইতে ফিরাইয়া আনিল। অগত্যা লেলে একাই ক্ষুন্নমনে ফিরিয়া গেলেন।"—(ঐ—পৃঃ ৪০-৪১)

উপেন্দ্রনাথ পরে লিখিয়াছেন—

"১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাধুটী মাণিকতলার বাগানে আসিয়া উপস্থিত হন। দুই চারি দিন আমাদের সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া তিনি বলিলেন: তোমরা যে-পন্থা ধরিয়াছ তাহা ঠিক নহে। তোমাদের মধ্যে জনকয়েককে এই প্রত্যাদেশ পাইবার জন্য সাধনা করিতে হইবে।

"সাধনার ফরমাইস শুনিয়া ছেলেরা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল! প্রত্যাদেশ, না অশ্বডিম্ব! ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিব, তাহার মধ্যে আবার ভগবানকে লইয়া এত টানাটানি কেন?

"বিনারক্তপাতে যে দেশোদ্ধার হইবে, এ কথাটা আমাদের নিতান্ত আরব্য উপন্যাসের মত মনে হইল। আমরা একটু বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: তাও কি সম্ভব?

"সাধু বলিলেন: দেখ, বাবা, যে-কথা আমি বলিতেছি তাহা জানি বলিয়াই বলিতেছি। তোমরা যে উদ্দেশ্যে কাজ করিতেছ, তাহা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু যে উপায়ে হইবে ভাবিতেছ, সে উপায়ে নয়। আমার বিশ বৎসরের সাধনার ফলে আমি ইহাই জানিয়াছি। চারিদিকের অবস্থা এক সময় এমনি হইয়া দাঁড়াইবে যে, সমস্ত রাজ্যভার তোমাদের হাতে আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। তোমাদের শুধু শাসন-ব্যবস্থা-প্রণালী গড়িয়া লইতে হইবে মাত্র। আমার সঙ্গে তোমরা জনকতক এস; সাধনার প্রত্যক্ষ ফল যদি কিছু না পাও, ফিরিয়া আসিও।

"সেদিন সাধু চলিয়া যাইবার পর আমাদের মধ্যে বিষম তর্কাতর্কি বাধিয়া গেল। বারীন ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল : কিছুতেই নয়। কাজ আমি ছাড়বো না। বিনা রক্তপাতে ভারত-উদ্ধার, এটা ওঁর খেয়াল। সাধুর আর সব কথা মানি, শুধু ঐটে ছাড়া।

"সাধু বলিলেন : দেখ রাস্তা যদি না ছাড় ত তোমাদের অল্পদিনের মধ্যে ভীষণ বিপদ অনিবার্য্য। বারীন দুই হাত নাড়িয়া বলিল : না হয় ধরে ঝুলিয়ে দেবে, এই বৈ ত নয়! তার জন্য ত প্রস্তুত হয়েই আছি। সাধু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন : যা ঘটবে, তা মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ।

"মার্চ মাসের মাঝামাঝি তিনি (লেলে মহারাজ) একাই ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া গেলেন।"—(নিঃ আঃ—পৃঃ ২৮-৩০)

বারীন্দ্র ও উপেন্দ্র, দুইজনে একই কথা লিখিয়াছেন। অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখা যায়। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"তিনি (লেলে মহারাজ) আমাদের বিপ্লব-প্রচেষ্টার সমস্ত বিবরণ শুনে মত প্রকাশ করেছিলেন যে, ইংরেজের কবল থেকে ভারত স্বাধীন করতে ভারতবাসীকে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হবে না। ভারতের সিদ্ধ দেহী ও বিদেহী মহাত্মারা তার ব্যবস্থা করেছেন; তাতে ক'রে পৃথিবীতে এমন ঘটনা ঘটবে, যার ফলে ভারত বিনা যুদ্ধে (এমন কি, বিনা কলমবাজী ও বিনা বক্তৃতাতে) আপনা হ'তেই স্বাধীন হয়ে যাবে। সে জন্য বিপ্লববাদ প্রচার বা বিপ্লবের আয়োজন অকারণ কষ্টমাত্র। তাঁর মতে বিপ্লববাদীদের উচিত তাঁর সঙ্গে গিয়ে স্বর্গের পরম বাঞ্ছিত ধাম গোলক-প্রাপ্তির জন্য যোগ-সাধনা করা।

"কিন্তু কেউ তাঁর এ সদযুক্তির সারবত্তা তখন উপলব্ধি করিতে পারেনি। আমাদের কর্ত্তরা বড়ই হতাশ হয়ে অগত্যা বাবাজীকে বিদায় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

"সিদ্ধ মহাপুরুষ সম্বন্ধে কর্ত্তারা হতাশ হ'লেও চেলাদের হতাশ হ'তে দেওয়া হয় নি।"—(ঐ—পৃঃ ২৪৭)

অরবিন্দ ও লেলের হিতোপদেশ : বিনারক্তপাতে, বিনাযুদ্ধে ভারত-উদ্ধার—লেলের এই মত, এই বিষয়ে অরবিন্দের সুস্পষ্ট অভিমতের সম্পূর্ণ বিরোধী।

১৮৯৩।১৮ই সেপ্টেম্বর 'ইন্দুপ্রকাশ" পত্রিকায় অরবিন্দ ফরাসীদেশের

উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে—ফরাসী দেশকে যেরূপ অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্র হইয়া (through purification by blood and fire) স্বাধীনতা লাভ করিতে হইয়াছিল, আমাদিগকেও সেইরূপ করিতে হইবে। পনর বৎসর পরে লেলের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অরবিন্দ তাঁহার এই সুস্পষ্ট মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া কথায় ও কার্য্যে দেখা যায় না।

বারীন্দ্র স্পষ্ট বলিতেছেন যে—মহারাষ্ট্র বা অন্য কোন প্রদেশের সাহায্য না পাইলেও "আমরা বাঙলা দেশ থেকেই পাঁচ বছরের মধ্যেই গরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করে দেব।" গরিলার পরেই অবশ্য প্রকাশ্য বিদ্রোহ। গুপ্তসমিতি, গরিলা, প্রকাশ্য বিদ্রোহ—একের পর আর, এই তিনটী স্তর নির্দ্দেশ করিয়াই অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত বারীন্দ্র-পরিচালিত সন্ত্রাসবাদমূলক গুপ্তসমিতির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গুপ্তসমিতিকে গরিলা ও তার পরবর্ত্তী প্রকাশ্য বিদ্রোহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে ঠিক দেখা হইবে না। অরবিন্দের মনেও ফরাসী বিদ্রোহের অনুরূপ প্রকাশ্য বিদ্রোহের কল্পনাই আসে এবং এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই নয় বৎসর পর ১৯০২ সনে বাঙলা দেশে প্রথম গুপ্তসমিতি প্রবর্ত্তিত হয়।

এক্ষণে লেলে মহারাজের বিনারক্তপাতে ও বিনাযুদ্ধে ভারত-উদ্ধারের মতবাদ তাঁহার মনে কিরূপ ক্রিয়া করিয়াছিল, তাহা তাঁহার অনুবর্ত্তী চেলারা কিছুই লিখেন নাই; সুতরাং আমরা উহা জানিতে পারি নাই। এক্ষেত্রে এখন একমাত্র অনুমান ভরসা। সম্ভবতঃ তিনি তখন লেলের মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কেননা, লেলে চলিয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরেই বারীন্দ্র বলিয়াছেন যে, চন্দননগরের ফরাসী মেয়র মঃ তার্দ্দীভিলকে গুপ্তহত্যা করিবার 'বাণী' অরবিন্দের নিকট আসিয়াছিল। "ক-বাবুর (অরবিন্দের) কাছে 'বাণী' এসেছিল। সেই 'বাণী' বারীন জারী করেছিল।"—(হেমচন্দ্র, পৃঃ—২৩৯)। কিংস্‌ফোর্ড-হত্যা সম্বন্ধেও অরবিন্দ আদেশ দিয়েছিলেন—এ কথাও বারীন্দ্র আমাকে বলিয়াছেন। "সেজদার (অরবিন্দের) হুকুম না পেলে কি ঐ রকম কাজে হাত দি?"

অরবিন্দের জীবনের পরবর্ত্তী ইতিহাসে দেখিতে পাই, অরবিন্দ বিপ্লবের পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন। ১৯১৪ সনে পণ্ডিচারী হইতে তিনি চন্দননগরে শ্রীমতিলাল রায়কে লিখিলেন, "I call a halt"—"থাম"। মঁসিয়েঁ পল্ রিশার (Paul Richard) ও তাঁহার পত্নী মাদাম্ রিশার তখন সবে অরবিন্দের

পণ্ডিচারী আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং 'আর্য্য' প্রকাশ করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

শ্রীমতিলাল রায় লিখিয়াছেন—

"শ্রীঅরবিন্দ এই উগ্র রাষ্ট্রনীতির মোড় ফিরাইয়া দিবার জন্য এই সময়ে নূতন ঋক্ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।"......তিনি আমায় অতঃপর তাঁহার 'আর্য্য' পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহের আদেশ দিলেন।"

প্রমাণ হইতেছে যে, ১৯০৮।ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে লেলের কথায় অরবিন্দ বিপ্লবের পথ ছাড়েন নাই। কিন্তু ১৯১৪ সনে পল্ রিশার ও মাদাম রিশারের সহযোগিতায় পণ্ডিচারী হইতে 'আর্য্য' প্রকাশ করিবার সময় তিনি বিপ্লবের পথ ছাড়িয়াছিলেন।

পরে ১৯২০।৭ই এপ্রিল অরবিন্দ পণ্ডিচারী হইতে বারীন্দ্রকে চিঠি লিখিলেন যে—তিনি রাজনীতিই ছাড়িয়া দিয়াছেন; কারণ উহা বিলাতী জিনিস, ভারতের আসল জিনিস নয়।

"রাজনীতিকে ছেড়েছি কেন? আমাদের রাজনীতি ভারতের আসল জিনিস নয় বলে; বিলাতী আমদানি, বিলাতী ঢঙের অনুকরণ মাত্র।" —(অরবিন্দের পত্র—পৃঃ ৯)। সত্যি কথাইতো। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance) বল, সন্ত্রাসবাদ (Terrorism) বল, এই দুই-ই ত বিলাতী জিনিস। ফরাসী বিদ্রোহের অনুকরণে জাতিকে অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্র করাইয়া পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা, ইহাও তো বিলাতী জিনিস। অরবিন্দ এই সমস্তই পরিত্যাগ করিলেন। বিলাতী বলিয়া একেবারে রাজনীতি পরিত্যাগ! তবে কি তিনি বিলাতী সব সম্পর্ক ছাড়িয়া দিলেন! অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! এমন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

আমাদের মনে কতকগুলি প্রশ্ন জাগিতেছে:

(ক) রাজনীতি কি বিলাতের একচেটিয়া? ভারতের ইতিহাসে কি রাজনীতি নাই? দেশী রাজনীতি বলিয়াও ত কিছু আছে! না থাকিলে, পরাধীন ভারত স্বাধীন হইবে কিসের বলে? অরবিন্দ কি পরাধীন ভারতকে আর স্বাধীন করিতে চান না? যদি চান, তবে রাজনীতি ছাড়িয়া দিয়া তাহা কী প্রকারে সম্ভব? রাজনীতি ছাড়াই কি পরাধীন ভারত স্বাধীন হইবে?

(খ) কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, অরবিন্দ রাজনীতি পরিত্যাগ করেন

নাই। কেননা, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের প্রস্তাব কংগ্রেসকে গ্রহণ ও সমর্থন করিতে বলিয়াছিলেন। ইহা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার কংগ্রেস শ্রীঅরবিন্দের কথা গ্রাহ্য করেন নাই—আদৌ কোনও আমলই দেন নাই। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দ তখন রাজনীতিক্ষেত্রে স্পষ্ট কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। ইহা ত রাজনীতি পরিত্যাগ করা নয়! তবে কি বুঝিতে হইবে যে, তিনি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ২২ বৎসর পরে রাজনীতিতে ফিরিয়া আসিলেন?

(গ) ১৯৪৭।১৫ই আগষ্ট, বাংলা দেশ ও পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া কংগ্রেস যে মাউণ্টবেটনী স্বাধীনতা আনিল, শ্রীঅরবিন্দ ত বহুবার বহুলোকের কাছে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (১৯৫০।৬ই ডিসেম্বর)—ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। এখানেও ত তিনি কংগ্রেসবিরোধীরূপেই আত্মপ্রকাশ করিলেন। ইহাও ত ভয়ঙ্কর রাজনীতি! তবে তিনি রাজনীতি ছাড়িলেন কিরূপে?

(ঘ) শ্রীঅরবিন্দ অখণ্ড বাংলা ও অখণ্ড ভারতের যে আদর্শ মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত দেশ ও জাতিকে দিয়া গেলেন, অন্ততঃ বাংলা দেশে, বাঙ্গালীদের পক্ষে তাহাই ভবিষ্যতের রাজনীতি। অখণ্ড বাংলার আদর্শই ত তাঁহার শেষ দান। তবে তিনি রাজনীতি ছাড়িলেন কিরূপে?

(ঙ) অখণ্ড বাংলা ও অখণ্ড ভারতের আদর্শ শূন্যে মিলাইয়া যায় নাই। ১৯৫২।৬ই সেপ্টেম্বর বিপ্লবী ডাক্তার তারকনাথ দাস সাতচল্লিশ (৪৭) বৎসর পর কলিকাতায় আসিয়া বলিলেন যে—"মহাত্মা গান্ধী দেশ-বিভাগের অশুভ পরিণতির কথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ছিলেন অসহায়। শ্রীনেহেরু ও সর্দ্দার প্যাটেল তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যান। গান্ধীজী প্রতিবাদধ্বনি তুলিবার পরিবর্ত্তে নীরবতা অবলম্বন করিয়া দেশের অশেষ ক্ষতিসাধন করিয়াছেন।"—[আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫৯।২২শে ভাদ্র]

"ডাঃ দাস বলেন যে—১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা আনেনাই; এ দিনটি ভারতের দুর্ভাগ্যের দিন। এই দিন ভারতের ⅓ অংশকে শত্রুর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ৮ কোটি ভারতীয় তাঁহাদের নাগরিক অধিকার হারাইয়াছেন।"—[যুগান্তর—২২শে ভাদ্র, ১৩৫৯]

সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে, শ্রীঅরবিন্দ মৃত্যুর প্রাক্‌কালে বাঙ্গালীকে, তথা

ভারতবাসীকে রাজনীতিক্ষেত্রে যে অখণ্ড বাংলা ও অখণ্ড ভারতের আদর্শ দিয়া গিয়াছেন, তাহা একটা কোন মেকি বা ভুয়া আদর্শ নয়।

প্রমাণ হইল যে, শ্রীঅরবিন্দ মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্য্যন্ত রাজনীতি ছাড়েন নাই। তবে, মহাত্মা গান্ধীর মতই তিনিও নিঃসহায়—এই যা'।

বাংলার স্বদেশী যুগে ভারতবর্ষকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিতে যে এক উদ্দাম কল্পনা ও তাহার জন্য অলৌকিক চেষ্টা শ্রীঅরবিন্দ জাতিকে দান করিয়া গিয়াছেন, শত চেষ্টাতেও ইতিহাস এ-কথা মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না।

রবীন্দ্রনাথের পাবনা-বক্তৃতা (১৯০৮।১১ই ফেব্রুয়ারী): সুরাট-কংগ্রেসের পর মাত্র চার মাস অরবিন্দ কারাগারের বাহিরে ছিলেন।

এই সময়ের দুইটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম—১১ই ফেব্রুয়ারী পাবনায় প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ভারতের পল্লীসংস্কার সম্পর্কে গঠনমূলক-কার্য্য, আত্মশক্তি ও স্বায়ত্তশাসনকে ভিত্তি করিয়া জোর বক্তৃতা দিলেন। দ্বিতীয়—১০ই মার্চ্চ, বিপিনচন্দ্র ছয় মাস কারাগারে বন্দী থাকার পর মুক্তি পাইয়া সন্ধ্যাকালে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলেন। বিপুল জনতা তাঁহাকে স্বাগতম বলিয়া অভ্যর্থনা করিল।

বাঙ্গলার স্বদেশীযুগকে এবং তাহার প্রেরণা ও প্রকাশভঙ্গীকে একটা সরল রেখার মুখে অঙ্কিত করা যায় না। কেননা, প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইতেছি যে, ১৯০৮।ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে (ক) অরবিন্দের সন্ত্রাসবাদ, (খ) রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক পল্লীসংস্কার, (গ) বিপিনচন্দ্রের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ—একই সঙ্গে বিভিন্ন বিচিত্র তরঙ্গ তুলিয়া একত্রে প্রবাহিত হইতেছে। স্রোত এক, কিন্তু তার তরঙ্গ বিচিত্র। অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত তরঙ্গ বিচিত্র ও পৃথক হইলেও উহা মূল স্রোতের অঙ্গীভূত। এই মূল স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অরবিন্দের জীবনচরিতের 'পোর্ট্রেট' আঁকিলে উহা সজীব পদার্থ হইবে না, জড়পদার্থ হইবে। এবং বাঙ্গালীর স্বদেশীযুগের ইতিহাসও বিকৃত ও বিকলাঙ্গ হইবে। জীবনচরিত আলোচনায় 'ল্যাণ্ডস্কেপ' আঁকিবার প্রয়োজন আছে। চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—ইহা না বুঝিয়া, "নিজভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহল॥"—(মধ্য-লীলা, ৮শ পরিচ্ছেদ)

যে কালে বাঙ্গালীর পক্ষে ভালো ইংরেজী না-জানা অত্যন্ত দোষের কথা ছিল, সেইকালে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দুঃসাহসের সহিত পাবনায় প্রাদেশিক সম্মি-

সনীতে বাঙ্গালায় বক্তৃতা পাঠ করিলেন। কিন্তু চিরাচরিত প্রথানুযায়ী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ এ. চৌধুরী ইংরেজীতেই তাঁহার স্বাগতম্-বক্তৃতা দিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালায় বক্তৃতা দিয়া নিয়মভঙ্গ করিলেন। অরবিন্দের পক্ষে ইহা অবশ্যই অসুবিধার ব্যাপার হইল, কেননা তিনি আদৌ বাঙ্গলায় বক্তৃতা করিতে পারেন না। পাবনা-বক্তৃতার চার বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ "স্বদেশী সমাজ" (১৯০৪।২২শে জুলাই) বক্তৃতা দেন। ঐ বক্তৃতাতেই চরমপন্থী-দলে রবীন্দ্রনাথের ধারার স্বরূপ প্রথম প্রকাশ পায়। তিনি আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া স্বায়ত্তশাসন বলিতে, গবর্ণমেণ্টকে বাদ দিয়া গঠনমূলক কার্য্যের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা তিনি বিশেষ কিছুই বলেন নাই এবং সন্ত্রাসবাদের ধারপাশ দিয়াও তিনি যান নাই—মনে তাঁহার যাহাই থাকুক। রবীন্দ্রনাথের ধারা সম্পূর্ণ গঠনমূলক। সে হিসাবে ইহা বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দের ধারা হইতে পৃথক। 'স্বদেশী সমাজ'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"বাংলাদেশে এমন জেলা নাই, যেখানে নানাস্থানে বৎসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে। প্রথমতঃ এই মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্ত্তব্য। তাহার পরে এই সমস্ত মেলাগুলির সূত্রে দেশের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ্য আমরা যেন অবলম্বন করি।

"প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন; ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন; এই সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন; কোন প্রকার নিস্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না-রাখিয়া বিদ্যালয় পথঘাট জলাশয় গোচর-জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে-সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন—তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।"

এই ধরণের গণসংযোগের ভিতর দিয়া জাতীয় জাগরণের কথা, অরবিন্দ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দেও বলিয়াছেন এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দেও বলিয়াছেন। যথা—

"Essential condition of Swaraj is that we should awaken the political sense of the masses……unless we organise the

united life of the village we cannot bridge over the gulf between the educated and the masses."—(*Kishoreganj Palli Samiti*, Apl. 1908)

রবীন্দ্রনাথ "স্বদেশী সমাজ"-এ যাহা বলিয়াছেন পাবনাতেও তাহাই আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। যথা—

"তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর, শিক্ষা দাও, কৃষি-শিল্প ও গ্রামের ব্যবহারসামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্ত্তিত কর; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর।...

"বর্তমানকালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না-পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতেই হইবে। বর্ত্তমানের সেই প্রকৃতিটি—জোট্ বাঁধা, ব্যূহবদ্ধতা, organisation. সমস্ত মহৎগুণ থাকিলেও ব্যূহের নিকট কেবলমাত্র সমূহ আজ কিছুতেই টিকিতে পারিবে না। অতএব গ্রামে গ্রামে আমাদের মধ্যে যে বিশ্লিষ্টতা যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে গ্রামগুলিতে সত্বর ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে।...দ্বিতীয়, আমাদের চেতনা জাতীয় কলেবরের সর্ব্বত্র গিয়া পৌঁছিতেছে না। সেইজন্য স্বভাবতঃই আমাদের সমস্ত চেষ্টা এক জায়গায় পুষ্ট ও অন্য জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জনসমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানাপ্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।"

রবীন্দ্রনাথের পাবনা-বক্তৃতার প্রায় দুই মাস পর অরবিন্দ কিশোরগঞ্জে "পল্লী-সমিতি"র উপর এক 'সুন্দর বক্তৃতা দেন। মূল কথা এক হইলেও, রবীন্দ্রনাথ হইতে অরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক। পাবনায় পল্লী-সংস্কারের কথা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের নামগন্ধও করেন নাই—সম্পূর্ণ উপেক্ষাই করিয়াছেন; কিন্তু কিশোরগঞ্জে অরবিন্দ পল্লী-সমিতির কথা বলিতে গিয়া গভর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া কথা বলেন নাই—খুব একচোট্ নিয়াছেন।

১৯৪২ সনের আগষ্টে "Quit India" এবং "Open Rebellion" ১৯০৬।৭।৮ সনে অরবিন্দে যতটা প্রবল, রবীন্দ্রনাথে ততটা প্রবল দেখা যায় না।

ইহার কারণ— রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়াছেন জাতিগঠনের দিকে, আর অরবিন্দ জোর দিয়াছেন ইংরেজ-শাসন ধ্বংসের দিকে। তাছাড়া অন্য কারণও আছে। রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী নহেন। অরবিন্দ বিপ্লবী।

বাঙ্গালার চরমপন্থীদলের গঠনমূলক কার্য্যে অন্য নেতা অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী; জাতির গঠনকার্য্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগামী চিন্তানায়ক। গঠনকার্য্যের প্রত্যেক বিভাগের উপর তাঁহার দৃষ্টি সমান প্রসারিত ছিল। জাতীয় শিক্ষা বল, সালিশী বিচার বল, মেলা প্রভৃতির সাহায্যে গণ-সংযোগ বল, পল্লীসংস্কার বল—সমস্ত দিকেই তাঁহার সুচিন্তিত পরিকল্পনা তিনি জাতিকে দিয়া গিয়াছেন। গান্ধী-যুগে গঠনমূলক কার্য্যের 'দফা'গুলির মধ্যে এমন একটাও কিছু নূতন নাই যাহা স্বদেশী যুগের বাঙ্গলা—বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পনা করেন নাই। এই দিকে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে বাদ দিয়া আমরা নিজেদের এমন একটা স্বদেশী সমাজ গড়িয়া তুলিব যাহাতে বিদেশী শাসনের অনেকগুলি ক্ষমতা আপনা হইতেই আমাদের হাতে আসিয়া পড়িবে। ইহা অনেকটা প্যারালেল (parallel) গবর্ণমেণ্টের মত, যদিও ঠিক parallel Government ইহা নয়।

রবীন্দ্রনাথের সহিত সহযোগিতা থাকিলেও বিপ্লবী অরবিন্দের চিন্তাধারা ঠিক এই রকমের নয়। অরবিন্দের মতে, জাতি বিদেশীর শাসনপাশ হইতে মুক্ত না হইলে গঠনমূলক কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে না। একটা পরাধীন জাতিকে কতকগুলি গঠনমূলক 'দফা' দিয়া কাজ 'রফা' অর্থাৎ শেষ করা যাইবে না। অরবিন্দ স্পষ্ট বলিয়াছেন—

"I have written about many things--about Swadeshi, Boycott, National Education, Arbitration and other subjects.···It is not by any mere political programme···that this country can be saved."—(*Bombay*—The Present Situation, *January 19, 1908)*

রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের চিন্তাধারার বৈশিষ্ঠ্য লক্ষ্য করা গেল।

বিপিন পালের কারামুক্তি : ১৯০৭।১১ই সেপ্টেম্বর বিপিনচন্দ্রের ছয় মাস কারাদণ্ড হয়। তিনি বক্সার জেলে প্রেরিত হন। ছয় মাস পর সেখান হইতে ১৯০৮।১০ই মার্চ্চ কারামুক্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। প্রায়

লক্ষাধিক লোকের বিপুল জনতা সমারোহের সহিত কারামুক্ত বিপিনচন্দ্রকে হাওড়া ষ্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনে। এই অভ্যর্থনার সমারোহে উল্লেখযোগ্য মডারেটরা কেহই উপস্থিত ছিলেন না।

বিপিনচন্দ্র যখন জেলে আবদ্ধ ছিলেন তখন Daily News তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করে—

"The extremist orator is now in jail for refusing to give evidence in the prosecution of an Indian newspaper for sedition. In his present character he was brought out by the new Swaraj Movement, that is, the demand for Home Rule, pure and simple—a demagogue of incalculable resources and the center of a malignant conspiracy against the British Dominion. He has found his chance in the dissatisfaction felt by the younger section of the educated community towords the older constitutional leaders."—(*Nov. 28, 1907*)

অরবিন্দকে জেল হইতে বাঁচাইবার জন্য বিপিনচন্দ্র বিবেকের দোহাই দিয়া নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করিয়া, জেলে গমন করিয়াছিলেন। Daily News বিপিনচন্দ্রকে তাঁহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া কম সম্মানিত করেন নাই।

১৯০৭ এপ্রিল ও মে, বিপিন পালের মাদ্রাজ বক্তৃতা Rowlatt Committee ইতিহাসে বিখ্যাত করিয়া দিয়াছেন। বিপিনচন্দ্র জেলে থাকাকালীন একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক 'বন্দেমাতরম্' সম্পাদকের নিকট মাদ্রাজের নবজাগরণ সম্পর্কে বিপিন পালের মাদ্রাজ-বক্তৃতার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া একখানি পত্র লেখেন। ১৯০৮।৫ই জানুয়ারী, অরবিন্দ যখন সুরাট-কংগ্রেসের পর বরোদায় ছিলেন, সেই সময় ঐ পত্রখানি 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশ হয়—

"*To the Editor, Bande Mataram,*—Our Presidency will soon belie her infamous title of the 'Benighted Presidency.' You will not deem it as a piece of flattery when I inform you that all these changes are due to our Bengal's inspired hero Bipin Chandra and to your National Organ—Bande Mataram."—(*Letter from* R. Subbiar ; *Dec. 23, 1907*)

আমরা বিপিন পালকে বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসকারী—'A demagogue of incalculable resources'-রূপেও পাইলাম, আবার 'Bengal's inspired hero'—যিনি মাদ্রাজে নবজাগরণ আনিয়াছেন, সেই রূপেও পাইলাম।

বিপিন পাল জেলে বসিয়া Study of Hinduism বলিয়া একখানি গ্রন্থ লেখেন। জেলের বাহিরে আসিয়া ঐ গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে আমরা ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রভাব প্রচুর দেখিতে পাই। আবার ব্রজেন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা রাজা রামমোহনের প্রভাব দেখিতে পাই। রাজা রামমোহন ব্রজেন্দ্রনাথ বিপিনচন্দ্র—ইঁহারা একটি ধারা সৃষ্টি করিয়াছেন। অরবিন্দ এই ধারাতে নাই। পার্নেল বঙ্কিম ও লেলে—এই তিন জন পর পর অরবিন্দের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

বিপিনচন্দ্র জেলে থাকাকালীন অরবিন্দ তাঁহার বোম্বাই-বক্তৃতাতে বলিয়াছেন যে—বিপিনচন্দ্র একজন সাধুর (প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়াছেন। তিনি 'বন্দেমাতরম্' কাগজের প্রতিষ্ঠাতা, স্বদেশী আন্দোলন তাঁহার নিকট হইতে বহু প্রেরণা পাইয়াছে। আলিপুর বোমার মামলায় এক বৎসর কারাবাস করিয়া উত্তরপাড়ায় অরবিন্দ যে বিখ্যাত বক্তৃতা দেন, তাহাতে বিপিন পাল সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—

"When Bepin Chandra Pal came out of jail, he came with a message, and it was an inspired message. I remember the speech he made here. It was a speech not so much political as religious in its bearing and intention. He spoke of his realisation in jail, of God within us all, of the Lord within the Nation ; and in his subsequent speeches also he spoke of a greater than ordinary force in the movement and a greater than ordinary purpose before it···That message, which Bepin Chandra Pal received in Buxar Jail, God gave to me in Alipore."—(*Uttarpara Speech—May, 1909.*)

অরবিন্দ আলিপুর জেলে ভগবানের সাক্ষাৎদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। এই কথা তিনি উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় বলায়, পুণার Indian Social Reformer **ঠাট্টা করিয়াছিল। অরবিন্দ আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন**

—ঈশ্বর শুধু অরবিন্দকেই আলিপুর জেলে দর্শন দেন নাই, পরন্তু বক্‌সার জেলে বিপিনচন্দ্রকে এবং আগ্রা জেলে কৃষ্ণকুমার মিত্রকেও দেখা দিয়াছিলেন।

বিপিন পাল কারামুক্ত হইয়া আসিবার পর মাত্র ১ মাস ২০ দিন অরবিন্দ কারাগারের বাহিরে ছিলেন। যখন বিপিন পাল কারামুক্ত হইয়া ফিরিলেন, তখন লেলে মহারাজ অরবিন্দের স্কটস্ লেনের বাড়ীতে অতিথি। এই একমাস কুড়ি দিনের মধ্যে মানিকতলা বোমার বাগান হইতে মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে পাঠাইয়া মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্যোগ চলিতেছে।

আমরা মিথ্যা বলি নাই যে, বাঙ্গালার স্বদেশী যুগের প্রেরণা ও প্রকাশভঙ্গী একটি সরল রেখার মুখে অঙ্কিত করা যায় না। বাইরের দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বহু বিচিত্র তরঙ্গমালায় বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলন আলোড়িত ও বিক্ষোভিত হইতেছে। প্রত্যক্ষ ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

অরবিন্দের বক্তৃতা: রবীন্দ্রনাথের পল্লী-সংস্কার লইয়া আলোচনা চলিতেছে; জাতীয় শিক্ষা লইয়া সভা হইতেছে ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ঐ সভায় সভাপতি হইতেছেন; বিপিন পাল কারামুক্ত হইয়া কলিকাতার পৌঁছিয়াই অভ্যর্থনা-সভায় সম্বর্দ্ধিত হইতেছেন, মতিলাল ঘোষ ঐ সভায় সভাপতি হইতেছেন, কিন্তু ঐ সম্বর্দ্ধনায় মডারেটরা না-আসায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বক্তৃতাতে মডারেটদের বিদ্রূপ ও ধিক্কার করিতেছেন। আবার ওদিকে, মাদ্রাজে চিদম্বরম্ পিলে বিপিন পালকে 'স্বরাজসিংহ' বলিয়া বক্তৃতা করেন, ফলে পিলে মহাশয়কে গ্রেপ্তার করা হয় ও টিনাভেলিতে দাঙ্গা ও খুনখারাপী হয় এবং এই সব কথা মাদ্রাজের "স্বরাজ" পত্রে লেখার দরুন পত্রের অধিকারী ও মুদ্রাকর গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত হ'ন। এইতো গেল প্রকাশ্য রাজনীতি। আর, অন্ধকারের রাজনীতি মানিকতলা বাগান হইতে মজঃফরপুরের দিকে পরিচালিত হইতেছে। প্রকাশ্য রাজনীতির সভা-সমিতিতে অরবিন্দ যোগ দিতেছেন, বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় সাময়িক রাজনীতি লইয়া প্রবন্ধ লিখিতেছেন এবং সেই সঙ্গে অন্ধকারের রাজনীতিতেও পরামর্শাদি যাহা প্রয়োজন তাহা দিতেছেন। এই ভাবে মার্চ্চ মাস কাটিয়া গেল।

অরবিন্দের বক্তৃতা: এপ্রিল মাসে অরবিন্দ কতকগুলি বক্তৃতা দেন। এই এপ্রিল মাসই শেষ মাস, কেননা ২রা মে তিনি গ্রেপ্তার হন।

(১) অরবিন্দের প্রথম বক্তৃতা (৩রা এপ্রিল) ছাপা দেখি নাই, তবে

তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা জানি। এই সভা কলিকাতায় হয়, সভার উদ্দেশ্য ছিল মাদ্রাজের চিদম্বরম্ পিলেকে ধন্যবাদ প্রদান, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহার নামে দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা। এই সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন বিপিন পাল এবং অরবিন্দ, দুই জনেই।

(২) ১০ই এপ্রিল পান্থির মাঠে এক সভা হয়। ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাস সভাপতি হন। এ সভাতেও বিপিন পাল ও অরবিন্দ, দুই জনেই বক্তৃতা করেন। সভার উদ্দেশ্য ছিল—সুরাটে কংগ্রেস ভাঙ্গিবার পর আবার তাহা এখন জোড়া দেওয়া চলে কি-না. সেই সম্বন্ধে আলোচনা ও পরামর্শ। মেদিনীপুর ও সুরাটে আমরা দেখিয়াছি, অরবিন্দ মডারেটদের সংস্রব বর্জ্জন করিয়া চলিবার পক্ষপাতী। কিন্তু, এই পান্থির মাঠের সভায় অরবিন্দ নরমপন্থী-দের সহিত একত্রে মিলিয়া কংগ্রেস করিবার পক্ষপাতী হইয়াছেন। মেদিনীপুরে যিনি সুরেন ব্যানার্জ্জীকে নিজের দায়িত্বে বর্জ্জন করিয়াছেন, সুরাটে যিনি তিল-কের পরামর্শ বাতিল করিয়া দিয়া মডারেটদের একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন—"Without them (Moderates) if it must be," নিজের লিখিত নীতি সোজা অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন—তিনি এই পান্থির মাঠের সভায় হঠাৎ নরম-পন্থীদের সহিত মিলিত হইয়া কংগ্রেস করিবার পক্ষ ও নীতি সমর্থন করিলেন কিরূপে এবং কি কারণে? অরবিন্দ যে মডারেটদের সম্পর্কে তাঁহার মত এই সভায় কিছুটা পরিবর্তন করিয়াছেন, ইহা তিনি নিজেই স্বীকারও করিয়াছেন। এবং এই মতপরিবর্ত্তনের যে কারণ, তাহাও তিনি বক্তৃতায় স্পষ্ট বলিয়াছেন। অরবিন্দ আরও বলিলেন——

"Our position is—let us work on our different party-lines through our own institutions, but at the same time let us have the united Congress of the whole people."

স্বদেশীযুগের এই নীতি এবং কর্ম্মকৌশল গান্ধীযুগেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। কংগ্রেস যখনই মহাত্মা গান্ধীর কথা শুনে নাই, তখনই মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস ছাড়িয়া যাইবেন এই হুমকি দেখাইয়াছেন এবং ছাড়িয়া গিয়াছেনও। কিন্তু দেশবন্ধু কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়াই কংগ্রেসকে নিজের মতে টানিয়া আনিয়াছেন।

আমাদের প্রশ্ন, অরবিন্দ তাঁহার মত বদলাইলেন কেন? অরবিন্দ নিজেই তাহার উত্তর দিতেছেন—

"We are a democratic party. At Pabna, at Dhulia and other places, people wanted a united Congress and it is our duty to try for it if no vital principle is to be sacrificed to gain that end."—[*Speech at Panti's Math Meeting—Calcutta, 10th April, 1908*]

অরবিন্দ বাল্যাবধি বহু বৎসর ইংলণ্ডে বাস করিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"আমি ইংরেজ জাতিকে ও তাহাদের রাজনীতি, 'their politics' ভালরূপেই জানি।" ইহা খুব সত্য কথা। গ্ল্যাডষ্টোনের সমালোচনাকালে আমরা ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে, মিষ্টার এ. এম. বোস গ্ল্যাডষ্টোনকে কত কম জানেন এবং এ্যাক্রয়েড অরবিন্দ ঘোষ ভারত-সম্পর্কে গ্ল্যাডষ্টোনকে কত বেশী জানেন। শিক্ষায়-দীক্ষায় অরবিন্দ একজন "ডেমোক্র্যাট", সুতরাং পাবনা ধুলিয়া প্রভৃতি স্থানের লোকমতকে একজন সাচ্চা ডেমোক্র্যাট উপেক্ষা করিতে পারেন না। কাজেই "ডেমোক্রাসি" তাঁহার মতপরিবর্ত্তনের কারণ।

কিন্তু এই সঙ্গে আমাদের আর একটি কথাও ভাবিয়া দেখিতে হয়। মেদিনীপুর ও সুরাটে অরবিন্দ একা নেতৃত্ব করিয়াছেন, বিপিন পাল তখন জেলে আবদ্ধ ছিলেন। পান্থির মাঠের সভায় বিপিন পাল উপস্থিত। কারামুক্তির পর গত এক মাস তিনি মেদিনীপুর ও সুরাটের কার্য্যকলাপ বিশদ-রূপে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। ঝগড়ার আদর্শ ও মূলনীতি যতই পবিত্র হোক, ফলে কিন্তু দেখা গেল চরমপন্থী দলকে মডারেটরা কংগ্রেস হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে—তাড়াইয়া দিয়া মডারেটরা কংগ্রেসে একচ্ছত্র রাজত্ব করিতেছে। মডারেটরা গভর্ণমেণ্টের আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাইতেছে। মিঃ মর্লির "Rally the Moderates" সুফল প্রসব করিতেছে। এ অবস্থায় চরমপন্থীদের উচিত নয় যে—কংগ্রেস ছাড়িয়া বাইরে আসা। ইহা করিলে গভর্ণমেণ্ট ও মডারেটরা মিলিয়া চরমপন্থীদের একেবারে উচ্ছেদ করিয়া দিবে। কাজেই বিপিন পাল সম্ভবতঃ চরমপন্থীদের কংগ্রেসে ঢুকিবার প্রস্তাব করেন। বিপিন পালের মত, প্রকাশ্য রাজনীতিতে অরবিন্দ উপেক্ষা করিতে পারেন না এবং পারেনও নাই। সুতরাং ইহা অসম্ভব নয় যে, বিপিনচন্দ্রই অরবিন্দের মত

পরিবর্ত্তন করিতে অনেকটা সাহায্য করিয়াছেন। শুধু পাবনা-ধুলিয়ার ডেমোক্রেসি অরবিন্দের মত পরিবর্ত্তন করায় নাই।

এই সভায় চরমপন্থীদের পুনরায় কংগ্রেসে ঢুকিবার প্রস্তাবের খসড়া বিপিনচন্দ্রের মতপ্রাবল্যে অরবিন্দ নিজেই মুসাবিদা করিয়াছেন। তাঁহার নিজ মতের বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব খসড়া করার কৈফিয়তে তিনি বলিয়াছেন যে—যেহেতু এই আন্দোলন স্বয়ং ঈশ্বর চালাইতেছেন, সুতরাং ঈশ্বরের কার্য্যে নিখুঁত সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না, যাহা কোন ব্যক্তির মতের দিক হইতে থাকা সম্ভব। ("A divine decree cannot proceed on the basis of strict consistency.)"। দেখিতেছি, ঈশ্বরের আর কোন মতেই নিস্তার নাই। শুধু ডেমোক্রেসির কৈফিয়তেই অরবিন্দের মতপরিবর্ত্তন সমর্থন করা যাইত। ইহার সহিত ঈশ্বরকে জড়িত করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কারণ, ইহাতে ঈশ্বরের উপর অসামঞ্জস্যের (inconsistency) দোষ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৩) ইহার দুই দিন পর (১২ই এপ্রিল) বারুইপুরে বয়কট-সমর্থনকারী এক বিরাট সভা হয়। বারুইপুরের জমিদারেরা বয়কট-বিরোধী হইয়াছিলেন। এ সভা অনেকটা তাহার প্রতিবাদ। এ সভাতেও অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র অন্যান্য নেতার সহিত উপস্থিত ছিলেন। অরবিন্দ প্রথমেই বলিলেন যে—

"He had been de-nationalised like his country, and like his country again he is now trying to re-nationalise himself."

এই ধরণের কথা অরবিন্দ আরও অনেক স্থানে বলিয়াছেন। এক বৎসর কারাবাসের পর, উত্তরপাড়া বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—

"I was brought up in England amongst foreign ideas and an atmosphere entirely foreign."

অরবিন্দ এই বক্তৃতায় বেদান্তের "মায়া" কথাটির অবতারণা করেন। যদিও এই প্রসঙ্গে তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে বিপিন পালের মাদ্রাজ-বক্তৃতাকেই তিনি প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করিয়াছেন। নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য কখনও ভাবেন নাই যে, বিংশ শতাব্দীর সপ্তম এবং অষ্টম বৎসরে বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ ভারতবর্ষকে ইংরেজের শাসন হইতে মুক্ত করিবার জন্য এদেশে ইংরেজ শাসনটাকেই অর্থাৎ আমাদের

পরাধীনতাকেই, শ্রেফ বেদান্তের মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। অরবিন্দের নিজের কথাই তুলিয়া দেওয়া ভাল:

"We in India fell under the influence of the foreigners' *maya* which completely possessed our soul. It was the *maya* of the alien rule, the alien civilization, the powers and capacities of the alien people who happen to rule over us. These were, as it were, so many shackles that put our physical, intellectual and moral life in bondage.···

"It is only through repression and suffering that *maya* can be dispelled and the bitter fruit of Partition of Bengal, administered by Lord Curzon, dispelled the illusion.······

"Some people tell us that we have not the strength to stand upon our own legs without the help of the aliens and we should therefore work in co-operation with, and also in opposition to, them. But can you depend on God and *maya* at the same time ? In proportion as you depend on others, the bondage of *maya* will be upon you. The first thing that a Nation must do is to realise the true freedom that lies within and it is only when you understand that free within is free without, you will be really free. It is for this reason that we preach the gospel of unqualified Swaraj ·· ."—[*Baruipur Speech, 12th April, 1908*]

ঠিক এক বৎসর পূর্বে বিপিনচন্দ্র মায়া সম্পর্কে মাদ্রাজে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তুলিয়া দিতেছি:

"The existence of the English rule in India was not due only to the sword, but was much more due to the paralysis of the Indian mind through English hypnotism. It is Maya (delusion) Maya.···What we want is this : to remove the Maya, to dispel this illusion, to kill and destroy this

hypnotism. We have been hypnotised into this belief; though three hundred millions we might be, yet we are weak ...."

"The new movement tried to shatter this belief of Maya by proclaiming the message of strength to, and the abandonment of the sense of helplessness in, the people of India. This tearing off the veil of Maya would have a very far-reaching effect for the galvanisation of their political philosophy into the Indian mass mind, leading to the general disenchantment of that hypnotic spell ...."

"An advancement made in this direction would lead them to make one united determination to cut asunder this Maya."--(*Speeches of B. C. Paul.*)

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিপিনচন্দ্র ও বিপিনচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া অরবিন্দ, ইংরেজের অধীনতারূপ মায়া হইতে ভারতবাসীকে জাতি হিসাবে মুক্ত হইতে বলিয়াছেন। তথাপি মায়ার জগৎ ঠিকই আছে, কার্যকারণ-সম্পর্ক ঠিকই চলিতেছে।

এই সময় মডারেট ভূপেন বসুকে এক সভায় বক্তৃতা দিতে শুনিয়াছিলাম যে—আমরা যেমন আকাশে সূর্য্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না, তেমনি ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকেও অস্বীকার করিতে পারি না। চরমপন্থী ও নরমপন্থীর দৃষ্টিভঙ্গী কত পৃথক! দার্শনিক জগতেও মায়াবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী দুই-ই দেখা যায়।

(৪) তারপর এপ্রিল মাসের শেষের দিকে ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জে গিয়া অরবিন্দ পল্লীসমিতির উপর এক বক্তৃতা দেন। ইহা রবীন্দ্রনাথের পাবনা-বক্তৃতার দুই মাস পরে অরবিন্দ দিলেন। এই দুই মাস কাল মধ্যে অরবিন্দ নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের পাবনা-বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিশোরগঞ্জে রবীন্দ্রনাথের পাবনা-বক্তৃতাকে তিনি হুবহু অনুকরণ করেন নাই। বরং রবীন্দ্রনাথ হইতে পল্লী-সংস্কারে আমরা কিশোরগঞ্জের বক্তৃতায় একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ পল্লীসংস্কারে গভর্ণমেণ্টকে একেবারেই বাতিল

করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু অরবিন্দ তাহা দেন নাই। তিনি এই বিদেশী শাসনের উপর দোষারোপ করিয়াছেন, পল্লীগুলি নষ্ট হওয়ায় স্পষ্ট গভর্ণমেণ্টকে দায়ী করিয়াছেন। সুতরাং এই গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদসাধন ব্যতিরেকে পল্লীসংস্কার সুচারুরূপে করা সম্ভব নয়। তিনি বলিয়াছেন—

"Foreign rule can never be for the good of a Nation .... Foreign rule is inorganic and, therefore, tends to disintegrate the subject body-politic by destroying its proper organs and centres of life ...."

"As soon as the foreign organism begins to dominate the body-politic, it compels the whole body to look to it as the centre of its activities and neglect its own organs of action till these become atrophied. We in India allowed this tendency of alien domination to affect us so powerfully that we have absolutely lost the habit and for some time had lost the desire for independent activity and became so dependent and inert that there can be found no example of such helplessness and subservience in history ...."

"The foreign organism which has been living on us, lives by division and it perpetuates the condition of its existence by making us look to it as the centre of our lives and away from our mother and her children."

অরবিন্দ বিদেশী শাসনকে এই জন্য দূর করিতে চান যে, তাহা না হইলে পল্লীসংস্কার সম্ভব হইবে না। কথাটা কিছুই মিথ্যা নয়, একেবারে সত্য।

বিদেশী শাসন এই জন্য ভাল নয় যে, ইহা বিদেশী। জাতির ভিতর হইতে, জাতির জীবনীশক্তি হইতে ইহার উদ্ভব হয় নাই। এবং সেই জন্যই ইহা পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। বিদেশী শাসন অত্যাচারী বলিয়া যে মন্দ তাহা নয়, গণতান্ত্রিক নয় বলিয়া যে মন্দ তাহা নয়। ইহা মন্দ, যেহেতু এই শাসন পদ্ধতি জাতীয় জীবনের স্বভাবিক বিকাশ নয়। এই বক্তৃতায় অরবিন্দ ঈশ্বরের অবতারণা করেন নাই। বক্তৃতাটি খুব যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল।

আলিপুর বোমার মামলায় মিঃ সি. আর. দাশ সম্ভবতঃ অরবিন্দের কিশোরগঞ্জের বক্তৃতাকে ভিত্তি করিয়াই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। মিঃ দাশ বলিয়াছেন—

"That is Aurobindo's view.······Proceeding Mr. Das said that Aurobindo put it on the ground of organic unity between the Government and the people.···In language of Aurobindo you have got here an authority which has not sprung from the Nation as a part of its organism. The Government has not sprung here from within the people as the Government of the other countries . . . ."

"I object to the Government of this country not because it is an autocratic Government, not because it is not a democratic Government or of its particular actions which are criticised by others. My objection is based on the philosophy that : this Government has not sprung from the people as a part of an organism."

মিঃ সি. আর. দাশ আলিপুর বোমার মমলায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, সন্ত্রাসবাদ, জাতীয়-শিক্ষা, বয়কট, পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ —সমস্তই এবং প্রত্যেকটিই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার আইনসঙ্গত অতি অনুপম ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, মিঃ দাশের বক্তৃতার বাঙ্গলা অনুবাদ হইয়া বহুল প্রচার হয় নাই। ইহা হওয়া উচিত ছিল। অবশ্য উচিত ছিল আরো অনেক কিছু। অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালী এপর্য্যন্ত দেশবন্ধুর একখানি সুচিন্তিত এবং সম্পূর্ণ জীবন চরিতও লিখিয়া উঠিতে পারিল না। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বাঙ্গালীকে একদিন না একদিন করিতেই হইবে।

অরবিন্দ ও অন্ধকারের রাজনীতি : শুধু দিবালোকের অরবিন্দকে দেখিলে ত তাহাকে চেনা যাইবে না। অন্ধকারের অরবিন্দকে না-দেখিলে তাঁহার স্বরূপ জানা যাইবে না।

রবীন্দ্রনাথ এবং সরলাদেবী মতে ও কাজে বিপ্লবী নহেন, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব মতে কতকটা বিপ্লবী হইলেও কাজে নহেন। অরবিন্দ মতে ও কর্মক্ষেত্রে

বিপ্লবী। তা'ছাড়া তিলকও বিপ্লবী নহেন। সুতরাং অরবিন্দ ও তিলকে যে পার্থক্য আছে, তাহা স্পষ্টই দেখা গেল। সুরাটে লাজপৎ গিয়া শেষ পর্য্যন্ত মডারেটদের দলে ভিড়িয়াছিলেন। ইহা অরবিন্দ একেবারেই আশা করেন নাই। পছন্দ ত নিশ্চয়ই করেন নাই। লাজপৎ হইতে অরবিন্দ পৃথক। দিবালোকে চরমপন্থী, অন্ধকারে বিপ্লবী—এই অরবিন্দের জুড়ি ভূ-ভারতে নাই, মিলে না।

যদিও অরবিন্দের জুড়ি ভূ-ভারতে মিলে না, তথাপি এই প্রসঙ্গে আর এক-জনের নাম না-করিলে অত্যন্ত অবিচার ও অপরাধ হইবে বলিয়া মনে করি—তিনি ভগিনী নিবেদিতা।

অরবিন্দ যেদিন চন্দননগরে পলায়ন করেন, সেদিন তিনি রাত্রির অন্ধকারে বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাড়ী গিয়া, পলায়নে তাঁহার সমর্থন লাভ করিয়া, শেষ সাক্ষাৎ করিয়া যান। বৈপ্লবিক মতবাদ ও কর্মক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে অরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতার নিকট যতটা এবং যেরূপ সহানুভূতি পাইয়াছেন তাহা আর কাহারও নিকট হইতে—এমন কি মিঃ পি. মিত্রের নিকট হইতেও পান নাই। অরবিন্দ চলিয়া গেলে, তাঁহার অনুরোধে নিবেদিতাই কর্ম্মযোগিন্ পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন।

অরবিন্দের হাতে গুপ্ত-সমিতির যে দলটি ছিল, নিবেদিতা হাতেকলমে সেই দলটিকে আগাগোড়া পরিচালিত করিয়াছেন। অরবিন্দ অপেক্ষা গুপ্ত সমিতির টেকনিক (technique) ভগিনী নিবেদিতার বেশী জানা ছিল। ভারতীয় চিত্রবিদ্যার তৎকালীন পরিকল্পনায় অরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতার অনুগামী।

রবীন্দ্রনাথ, সরলাদেবী, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনচন্দ্র, তিলক, লাজপৎ, পি. মিত্র, ভগিনী নিবেদিতা—ইঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই অরবিন্দের যোগাযোগ ছিল। অথচ ইঁহাদের প্রত্যেকের সহিত মিল থাকিলেও অরবিন্দচরিত্রে কিছুটা পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্যই অরবিন্দের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। অরবিন্দের পোর্ট্রেট আঁকিতে হইলে তাঁহার এই অদ্ভুত ও অনুপম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই অঙ্কিত করিতে হইবে।

প্রকাশ্য দিবালোকে অরবিন্দকে দেখিতে পাই—তিনি ইংরেজবর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিতেছেন ও তাহা লাভের জন্য নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এবং সেই সঙ্গে স্বদেশী যুগে বাংলাদেশ ভারতবর্ষকে যে রাজনৈতিক প্রোগ্রাম দিয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটিকেই অরবিন্দ বক্তৃতা ও

"বন্দেমাতরম্"-এ লেখার দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বোম্বাই-এর বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে : যদিও আমি স্বদেশী, স্বরাজ, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা, সালিশী-বিচার, পল্লীসংস্কার প্রভৃতি বহু বিষয়ে লিখিয়াছি তথাপি আমার বিশ্বাস যে—শুধু এই প্রোগ্রাম দ্বারা দেশকে বাঁচানো যাইবে না, অর্থ স্বাধীন করা যাইবে না।

এইখানেই বিপ্লবী অরবিন্দের মনের পুরা আত্মপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই। শুধু চরমপন্থী প্রোগ্রামে হইবে না—এইখানে অপর নেতাদের হইতে তিনি পৃথক। এক ভগিনী নিবেদিতা ছাড়া অপর কোন নেতাই বিপ্লবী নহেন। অরবিন্দ বিপ্লবী।

তিনি যে বিপ্লবী তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই অন্ধকারের অরবিন্দের কার্য্য-প্রণালীর মধ্য দিয়া। অন্ধকারের অরবিন্দ ফুলার, ফ্রেজার, মঃ ডাদিভিলা—ইঁহাদের উপর অন্ধকারের মধ্য দিয়া যে গোপন আক্রমণ হইয়াছিল তিনি তাহার নেতৃত্ব করিয়াছেন। এবার মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের উপর যে গোপন আক্রমণ হইবে, তাহার সহিতও তিনি জড়িত থাকিবেন। আলিপুর বোমার মামলায় অবশ্য মিঃ সি. আর. দাশ দক্ষতার সহিত প্রমাণ করিয়াছেন যে—কোনরূপ গুপ্তহত্যার সহিত অরবিন্দ কখনই জড়িত ছিলেন না। উহা আদালতের বিচার, আইনের বিচার। আদালত ও আইনকে অতিক্রম করিয়া আমরা ইতিহাসের বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছি। ইহা সত্য যে—ইতিহাসে বিপ্লবী অরবিন্দকে অন্ধকারের রাজনীতিতে যে মূর্ত্তিতে দেখা যাইবে, তাহা আইন ও আদালতের মূর্তি হইতে ভিন্ন। স্বদেশী যুগে অন্ধকারের অরবিন্দের কথা অদ্যাপি কেহ লেখেন নাই। সকলেই চাপিয়া গিয়াছেন। বারীন্দ্র কিছুটা লিখিয়াছেন, আর লিখিয়াছেন হেমচন্দ্র। কিন্তু উহা যথেষ্ট নয়। আলোতে সত্য থাকে, আবার অন্ধকারেও সত্য থাকে। বিপ্লবী অরবিন্দের জীবনে অন্ধকারের সত্য, দিবালোকের সত্যের চেয়ে কম নয়—ছোট নয়।

বয়স সাঁইত্রিশ বৎসর (১৯০৮।১৫ই আগষ্ট—১৯০৯।১৪ই আগষ্ট):

মিঃ কিংস্‌ফোর্ড ★ গ্রেপ্তারের আগে ও গ্রেপ্তার—"my mission is over" (বারীন্দ্র) ★ মিঃ বার্লির কোর্টে অরবিন্দ প্রভৃতির বিচার আরম্ভ (১৯শে মে—১১ই সেপ্টেম্বর) ★ বারীন্দ্রের জেল হইতে পলায়নের কল্পনা ★ নরেন গোঁসাইকে হত্যা (১লা সেপ্টেম্বর) ★ মিঃ বার্লির কোর্ট হইতে মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌টের কোর্ট ★ বাংলা ও মারাঠা ★ ফাঁসি—কানাই-এর (১০ই নভেম্বর), সত্যেনের (২৩শে নভেম্বর) ★ অরবিন্দের কারাজীবন ★ ১৯০৮।ডিসেম্বর—স্বদেশীর নির্বাপিত অবস্থার পূর্বলক্ষণ ★ অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে মিঃ সি. আর. দাশ ★ অরবিন্দের কারামুক্তি ★ উত্তরপাড়া বক্তৃতা (১৯০৯।মে) ★ বীডন স্কোয়ারে (কলিকাতা) বক্তৃতা—(১৯০৯।১৩ই জুন) ★ "কর্ম্মযোগিন্" (ইংরাজী) পত্রিকা প্রকাশ (১৯০৯।১৯শে জুন) ★ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ ★ বিপিনচন্দ্রের প্রতি অরবিন্দ ★ ঝালকাঠি বক্তৃতা (১৯০৯।২৩শে জুন) ★ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ ★ অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত ভারতীয় চিত্রকলা ★ ১৯০৯।১লা জুলাই—লণ্ডনে স্যার কার্জ্জন উইলী খুন ★ মিঃ গোখ্‌লের পুণা-বক্তৃতা (১৯০৯।৮ই জুলাই) ★ অরবিন্দের বক্তৃতা—("The Right of Association", ১৭ই জুলাই তারিখের 'কর্ম্ম-যোগিন্' পত্রিকায় প্রকাশিত) ★ কলেজ-স্কোয়ারে বক্তৃতা (১৯০৯।১৮ই জুলাই) ★ দেশবাসীকে অরবিন্দের খোলা চিঠি (১৯০৯।৩১শে জুলাই) ★ বিলাতে বিপিন পাল (১৯০৯।আগষ্ট) ★ ১৯০৯।৭ই আগষ্ট—(সভায় ভূপেন বসু সভাপতি)

মিঃ কিংস্‌ফোর্ড ঃ মিঃ কিংস্‌ফোর্ড কলিকাতা হইতে মজঃফরপুরে বদলি হইয়া গিয়াছেন। তিনি যখন কলিকাতায় ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন রাজদ্রোহ-মূলক কতকগুলি মোকদ্দমায় শাস্তি দিয়াছিলেন। ১৪ বৎসরের বালক সুশীলকে ১৪ ঘা বেত মারিবার হুকুম তিনিই দিয়াছিলেন। এই চৌদ্দ ঘা বেত খাইয়া সুশীল মানিকতলা বোমার আড্ডায় গিয়া যোগ দিয়াছিল। প্রথমে সুশীলকে দিয়াই মিঃ কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করিবার প্রস্তাব হয়। পরে সুশীলের পরিবর্তে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে মনোনীত করা হয়।

মিঃ কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করিবার প্রথম চেষ্টা করা হয় কলিকাতায়। একখানা বড় বইয়ের মাঝখানে পাতা কাটিয়া ফেলিয়া জায়গা করিয়া একটা বোমা এমনভাবে রাখা হয় যে, বই খুলিতে গেলেই বোমাটি ফাটিয়া যাইবে। মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের হাতে তাঁর টালিগঞ্জের বাড়ীতে বোমাসমেত বইখানি দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর বরাতের এমনি জোর যে, তিনি বইখানি না খুলিয়াই আলমারিতে রাখিয়া দেন। 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে?'

রাউলাট কমিটি এই বিষয়ে লিখিয়াছেন—

"Upon search being made, a parcel was found which Mr. Kingsford had received but not opened, thinking it contained a book borrowed from him. The parcel did contain a book ; but the middle portion of the leaves had been cut away and the volume was thus in effect a box and in the hollow was contained a bomb with a spring to cause its explosion if the book was opened."—[*Sedition Committee (1918) Report* ; *Page 32*]

বারীন্দ্র আমাকে বলিয়াছেন : "সেজ্‌দা (অরবিন্দ), রাজা সুবোধ মল্লিক ও চারুচন্দ্র দত্ত—এই তিনজনে কিংসফোর্ড বধের আদেশ দিয়াছিলেন।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করাতে বারীন্দ্র বলিলেন : "সেজ্‌দা (অরবিন্দ) না বলিলে কি অমন কাজে হাত দিই ?"

বারীন্দ্র লিখিয়াছেন—

"প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামকে মজঃফরপুর পাঠাইয়া আমি দিন গণিতেছিলাম।

প্রতিদিন 'এম্পায়ার' কাগজ কিনিয়া দেখিতাম কার্য্যোদ্ধার হইল কি-না।"
—(বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী, পৃঃ ৪৫)

অরবিন্দ লিখিয়াছেন—

"১৯০৮ সনের ১লা মে শুক্রবার আমি 'বন্দেমাতরম্' অফিসে বসিয়াছিলাম. তখন শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী আমার হাতে মজঃফরপুরের একটি টেলিগ্রাম দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম, মজঃফরপুরে বোমা ফাটিয়াছে, দুটি যুরোপীয়ান স্ত্রীলোক হত। সেদিনের এম্পায়ার কাগজে আরও পড়িলাম, পুলিস-কমিশনার বলিয়াছেন—আমরা জানি কে কে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এবং তাহারা শীঘ্র গ্রেপ্তার হইবে। জানিতাম না তখন যে, আমি এই সন্দেহের মুখ্য লক্ষ্যস্থল, আমিই পুলিশের বিবেচনায় প্রধান হত্যাকারী, রাষ্ট্রবিপ্লবপ্রয়াসী যুবকদলের মন্ত্রদাতা ও গুপ্তনেতা।"—(কারাকাহিনী, পৃঃ ৩১)

১৯০৮।১লা মে সন্ধ্যার পর "Empire"-এ সংবাদ বাহির হইল—"৩০শে এপ্রিল রাত্রি ৮টার সময় মিসেস এবং মিস্ কেনেডি, মজঃফরপুরের জজ মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের বাড়ীর গেটে (ফটকে) ঢুকতে বোমার দ্বারা নিহত হয়েছেন।"

এই দুর্ঘটনার ছয় মাস পূর্ব্বে ১৯০৭।৩০শে অক্টোবর, "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় অরবিন্দ মিঃ কিংস্‌ফোর্ড সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন যে—দেশের জন্য প্রাণ দিয়া যাঁহারা শহিদ (martyr) হন, সেই বিদ্রোহীদের সায়েস্তা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যাঁহারা প্রাণ পণ করেন তাঁহারাও শহীদ (martyr) হন।

"*Mr. Kingsford a martyr :* If there are martyrs to the national cause there are also martyrs to the so-called benevolent despotism under which we live."—(*Bandemataram*; *30th Oct., 1907*)

মজঃফরপুরে বোমা ফাটিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় New Conditions নাম দিয়া প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেন যে—গভর্ণমেণ্ট যদি এদেশে প্রজার ন্যায্য অধিকার ক্রমাগতই অস্বীকার করেন, তবে প্রতিক্রিয়ার ফলে গুপ্তহত্যা ও গুপ্ত অনুষ্ঠান অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

মজঃফরপুরের বোমা ফাটিবার মাত্র একদিন পূর্ব্বে অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় আরও সাংঘাতিক গুরুতর কথা লিখিলেন। তাহার মর্ম এই যে,

বিপ্লব অনিবার্য্য। যেদিন এই কথা 'বন্দেমাতরমে' প্রকাশ হইল, সেদিন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে বোমা-রিভলবার লইয়া মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছেন।

অরবিন্দ লিখিলেন—

"The fair hope of an orderly evolution of self-government, which the first energy of the new movement had fostered, is gone for ever. Revolution, bare and grim, is preparing her battlefield moving down the centres of order which were evolving a new cosmos and building up the materials of a gigantic downfall and a mighty new creation. We could have wished it otherwise. But God's will be done!"
—(*Bandemataram—29th April, 1908*)

সোজা কথা, ঘোরপ্যাঁচ কিছুই নাই। অরবিন্দের মনের ভাব স্পষ্ট বোঝা গেল; প্রত্যক্ষ ঘটনার সহিত অরবিন্দের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট মিল রহিয়া গিয়াছে।

গ্রেপ্তারের আগেও গ্রেপ্তার : মানিকতলার বোমার আড্ডা 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' নানাস্থানে ঘুরিতেছে। উপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"বৈদ্যনাথের কাছে মাঠের মাঝখানে একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া সেইখানেই বোমার আড্ডা উঠাইয়া লইয়া যাওয়া স্থির হইল।"—(পৃঃ ২৬-২৭)

সেখানে বোমা তৈরী ও বোমা ফাটাইবার মহড়া চলিতেছিল। দিঘারিয়া পাহাড়ে বোমা ফাটান দেখিতে গিয়া প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী নামে একটি ছেলে মারা যায়। উপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"তাহার (প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী) মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মাথার মাঝখান হইতে কোমর পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া কি যেন একটা ধড়াৎ করিয়া নামিয়া গেল। একটা অন্ধ রাগ আর ক্ষোভে মনটা ভরিয়া গেল। মনটা শুধু আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিতে লাগিল 'সব চুলোয় যাক, সব চুলোয় যাক্!'—(পৃঃ ২৭)। পরে যাতায়াতের ব্যয়সঙ্কোচ করিবার জন্য বোমার আড্ডা দেওঘর হইতে কলিকাতায় উঠাইয়া আনা হইল। সেখানে যাহাতে লোকের গতিবিধি কম হয় ও পুলিশের নজর না পড়ে সেইজন্য ভবানীপুরে আর একটি বাড়ীতে পুরান

ছেলেদের রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইল। বাগানে রহিল প্রধানতঃ নূতন ছেলেরা। কিন্তু শত চেষ্টায়ও পুলিশের দৃষ্টি আমরা এড়াইলাম না।”—(পৃঃ ৩১)

হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

“গোপীমোহন দত্ত লেনে প্রথমে যে তিনটা বোমা তয়ের হয়েছিল, তার একটা পরীক্ষা করে দেখা হল আশানুরূপ কাজ দেবে।”—(পৃঃ ২৬৬)

সম্ভবতঃ এই বোমাটিই মজঃফরপুরে পাঠান হইয়াছিল।

হেমচন্দ্র আরও লিখিয়াছেন—

“ক-বাবু (অরবিন্দ) বারীনকে সাবধান হতে বলেছিলেন। তাতে না-কি বারীন বলেছিল: ওসব মিথ্যে কথা, দেখছ না। ওরা (আমরা) শক্ত কোন কাজে হাত দিতে চায় না বলেই দিনরাত কেবল পুলিশের স্বপ্নই দেখছে, ইত্যাদি। ক-বাবু (অরবিন্দ) বারীনেব অন্য সব কথার মত এ-কথাও খুব সঙ্গত বলেই মেনে নিয়েছিলেন।”—(পৃঃ ২৬৮)

তারপরেই মজঃফরপুরে বোমা ফাটিবার খবর আসিল। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

“আমাদের কর্তা (অরবিন্দ) এ খবর পাওয়ামাত্র বারীনকে ডেকে এনে আদেশ দিলেন, দলের সকলকে এসংবাদ জানাতে আর সকলকে আড্ডা থেকে তৎক্ষণাৎ সরিয়ে দিতে। কিন্তু কোন আদেশই পালন করা তার ধাতে সয় না। তাই কাউকে কোন খবর না দিয়ে মানিকতলার আড্ডায় গিয়ে বন্দুক, রিভলভার, গুলী, সেল আদি পুঁতে ফেলতে সে হুকুম দিয়েছিল। আদেশ অনুযায়ী রাত ১২টা পর্যন্ত ঐ সকল জিনিষের ওপর দুটি দুটি মাটী ঢাকা দেওয়া হয়েছিল। ঐ সময় নাকি পুলিসের কে একজন এসে এই রকম ইঙ্গিত দিয়েছিল, ‘সকালে অনেক পুলিশ আসবে, সাবধান!’ একথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আসেনি। এদিকে হ্যারিসন রোডের উক্ত মালপূর্ণ বাক্সগুলোও সরান হলো না। আমিও রাত ১২টা পর্য্যন্ত কোন খবর না পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে নিশ্চিন্ত হলাম।”—(পৃঃ ২৭০)।

মানিকতলা, ১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেন, ১৩৪নং হ্যারিসন রোড, ৮নং গ্রে ষ্ট্রীট, ৩৮।৪রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট ও মেদিনীপুর হইতে সকলেই গ্রেপ্তার হইলেন। অরবিন্দের গ্রেপ্তারের কথা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

“শুক্রবার রাত্রিতে আমি নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইয়াছিলাম, ভোরে প্রায় ৫টার

সময় আমার ভগিনী সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিল; জাগিয়া উঠিলাম। পরমুহূর্তে ক্ষুদ্র ঘরটী সশস্ত্র পুলিশে ভরিয়া উঠিল—সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ক্রেগান, ২৪-পরগণার ক্লার্ক সাহেব, সুপরিচিত শ্রীমান বিনোদকুমার গুপ্তের লাবণ্যময় ও আনন্দদায়ক মূর্ত্তি, আর কয়েকজন ইন্স্পেক্টার, লালপাগড়ী, গোয়েন্দা, খানাতল্লাসীর সাক্ষী। হাতে পিস্তল লইয়া তাহারা বীরদর্পে দৌড়াইয়া আসিল, যেন বন্দুক কামানসহ একটী সুরক্ষিত কেল্লা দখল করিতে আসিল। শুনিলাম, একটি শ্বেতাঙ্গ বীরপুরুষ আমার ভগিনীর বুকের উপর পিস্তল ধরে; তাহা স্বচক্ষে দেখি নাই। বিছানায় বসিয়া আছি, তখনও অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থা। ক্রেগান জিজ্ঞাসা করিলেন—অরবিন্দ ঘোষ কে, আপনিই কি? আমি বলিলাম—আমিই অরবিন্দ ঘোষ। অমনি আমাকে গ্রেপ্তার করিতে একজন পুলিসকে বলেন। তাহার পর ক্রেগানের একটি অতিশয় অভদ্র কথায় দুজনের অল্পক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডা হইল। আমি খানাতল্লাসীর ওয়ারেণ্ট চাহিলাম, পড়িয়া তাহাতে সহি করিলাম। ওয়ারেণ্টে বোমার কথা দেখিয়া বুঝিলাম, এই পুলিস সৈন্যের আবির্ভাব মজঃফরপুরের খুনের সহিত সংশ্লিষ্ট। কেবল বুঝিলাম না—আমার বাড়ীতে বোমা বা অন্য কোন স্ফোটক পদার্থ পাইবার আগেই body warrant-এর অভাবে কেন আমাকে গ্রেপ্তার করে। তবে সেই সম্বন্ধে বৃথা আপত্তি করিলাম না। তাহার পরেই ক্রেগানের হুকুমে আমার হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি দেওয়া হইল। একজন হিন্দুস্থানী কনেষ্টবল সে দড়ি ধরিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল।"—(কারাকাহিনী—পৃঃ ৩-৪)

"মনে পড়ে ক্ষুদ্র কার্ডবোডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটি রক্ষিত ছিল, ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধচিত্তে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করেন, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে—এটা কী নূতন ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ! এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না। শেষে ইহা মাটি ভিন্ন আর কিছু নয় এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর নিকট পাঠান অনাবশ্যক—এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়।"—(কারাকাহিনী—পৃঃ ৫-৬)

অরবিন্দ গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে দক্ষিণেশ্বরের মাটির উপর কতটা আকৃষ্ট ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল। তিনি ষড়যন্ত্রে নিজের দায়িত্ব বিলকুল অস্বীকার করিলেন। তাই মহারাজের মোকদ্দমায় তিলক যেরূপ নির্দ্দোষ

ছিলেন, আলীপুর বোমার মামলাতেও তিনি নিজেকে সেইরূপ নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি লিখিতেছেন—

"অনুমান করিলাম যেমন তাই মহারাজের মোকদ্দমায় তিলককে ভণ্ড, মিথ্যা-বাদী, প্রবঞ্চক ও অত্যাচারী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং সেই চেষ্টায় বোম্বে গবর্ণমেণ্ট যোগদান করিয়া প্রজার অর্থের অপব্যয় করিয়াছিলেন—তেমনই এস্থলেও কয়েকজন আমাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল।"—(কারা-কাহিনী—পৃঃ ১৩)

গুপ্তসমিতির কথা কেহ প্রকাশ করে না। করিলে শাস্তি—প্রাণদণ্ড। গুপ্ত-সমিতির এই রীতি (টেক্‌নিক্) তিনি সম্পূর্ণ মানিয়া চলিলেন। গুপ্তসমিতির ব্যাপারে সত্যের সহিত মল্লযুদ্ধ করা (experiment with truth) চলে না। অহিংসার যাহা টেক্‌নিক্, হিংসার তাহা নয়। অরবিন্দ অহিংস নহেন, তিনি বিপ্লবী। বারীন্দ্র যে অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা অরবিন্দের অভিপ্রেত ছিল না। এইখানে অরবিন্দ, বারীন্দ্র হইতে পৃথক। হেমচন্দ্রও অপরাধ স্বীকার করেন নাই। তিনিও গুপ্তসমিতির টেক্‌নিক্ মানিয়া চলিয়াছেন। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"অরবিন্দ বাবু নাকি বলেছিলেন, তাঁর বক্তব্য কোন উকীলের মারফত জজসাহেবকে আবশ্যক হলে জানাতে পারেন। আর একজন বলেছিল, সে গুপ্তসমিতি আদি সম্বন্ধে কিছুই জানে না। এছাড়া আপাততঃ, এমন কি নিজের নাম-ধাম ইত্যাদি বলাও সে উচিত মনে করে না। আর কয়েক জন কিছুই জানে না ব'লেছিল। উপেন, বারীন, উল্লাস প্রভৃতি আবার বিশেষ ক'রে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল।"—(পৃঃ ১৮৫)

বারীন্দ্রের অপরাধ স্বীকার ঃ নরেন গোঁসাই প্রথমে ধরা পড়েন নাই। বারীন্দ্র নাকি তাঁহার নাম বলিয়া ধরাইয়া দেন। এই আক্রোশেই নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী (approver) হইয়া অরবিন্দের নাম বলিয়া দেন। বারীন্দ্র আর সকলের নামই বলিয়াছিলেন, কেবল তাঁহার সেজদা অরবিন্দের নাম বলেন নাই। নরেন গোঁসাই অরবিন্দের নাম বলিয়া দিলেন। সুতরাং প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, বারীন্দ্র ও নরেন গোঁসাইর স্বীকারোক্তিতে তফাৎ কোথায়।

অরবিন্দ জেলের মধ্যে গিয়াও বারীন্দ্রকে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু বারীন্দ্র তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"অরবিন্দ বাবুর সঙ্গে আমাদের পাঁচ জনের দেখা হয়েছিল। তিনি আমাদের বিশেষ করে বলে দিয়েছেন যে, যারা confession দিয়েছে তাদের বিশেষতঃ বারীনের সঙ্গে দেখা হলে যেন ব'লে দি, তারা যা-কিছু স্বীকারোক্তি দিয়েছে, তা' যেন প্রত্যাহার (retract) করে। কারণ, উকীলের সঙ্গে পরামর্শ না করে আসামীর পক্ষে স্বীকারোক্তি দেওয়া কখনও উচিত নয়। যদি কিছু বলতে হয়, তা' উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করেই উকীলের দ্বারা বা নিজের বলা উচিত। Retract করলে স্বীকারোক্তির দোষ খণ্ডে যায়। এতেও যখন বারীন ভিজলো না, তখন বলেছিলাম—বিবেচনা করে দেখা উচিত, তার রকম স্বীকারোক্তি দেশদ্রোহিতা ব'লে বিবেচিত হতে পারে কি-না। এই না শুনে বারীন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে যা' বলেছিল, তার মর্ম্ম হচ্ছে—সে এই স্বীকারোক্তি দিয়ে যা করছে, তা বোঝবার ক্ষমতা সেজদা বা কোন উকীলের নাই। আমরা সব ভীরু কাপুরুষ। 'অরবিন্দ এ সব কি বোঝে!'—(বারীনের মুখের কথা)। এই রকম অনেক কিছু শোনবার পর বারীন অন্যের নাম প্রকাশ করলে কেন, তা জিজ্ঞেস করায় বলেছিল—সে মিথ্যে কথা বলতে আমাদের মত অভ্যস্ত নয়। অত্যধিক উত্তেজনার বশে আরও অনেক কিছু বলেছিল।"—(পৃঃ ২৮৮)

বারীন্দ্র গ্রেপ্তার হবার পরেই বলিয়া উঠিলেন, "আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে" —"My mission is over". এখন প্রশ্ন: এই "মিশন" কি? বারীন্দ্র নিজেই লিখিয়াছেন—

"আমাদিগকে প্রকাশ্য রাজদ্বারে ঘাতকহস্তে স্বেচ্ছায় যাচিয়া জীবন দিতে না দেখিলে, বুঝি এ মরণ-ভীরু জাতি মরিতে শিখিবে না।"—(আত্মকাহিনী —পৃঃ ৫০-৫১)

সুতরাং এই মরণভীরু জাতিকে দেশের জন্য মরিতে শিখানই বারীন্দ্রের "মিশন"। সরলাদেবী ও মিঃ পি. মিত্রের লাঠিখেলোয়াড়ের দল মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। যুগান্তরের দল তাঁহাদের অপেক্ষা অগ্রগামী।

অরবিন্দের অপরাধ অস্বীকার ও বারীন্দ্রের অপরাধ স্বীকার—এ দু'য়ের তুলনামূলক সমালোচনা ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকের উপর ছাড়িয়া দিয়া—নরেন গোঁসাইয়ের অপরাধ স্বীকার আর বারীন্দ্রের অপরাধ স্বীকারের মধ্যে দেখা

যায় যে, বারীন্দ্র মরণভীরু জাতিকে মরিতে শিখাইবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে গিয়াছিলেন, আর নরেন গোঁসাই সব শুদ্ধ দলটীকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পার্থক্য আছে।

মিঃ বালির কোর্টে অরবিন্দ প্রভৃতির বিচার আরম্ভ (১৯শে মে—১১ই সেপ্টেম্বর): আলিপুর বোমার মামলায় প্রধানতঃ তিনটি বিশেষ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে—

১ম, অরবিন্দ বিলকুল তাঁহার অপরাধ অস্বীকার করিয়াছেন এবং যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়ায় বেকসুর খালাস পাইয়াছেন।

২য়, বারীন্দ্র প্রভৃতি অরবিন্দকে বাদ দিয়া, নিজেদের দায়িত্বে সকল অপরাধ সরলভাবে স্বীকার করিয়া আইনের সর্ব্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি দ্বীপান্তর গ্রহণ করিয়াছেন।

৩য়, নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী (approver) হইয়া অরবিন্দকে জড়াইয়া সকল অপরাধ স্বীকার করায় জেলের ভিতরেই সত্যেন ও কানাই, এই উভয়ের দ্বারা পিস্তলের গুলিতে খুন হইয়াছেন।

বারীন্দ্র প্রভৃতি অরবিন্দকে বাঁচাইতে গিয়া তাঁহাকে বাদ দিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন; আর নরেন গোঁসাই অরবিন্দকে ধরাইয়া দিতে গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন—তফাৎ এইখানে।

মিঃ বালির কোর্টে বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পুলিশের তদন্তে আসামী-দের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি বাহির করিবার চেষ্টার কিছুটা বিবরণ দিতেছি:

'ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রামসদয় বাবু আমাদিগকে দিদিশাশুড়ীর মত আদরযত্ন করিয়া তুলিয়া লইলেন। তাঁহার হাতে বাঁধা একটা প্রকাণ্ড ঢোলকের মত মাদুলি বাহির করিয়া বলিলেন যে, তিনি খ্যাতনামা সাধক কমলাকান্তের বংশধর; আর ঐ মাদুলির মধ্যে কমলাকান্তের সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন পদধূলি বিদ্যমান। আমাদের মাথায় সেই মাদুলিটি ঠেকাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কখনও হাসিয়া কখনও বা কাঁদিয়া কমলাকান্তের বংশধরটি আমাদের বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার মত সুহৃদ আমাদের আর ত্রিভুবনে নাই। তিনি নিজে আমাদের কাজকর্ম্মের সহিত গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন। তবে কি করেন, পেটের দায়—ইত্যাদি।......একখণ্ড হাতে-লেখা কাগজ লইয়া ঘরে

ঢুকিলেন, মহা উৎসাহে বলিলেন : এই দেখ, বাবা হেমচন্দ্রের statement ; সে সব কথাই স্বীকার করেছে। বলা বাহুল্য কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা।"—(নিঃ আঃ—উপেন্দ্র, পৃঃ ৩৬-৩৭)।

তারপর বারীন্দ্র লিখিয়াছেন—"রামসদয় বাবু হঠাৎ ব্যস্তসমস্তভাবে বাহির হইলেন ; যেন আমার এরূপ অপেক্ষা করার ব্যাপার কিছুই জানেন না, এমন ভাব দেখাইয়া বলিলেন : এই যে, তাইতো, তোমায় এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছে! এসো বাবা, এসো। তোমরা দেশের রত্ন, কি কাজটাই করেছ। এর পরেও শালারা আর আমাদের কাপুরুষ ভাববে, অপমান করবে! এসো বাবা, এসো, বসো।...... যে আসে তাহাকেই ডাকিয়া বলা—এই বারীন্দ্র, দেখে যাও! I say, Jones, here is Barindra।"—(আঃ—বারীন্দ্র—পৃঃ ৫১)

বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, উল্লাস ইহারা সকলেই পুলিশের নিকট অপরাধ স্বীকার করিলেন। উপেন্দ্র লিখিয়াছেন—

"আইন-কানুন সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা যেরূপ প্রচণ্ড তাহাতে আমাদিগকে বধ করিতে পুলিশের বড় অধিক বেগ পাইতে হইল না।

বারীন্দ্র লিখিয়াছেন—

"এই প্রকারে আত্মকীর্ত্তি রাখিতে গিয়া, খুন চাপিয়া যাওয়ায় সে সময়ে নরেন গোঁসাইয়ের নাম বলা হইয়াছিল। তাহার শ্রাদ্ধ যে কতদূর গড়াইবে, তাহা তখন কেবল অন্তর্যামীই জানিতেন, আমরা বুঝি নাই।"—(পৃঃ ৫৫)

খুব সত্যি কথা। বারীন্দ্র যদি নরেন গোঁসাইকে ধরাইয়া না দিতেন, তবে গোঁসাই রাজসাক্ষী হইয়া অরবিন্দকে জড়াইতেন না। অরবিন্দকে জড়াইবার ফলেই না সত্যেন ও কানাই, গোঁসাইকে জেলের মধ্যে নৃশংসভাবে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করিল। ফলে কানাই ও সত্যেনের ফাঁসি হইল। শ্রাদ্ধ এতদূর গড়াইবার জন্য বারীন্দ্রই দায়ী। তবে তাহা তিনি আগে বুঝিতে পারেন নাই—ইহাও খুব সত্যি কথা।

এইবার হেমচন্দ্রের পালা। তিনি প্যারিস হইতে গুপ্তসমিতির গুপ্তবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া মাত্র কিছুদিন আগে দেশে ফিরিয়াছেন—অভিজ্ঞতায় তাঁহার সমকক্ষ কেহই নহে। বারীন্দ্র তাঁহার কাছ ঘেঁষিয়াও দাঁড়াইতে পারেন না। বারীন্দ্র লিখিয়াছেন—

"হেমচন্দ্র আসিল এবং কোন কথাই স্বীকার করিতে রাজী হইল না।......

সে বরঞ্চ আমাদেরই এই বেকুবি করিতে মানা করিল। পুলিশ বেগতিক দেখিয়া তাহাকে সরাইয়া লইল।"—(পৃ: ৫৪)

হেমচন্দ্র লিখিতেছেন—

"আমার একমাত্র ভাবনার বিষয় হয়েছিল কি করে বারীন্দ্রকে দেশের এ হেন উৎকট মঙ্গল করবার ব্যাধি হতে (অর্থাৎ স্বীকারোক্তি করা হতে) মুক্ত করা যেতে পারে। যে এক টোটকা ব্যবস্থা করেছিলাম তা একেবারে ব্যর্থ হয়েছিল।

"কিন্তু তার (সেজদার) নাম করে কিছু বললে তা রাখলেও রাখতে পারে, এই আশায় তার বক্তৃতার শেষে বলেছিলাম—অরবিন্দ বাবুর সহিত আমাদের পাঁচ জনের দেখা হয়েছিল। তিনি আমাদের বিশেষ করে বলে দিয়েছেন যে—যারা confession দিয়েছে তাদের বিশেষতঃ বারীনের সঙ্গে দেখা হলে যেন বলে দি, তারা যা-কিছু স্বীকারোক্তি দিয়েছে তা যেন প্রত্যাহার (retract) করে। কারণ, উকীলের সঙ্গে পরামর্শ না করে আসামীর পক্ষে স্বীকারোক্তি দেওয়া কখনও উচিত নয়।......Retract করলে স্বীকারোক্তির দোষ খণ্ডে যায়। এতেও যখন বারীন ভিজল না, তখন বলেছিলাম—বিবেচনা করে দেখা উচিত, তার এ রকম স্বীকারোক্তি দেশদ্রোহিতা বলে বিবেচিত হতে পারে কি-না।

"এই না শুনে বারীন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে যা বলেছিল, তার মর্ম্ম হচ্ছে—সে এই স্বীকারোক্তি দিয়ে যা করছে তা বোঝবার ক্ষমতা সেজদা (অরবিন্দ) বা কোন উকীলের নাই। আমরা সব ভীরু কাপুরুষ। 'অরবিন্দ এসব কি বোঝে ?' (বারীনের মুখের কথা)। এই রকম অনেক কিছু শোনবার পর বারীন অন্যের নাম প্রকাশ করলে কেন, তা জিজ্ঞেস করায় বলেছিল—সে মিথ্যে কথা বলতে আমাদের মত অভ্যস্ত নয়। অত্যধিক উত্তেজনার বশে আরও অনেক কিছু বলেছিল।"—(বাং-বিঃ-প্রঃ—পৃ: ২৮৭-২৮৮)

হেমচন্দ্র এখানে বারীন্দ্রের চরিত্রচিত্র নিখুঁতভাবেই অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহার উপর আর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

অরবিন্দ লিখিয়াছেন—

"হেমচন্দ্র দাসকে চিনিতাম। একবার মেদিনীপুরে তাঁহার বাড়ীতে উঠি। ......হেমচন্দ্রের নিজের ধারণা ছিল যে, পুলিশ অশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে দোষ স্বীকার করাইতে পারে নাই বলিয়া তাঁহার উপর এই ক্রোধেই তাঁহাকে

একটি অতি ক্ষুদ্র ঘরে আবদ্ধ করিয়া বাহিরের দরজা পর্যন্ত বন্ধ করিয়া রাখা হইত।"—(কারাকাহিনী—পৃ: ১৫-৩২)

অরবিন্দ তাঁহার অপরাধ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন। তিনি হ্যালিডে সাহেবকে স্পষ্টই বলিলেন—

"আমি এই হত্যাকাণ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি। "হ্যালিডে আর কোন কথা বলিলেন না।"—(কারাকাহিনী—পৃ: ১১)

অরবিন্দ ও হেমচন্দ্র এক পর্য্যায়ভুক্ত।

বারীন্দ্রের অপরাধ স্বীকারের কৈফিয়ৎ : ১ম, উপেন্দ্র লিখিয়াছেন—"বারীন্দ্র বলিল : আমাদের দফা ত এইখানেই রফা হইল, এখন আমরা যে কি করিতেছিলাম তাহা দেশের লোককে বলিয়া যাওয়া দরকার।"—(নিঃ আঃ—পৃঃ ৩৭)

বারীন্দ্র নিজে লিখিয়াছেন—

"এই প্রকারে আত্মকীর্ত্তি রাখিতে গিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছি। ইহার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বাহাদুরীর বেশ গাঢ় প্রলেপ আছে।"—(আঃ—পৃ: ৫৪-৫৫)

২য়, বারীন্দ্র লিখিয়াছেন—

"আমাদিগকে প্রকাশ্য রাজদ্বারে ঘাতকহস্তে স্বেচ্ছায় যাচিয়া জীবন দিতে না দেখিলে, বুঝি এ মরণভীরু জাতি মরিতে শিখিবে না!"—(আঃ—পৃ:৫০-৫১)

৩য়, বারীন্দ্র লিখিয়াছেন—

"খুন চাপিয়া যাওয়ায় সে-সময়ে নরেন গোঁসাইয়ের নাম বলা হইয়াছিল।"—(আঃ—পৃঃ ৫৫)

এটি ভাল কথা নয়—সুস্থ অবস্থার কথা নয়। গুপ্তসমিতির পদ্ধতিসম্মত কথাও নয়।

৪র্থ, উপেন্দ্র লিখিয়াছেন—"ধরা পড়িবার পর বারীন্দ্র বলিয়াছিল : My mission is over—আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু সে কথার প্রতিধ্বনি ত নিজের মধ্যে একটুও খুঁজিয়া পাইলাম না। দেশের কাজ ত সবই বাকি।"

সুতরাং উপেন্দ্র, বারীন্দ্রের কথায় এক্ষেত্রে সায় দিল না। সমর্থন করিল না।

বারীন্দ্র লিখিয়াছেন—"১৯শে মে হইতে বার্লি সাহেব ১২ই সেপ্টেম্বর অবধি তদন্ত চালাইয়া ৩৮জনকে সেসন্স সোপর্দ্দ করেন।"

মিঃ বার্লির কোর্টে বিচার আরম্ভ হইবার ৩।৪ দিন পরেই নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হয়।

নরেন গোঁসাই সম্বন্ধে অরবিন্দের অভিমত ঃ অরবিন্দ লিখিয়াছেন—"গোঁসাই অতিশয় সুপুরুষ—লম্বা, ফরসা, বলিষ্ঠ, পুষ্টকায় ; কিন্তু তাহার চোখের ভাব কুবৃত্তি-প্রকাশক ছিল, কথায়ও বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ পাই নাই। এ বিষয়ে অন্য যুবকদের সঙ্গে তাহার বিশেষ প্রভেদ ছিল ; তাঁহাদের মুখে প্রায়ই উচ্চ ও পবিত্র ভাব অধিক এবং কথায় প্রখর বুদ্ধি, জ্ঞানলিপ্সা ও মহৎ স্বার্থহীন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইত। গোঁসাইয়ের কথা নির্ব্বোধ লঘুচেতা লোকের কথার ন্যায় হইলেও তেজ ও সাহসপূর্ণ ছিল।......এইরূপ লোকই approver হয়।" —(কারাকাহিনী—পৃঃ ৩৩-৩৪)

বারীন্দ্রের জেল হইতে পলায়নের কল্পনা ঃ "বার্লি সাহেবের কোর্টে মকদ্দমা থাকিতে থাকিতেই আমার খেয়াল ঢোকে যে, জেল ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে হইবে। মাথায় আমার খেয়াল ঢুকিবামাত্রই পত্রপাঠ জোগাড়যন্ত্রে লাগিয়া গেলাম। কোর্টে যাইতাম আসিতাম ও সেখানে কয়েক-জন বন্ধুর সহিত যোগাযোগে বন্দোবস্ত করিতাম। টাকার ব্যবস্থা হইল, অস্ত্র সংগ্রহ চলিতে লাগিল বাহিরে বাহিরে ; স্থির হইল ১০।১২টি রিভলবার বাহিরে সংগ্রহ করিয়া জেলের মধ্যে একে একে আনানো হইবে, তাহার পর কোন জেলের লোককে কোন রকমে উৎকোচে বা কৌশলে বশীভূত করিয়া রাত্রে ব্যারাকের চোরা-চাবির সাহায্যে বা রেলিং কাটিয়া আমরা বাহির হইব। আত্মীয়-স্বজনের সহিত অনেক বন্ধুবান্ধব দেখা করিতে আসিত। সে দেখার অছিলায় একে একে পিস্তল জেলের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহার আগেই ২টা পিস্তল আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই সময় ছেলেদের মধ্যে অনেকে জল্পনা-কল্পনা করিতেছিল যে, কি করিয়া নরেন্দ্রনাথ গোঁসাইকে ইহধাম হইতে সরান যায়। আমি জানিতাম না যে, ছেলেদের একদল আমাকে লুকাইয়া আমারই আনা পিস্তল দিয়া নরেনকে জেলের মধ্যেই প্রাণে মারিবার ফন্দি আঁটিয়াছে। কাঁচা লীডারের যাহা সচরাচর হইয়া থাকে, আমার ধাতটা তদনুরূপই ছিল, বিলক্ষণ কিছু স্বেচ্ছাচারী ও autocratic গোছের। সবাইকে লইয়া কাজ করিতাম বটে, কিন্তু আপন গোঁয়েই করিতাম। জেলে আসিয়া ছেলেদের কাহারও কাহারও মধ্যে আমার প্রতি একটা বেশ রাগ ও অভিমানের ভাব যে দেখা দিয়াছে,

তাহা বুঝিয়াছিলাম ; এটা ভাবিয়াও উঠিতে পারি নাই যে, আমাকে বাদ দিয়া অন্ততঃ আমাকে না জানাইয়া তাহারা একটা কিছু করিবে।''—(আঃ—পৃঃ ৮৫-৮৭)

মিঃ বার্লির কোর্টে বিচার ১৯শে মে হইতে আরম্ভ হইয়া ১৫ই আগষ্ট অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে।

অথচ মিঃ বার্লির কোর্টেই মোকদ্দমা থাকাকালীন ১লা সেপ্টেম্বর জেলের ভিতর সত্যেন ও কানাই নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে।

নরেন গোঁসাইকে হত্যা (১লা সেপ্টেম্বর) : হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার সকালে নরেন অন্য দিনের মত তার শরীররক্ষক দু'জন য়ুরেশিয়ান কয়েদী-ওয়ার্ডার সঙ্গে করে হাসপাতালের দোতালার উপর সিঁড়ির পাশে ডিস্‌পেন্‌সারীতে গিয়ে সত্যেনের সামনে বসেছিল। রিভলবারটা সহজে কেউ কেড়ে নিতে না পারে, সেজন্য নাকি সত্যেনের কোমরে দড়ি দিয়ে সেটা বাঁধা ছিল। সত্যেন জামার ভিতর থেকেই নাকি নরেনকে তাক করে মারে। খট্ করে শব্দ হ'ল, কিন্তু কার্তস আগুন দিলে না। সত্যেন পরমুহূর্তে জামার ভেতর থেকে রিভলবার বের করে আবার নরেনকে তাক করে। তখন হিগেন বোথাম নামক পূর্ব্বোক্ত একজন য়ুরেশিয়ান কয়েদী-ওয়ার্ডার রিভলবারটা ধরে টানাটানি করাতে আওয়াজ হয়ে তার হাতের কব্জি ভেঙ্গে যায়, কাজেই রিভলবার ছেড়ে দেয়। ইত্যবসরে গোঁসাই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেই কানাই গুলি চালায়। কানাই দাঁত মাজার ভান করে ডিসপেন্সারীতে সিঁড়ির সামনে পায়চারী করছিল। যাই হোক্ গুলি সামান্যভাবে পায়ের কোন স্থানে লেগেছিল। তাই সিঁড়ি নেবে হাসপাতালের ফটক পার হয়ে—দুপাশে দেয়াল, এমন একটা লম্বা সরু গলির ভেতর গিয়ে পড়েছিল। কানাইও পেছনে তাড়া করেছিল। সত্যেন ডিসপেন্সারী থেকে বেরিয়ে সামনে একজন কয়েদীকে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করছিল, নরেন কোথায় গেল। আঙ্গুল দিয়ে ইসারায় সে দেখিয়ে দিলে। সত্যেন ছুটে গিয়ে কানাইর সঙ্গে যোগ দেয়। দুজনেই গুলি চালাতে থাকে। সত্যেনের একটা গুলিতে কানাইর গায়ের চামড়া ছোলা হয়ে গেছল। এ থেকে বোঝা যায়, সত্যেন যখন সেখানে যায় তখনও নরেন জমি ধরে নি।

"নরেন নাকি দু'একবার পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে খুব বলিষ্ঠ জোয়ান ছিল।

"তারপর যথারীতি পাগলাঘন্টি, ভোম্বা, কর্ম্মচারীদের লুটোপুটি, দৌড়াদৌড়ি, সত্যেন ও কানাইকে গ্রেপ্তার, সব ওয়ার্ডে তালা-বন্ধ, খানাতল্লাসী ইত্যাদি যথারীতি সবই হয়েছিল।"—(বাঃ বিঃ প্রঃ—পৃঃ ৩২৪-৩২৫)

বারীন্দ্র লিখিয়াছেন—

"এদিকে সত্যেন পকেটে হাত রাখিয়া কথা কহিতে কহিতে পকেটেই পিস্তল সই করিয়া নরেনকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল। গুলি নরেনের উরুতে লাগিয়া মাংস ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। য়ুরেশিয়ান কয়েদী সত্যেনকে ধরিতে গিয়া পিস্তলের বাঁটের ঘায়ে আঙুল ভাঙ্গিয়া পিছাইয়া পড়িল। নরেন্দ্র ছিল কুস্তিগীর, বেশ সাজোয়ান পুরুষ, গুলি খাইয়া সে হাসপাতাল ছাড়িয়া বাহির হইয়া দৌড় দিল। খোলসা পথ পাইয়া কানাই তাড়া করিতে করিতে নরেনের পিঠ লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল, গুলি শির-দাঁড়া ভেদ করিয়া বুকে বসিয়া গেল। ফলে নরেন তথনই মরিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।" —(আঃ—পৃঃ ৯৪-৯৫)

উপেন্দ্র লিখিয়াছেন—

"একটা পুরাণো চোর ছুটিয়া আসিয়া আমাদের সংবাদ দিল—

: নরেন গোঁসাই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

: ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কিরে ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, কানাই বাবু তাকে পিস্তল দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। ঐ দেখুন গে না—কারখানার সুমুখে সে একদম্ লম্বা হয়ে পড়েছে। আর জেলারবাবুরও আর একটু হলে হয়ে যেত। তিনি কারখানায় ঢুকে পড়ে বেঞ্চির তলায় লুকিয়ে খুব প্রাণটা বাঁচিয়েছেন।"—(নিঃ আঃ—পৃঃ ৫৮)

জেলের ভিতরে নরেন গোঁসাইর হত্যাকাণ্ড বাংলার সন্ত্রাসবাদকে এক চরম পরিণতির মধ্যে আনিয়া ফেলিল। এরূপ কাণ্ড বাঙ্গালী ইতঃপূর্ব্বে কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই। সমগ্র ভারতবর্ষে হৈ হৈ, রৈ রৈ পড়িয়া গেল।

মিঃ বার্লির কোর্ট হইতে মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌টের কোর্ট : ১লা সেপ্টেম্বর সত্যেন বসু ও কানাই দত্ত জেলের ভিতর নরেন গোঁসাইর হত্যাকাণ্ড সমাধা করায় ১০ দিন পর, ১১ই সেপ্টেম্বর মিঃ বার্লি অরবিন্দ প্রমুখ ৩৮

জন আসামীকে মিঃ বীচক্রফ্‌টের কোর্টে দায়রায় সোপর্দ্দ করেন। মিঃ বার্লির কোর্টে ৪ মাস বিচার চলিয়াছিল।

১১ই সেপ্টেম্বর মকদ্দমা সেসন্স কোর্টে সোপর্দ্দ হইলেও ১৯শে অক্টোবর দায়রার বিচার আরম্ভ হয়। সেসন্স কোর্টে মিঃ বীচক্রফ্‌টের সঙ্গে দুইজন জুরি বা এসেসার ছিলেন—একজন গুরুদাস বসু, আর একজন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। মিঃ বীচক্রফ্‌ট কেম্ব্রিজে অরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন এবং অরবিন্দ মিঃ বীচক্রফ্‌ট্ অপেক্ষা ক্লাসিকে বেশী নম্বর পাইয়া পাশ করিয়াছিলেন। ইহা ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ১৬ বৎসর আগেকার ঘটনা।

১৯০৯।৬ই মে মিঃ বীচক্রফ্‌টের রায় বাহির হয়; অরবিন্দ বেকসুর খালাস পান। অপর সব আসামীর ফাঁসী, দ্বীপান্তর প্রভৃতি শাস্তি হয়। মিঃ বীচ-ক্রফটের কোর্টে ১৯শে অক্টোবর।১৯০৮ হইতে ৬ই মে।১৯০৯ প্রায় ৬ মাস ৩ সপ্তাহ বিচার চলিয়াছিল।

মিঃ সি. আর. দাশ এই ৬ মাস কাল মিঃ বীচক্রফ্‌টের কোর্টে একাদিক্রমে অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

মিঃ বার্লির কোর্টে চারিটি ঘটনা প্রধানতঃ আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। প্রথম—মিঃ বার্লি কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত অনুমতি ব্যতীত বিচার আরম্ভ করেন, সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। সেসন্স আদালতে মিঃ সি. আর. দাশ এই বে-আইনী কাণ্ডের জন্য ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করেন। মিঃ সি. আর. দাশ বলেন—"It is perfectly clear that before the 18th May there was no sanction put up before him (Mr Birley) on any authority and it is perfectly clear that even when he got sanction he did not examine the complainant as he was bound to do under the law." দ্বিতীয়—নরেন গোঁসাই মিঃ বার্লির কোর্টে এপ্রুভার (approver) হইয়া যে সাক্ষ্য দিয়াছিল, ঐ সাক্ষ্য দেওয়ার পর মিঃ বার্লি নরেনকে জেরা করিতে দেন নাই। এবং তাহার পরে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করা হয়। জেরা না হওয়ার দরুন, সেসন্স আদালতে নরেন গোঁসাই-এর সাক্ষ্য প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। এবং তাতেই অরবিন্দের জীবন রক্ষা পায়। এ বিষয়ে হেমচন্দ্র লিখিতেছেন—

"ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের (মিঃ বার্লির) কোর্টে কিন্তু অতিরিক্ত জেরা

হচ্ছে ব'লে নরেনকে এজাহারের পর জেরা করতে হাকিম দেন নি। তাতে আমাদের পক্ষের উকীল অনেক সাধ্য-সাধনায় এই মর্ম্মে একখানি দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন যে—যেহেতু সাক্ষীকে জেরা করতে দেওয়া হল না, সেই হেতু তার উক্তি তাবৎ প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না, যাবৎ সে আবার না যথারীতি সেসন্স আদালতে সাক্ষ্য দেয় ও জেরা হয়। এই মঞ্জুরীটি না নিলে গোঁসাইকে মারা প্রায় বৃথা হ'ত, আর অরবিন্দ বাবুর মুক্তিও নাকি অসম্ভব হত। তখন বার্লি সাহেবের কোর্টে কোন উকীলই এর আবশ্যক বা তাৎপর্য্য বুঝতে পারেন নি, তাই রাজী হ'ন নি। এ ফন্দিও সত্যেনের উদ্ভাবিত ও তারই চেষ্টায় হয়েছিল।"—(বাংলায় বিপ্লবপ্রচেষ্টা—পৃঃ ৩২৭)

আইন-ব্যবসায়ী না হইলেও, সত্যেনের বুদ্ধিকে প্রশংসা করিতে হয়—যে বুদ্ধির জোরে নরেন গোঁসাই-এর সাক্ষ্য নাকচ হইয়া গিয়াছে এবং আমরা যাহার জীবনচরিত লিখিতেছি সেই অরবিন্দের জীবন রক্ষা পাইয়াছে। তৃতীয়—জেলের ভিতর নরেন গোঁসাই-এর হত্যা এক আশ্চর্য্য কাণ্ড। সন্ত্রাসবাদীর দল এরূপ দুঃসাহসের পরিচয় ইতিপূর্বে আর কখনও দেয় নাই। ইহা সমস্ত ভারতবর্ষকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। চতুর্থ—অথচ এত বড় একটা ঘটনা বারীন্দ্রকে না জানিতে দিয়া করা হইল, ইহাতে বারীন্দ্রের নেতৃত্বে খুব বড় আঘাত লাগিল। এই ঘটনার পর ছেলের দল বারীনের নেতৃত্বকে আদৌ অমল দিত না। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"সত্যেনের সঙ্গে বারীনের ঝগড়া আরম্ভ হয় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে গুপ্তসমিতির গোড়াতে, সারকিউলার রোডের প্রথম আড্ডা থেকে। তারপর তাকে (বারীনকে) কিছুমাত্র জানতে না দিয়ে, এত বড় একটা কাণ্ড (নরেন গোঁসাইকে হত্যা) সত্যেন করল, এতে বারীনের নেতৃত্বের অভিমানে এমনই আঘাত লেগেছিল যে, নরেনের হত্যার পর সেই দিনই আমাদের ২৩নং ওয়ার্ডে দস্তুর মাফিক এক মিটিং-এ ব'সে সত্যেনের ওপর দোষারোপের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়ে সত্ত গায়ের জ্বালা কতকটা জুড়িয়েছিল।"—(পৃঃ ৩২৫-২৬)

বারীন্দ্রের এতদিনকার নেতৃত্ব একটা মিথ্যা ধাপ্পাবাজীর মত হাওয়ায় উড়িয়া গেল। বারীন্দ্র জেল ভাঙ্গিয়া পলায়নের একটা উদ্ভট কল্পনা করিয়াছিল, যদিও তাহা সফল হইবার আশা খুবই কম ছিল। তথাপি যদি বারীন জেল ভাঙ্গিয়া পালাইয়া যাইত, এবং নরেন গোঁসাই-এর হত্যা না হইত ও তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ

বলিয়া গ্রাহ্য হইত, তবে ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে অরবিন্দ বাঁচিতেন কিরূপে? যে ঘটনায় অরবিন্দের জীবন রক্ষা পাইল, সেই ঘটনার উপর দোষারোপ করিয়া বারীন্দ্র সত্যেনের উপর যে বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একদিকে যেমন বুদ্ধিহীনতার, অন্যদিকে তেমনি এক অতি নিকৃষ্ট মনোভাবের পরিচায়ক।

বাংলা ও মারাঠাঃ মজঃফরপুরে বোমা ফাটিবার পর অরবিন্দ ও যুগান্তরের দল গ্রেপ্তার হইলেন। এই ঘটনায় তিলকের "কেশরী" কাগজে এই মর্ম্মে কতকগুলি প্রবন্ধ বাহির হইল যে—রাজ-অত্যাচারই গুপ্তসমিতির উদ্ভবের কারণ। মিঃ তিলক এই প্রবন্ধগুলি অবশ্য নিজে লেখেন নাই। তথাপি সম্পাদক হিসাবে তিনি ইহার দায়িত্ব স্বীকার করিলেন। ফলে ২৪শে জুন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। বিচারে তিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ড হইল। তিলক বলিলেন—"আমি যে কার্য্য সমর্থন করি, তাহা আমি স্বাধীন থাকা অপেক্ষা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলে আরও দ্রুত অগ্রসর হইবে।"

গুজব শোনা যায়, মিঃ গোখলে তিলকের এই মকদ্দমায় গভর্ণমেণ্টকে কুপরামর্শই দিয়াছিলেন। কথাটা সত্য হইলে, অরবিন্দ যে গোখ্‌লেকে "বিভীষণ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, তাহার একটা প্রমাণ হাতেহাতেই পাওয়া গেল।

বাংলার প্রতিধ্বনি মারাঠায় শোনা গেল। মারাঠার সহিত বাংলার এই সময়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট হত্যার পর (১৮৯৭।২২শে জুন) তিলকের দেড় বৎসর কারাদণ্ড হয়। ইহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। তিলক সর্বদাই তাঁহার কৃতকার্য্যের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করেন, অরবিন্দ তাহা করেন না—ইহাও আমরা "বন্দেমাতরম্" মকদ্দমায় দেখিয়া আসিয়াছি এবং আলিপুর বোমার মামলায় প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মারাঠা হইতেই অরবিন্দ গুপ্তসমিতিকে বংলায় আনিবার চেষ্টা করেন। গুপ্তসমিতি মারাঠা হইতেই বাংলায় আসিয়াছে, ইহাও সত্য। র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের গুপ্তহত্যাই যে প্রথম রাজনৈতিক গুপ্ত হত্যা, ইহাও সত্য। কিন্তু মারাঠা অপেক্ষা বাংলার উর্ব্বর ভূমিতে অরবিন্দ-রোপিত গুপ্তসমিতিরূপ বিষবৃক্ষ যেরূপ শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হইয়া বিস্তার লাভ করিল, তাহা গুপ্তসমিতির জন্মভূমি মারাঠাতেও করে নাই। ইহার কারণ, বাংলায় ভাবপ্রবণতা অত্যন্ত বেশী; এবং হাত না পাকাইয়া, কাঁচা হাতে কাজ করিয়া পুনঃপুনঃ ব্যর্থ হওয়ার দৃষ্টান্তও এখানেই খুব বেশী।

আলিপুর বোমার মামলায় বাংলার সকল সন্ত্রাসবাদীই যে জেলে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। এবং যুগান্তরের দলই যে একমাত্র সন্ত্রাসবাদী দল, তাহাও মনে হয় না। কেননা, ৭ই নভেম্বর কলিকাতা ওভারটুন হলে ছোটলাট ফ্রেজারকে আবার গুলি করিয়া মারিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ইহার দুই দিন পর, ৯ই নভেম্বর, সন্ধ্যাকালে কলিকাতার প্রকাশ্য রাজপথে পুলিশকর্ম্মচারী নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে সন্ত্রাসবাদীরা গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে। কারণ, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপকারী প্রফুল্ল চাকীকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ধরিতে পারেন নাই। কেননা, প্রফুল্ল আত্মহত্যা করিয়াছিল।

অরবিন্দ যখন আলিপুর বোমার মামলায় জেলে আবদ্ধ, তখন জেলের ভিতরেই সন্ত্রাসবাদীরা নরেন গোঁসাইকে হত্যা করিল এবং জেলের বাহিরে ছোটলাট ফ্রেজারকে হত্যা করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া পুলিশ-কর্ম্মচারী নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে সত্যই হত্যা করিল। দেখা যাইতেছে, জেলের ভিতরে ও বাহিরে বাংলার সন্ত্রাসবাদ যেন দামামা বাজাইয়া চলিয়াছে। এবং মারাঠায় ইহার প্রতিক্রিয়ার ফলে মিঃ তিলক ছয় বৎসরের জন্য মান্দালয় দুর্গে কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশ একেবারে নীরব। কাহারও মুখে টুঁ শব্দটি নাই।

অরবিন্দ মে মাসে গ্রেপ্তার হইবার পর, বিপিন পাল আবার "বন্দেমাতরম্" পত্রিকা ছয় মাস চালাইয়াছিলেন। পরে তিনি দেশের অবস্থা দেখিয়া বীতশ্রদ্ধ হইয়া বিলাত গমন করেন। কেননা, তিনি বরাবর গুপ্তসমিতির বিরোধী ছিলেন।

কানাইর (১০ই নভেম্বর) ও সত্যেনের (২৩শে নভেম্বর) ফাঁসি ঃ কানাই ও সত্যেন প্রভৃতির কথা মনে করিয়াই কবি নজরুল ইসলাম লিখিয়া গিয়াছেন যে—

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।"

এই সব ক্ষেত্রেই জীবন মৃত্যুকে পরাজিত করিয়া চলে। বারীন্দ্র লিখিয়াছেন—

"কানাইকে বিচার করিয়া সেসন্স সোপর্দ্দ করার পর ওজনে সে অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল। মরিবার দিন প্রাতে চারটার সময় তাহাকে বধমঞ্চে লইতে

আসিলে সকলে দেখিল, সে অকাতরে ঘুমাইতেছে। একটি ঘুম হইতে তার জাগরণ আর একটি দীর্ঘতর নিবিড়তর ঘুমের জন্য। তার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় উঠানে বেড়াইতে বাহির হইয়া সে আমার ও অনেকের কুঠরির সামনে দাঁড়াইয়া স্মিতহাস্যে বিদায়-নমস্কার করিয়াছিল। সেদিন প্রহরী বাধা দেয় নাই, পরন্তু আমাদের উঠানের দরজা মুক্ত রাখিয়াছিল। সে সহাস্য পসন্ন জ্যোতির্ময় রূপ আমি কখনও ভুলিব না। কানাই তখন মহাতাপস, প্রকৃত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। পথ ভুল হউক আর সত্য হউক, তাহার সে মরণের মহত্ত্ব যাইবার নয় .....যে-কোন দেশে কানাইয়ের তুলনা নাই। কারণ এ বীরপূজার জাতি নাই, গোত্র নাই, দেশ নাই; যেখানে মানুষ প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইয়া আর্ত্তত্রাণব্রত ধরে, সেইখানে তখনি সে নমস্য।"—(আত্মকাহিনী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ; পৃঃ ৯৭)

উপেন্দ্র বলিয়াছেন—

"জীবনে অনেক সাধুসন্ন্যাসী দেখিয়াছি; কানাই-এর মত অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটা দেখি নাই। সে মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিপদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই—প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনিই ফুটিয়া রহিয়াছে।......প্রহরীর নিকট শুনিলাম ফাঁসির আদেশ শুনিবার পর তাহার ওজন ১৬ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে! ঘুরিয়া ফিরিয়া শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তবৃত্তি নিরোধের এমন পথও আছে, যাহা পাতঞ্জলের বাবাও বাহির করিয়া যান নাই।"

"তাহার পর একদিন কানাইলালের ফাঁসি হইয়া গেল। ইংরাজ-শাসিত ভারতে তাহার স্থান হইল না। না হইবারই কথা! কিন্তু ফাঁসির সময় তাহার নির্ভীক প্রশান্ত ও হাস্যময় মুখশ্রী দেখিয়া জেলের কর্তৃপক্ষেরা বেশ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলেন। তাহার গলায় ফাঁসির দড়ি ঠিকমত দেওয়া হয় নাই। এ জন্য প্রহরীকে ডাকিয়া ঠিক করিয়া দিতে বলিলেন। একজন ইউরোপীয় প্রহরী চুপি চুপি আসিয়া বারীনকে জিজ্ঞাসা করিল—'তোমাদের হাতে এ রকম ছেলে আর কতগুলি আছে? যে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ কালীঘাটের শ্মশানে কানাইলালের চিতার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারাই প্রমাণ করিয়া দিল যে, কানাইলাল মরিয়াও মরে নাই।"
—(নির্ব্বাসিতের আত্মকথা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ৬৪)

প্রায় পাঁচ শত মহিলা শ্মশানে উপস্থিত হন ও কানাই-এর উদ্দেশ্যে বলেন—"যদি স্বর্গ থাকে, তবে তোমার অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়াছে।"

সত্যেনের ফাঁসি সম্পর্কে হেমচন্দ্রের এক বন্ধু—এ. সি. রায়—হেমচন্দ্রকে নিম্নরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—

"ফাঁসির দিন অতি প্রত্যুষে আমরা আলিপুর জেলের ফটকে উপস্থিত হইলাম। আমরা ঐ নির্দ্দয় ব্যাপার দেখিতে প্রস্তুত ছিলাম না। উহা সমাপ্ত হইলে একজন চর্ম্মবর্ম্ম-পরিহিত শ্বেত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন—You can go now. The thing is over. Satyendra died bravely. Kanai was brave, but it seems Satyendra was braver. তদ্দণ্ডেই একজন সার্জ্জেণ্ট বলিতে লাগিল—When I went to his cell to get him to the gallows, he was wide awake. When I said Satyendra, be ready, he answered: Well I am quite ready, and smiled. He walked steadily to the gallows. He mounted it bravely and bore it cheerfully. A brave lad!"

"তখনকার বালকবালিকারা নানাস্থানে কানাই ও সত্যেন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিয়াছিল। এই সংবাদ আমি কারাগারে সত্যেন্দ্রকে দিয়াছিলাম। শুনিয়া তাহার মুখ খুব উৎফুল্ল হইয়াছিল।"

সত্যেনের বিরুদ্ধ-দল—বারীন্দ্র প্রভৃতি—রটাইয়াছিল যে, সত্যেনকে মূর্চ্ছিত বা এমন কি মৃত অবস্থায় ফাঁসি দেওয়া হয়। ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। দলাদলি এমন বিষ উদ্গীরণ করে যে, তাহা স্বয়ং শিবও হজম করিতে পারেন কি-না সন্দেহ!

উপেন্দ্র, সত্যেন সম্পর্কে কিছুই লেখেন নাই। তিনি সর্ব্বদাই বারীন্দ্র-অনুগামী। গোঁসাই-এর হত্যায় সত্যেন মস্তিষ্ক, কানাই দক্ষিণহস্ত। এই উভয়ের সংযোগ ব্যতীত এই কার্য্য সম্পন্ন হইত না।

এখন সমস্ত ব্যাপারটা ভাবিয়া দেখা যাক্। কথা ছিল, মিঃ কিংসফোর্ডকে মারিতে হইবে। কলিকাতায় চেষ্টা হইল, কিন্তু কোন ফল হইল না। মজঃফরপুরে চেষ্টা হইল, ফলে দুইটি নির্দ্দোষ ইংরেজ মহিলার প্রাণ গেল। অরবিন্দ "বন্দেমাতরম্" অফিসে এই মৃত্যু সম্পর্কে টেলিগ্রাম পাইয়া বলিলেন—

"It was darkness, it was darkness. The mistake was due to that." অরবিন্দের একজন সহকর্মী (হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ) তখন তাঁহার কাছে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ইহা শুনিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর প্রাণ গেল। তারপর, অরবিন্দ প্রমুখ বোমার দলটি আলিপুর জেলে আবদ্ধ হইল। সেখানে নরেন গোঁসাই খুন হইল। প্রফুল্ল চাকীকে ধরিতে গিয়াছিল বলিয়া নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় খুন হইল। কানাই-এর ফাঁসি হইল। সত্যেনের ফাঁসি হইল। এই আটজন—একের পর আর—মারা গেল। কিন্তু মিঃ কিংসফোর্ড প্রভুর কৃপায় বাঁচিয়া গেলেন। সমস্তটাই একটা অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয় বিয়োগান্ত নাটকের মত মনে হয়।

অরবিন্দের কারাজীবন ঃ অরবিন্দ লিখিয়াছেন যে, তিনি "আলিপুরস্থ আশ্রম" হইতে "একটি নূতন মানুষ হইয়া" বাহির হইলেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, এই এক বৎসর কারাবাসে তাঁহার ঘোরতর মানসিক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। নির্জ্জন কারাবাস সম্পর্কে তাহার অভিজ্ঞতা তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"তথাপি দীর্ঘ দিনার্দ্ধ যাপন করিবার উপায় আর জুটিতেছিল না। মনকে বুঝাইয়া দিলাম, জোর করিয়া চিন্তা আনিলাম, কিন্তু দিন দিন মন বিদ্রোহী হইতে লাগিল, হাহাকার করিতে লাগিল। কাল যেন তাহার উপর অসহ্য ভার হইয়া পীড়ন করিতেছে, সেই চাপে চূর্ণ হইয়া সে হাঁপ ছাড়িবার শক্তিও পাইতেছে না, যেন স্বপ্নে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি গলাপীড়নে মরিয়া যাইতেছে অথচ হাত-পা থাকিয়াও নড়িবার শক্তি রহিত। আমি এই অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। সত্য বটে, আমি কখন অকর্মণ্য বা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে ভালবাসি নাই, তবে কতবার একাকী থাকিয়া চিন্তায় কালযাপন করিয়াছি, এক্ষণে এতই কি মনের দুর্ব্বলতা হইয়াছে যে অল্প দিনের নির্জনতায় এত আকুল হইয়া পড়িতেছি?"—(কারাকাহিনী, পৃঃ ৪৩)

ইতালীর রাজহত্যাকারী ব্রেশীর ভীষণ পরিণাম মনে পড়িল। তাঁহার নিষ্ঠুর বিচারকগণ তাঁহাকে প্রাণে মারিয়া সপ্ত বৎসরের নির্জ্জন কারাবাসে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। এক বৎসরও অতিবাহিত না হইতেই ব্রেশী উন্মাদাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তবে এতদিন সহ্য করিলেন ত। আমার মনের দৃঢ়তা কি এতই কম?"—(পৃঃ ৪৪)

"একদিন অপরাহ্ণে আমি চিন্তা করিতেছিলাম, চিন্তা আসিতেই লাগিল, হঠাৎ সেই চিন্তাসকল এমন অসংযত ও অসংলগ্ন হইতে লাগিল যে, বুঝিতে পারিলাম চিন্তার উপর বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হইতে চলিল। তাহার পরে যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন মনে পড়িল যে বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হইলেও বুদ্ধি স্বয়ং লুপ্ত বা এক মুহূর্ত ভ্রষ্ট হয় নাই, বরং শান্তভাবে মনের এই অপূর্ব্ব ক্রিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু তখন আমি উন্মত্ততা-ভয়ে ত্রস্ত হইয়া ইহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই।"—(পৃ: ৪৬-৭)

"তিনি (ভগবান) উন্মত্ততা না ঘটাইয়া নির্জ্জন কারাবাসে উন্মত্ততার ক্রমবিকাশেরই প্রণালী আমার মনের মধ্যে অভিনয় করাইয়া বুদ্ধিকে সেই নাটকের অবিচলিত দর্শকরূপে বসাইয়া রাখিলেন।"—(পৃঃ ৪৮)

তারপর তিনি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" মন্ত্র জপ করিতে করিতে নির্জ্জন কারাবাসের বিভীষিকা হইতে মুক্তি পাইলেন।

"বৃক্ষে, গৃহে, প্রাচীরে, মনুষ্যে, পশুতে, পক্ষীতে, ধাতুতে, মৃত্তিকায় 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' মনে মনে এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সর্ব্বভূতে সেই উপলব্ধি আরোপ করিতাম। এইরূপ করিতে করিতে এমন ভাব হইয়া যাইত যে কারাগার আর কারাগারই বোধ হইত না। সেই উচ্চ প্রাচীর, লোহার গরাদ, সেই সাদা দেওয়াল, সেই সূর্য্যরশ্মিদীপ্ত নীলপত্রশোভিত বৃক্ষ, সেই সামান্য জিনিসপত্র যেন আর অচেতন নহে, যেন সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যপূর্ণ হইয়া সজীব হইয়াছে......এক একবার এমন বোধ হইত যেন ভগবান সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বংশী বাজাইতে দাঁড়াইয়াছেন; এবং সেই মাধুর্য্যে আমার হৃদয় টানিয়া বাহির করিতেছেন। সর্ব্বদা বোধ হইতে লাগিল যেন কে আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে, কে আমাকে কোলে করিয়া রহিয়াছে।"—(পৃঃ ৫০)

ঈশ্বর কোলে করিয়া রহিয়াছেন, এই প্রকার অনুভূতিই তো সরল বিশ্বাসী লোকের নিকট ভগবানের সাক্ষাৎদর্শন বলিয়া অভিহিত হয়। আবার অবিশ্বাসীরা ইহাকে বিদ্রূপও করিয়া থাকে। অরবিন্দ লিখিতেছেন—

"সেদিন দেখিলাম পুণার Indian Social Reformer আমার একটি সহজবোধগম্য উক্তি লইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন...জেলে ভগবৎসান্নিধ্যের বড় ছড়াছড়ি হইল দেখিতেছি।"

ইহার উত্তরে অরবিন্দ লিখিতেছেন—"উত্থানোদ্যত পতিত জাতির মধ্যে দেশসেবকের নির্জ্জন কারাগারেই ভগবৎ-সান্নিধ্যের ছড়াছড়ি সম্ভব।"

"শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বকসার জেলে ইহা অনুভব করিয়া আসিয়াছিলেন ...আমিও আলিপুর জেলেই হিন্দুধর্মের এই মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম, চোর ডাকাত খুনীর মধ্যে সর্বপ্রথম মনুষ্যদেহে নারায়ণকে উপলব্ধি করিলাম।"—(পৃঃ ৯২)। ইহার পর বিচারাভিনয় সম্পর্কে অরবিন্দ লিখিতেছেন—"নর্টন সাহেব এই নাটকের নায়করূপে আমাকেই পছন্দ করিয়াছিলেন দেখিয়া আমি সমধিক প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। যেমন মিল্টনের Paradise Lost-এর সয়তান, আমিও তেমনি নর্টন সাহেবের Plot-এর কল্পনাপ্রসূত মহা-বিদ্রোহের কেন্দ্রস্বরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী bold, bad man. আমিই জাতীয় আন্দোলনের আদি ও অন্ত, স্রষ্টা, পাতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংহারপ্রয়াসী। উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী ইংরাজী লেখা দেখিবামাত্র নর্টন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন—অরবিন্দ ঘোষ। আন্দোলনের বৈধ-অবৈধ যত সুশৃঙ্খলিত অঙ্গ বা অপ্রত্যাশিত ফল সকলই অরবিন্দ ঘোষের সৃষ্টি, তখন বৈধ হইলেও নিশ্চয় অবৈধ অভিসন্ধি গুপ্তভাবে তাহার মধ্যে নিহিত। তাঁহার বোধ হয় বিশ্বাস ছিল যে, আমি ধরা না পড়িলে বোধ হয় দুই বৎসরের মধ্যে ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। আমার নাম কোনও ছেঁড়া কাগজের টুকরায় পাইলে নর্টন মহাখুসী হইতেন, এবং সাদরে সেই পরম মূল্যবান প্রমাণ ম্যাজিষ্ট্রেটের শ্রীচরণে অর্পণ করিতেন। দুঃখের কথা, আমি অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, নচেৎ আমার প্রতি সেই সময়ের এত ভক্তি ও অনবরত আমার ধ্যানে নর্টন সাহেব নিশ্চয়ই তখনই মুক্তিলাভ করিতেন...সেসন্স আদালতে আমি নির্দ্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় নর্টনকৃত plot-এর শ্রী ও গৌরব বিনষ্ট হয়। বেরসিক বীচক্রফ্‌ট হ্যামলেট নাটক হইতে হ্যামলেটকে বাদ দিয়া বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্যকে হতশ্রী করিয়া গেলেন।"—(পৃঃ ৫৭-৫৯)

এস্থলে অরবিন্দ নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই।

১৯০৮।ডিসেম্বর ঃ স্বদেশীর তিনটি অবস্থার কথা আমরা বলিয়াছি—ধূমায়িত, প্রজ্জ্বলিত, নির্ব্বাপিত। দীপ নির্ব্বাণের পরেও অবশ্য কিছুটা ধূম

উদ্গীরণ করে। আমরা এক্ষণে স্বদেশীর নির্ব্বাপিত অবস্থায় আসিয়া পৌছিতেছি।

১১ই।১২ই ডিসেম্বর—শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, পুলিনবিহারী দাস ও ভূপেন্দ্রচন্দ্র নাগ বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত হইলেন। পুলিন দাসের নির্ব্বাসনে পূর্ব্ববঙ্গের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল।

১৭ই ডিসেম্বর—লর্ড মর্লির শাসন সংস্কার প্রকাশিত হইল। মডারেটরা আশ্বস্ত হইলেন।

কংগ্রেস: ২৮শে ডিসেম্বর মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। সভাপতি ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, বিনাবিচারে নির্ব্বাসনকে অতীতের বর্ব্বরতার চিহ্ন বলিয়া নিন্দা করিলেন। কংগ্রেসে সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার নিন্দা করা হইল। নিন্দা করিবার কথাই! কেননা, ভারতের সকল প্রদেশের মডারেটরা বাঙ্গলার সন্ত্রাসবাদীদের খুনাখুনি কাণ্ড দেখিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছেন।

অতঃপর দেশে আর মানুষ রহিল না। আন্দোলনের আগুন ক্রমশই নিবিতে লাগিল।

অরবিন্দের পক্ষসমর্থনে মিঃ সি. আর. দাশ: নরেন গোঁসাইর হত্যার পর, এবং কানাই ও সত্যেনের ফাঁসির কিছু পূর্ব্বে, মিঃ সি. আর. দাশ আলিপুরে মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌টের সেসন্স কোর্টে অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। এ-সম্বন্ধে উত্তরপাড়া-বক্তৃতায় অরবিন্দ যাহা বলিয়াছেন, তাহা তুলিয়া দিতেছি—

"Afterwards when the trial opened in the Sessions Court, I began to write many instructions for my Counsel as to what was false in the evidence against me and on what points the witnesses might be cross-examined. Then something happened which I had not expected. The arrangements which had been made for my defence were suddenly changed and another Counsel stood there to defend me. He

came unexpectedly—a friend of mine, but I did not know that he was coming. You have all heard the name of the man who put away from him all other thoughts and abandoned all his practices, who sat up half the night day after day for months and broke his health to save me—Srijut Chittaranjan Das. When I saw him, I was satisfied; but I still thought it necessary to write instructions. Then all that was put from me and I had the message from within: This is the man who will save you from the snares put around your feet. Put aside those papers. It is not you who will instruct him. I will instruct him.… From that time I did not of myself speak a word to my Counsel about the case or give a single instruction, and if ever I was asked a question, I always found that my answer did not help the case. I had left it to him and he took it entirely into his hands with what results you know."—(*Speeches of Aurobindo Ghose : Uttarpara Speech, pp. 58-59*)

মিঃ সি. আর. দাশ সম্পর্কে অরবিন্দের কতদূর গভীর বিশ্বাস ছিল তাহা তাঁহার এই উক্তি হইতেই বুঝা যায়।

মিঃ সি. আর. দাশ আদালতকে স্পষ্ট বলিলেন যে—অরবিন্দ তাঁহার দেশের জন্য, জাতির জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিয়াছেন এবং এই পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ তাঁহার লেখায় ও বক্তৃতায় প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তবে সেই অপরাধের চরম শাস্তি নিতে তিনি প্রস্তুত আছেন। মিঃ সি. আর. দাশ আদালতকে বলিলেন :

"If it is suggested that I preached the ideal of freedom to my country which is against the law, I plead guilty to the charge. If that is the law here, I say I have done that and I request you to convict me. If it is an offence to preach the ideal of freedom, I admit having done it—I have

never disputed it.* It is for that, that I have given up all the prospects of my life. It is for that, that I came to Calcutta to live for it and to labour for it. It has been the one thought of my waking hours, the dream of my sleep. If that is my offence, there is no necessity to bring witness into the box to depose to different things in connection with that. Here am I, and I admit it. If that is my offence, let it be so stated, and I am cheerful to bear any punishment. ... I felt I was called upon to preach to my country to make them realise that India had a mission to perform in the Comity of Nations. If that is my fault, you can chain me, imprison me; but you will never get out of me a denial of that charge. I venture to submit under no section of the law do I come for the preaching of that ideal of freedom and with regard to the deeds with which I have been charged ; I submit there is no evidence on the record and it is absolutely inconsistent with everything that I taught, that I wrote and with every tendency of my mind discovered in the evidence."—(*Life-Work of Sri Aurobindo* ; Jyotish Chandra Ghose ; *pp. 184-85*)

এই পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ অরবিন্দ জেলে আবদ্ধ হইবার ১৯ দিন পূর্ব্বে বারুইপুর বক্তৃতাতে বলিয়াছেন :

"We preach the gospel of unqualified Swaraj"—(*Baruipur Speech, 12th April, 1908*)

জেল হইতে মুক্তি পাইয়া ১৯০৯।২৩শে জুন ঝালকাঠি-বক্তৃতাতেও মিঃ সি. আর. দাশের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

"We seek the fulfilment of our life as a Nation...Swaraj is not the Colonial form of Government nor any form of Government. It means the fulfilment of our National life...

There are some who fear to use the word "freedom", but I have always used the word, because it has been the *mantra* of my life to aspire towards freedom of my Nation. And when I was last in jail, I clung to that *mantra*; and through the mouth of my Counsel I used the word persistently. When he said for me—and it was said not only on my behalf, but of all who cherish this ideal—was this: If to aspire to Independence and preach Freedom is a crime, you can cast me into jail and there bind me with chains. If to preach Freedom is a crime, then I am a criminal and let me be punished."—(*Speeches of Aurobindo Ghose, Jhalakati Speech; pp. 86-88*)

বাঙ্গলার স্বদেশীযুগ অরবিন্দের ভিতর দিয়া—ভারতবর্ষকে এই পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ দিয়াছে। এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দের কৌঁসুলী মিঃ সি. আর. দাশ এই পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শকে ইংরেজের আদালতে বৈধ বলিয়া স্বীকার করাইয়া লইয়াছেন। মিঃ দাশের এই কৃতিত্ব ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ আমরা পাইলাম। এখন তাহা লাভ করিবার উপায় কি? মিঃ দাশ অরবিন্দের পক্ষ হইতে বলিলেন যে, অরবিন্দ এই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance)-এর উপায় অবলম্বন করিতে বলিলেন এবং কোনরূপ হিংস্র উপায় অবলম্বন করিতে নিষেধ করিলেন। মিঃ দাশ বলিতেছেন:

"When you find Aurobindo leaving Baroda and coming to Calcutta, you find that the doctrines he preaches are not doctrines of violence but doctrine of Passive Resistance. It is not bombs but sufferings. He deprecates secret societies and violence and enjoins them to suffer.···The ideals of Independence and the means suggested are those of Passive Resistance···"

অরবিন্দ "বন্দেমাতরম্"-এর কর্ণধার ছিলেন। মিঃ দাশ বলিতেছেন :

"According to the *Bandemataram*, the ideal of Freedom must be attained by passive resistance—*Swadeshi*, Boycott, National Education, Courts of Arbitration, etc."

এখন দেখা যাক, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বস্তুটি কি। মিঃ দাশ ইহার অতি নিপুণ ও বিশদ আলোচনা করিয়া বলিতেছেন :

"If there is a law which is unjust and offensive against the development of the Nation, break that law by all means and take the consequences. He never asked you to apply force in a single utterance of his either in the press or on the platform. If the Government thought fit to bring in a law which hinders you from attaining that salvation, Aurobindo's advice is to break that law if necessary in the sense of not obeying it. You owe it to your conscience; you owe it to your God. If the law says, you must go to jail—go to jail. That was the cardinal feature of the doctrine of passive resistance which Aurobindo preached."

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে শুধু অসহযোগ নয়, আমরা গান্ধীযুগের আইন-অমান্য (Civil Disobedience)-ও পাইলাম। অরবিন্দ এক স্থানে বলিয়াছিলেন যে, দেশের মাটিকে আমাদের রক্ত দ্বারা সার দিতে হইবে ("manuring the soil with their blood")। মিঃ দাশ বলেন, এরকম জিনিস কখনও সম্ভবপর নয়। ইহা একটা metaphor মাত্র। আবার এই প্রসঙ্গেই তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অবতারণা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিবার কথাও বলেন।

"···If passive resistance could be so well-organised that all the people refused to pay taxes·· there would be firing of guns and the result of that would be that the people would be weltering in blood."

তারপর মিঃ দাশ বলেন যে, ইংরেজজাতি বারংবার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বন করিয়াছে।

"Is not the doctrine of passive resistance preached throughout the world on the same footing? Is it peculiar to this country—this movement which has met with such abusing language from Mr. Norton? Have not the people of England done it over and over again? I say that this is the same doctrine that Aurobindo was preaching almost up to the very day when those handcuffs were put on his hand."

গান্ধীযুগে অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলনের দিনে, বাঙ্গলার স্বদেশী যুগে বিপিনচন্দ্র অরবিন্দ মিঃ সি. আর. দাশ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যে আইন-অমান্য ও ট্যাক্স বন্ধ করার কথা বলিয়াছিলেন—তাহা ভারতের অন্য প্রদেশ দূরের কথা অনেক বাঙ্গালীই ঠিকমত মনে রাখিতে পারেন নাই। বাঙ্গালী খুব সহজেই নিজের ইতিহাস ভুলিয়া যায়।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কথাটা বিপিনচন্দ্রই প্রথম বলেন। অরবিন্দও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। বিপিনচন্দ্রের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দ্বারাই মিঃ দাশ অরবিন্দকে সমর্থন করিলেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ যে বৈধ এবং আইনসঙ্গত, ইহাও মিঃ দাশ আদালতে প্রমাণ করিলেন। মিঃ দাশের এই কৃতিত্বও কম গৌরবের কথা নয়। ইতিহাস কখনও ইহা ভুলিতে পারিবে না।

মিঃ দাশ স্বদেশী যুগের গঠনমূলক প্রোগ্রামের কথা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, অরবিন্দ ঐ গঠনমূলক প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেন। কিন্তু "যুগান্তর"-এর বিপ্লবী দল গঠনমূলক কার্য্য আদৌ সমর্থন করিতেন না। তাঁহারা বলিতেন—দেশ স্বাধীন না হইলে, দেশের লোকের হাতে ক্ষমতা না আসিলে, কোন গঠনমূলক কার্য্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং মিঃ দাশ বলেন যে, গঠনমূলক কার্য্য সমর্থন করার প্রমাণই হইতেছে যে, অরবিন্দ বিপ্লবী নহেন। মিঃ দাশের বক্তৃতা তুলিয়া দিতেছি :

"Aurobindo has advocated National Education, *Swadeshi*, Boycott and Court Of Arbitration whereas the *Jugantar* in

its articles headed the *Suchona* holds that no progress of the country is possible without Independence. Talk of *Swadeshi*—the *Jugantar* laughs at it. Talk of National Education, Arbitration Court—the *Jugantar* says all that is a pastime. No progress of the country can ever take place unless you have absolute Independence. This is the essential difference between the principles of the *Bande Mataram* and the *Jugantar*. Mr. Das here read articles from the *Sandhya, Nabasakti* and other papers to show the difference in the tone of their writings."

অতঃপর মিঃ দাশ বলিলেন—যদি একটি বোমা নিয়া অরবিন্দের নিকট উপস্থিত করিয়া বলা হয়, "ইহা কি আমি যে-কোন ইংরাজকে প্রথম দেখিব তাহারই উপর নিক্ষেপ করিব ?" ইহার উত্তরে অরবিন্দ বলিবেন যে, "এই কার্য্য দ্বারা কি দেশ স্বাধীন হইবে ?" উত্তর হইবে, "না, তাহা হইবে না।" তখন তিনি নিশ্চয়ই বোমানিক্ষেপ নিষেধ করিবেন।

এই সময় হাকিম মিঃ বীচক্রফ্‌ট এক ভয়ঙ্কর প্রশ্ন মিঃ দাশকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "যদি বোমানিক্ষেপে অভীপ্সিত কার্য্য সিদ্ধ হয়, তবে কি অরবিন্দ বোমানিক্ষেপের আদেশ দিবেন ?" এই ভয়ঙ্কর প্রশ্নের উত্তরে মিঃ দাশ নির্ভীক কণ্ঠে বলিলেন যে, "হাঁ—তা' দিবেন।" ইংরেজের আদালতে এমন কথা ইতিপূর্ব্বে আর কোনও কৌঁসুলী বলেন নাই। মিঃ দাশের কথা তুলিয়া দিতেছি :

"His Honour : If effective, use it ?

Mr. Das : If the oppression increases to such an extent and people are so united together, and have got such resource at their back that they think they can fight the Government in battle as it were they might do it, but not now.

His Honour : He goes back to the utilitarian method if you are strong enough to fight.

Mr. Das : Yes."

ইহা লিখিতে গিয়া মনে হইতেছে, নেতাজী সুভাষের "আজাদ হিন্দ ফৌজ"-এর বিচারাভিনয়ের সময় মিঃ সি. আর. দাশ বাঁচিয়া থাকিলে "আজাদ হিন্দ ফৌজ"-এর পক্ষ সমর্থন করিতে দাঁড়াইয়া কি কথাই না বলিতেন! দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের সময় কোন কৌসুলীই এমন কথাটি বলিতে সাহস করেন নাই।

মিঃ দাশ বলেন, এদেশে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট পরগাছার মত দেশের উপর শিকড় গাড়িয়া ইহার রস শোষণ করিতেছে। এই বিদেশী গভর্ণমেণ্ট আমাদের জাতির স্বাভাবিক বিকাশ নয়। সুতরাং অরবিন্দ ইহার উচ্ছেদ কামনা করিতেছেন। মিঃ দাশ বলিতেছেন :

"In language of Aurobindo, you have got here an authority which has not sprung from the Nation as a part of its organism. The Government has not sprung here from within the people as the Government of other countries.... I objeet to the Government of this country, not because it is not a Democratic Government nor to its particular actions which are criticised by others. My objection is based on the philosophy that this Government has not sprung from the people as a part of an organism."

অরবিন্দ কারারুদ্ধ হইবার অব্যহিত পূর্ব্বে, কিশোরগঞ্জে পল্লী-সমিতির উপর যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন :

" ..Foreign rule is inorganic and, therefore, tends to disintegrate the subject body-politic by destroying its proper organs and centres of life."

মিঃ দাশ আদালতে অরবিন্দের কিশোরগঞ্জের বক্তৃতারই প্রতিধ্বনি করিলেন।

তারপর মিঃ দাশ যে অতুলনীয় ভাষায় তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলেন, ভবিষ্যতের ইতিহাস তাঁহার প্রত্যেকটি কথা সত্য প্রমাণ করিয়া দিয়াছে :

"I appeal in the name of the very ideal that Aurobindo

preached and in the name of all the traditions of our country...

"My appeal to you, therefore, is that a man like this, who is being charged with the offences imputed to him, stands not only before the bar in this Court, but stands before the bar of the High Court of History, and my appeal to you is this: That long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will be echoed and re-echoed not only in India, but across distant seas and lands. Therefore, I say that a man in his position is not only standing before the bar of this Court, but before the bar of the High Court of History."

অরবিন্দের কারামুক্তি ঃ মিঃ দাশের বক্তৃতায় হাকিম মিঃ বীচক্রফ্‌টের মন ভিজিল। পুলিশ বাহিনী মিঃ নর্টনের মারফৎ অরবিন্দের বিরুদ্ধে যে-সকল প্রমাণ আদালতে দাখিল করিয়াছিল, মিঃ দাশ সেই সমস্ত প্রমাণ অগ্রাহ্য বলিয়া উড়াইয়া দিলেন—ধোপে টিকিল না। অরবিন্দ বেকসুর খালাস হইলেন। ১৯০৯।৬ই মে মিঃ বীচক্রফ্‌টের রায় বাহির হইল।

অরবিন্দের সঙ্গে দেবব্রত বসু, নিখিলেশ্বর, হেমেন্দ্র, শচীন্দ্র, নরেন্দ্র বক্সী, নলিনী গুপ্ত, বিজয় নাগ, ধরণী গুপ্ত, নগেন্দ্র, পূর্ণ সেন, বারীন্দ্র ঘোষ প্রভাস দে, দীনদয়াল, বিজয় ভট্টাচার্য্য, কুঞ্জ সাহা ও হেম সেন—সর্বসমেত এই ১৭জন মুক্তিলাভ করিলেন। বাকী ১৯ জনের মধ্যে বারীন ও উল্লাসের ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল। উপেন্দ্র, হৃষীকেশ, বীরেন সেন, ইন্দ্রনাথ, বিভূতি, সুধীর, ইন্দু, অবনাশ, শৈলেন ও হেমচন্দ্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস, অধিকন্তু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত। নিরাপদ, শিশির ও পরেশের দশ বছর দ্বীপান্তর। সুশীল, বালকৃষ্ণ সাত বছর দ্বীপান্তর আর কৃষ্ণজীবন এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করিয়াছিল। আর একজন—অশোক নন্দী—বিচার শেষ হইবার আগেই মারা যায়।

মিঃ বীচক্রফ্‌টের রায় বাহির হইবার পর মিঃ সি. আর. দাশ হাইকোর্টে আপীল করিলেন। ১৯০৯।নভেম্বর মাসে হাইকোর্টের রায় বাহির হইল। বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাঁসির হুকুম বন্ধ হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হইল। দ্বীপান্তরের যাত্রীরা ১৯০৯।১১ই ডিসেম্বর আলিপুর হইতে রওনা হইলেন।

অরবিন্দের নিকট বারীন্দ্রের পত্র ঃ হাইকোর্টের যখন আপীল চলিতেছে, তখন জেল হইতে বারীন্দ্র অরবিন্দকে সাতখানি পত্র গোপনে লিখিয়াছিলেন। অরবিন্দও সেই সাতটি পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন। বারীন্দ্র লিখিতেছেন—

"সে বাহিরে অরবিন্দের নিকট আমার পত্র লইয়া যাইতে রাজী হইল। আমার সেজদা তখন আমার ন-মেশো কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ি, সঞ্জীবনী কার্য্যালয়ে আছেন। মেশো মহাশয় তখন দেশান্তরী দশায় (deportation) বাঙলার বাহিরে আবদ্ধ। এই লা—আমার সাতখানি পত্র ক্রমে ক্রমে সেজদার কাছে লইয়া যায় এবং আমায় তাহার উত্তরও আনিয়া দেয়। প্রথমে সে প্রতি পত্রের জন্য ৫৲ লইত, শেষে আমাদের সৌহার্দ্দ্য জমিয়া উঠিলে সাধন লইতে ব্যাকুল হইলে লা—আর কিছুই লইত না।"—(বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী, পৃঃ ১১০)

"সেজদা তাঁর সাতটি পত্রে আমায় বুঝাইবার প্রয়াস করিলেন যে, আমার ক্রিয়াসাধনার অবস্থা শেষ হইয়াছে, এখন সর্ব-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবৎসমর্পিত না হইলে আর উন্নতি হইবে না।"—(পৃঃ ১১১)

দুই ভ্রাতার মধ্যে জেল হইতে বাহিরে, এখন সাধন-তত্ত্বের প্রসঙ্গ চলিতেছে।

অরবিন্দ ১৯০৯।৬ই মে কারামুক্ত হন। ভগিনী নিবেদিতা ২ বৎসর ইয়োরোপ ও আমেরিকা থাকিয়া ১৯০৯।আগষ্ট মাসে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার পত্নী, লেডি (lady) অবলা বসুর সহিত এক সঙ্গে এক জাহাজেই দেশে ফিরিয়া আসেন। এই সময় মিঃ সি. আর. দাশ অল্প কিছুদিনের জন্য দার্জ্জিলিঙ্‌ গমন করেন। সেখানে রাস্তায় একদিন ভগিনী নিবেদিতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ভগিনী নিবেদিতার হাতে একটি বড় লাল গোলাপ ফুল ছিল। নিবেদিতা হাসিতে হাসিতে মিঃ দাশের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এবং সেই গোলাপ ফুলটি মিঃ দাশের কোটের বোতামের ছিদ্রে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে মহৎ বলিয়াই জানিতাম। কিন্তু আপনি এত মহৎ তাহা

জানিতাম না” (“I knew you to be great, but I did not know you are so great”)। সমগ্র দেশবাসী ভগিনী নিবেদিতার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁহার কথার সমর্থন করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

উত্তরপাড়ার বক্তৃতা : (১৯০৯।মে) : অরবিন্দ এক বৎসর আলিপুর জেলে বাস করিয়া ১৯০৯।৬ই মে বাহিরে আসিলেন এবং তাঁহার ন-মেশোমশায় কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ী ৬নং কলেজ স্কোয়ারে আসিয়া উঠিলেন। এই বাড়ীতেই দশ মাস থাকিয়া ১৯১০।ফেব্রুয়ারীর শেষে চন্দননগর প্রস্থান করিলেন। সুতরাং জেল হইতে বাহির হইয়া মাত্র দশ মাস তাঁহার কর্মজীবন। ইহার পরে মার্চ্চ মাসে চন্দননগরে শ্রীমতিলাল রায়ের বাড়ীতে অজ্ঞাতবাস এবং ১৯১০।৪ঠা এপ্রিল হইতে পণ্ডিচেরীতে অবস্থান এবং সেইখানেই মৃত্যু (১৯৫০।৬ই ডিসেম্বর)।

জেল হইতে বাহির হইয়া (“just after acquittal”) উত্তরপাড়ায় ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভায় তিনি প্রথম বক্তৃতা করেন। নানা কারণে এই বক্তৃতাটি অর-বিন্দের একটি প্রসিদ্ধ বক্তৃতার মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

অরবিন্দ বলিলেন যে, যে-সমস্ত কথা তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন, ঈশ্বর তাঁহাকে তাহা বলিতে দিলেন না। তৎপরিবর্তে, ঈশ্বর তাঁহাকে যাহা বলিতে বলিলেন, তিনি এই বক্তৃতায় কেবল সেই সমস্ত কথাই বলিলেন।

“This is the word that has been put into my mouth to speak to you today; what I intended to speak has been put away from me, and beyond what is given to me I have nothing to say....Even in these few minutes a word has been suggested to me which I had no wish to speak. The thing I had in my mind, He has thrown from it and what I speak is under an impulse and a compulsion.”

সুতরাং আদ্যোপান্ত এই বক্তৃতাটি ঈশ্বর অরবিন্দের মুখ দিয়া বলাইয়া আমা-দিগকে শুনাইলেন। এই বক্তৃতার ভালমন্দ যা-কিছু দায়িত্ব সমস্তই ঈশ্বরের—অরবিন্দের নহে। এই বক্তৃতার সমালোচনা করিতে হইলে, ঈশ্বরের প্রত্যা-দেশের সমালোচনা করিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে তাহা এক অতি বিপজ্জনক কথা। ঈশ্বরের এরকম প্রত্যাদেশ, ধর্ম্মজগতে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ এবং প্রভুপাদ শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে

তিলক বিপিনচন্দ্র পাল বলেন নাই। পরবর্ত্তী যুগে, মহাত্মা গান্ধী যদি বা কিছু চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অরবিন্দের মতো এতটা এরকমের নহে। রাজনীতিক্ষেত্রে এরকম ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ সম্পূর্ণ নূতন। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারে এই রকমের "ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ" প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদীয়মান যুক্তিবাদী যুবকেরা তাহা মানে নাই। এবং "ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ" প্রয়োগ করার দরুণ তাঁহারা কেশবচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

তারপর অরবিন্দ বলিলেন, কারাবাসকালে ঈশ্বর তাঁহার হাতে গীতা আনিয়া দিলেন। ঈশ্বরের শক্তি তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তিনি গীতার সাধনা আরম্ভ করিলেন।

"Then He placed the Gita in my hands, His strength entered into me and I was able to do the *Sadhan* of the Gita."

এই গীতার সাধন তিনি এইরূপে ব্যক্ত করিলেন যে—দুঃখে উদ্বিগ্ন হইবে না, সুখে বিগতস্পৃহ হইবে, এবং কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা করিবে না; নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবে, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছায় কার্য্য করিয়া যাইবে। কিন্তু কোন্‌টি ঈশ্বরের ইচ্ছা আর কোন্‌টি যে নিজের ইচ্ছা, তাহা সকলে বুঝিয়া উঠিতে পারে না—মুস্কিল সেইখানে! এবং নিজের ইচ্ছাকেই ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া ভ্রম করার আশঙ্কাও খুব বেশী থাকিয়া যায়।

সেই সাধনের ফলে, তিনি কারাগারের সর্ব্বত্রই ঈশ্বরকে দেখিতে লাগিলেন। এই ঈশ্বরকে তিনি বাসুদেব, নারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করিলেন। কারাগারের উচ্চপ্রাচীরকে তিনি আর প্রাচীর দেখিলেন না—দেখিলেন, বাসুদেব। কারগারের মধ্যে একটি বৃক্ষ ছিল, কিন্তু তাহাকে তিনি আর বৃক্ষ দেখিলেন না—দেখিলেন, বাসুদেব দাঁড়াইয়া আছেন। যে-সকল প্রহরী পাহারা দিতেছিল, তাহাদিগকেও তিনি দেখিলেন যে, বাসুদেব বা নারায়ণ পাহারা দিতেছেন!

"I looked at the jail that secluded me from men and it was no longer by its high walls that I was imprisoned; no, it was Vasudeva who surrounded me. I walked under the

branches of the tree in front of my cell but it was not the tree. I knew it was Vasudeva, it was Srikrishna whom I saw standing there and holding over me His shade. I looked at the bars of my cell, the very grating that did duty for a door and again I saw Vasudeva. It was Narayana who was guarding and standing sentry over me."

অরবিন্দ কিছু মিথ্যা কথা বলেন নাই। তিনি সত্যই যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষবাদী বলিবেন, ইহা অরবিন্দের দৃষ্টিভ্রম। কেননা, যে-বস্তু যাহা নয়, তিনি সেই বস্তুতে তাহা দেখিয়াছেন। কারাগারের প্রাচীর, বৃক্ষ বা প্রহরী, কেহই বাসুদেব বা নারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণ নহেন। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী (subjective idealist) বলিবেন যে, অরবিন্দ সাধনার এমন একটি উচ্চস্তরে উঠিয়াছেন যে, সর্ব্বভূতে তাঁহার ঈশ্বর দর্শন হইতেছে। তাঁহার দৃষ্টিভ্রম হয় নাই, পরন্তু তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের যুগে চৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন—"যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" যাহা শ্রীচৈতন্যের যুগে সম্ভব হইয়াছিল, অরবিন্দ স্বদেশীযুগে তাহাই আবার সম্ভব করিলেন।

অরবিন্দ সংশয়বাদী ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর কারাগারে তাঁহাকে দেখা দিয়া এবং তাঁহার সহিত কথা বলিয়া তাঁহার সমস্ত সংশয় দূর করিয়া দিলেন।

"The agnostic was in me, the atheist was in me, sceptic was in me and I was not absolutely sure that there was a God at all."

তারপর, ঈশ্বর অরবিন্দকে বলিলেন—

"This is the *Sanatana Dharma*, this is the enternal religion which you did not really know before, but which I have now revealed to you. The agnostic and the sceptic in you have been answered, for I have given you proofs within and without you, physical and subjective, which have satisfied you."

জেলের ভিতর ঈশ্বরের সহিত এইরূপ মুখোমুখী দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা বলা, এক পরম আশ্চর্য্যের বিষয়। এক্ষেত্রে অরবিন্দ, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলকেই স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছেন। Indian Social Reformer বাচালতার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অরবিন্দকে এজন্য ঠাট্টা-বিদ্রূপও কম করেন নাই। অবশ্য, অরবিন্দও তাহার উত্তর দিয়াছেন।

অরবিন্দ বৈদান্তিক হইলেও মায়াবাদী নহেন, লীলাবাদী—যদিও গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তিনি, বিপিন পালের মাদ্রাজ-বক্তৃতা অনুসরণ করিয়া অনেকবার 'বৈদান্তিক মায়াবাদ' কথাটা প্রয়োগ করিয়াছেন। অরবিন্দ এই বক্তৃতায় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি বাল্যাবধি বিলাতী আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হওয়ায় হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব আগে বুঝিতেও পারেন নাই, এবং বিশ্বাসও করেন নাই। কিন্তু জেলের গুহার মধ্যে অবস্থানকালে ঈশ্বর আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

"He showed me His wonders and made me realise the utter truth of the Hindu Religion. I had had many doubts before. ···I was brought up in England amongst foreign ideas and an atmosphere entirely foreign."

এক বৎসর কারাবাসকালে অরবিন্দের জীবনে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, কি অভাবনীয় কাণ্ডই না ঘটিয়াছে! অরবিন্দের কোনও চরিতলেখকই ইহা বিশদরূপে ও সবিস্তারে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

এই বক্তৃতায় রাজনীতির প্রসঙ্গও কিছু আছে। অরবিন্দ জেলে যাইবার পূর্ব্বে যে উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়া ও দেখাইয়া গিয়াছিলেন, তাহা সন্ত্রাসবাদ ও গভর্ণমেণ্টের দমননীতির ফলে মুমূর্ষু অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অরবিন্দ যাঁহাদের সঙ্গে কাজ করিতেন তাঁহারা কেহই দেশে নাই। তিলক মান্দালয় দুর্গে আবদ্ধ, বিপিনপাল বিলাতে, অপর নয়জন নেতা নির্ব্বাসনে—তিনি সম্পূর্ণ একা। এ অবস্থায় তাঁহার মনের ভাব তিনি নিজেই প্রকাশ করিতেছেন—

"Others whom I was accustomed to find working beside me are absent. The storm that swept over the country has scattered them far and wide. It is I this time who have spent one year in seclusion, and now that I come out I find

all changed..........I looked around for those to whom I had been accustomed to look for counsel and inspiration. I did not find them...When I went to jail, the whole country was alive with the cry of Bande Mataram. ··· When I came out of jail, I hastened for that cry, but there was instead a silence. A hush had fallen on the country and men seemed bewildered.......I too did not know which way to move, I too did not know what was next to be done."

বিপিনচন্দ্র, এরূপ যে হইবে তাহা আগেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অরবিন্দ তখন বিপিনচন্দ্রের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। অরবিন্দ আরও অত্যাচার চাহিয়াছিলেন ('Wanted more Repression'—*1907, 19th July*)। এখন সেই অত্যাচারের নগ্নরূপ তিনি দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তিনি যেরকম ঈশ্বরভক্ত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি ইহার মধ্যেও ঈশ্বরের হস্ত নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন।

"... It was the Almighty power of God which had raised that cry, that hope; so it was the same power which had sent down that silence. He who was in the shouting and movement, was also in the pause and the hush."

ঈশ্বরভক্তেরা কিছুতেই দমিবার পাত্র নহেন। প্রত্যক্ষ অমঙ্গলের মধ্যেও তাঁহারা ভবিষ্যৎ মঙ্গল কল্পনা করেন!

তারপর, তিনি তাঁহার অনুচর যুবকদের প্রশংসা করিলেন। এবং ঈশ্বর অরবিন্দকে বলিলেন যে, এই সব বন্দী যুবকরাই দেশের উদ্ধার সাধন করিবেন এবং "ইহারা তোমার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ"।

"Then I found myself among these young men and in many of them I discovered a mighty courage, a power of self-effacement in comparison with which I was nothing. I saw one or two who were not only superior to me in force and character—very many were that—but in the promise of that intellectual ability on which I prided myself. He

said to me: This is the young generation, the new and mighty nation that is arising at my command. They are greater than yourself."

সন্ত্রাসবাদী যুবকেরাও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ এবং আদেশ দুই-ই পাইলেন। অরবিন্দ সন্ত্রাসবাদী যুবকদের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই প্রশংসাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। যিনি সন্ত্রাসবাদের প্রবর্তক, তাঁহার পক্ষে ইহা খুব স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

এইবার এই বক্তৃতার সব চেয়ে যাহা গুরুতর কথা, তাহাই বলিতেছি। জেলের ভিতর ঈশ্বর অরবিন্দের নিকট আসিয়া, হিন্দুধর্ম্ম যে সনাতন ধর্ম্ম তাহা বুঝাইয়া দিলেন এবং জগতে এই সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিবার আদেশ দিলেন। এবং এই সনাতন ধর্ম প্রচারের জন্যই ভারতবর্ষের উত্থান, অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রয়োজন। কথাটা দাঁড়াইল এইরূপ যে, জগতে সনাতন অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করাই হইল আসল উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ তাহার একটা উপায় মাত্র। সুতরাং এই আন্দোলন মুখ্যভাবে ধর্ম্মের আন্দোলন এবং গৌণভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন।

"When you go forth, speak to your nation always this word that it is for the *Sanatana Dharma* that they arise, it is for the world and not for themselves that they arise."

অরবিন্দ এই বক্তৃতায় তাঁহার বোম্বাই-বক্তৃতার (১৯০৮।১৯শে জানুয়ারী) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লেখ করার প্রয়োজন হইয়াছিল, কেননা বোম্বাই-এর বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন উত্তরপাড়া-বক্তৃতায় তাহার বিপরীত কথা বলিলেন। বোম্বাই-বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন যে—জাতীয়তাবাদ (Nationalism) আমাদের ধর্ম্ম (Religion), বাঙ্গলাদেশ ধর্ম্ম হিসাবেই জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু উত্তরপাড়া-বক্তৃতায় বলিলেন যে, সনাতন ধর্মই আমাদের জাতীয়তাবাদ। বোম্বাই-বক্তৃতায় জোর দেওয়া হইল জাতীয়তাবাদের উপর, আর উত্তরপাড়া-বক্তৃতায় জোর দেওয়া হইল সনাতন ধর্মের উপর। এই পার্থক্য তিনি নিজেও স্বীকার করিয়াছেন।

"I spoke once before with this force in me and I said them that this movement is not a political movement and

that Nationalism is not politics but a religion, a creed, a faith. I say it again today, but I put it in another way. *I say no longer that Nationalism is a creed, a religion, a faith*; I say that it is the *Sanatana Dharma* which, for us, is Nationalism."

মিঃ সি. আর. দাশ অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া অরবিন্দের স্ত্রীর নিকট লিখিত এক পত্রের (১৯০৫।৩০শে আগষ্ট) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে, অরবিন্দ স্বদেশী আন্দোলন ছাড়াও জগতে বেদান্তধর্ম্ম প্রচারের জন্য আর একটি আন্দোলন সুরু করিবেন। অবশ্য মিঃ নর্টন এই আর একটি আন্দোলনের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—সন্ত্রাসবাদের আন্দোলন। মিঃ নর্টনের ব্যাখ্যাই অধিকতর ইতিহাসসম্মত বলিয়া মনে হয়। অরবিন্দ তাঁহার স্ত্রীকে বাঙ্গলায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার ইংরাজী অনুবাদ এইরূপ—

"I have had to spend a lot of money on account of the *Swadeshi* movement, I have another movement in view which requires unlimited money."

মিঃ সি. আর. দাশ বলিলেন—

"I submit, this movement is not the movement of bomb. Aurobindo's idea was to start an extensive movement of *Vedantism*. He desired to spread it not only all over India, but all over the world…You must not forget that it is not a matter of conjecture that *Vedantism* may be carried outside India. It has already been carried into America and also into England, though not to the same extent into the latter."

এখানে মিঃ সি. আর. দাশ স্পষ্টই স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা ও ইংলণ্ডে হিন্দু ধর্ম্ম প্রচারের কথাই উল্লেখ করিলেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবও অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজে বেদান্তধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এবং অরবিন্দ তাঁহার "another movement"-এ স্বামী বিবেকানন্দের অনুগামী হইয়া জগতে বেদান্তধর্ম্ম প্রচার করিবেন, এই কথাই খোলসা বলিলেন। অরবিন্দ

মিঃ সি. আর. দাশের বক্তৃতা মন দিয়াই শুনিয়াছিলেন। এবং ইহা তাঁহার উত্তরপাড়া বক্তৃতা দিবার সময় বিস্মরণ হইবার কথাও নয়। সুতরাং জগতে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষের উত্থান প্রয়োজন, এই ধর্ম্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণমূলক বক্তৃতা স্পষ্টই স্বামী বিবেকানন্দের অনুগামী। জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, অরবিন্দ এক্ষেত্রে মুখ্যভাবে স্বামী বিবেকানন্দ এবং গৌণভাবে মিঃ সি. আর. দাশকে অনুসরণ করিয়াছেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে বিপিন পাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তরফ হইতে বেদান্ত-ধর্ম্ম প্রচার করিতে আমেরিকা গিয়াছিলেন। তখন সেখানে এক মার্কিণ বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে—তোমরা পরাধীন জাতি, তোমাদের কথা কেহ শুনিবে না। আগে তোমাদের দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের মত স্বাধীন হইয়া আইস, তখন তোমাদের কথা শুনিব। মার্কিণ বন্ধুর এই কথায় লজ্জা পাইয়া বিপিনচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিয়া "নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা প্রকাশ করিয়া চরমপন্থী রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ করেন।

এখন প্রশ্ন, অরবিন্দের সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য দেশের স্বাধীনতা আগে প্রয়োজন কি-না? যদি তা না হয়, তবে দেশকে পরাধীন রাখিয়াই কি অরবিন্দ জগতে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বহির্গত হইবেন? হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"অরবিন্দ অবতার বনবার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন।...ধর্ম্মকে উপায়-স্বরূপ ধ'রে নিয়ে বিপ্লব প্রচারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সুরু করলেন।...পলিটিক্সের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার মিলন করতে গিয়ে করলেন ধোঁয়ার সৃষ্টি।"—(বাঙ্গলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, পৃঃ ২৫১)

মিঃ সি. আর. দাশ অরবিন্দকে "prophet of nationalism" বলিয়া আলিপুর বোমার মামলায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অরবিন্দ বঙ্কিম-অনুপ্রাণিত হইয়া nationalismকে ধর্ম্ম বলিয়া ব্যখ্যা করিয়াছিলেন। পরে এখন সনাতন হিন্দুধর্ম্মকেই nationalism বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি prophet বা messiah-র ভূমিকাই গ্রহণ করিয়া উত্তরপাড়া বক্তৃতাটি দিলেন।

অরবিন্দ রাজনীতি হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। এই পরিবর্ত্তন অরবিন্দের জীবনে এক অতি গুরুতর পরিবর্ত্তন। ভবিষ্যৎ পণ্ডিচেরী জীবনের বীজ এই উত্তরপাড়া বক্তৃতার মধ্যে অঙ্কুরোদ্গম করিয়াছে। অরবিন্দ

যখন সন্ত্রাসবাদ লইয়া রাজনীতিক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন দেখিয়াছি—বগলামুখীর পূজা, ভবানীমন্দির, মা কালী। নিজেকে তিনি 'কালী' বলিয়াই স্বাক্ষর করিতেন। এই বক্তৃতায় দেখিতেছি—গীতা হস্তে শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব বা নারায়ণ।

"কর্ম্মযোগিন্"-এর প্রচ্ছদপটেও দেখিতে পাইব, কুরুক্ষেত্রে অশ্বরজ্জু হস্তে রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ।

১৯০৯।জুন মাস : জুন মাসে অরবিন্দকে খুব কর্ম্মব্যস্ত দেখিতে পাই। তিলক ও বিপিনচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে তিনিই এখন একাই ভারতবর্ষে মডারেট বিরোধী, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদী চরমপন্থী দলের নেতৃত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। মিঃ সি. আর. দাশ, বারীন্দ্র প্রভৃতির ফাঁসির হুকুম রদ করিবার জন্য হাইকোর্টে আপীল করিয়া ঝুলাঝুলি করিতেছেন, কিন্তু সেদিকে সময় ক্ষেপণ না করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে অরবিন্দ ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ১৩ই জুন তিনি বীডন্ স্কোয়ারে বক্তৃতা দিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি হইয়াছিলেন। পাঁচদিন পর, ১৯শে জুন, "কর্ম্মযোগিন্" পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। তিন দিন পর, ২৩শে জুন, ঝালকাঠিতে (বরিশাল) বক্তৃতা দিলেন। এইরূপে জুন মাস শেষ হইয়া গেল।

বীডন্ স্কোয়ারে বক্তৃতা : এই বক্তৃতার প্রথমেই তিনি গভর্ণমেণ্টের দমন-নীতির কথা বলিলেন। নয়জন নেতার নির্ব্বাসনের কথা উল্লেখ করিলেন। দমন-নীতি সম্পর্কে তিনি তাঁহার আগের মতই বহাল রাখিয়া বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন, আন্দোলন যখনই নিব' নিব' হইয়া আসে তখনই একটা রাজ-অত্যাচার আসিয়া ইহাকে দ্বিগুণ তেজে প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়। সুতরাং আমাদের পক্ষে ইহা মন্দ নয়, ভাল।

"He had always found that when Swadeshi was flagging or the Boycott beginning to relax, it only needed an act of repression on the part of the authorities to give it vigour."

তারপরে বলিলেন, অন্য জাতিরা স্বাধীনতা লাভের জন্য যে মূল্য দিয়াছে ইহা তাহার তুলনায় কিছুই নহে।

"This was nothing compared with the price other nations had paid for their liberty."

অবশ্য এখনকার মত তখন নিরস্ত্র অহিংস ছাত্র-শোভাযাত্রীদের উপর পুলিশের বেপরোয়া গুলি চালাইয়া হত এবং বহু আহত করা আরম্ভ হয় নাই।

তারপর বলিলেন, অতীতে আমরা দেশের প্রতি কর্তব্য করি নাই; এখন তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই অত্যাচার বুক পাতিয়া নিতে হইবে।

"That was the price it had to pay for its previous lapses from national duty."

তারপর মর্লির শাসন-সংস্কারের কথা তুলিয়া বলিলেন যে—ইহা অত্যন্ত ভুয়া, মেকী এবং ফাঁকি। ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্ষমতাকে খর্ব করিবে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করিবে।

"The so-called introduction of the elective principle was a sham and the power given was nothing.....It would diminish the political power of the *educated class* which was *the brain and backbone of the nation*, it would sow discord among the various communities. This was not a real reform, but reaction."

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য অরবিন্দ এখন কিছু দরদ দেখাইলেন বটে, কিন্তু ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে "ইন্দুপ্রকাশ"-এ প্রবন্ধ লিখিবার সময় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিলক্ষণ উপেক্ষা করিয়া "প্রলেটেরিয়েট"-দের (Proletariat) উত্থানের জন্য খুব জোর লিখিয়াছিলেন। তখন যে "বুর্জয়েস" (bourgeois)-নীতি তাঁহার লেখনী হইতে অজস্র শরবর্ষণ সহ্য করিয়াছে, এখন ঘটনাচক্রে তিনিই সেই বুর্জয়েস-সম্প্রদায়ের—অবশ্য চরমপন্থী দলের—একমাত্র কর্ণধার।

তারপর তিনি বলিলেন যে, তিনি চৌদ্দ বৎসর বিলাতে ছিলেন। ইংরেজ জাতি এবং তাহাদের রাজনীতি তিনি ভালরূপেই জানেন। তাহারা মাত্র সেইটুকু ক্ষমতাই আমাদিগকে দিবেন, যাহা না দিয়া উপায় নাই—অতিরিক্ত কিছুই দিবেন না।

"He had been in England for fourteen years and knew something of the English people and their politics... ...They would only give just as much as they could not help giving."

এই বক্তৃতাটি উত্তরপাড়া-বক্তৃতার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পৃথক। ইহা যুক্তিপূর্ণ ও সুসংবদ্ধ। অরবিন্দের নেতৃত্বের ক্ষমতার পরিচয় আমরা পাইতেছি।

"কর্মযোগিন্" পত্রিকা প্রকাশ (১৯০৯।১৯শে জুন) ঃ অরবিন্দ জেল হইতে বাহির হওয়ার পর পুনরায় "বন্দেমাতরম্" পত্রিকা প্রকাশ করার প্রস্তাব তাঁহার নিকট করা হইল। তিনি রাজী হইলেন না। তার পরিবর্ত্তে তিনি "কর্মযোগিন্" প্রকাশ করিলেন। "বন্দেমাতরম" হইতে "কর্মযোগিন্"-এর আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী যতটা পৃথক্, ঠিক ততটাই পরিবর্ত্তন তাঁহার জীবনে আসিয়া গিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ ঃ "কর্মযোগিন্"-এর প্রথম সংখ্যাতেই অরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথা দিয়া আরম্ভ করিলেন। গ্রেপ্তার হইবার সময় তাঁহার ঘরে দক্ষিণেশ্বরের মাটি ছিল। এ মাটি লইয়া পুলিশ এবং রসায়নবিদ্‌গণ কত কাণ্ডই না করিলেন! গ্রেপ্তারের পূর্বেই তিনি দক্ষিণেশ্বরের মাটির প্রভাবে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। দীর্ঘ কারাবাসের পর, জেল হইতে বাহির হইয়া "কর্মযোগিন্"-এর প্রথম প্রবন্ধেই আবার শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথাই তুলিলেন। অরবিন্দের উপর সন্ত্রাসবাদের-প্রবর্তনকালে আমরা দেখিয়াছি বঙ্কিমের প্রভাব। "কর্মযোগিন্"-এর সূচনাতেই দেখিতেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রভাব। পরিবর্তনমুখে হয়তো এই প্রভাব হইতেও তিনি কালে কিছুটা মুক্ত হইবেন। কিন্তু সে পরের ইতিহাস।

অরবিন্দ লিখিলেন যে, শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ পূর্ণতর সমন্বয় দিয়া গিয়াছেন। উপনিষদ্ই আমাদের প্রামাণ্য। শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদী ভাষ্য অনেক ভাষ্যের মধ্যে একটি।

"Ramkrishna and Vivekananda gave more perfect synthesis than Sankaracharya. Not Sankar, but Upanishad, is the authority. Sankar's *mayabad* is only one of the many interpretations."—[*Karmayogin, June 19th*]

অরবিন্দ মায়াবাদী শঙ্কর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে পৃথক করিয়া দেখিলেন। শুধু তাই নয়, শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা এতদুভয়ের সমন্বয়কে উচ্চ স্থান দিলেন। এবিষয়ে আমি আমার অন্য এক গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি (* ক)। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর

(* ক) "স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী"—[নবভারত পাবলিশার্স]

প্রথমে রাজা রামমোহন এবং শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ, উভয়েই শঙ্করানুগামী মায়াবাদী ছিলেন। এবং পরমহংসদেব তোতাপুরী-নির্দ্দিষ্ট নির্বিকল্প সমাধিতে ক্ষমতাপন্ন ও বিশ্বাসী ছিলেন। তবে আচার্য্য শঙ্কর যেমন অন্যান্য বাদগুলিকে প্রখর যুক্তির শাণিত কুঠারে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দিয়াছেন এবং অস্বীকার করিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ মায়াবাদ ও পূর্ণ অদ্বৈতবাদ সাধনের চরম পরিণতি বলিয়া স্বীকার করিয়াও অন্যান্য বাদগুলিকে, মায় মূর্ত্তিপূজা, পরিহার করেন নাই—তফাৎ এইখানে। অরবিন্দ, পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের সমন্বয়কে দার্শনিক মতবাদের দিক হইতেই দেখিয়াছেন। পণ্ডিত মোক্ষমূলারের মত পরমহংসদেবের সমন্বয়কে সাধনপথে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের দিক হইতে সম্ভবতঃ দেখেন নাই।

বিপিনচন্দ্রের প্রতি অরবিন্দ : বিপিনচন্দ্র ইংলণ্ডে থাকিয়া যে-সকল কার্য্য করিতেছেন, অরবিন্দ তাহা পছন্দ করিতেন না। 'কর্ম্মযোগিন্'-এর প্রথম সংখ্যাতেই অরবিন্দ লিখিলেন—

"For Bepin Babu's mission there would not be a worse place than England, a worse audience than the British people. Self-helf and passive resistance are not the things to preach before the English people in England···The first three or four issues of '*Swaraj*' were disappointing. In this month's issue Bepin Babu seems to have recovered the copious vein of thought, the subtle and flexible reasoning, the just and original view of this subject, which made one wait with impatience for every fresh number of '*New India*'. His attitude towards pro-Mahomedan policy in the Reform Scheme has consistently been adopted by the Nationalist party in Bengal."—[*Ibid*]

'স্বরাজ'-এর বহু প্রবন্ধ 'কর্ম্মযোগিন্'-এ পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। সাত-সমুদ্র-তের-নদীর-পার হইতে বিপিনচন্দ্রের সহিত অরবিন্দের একটা যোগাযোগ রক্ষিত হইতেছে। মিঃ তিলক মান্দালয় দুর্গে আবদ্ধ, তাঁহার সহিত যোগাযোগের কোনই উপায় নাই। তিলক গীতারহস্য লিখিতেছেন।

"কর্মযোগিন্'-এ লেখা হইল—ইউরোপ অপেক্ষা এসিয়ার জাতিসকলের জীবনীশক্তি বেশী। ইহা স্বামী বিবেকানন্দের কথার প্রতিধ্বনি। তিনটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল: (১) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘের আন্দোলন, (২) বঙ্গ-ভঙ্গবিরোধী স্বদেশী আন্দোলন, (৩) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রবর্ত্তিত ভারতীয় চিত্রকলার আন্দোলন। সম্ভবতঃ প্রথম ও তৃতীয় দৃষ্টান্তে ভগিনী নিবেদিতার প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

২০শে জুন নাসিকের উকীল মিঃ প্রধান বোম্বাই-এ এক বক্তৃতা দিয়া বলিলেন যে, ভারতবাসীর সম্মুখে দুইটি আদর্শ রাজনীতিক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে। একটি, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন—ইহার নেতা মিঃ গোখলে; আর একটি, পূর্ণ স্বাধীনতা—ইহার প্রবর্তক শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল।

অরবিন্দের যোগ: অরবিন্দ এই সংখ্যাতেই লিখিলেন যে, যোগের গূঢ় তত্ত্ব মানবজাতির নিকট এখন প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাহা না হইলে মনুষ্যজাতি ক্রমোন্নতির পথে ইহার পরের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারিবে না।

"Yoga must be revealed to mankind, because without it mankind cannot take the next step in the human evolution."

পণ্ডিচেরী আশ্রমে বসিয়া যোগপথে অরবিন্দ যে দিব্যমানব সৃষ্টি করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার বীজও 'কর্মযোগিন্'-এর প্রথম সংখ্যাতেই অঙ্কুরোদ্গম করিয়াছে।

ঝালকাঠি বক্তৃতা: "কর্ম্মযোগিন্" প্রকাশের দুই দিন পরে অরবিন্দ ঝালকাঠি (বরিশাল) যাত্রা করিলেন। সেখানে এক প্রকাণ্ড সভায়, ২৩শে জুন দেড়ঘণ্টাব্যাপী একটি বক্তৃতা দিলেন। পরের দিন প্রাতে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন।

বক্তৃতার প্রারম্ভেই তিনি বলিলেন—

"When I come to Barisal, I come to the chosen temple of the Mother, I come to a sacred *Pithasthan* of the national spirit—I come to the birth-place and field of work of Aswini Kumar Dutta."

তিনি অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতির বি.া বিচারে নির্ব্বাসনের কথা তুলিলেন। লর্ড মর্লি এই বিনাবিচারে নির্ব্বাসন সমর্থন করায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করিলেন।

"Lord Morley says—it is a good law. We say—it is a lawless law ; a dishonest law ; a law that is, in any real sense of the word, no law at all."

তিনি বলিলেন যে, আমাদের মধ্যে 'বিভীষণ' শ্রেণীর ব্যক্তি আছে —

"There is a sprinkling of *Vibhisans* among us—men who for their own ends are willing to tell any lie that, they think, will please the authorities or injure their personal enemies."

সম্ভবতঃ সেদিন ঝড় হইয়াছিল। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"Storm has swept over us to-day. I saw it come, I saw the striding of the storm blast and the rush of the rain, and as I saw it an idea came to me : What is this storm that is so mighty and sweeps with such fury upon us ? And I said in my heart : It is God who rides abroad on the wings of the hurricane, it is the might and force of the Lord that manifested itself and His Almighty hands that seized and shook the roof so violently over our heads today. A storm like this has swept also our national life."

তিনি গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের কথা তুলিয়া বলিলেন—

"Repression is nothing but the hammer of God that is beating us into shape so that we may be moulded into a mighty nation and an instrument for His work in the world."

পরে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিলেন—

"We seek the fulfilment of our life as a nation........Swaraj is not the Colonial form of Government nor any form of

Government. It means the fulfilment of our national life...... we shall not perish as a nation, but live as a nation."

কি উপায়ে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিব ? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেছেন—

"We seek it by feeling our separateness and pushing forward our individual self-fulfilment by what we call Swadeshi—Swadeshi in commerce, in politics, in education, in law and administration, in every branch of national activity. No doubt this means Independence, it means Freedom ; but it does not mean rebellion. There are some who fear to use the word, 'freedom'; but I have always used the word, because it has been the *mantra* of my life to aspire towards freedom of my nation. And when I was last in jail, I clung to that *mantra* ; and through the mouth of my counsel I used this word persistently."

গভর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া অরবিন্দ বলিতেছেন—

"Your repression cannot for ever continue, for it will bring anarchy into the country. You will not be able to continue your administration if this repression remains permanent. Your Government will become disorganised ; the trade you are using such means to save, will languish and capital be frightened from the country."

এই সতর্কবাণীর মধ্যেই আমরা প্রথম আভাস পাই যে, অরবিন্দ গভর্ণমেণ্টকে দমন-নীতি পরিহার করিতে বলিতেছেন। কিন্তু তথাপি তিনি আত্মসংযম (self-restraint) অথবা 'discipline'-এর অজুহাতে তাঁহার দেশবাসীকে অত্যাচারের নিকট মাথা নীচু করিবার সদুপদেশ দেন নাই। তিনি বলিতেছেন—

"There are some who think that by lowering our heads the country will escape repression. That is not my opinion.

It is by looking the storm in the face and meeting it with a high courage, fortitude and endurance that the nation can be saved........The storm may come down on us again and with greater violence. Then remember this—brave its fury, feel your strength, train your strength in the struggle with the violence of the wind, and by that strength hold down the roof over the temple of the Mother."

উত্তরপাড়া বক্তৃতায় মনে হইয়াছে যেন সনাতন ধর্মই অরবিন্দের মনের সবটা জুড়িয়া বসিয়া আছে। রাজনীতি একটু দূরে সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু বীডন্ স্কোয়ারের পর এই ঝালকাঠি বক্তৃতায় দেখিতে পাইতেছি যে দেশের স্বাধীনতা লাভ করাই অরবিন্দের জীবনের মূল মন্ত্র এবং জেলে থাকাকালীন তিনি সর্ব্বদা এই মন্ত্রই জপ করিতেন এবং তাঁহার কৌঁসুলী মিঃ সি. আর. দাশের মুখ দিয়া তিনি আদালতে বারংবার এই কথা বলাইতে ও স্বীকার করাইতে জেদ করিয়াছেন।

অরবিন্দ জেলে থাকাকালীন শুধু বাসুদেব বা নারায়ণ দর্শন করেন নাই দেশকে স্বাধীন করিবার স্বপ্নও দেখিয়াছেন এবং দেশকে স্বাধীন করিবার মন্ত্র জপ করিয়াছেন। যাঁহারা শুধু ভগবান দেখেন অথচ দেশের স্বাধীনতা বা পরাধীনতার কথা স্বপ্নেও ভাবেন না, চিন্তার মধ্যেও আনেন না—অরবিন্দ সে শ্রেণীর মানুষ নহেন। অনেকের মতে এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব তাঁহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় দেখা যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ : অরবিন্দ "কর্ম্মযোগিন্"-এ লিখিয়াছেন—

"... It was when the flower of the educated youth of Calcutta bowed down at the feet of an illiterate Hindu ascetic, a self-illuminated ecstatic and 'mystic' without a single trace or touch of the alien thought or education upon him that the battle was won. The going forth of Vivekananda marked out by the master as the heroic soul destined to take the world between his two hands and change it, was

the first visible sign to the world that India was awake, not only to survive but to conquer."—("*The Awakening Soul of India*", Karmayogin)

অরবিন্দের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে।

তারপর অরবিন্দ লিখিলেন—

"That which Vivekananda received and strove to develop, has not yet materialised. The truth of the future that Bijoy Goswami hid within himself, has not yet been revealed utterly to his disciples. A less discreet revelation prepares, a more concrete force manifests; but where it comes, when it comes none knoweth."—("*In Either Base*", Karmayogin.)

উল্লিখিত মন্তব্যটি অরবিন্দের নিজের। তিনি খুব সংক্ষেপে লিখিয়াছেন। অনেকের পক্ষেই ইহা সহজবোধ্য হইবে না। জাতির জীবনে ও চিন্তাধারায় শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যে প্রেরণা ঢালিয়া দিয়াছেন তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে, পরিপুষ্ট হইবে, বিপুল আকার ধারণ করিবে—এই অর্থ করাই সমীচীন মনে হয়।

অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত ভারতীয় চিত্রকলা : অরবিন্দ, অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত ভারতীয় চিত্রকলার উপর সমধিক আকৃষ্ট হইয়া ইহার বিস্তৃত প্রশংসামূলক আলোচনা "কর্ম্মযোগিন্"-এ আরম্ভ করিলেন। অরবিন্দ লিখিয়াছেন—

"In Bengal again, the National Spirit is seeking to satisfy itself in art and, for the first time since the decline of the Mughouls, a new school of National Art is developing itself, the school of which Abanindranath Tagore is the founder and master. It is still troubled by the foreign though Asiatic influence from which its master started and has something of an exotic appearance, but the development and self-emancipation of the National self from this temporary

domination can already be watched and followed. There again, it is the spirit of Bengal that expresses itself. The attempt to express in form and limit something of that which is formless and illimitable is the attempt of Indian art. The Greeks, aiming at a smaller and more easily attainable end, achieved a more perfect success. Their instinct for physical form was greater than ours, our instinct for psychic shape and colour was superior. Our future art must solve the problem of expressing the soul in the object, the great Indian aim, while achieving anew the triumphant combination of perfect interpretative form and colour. No Indian has so strong an instinct for form as the Bengali. In addition to the innate Vedantism of all Indian races, he has an all-powerfull impulse towards delicacy, grace and strength and it is these qualities to which the new school of art has instinctively turned in its first inception. Unable to find a perfect model in the scanty relics of old Indian art, it was only natural that it should turn to Japan for help, for delicacy and grace are there triumphant. But Japan has not the secret of expressing the deepest soul in the object, it has not the aim. And the Bengali spirit means more than the union of delicacy, grace and strength ; it has the lyrical mystic impulse ; it has the passion for clarity and concreteness and as in our literature, so in our art we see these tendencies emerging—an emotion of beauty, a nameless sweetness and spirituality pervading the clear line and form. Here too is the free spirit of the Nation beginning to emancipate itself from the foreign limitations and shackles."—("*The Awakening Soul of India*" ; Karmayogin).

অরবিন্দ চন্দননগর প্রস্থানের মাত্র সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে (৯ই ফাল্গুন, ১৩১৬) 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় ভারতীয় চিত্রবিদ্যা সম্পর্কে বাঙ্গলা ভাষায় ঠিক এই কথাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন—

"শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ প্রতিভার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েকজন যুবক লুপ্ত ভারতীয় চিত্রবিদ্যার পুনরুদ্ধার করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতিভার গুণে বঙ্গদেশে নূতন যুগের সূচনা হইতেছে। ইহার পর আশা করা যায় যে, ভারত ইংরাজের চোখে না দেখিয়া নিজ চোখে দেখিবে, পাশ্চাত্যের অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রাঞ্জল বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া আবার চিত্রিত রূপ ও বর্ণে ভারতের সনাতন ভাব ব্যক্ত করিবে।

"ভারতীয় চিত্রকর ও অন্যান্য শিল্পী যে ঠিক বাহ্য জগতের অনুকরণ করেন না, ইহা সত্য। কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে নহে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য বাহ্য দৃশ্য ও আকৃতি অতিক্রম করিয়া অন্তঃস্থ ভাব ও সত্য প্রকাশ করা। . . . . পাশ্চাত্য বাহিরের মিথ্যা অনুভব লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা ছায়ার ভক্ত। পাশ্চাত্য নাম-রূপে অনুরক্ত, আমরা নিত্যবস্তু না পাইয়া কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। এই প্রভেদ যেমন ধর্ম্মে, দর্শনে, সাহিত্যে—তেমনিই চিত্রবিদ্যায় ও স্থাপত্যবিদ্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়।"

১৯০৯।জুলাই—বিলাতে স্যার কার্জ্জন উইলি খুন : ১লা জুলাই মদনলাল ধিঙ্গড়া নামে একজন পাঞ্জাবী ছাত্র বিলাতে স্যার কার্জ্জন উইলি (Sir Curzon Wyllie) নামে একজন সাহেবকে খুন করেন। খুন করিবার কারণ, ধিঙ্গড়া নিজে বলিয়াছেন—

"I attempted to shed English blood intentionally and of purpose as an humble protest against the inhuman transportations and hangings of Indian youths ··· I do not want to say anything in defence of myself, but simply to prove the justice of my deed, I hold the English people responsible for the murder of 80 millions of Indian people in the last 50 years, and they are also responsible for taking away £ 100,000,000 every year from India to this country. Just

as the Germans have no right to occupy this country, so the English have no right to occupy India."

১৯০৯।ফেব্রুয়ারী মাসে, আলিপুর গভর্ণমেণ্টের উকীল আশুতোষ বিশ্বাসকে অরবিন্দ প্রভৃতি জেলে থাকার সময়েই সন্ত্রাসবাদীরা খুন করে। বাঙ্গলার সন্ত্রাসবাদের দেখাদেখি, বিলাতেও একটি ছোট সন্ত্রাসবাদী দল সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্যামজি কৃষ্ণবর্ম্মা ইহার পরিচালক ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। ভগিনী নিবেদিতা ঐ সময়ে জেনেভাতে থাকিয়া এই সংবাদ পান। অরবিন্দ এই হত্যা সম্বন্ধে (৩১শে জুলাই) লিখিয়াছেন—

"Madanlal Dhingra : We have no wish whatever to load the memory of this unfortunate young man with curses and denunciation. If a random patriotism was at its back, we have little hope that reflection will induce him to change his views. ··· Here his country remains behind to bear the consequences of his act."

ইহার মাত্র সাত দিন পূর্ব্বে (২৪শে জুলাই)—

"Kali when she enters into a man, cares nothing for rationality and possibility."

মিঃ গোখ্‌লে এই গর্হিত কাজের জন্য ধিঙ্গড়াকে ধিক্কার দিলেন। লজ্জায় ও ক্ষোভে তাঁহার মাথা মাটিতে নুইয়া পড়িল। অরবিন্দের সে রকম কিছুই হইল না। সন্ত্রাসবাদের প্রবর্তক অরবিন্দ ধিঙ্গড়াকে ধিক্কার দিতে পারিলেন না। তাঁহার কলম হইতে উহা নির্গত হইবার কথা নয়।

ধিঙ্গড়া তাঁহার কাজের সমর্থনকল্পে গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের কথাই স্পষ্ট উল্লেখ করিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারই সন্ত্রাসবাদকে জন্ম দেয়—সৃষ্টি করে। ইহা একজন সন্ত্রাসবাদীর নিজের কথা। কোনও কল্পনা বা theory নয়।

মিঃ গোখ্‌লের পুণা-বক্তৃতা ঃ মিঃ গোখ্‌লে ৮ই জুলাই স্যার কার্জ্জন উইলিকে হত্যার সাত দিন পর, পুণাতে এক বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরেজের অধীন থাকা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। শান্তিপূর্ণ উপায়ে অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে না। যাহারা

পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলে তাহারা পাগলা গারদের বাহিরে পাগল মাত্র। অরবিন্দ ১৭ই জুলাই গোখ্‌লের এই বক্তৃতার জবাব দিলেন—"Exit Vibhishan", অর্থাৎ মিঃ গোখ্‌লে আমাদের দেশে একজন দেশদ্রোহী ও স্বজাতিদ্রোহী, ত্রেতাযুগের বিভীষণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। মিঃ গোখ্‌লের মতে, মিঃ তিলক বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ—ইঁহারা সকলেই পাগলা-গারদের বাহিরে পাগল মাত্র!

বিপিন পাল সম্পর্কে অরবিন্দ লিখিলেন যে, বিপিন পাল ইংলণ্ডে গিয়া দেখিলেন শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তিনি তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন। বিপিনচন্দ্র এদেশে "বন্দে-মাতরম্' -এর বিখ্যাত সম্পাদক ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ মাদ্রাজ বক্তৃতার অদ্ভুত ক্ষমতাশালী বক্তারূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের নিকট তিনি আসন্ন বিপ্লবের একজন নেতারূপে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে একজন ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কিন্তু সেই বিপিন পালই এখন লণ্ডনে গিয়া একজন শান্ত, শিষ্ট সাংবাদিকরূপে পরিগণিত হইতেছেন।

হাওড়া-বক্তৃতা : অরবিন্দ হাওড়ায় এক বক্তৃতা দেন। ১৭ই জুলাই ঐ বক্তৃতা 'কর্ম্মযোগিন্'-এ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। বক্তৃতার বিষয়—"The Right of Association." গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের সভা, সংবাদপত্র ও ব্যায়াম সমিতিগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। অরবিন্দ বলেন যে, এইগুলি একটা জাতির প্রাথমিক অধিকার ("These are primary rights of a modern nation.")। এই প্রাথমিক অধিকার হইতে গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বলপূর্ব্বক বঞ্চিত করিতেছেন এবং এই অধিকার না পাইলে আমরা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে চালাইতে পারি না। দেখিতেছি, অরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা পরিবর্ত্তন হইতে চলিয়াছে। ঠিক দুই বৎসর আগে—'আরো অত্যাচার চাই' যে তিনি বলিয়াছিলেন, এখন তাহা বলিতেছেন না। এখন তিনি বুঝিতেছেন যে, অত্যাচারে সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ মারা যায়। বিপিন পাল ইহা ১৯০৬ খৃষ্টাব্দেই বলিয়াছিলেন।

কলেজস্কোয়ার-বক্তৃতা : ১৮ই জুলাই অরবিন্দ কলেজ-স্কোয়ারে সভাপতি হইয়া একটি বক্তৃতা দিলেন। ২৪শে জুলাই উহা 'কর্ম্মযোগিন্'-এ

প্রকাশিত হয়। অরবিন্দ তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন যে, বিলাতে কার্জন উইলির হত্যার কথা উল্লেখ করিয়া ছোটলাট বাহাদুর শাসাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষের লোকেরা যদি গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা না করিয়া চলে, তবে গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এই দেশবাসীর উপর ভীষণ অত্যাচার (violent repression) আরম্ভ হইবে। অরবিন্দ খুব স্পষ্ট ভাষায় ইহার উত্তর দেন। অরবিন্দ বলেন—(১) গভর্ণমেণ্ট ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিলে সন্ত্রাসবাদও ভয়ঙ্কররূপে বাড়িয়া যাইবে, সুতরাং গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে। (২) সভাসমিতি ও সংবাদপত্র ইত্যাদির স্বাধীনতারূপ জাতির প্রাথমিক অধিকার যদি গভর্ণমেণ্ট স্বীকার না করেন, তবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance) শান্তিপূর্ণ উপায়ে চালানো যাইতে পারে না। (৩) আর, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে চালাইবার পথ যদি গভর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া দেন, তবে সন্ত্রাসবাদ (terrorism) অতি ভয়ঙ্কররূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। (৪) মিঃ গোখ্‌লে তাঁহার পুণা-বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে—শান্তিপূর্ণ উপায়ে, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা, স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে না। ইহার ফলে সন্ত্রাসবাদিগণ দ্বিগুণ উৎসাহে সন্ত্রাসবাদ চালাইতে আরম্ভ করিবেন।

মিঃ গোখ্‌লের বিরুদ্ধে এই শেষোক্ত সমালোচনাটি লণ্ডনে 'স্বরাজ' পত্রিকায় বিপিন পালই প্রথম প্রকাশ করেন। অরবিন্দ এখন বিপিন পালের সহিত একমত হইতেছেন।

জুলাই মাসে অরবিন্দ 'কর্ম্মযোগিন্‌'-এ অনেক কিছু লিখিলেন; এবং হাওড়া ও কলেজ-স্কোয়ারে বক্তৃতা দিলেন। জুন মাসে গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারকে যে চক্ষে দেখিয়াছেন এবং যে ভাবায় উহার তাৎপর্য্য বীডন-স্কোয়ার ও ঝালকাঠি (বরিশাল) বক্তৃতায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, জুলাই মাসে হাওড়া ও কলেজ-স্কোয়ারের বক্তৃতায় ঠিক সেরূপটি করিলেন না। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে এবং তিনি ক্রমে বিপিন পালের সহিত একমত হইতে চলিয়াছেন। বিপিন পাল ১৯০৬ খৃষ্টাব্দেই বলিয়াছিলেন, গভর্ণমেণ্টের অসহনীয় অত্যাচার জাতির মেরুদণ্ডকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে; ফলে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চলিবে না—মারা যাইবে। অরবিন্দ তখন ইহা গ্রাহ্য করেন নাই।

দেশবাসীকে অরবিন্দের খোলা-চিঠি (৩১শে জুলাই)ঃ ১লা জুলাই

বিলাতে ধিঙড়া কার্জ্জন উইলিকে রিভল্ভারের গুলির দ্বারা গুপ্তহত্যা করিলেন। ইহা মাসের প্রথম দিনের কাণ্ড। আর মাসের শেষ দিন, ৩১শে জুলাই অরবিন্দ আসন্ন গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় দেশবাসীকে তাঁহার রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে চরম নির্দ্দেশ দিয়া "খোলা চিঠি" লিখিলেন।

"Rumour that Calcutta police submitted a case foı my deportation to the Government......In case of my deportation and if I do not return from it, it may stand as my last political will and testament to my countrymen.

1 Strict regard to law—self-help and passive resistance.

2 No control, no co-operation.

3 United Congress.

4 Boycott—political and economic.

5 Organisation of provinces.

6 Co-operation among the workers."

১৯০৯।আগষ্ট—বিলাতে বিপিন পাল : কার্জ্জন উইলির গুপ্ত-হত্যার পর শুধু অরবিন্দকেই বাঙ্গলা দেশে গ্রেপ্তারের গুজব রটিল না, বিলাতে বিপিন পালকেও ইহা বিচলিত করিল। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যাহা লিখিলেন, ৭ই আগষ্ট 'কর্ম্মযোগিন্' বিপিন বাবুর সেই কথাগুলি ছাপাইয়া দিল। বিপিন বাবু লিখিলেন—

"If to condemn the official repression—which has been the psychological cause and origin of the various acts of violence in Bengal—be a crime, I plead guilty to it and challenge to be brought to trial for it. If to found and edit the *Bande Mataram* be a crime, I cannot help pleading guilty to it also. But it is significant that no prosecution was started against this paper so long as I was in charge of it, though it openly declared absolute autonomy as the nationalist ideal.

"In India, or elsewhere, I have nothing to alter or to amend in anything that I have written and said during the

last five or six years. If those opinions are criminal, why was I not prosecuted for them? I have never been hauled up for sedition even in India, where almost anything can be construed as such.

"My photo has, I hear, recently been proscribed by an Indian judge as seditious, but the original yet stands uncondemned."

গভর্ণমেণ্ট, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদীদিগকে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। ইহা মনে করিবার কিছুটা কারণ যে না-আছে, তাহা নয়। বিপিনচন্দ্র অবশ্য গোড়া হইতেই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে সন্ত্রাসবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজেও দেখিয়াছেন এবং দেশবাসীকেও দেখিতে বলিয়াছেন। কিন্তু অরবিন্দ সেরূপটি করেন নাই। তিনি প্রথমে সন্ত্রাসবাদ, পরে সন্ত্রাসবাদ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ—এই দুই ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কাজ করিয়া আসিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের ইহা কিছু অবিদিত থাকিবার কথা নয়।

কুমারটুলি-বক্তৃতা: অরবিন্দ ৭ই আগষ্টের পূর্ব্বেই এই বক্তৃতা দেন। তিনি নিস্তব্ধতা, গোখ্‌লের পুণা-বক্তৃতা, গভর্ণমেণ্টের মডারেটতোষণ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দমন নীতি, বয়কট, এবং ৭ই আগষ্ট জাতীয় উৎসব সম্বন্ধে বলেন। তারপর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে বলেন যে, ইহা নৈতিক বলের উপর ভিত্তি করিয়া এমন এক বিপ্লব ও পরিবর্ত্তন আনিবে যাহা জগতের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই।"Passive Resistance will bring a peaceful revolution based on moral force, unprcedented in history."

বিপিন পাল ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এই কথাই বলিয়া আসিতেছেন। মিঃ সি. আর. দাশ আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিতে দাঁড়াইয়া এই কথাই বলিয়াছেন। অরবিন্দ জেল হইতে বাহির হইবার তিন মাস পর কুমারটুলিতে সেই কথাই বলিলেন। পরবর্ত্তী যুগে মহাত্মা গান্ধীও এই কথাই বলিবেন। বাঙ্গলার স্বদেশী যুগে যাহা একটা চিন্তা ধারা বা তত্ত্বরূপে প্রচারিত হইতেছিল, পরবর্ত্তী অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের যুগে বাঙ্গলার সেই তত্ত্বকথা মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায় সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল ও কার্য্যে পরিণত হইল।

৭ই আগষ্ট : বয়কট উৎসবে ভূপেন বসু সভাপতি হইলেন, অরবিন্দ 'কর্ম্মযোগিন্'-এ লিখিলেন : মহারাষ্ট্রে মিঃ তিলক যেমন গণপতি ও শিবাজী উৎসব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বাঙ্গালীও সেইরূপ ৭ই আগষ্ট ও ১৬ই অক্টোবর জাতীয় উৎসব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহা আমাদের জাতীয় জাগরণের পবিত্র দিন।

"Ganapati and Shivaji festivals by Mr. Tilak, and 7th August and 16th October in Bengal—are equally national festivals. It is our sacred day of awakening."

স্বরাজ পত্রিকায় বিপিন পাল অরবিন্দের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী ছাপাইলেন। ১৪ই আগষ্ট 'কর্ম্মযোগিন্'-এ উহা পুনর্মুদ্রিত হইল।

বয়স আটত্রিশ বৎসর (১৯০৯।১৫ই আগষ্ট—১৯১০।ফেব্রুয়ারী) :

ভগিনী নিবেদিতার ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ ★ "ধর্ম্ম" পত্রিকার প্রকাশ (১৯০৯।২৩শে আগষ্ট) ★ বিপিন পাল (১৯০৯।সেপ্টেম্বর) ★ হুগলি কনফারেন্স (১৯০৯।৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর)

কতকগুলি সংবাদ :

(ক) "Indian Sociologist" মুদ্রাকর, Mr. Alfred-এর ১ বৎসর কারাদণ্ড ;

(খ) শ্যামজি কৃষ্ণবর্ম্মা কর্ত্তৃক তাঁহার চন্দননগরস্থ গৃহে কানাই দত্তের আবক্ষ প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ;

(গ) মিঃ তিলক মান্দালয় জেল হইতে মিক্‌টিনায় স্থানান্তরিত ;

(ঘ) মিঃ গোখ্‌লে কর্ত্তৃক বোম্বাইয়ে বক্তৃতায় ট্রান্সভ্যালবাসীদিগকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের উপায় অবলম্বনের উপদেশ।

লালমোহন ঘোষের মৃত্যু ★ বিপিনচন্দ্র পাল ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদীর দল

<u>কতকগুলি সংবাদ ঃ</u>

(ক) "হিতবাদী" অফিসে খানাতল্লাসী ;

(খ) হীরেন্দ্র দত্ত ঢাকায় ঘোষণা করিলেন যে, রাজনীতির সহিত জাতীয় বিদ্যালয়গুলির কোন সম্পর্ক নাই ;

(গ) গভর্ণমেণ্ট "অনুশীলন সমিতি" বন্ধ করিয়া দিলেন ;

(ঘ) আলিপুরের বোমার মামলায় বারীন, উল্লাসকর প্রভৃতির প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মিঃ সি. আর. দাশের বক্তৃতা ;

(ঙ) "ধর্ম্ম" পত্রিকায় অরবিন্দ-লিখিত একটি সুন্দর দুর্গাস্তোত্র প্রকাশিত ;

(চ) 'অরবিন্দ-রাখী-কার্ড'—মডারেট দল কর্তৃক ১৬ই অক্টোবরের নিয়মিত বিবৃতি প্রকাশ বন্ধ।

অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র ★ স্বদেশী সভা, কলেজ-স্কোয়ার—
অরবিন্দের বক্তৃতা ★ ১৯০৯নভেম্বর

<u>কতকগুলি সংবাদ ঃ</u>

(ক) হাসান ইমাম কর্তৃক গোখলের "Students and Politics"-বক্তৃতার প্রতিবাদ ;

(খ) জাপানে প্রিন্স হিরুবুমি ইতোকে গুপ্তহত্যা ;

(গ) অরবিন্দের জেলে-লেখা "Invitation" কবিতাটির "কর্ম্মযোগিন্"-এ প্রকাশ ;

(ঘ) লাহোরে হিন্দু সভার অধিবেশন ;

(ঙ) বড়লাট লর্ড মিণ্টোর প্রতি বোমা নিক্ষিপ্ত।

অরবিন্দ ও লাহোর কংগ্রেস ★ যুক্ত-মহাসভা—"ক্রীড্" স্বাক্ষর ★ সরোজিনী নাইডু ও নাসিক হত্যা—["বার্লিন-বাসী ভ্রাতার সহিত কোন সম্পর্ক নাই, আমরা নিজামভক্ত

ও ব্রিটিশভক্ত"।] ★ অরবিন্দের নির্ব্বাসন-বিভীষিকার দ্বিতীয় দফা

কতকগুলি সংবাদ ঃ

(ক) বারীন প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ;

(খ) রমেশ দত্তের মৃত্যু ;

(গ) লাহোর-কংগ্রেস ;

(ঘ) "মিঃ গান্ধীর নেতৃত্বে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ভারতবর্ষ অপেক্ষা ট্রান্সভ্যালে অধিক কার্য্যকরী"—অরবিন্দ লিখিলেন ;

(ঙ) সুরেন্দ্র ব্যানার্জির লাহোর-বক্তৃতা ও তাহার স্থানীয় প্রতিক্রিয়া।

১৯১০।জানুয়ারী—"শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবিষ্যৎ ভারত" ★ অরবিন্দের নির্ব্বাসন বিভীষিকার ৩য় দফা ★ গোয়েন্দা আলম খুন ★ "আমরা কি নিশ্চেষ্ট থাকিব ?"—"চেষ্টার উপায়"—"আমাদের আশা"

কয়েকটি সংবাদ ঃ

(ক) লাহোরে বাঙ্গালী গ্রেপ্তার ;

(খ) লাহোরে রাজদ্রোহ ;

(গ) দক্ষিণ মহারাষ্ট্রদেশে যুদ্ধ ঘোষণা ;

(ঘ) নাসিকের হত্যাকাণ্ড, খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তারি অবিরাম চলিতেছে ;

(ঙ) লাহোরে বিপ্লববাদীদের কাণ্ড ;

(চ) কলিকাতায় শিয়ালদহের ট্রেণে গুলী ;

(ছ) কাশ্মীরে বিপ্লব-ভয় ;

(জ) ময়মনসিংহে ডাকাতি ;

(ঝ) মিঃ জ্যাক্‌সনের হত্যাকাণ্ডে প্রতিবাদ-সভা ;
(ঞ) বিপ্লবের প্রতিবাদ ;
(ট) ছোটলাটের প্রাণনাশ চেষ্টা ;
(ঠ) নিতরার ডাকাতি ;
(ড) লাহোরে অধ্যাপক পরমানন্দ গ্রেপ্তার ;
(ঢ) আম্বালায় খানাতল্লাসী ;
(ণ) পাতিয়ালায় রাজদ্রোহ ;
(ত) বাহ্রার ডাকাতির জের ;
(থ) লক্ষ্ণৌ-এ ৬ জন বাঙ্গালীর খানাতল্লাস।

মিঃ গান্ধী ও মিঃ পোলক ★ ১৯১০।ফেব্রুয়ারী ★
"আমাদের নিরাশা"

কয়েকটি সংবাদ ঃ

(ক) পুণায় অস্ত্রশস্ত্র অধিকার ;
(খ) "সিন্ধী"র সম্পাদকের দ্বীপান্তর ;
(গ) "খুলনাবাসী"—রাজদ্রোহ ;
(ঘ) সরকারী ডাক লুট ;
(ঙ) হাইকোর্টে হত্যাকাণ্ড—গোয়েন্দা আলম্ খুন ;
(চ) কৃষ্ণনগর হইতে উকীল ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার মুহুরী গ্রেপ্তার ;
(ছ) দিনাজপুরে খানাতল্লাসী ;
(জ) ভাই পরমানন্দের মামলা ;
(ঝ) জাট (১০ম) সৈন্যদল ঃ "ইহাদের আর আলিপুরে রাখা হইবে না।"
(ঞ) ডাকাতির অনুসন্ধানের ফল ;
(ট) ময়মনসিংহে গ্রেপ্তার ;

(ঠ) রাজসাহীতে ভীষণ ডাকাতি ;

(ড) কিশোরগঞ্জে খানাতল্লাস ;

(ঢ) পাবনায় বন্দুক চুরি ;

(ণ) পুণায় বিপ্লববাদী ;

(ত) বেশান্ত ও কৃষ্ণবর্ম্মা : "ভীরু, এই বিশেষণটির দ্বারাও কৃষ্ণবর্ম্মার প্রকৃত চরিত্র বর্ণিত হয় না।"—বেশান্তের মন্তব্য।

নির্ব্বাসিতের মুক্তি—(বড়লাট লর্ড মিণ্টোর বক্তৃতা) ★ গীতায় বিশ্বরূপ দর্শন, বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ—["প্রকৃতি জয়"—"ত্যাগ ও ভোগ"] ★ অরবিন্দের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ★ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ★ শ্রীশ্রীসারদা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ ★ ভগিনী নিবেদিতার ফরাসী জীবন-চরিতে অরবিন্দের প্রস্থান-প্রসঙ্গ ★ অরবিন্দের চন্দননগর প্রসঙ্গ ও ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতার ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ : ১৯০৯।আগষ্ট মাসে ভগিনী নিবেদিতা, "মিসেস্ মার্গারেট" এই ছদ্ম নামে ও ছদ্ম পোষাকে, বোম্বাই জাহাজঘাটে অবতীর্ণ হইলেন। পরে সোজা কলিকাতা না আসিয়া একটি ফার্ষ্ট ক্লাশ কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করিয়া মাদ্রাজের দিকে চলিয়া গেলেন। স্যার্ জগদীশ বসু ও তাঁহার পত্নী সোজা কলিকাতায় আসিলেন। কিছুদিন পরে, ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতা বাগ-বাজারে তাঁহার বাড়ীতে লুকাইয়া আসিলেন এবং তিন সপ্তাহ বাড়ীর ভিতরই লুকাইয়া থাকিলেন। পরে, আস্তে আস্তে, বাড়ীর বাহির হইলেন। সকলেই দেখিতে পাইল, ভগিনী নিবেদিতা ফিরিয়া আসিয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবার নিজেই সংবাদপত্রে এক চিঠি দিয়া জানাইলেন যে, ভগিনী নিবেদিতার দলের সহিত রামকৃষ্ণ মঠের কোনই সম্পর্ক নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ তুই তুইবার ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে সাবধান হইয়া ভাল কাজ

করিয়াছিলেন। কেননা, আয়র্ল্যাণ্ডের এই বিপজ্জনক মেয়েটির সংস্পর্শে থাকিলে মঠ ও মঠের সন্ন্যাসীদের কপালে কি যে ঘটিত, কে বলিতে পারে।

"When the return of Nivedita was officially known, Swami Brahmananda published for the second time the declaration of independence of the two parties (*Nivedita and the Math people*)—a useful precaution."—(ফরাসী জীবন-চরিত, পৃঃ ৩১৭)

"ধর্ম্ম" পত্রিকার প্রকাশ : [ধর্ম্ম—Reg. No. C550. সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ। নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র। সোমবার, ৭ই ভাদ্র, ১৩১৬ সাল (23rd August, 1909)]

অরবিন্দ ৩৮ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। বাংলাদেশে এই তাঁহার শেষ বৎসর।

"ধর্ম্ম" পত্রিকার উদ্বোধনেই অরবিন্দ যাহা লিখিলেন তাহাতে তখনকার অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তাঁহার মন কি ভাবিতেছে তাহাও জানা যায়। দুই সপ্তাহ পর হুগলী-কন্‌ফারেন্স আসিতেছে। শুধু নুন-চিনির বয়কট নয়, ব্রিটিশশাসন বয়কটেরও প্রস্তাব করিতে হইবে। ব্রিটিশশাসন বয়কটের প্রস্তাব ১৯০৬ কলিকাতা নৌরজী-কংগ্রেসে বিপিন পাল সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করেন। মেহতা, গোখ্‌লে, মালব্য প্রভৃতি তখন ইহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। অরবিন্দ "ধর্ম্ম"-এর প্রথম সংখ্যাতেই লিখিলেন—

"আমাদের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা—মতির একতা নেই, গতির স্থিরতা নেই,... অগ্রগামী, পশ্চাদ্‌গামী, বিপ্লববাদী, শান্তিপ্রিয়, তেজস্বী নিস্তেজ হয়।...তরঙ্গের গায়ে তরঙ্গ উটে, যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ তরঙ্গের চূড়ায় আরূঢ় তাঁহারা তরঙ্গের সঙ্গে ভাসিতেছেন, তরঙ্গ চালাইতেছেন না। সেই উদ্বেলিত শক্তিই বিপ্লবের একমাত্র নেতা ও কর্ত্তা।...কয়েকজন ভাসমান নেতাকে আকর্ষণ করিয়া সমুদ্রের অতলগর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছেন এবং উদ্ধত বায়ুকুলকে আইন-কানুন নিগড়াবদ্ধ গুহাগহ্বরে নিগৃহীত করিয়াছেন,...কিন্তু যে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত গোল থামিবার নয়। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।...আমাদের দেশে এইরূপ নিয়ম পাঁচ বৎসর হইতে চলিতেছে। এই সময় অগ্রসর হইবার দিন নহে, আত্মরক্ষার দিন। যেন উদ্দাম আচরণে

বিপক্ষকে সুযোগদান না করি, কিংবা ভীরুতা প্রকাশে নিগ্রহনীতিকে সফল না করি।”

নেতারা আন্দোলন সৃষ্টি করেন না, তাঁহারা আন্দোলনের তরঙ্গের উপর কখনও ভাসেন এবং কখনও ডুবিয়া যান। জাতীয় জীবনের আন্দোলন মহাশক্তির খেলা। আন্দোলনের প্রতি এই গভীর mystic দৃষ্টি অরবিন্দের যেরূপ আছে, অন্য কোনও নেতার তাহা নাই।

মডারেটরা গোপনে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, যাহাতে অরবিন্দ কোনও জেলা-সমিতি দ্বারা হুগলীর অধিবেশনে প্রতিনিধি নিযুক্ত না হন। কিন্তু ডায়মণ্ড-হারবার হইতে তিনি প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলেন। এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হইয়া অরবিন্দ লিখিলেন—“চাণক্য-নীতি রাজতন্ত্রে পোষায়, প্রজাতন্ত্রে কেবল ভীরুতা ও স্বাধীনতা রক্ষণের অযোগ্যতা আনয়ন করে।”

১৯০৯।সেপ্টেম্বর—বিপিন পাল ঃ গোখ্‌লের পুণা-বক্তৃতার আর এক দফা সমালোচনা বিপিনবাবু “ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান”-এ ছাপান। হুগলী-কন্‌ফারেন্সের মাত্র ২.৩ দিন পূর্ব্বে অরবিন্দ ইহা “কর্ম্মযোগিন্’ এ পুনর্মুদ্রিত করেন। বিপিন বাবুর এই সমালোচনার গুরুত্ব খুব বেশী, কেননা অরবিন্দ বিপিন বাবুর এই মতকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন। বিপিন বাবুর সমালোচনা তুলিয়া দিতেছি—

“Moderation and madness in Indian politics”—by Bepin Pal, Reprint in Karmoyogin, 4th September from the Manchester Guardian. The date of the letter is 31st July, 1909, London. Analysis of Gokhale's speech—

A. (i) Independence cannot be secured by peaceful means. (ii) The means that are capable of securing it are not at present at our disposal. (iii) Therefore, to talk and think of independence, which is unattainable, is mere madness.

Had Mr. Gokhale a powerful army at his command by which he could have driven out his masters in India, he would have done it and secured independence.

The bombmakers think that they can organise the physical means necessary for securing independence.

The political philosophy of both is the same. They differ only in their estimates of the capacity of the people to put that philosophy into practice.

B. Three parties in Indian politics—(1) Moderate—Mr. Gokhlae, (2) Advocates of physical force—open or secret, (3) Advocates of passive resistance.

"The difference between (1) and (2) is that of prudence and recklessness. The (3) believes in the possibility of securing Independence by peaceful means. It advocates passive resistance in which alone lies the possibility of peace. Deny the passive resister his lawful rights, crush him out, and the country will be thrown into the vortex of a revolution.

"Repression may kill us. But it will not kill the desire of the people of India to be a free nation among the free nations of the world.

"It is not true that the talk or thought of Independence and the pursuit of passive resistance have resulted in these *acts of violence, which none more sincerely regrets than the Swarajist passive resister. They are the results of official repression.* They are the fruit of the attempt to deny to passive resistance its legitimate scope and play. *Not lawful passive resistance but Executive lawlessness is the parent of the bomb in Bengal......Colonial is a racial relation which does not exist between England and India. Therefore, Independence is the logical ideal."*

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদীদের তরফ হইতে মডারেট ও সন্ত্রাসবাদীদের আদর্শ

ও কার্য্য-প্রণালী অতিশয় প্রাঞ্জল ভাষায় বিপিন বাবু বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর অরবিন্দ হুগলী কন্‌ফারেন্সের প্রস্তাবগুলিকে সংশোধন করিবার কথা লিখিলেন। গত বৎসর পাবনাতে বয়কট-প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু হুগলীতে তাহা দেখা যাইতেছে না। আবেদন-নিবেদন নীতির সুর সব প্রস্তাবগুলির মধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরিশেষে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব আছে অরবিন্দ তাহার ঘোর বিরোধিতা করিয়া লিখিলেন—

"We totally reject the resolution on the Terrorist outrages, which no Bengal Conference ought to pass. The conference should dissociate from violence and remind the Government that it is their creation."

সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কোন কথা সন্ত্রাসবাদের প্রবর্ত্তক অরবিন্দের কলম হইতে নির্গত হইতে পারে না। এইখানে তিনি বিপিনচন্দ্র হইতে পৃথক।

হুগলী কন্‌ফারেন্স্‌—৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর (২০শে ও ২১শে ভাদ্র): ৭ই সেপ্টেম্বর, হুগলী কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় দিনে "ধর্ম্ম" পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিলেন—

"প্রবল নিগ্রহনীতি আরম্ভ হওয়া প্রভৃতিতে দেশ নীরব হইয়া পড়িল। বঙ্গজাতির নবোত্থিত শক্তি ও সাহস যুবকদের প্রাণের মধ্যে লুকায়িত হইল এবং ভীরুগণের পরামর্শে দেশবাসীর স্মৃতিভ্রংশ ও বুদ্ধিলোপ হইতে চলিল। কোথায় নিগ্রহনীতির বৈধ অথবা সাহসপূর্ণ প্রতিরোধ করিয়া সেই নীতি বিফল করিবে, তাহা না হইয়া ভয়ে নিশ্চেষ্টতা ও নীরবতা শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া প্রচারিত হইল। তাহাতেই নিগ্রহনীতি সফল হইয়াছে।......গত পাঁচ বৎসরের কত চেষ্টা ও উদ্যম, শক্তিহীন ও বিফল হইয়া যাইতেছে।......যদি আমরা প্রাদেশিক সমিতিতে দেশের মুখ রক্ষা ও ভারতের ভবিষ্যৎ আশা রক্ষা করিতে পারি...সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছি। নচেৎ নিজের পথ নিজে পরিষ্কার করিয়া ভয়ার্ত্ত ও নিগ্রহনীতিবিক্ষুব্ধ দেশের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে।"

কন্‌ফারেন্সের এক সপ্তাহ পরে (২৮শে ভাদ্র) "ধর্ম্ম" পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিলেন (বৈকুণ্ঠনাথ সেন সভাপতি হইয়াছিলেন)—

"স্বয়ং সভাপতি মহাশয়ের বয়কট নাম তেমন পছন্দ নয়, তিনি লজ্জায় মাথা

খাইয়া তাঁহার বক্তৃতায় সে কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু ১৯০৫।৭ই আগষ্ট টাউন হল সভায় ঠিক অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।"

সভাপতি বলিয়াছিলেন, "If you please I would omit the word *boycott*, in connection with the movement." ১৯০৬ খৃঃ-এ কলিকাতায় নৌরজী-কংগ্রেসে বিপিন পালের বয়কট-প্রস্তাবের জন্য জেদ ও ব্যাখ্যা মনে পড়ে। এই তিন বৎসরের অল্পকালের মধ্যেই গভর্ণমেণ্টের নিগ্রহ-নীতির ফলে, নেতারা ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন। একা অরবিন্দ এই তুফানের মধ্যে হালে পানি পাইতেছেন না।

মডারেটরা হুগলীতে চারিটি বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প হইয়া আসিয়াছিলেন—(১) নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা তোলা হইবে না, (২) মর্লির শাসন-সংস্কার অস্বীকার করা হইবে না, (৩) জাতীয় দল যদি লাহোর-কংগ্রেসে না যায়, মডারেটরা যাইবে, (৪) সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব আছে, তাহা চরমপন্থীদের ইচ্ছানুযায়ী সংশোধন করা হইবে না। "কর্ম্মযোগিন্"-এ অরবিন্দ লিখিলেন—

"If the Nationalists pressed their points, the Moderates would have seceded and the Conference broken. Therefore, the Nationalists gave way and adhered only to their main point of securing some definite step to hold a united Congress.

"In his speech on the Boycott resolution Sj. Aurobindo Ghose purposely refrained from stating more than the bare fact, in order that nothing he might say should lead to excitement or anything which could be an excuse for friction."

অরবিন্দ বয়কট-প্রস্তাবটি শুধু উত্থাপন করিলেন মাত্র, কোনও বক্তৃতা করিলেন না। ভয়, পাছে মডারেটরা সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। আমরা দেখিয়াছি, মেদিনীপুরে তিনি মডারেটদের ছাড়িয়া আসিয়া জাতীয় দলের পৃথক সভা করিয়াছিলেন। সুরাটেও দেখিয়াছি, তিলকের পশ্চাতে থাকিয়াও তিনি তিলক অপেক্ষাও মডারেটদের ছাড়িয়া আসিবার পক্ষপাতী। "Without them (Moderates) if it must be"—এই ছিল তাঁহার সুস্পষ্ট মত।

কিন্তু হুগলীতে সে মতের অনুযায়ী কার্য্য তিনি করিলেন না, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। তবে কি বুঝিতে হইবে যে—তিনি তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন? অথবা বুঝিতে হইবে—তিনি তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করেন নাই, রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনে এবং গভর্ণমেণ্টের নিগ্রহনীতির চাপে পড়িয়া জাতীয় দলকে মডারেট দল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিতে একা ভরসা পাইলেন না? যদিও সভাপতি বৈকুণ্ঠনাথ সেন তাঁহাকে "impatient idealist"—মর্লির এই কথায় সম্ভাষণ করিলেন, তথাপি আমরা বলিব যে, হুগলীতে অরবিন্দ "impatient idealist"-এর ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। ৩১শে জুলাই দেশবাসীর নিকট "খোলা-চিঠি"তে অরবিন্দ দুই দলে মিলিয়া United Congress করিবার কথাই বলিয়াছিলেন। নিজে এই কথা দেশবাসীকে চরম-পত্রে বলিয়া আবার হুগলীতে নিজেই সেই নিজের কথার বিরুদ্ধাচারণ করেন কি করিয়া? যে মানুষ অবস্থার পরিবর্ত্তনে নিজের মত ও কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করে না, সে মানুষ নয়—যন্ত্র মাত্র। হুগলীতে অরবিন্দের পূর্ব্বেকার মডারেটবিরোধী মত, কার্য্যপ্রণালী অবস্থাধীনে কিছুটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না।

আমরা দেখিতেছি, অরবিন্দ মর্লির ভেদনীতিমূলক শাসনসংস্কার চাহেন না। তিনি ৩১শে ভাদ্র "ধর্ম্ম" পত্রিকায় লিখিয়াছেন—

"মর্লির সংস্কারে হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব বাড়িবে। ফলে ইংরেজ মধ্যস্থ ও দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া বিরাজ করিবেন।"

অরবিন্দ গভর্ণমেণ্টের নিগ্রহনীতিকে "বৈধ অথচ সাহসপূর্ণ প্রতিরোধ" করিতে চাহেন। তিনি লাহোরে দুই দলে মিলিত কংগ্রেস চান। এবং কলিকাতা কংগ্রেসের জাতীয় দলের চারিটি প্রস্তাব লাহোর কংগ্রেসেও মঞ্জুর করাইতে চান, বিশেষতঃ বয়কট-প্রস্তাবে শুধু নুন-চিনির বয়কট নয়—বিপিন পাল কথিত ব্রিটিশ শাসন বয়কটও কংগ্রেসকে গ্রহণ করিতে বলেন। জেল হইতে বাহির হইয়া, এই পাঁচ মাস তিনি তাঁহার সকল শক্তি রাজনীতিক্ষেত্রে যথাসাধ্য প্রয়োগ করিতেছেন।

শ্রীহট্ট জেলা সমিতি: ৪ঠা আশ্বিন "ধর্ম" পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিলেন যে, হুগলীর পর তিনি শ্রীহট্ট জেলা সমিতিতে জলপ্লাবিত জলসুকা গ্রামে গিয়াছিলেন। হুগলী কনফারেন্সে যাহা তিনি করিতে পারেন নাই, শ্রীহট্টে তাহা পারিয়াছিলেন। তিনি লিখিতেছেন—

"...স্বরাজের নাম করিতে ভয় করেন নাই। সর্ব্বাঙ্গীণ বয়কট সমর্থন করিতে সাহসী হইয়াছেন, আবেদন-নিবেদন নীতি বর্জ্জনপূর্ব্বক তদনুযায়ী প্রস্তাবসকল রচনা করিয়াছেন।"

শ্রীহট্টে ইহাও বলা হইয়াছে যে, স্বরাজ অর্থ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন নহে।

"ইংলণ্ডের সহিত ভারতের ঔপনিবেশিক সম্বন্ধ নাই। উপরন্তু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ভারতের পূর্ণ জাতীয় বিকাশের ও মহত্ত্বের উপযোগী শাসনতন্ত্র নহে।"

শ্রীহট্টবাসীরা এক্ষেত্রে তাঁহাদের দেশের লোক বিপিন পালের মতকে পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, বয়কটের আর এক রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বয়কট বঙ্গ-বিরোধের শুধু প্রতিবাদ নয়, ইহা—

"যে বৈধ উপায়ে স্বরাজ লাভের চেষ্টা সমিতির অনুমোদিত, বয়কট সেই বৈধ উপায়ের মধ্যে গণ্য ও প্রধান, ইহাই শ্রীহট্টবাসীদিগের মত।"

কতকগুলি সংবাদ: তারপরে, কতকগুলি সংবাদ আছে—(১) Indian Sociologist-এর মুদ্রাকর মিঃ আলফ্রেড্ এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। (২) গুজব যে, শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা নরেন গোঁসাই-এর হত্যাকারী কানাইলাল দত্তের একটি আবক্ষ প্রস্তরমূর্ত্তি তাঁহার চন্দননগরের পৈতৃক বাড়ীতে প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠাইতেছেন। (৩) মিঃ তিলক মান্দালয় জেল হইতে মিক্‌টিনা জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। (৪) মিঃ গোখ্‌লে বোম্বাই-এ একটি বক্তৃতা দিয়া বলিয়াছেন যে, ট্রান্সভালবাসীরা তথাকার গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বন করিতে পারেন। ইহার উত্তরে অরবিন্দ লিখিতেছেন—

"দেশে আস্থাহীন হইলে বিদেশে উন্নত হয় না।...গোখলের এই উক্তি কি তাঁর পূর্ব্ব বক্তৃতার দেশব্যাপী বিক্ষোভের ফলে?"

জলশুকা-কনফারেন্স হইতে অরবিন্দ বানিয়াচঙ্গে আসিয়া মঙ্গলবার, ২৩শে ভাদ্র, পৌঁছিলেন। বানিয়াচঙ্গে তিনি কোনও বক্তৃতা করিলেন না। তিনি বলিলেন—"স্বদেশে বিদেশী ইংরেজী ভাষায় কিছু বলিব না।" এরূপ কথা ইতিপূর্ব্বেও তিনি অনেকবার বলিয়াছেন।

আয়র্ল্যাণ্ড ও ধিংড়া: আয়র্ল্যাণ্ডে বড় বড় প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল—

'Ire খিংড়াকে সম্মান করিতেছে।' Ireতে ইংরেজ-বিদ্বেষ চিরপ্রসিদ্ধ। স্বায়ত্তশাসন দাবী করিতেছে। এখানেই বয়কটের উৎপত্তি।

লালমোহন ঘোষের মৃত্যু : ১১ই আশ্বিন "ধর্ম্ম" পত্রিকা লিখিলেন—"প্রাদেশিক সমিতিতে বাংলায় বক্তৃতা করিবার প্রথা তিনিই (লালমোহন ঘোষ) প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন।...অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। বিলাতে অনেকে তাঁহার বক্তৃতা বিদেশীর বলিয়া বুঝিতে পারিত না।...বাংলায় বয়কট প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি।"

কলিকাতা নৌরজী-কংগ্রেসের সময় অরবিন্দ "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় লাল মোহন ঘোষকে তাঁহার মডারেটনীতির জন্য এবং জাতীয় দলের প্রতি বক্রোক্তি করার জন্য অতি তীব্র কশাঘাতপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছেন। অরবিন্দের সমালোচনা কখনই মৃদু হইতে দেখি নাই। তথাপি বলিতে হইবে, ভারতবর্ষে লালমোহন ঘোষ দুইজন ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের একটা ইন্দ্রপাত হইয়া গেল, এ বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতীয় দলের অগ্রগামী চিন্তা ও কার্য্য-প্রণালীর সহিত তিনি শেষজীবনে সকল বিষয়ে যোগ রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই।

বিপিন পাল ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদীর দল : বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিপিন পাল একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর উহা "কর্ম্মযোগিন্"-এ ছাপা হইল। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি—

"*The Situation by Bepin Pal* : 1. The Passive Resisters are to separate themselves from (a) Moderates, and (b) Terrorists.

2. They are not a party, but only a school of thought. There must be an All-India Nationalist Association or the whole movement will split up into small and eccentric groups working frequently at cross purposes. Register of Nationalists—necessary.

3. By a strange irony of fate Mr. Gokhale and Mr. Krishnavarma have found in each other exceedingly useful

allies in helping forward the propaganda of political violence in India.

4. All Nationalists should pledge themselves to lawful activities laid down in Sreejut Aurobindo Ghose's open letter."—(*31st July, 1909.*)

সেদিন (২২।২৩শে নভেম্বর, ১৯৪৫) কলিকাতার রাজপথে বাংলার তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদল দিবারাত্রি নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বসিয়া থাকিয়া, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায়, পুলিশের গুলি মাথা ও বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়া—বুকের রক্তে মহা-নগরীর রাজপথকে লালে লাল করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের এই নির্ভীক দৃষ্টান্ত বাংলা দেশ দেখাইতে পারিল। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের জন্ম-স্থানেই যে চল্লিশ বৎসর পরে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের এই ইতিহাস রচিত হইল তাহা বাংলাদেশে যাঁহারা স্বদেশী যুগে নিষ্ক্রয় প্রতিরোধ প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই দেখিয়া যাইতে পারেন নাই—এক অরবিন্দ ছাড়া।

১৯০৯।অক্টোবর : পাঁচ মাস অতীত হয়, অরবিন্দ জেল হইতে বাহির হইয়াছেন। এই পাঁচ মাসের মধ্যেই তাঁহাকে আবার নির্বাসনের কথা উঠিয়াছে। তিনি ৩১শে জুলাই দেশবাসীকে এক চরম পত্রে খোলাখুলি সব লিখিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন। জতীয় দলের তরণীখানি কিরূপ ঝড়-তুফানের মধ্যে তিনি একা চালাইতেছেন, তাহা গত পাঁচ মাসে আমরা দেখিয়াছি। সম্মুখে আর মাত্র পাঁচ মাস। ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহেই তিনি চন্দননগর প্রস্থান করিবেন—বঙ্কিম-বন্দিতা বঙ্গভূমির নিকট হইতে চিরতরে বিদায় লইবেন। কিরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া তিনি প্রিয় জন্মভূমি চিরজীবনের মত পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন, আমরা আগামী পাঁচ মাসে তাহা দেখিতে পাইব।

কতকগুলি সংবাদ : (১) পুলিশ "হিতবাদী" অফিস নাহক খানা-তল্লাসী করিল। কিছুই পাইল না। (২) হীরেন্দ্র দত্ত ঢাকায় বক্তৃতা দিলেন যে, রাজনীতির সহিত জাতীয় বিদ্যালয়গুলির কোনই সংস্রব থাকিবে না। থাকিলে হয়তো গভর্ণমেণ্ট জাতীয় বিদ্যালয়গুলি উঠাইয়া দিবেন, এই ভয়।

অরবিন্দ লিখিলেন—

"A divorce of National Council of Education from National movement—a deliberate policy."

এই policy অরবিন্দ পছন্দ করেন নাই বলিয়াই জাতীয় বিদ্যালয় হইতে তিনি বিদায় লইয়াছেন। (৩) গভর্ণমেণ্ট অনুশীলন সমিতি বন্ধ করিয়া দিলেন। কেননা, এই সমিতির কার্যকলাপ দ্বারা রাজ্যশাসনের ব্যাঘাত জন্মিতেছে। অরবিন্দ লিখিলেন—

"কিরূপ প্রমাণের বলে যে গভর্ণমেণ্ট একটি সম্ভ্রান্ত সমিতির বিরুদ্ধে এই প্রকার গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থান প্রভৃতিতে দেশসেবা ব্যতীত অন্য কী অভিযোগ তাহাদের বিরুদ্ধে আসিতে পারে, আমরা তাহা জানি না।" "কর্ম্মযোগীন্"-এ আরও সুর চড়াইয়া লিখিলেন—

"Government is determined to allow no organisation to exist among the Bengalees."

অরবিন্দের এ সমালোচনা ত "wanted more repression"-এর মত শুনাইতেছে না। শান্তিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলির উপরেও গভর্ণমেণ্ট পুরা দমে নিগ্রহ নীতি চালাইতেছেন—ইহাই অরবিন্দের অভিমত। এবং এই নিগ্রহ-নীতি তিনি আর চাহেন না।

(৪) মিঃ সি আর দাশ আলিপুরের বোমার মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের পক্ষে হাইকোর্টে যে আপীল করিয়াছিলেন, সেই আপীলের বক্তব্য শেষ করিয়া উপসংহারে বলিলেন—

"দণ্ডপ্রদানকালে মাননীয় বিচারপতি মহোদয়গণ অভিযুক্তদিগের বালসুলভ উন্মত্ততা ও যৌবনের দূরদৃষ্টিশূন্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন এবং উৎকট স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতার প্রতি আকাঙ্ক্ষাই যে এই সকল যুবকদিগকে বিপথে চালিত করিয়াছে, তাহাও বুঝিয়া দেখিবেন। গুরুদণ্ড দ্বারা যেন ইহাদের সারা জীবনটাকে বিনষ্ট করিয়া না দেওয়া হয়।"

মিঃ দাশ আদালতে দাঁড়াইয়া ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে বারীন্দ্র, উল্লাসকর প্রভৃতিকে বাঁচাইবার জন্য সন্ত্রাসবাদীদের পথকে 'বিপথ' বলিতে বাধ্য হইলেন—সুপথ আর বলেন কি করিয়া! (৫) মিঃ গোখলে আবার এক

বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন, ছাত্রেরা রাজনৈতিক সভায় দর্শক হিসাবে যাইতে পারিবেন, কিন্তু বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। তারপর বলিলেন—শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চলিবে না, গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়া নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারীদিগকে খোঁচাইয়া সক্রিয় এবং হিংস্র করিয়া তুলিবেন। "Government will not allow even peaceful agitation. *It will provoke it to be violent.*"

মি: গোখ্‌লে গভর্ণমেণ্টের মন জানেন, সুতরাং তিনি একথা বলিতে পারেন। অরবিন্দ ইহার সমালোচনায় লিখিলেন যে—মি: গোখ্‌লে ট্রান্স-ভালবাসীদের জন্য বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সমর্থন করিয়া ভারতবর্ষের জন্য অন্যরূপ কথা বলেন কিরূপে? 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় অরবিন্দ আরও কঠোর সমালোচনা করিলেন। তিনি লিখিলেন—

"গোখ্‌লে মহাশয় কোন জন্মে মহৎ ছিলেন না! তবে তিনি মহত্তের ছায়া বটে। তাঁহার সকল মত, বুদ্ধি, বিদ্যা, চরিত্র তাঁহার নিজস্ব নহে—কৈলাস-বাসী রাণাডের দান। গোখলের মধ্যে মহাত্মা রাণাডের ছায়া বিনষ্ট হইতে চলিল দেখিয়া আমরা দুঃখিত।"

অরবিন্দ যাঁহাকে দেশদ্রোহী 'বিভীষণ' বলিয়াছেন, তাঁহার প্রতি এটুকু সমালোচনা আর এমন বেশী কি?

(৬) অরবিন্দ একটি সুন্দর দুর্গাস্তোত্র 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় লিখিলেন (তাহার পুস্তকাকারে প্রকাশ দেখি নাই)।

(৭) **১৬ই অক্টোবর—রাখী সম্মিলন**ঃ "অরবিন্দবাবু ও তাঁহার পত্নীর হাফটোন ফটোযুক্ত অরবিন্দ-রাখী কার্ড ছাপা হইয়াছে। মূল্য এক আনা মাত্র।" ১৬ই অক্টোবর যে ঘোষণাপত্র দেওয়া হইত এবার তাহা মডারেটরা বন্ধ করিয়া দিলেন। অরবিন্দ নেতাদের ভীষণ আক্রমণ করিয়া লিখিলেন—

"We will oppose this act of culpable weakness. Even a nation of strong men led by the weak, blind or selfish becomes easily infected with the vices of its leaders."

শুধু স্বদেশীযুগে নয়—পরবর্ত্তী গান্ধীযুগেও নেতাদের বিরুদ্ধে অরবিন্দের এই তীব্র সমালোচনার সত্যতা ইতিহাস বহুবার প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্রঃ মডারেট দল, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদী জাতীয়

দল, গভর্ণমেণ্টের নিগ্রহনীতি ও তাহার ফলে সন্ত্রাসবাদী দল—এই সম্পর্কে অরবিন্দ বিপিনচন্দ্রের সহিত প্রায় একমত হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু একটি বিষয়ে দুইজনের মধ্যে ঘোরতর মতপার্থক্য দেখা দিয়াছে। বিপিনচন্দ্র বলেন ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে ইংলণ্ডে প্রচার-চেষ্টার প্রয়োজন আছে। অরবিন্দ, ১৮ই আশ্বিন 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় খোলসা লিখিলেন—

"আমরা সেইরূপ (বিপিনবাবু কথিত) চেষ্টায় আস্থাবান নই। আমরা বর্তমান স্বেচ্ছাতন্ত্র বৈধ উপায়ে প্রজাতন্ত্রে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ। সেই হেতু আত্মশক্তি অবলম্বন ও বৈধ প্রতিরোধ সমর্থন করি।"

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে অরবিন্দ, আলিপুর বোমার মামলার মিঃ সি. আর. দাশকে অনুসরণ করিয়া, বৈধ বলিলেন।

বিপিনচন্দ্র ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের প্রচার সমর্থন করিয়া যাহা লিখিলেন, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

1. "Work in England necessary. Lajpat's release is due to pressure of British public opinion. India Government was opposed to it.

2. Passive Resistance depends upon the reduction of repression in India. That can only be done by pressure from British public opinion.

3. Repression will kill people's faith in Passive Resistance ; and passive resistance will fail and die.

4. Repression drives capital away, causes collapses of industrial enterprises in India. So reform is granted to quiet India.

5. Estimate of British character (a) show of fight—when defeated, (b) compromise, because of strong common-sense."

অরবিন্দ বিপিনবাবুর এই মতবাদের প্রতিবাদ করিয়া যাহা লিখিলেন, তাহা সংক্ষেপে তুলিয়া দিতেছি—

1. "Work in England at present is hopeless—waste of money and energy.

2. Carzon Wyllie murder is no excuse to release the deportees. No ministerial pronouncement of imminent release, when that happened.

3. Bepin Babu relies on the enlightened (a) self interest of the British people, and (b) on their civilized conscience.—"On which frankly, we place no reliance whatsoever"; and on (a)—"here also we differ from Bipin Babu, because correct representations of their interest will not avail. They are amazingly muddle-headed and can only learn by knocking their shins against hard and rough facts." Their "absolute Lordship" thus came in conflict with "boycott and passive resistance" of Bengal. They want to do away with it by repression. And in retutn, we must show 'a tenacity and courage and a power of efficiently rivalling the British"—and—"not to appeal to the conscience and clear common-sense of the British public."

4. The only way is, for the Nationalist party, to establish its separate existence, clear from the drag of Moderatism on the one side and disturbance of the ill-instructed outbreaks of Terrorism on the other, and erect itself into a living, compact and working force in India."

ইহা ছাড়া অরবিন্দ বিপিনবাবুর আরও একটি প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। বিপিনবাবু বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের জাতীয়তাবাদীদের নাম ও ঠিকানা একটি খাতায় একত্র করিয়া লিখিয়া রাখিলে ভাল হয়, সংগঠনের অনুকূল হয়। অরবিন্দ প্রতিবাদ করিয়া লিখিলেন যে, এরূপ করিলে গভর্ণমেণ্টকে গ্রেপ্তার করিবার সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে মাত্র। ২রা অক্টোবর 'কর্ম্মযোগিন্'-এ অরবিন্দ লিখিতেছেন—

"Sreejut Bepin Pal advocates a register of all India Nationalists as a basis for organisation; but it would be

victims of police harrassment, house searches ; arrests, binding down under 'securities, prosecutions with no evidence."

অরবিন্দ—"man on the spot"; সুতরাং তাঁহার কথার মূল্যই বেশী।

স্বদেশী সভা—কলেজ-স্কোয়ার—অরবিন্দের বক্তৃতা : "শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ বলেন যে, ১৬ই অক্টোবর ভারতবর্ষের ইতিহাসে কেন, জগতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই মহোৎসবের তিনটি অঙ্গ আছে; ১ম, এই মহাজাতির একত্বজ্ঞাপন; ২য়, ইহার স্বাতন্ত্র্য, জগতের মধ্যে এই জাতির যে ভগবৎ-নির্দ্দিষ্ট স্বকীয় স্থান আছে, তাহা বিঘোষণ। শুধু অতীতের মধ্যেই এই জাতি নিঃশেষিত হইয়া থাকিবে না। ইহার গৌরবমণ্ডিত এক মহা ভবিষ্যৎ আছে, তাহাও উপলব্ধি করিতে হইবে। ৩য়, এই জাতির জাতীয়ত্ব উদ্বোধন ও স্বদেশী মন্ত্রগ্রহণ। স্বদেশী বলিতে শুধু স্বদেশীয় পণ্য ব্যবহার বুঝিব না, স্বদেশীর মধ্যে আগে স্বদেশ এবং জাতীয়ত্বই সেই স্বদেশের প্রাণ। এই জাতীয়ত্ব সংস্থাপনই প্রকৃত স্বদেশী। এই স্বদেশীর প্রতিষ্ঠা আত্মশক্তির দ্বারাই সংসাধিত হইবে। আয়র্লণ্ড ইহার একটি দৃষ্টান্ত-স্থল। যত কঠিন বাধাবিঘ্ন আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে, আমাদের শক্তিও ততই বিকশিত হইবে। গৌতম মারের সকল প্রলোভন, সকল বিভীষিকা অতিক্রম করিয়াই বুদ্ধ হইয়াছিলেন। আমাদের বর্ত্তমান পরীক্ষার কঠোরতাই ভবিষ্যৎ মহামহিমার পরিমাপক।"—(ধর্ম্ম—১লা কার্ত্তিক, ১৩১৬—পৃঃ ১৩)

এখানে প্রলোভন—মর্লির শাসনসংস্কার; আর বিভীষিকা—গভর্ণমেণ্টের নিগ্রহনীতি। অরবিন্দ দুই-ই প্রত্যক্ষ করিতেছেন!

১৯০৯।নভেম্বর : অরবিন্দ বার্ক ও ভল্‌টেয়ারের ভক্তজন, মর্লি শাসন-সংস্কারে হিন্দুসম্প্রদায়কে অসন্তুষ্ট করার দরুণ মর্লিকে সম্রাট আকবরের সহিত তুলনা করিয়া লিখিলেন—

"**আকবর ও মর্লি :** আকবরে ও মর্লিতে অনেক সাদৃশ্য আছে। আকবর উদারনীতিক ছিলেন। লর্ড মর্লীও উদারনীতিক। আকবর হিন্দুদের বশ করিলেন, মর্লি মুসলমানদের বশ করিয়াছেন। আকবর শাসনসংস্কার করিয়াছিলেন, মর্লিও শাসনসংস্কার করিয়াছেন। কিন্তু ভগবানের সহিত মর্লির

এই মাত্র মিল আছে যে—ভগবান মায়াবী, রৌদ্র, সৌম্য এই বিবিধ মায়ার সমাবেশে জগৎ চালান ; মর্লিও মযাবী, রৌদ্র, নিগ্রহ ও সৌম্য শাসন-সংস্কার, এই দ্বিবিধ মায়ার সমাবেশে বৃটিশ সাম্রাজ্য চালান।"— [ধর্ম —৬ই অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৬-৭]

অরবিন্দ আকবর ও মর্লিতে সাদৃশ্য দেখিলেন। কিন্তু আকবর মুসলমান হইয়াও হিন্দুসম্প্রদায়কে যেরূপ সন্তুষ্ট রাখিতে পারিয়াছিলেন, মর্লি মুসলমান না হইয়াও তাহা পারেন নাই। মর্লির মুসলমান-প্রীতি ভেদনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আকবরে এই ভেদনীতি ছিল না।

বিপিন পালের "AETIOLOGY OF BOMB" : বিপিন পাল স্বরাজ' পত্রিকায় বোমার উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিলেন। এই প্রবন্ধে বোমার উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধেই লেখা হইয়াছে, পরন্তু বোমারুদের উৎসাহ দিবার জন্য কিছুই লেখা হয় নাই। মিঃ ষ্টেড (Stead) 'রিভিউ অফ্ রিভিউস্' ("Review of Reviews") পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল—

"Mr. Stead writes : If Mr. Bepin Ch. Pal who has given proofs of his detestation of the whole evil system of terrorism had not written this article of his motion, Lord Morley could hardly have spent a thousand rupees more profitably for the Indian Government than by paying Mr. Bepin Chandra Pal a fee to make so careful, so judicious and so well-informed a study of causes which led to the apparition of the Bomb in India."

কতকগুলি সংবাদ : (১) মিঃ হাসান ইমাম, মিঃ গোখলের "Students and Politics" বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগ দিবার অধিকার আছে এবং দেওয়া উচিত। অরবিন্দ মিঃ হাসান ইমামের এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন।

(২) জাপানে হিরোবুমি ইতোকে গুপ্তহত্যা করা হইল। অরবিন্দ জাপানের ইতিহাসে প্রিন্স ইতোর সর্বোচ্চ স্থান নির্দেশ করিয়া এবং আমাদের ইতিহাসে অনেক স্মরণীয় মহাপুরুষের সহিত তুলনা করিয়া ইতোকে উচ্চ প্রশংসায়

অভিনন্দিত করিলেন। তাঁহাকে যে গুপ্তহত্যা করা হইয়াছে, ইহাও ইতোর পক্ষে একটা আত্মোৎসর্গ—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন। দুঃখের বিষয়, অরবিন্দ-লিখিত 'ধর্ম্ম'-এর প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে ছাপা হইবার পর সেই গ্রন্থে এই প্রবন্ধটি স্থান পায় নাই।

(৩) অরবিন্দ আলীপুর জেলে থাকাকালীন একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। ঐ কবিতাটি—"Invitation"—৬ই নভেম্বর "কর্ম্মযোগিন"-এ ছাপা হইল। আলীপুর জেলে বসিয়াও তিনি কবিতা লিখিয়াছেন। তিনি যে বলিয়াছেন, "আমি কবিতা ও দেশকে সমান ভালবাসি"—তাহা প্রমাণ হইয়া গেল। "Who?" বলিয়া আর একটি কবিতা ১৩ই নভেম্বর ছাপা হইল।

(৪) লাহোরে হিন্দু-সভার অধিবেশন হইল। লাজপত রায় বলিলেন, "আগে হিন্দু জাতীয়তা সংস্থাপিত হউক, তাহার পরে হিন্দু-মুসলমান এই দুই জাতি লইয়া ভারতীয় জাতীয়তা সংস্থাপিত হইবে।" লাজপত রায়ের এ কথায় অরবিন্দ লিখিলেন (২২শে কার্ত্তিক—"ধর্ম")—"বড় সাংঘাতিক কথা। তবে যখন অনেক মুসলমানের স্বার্থপর আচরণে এই ভাব হিন্দুর হৃদয়ে প্রবল হইল, তখন একজন নির্ম্মলচরিত্র, নিঃস্বার্থ, প্রকৃত দেশহিতৈষী হিন্দু নেতার মুখে একথা যে স্পষ্টভাবে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে।"

"অনেক মুসলমানের স্বার্থপর আচরণে" ক্ষুব্ধ হইয়া অরবিন্দ হিন্দুসভার পক্ষপাতী হইলেন। আমরাও অরবিন্দের সঙ্গে বলিতেছি—"বড় সাংঘাতিক কথা!" ঠিক চারি বৎসর পূর্ব্বে, ঢাকার নবাব সলিমুল্লার প্রাসাদে মুসলিম লীগ ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

(৫) **গোখ্‌লে ও "হিন্দু পাঞ্চ"** : "হিন্দু পাঞ্চ"-এর সম্পাদক লিখিলেন যে, মিঃ গোখলে মিঃ মর্লিকে কুমন্ত্রণা দিয়া মিঃ তিলককে ছয় বৎসরের জন্য জেলে পাঠাইয়াছেন। ইহাও একটি সাংঘাতিক কথা—বিশেষতঃ আইনের চক্ষে মানহানিকর অপরাধ। সুতরাং সম্পাদকের শাস্তি হইয়া গেল। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, তবে অরবিন্দ হয়তো বিশ্বাস করিতেন কিম্বা ভিতরের খবর জানিতেন।

(৬) **বড়লাট লর্ড মিণ্টোর প্রতি বোমা নিক্ষেপ** : বড়লাট আমেদাবাদে গাড়ীতে যাইতেছিলেন, গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইল। ভাগ্যক্রমে কোন ক্ষতি হয় নাই।

বাঙ্গলার সন্ত্রাসবাদের ছোঁয়াচ লণ্ডনে গিয়াছে, আমেদাবাদেও গেল। স্বয়ং বড়লাটের জীবন পর্য্যন্ত নিরাপদ নয়। সন্ত্রাসবাদীরা যে কাহার কথায় পরিচালিত হইতেছে, তাহাদের নেতা যে কে—তাহাও বুঝিবার উপায় নাই।

(৭) আলীপুর বোমার মকদ্দমায় হাইকোর্ট আপীলের রায় বাহির হইল (২৭শে নভেম্বর, "কর্ম্মযোগিন্"-এ প্রকাশ)। অরবিন্দ লিখিলেন—

"We ourselves belong to a party of peaceful revolution. We have also always admitted that there is a Terrorist Party, for bombs are not thrown without hands and men are not shot for political reasons unless there is terrorism in the background."

অরবিন্দ খোলসা লিখিলেন যে—তিনি সন্ত্রাসবাদীদের দলভুক্ত নহেন, শান্তিপূর্ণ বিপ্লববাদীদের ("Peaceful revolution") দলভুক্ত। অর্থাৎ, তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদী। মিঃ সি আর দাশ এই কথা বলিয়াই তাঁহাকে খালাস করিয়াছেন। যদি কেহ আশা করেন যে, অরবিন্দ নিজ মুখে স্বীকার করিবেন যে, তিনি বাঙ্গলাদেশে সন্ত্রাসবাদের প্রবর্ত্তক—তবে বুঝিতে হইবে যে, তিনি সন্ত্রাসবাদের আদর্শ ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে একেবারেই অনভিজ্ঞ—কিছুই জানেন না। আলীপুর জেলে হ্যালিডে সাহেবের নিকটও অরবিন্দ মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

"হ্যালিডে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন : এই কাপুরুষোচিত দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া আপনার কি লজ্জা করে না? 'আমি লিপ্ত ছিলাম, ইহা ধরিয়া লইবার আপনার কি অধিকার?' উহার উত্তরে হ্যালিডে বলিলেন : আমি ধরিয়া লই নাই, আমি সবই জানি। আমি বলিলাম : কি জানেন বা না-জানেন আপনারাই অবগত, এই হত্যাকাণ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি। হ্যালিডে আর কোন কথা বলিলেন না।"—(কারাকাহিনী—পৃঃ ১১)

সন্ত্রাসবাদীদের অপরাধ স্বীকার করিতে নাই। অরবিন্দ ও প্যারিসে শিক্ষাপ্রাপ্ত গুপ্তসমিতির কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হেমচন্দ্র—ইঁহারা দুইজনে আলীপুর বোমার মামলায় অপরাধ স্বীকার করেন নাই। বারীন্দ্র গুপ্তসমিতির কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের মত অভিজ্ঞ নন, তাই তিনি গুপ্তসমিতির নিয়মপ্রণালী

ভঙ্গ করিয়া—কতকটা হাম্‌বড়াই, কতকটা হঠকারিতার বশে, অরবিন্দের মতের বিরুদ্ধে অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন।

১৯০৯।ডিসেম্বর—বিপিন পাল ও তাঁহার ম্যাঞ্চেষ্টার-বক্তৃতা : মর্লির শাসন-সংস্কারের উপর ম্যাঞ্চেষ্টারে বিপিন পাল এক বক্তৃতা দিলেন। ১১ই ডিসেম্বর "কর্মযোগিন্"-এ উহা ছাপা হইল। বক্তৃতার পরিশেষে তিনি বলিলেন যে, ভারতে বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন না-হইলে ভারতবর্ষ আয়র্ল্যাণ্ডকেও ছাড়াইয়া যাইবে—নূতন রাশিয়া হইবে।

বাঙ্গলায় নিগ্রহ-নীতি ও সন্ত্রাসবাদের সংঘর্ষে বিলাতে বিপিন পাল, কলিকাতায় অরবিন্দ—দুইজনেই অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। কেহই কোনও কূল-কিনারা পাইতেছেন না। মর্লির শাসন-সংস্কার উল্লেখ করিয়া বিপিনবাবু বলিলেন—

"It is a bribery calculated to make a section of the people sell their souls for a mess of pottage.···If the present state of things continued, India would be worse than a second Ireland ; it would be a new Russia."

কংগ্রেস : এই বৎসর কংগ্রেস লাহোরে হয় ; সভাপতি—পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্য। পণ্ডিত মালব্য গোঁড়া, রক্ষণশীল, কনৌজী ব্রাহ্মণ। তাঁহার হিন্দুয়ানী, আর অরবিন্দের হিন্দুয়ানী এক বস্তু নয়। তিনি শুধু গোঁড়া ব্রাহ্মণই নহেন, পরন্তু গোঁড়া মডারেটও বটে। বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের অহিংস হইবার জন্য উপদেশ দিতে গিয়া তিনি মনুসংহিতার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের নাম করেন নাই। এবারকার কংগ্রেসে তাঁহার প্রেসিডেণ্ট হইবার ইহা একটি কারণ। এই লাহোর কংগ্রেস বাংলার অরবিন্দ প্রমুখ চরমপন্থীদের একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য চরমপন্থীরা এক বাংলাতেই আছে, মারাঠা ব্যতীত আর কোন প্রদেশেই নাই। এই কংগ্রেস প্রমাণ করিল যে—অরবিন্দের, প্রথম—মডারেট-ছাড়া কংগ্রেস ; দ্বিতীয়—যুক্ত কংগ্রেস (United Congress)—এই দুই কল্পনাই ভণ্ডুল হইয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে অরবিন্দ পরাজিত।

মালব্যজী লালমোহন ঘোষ ও রমেশ দত্তের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলেন। রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার (স্যার্ উইলিয়ম কার্জ্জন উইলি—মিঃ

জ্যাকসন—প্রভৃতি) জন্য বুক চাপড়াইলেন। ইহা মডারেট-নীতি। রমেশ দত্ত, গোখ্‌লে প্রভৃতি এক্ষেত্রে এইরূপ বুক-ফাটা দুঃখ প্রকাশের রেওয়াজ ইতি-পূর্ব্বে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমেদাবাদে লর্ড মিণ্টোর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ইহাও অতিশয় সাংঘাতিক ও মর্মান্তিক ঘটনা—মালব্যজী তাহাও বলিলেন। এই সব ঘটনায় অরবিন্দ কোনদিনই কেবল সন্ত্রাসবাদীদের উপর দোষ চাপান নাই বা ইহাদের কার্য্যের জন্য রমেশ দত্ত এবং গোখলের মত লজ্জায় তাঁহার মাথা মাটিতে নুইয়া পড়ে নাই। বঙ্গভঙ্গের জন্যও মালব্যজী প্রতিবাদ করিলেন। বিনাবিচারে নির্বাসন—তাহারও প্রতিবাদ করিলেন। গতবার মাদ্রাজ-কংগ্রেসে, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ বিনা বিচারে নির্বাসনকে বর্ব্বর যুগের ঘটনা বলিয়া কশাঘাত করিয়াছিলেন।

এবারকার কংগ্রেস—একদলীয় কংগ্রেস। ইহাকে বাংলার চরমপন্থীরা "মেহেতা-মজলিস" বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। বাংলার বয়কট-প্রস্তাব সম্পর্কে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত উচ্চারিত হইল না। এক্ষেত্রেও অরবিন্দ পরাজিত।

অরবিন্দ ও লাহোর-কংগ্রেস : 'মেহতার চাল' সম্পর্কে অরবিন্দ লিখিলেন—"ফিরোজ শাহের ইচ্ছা, বঙ্গদেশের প্রতিনিধিগণকে লাহোরে হাজির করাইয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজের কার্য্য হাসিল করিবেন এবং বঙ্গদেশীয় শিখণ্ডীর পশ্চাৎ গুপ্তভাবে যুদ্ধ করিবেন। নচেৎ কুচক্রীর শিরোমণি উদ্দেশ্যহীন চাল চালিবেন কেন ?"—(ধর্ম—২৭শে অগ্রহায়ণ)

অরবিন্দ কি এখানে "বঙ্গদেশীয় শিখণ্ডী" বলিতে সুরেন্দ্রনাথকেই ইঙ্গিত করিলেন ? কত বড় শোচনীয় ঘটনা ! অবস্থার ও পরিস্থিতির কী পরিবর্ত্তনই না হইতে চলিয়াছে !

ইহার পরেই অরবিন্দ "ধর্ম্ম" পত্রিকায় লিখিলেন—

"**যুক্ত মহাসভা—ক্রীড্** (?) : মেহতা কিছুতেই কলিকাতা মহা-সভার বয়কট-প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হইলেন না···বঙ্গদেশের জাতীয় পক্ষ কখনও মেহতা মজলিসকে মহাসভা বলিয়া স্বীকার করিবে না। সেই মজলিসে ঢুকিবার জন্য লালায়িত নহে। ক্রীড সহি করিতে কোনও কালে রাজী হইবে না।··· ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন মহাসভার দাবী বলিয়া কলিকাতায় স্থির হইয়াছিল। যদিও ইহাতে আমাদের মত ছিল না, তথাপি অধিকাংশ

প্রতিনিধির মত বলিয়া আমরা ইহাই মানিয়া লইলাম।…ক্রীডে সহি করা এবং ইহাতে মত দেওয়া, একই কথা।"

"ক্রীডে সহি করা জাতীয় আদর্শের অপমান, জাতির অপমান, জাতীয়তার অপমান—মাতৃভক্ত নিগৃহীত ভারতসন্তানদের অপমান করা হইবে। যদি আমরা যুদ্ধে পরাজিত, সন্ধিভিক্ষাপ্রার্থী হইতাম, তাহা হইলে মধ্যপন্থীদের আবদার বুঝিতাম। আমরা পরাজিতও নহি, ভিক্ষাপ্রার্থীও নহি। দেশের হিতের জন্য, দেশবাসীর বাসনা বলিয়া যুক্ত মহাসভা করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, নচেৎ আমাদের বল আছে, তেজ আছে, সাহস আছে, ভবিষ্যত আমাদের পক্ষে, দেশবাসী আমাদের পক্ষে, যুবকমণ্ডলী আমাদেরই, আমরা স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়াইতে সর্বদা প্রস্তুত।"

বোম্বাই মডারেটরা চরমপন্থীদের একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিলেন। এক অরবিন্দ ভিন্ন জাতীয়দলের আর কোনও নেতাই এখন ভারতবর্ষে নাই। অরবিন্দের মিলিত-কংগ্রেসের স্বপ্ন হাওয়ায় মিলিয়া গেল। স্বীকার করিতেই হইবে, মডারেটদের নিকট জাতীয়দলের নেতা হিসাবে অরবিন্দের পরাজয় ঘটিল। এই পরাজয়ের ক্ষোভ তাঁহার মনে নিরাশার সঞ্চার করিবে, ইহা আমরা দেখিতে পাইব। ১২ই পৌষ "ধর্ম" পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিলেন—

"**আবার জাগো** : বঙ্গবাসী অনেক দিন ঘুমাইয়া রহিয়াছ, যে নব জাগরণ হইয়াছিল, যে নব প্রাণসঞ্চারক আন্দোলন সমস্ত ভারতকে আন্দোলিত করিয়াছিল, তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে।…যে মিলনের আশায় এতদিন অপেক্ষা করিয়াছিলাম সে আশা ব্যর্থ। মধ্যপন্থী দল জাতীয় পক্ষের সহিত মিলিত হতে চায় না, গ্রাস করিতে চায়।…কিন্তু আর উদ্দাম উত্তেজনার বশে যেন কোন কার্য্য না কর।"

উপরের এই কয়েক ছত্রে অরবিন্দের মনের ভাব সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে! যে অবস্থার মধ্যে পড়িয়া তাঁহার মতি ও গতি পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে, তাঁহার "আশা ব্যর্থ" হইয়াছে, আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

২১শে ডিসেম্বর নাসিকের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্যাকসনকে গুপ্তহত্যা করা হইল। সন্ত্রাসবাদ মারাঠা হইতেই অরবিন্দ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় আনিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পুণায় র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টকে গুপ্ত হত্যা করা হয়। সন্ত্রাসবাদীদের ইহাই প্রথম গুপ্তহত্যা। বাঙ্গলায় তখন ইহার নামগন্ধও ছিল

না। কিন্তু নাসিকে মিঃ জ্যাকসনের গুপ্তহত্যা সম্ভবতঃ বাঙ্গলার সন্ত্রাসবাদের ছোঁয়াচ হইতেই হইয়া থাকিবে। বাঙ্গলা হইতেই সন্ত্রাসবাদ এখন বিলাতে যাইতেছে—আমেদাবাদ যাইতেছে—নাসিকেও গেল।

অরবিন্দ (১২ই পৌষ) 'ধর্ম' পত্রিকায় লিখিলেন—

"**নাসিকে খুন** ঃ নাসিকবাসী সবারকর কয়েকটি উদ্দাম কবিতা লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইংরেজ বিচারালয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হইলেন। সবারকরের অল্পবয়স্ক বন্ধু নাসিকের কলেক্টার জ্যাকসনকে হত্যা করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইলেন (২১শে ডিসেম্বর, ১৯০৯)।..অন্ধকারেই হত্যাকারীর সুবিধা, নীরবতার মধ্যে উন্মত্ত রাষ্ট্রবিপ্লবকারীর পিস্তল ও বোমার শব্দ ঘন ঘন শোনা যায়, নিরাশাই গুপ্তসমিতির আশা। যাহাতে এই রাজনীতিক হত্যা অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি দেশ হইতে উঠিয়া যায়, আমরাও তাই চেষ্টা করিতে চাই।"

"উদ্দাম কবিতা" লিখিবার জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, ইহা লঘু পাপে গুরু দণ্ড। কিন্তু ইহাই আবার নিগ্রহ-নীতি। এবং নিগ্রহ-নীতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ গুপ্তহত্যা। অরবিন্দ এই রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার প্রবৃত্তি যাহাতে "দেশ হইতে উঠিয়া যায়" তাহার চেষ্টা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। অবস্থাধীনে ও পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনে ইহাই যদি এখন অরবিন্দের অকপট অভিমত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বিপিন পাল "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় "Golden Bengal Scare" প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, অরবিন্দ তখন তাহার প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও, এখন আবার বিপিন পালের মতে ফিরিয়া আসিতেছেন। তিনি নাসিকে খুনের পর সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য করিয়া স্পষ্টই লিখিলেন, "আর উদ্দাম উত্তেজনার বশে যেন কোন কার্য্য না কর।"

সরোজিনী নাইডু ও নাসিক হত্যা : বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা। বিলাতে কার্জ্জন উইলির হত্যার পর, বিলাতের "টাইমস" পত্রে, হত্যাকারী পাঞ্জাবী যুবক ধিঙ্ড়ার প্রশংসা করিয়া বীরেন্দ্রনাথ এক পত্র লিখিলেন। ইহাতে বীরেন্দ্রনাথের ভগিনী সরোজিনী টাইমসে হায়দরাবাদ হইতে দুইখানি পত্র লিখিয়া বলিতেছেন, "বীরেন্দ্রনাথের সহিত আমাদের এক্ষণে আর কোনও সংস্রবই নাই। সুতরাং তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের জন্য আমরা কোন অংশেই দায়ী নহি। আমি, আমার পিতা এবং

আমাদের পরিবারবর্গের সকলে নিজামভক্ত ও ব্রিটিশভক্ত। বীরেন্দ্রনাথ বিগড়াইয়া গিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।”—[“ধর্ম্ম”, ১২ই পৌষ]

অরবিন্দ ইহার উপর কোনও মন্তব্য করিলেন না, শুধু লিখিলেন—“মদনলালের জ্ঞাতিবর্গও মদনলালের কাণ্ডের পর এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিল।”

অরবিন্দের নির্ব্বাসন-বিভীষিকার দ্বিতীয় দফা : আমরা দেখিয়াছি যখনই একটা গুপ্তহত্যা হয় তার পরই অরবিন্দকে নির্ব্বাসনের গুজব রটে এবং এই গুজবের উত্তরে অরবিন্দ তাঁহার দেশবাসীকে “খোলা-চিঠি” লিখিয়া তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকেন। কার্জ্জন উইলীর হত্যার পর তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন। নাসিকে হত্যার পরেও তিনি দ্বিতীয়বার “কর্ম্মযোগীন্”-এ তাঁহার দেশবাসীকে (২৫শে ডিসেম্বর) এক “খোলা-চিঠি” (“To My Countrymen”) লিখিলেন।

কতকগুলি সংবাদ : (১) বারীন, উল্লাসকর প্রভৃতির ফাঁসির হুকুম রদ হইয়া হাইকোর্টে আপিলের রায়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হইল। “মহারাজা” ষ্টিমার ১২ই ডিসেম্বর, রবিবার প্রাতে বারীন প্রভৃতিকে লইয়া আন্দামান রওনা হইল।

(২) রমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু হইল। লালমোহন ঘোষের মৃত্যুর অল্প পরেই ভারতবর্ষ রমেশচন্দ্র দত্তকে হারাইল। অরবিন্দ রমেশচন্দ্রের উপর বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের পুস্তকাবলী বাঙ্গলার স্বদেশীকে বহু পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে, উদ্দীপনা ও প্রেরণা দিয়াছে।

(৩) **লাহোর কংগ্রেস :** “বঙ্গদেশ হইতে সুরেনবাবু ও ভূপেনবাবু প্রমুখ নয় জন ব্যক্তি লাহোরে পদার্পণ করিয়াছিলেন।···বঙ্গদেশের কলিকাতা ব্যতীত অন্যান্য কোন স্থান হইতে একজনও প্রতিনিধি প্রেরিত হয় নাই।··· আমরা আশা করি, পুরাতনের আমূল ধ্বংস। তার চিতাভস্মের উপরই নূতন তাহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে।”—[“ধর্ম্ম”, ১৯শে পৌষ]

(৪) অরবিন্দ লিখিলেন—“মিঃ গান্ধীর নেতৃত্বে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ভারতবর্ষ অপেক্ষা ট্রান্সভালে অধিকতর কার্য্যকরী হইতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে—ট্রান্সভালের কুলীদের অপেক্ষাও কি আমরা হীন?”

(৫) সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর লাহোরে ব্রাড্‌লো হলে বক্তৃতা—"ধর্ম্ম" পত্রিকায় ১৯শে পৌষ সংবাদ বাহির হইল—

"সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী ব্রাড্‌লো হলে বক্তৃতা দিয়া বাহিরে আসিলে দেখা গেল দেওয়ালে নোটিশে লেখা আছে—পাঞ্জাবীরা বোমা ব্যবহার কর, অলসের মত বসিয়া থাকিও না এবং ইংরেজ মার।"

মডারেটরা কংগ্রেস, কনফারেন্স ও সাধারণ সভাসমিতিতে অরবিন্দ-পরিচালিত জাতীয়দলের বিরুদ্ধে পূর্ণ মাত্রায় বর্জ্জন-নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। ওদিকে গভর্ণমেন্টের নিগ্রহ-নীতি, এদিকে সন্ত্রাসবাদীদের বিভীষিকাপূর্ণ গুপ্তহত্যা—চতুর্দ্দিকে পরিস্থিতির এই উত্তাপ ক্রমশঃ অরবিন্দের পক্ষেও সহ্য করা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। দুই মাস পর, অরবিন্দের চন্দননগর প্রস্থানের কারণ হঠাৎ একদিন বা এক মুহূর্ত্তে উপস্থিত হয় নাই। অনেক আগে হইতেই ইহার সূত্রপাত হইয়াছে।

১৯১০ জানুয়ারী ঃ ইংরেজী নূতন বৎসর আরম্ভ হইল। কলিকাতায় পৌষের শীত পড়িয়াছে।

অরবিন্দ ৩৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় এই শেষ শীতকাল কাটাইয়া যাইতেছেন। সুজলা-সুফলা-মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির শীত ও গ্রীষ্ম আর এ জীবনে তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না। "কর্ম্মযোগীন্‌" ও "ধর্ম্ম" পত্রিকার অফিস ১৪ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট হইতে ৪ নং শ্যামপুকুর লেনে উঠিয়া গেল।

"ধর্ম্ম" পত্রিকায় ১৯শে পৌষ, অরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে লিখিলেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবিষ্যৎ ভারত ঃ "যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টিস্বরূপ তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই—একথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশ্বাস, যাহা তিনি মুখে বলেন নাই, তাহা তিনি কার্য্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রেমিকতা তাঁহার নিজের দান। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার পরম পূজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান।......তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) জন্ম হইতেই বীর, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিতেন, 'তুই যে বীর

রে।' তিনি জানিতেন যে, তাঁহার ভিতর যে শক্তিসঞ্চার করিয়া যাইতেছেন, কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্য্যকরজালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীর ভাব সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগকে বেপরওয়া হইয়া দেশের কার্য্য করিতে হইবে এবং অহরহ এই ভগবৎ বাণী স্মরণ পথে রাখিতে হইবে, 'তুই যে বীর রে' (* ক)।"

গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে যাঁহার ঘরে দক্ষিণেশ্বরের মাটি সযত্নে রক্ষিত ছিল, সেই অরবিন্দের পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে এরূপ লেখাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বরং ইহা খুব স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। দেশের যুবকগণকে নির্ভীক হইয়া দেশের কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য অরবিন্দ স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টান্তকে উজ্জ্বল করিয়া ধরিতেছেন এবং লিখিতেছেন, "আমাদের যুবকগণকেই এই বীর ভাব সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগকে বেপরওয়া হইয়া দেশের কার্য্য সাধন করিতে হইবে।"

আবার—তৃতীয়বার—অরবিন্দকে নির্ব্বাসনের কথা উঠিল। অরবিন্দ "কর্ম্মযোগিন্" পত্রিকায় "Menace of Deportation" বলিয়া প্রবন্ধ লিখিলেন। "ধর্ম্ম" পত্রিকায় ২৬শে পৌষ (৮ই জানুয়ারী) অরবিন্দ লিখিলেন—

অরবিন্দের নির্ব্বাসন বিভীষিকার ৩য় দফা : "আমাদের পুলিশ বন্ধুগণ রটনা করিয়াছেন যে, আবার নির্ব্বাসনরূপ ব্রহ্ম অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবে। এই বার নয় জন নহে, চব্বিশ জনকে। পুলিশের এই তালিকায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ নাকি প্রথম নম্বর পাইয়াছেন। আমরা কখন বুঝিতে পারি নাই, নির্ব্বাসন

(* ক) ৺চারুচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছিলেন যে—"শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় যে-সমস্ত লেখা বাহির হইয়াছিল, তাহা অরবিন্দ লেখেন নাই।" ইহার প্রতিবাদ করিয়া ৺রামচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছিলেন—"ধর্ম্ম পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি (শ্রীঅরবিন্দ) কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' তাঁহারই লিখিত। ইহা আমি বিশেষভাবেই জানি।"—("উদ্বোধন"—ভাদ্র, ১৩৫২—পৃঃ ২৩০)। ৺চারুচন্দ্র দত্ত অরবিন্দ সম্পর্কে আরও অনেক কথা লিখিয়াছিলেন, যাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। ৺ দত্ত এই প্রমাণের বিরুদ্ধে তাঁহার জীবিতকালে কোনও জবাব পর্য্যন্ত দিতে পারেন নাই। আমরা ৺রামচন্দ্র মজুমদারের কথাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছি।

এমন কি ভয়ঙ্কর জিনিস যে লোকে নির্ব্বাসন নাম শুনিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া দেশের কার্য্য, কর্ত্তব্য, মনুষ্যত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে ঘরের কোণে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়ে।······বাহিরে পরিশ্রম করিতেছিলাম, নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে দেশসেবা করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, না হয় ভগবান লর্ড মিণ্টো বা মর্লীকে যন্ত্র করিয়া বলিলেন—যাও, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক, নির্জ্জনে আমার চিন্তা কর, ধ্যান কর, পুস্তক পড়, পুস্তক লেখ, জ্ঞান সঞ্চয় কর, জ্ঞান বিস্তার কর। জনতায় থাকার রস আস্বাদন করিতেছিলে, নির্জ্জনতার রস আস্বাদন কর, এই এমন কি ভয়ানক কথা যে ভয়ে কাতর হইতে হয়? ···ভারতের স্বাধীনতা না হয় স্থাপন করিতে পারিলাম না, ভারতের স্বাধীনতা ভোগ করিতে আসিব, কেহ আমাকে বারণ করিতে পারিবে না। এত ভয় কিসের?···ট্রান্সভালের কুলীদের মহৎভাব এবং ভারতের শিক্ষিত লোকের এই জঘন্য কাতরভাব দেখিয়া লজ্জিত হইতে হয়।···"

"**নির্ব্বাসন অসম্ভব :** ২৪ জনকে নির্ব্বাসন করুন বা ১০০জনকে নির্ব্বাসন করুন; অরবিন্দ ঘোষকে নির্ব্বাসন করুন বা সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীকে নির্ব্বাসন করুন—কালচক্রের গতি থামিবার নয়।"

গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী শামসুল আলমকে হত্যার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে অরবিন্দকে নির্ব্বাসনের জন্য তৃতীয়বার গুজব রটিল। ইহার সাড়ে চার মাস পূর্বে (১লা সেপ্টেম্বর) মিঃ রিজ নামে পার্লামেণ্টের এক সভ্য বলিয়াছিলেন—

"ঘোষ নামে একটা লোক (শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষই ইহার উদ্দিষ্ট) অতিকষ্টে কারাদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে; এখন সে যুবকদিগকে বলিতেছে, কারাক্লেশ যতটা ভয়াবহ মনে হয় ততটা ভয়াবহ নহে; সুতরাং তাহারা যেন কাপুরুষ হইয়া না যায়। ভারত গভর্ণমেণ্ট অচিরে ইহাকে নির্ব্বাসিত করুন।"—["ধর্ম্ম"—"রিজের বিবোদগার"]

বাঙ্গলার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। ঝড় উঠিবার সম্ভাবনা। কবির ভাষায় বলা যায়—"তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি।" অরবিন্দের প্রস্থানের কারণ একে একে পুঞ্জীভূত হইতেছে।

২৪শে জানুয়ারী হাইকোর্টে গোয়েন্দা শামসুল আলমকে সন্ত্রাসবাদীরা হত্যা

করে। "কর্ম্মযোগিন"-এ লেখা হইল—"The victim was the right-hand man of Mr. Norton in Alipore Bomb case."

গোয়েন্দা আলম খুন: "গত সোমবার ৫-১০ মিনিটের সময় কলিকাতা হাইকোর্টে, আন্দাজ বিশ বৎসর বয়স্ক একজন যুবক গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী শামসুল খাঁ বাহাদুরকে গুলি করিয়া মারিয়াছে। মিঃ আলম গত ১৯০৮ অব্দের মে মাস হইতে আলিপুরের বোমার মামলার তদ্বির করিতেছিল এবং আশু বিশ্বাসের হত্যার পূর্বে আশুবাবুর ও পরে ঐ মামলায় আলিপুরের দায়রায় এবং হাইকোর্টে নর্টন সাহেবের-দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া কাজ করিতেছিল। হাইকোর্টে যে বোমার মামলা এখন চলিতেছে, তাহার তদ্বিরও আলম করিতেছিল এবং গত সোমবার প্রায় সমস্ত দিনই সে আদালতে হাজির ছিল। পাঁচটা বাজিতে যখন দশ মিনিট বাকী তখন জজ উঠিলে আলম তাহার কাগজপত্র সমস্ত গুছাইয়া রাখিয়া কতকগুলি ভদ্রলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে বাহিরে আসে। যে ঘুরান পাথরের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলে ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে আসা যায়, আলম যখন সেই সিঁড়ির কাছে আসিয়াছে, তখন প্রায় ১৯৷২০ বৎসরের একজন যুবক পশ্চাৎ দিক হইতে তাহার নিকট আসিয়া আলোয়ানের ভিতর হইতে রিভলবার বাহির করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে গুলি করে। যুবকটিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আলম তখন একবার খুব চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। শাদী চাপরাসীকে পাকড়ো পাকড়ো বলিয়া তৎক্ষণাৎ সটান্ চিৎ হইয়া পড়িয়া যায় এবং দু একবার গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া মরিয়া যায়। গুলি খাওয়ার ৩৷৪ মিনিট পরে আলম মরিয়া যায়।"—["ধর্ম্ম"—১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী)]

বারীন্দ্র প্রভৃতি আন্দামানে রওনা হইবার প্রায় দেড়মাস পরে গোয়েন্দা আলমকে হত্যা করা হইল। সন্ত্রাসবাদ ফাঁসি বা দ্বীপান্তরেও মরিল না। ২৯শে জানুয়ারী, আলমকে হত্যার পাঁচদিন পর, অরবিন্দ "কর্ম্মযোগিন্"-এ লিখিলেন, "হাইকোর্টে আলমকে হত্যা, হত্যাকারীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।"

"Boldest of the many bold acts of violence. They (the terrorists) prefer public places and crowded buildings—

Nasik-London-Calcutta—Goswami in jail—these are remarkable features."

অরবিন্দ "boldest of the bold" বলায় একহিসাবে প্রশংসাই করিলেন। নিন্দার মত তো শুনাইল না।

গোয়েন্দা আলমের খুন অরবিন্দের প্রস্থানাভিমুখের গতিকে ত্রস্ত করিয়া তুলিবে, ইহা আমারা এক মাস পরেই দেখিতে পাইব।

আমরা স্বদেশী আন্দোলনের গতিমুখে তিনটি অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছি—ধুমায়িত, প্রজ্জ্বলিত, নির্ব্বাপিত। বরিশাল কন্‌ফারেন্স (১৯০৬ খৃঃ)-এর পূর্ব্বে ধুমায়িত, বরিশাল কন্‌ফারেন্সের পর হইতে চার বৎসর প্রজ্জ্বলিত, এবং অরবিন্দের চন্দননগরে প্রস্থানের কিছু পূর্ব হইতে (১৯১০ খৃঃ) নির্বাপিত অবস্থার সূচনা দেখা যায়। অরবিন্দ এই নির্ব্বাপিত অবস্থাকে পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং ব্যর্থমনোরথ হইয়া রাজনীতি ও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া চন্দননগর প্রস্থান করেন। প্রস্থানের দুই মাস পূর্ব্বে এই নির্বাপিত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অরবিন্দ লিখিতেছেন—

"**ভারতের নিদ্রা** ঃ ৪ বৎসর গিয়াছে, ৫ম বৎসর চলিতেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে কি সেই অপূর্ব আবেশ ক্ষীণ হইয়া গেল, সেই আশাতীত জাগরণ আবার তামসিক নিশ্চেষ্টতায়, নীচ ক্ষুদ্রাশয়তায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল? ·· এখনও আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আমার দেশ' গান করিয়া বলি—মানুষ আমরা নহি ত মেষ। আকারে মানুষ বটে, কিন্তু কার্য দেখিলে মেষ অপেক্ষা ভীরু ও নিরীহ বলিতে বাধ্য হইলাম।"—["ধর্ম্ম", ২৬শে পৌষ, ১৩১৬, পৃঃ ৪-৫]

একটি কথা লক্ষ্য করিবার বিষয়—অরবিন্দ ১২ই পৌষ, ১৩১৬ (১৯০৯, ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে) "ধর্ম্ম" পত্রিকায় সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য করিয়া লিখিলেন—"আর উদ্দাম উত্তেজনার বশে যেন কোন কার্য না কর"—(ধর্ম্ম, পৃঃ ৩)। আবার দুই সপ্তাহ পর (২৬শে পৌষ—১৯১০।জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে) ঐ পত্রিকায় স্পষ্ট লিখিলেন, "আমরা উদ্দাম আচরণ করিতে নিষেধ করি"—(ধর্ম্ম, পৃঃ ৪)। সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি এই দুই দুই বারের নিষেধ-বাণী শামসুল আলম্ হত্যার (১৯১০।২৪শে জানুয়ারী) মাত্র দুই-তিন সপ্তাহ আগের ঘোষণা।

যে-সময় অরবিন্দ এই নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিতেছেন, ঠিক সেই সময় শামসুল আলম্ হত্যার আয়োজন চলিতেছে। এবং অরবিন্দকে নির্ব্বাসন করিবার গুজব পুলিশ তৃতীয়বার রটনা করিতেছে। খুব জোর গুজব চলিতেছে। অরবিন্দ এই নির্ব্বাসনের গুজবকে বিভীষিকা আখ্যা দিয়াও লিখিতেছেন—"অরবিন্দ ঘোষকে নির্বাসন করুন, কিন্তু কালচক্রের গতি থামিবার নয়।" আমাদের প্রশ্ন—শামসুল আলম্ হত্যার আয়োজন-উদ্যোগের খবর কি অরবিন্দ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন? এবং এই আসন্ন হত্যাকাণ্ডে প্রকাশ্যে নিষেধাজ্ঞা ও গোপনে অনুমোদন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন? আমরা অনেক রকম কথাই শুনিয়াছি। শুনিয়াছি—অরবিন্দ শামসুল আলম্ হত্যায় অনুমতি দিয়াছিলেন।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী হইবে) অরবিন্দ 'ধর্ম' পত্রিকায় লিখিতেছেন—

"**আইন ও হত্যাকারী :** লাট সাহেব সমস্ত ভারতের উপর কেন এই অনুগ্রহ করিয়াছেন, তা বলা কঠিন। অনেকে বলে, হত্যা ও ডাকাতি হইতেছে বলিয়া এই সভা-নিষেধ ঘোষণা। গুপ্তহত্যাকারী ও রাজনীতিক ডাকাত যে এই ভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্রে ভীত হইবে, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। তাঁহারা যে কুড়ি জন মিলিয়া 'প্রকাশ্য সভা' করিতে অভ্যস্ত, ইহা কখনও শুনি নাই। ৬ মাস কারাদণ্ডের ভয়ে তাঁহারা যে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনারের নিকট অনুমতি লইয়া গুপ্তহত্যা বা ডাকাতির পরামর্শ করিতে বসিবেন, তাহার সম্ভাবনাও অত্যল্প।...এতদিন কি সভাসমিতি বন্ধ ছিল না? চরমপন্থী দলের সভাসমিতি অনেক দিন লোপ পাইয়াছে, মধ্যপন্থী নেতাগণ নির্ব্বাসনের পরে আর সভাসমিতিতে যোগদান করা বন্ধ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে কলেজস্কোয়ারে যে স্বদেশী সভা হয়, তাহাতে কোন বিখ্যাত বক্তাও উপস্থিত হন না, দর্শকমণ্ডলীও সংখ্যায় নগণ্য।...শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ জেল হইতে আসিবার পরে কয়েকদিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন বটে, তিনিও হুগলী প্রাদেশিক সভার পরে নীরব হইয়া পড়িয়াছেন।"

অরবিন্দ স্পষ্ট লিখিতেছেন যে—গভর্ণমেণ্টের সভা-নিষেধ আজ্ঞার পূর্ব্বেই মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীরা সভাসমিতিতে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। নিজের সম্বন্ধে লিখিতেছেন যে—তিনিও হুগলী কন্‌ফারেন্সের পর নীরব হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি লাহোর-কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারেন নাই।

এবং তিনি স্থির ও দৃঢ় বিশ্বাসে লিখিতেছেন যে, গুপ্তহত্যাকারী ও রাজনৈতিক ডাকাত এই সভা-নিষেধ আজ্ঞায় ভীত হইবে না—তাহাদের কাজ তাহারা করিয়া যাইবে। সুতরাং, অরবিন্দের নিষেধ-আজ্ঞাও তাহারা শুনিবে না। শামসুল আলম্ হত্যার মাত্র এক সপ্তাহ পূর্ব্বে অরবিন্দ তাঁহার এই মত প্রকাশ করিলেন।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী হইবে) 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিলেন—

"**আমরা কি নিশ্চেষ্ট থাকিব?**—এখনও বিপ্লবকারিগণ লোকের মন গুপ্তহত্যা ও বলপ্রয়োগের পথে টানিতে পারে নাই, কিন্তু কবে টানিতে পারিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। একবার সেই অনর্থ ঘটিলে গভর্ণমেণ্টের বিপদ এবং দেশের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না। আমরা এই আশঙ্কায় এবং দেশের নবজীবন রক্ষার আশায় জাতীয় পক্ষ সুশৃঙ্খলিত করিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল যে, স্বাধীনতা লাভের নির্দ্দোষ পন্থা দেখাইতে পারিলে দেশ হইতে গুপ্তহত্যা উঠিয়া যাইবে। এখন বুঝিলাম ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সেই পন্থা অবলম্বন করিতে দিবেন না। এই অবস্থায় স্বভাবতঃ এই চিন্তা মনে আসে: তাহাই হউক, তাঁহাদের যখন এই ধারণা যে আরও উগ্র দণ্ডনীতি প্রয়োগ করিলে রোগের উপশম হইবে, তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া দণ্ডনীতি প্রয়োগ করুন। আমরা চুপ করিয়া দেখি কিসেতে কি হয়; আমরা ভ্রান্ত, না তাঁহারা ভ্রান্ত। যখন ইংরেজ রাজনীতিবিদগণ নিজেদের ভুল বুঝিবেন, তখন আমাদের কর্ম্মের সময় আসিবে। এই পন্থাকে masterly inactivity, ফলবতী নিশ্চেষ্টতা বলা যায়।"—['ধর্ম্ম'—৪ঠা মাঘ, ১৩১৬; পৃঃ ৩-৪]

"আমরা কি নিশ্চেষ্ট থাকিব?"—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অরবিন্দ নিজেই উত্তর দিতেছেন: আমরা চুপ করিয়া দেখি, কিসেতে কি হয়। ইহার অর্থ গভর্ণমেণ্টের নিগ্রহনীতি ও গুপ্তহত্যাকারীর বোমা-রিভলভারের গুলিবর্ষণ, এই উভয়ের সংঘর্ষে কী ফল দাঁড়ায়!—'masterly inactivity'র পন্থাই, দেশবাসীকে খোলসা বলিয়া, বাছিয়া লইতেছেন। তারপরে লিখিতেছেন—

"**চেষ্টার উপায়**—যদি শেষে গভর্ণমেণ্ট জাতীয় শিক্ষা-পরিষদকে বে-আইনী জনতা বলিয়া জাতীয় বিদ্যালয়সকল বন্ধ করে; শিক্ষা দেওয়া, স্বদেশী কাপড় পরা, বিদেশী মাল না কেনা, সালিশীতে কলহ মিটানকে গুরুতর অপরাধ বলিয়া সশ্রম কারাবাস বা দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করেন; আর যদি ট্রান্সভালবাসী কুলি

ও দোকানদারদের সাহস, দেশহিতৈষিতা ও স্বার্থত্যাগ আমাদের গায়ে ন থাকে, তাহা হইলে না হয় পুলিশ ও গুপ্তবিপ্লবকারীর পন্থা আর রোধ করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া সরিয়া পড়িব। সেই পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখা যাক।" —["ধর্ম্ম"—৪ঠা মাঘ, ১৩১৬ ; পৃঃ ৪]

অরবিন্দ ট্রান্সভ্যালে মিঃ গান্ধী-পরিচালিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পন্থাও ভারতবাসীকে অবলম্বন করিতে বলিলেন।

পুলিশ ও বিপ্লবকারীর পন্থা আর রোধ করা—অরবিন্দ নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছেন। কেননা, ইহার একজন না থামিলে আর একজন থামিবে না। অথচ ইহাদের দুইজনের কেহই থামিতে প্রস্তুত নয়। কাজেই অরবিন্দ খোলসা লিখিতেছেন যে, 'সরিয়া পড়িব'। চন্দননগর প্রস্থানের দেড় মাস পূর্ব্বে অরবিন্দ স্থির করিলেন যে, তিনি নিরুপায় হইয়া সরিয়া পড়িবেন। এবং একথা তিনি প্রকাশ্যে দেশবাসীকে লিখিয়া জানাইলেন। আর একথাও লিখিলেন যে, আধ্যাত্মিক শক্তির (soul force) বলে, "সূক্ষ্ম ও স্থূল উপায়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে।" এই "সূক্ষ্ম উপায়" নিশ্চয়ই যোগের পথ। তিনি 'ধর্ম্ম' পত্রিকার ঐ সংখ্যাতেই লিখিতেছেন—

"**আমাদের আশা**—আমাদের বাহুবল নাই, যুদ্ধের উপকরণ নাই, শিক্ষা নাই, রাজশক্তি নাই—আমাদের কিসেতে আশা, কোথায় সেই বল, যাহার ভরসায় আমরা প্রবল শিক্ষিত ইউরোপীয় জাতির অসাধ্য কাজ সাধিত করিতে প্রয়াসী হই? পণ্ডিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন—ইহা বালকের উদ্দাম দুরাশা, উচ্চ আদর্শের মদে উন্মত্ত অবিবেকী লোকের শূন্য স্বপ্ন। যুদ্ধই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পন্থা, আমরা যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, আমরাও যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিই নাই।

"কিন্তু ইহা কি সত্য কথা যে—বাহুবলই শক্তির আধার, না শক্তি আরও গূঢ় গভীর মূল হইতে নিঃসৃত হয়?…,কোন্ শক্তিতে দুর্বল পক্ষের জিত হয়, প্রবল পক্ষের শক্তি পরাজিত বা বিনষ্ট হয়? আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত-সকল পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারিব, আধ্যাত্মিক শক্তির বলে এই অঘটন ঘটিয়াছে, আধ্যাত্মিক শক্তিই এই বাহুবলকে তুচ্ছ করিয়া মানবজাতিকে জানায় যে, এই জগৎ ভগবানের রাজ্য, অন্ধ স্থূল প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র নহে।…

"য়ুরোপ আজকাল এই soul force বা আধ্যাত্মিক শক্তিকে আবিষ্কার

করিতেছে, এখনও তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই, তাহার ভরসায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না।

"কিন্তু ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা, গৌরব, বল, মহত্ত্বের মূলে আধ্যাত্মিক শক্তি। যতবার ভারতজাতির বিনাশকাল আসন্ন বলিয়া সকলের প্রতীতি হইবার কথা ছিল, আধ্যাত্মিক বল গুপ্ত-উৎস হইতে উগ্রস্রোতে প্রবাহিত হইয়া মুমূর্ষু ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে। এখনও সেই উৎস শুকাইয়া যায় নাই, আজও সেই অদ্ভুত মৃত্যুঞ্জয় শক্তির ক্রীড়া হইতেছে।—(পৃষ্ঠা ৫)

"ভারতীয় সভ্যতার বলে, আধ্যাত্মিক শক্তিতে, আধ্যাত্মিক শক্তিতে সৃষ্ট, সূক্ষ্ম ও স্থূল উপায়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে। সেইজন্য ভগবান আমাদের পাশ্চাত্য ভাবযুক্ত আন্দোলন ধ্বংস করিয়া বহির্ম্মুখী শক্তিকে অন্তর্মুখী করিয়াছেন।

"ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় দিব্যচক্ষুতে যাহা দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া বার বার বলিতেন—'শক্তিকে অন্তর্মুখী কর'—কিন্তু সময়ের দোষে তখন কেহ তাহা করিতে পারে নাই, স্বয়ং করিতে পারেন নাই, কিন্তু ভগবান আজ তাহা ঘটাইয়াছেন।

"ভারতের শক্তি অন্তর্মুখী হইয়াছে, যখন আবার বহির্ম্মুখী হইবে আর সেই স্রোত ফিরিবে না। সেই ত্রিলোকপ্লাবনী গঙ্গা ভারত প্লাবিত করিয়া অমৃতস্পর্শে জগতের নূতন যৌবন আনয়ন করিবে"—(পৃষ্ঠা ৬)।—['ধর্ম্ম'—৪ঠা মাঘ, ১৩১৬]

অরবিন্দ বলিলেন, 'আমাদের যুদ্ধের উপকরণ নাই' এবং তিনিও রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দেন না। যুদ্ধের পরিবর্ত্তে, আধ্যাত্মিক শক্তির "সূক্ষ্ম ও স্থূল" উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। সূক্ষ্ম উপায়টি বোঝা যাইবে না, কিন্তু স্থূল উপায়টিও পরিষ্কার বলা হইল না।

অরবিন্দ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করিয়া "শক্তিকে অন্তর্মুখী" করিলেন, ভারতের শক্তি অরবিন্দের মধ্যে অন্তর্মুখী হইতে চলিল! অরবিন্দের পণ্ডিচারীর ভবিষ্যৎ-জীবনের সূত্রপাত আমরা তাঁহার চন্দননগর-প্রস্থানের দেড় মাস পূর্ব্বেই দেখিতে পাইলাম।

গভর্ণমেণ্টের নিগ্রহ-নীতি ও সন্ত্রাসবাদের সংঘর্ষের ফলে চারিদিকে যে

আগুন জ্বলিয়া উঠিল, সপ্তাহের 'সংবাদ'গুলির মধ্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—

"**ভারতীয় সংবাদ**—(১) লাহোরে বাঙ্গালী গ্রেপ্তার, (২) লাহোরে রাজদ্রোহ, (৩) দক্ষিণ মহারাষ্ট্র দেশে যুদ্ধ ঘোষণা : "স্যার জর্জ বার্ডউড টাইমস্ পত্রিকায় লিখিয়াছেন—দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশ ইংরেজের বিরুদ্ধে হিন্দুর মন্দিরে মন্দিরে নাকি যুদ্ধ-ঘোষণা-সূচক মন্ত্রাদি পাঠ এবং প্রতিজ্ঞাবন্ধন চলিতেছে।" (৪) নাসিকের হত্যাকাণ্ড—"খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার অবিরাম স্রোতে চলিয়াছে।" (৫) লাহোরে বিপ্লববাদীদের কাণ্ড, (৬) আবার ট্রেনে গুলি—"গত বৃহস্পতিবার শিয়ালদহের সন্নিকটে ৫৭নং আপ ট্রেনে কে বন্দুক ছুড়িয়াছিল।" (৭) কাশ্মীরে বিপ্লব-ভয়, (৮) ময়মনসিংহে ডাকাতি, (৯) মিঃ জ্যাক্‌সনের হত্যাকাণ্ডে প্রতিবাদ সভা, (১০) বিপ্লবের প্রতিবাদ, (১১) ছোটলাটের প্রাণনাশ চেষ্টা, (১২) নেতরার ডাকাতি, (১৩) লাহোরে অধ্যাপক পরমানন্দ গ্রেপ্তার, (১৪) আম্বালায় খানাতল্লাসী, (১৫) পাতিয়ালায় রাজদ্রোহ, (১৬) বাহ্রার ডাকাতির জের, (১৭) লক্ষ্মৌয়ে ৬ জন বাঙ্গালীর খানাতল্লাস।"—["ধর্ম্ম", ৪ঠা মাঘ, ১৩১৬]

উপরের সংবাদগুলি 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে। উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ ব্যতিরেকে বাঙ্গালার সন্ত্রাসবাদ মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে; চারিদিকের পরিস্থিতির মধ্যে যেন স্বয়ং ছিন্নমস্তা আবির্ভূতা হইয়া এক নিদারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছেন। জাতীয় দল নেতাশূন্য। বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে একা অরবিন্দ কোন দিক সামলাইতে পারিতেছেন না।—ইহা শামসুল আলম্ হত্যার মাত্র এক সপ্তাহ পূর্ব্বের খবর।

মিঃ গান্ধী ও মিঃ পোলক : মিঃ গান্ধী এই সময় ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তিনি ও মিঃ পোলক ১৯১০।১৮ই জানুয়ারী আগ্রা টাউনহলে বক্তৃতা করিলেন। তিনি ট্রান্সভালবাসীর জন্য অর্থ-সাহায্য চাহিলেন এবং নাসিকে মিঃ জ্যাকসনের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করিলেন। তিনি অরবিন্দের মত এই হত্যাকাণ্ডকে "boldest of the many bold acts of violence" বলিয়া অভিহিত করিলেন না। ১৯০৬ খৃঃ হইতেই মিঃ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় শান্তভাবে আইন-অমান্য করিয়া, দলে দলে ভারতীয় কুলিদের লইয়া জেলে গমন আরম্ভ করিয়াছেন। বিপিন পাল যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের তত্ত্ব ১৯০৬

বাঙ্গালাদেশে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাখ্যা ও প্রচার করিয়াছেন, ঠিক সেই বৎসরেই মিঃ গান্ধী ইহা দক্ষিণ আফ্রিকায় হাতেকলমে দেখাইতে সুরু করিয়াছেন। কিন্তু ১৯০৯।অক্টোবর মাসে যদিও মিঃ গোখলে ট্রান্সভালবাসীদের গভর্ণমেণ্টকে ট্যাক্‌স দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিতে বলিলেন, তথাপি তিনি আশঙ্কা করিলেন যে—গভর্ণমেণ্ট এই উদ্যমকে শান্তভাবে থাকিতে দিবেন না—("Government will provoke it to be violent.")।

১৯১০।ফেব্রুয়ারী : অরবিন্দ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া ফেব্রুয়ারীর প্রথমেই লিখিলেন—

"**আমাদের নিরাশা**—আমরা আশা করিয়াছিলাম, বৈধ ও নির্দ্দোষ উপায় অবলম্বন করিয়া, সাহস দৃঢ়তা শান্ততার সহিত জাতীয় আন্দোলন আবার জাগাইয়া ও সুপথে চালাইয়া আমরা দুই অতি-প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিব। ১ম, লোকের মনে বৈধ উপায়ের শ্রেষ্ঠতায় ও ফলবত্তায় বিশ্বাস উৎপাদন করাইয়া এখন যে গুপ্তহত্যা ও বলপ্রয়োগের দিকে যুবকদের মনের আকর্ষণ হইতেছে, তাহা বন্ধ করিতে পারিব। ২য়, রাজপুরুষগণকে বৈধ প্রতিরোধের ফলে সভ্য উপায়ে দুই জাতির হিতের সংঘর্ষজনিত যুদ্ধ চালাইবার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেশের উন্নতি সাধন করিব এবং দেশের স্বাধীনতা ক্রমে ক্রমে আদায় করিব। আমাদের এখনো বিশ্বাস যে, এই উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে দুইটি উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে। কিন্তু সেই উপায় অবলম্বন করা একপ্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিতেছে।

"প্রথম অন্তরায়—লোকের অনাস্থা ও উৎসাহের অভাব। বৈধ উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে আমরা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারিব। প্রৌঢ় লোকের মধ্যে এই বিশ্বাস আছে, মধ্যপন্থীর অনুমোদিত উপায়ের উপর হইতে সকলের আস্থা উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও কি হয়, গভর্ণমেণ্ট সেই বৈধ উপায় অবলম্বন করিতে দিবেন না। তাঁহাদের হাতে যখন আইন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট-পুলিশ তাঁহাদেরই চাকর দেশবাসীর প্রভু, তখন কোনও বৈধ আন্দোলন করা অসম্ভব। আমরা দেখিয়াছি, এই মতের এত প্রাবল্য হইতেছে যে, বৈধ আন্দোলন ও বৈধ প্রতিরোধ আর চলে না!

"লোকের আস্থা নাই, শ্রদ্ধা নাই, শ্রদ্ধারহিত কর্ম্ম বৃথা, তাহার ফল 'ন চৈবামুত্র ন ইহ'। বৈধ আন্দোলনের পক্ষে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মতের

প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা আবশ্যক, নচেৎ আন্দোলন হইতে পারে না।... ..মনে মনে স্বাধীন চিন্তা পোষণ করাও বিপজ্জনক, কেননা বিনা কারণে খানাতল্লাসী, অমূলক সন্দেহে গ্রেপ্তার এবং বিনা অভিযোগে নির্ব্বাসন, প্রত্যেক স্বাধীনতালিপ্সুর পথে এই তিন বিপদ সর্ব্বদা গ্রাস করিতে উদ্যত। এই অবস্থায় আন্দোলন করা এক প্রকার আইনে নিষিদ্ধ। কাজেই লোকে আর আন্দোলন করতে অনিচ্ছুক।

—নির্জ্জীব আন্দোলন নিরর্থক।
—সজীব আন্দোলন অবৈধ।

"দ্বিতীয় অন্তরায়—বিপ্লবকারীর অদমনীয় উদ্দাম চেষ্টা। যাহাতে আমরা দমিয়া যাই, তাহাতে বিপ্লবকারীর তেজ ও উৎসাহ জাগিয়া উঠে। যত নিপীড়ন কর, সে তত হত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে ছুটিয়া আসে। আশু বিশ্বাসের হত্যার পরে সেই অশান্তি প্রায় নিবিয়া গিয়াছিল। নূতন চিফ্ জাষ্টিসের সুবিচারে, রিফর্ম্মের কোলাহলে, হুগলিতে জাতীয় পক্ষের পুনরুত্থানে, লোকের মনে আশা উৎপন্ন হইয়াছিল যে—আবার বুঝি বৈধভাবে জাতীয় জাগরণকে উদ্দেশ্যের দিকে চালাইবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। সেই আশার আলোক নিবিড়তর অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। এদিকে রাজনীতিক ডাকাতির জন্য দেশময় ধরপাকড় ও খানাতল্লাসীতে বিপ্লবকারীদের তেজ ও আশা উদ্দীপিত হইয়াছে। নাসিকে খুন, পূর্ব বাংলায় রেলওয়েতে গুলি চালান, হাইকোর্টে শামসুল আলমের হত্যা, এইরূপে দিন দিন নূতন ঘটনা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার শেষ কোথায় ?

"প্রথম ফল—রাজপুরুষগণ সমস্ত দেশের উপর চটিয়াছেন, আন্দোলনের অবশিষ্ট ক্ষীণ বহ্নিটুকু নিবাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। নিগ্রহের বৃদ্ধিতে গুপ্তহত্যার বৃদ্ধি, গুপ্তহত্যার বৃদ্ধিতে নিগ্রহের বৃদ্ধি—এইরূপ ক্রোধের শেষ কোথায় ? রাজপুরুষদের বিবেচনারহিত ক্রোধ, বিপ্লবকারীর বিবেচনারহিত উন্মত্ততা—এই দুই শক্তির সংঘর্ষে, নিষ্পেষণে পড়িয়া আমাদের আন্দোলন মরিয়া যাইতেছে।

"এ অবস্থায় করিব কী ? যখন গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে আমরা চুপ করিয়া থাকি, নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকি, যখন দেশবাসী আর রব করিতে চায় না, তখন নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকাই শ্রেয়ঃ। ইংরেজ বলে—জাতীয় পক্ষের সংবাদপত্র ও বক্তাই দায়ী, তাঁহাদিগকে যদি থামাইতে পারি, বিপ্লবকারীর চেষ্টা আপনি থামিয়া যাইবে।

—তবে তাহাই হউক।

—আমরা থামিয়া গেলাম। নীরব নিশ্চেষ্ট হইলাম। দেখি তোমাদের অভিযোগ সত্য, না মিথ্যা।

"রাজনীতিচর্চ্চা কয়েক দিন পরিত্যাগ করিয়া আমরা ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি, ভারতের চিন্তার গভীরতা, কর্ম্মক্ষেত্রে আনাইবার চেষ্টা করি।"—['ধর্ম্ম' —১৮ই মাঘ, ১৩১৬; পৃঃ ৪-৫]

অরবিন্দের এই দীর্ঘ প্রবন্ধ এই জন্য তুলিয়া দিলাম যে, দুই তিন মাস পূর্ব্ব হইতেই, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, তিনি তাঁহার প্রস্থানের কারণগুলি একের পর আর নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বিশদরূপে দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিয়া যাইতেছেন—পাছে কেহ তাঁহাকে ভুল না বোঝে।

পরিস্থিতির আর এক দফা ঃ এই পরিস্থিতির গুরুত্ব খুব বেশী, কেননা ইহার বিভীষিকাই অরবিন্দের প্রস্থানের প্রধান কারণ। ১৯০২ খৃঃ হইতে সন্ত্রাসবাদ প্রবর্ত্তন করিয়া কালচক্রের গতিতে যে পরিস্থিতি বহু পরিমাণে তিনি নিজে সৃষ্টি করিয়াছেন, সে নিজের সৃষ্টি তাঁহাকে এখন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং তাঁহার নিজের সৃষ্টি তাঁহাকে চিরজীবনের মত প্রিয় জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত করিবে। স্বেচ্ছায় তিনি আজীবন নির্ব্বাসন বরণ করিলেন। অরবিন্দ তাঁহার মা-কালীকে এই অবস্থায় দাশরথি রায়ের মত বলিতে পারেন—"দোষ কারু নয় গো শ্যামা—আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি।"

কিন্তু যাহারা দেশের স্বাধীনতার গঙ্গায় ডুবিয়া মরিবার পথে "স্বখাদ সলিল" সৃষ্টি করেন, অরবিন্দ তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সুতরাং তিনি আমাদের নমস্য।

কয়েকটি 'ভারতীয় সংবাদ'—(১) পুণায় অস্পৃশ্য অধিকার, (২) "সিন্ধী"র সম্পাদকের দ্বীপান্তর, (৩) "খুলনাবাসী" রাজদ্রোহ, (৪) সরকারী ডাক লুট, (৫) হাইকোর্টে হত্যাকাণ্ড—গোয়েন্দা আলম খুন, (৬) আরও গ্রেপ্তার—"কৃষ্ণনগর হইতে উকিল ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায়কে ও তাঁহার মুহুরীকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় আনা হইয়াছে।" (৭) দিনাজপুর খানা-তল্লাসী, (৮) ভাই পরমানন্দের মামলা, (৯) ১০ম জাট সৈন্যদল—"ইহাদের মধ্যে বিদ্রোহ-চেষ্টার কথা আমরা পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। উক্ত সৈন্যদলকে আর আলিপুরে রাখা হইবে না।" (১০) ডাকাতির অনুসন্ধানের ফল, (১১) ময়মনসিংহে গ্রেপ্তার, (১২) রাজসাহীতে ভীষণ ডাকাতি, (১৩) কিশোরগঞ্জে

খানাতল্লাস, (১৪) পাবনায় বন্দুক চুরি, (১৫) পুণায় বিপ্লববাদী, (১৬) বেশান্ত ও কৃষ্ণবর্ম্মা।

মিসেস্ বেশান্ত লিখিয়াছেন—"মিঃ শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা এদেশে প্রভূত পরিমাণে বৈপ্লবিক সাহিত্য প্রচার করিয়াছেন। 'ভীরু' এই বিশেষণটি দ্বারাও কৃষ্ণবর্ম্মার প্রকৃত চরিত্র বর্ণিত হয় না। তিনি নিজে বিদেশে সুখশান্তিতে সুরক্ষিত হইয়া ভারবাসীদিগকে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যে উত্তেজিত করিতেছেন। এরূপ লোকের প্রতি কোন প্রকার কটুক্তিই কঠোর বা অতিরঞ্জিত হইতে পারে না।"—['ধর্ম্ম', ১৮ই মাঘ, ১৩১৬—পৃঃ ১৬]

হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াই মিসেস্ বেশান্ত ও ভগিনী নিবেদিতা আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন। দেখা গেল, মিসেস্ বেশান্ত আমাদের দেশে সন্ত্রাসবাদের ঘোর বিরোধী। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা আয়ল্যাণ্ডের মেয়ে এবং আমাদের দেশে আয়র্ল্যাণ্ডের 'সিন্ ফিন্' মতাবলম্বী সন্ত্রাসবাদ প্রচলনের পক্ষপাতী। মিসেস্ বেশান্তের সহিত অরবিন্দের কোন যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার সহিত বরোদায় প্রথম সাক্ষাৎ (১৯০৩।অক্টোবর) হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত (১৯১১।অক্টোবর), ৮ বৎসর ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে অরবিন্দ লিখিতেছেন—

"গত রবিবার আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে যোগদান করিতে বেলুড় মঠে গিয়াছিলাম। আমি একজন কল্পনাপ্রিয় ভাবুক ব্যক্তি। আমার ভাব এই যে, হিন্দুজাতি সমগ্র জগতকে জয় করিবে।"

অরবিন্দ রাজনীতিক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া জগতে হিন্দুধর্ম প্রচারের কথাই বলিতেছেন। এবং এই পথে অগ্রসর হইতে স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছেন। ফেব্রুয়ারীর শেষ ভাগে অরবিন্দ চন্দননগর প্রস্থান করেন। এবং মার্চ্চ মাস চন্দননগর মতিলাল রায়ের বাড়ীতেই আত্মগোপন করিয়া থাকেন। কিন্তু মার্চ্চ মাসে 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ', 'জন্মতিথি উৎসব', 'পুনরায় জন্মাতিথি উৎসব'—এই তিনটি প্রবন্ধ বাহির হয়। এখন প্রশ্ন, এই লেখাগুলি কাহার? আভ্যন্তরীণ প্রমাণে দেখিতেছি, এই লেখাগুলির মধ্যে অরবিন্দের এই সম্পর্কে আগের লেখার ভাব ও ভাষা জাজ্বল্যমান। ১৪ই মার্চ্চের (৩০শে ফাল্গুন) জন্মতিথি উৎসব প্রবন্ধে লেখা আছে—

"...ভারত যে এবার জাতীয় জীবন ও সনাতন ধর্ম্ম স্থাপন করিবে তাহা

নহে—সমস্ত পৃথিবীর জাতীয় জীবনের রক্ষাকর্ত্তা হইবে ও মহান ধর্ম্মদান করিবে। তাই তিনি (বিবেকানন্দ) অন্য দেশে জন্মগ্রহণ না করিয়া এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।... বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবন গঠন-কর্ত্তা, তিনি ইহার প্রধান নেতা।"

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এইরূপ উচ্চ প্রশংসা তিনি "কর্ম্মযোগিন্" পত্রিকার সূচনাতেই লিখিয়াছেন। মার্চ্চ মাসের উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির ভাব ও ভাষা দুই-ই অরবিন্দের, পরিষ্কার বোঝা যায়। হয় তিনি ইহা আগে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, না হয় চন্দননগর হইতে লিখিয়া পাঠাইয়া থাকিবেন। "কর্ম্মযোগিন্" পত্রিকাতেও এই মার্চ্চ মাসে অরবিন্দের লেখা বাহির হইয়াছে। যেমন, "বাজী-প্রভু"। এবং সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধেও একটি লেখা বাহির হইয়াছে। "বাজী-প্রভু" অরবিন্দ ভিন্ন আর কেহ লিখিতে পারেন না।

১৩ই ফেব্রুয়ারী নয়জন নেতা, যাঁহারা ১৯০৮।ডিসেম্বরে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা মুক্তি পাইলেন।

"গত মঙ্গলবার (১০ই ফেব্রুয়ারী) শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও সতীশ চাটার্জ্জি রেঙ্গুন মেল ষ্টীমারে কলিকাতা আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ চাঁদপাল ঘাটে উপস্থিত ছিলেন।"—["ধর্ম্ম", ৯ই ফাল্গুন, ১৩১৬]

১৬ই ফেব্রুয়ারী অরবিন্দকে আমরা কলিকাতায় চাঁদপাল ঘাটে উপস্থিত দেখিলাম।

ভগিনী নিবেদিতা : নির্ব্বাসিত নেতারা মুক্তিলাভ করিবার পর, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার স্কুলের তোরণদ্বার মঙ্গলঘট, কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব প্রভৃতির দ্বারা সজ্জিত করিলেন। এবং স্কুলের মেয়েদের লইয়া একটি মাঙ্গলিক উৎসব করিলেন। অরবিন্দ খুব কম লোকের বাড়ীতেই যাতায়াত করিতেন, কিন্তু তিনি বোসপাড়া লেনে ভগিনী নিবেদিতার বাড়ীতে দেখা করিতে আসিতেন। স্যার্ জগদীশ চন্দ্র বসুর পত্নী, লেডী অবলা বসু, আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে—জগদীশ বসু এবং অরবিন্দ ঘোষ, উভয়েই নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে দেখাসাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। নিবেদিতাই স্বামী বিবেকানন্দের "রাজযোগ" বইখানি অরবিন্দকে বরোদায় প্রথম সাক্ষাতের সময়ই পড়িতে দিয়াছিলেন। এই বইখানি পড়িয়াই অরবিন্দ যোগের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই

সামান্য ঘটনাটি পরে শ্রীঅরবিন্দের জীবনে কি বিপুল আকারেই না আত্মপ্রকাশ করিয়াছে!

নির্ব্বাসিতের মুক্তি : বড়লাট (লর্ড মিণ্টো) এক বক্তৃতায় বলেন—"দেশে এখন রাজনীতিক অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নির্ব্বাসিতেরা যে রাজনীতিক আন্দোলনের নেতা ছিলেন, তাহা রাজবিদ্রোহমূলক ছিল বটে, কিন্তু এখন তাহা বিপ্লববাদীদিগের ষড়যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। তাঁহারা যে-রাজনীতিক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহা এই রাজনীতিক আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ন্যায়তঃ পরিগণিত হইতে পারে না।"—["ধর্ম্ম", ২রা ফাল্গুন, ১৩১৬]

১২ই ফেব্রুয়ারীর "কর্ম্মযোগিন্"-এ বড়লাটের বক্তৃতা সম্বন্ধে অরবিন্দ লিখিলেন—

"*Viceroy's Speech--Release Of Deportees* (1) The political movement of which they were leaders—seditious as it was—has degenerated into an anarchical plot, which can no longer bc legitimately included as part of the political agitation in which they were so culpably implicated. (2) We are now face to face with an anarchical conspiracy waging war against British and Indian communities alike."

রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বড়লাট যে মন্তব্য করিলেন, অরবিন্দের মন্তব্যের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল রহিয়া গিয়াছে। এখন কেবল অরাজকতা-মূলক রাজার সহিত যুদ্ধপ্রয়াসী বৈপ্লবিক দলের মুখোমুখি সংঘর্ষ চলিতেছে। সভা-সমিতির আন্দোলনকারিগণ সম্পূর্ণ নীরব হইয়া গিয়াছেন। অরবিন্দ এই কথাই গত দুই মাস যাবৎ, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বলিয়া ও লিখিয়া আসিতেছেন। তবে বড়লাট যে সন্ত্রাসবাদীদের anarchist, অরাজকতা-সৃষ্টিকারী, বলিয়াছেন অরবিন্দ ঐ সংখ্যাতেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। অরবিন্দ লিখিলেন যে, বাঙ্গলা তথা ভারতের সন্ত্রাসবাদীরা তো অরাজকতা চায় না—সুশৃঙ্খলাপূর্ণ রাজ্যশাসনই চায়, এবং ইংরেজের অত্যাচারপূর্ণ শাসনে উহা সম্ভবপর নয় বলিয়াই এই বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন স্বদেশী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চায়।

"*Anarchism* : It is different from Terrorism. The Irish Fenians did the same thing as the Indian Terrorists are now practising, but nobody ever called them Anarchists."—[*Karmayogin, 12th February*]

চন্দননগর প্রস্থানের মাত্র দুই সপ্তাহ পূর্ব্বেও স্বয়ং বড়লাটের কথার প্রতিবাদে অরবিন্দ আয়র্ল্যাণ্ডের "সিন্ ফিন্"দের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া ভারতের সন্ত্রাসবাদীদিগকে সমর্থনই করিয়া গেলেন। পার্ণেলের প্রভাব শেষ অবধিও তাঁহার মধ্যে লক্ষ্য করা যাইতেছে।

বড়লাট যখন সভাসমিতির আন্দোলনকারী নেতাদিগকে মুক্তি দিতেছেন, ঠিক সেই সময়েই অরবিন্দকে নির্ব্বাসন ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিতেছেন কেন? তবে কি গভর্ণমেণ্ট অরবিন্দকে শুধু সভাসমিতির আন্দোলনকারী নেতা বলিয়া মনে করেন না—পরন্তু, সন্ত্রাসবাদীদের নেতা বলিয়া বিশ্বাস করেন?

গীতায় বিশ্বরূপ-দর্শন—বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ : সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দের মতপার্থক্য আমরা দেখিয়াছি। গীতা সম্পর্কেও একটা মতপার্থক্যের দৃষ্টান্ত দিতেছি। অরবিন্দ লিখিতেছেন—

" 'বন্দেমাতরম্' শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিপিনচন্দ্র পাল অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে—ইহা সম্পূর্ণ অসত্য, কবির কল্পনা মাত্র। আমরা এই কথার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য।··· বিশ্বরূপ দর্শন কল্পনা নয়, উপমা নয়, সত্য; অতিপ্রাকৃত সত্য নহে—কেননা, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত, বিশ্বরূপ অতিপ্রাকৃত হইতে পারে না। বিশ্বরূপ কারণজগতের সত্য, কারণজগতের রূপ দিব্যচক্ষুতে প্রকাশ হয়। দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত অর্জ্জুন কারণজগতের বিশ্বরূপ দেখিলেন।"—(পৃঃ ২)

বিপিন বাবু উত্তরে লিখিতেছেন ('বন্দেমাতরম্')—

"অর্জ্জুন যাহা দিব্যচক্ষে আপনার অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা মিথ্যাও নহে, কল্পনাও নহে। তাহা সত্য। সে সত্য অ-প্রাকৃত। গীতায় সে সত্যের ছবি নাই। ভাষা অ-প্রাকৃত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিতে পারে না"—(পৃঃ ৭)।—["ধর্ম্ম", ২৫শে মাঘ, ১৩১৬]

কারণজগতের রূপ ও দিব্যচক্ষু সম্পর্কে অরবিন্দ যতটা নিঃসংশয়, বিপিনচন্দ্র ততটা নয়। অরবিন্দের দৃষ্টি রহস্যে পূর্ণ (mystic), আর বিপিনচন্দ্রের দৃষ্টি যুক্তির প্রখর কিরণে সমুজ্জ্বল।

অরবিন্দ ভবিষ্যৎ-জীবনে যে যোগপথ অবলম্বন করিবেন, তাহার পূর্ব্বাভাস তিনি দিয়া যাইতেছেন—

"**প্রকৃতি জয়**—প্রবল ইচ্ছা, কঠোর তপস্যা দ্বারা প্রকৃতিকে জয় করা যাইতে পারে। কিন্তু এই নিগ্রহের পন্থার এক আশঙ্কা এই যে, আপাততঃ ফলদায়ী হইলেও, অকস্মাৎ এক মুহূর্তে বিদ্রোহী হইয়া আপন আপন রুদ্ধ ক্ষুধার পরিতৃপ্তি চাহে। আমাদের পুরাণে মহা মহা তপস্বী মুনিঋষিদের অকস্মাৎ পদস্খলনের দৃষ্টান্তসকল এই মহা সত্য ঘোষণা করিতেছে।

"প্রকৃতি জয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা কেবলমাত্র বুদ্ধি নির্লিপ্ত করা, প্রকৃতির উপরই সকল ভার অর্পণ করা। আমার মধ্য দিয়া যে-সকল চিন্তা, যে-সকল ভাব, যে-সকল কর্ম্মের স্রোত বহিয়া যাইতেছে তাহা আমি কোন প্রকারে বাধা দিব না। প্রকৃতি যাহা করে তাহা সর্ব্বতোভাবেই স্বীকার করিয়া লইব। এইরূপে প্রকৃতিকে তাহার নিজ মনোমত পথ অনুসরণ করিতে দিলে সে সর্ব্বাপেক্ষা সরল, শীঘ্রতম, দ্রুত ও প্রকৃষ্ট পন্থাই লইবে। সে আপনা হইতেই ত্যাগ ভোগ সংযমের দ্বারা সকল ময়লা, সকল কালিমা বিদূরিত করিয়া পুরুষকে শাশ্বত আনন্দেই প্রতিষ্ঠা করিবে। যে জোর করিয়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করে, সে মহৎ বটে; কিন্তু প্রকৃতি আপনা হইতেই যাহার দাসী হইয়া সেবা করে, সে মহত্তর।···

"**ত্যাগ ও ভোগ**—বিনা ভোগে ত্যাগ সম্ভব নয়।···আমাদের পুরা মাত্রায় ভোগ করা চাই। সর্ব্বোচ্চ ভোগ নহিলে সর্ব্বোচ্চ ত্যাগ সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন রাজগণ পূর্ণ ভোগ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন। আমাদের চাই পূর্ণ ভোগ, পূর্ণ ত্যাগ।"—("ধর্ম্ম", ১৬ই ফাল্গুন, ১৩১৬)

সাংখ্যের পুরুষ যেমন প্রকৃতির উদ্দাম আচরণ ও গতিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া নিজে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, অরবিন্দের যোগপথও ঠিক তদনুরূপ। প্রকৃতির উদ্দাম আচরণকে বাধা দিবার পক্ষপাতী অরবিন্দ নহেন। পাতঞ্জল যে বলিয়াছিলেন, যোগ চিত্তবৃত্তির নিরোধ—অরবিন্দ তাহা মানেন না। স্বামী বিবেকানন্দের যোগ পাতঞ্জল-অনুমোদিত। আর অরবিন্দের যোগ সম্পূর্ণ পাতঞ্জল-বিরোধী। ভোগ সম্বন্ধেও সেই একই কথা। আগুনে ঘি ঢালিলে যেমন আগুন নেবে না, আরও বেশী জ্বলিয়া উঠে—অবিরত ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতে গেলে ভোগস্পৃহা বাড়িয়াই যাইবে। কোনদিন ত্যাগ আসিবে না। ইহাই

প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের অভিমত। কিন্তু মনস্তত্ত্বে অরবিন্দের নূতন আবিষ্কার আমাদিগকে নূতন কথা শুনাইতেছে। অরবিন্দ ভবিষ্যৎ যোগপথের আভাস প্রস্থানের প্রাক্‌কালে কি আমাদিগকে দিয়া যাইতেছেন না?

অরবিন্দের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা : (১) অরবিন্দ ধর্মজীবনে প্রথমে নাস্তিক ছিলেন, পরে অতিশয় ঈশ্বরভক্ত হইলেন। এ পরিবর্ত্তন অপেক্ষাও তাঁহার রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। অরবিন্দের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বিশ বৎসরের (১৮৯০-১৯১০) ইতিহাস। তাঁহার মধ্যে বাঙ্গলাদেশে প্রকাশ্য রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি ১৯০৬।আগষ্ট হইতে ১৯১০।ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে এক বৎসর কারাবাস বাদ দিলে, মাত্র দুই বৎসর সাত মাস তাঁহার প্রকাশ্য রাজনীতিক্ষেত্রের কর্মজীবন। আর অন্তরালে গুপ্তসমিতির প্রবর্ত্তন ব্যাপারে প্রথমে তিন বৎসর (১৯০২-০৫), আর দ্বিতীয় পর্ব্বেও (১৯০৬-০৮) তিন বৎসর—এই মোট ছয় বৎসর।

(২) ১৪ বৎসর বিলাতে থাকিয়াই ইংরেজের রাজনীতির সহিত তিনি সুপরিচিত ছিলেন—এ-কথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। কেম্ব্রিজ মজলিসে ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দিতেন। প্রথমে তিনি কংগ্রেসের পক্ষপাতী ছিলেন। পরে, পার্ণেলের প্রভাবে কংগ্রেসের "আবেদন নিবেদন" নীতির উপর আস্থা হারাইলেন। দেশে ফিরিয়া কংগ্রেসের 'আবেদন-নিবেদন' নীতির বিরুদ্ধে (১৮৯৩-৯৪) তীব্র সমালোচনা করিলেন, ফরাসী বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেন। পরে, তিনি কলিকাতা ও সুরাট কংগ্রেসে যোগদান (১৯০৬-০৭) করিলেন। লাহোর কংগ্রেসে (১৯০৯), তিনি ইচ্ছা করিলেও, মডারেটরা তাঁহাকে যোগদান করিতে দিলেন না।

(৩) তিনি বরিশাল (১৯০৬) কন্‌ফারেন্সে গিয়াছিলেন। মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্সে (১৯০৭) মডারেটদের ছাড়িয়া জাতীয় দলের পৃথক কন্‌ফারেন্স করিয়াছিলেন। পরে হুগলী কন্‌ফারেন্সে (১৯০৯) কিছুটা নত হইয়াই মডারেটদের সহিত আপোষ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট জেলা-সমিতিতে হুগলী অপেক্ষা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

(৪) দেশে ফিরিবার কয়েক মাস পরেই (১৮৯৩) তিনি কংগ্রেসের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলনকে আক্রমণ করিয়া প্রলেটেরিয়েটবাদী হইয়াছিলেন। পরে, (১৯০৭) মর্লির শাসন-সংস্কারের প্রতিবাদ করিতে গিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন

যে, ইহা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব খর্ব্ব করিবে এবং এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই প্রলেটেরিয়েটদের মস্তিষ্কস্বরূপ। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে ১৮৯৩ হইতে ১৯০৭— অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়।

(৫) তিনি যখন গুজরাট গুপ্তচক্রের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, সেই সময়ে (১৯০২-০৪) নিজে বাঙ্গলাদেশে আসিয়া গুপ্তসমিতির প্রথম পর্ব্বের উদ্বোধন করেন। কিন্তু লোকের আস্থা নাই (apathy) দেখিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া বরোদায় ফিরিয়া যান। পরে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনার সময় যুগান্তরের দলের মধ্য দিয়া গুপ্তসমিতির দ্বিতীয় পর্ব্ব (১৯০৬-০৮) আরম্ভ করেন। গুপ্ত-সমিতির সম্মুখে আদর্শ ছিল—প্রথমে গুপ্তসমিতি, পরে 'গরিলা', সর্ব্বশেষ প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এই দ্বিতীয় বারের গুপ্তসমিতিও 'গরিলা'র স্তরে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। আবার, চন্দননগর প্রস্থানের দুই মাস পূর্ব্বে সন্ত্রাসবাদীদিগকে "উদ্দাম আচরণ" করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং 'শক্তিকে অন্তর্মুখী' করিবার কথাও লিখিয়াছেন। 'আমাদের যুদ্ধের উপকরণ'—অস্ত্রশস্ত্র নাই বলিয়া যুদ্ধ করিবার পরামর্শ দেন নাই; অথচ (১৮৯৩) আমাদের নিরস্ত্র দেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়াই ফরাসী বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছিলেন, জাতিকে 'অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্র' হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে বলিয়াছিলেন। তখন soul force (১৯১০)-এর 'সূক্ষ্ম' উপায়ের কথা তাঁহার মনে আসে নাই। যখনি লৌকিক উপায় ব্যর্থ হইয়াছে, তখনি অলৌকিক উপায়ের দিকে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন।

(৬) তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট 'আরও বেশী অত্যাচার' চাহিয়াছেন (১৯০৭)। অত্যাচারে সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধি পায়, ইহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। সুতরাং সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধির জন্যই তিনি অত্যাচার চাহিয়াছেন। কিন্তু পরে (১৯১০) গভর্ণমেণ্টকে নিগ্রহ-নীতি সম্বরণ করিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন। সে অনুরোধে কোনই ফল হয় নাই।

(৭) তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধও সমর্থন করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদও চালাইয়া গিয়াছেন। পরে (১৯১০) বুঝিয়াছিলেন যে, সন্ত্রাসবাদ না ছাড়িলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চলিতে পারে না।

(৮) গভর্ণমেণ্টের নিদারুণ নিগ্রহ-নীতি; দেশের লোকের 'আস্থা নাই, উৎসাহ নাই, শ্রদ্ধা নাই' দেখিয়া, এবং বৈধ উপায়ে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চালান

অসম্ভব বুঝিয়া—আসন্ন গ্রেপ্তার ও নির্ব্বাসনের কথা শুনিয়া সন্ত্রাসবাদ ও নিগ্রহ-নীতির প্রবল সংঘর্ষের মধ্যে তাঁহার দেশকে তাঁহার কৃত কার্য্যের ফলভোগ করিবার জন্য ফেলিয়া রাখিয়া তিনি চন্দননগর প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ধিঙড়া সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, সেই তাঁহার নিজের কথাই তাঁহার সম্বন্ধেও বলা যায়—"Here his country remains behind to bear the consequences of his act."—[*Karmayogin, July 31, 1909*]

তিনি সন্ত্রাসবাদের যে বিষ বাঙ্গালার মাটিতে ঢালিয়া গেলেন, তাহা তাঁহার প্রস্থানের পর শুকাইয়া যায় নাই—যদি তিনি নিষেধ করিয়া থাকেন, সে নিষেধ মানে নাই ; নদীর স্রোতের মত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

বীরেন্দ্রের ফাঁসি ঃ "বীরেনের পক্ষে কৌঁসুলী ছিল, কিন্তু বীরেন কাহারও সাহায্য লয় নাই, দোষ স্বীকার করিয়াছে।…… গত সোমবার (৯ই ফাল্গুন—২২শে ফেব্রুয়ারী হইবে) ভোর ৬-৩০ মিনিটের সময় কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যে আলমের হত্যাকারী বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।… ভোরবেলা তাহাকে ফাঁসিমঞ্চের নিকট আনা হয় এবং সে দৃঢ়পদে নিজে হাটিয়া মঞ্চোপরি আরোহণ করে। ফাঁসির হুকুম পড়িয়া শুনাইলে সে কিছু বলে নাই।"—("ধর্ম্ম", ১৬ই ফাল্গুন, ১৩১৬)

ইহা অরবিন্দের চন্দননগর প্রস্থানের মাত্র এক সপ্তাহ আগের ঘটনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ অরবিন্দ 'ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"বিগত পাঁচশত বৎসরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত দ্বিতীয় একটি পুরুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন নাই।"…

একটি কবিতাও আছে—

"বিধির তূর্য্য উঠিল বাজিয়া
পলায়ন নহে পলায়ন।"

পলায়ন, পলায়ন নহে—এই স্ববিরোধী কথার মধ্যে এক গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। অরবিন্দের চন্দননগর প্রস্থানের সম্ভবতঃ দুই-একদিন পূর্ব্বে 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় লেখা হইল—

"**ভগবৎ-দর্শন** : শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, যদি কেবল তিন দিন মাত্র অনন্যকর্মা হইয়া আকুল ও একাগ্রচিত্তে ভগবানকে ডাকা যায়, তাহা হইলেই তাঁহার দর্শনলাভ হয়।"—('ধর্ম'—১৬ই ফাল্গুন)

জেলের মধ্যে ভগবানের সাক্ষাৎ-দর্শন লাভ করিয়া অরবিন্দ পরমহংসদেবের কথার সত্যতাই প্রমাণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীসারদা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ : অনেক বাদানুবাদের পর প্রমাণ-মূলে ইহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে যে, চন্দননগর প্রস্থানের কিছু পূর্ব্বে অরবিন্দ সস্ত্রীক বাগবাজার "উদ্বোধন" অফিসে আসিয়া পরমহংসদেবের পত্নী, শ্রীশ্রীসারদা দেবীকে উভয়ে প্রণাম করিলেন। শ্রীশ্রীমা অরবিন্দের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং উপদেশ দিলেন। শ্রীশ্রীমা অরবিন্দকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"এইটুকু মানুষ—এঁকেই গভর্ণমেণ্টের এত ভয়?" তারপর অরবিন্দকে বলিয়াছিলেন—"আমার বীর ছেলে।" গৌরী-মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অরবিন্দের চিবুক ধরিয়া স্বামীজীর কবিতা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন—

"যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।
হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ জগতে নাহি তব স্থান।"

ভগিনী নিবেদিতার ফরাসী জীবন-চরিতে অরবিন্দের প্রস্থান-প্রসঙ্গ : "যোগীন্-মা", শ্রীশ্রীসারদা দেবীর সেবিকা, সংবাদ দিলেন যে—তাঁহার নাতি পুলিশের নিকট হইতে গোপনে সংবাদ পাইয়াছে যে, অরবিন্দকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিবে। "যোগীন্-মা" স্বামী সারদানন্দকে ইহা বলিলেন। খবর সত্য।

সর্ব্বপ্রথম গণেন-মহারাজ অরবিন্দকে সাবধান করিবার জন্য ছুটিলেন। অরবিন্দ তখন লিখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—"নিবেদিতা যদি আমার হইয়া কাজ করে (অর্থাৎ 'কর্ম্মযোগিন্'-এ লিখে) তবে আমি প্রস্থান করিব।" সমস্ত দিন অরবিন্দ লিখিলেন—"Open Letter To My Co-citizens", "My Political Testament". সেই রাত্রেই তিনি প্রস্থান করিলেন ("That very night he left")।

অরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতার বাড়ীতে গেলেন। তার পরের সমস্ত দিন সেইখানে থাকিলেন। সেই রাত্রে বাগবাজারের ঘাটে একটি ছোট ফরাসী-বোট

আসিয়া লাগিল। এই শেষের উদ্বেগজনক ঘণ্টাগুলি গোপনতার আবরণে আচ্ছন্ন। "Divine Mother"-এর দুইজন সাধক মিলিত হইলেন (অরবিন্দ ও নিবেদিতা)। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর উভয়কে শক্তিসঞ্চার করিলেন।

"This time the communication of danger came from 'Jogin-Ma', one of the followers of the Holy Mother, on whom one of her grand nephews—শশীভূষণ দে—a secret police officer, had bestowed his confidence. Jogin-Ma was disquieted and disclosed it to Swami Saradananda. The communication was precise. ··· It was Ganen Maharaj who hastened to warn Aurobindo. Aurobindo was working. ·· 'Work before everything (he said) ··· *if Nivedita continues the work I shall leave.'* All the day he went on writing. He gave to his last article the title : 'Open Letter To My Co-citizens', 'My Political Testament' ; that very night he left.—(*Page 321*) ·····He went to Nivedita where he spent the whole of the next day. A small French boat was to touch at Bagbazar that night. These last tense hours were, such is the mystery in the temple, veiled in secrecy. Two worshippers of the Divine Mother met together to transmit their powers to each other."—*(P. 321-22)*—[ফরাসী জীবন-চরিত]

অরবিন্দের চন্দননগর প্রস্থান ও ভগিনী নিবেদিতা : ৺রামচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন—"ইহার কয়েক দিন পরে আমি জনৈক সি. আই. ডি'র নিকট হইতে সংবাদ পাই যে, শ্রীঅরবিন্দকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হইবে, এবং খুব সম্ভব শামসুল আলমের হত্যার মামলায় তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইবে। এই সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই আরও দুই স্থান হইতে পাই। সংবাদ পাইয়াই আমি কৃষ্ণকুমার বাবুর বাড়ী ছুটিলাম এবং শ্রীঅরবিন্দকে সংবাদ দিলাম। তিনি ধীরচিত্তে ইহা শুনিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া 'কর্ম্মযোগিন্' অফিসে আসিলেন। প্রথমে জামিনদার ঠিক করিয়া রাখিবার পরামর্শ হইল। পরে বলিলেন : 'নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।' আমি ভগিনী

নিবেদিতার বাড়ী গেলাম। তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। বরোদায় নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। নিবেদিতা তাঁহাকে স্বামীজীর 'রাজযোগ' উপহার দেন। অরবিন্দ বাবু বলিতেন যে, এই পুস্তক পড়িয়াই তাঁহার হিন্দু দর্শন পড়িবার আগ্রহ হয়। ভগিনী নিবেদিতা 'কর্ম্মযোগিনে' প্রবন্ধ লিখিতেন। যে-সময়ে অরবিন্দ বাবু চন্দননগরে লুকাইয়া ছিলেন, সে-সময় নিবেদিতাই কাগজখানি চালাইয়াছিলেন।···যাহা হউক, ভগিনী নিবেদিতাকে সকল ঘটনা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন—'Tell your chief to hide and the hidden chief through intermediary shall do many things.' একদিন অরবিন্দ বাবু আমাকে বলিয়াছিলেন—'Mother Kali through Sister Nivedita ordered me to hide.' ··· ··· এই সংবাদ লইয়া আমি অফিসে ফিরিলাম। অরবিন্দ বাবু বলিলেন—All right, arrange."

"গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিবার পূর্ব্বে বোসপাড়া লেনে অরবিন্দ বাবু ভগিনী নিবেদিতার বাসায় গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। ···বোধ হয়, নিবেদিতার সঙ্গে তিনি 'কর্ম্মযোগিন্' পরিচালনার পরামর্শ করিয়াছিলেন। এই কথাবার্ত্তার সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম না, নীচের রোয়াকে বসিয়াছিলাম। কাজেই কী কথা হইয়াছিল, তাহা জানি না। নিবেদিতার বাসা হইতে আমরা বাগবাজার গঙ্গার ঘাটে যাই। ·····

"নৌকা ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে অরবিন্দ বাবু আমাকে বলিলেন—Be rare in you acquaintances. Seal your lips to rigid secrecy. Don't breathe this to your nearest and dearest. ··· নৌকা ছাড়িয়া দিল।"
—["উদ্বোধন" ; ভাদ্র, ১৩৫২ ; পৃঃ ২৩০-৩১]

নৈশসমীরণে নৌকা হেলিয়া দুলিয়া ক্রমে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

॥ সমাপ্ত ॥

শব্দ-সূচী

অ

আ

ই

উ

প

ফ

ব

॥ বার ॥